জীবনের অদ্ভুত সৃষ্টি হয় দেখিতে হইলে, সঙ্ঘ-বদ্ধ মানুষের ব্যক্তিগত চিন্তা কিরূপে সঙ্ঘের চিন্তায় পরিণত হইয়া নূতনের সৃষ্টি করে, দেখিতে হইবে।

মনে করা যা'ক, ব্যবস্থাপক সভার একজন সভ্য দেশের তার্থে একটা সামাজিক বিধি (আইন) প্রবর্ত্তিত করিতে তিলাষী হইলেন। কয়েক দিন ধরিয়া তিনি এ বিষয়ে ন্তা করিতে লাগিলেন ; ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে (তাঁহার ত) সম্ভব যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া আলোচনা রিতে লাগিলেন। তাহার পর হয় ত তাঁহার সান্ধ্য-মিতি (club) বা নিকট বন্ধুবর্গের নিকট এই প্রস্তাব থাপন করিলেন। এই সান্ধ্য-সমিতির সভ্যগণ অথবা হার নিকট বন্ধুবর্গ সামাজিক মতবাদে তাঁহারই অনুকূল ভাবলম্বী, ইহা আশা করা যাইতে পারে। সুতরাং তাঁহারা ই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। আলোচনা-প্রসঙ্গে আরও য়েকটি অনুকূল যুক্তি পাওয়া গেল, কয়েকটি প্রতিকূল ক্তির খণ্ডন হইল। আমাদের কাল্পনিক ব্যক্তিটিরও নিজস্ব কয়েকটি যুক্তি হয় ত ভ্রান্ত বলিয়া—এখা গেল। াহাই হউক, এই প্রথম পত্তনে, সামাজিক প্রস্তাবটি মোটের পর সমর্থিত হইল এরূপ আশা করিতে পারি। এইরূপে ৎসাহিত হইয়া উক্ত ব্যক্তি প্রস্তাবটি আইনের আকারে বস্থাপক সভায় উত্থাপিত করিলেন। সংবাদপত্রসমূহে াহার সেই প্রস্তাবের খসড়া প্রকাশিত হইল ; ফলে তাঁহার মত" নিকটস্থ বন্ধুমহল হইতে শিক্ষিত মহলে পৌঁছিল। াঁহাদেরও আপন আপন সঙ্ঘ আছে, এবং তাহার তকগুলির সামাজিক মতবাদ হয় ত আমাদের কাল্পনিক ভ্যটির মতবাদের প্রতিকূল। সুতরাং অনুকূল আলোচনা ও প্রতিকূল সমালোচনা পাশাপাশি চলিতে লাগিল ; ত্তর-প্রত্যুত্তর হইতে লাগিল। অর্থাৎ, প্রস্তাবটির মর্থনকারী ও প্রতিকূল-মতাবলম্বীদিগের মধ্যে রীতিমত াগযুদ্ধ ঘোষিত হইল,—সময় সময় এই যুদ্ধ বাক্যের সীমা াড়াইয়া যায় এবং পুলিশের সাহায্য লইতে হয়। যাহাই উক, উভয় পক্ষই দলবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে াগিলেন। আন্দোলন অর্থাৎ propoganda আরম্ভ হইল—দেশ জুড়িয়া সভা-সমিতির সাড়া পড়িয়া গেল। এই সভা-সমিতির ফলে প্রস্তাবটির বিষয় অশিক্ষিত জনসাধারণও অবগত হইল। সকলেই নিজে নিজে চিন্তা করিতে লাগিল ; এবং এই চিন্তার মধ্যে, অপরে, বিশেষতঃ াহাদের সঙ্ঘ, কিরূপ চিন্তা করিতেছে এবং তাহাদের মত কি, তাহাও স্থান পাইল। এইরূপে চিন্তার ও ভাবের ঘাতপ্রতিঘাত আরম্ভ হইল। প্রস্তাবটি যদি অত্যন্ত আধুনিকপন্থী হয়, তাহা হইলে আমাদের রক্ষণশীল-দলের নেতৃবর্গ বিদ্রোহ ঘোষণা করিবেন এবং শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া পুরাতনের পবিত্রতা রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইবেন। ফলে, সর্ব্বপ্রকার মতাবলম্বী ব্যক্তিগণই প্রস্তাবটির সম্বন্ধে চিন্তাশীল থাকিবেন। ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভ্যগণকে, যাহারা তাঁহাদের নির্ব্বাচন করিয়াছে তাহাদেরও (voters) "মত" মনে রাখিতে হইবে। পরিশেষে প্রস্তাবটি সভার আলোচনার জন্য উপস্থিত হইল, তাহার সামাজিক মূল্য বিচারের জন্য। হয় ত প্রস্তাবটি গৃহীত হইল, হয় ত হইল না—তাহার সহিত আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কোনও সম্পর্ক নাই। মূল কথা এই, একটা "জনমত" বা public opinion সৃষ্ট হইল। জনমত যে প্রত্যেক বিষয়েই একটা বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তাহা নয়, এবং ব্যবস্থাপক সভায় যে তাহাকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য উপস্থিত হইতেই হইবে তাহাও নহে,—বরঞ্চ, বেশীর ভাগ স্থলেই সমাজসম্পর্কীয় প্রশ্ন এইরূপ একটা বিশিষ্ট সভায় শেষ মীমাংসার জন্য উপস্থিত হয় না এবং জনমতের সমাধান অস্পষ্ট রহিয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলেও সমাজ-মন বা সঙ্ঘ-মনের চিন্তা করিবার প্রণালী কি, তাহা উপর্যুক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা কঠিন হইবে না।

অতএব দেখা যাইতেছে, এই যে জনমত বা সমাজ-মন সৃষ্ট হইল, ইহা সমাজের অন্তর্গত সঙ্ঘ-মনগুলির ঘাতপ্রতিঘাতে। এই সমাজ-মন শুধুমাত্র সঙ্ঘ-মনগুলির যোগফল নহে ; ইহার মধ্যে একটা শক্তি আছে যাহা ব্যষ্টিগত বা সঙ্ঘ-মনের মধ্যেই কেবল পাওয়া যায় না। ব্যষ্টি ও সমষ্টির এইখানেই প্রভেদ। যেমন ভাব, কল্পনা ইত্যাদি ব্যষ্টিগত মনোবৃত্তিসমূহের সমষ্টিতে মানুষের ব্যক্তিত্বের উদ্ভব, তেমনি ব্যষ্টিগত ব্যক্তির সমষ্টিতে সঙ্ঘের উৎপত্তি, এবং ব্যষ্টিগত সঙ্ঘের সমষ্টিতে সমাজের প্রকাশ। এই যে মানুষের স্বকীয়ত্ব, সঙ্ঘের ব্যক্তিত্ব, সমাজের ব্যক্তিত্ব, এই প্রত্যেক ব্যক্তিত্বই এক-একটা ঐক্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সমাজে এক এবং এক সম্মিলিত হইলে দুই-ও হয়ই,

উপরন্তু একটা উচ্চতর শক্তির উদ্ভব হয়;—এই উচ্চতর শক্তির একটা নৈতিক ঐক্য আছে—'ব্যক্তিত্ব' বুঝিতে আমরা সেই ঐক্যটাকেই বুঝি। সুতরাং সমাজ-মনের যে ঐক্য, তাহা নিজস্ব একটা ঐক্য হইলেও সঙ্ঘের অন্তর্গত ব্যক্তিস্বরূপ ঐক্যগুলির পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতেই তাহার সৃষ্টি। তেমনই সঙ্ঘ মনও মনুষ্যবিশেষের ব্যক্তিত্বের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রকাশ লাভ করে;—অর্থাৎ, ব্যষ্টিও একটা ঐক্য, সমষ্টিও একটা ঐক্য; পরস্পরের উপর পরস্পরের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া প্রতিনিয়তই চলিতেছে। (২)

সমাজমনকেও এইভাবেই বুঝিতে হইবে। কোনও সমাজ বা সঙ্ঘের ভিতরে যদি ব্যক্তিগত চিন্তার ধারার পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে, তখন সঙ্ঘ-মনেরও পরিবর্ত্তন ঘটে; এবং এই সঙ্ঘ মনের ভিতর দিয়াই সামাজিক চিন্তার ধারার বা আদর্শের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কথাবার্ত্তা, আচার ব্যবহারে আমরা অনেকেই সমাজটাকে বাহিরের কিছু বলিয়া ধরিয়া লই,—এমন একটা জীব যাহাকে কখনও দেখা যায় না, অথচ তাহার চক্ষু যে রক্তবর্ণ এবং তাহার আদেশ মাত্রই যে হুঙ্কার, সে বিষয়ে অনেকের মনেই কোনও সন্দেহ নাই। সমাজের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিলে কিন্তু দেখা যাইবে, সমাজ আমাদেরই ঘরের লোক; ইহার চক্ষুতে আমাদেরই দৃষ্টিশক্তি প্রকাশ পায়, এবং ইহার হুঙ্কারে ইহাই প্রমাণ হয় যে, আমরা হুঙ্কারের দ্বারাই আদেশ করিতে এবং আদেশ লইতে ভালবাসি। যেখানকার মানুষে সাম্য ও স্বাধীনতা ভালবাসে, সেখানে শিক্ষিত লোকের অভাব নাই, জ্ঞানহীন কুসংস্কার যেখানে মানুষের মনকে শাসিত করে না, সেখানকার সমাজ কখনও হুঙ্কার দিয়া কথা বলিতে জানে না, সেখানকার সমাজ নূতন বধূটির মত অনুরোধ করে, এবং নূতন বধূর অনুরোধের মতই তাহার অনুরোধ সানন্দে এবং স্বেচ্ছায় পালিত হয়। একটা কথা বলা এখানে হয় ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আজ আমরা আমাদের সমাজকে একটা বাহিরের দৈত্য বলিয়া মনে করি; তাহার একমাত্র কারণ, এখানে প্রকৃত সমাজের অভাব। বহু বৎসরের সামাজিক অরাজকতা ও রাজনৈতিক পরাধীনতার ফলে বাংলার মানুষ পরস্পরের চিত্ত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে; ভ্রাতৃভাব দূর হইয়া প্রভু-ভৃত্যের ভাবটাই বাংলার সামাজিক প্রাণটাকে আক্রমণ করিয়াছে। প্রাচীন ভারতে সমাজের এ আদর্শ ছিল না; তখন আমাদের সমাজ-প্রতিষ্ঠায় গণতন্ত্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিকাশ হইয়াছিল। কিন্তু এখন সমাজ অর্থে আমরা বুঝি সমাজ-পতি (অর্থাৎ গ্রামের 'মোড়ল'), এবং দেশ অশিক্ষিত বলিয়াই লোকে এই সমাজ-পতির শাসন, কতক ভয় ও কতক শ্রদ্ধার সহিত, পালন করিয়া আসিতেছে। এই শাসক ও শাসিতের ভাব সেই দিন দূর হইবে যেদিন শিক্ষার আলোক বাংলার ঘরের কোণ হইতে আচারের দাসত্ব ও কুসংস্কারের অন্ধকার দূর করিতে সমর্থ হইবে।

(মানুষের ব্যক্তিগত মন যেমন ব্যক্তিগত জীবনকে পরিচালিত করে, সঙ্ঘমনও তেমনি সঙ্ঘের জীবনকে পরিচালিত করে,) সঙ্ঘের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সঙ্ঘের সামঞ্জস্য স্থাপন করে, সঙ্ঘের সভ্যগণের পারস্পরিক আচার-ব্যবহার নির্ণয় করে, এবং অপরাপর সঙ্ঘের সহিত নিজের সম্বন্ধ স্থির করে) অতএব, যাহাকে আমরা সাধারণতঃ সামাজিক ক্ষেত্র বলি, সমাজ-মনের প্রভাব যে শুধু সেই ক্ষেত্রেই তাহা নয়, ইহা আমাদের পারস্পরিক ব্যবহারের সবটুকুই পরিচালিত করে,—অর্থাৎ, সমষ্টিবদ্ধ হইয়া মানুষ যাহা কিছু কার্য্য করে, তাহাই সমাজ মনের শাসনাধীন। ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনের যত কিছু সংস্কার (traditions) সে সকলই এই সমাজ-মনের সৃষ্টি। (যেমন একটা ক্ষণিক চিন্তার ধারা মানুষের মনের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, তেমনই এক জন মানুষ কিছু ভাবিলে বা করিলে সমাজের উপর তাহা খুব অল্পই প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে; যতক্ষণ না সেই ব্যক্তির চিন্তার ধারা জনসাধারণে সংক্রামিত হইতেছে, ততক্ষণ তাহা সমাজ গ্রহণ করিবে না)। (সমাজ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে এইরূপ ব্যক্তিগত চিন্তার ধারা প্রধানতঃ দুইটি উপায়ে জনসাধারণে সংক্রামিত হইতে পারে, (ক) সহানুভূতি ও অনুকরণের দ্বারা, এবং (খ) সুবালোচনায়

(২) ইংলণ্ডের বিখ্যাত মনীষী Hobhouse বলেন, "By the social mind we mean not necessarily a unity pervading any given society as a whole, but a tissue of operative psychological force which in their higher developments crystallise into unity within unity and into organism acting upon organism.—Social Evolution and Political Theory.

দ্বারা। কেবলমাত্র সহানুভূতি বা অনুকরণের দ্বারা আমরা যে কার্য্য করি তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিতে হয় না, গতানুগতিকতাই তাহার মুখ্য ধর্ম্ম। কিন্তু সমালোচনার বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা কার্য্যের বিচার করা হয়, অনুকরণ করিলেও তাহা অন্ধ নহে, বিবেচনার ফল।

(ক) সহানুভূতি ও অনুকরণ।—মানুষ যতই বুদ্ধিবৃত্তির গৌরব করুক না কেন, সমাজে অন্ধ সহানুভূতি ও অনুকরণের দ্বারাই বেশীর ভাগ মানুষ পরিচালিত হয়। স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা মানুষের ব্যবহার খুব কমই নির্ণীত হয়। পাঁচজনে যাহা ভাবিতেছে বা পাঁচজনে যাহা করিতেছে, তাহাই ভাবা বা করা মানুষের স্বভাব-ধর্ম্ম বলিয়া দেখা গিয়াছে। ফরাসী পণ্ডিত লি-বন্ (Le Bon) প্রমুখ মনীষিগণের মানব-মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ হইতে জানা গিয়াছে যে দশজনের মধ্যে পড়িয়া মানুষ এমন কার্য্য করিতে পারে যাহা সে শান্তভাবে বিবেচনা করিলে কখনও করিতে পারিত না। দশজনের উদাহরণ সাধারণ মানুষকে অভিভূত করিয়া ফেলে। এই গতানুগতিকতাই মানুষের স্বভাব-ধর্ম্ম। অসামান্য বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণই স্বাধীনভাবে চিন্তা বা কার্য্য করিতে পারেন; তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব (personality) দেশ-কাল-পাত্র ছাপাইয়া উঠে, এবং তাঁহারাই সত্যানুসন্ধিৎসাকে স্ফূর্ত্তিময় করিয়া তুলেন। ইঁহারাই পৃথিবীর যীশুখ্রীষ্ট, মানুষের চৈতন্য, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, মুসোলিনী, রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সাধারণের সংখ্যার তুলনায় ইঁহারা কয়জন! সাধারণ মানুষের অনুভূতি পারিপার্শ্বিক পাঁচজনের অনুভূতির দ্বারা শাসিত হয়। সমাজ-বিজ্ঞানের ভাষায় ইহাই হইল সহ-অনুভূতি বা সহানুভূতি। তাহার কার্য্যও তাহার সমবয়স্কগণের কার্য্য ও ব্যবহারের দ্বারা নির্ণীত হয়, ইহাকেই অনু-করণ বলা হয়। সাধারণতঃ, কোনও সাময়িক উত্তেজনার সময়েই মানুষ কেবলমাত্র সহানুভূতি ও অনুকরণের দ্বারা পরিচালিত হয়। (৩)

(খ) সমালোচনা। সমালোচনার দ্বারা মানুষ বুদ্ধিকে, সহানুভূতি ও অনুকরণের এবং প্রত্যেক স্বাধীন কার্য্যের বিচারক নিযুক্ত করে। প্রত্যেক অনুভূতিই যে সহানুভূতির উদ্রেক করে তাহা নহে, এবং প্রত্যেক কার্য্যই অনুষ্ঠিত হয় না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি আছে, বিচারশক্তি আছে; এইখানেই মানুষের সহিত পশুর প্রভেদ। এই বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারাই মানুষ প্রত্যেক অনুভূতি ও কার্য্যের ন্যূনাধিক বিচার করে। কেবলমাত্র কোনও সাময়িক উত্তেজনার সময়েই এই বুদ্ধিবৃত্তির সম্পূর্ণ লোপ হইতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক স্বাধীনতার উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান দার্শনিকগণ এই আস্থা ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। এখন দেখা যায়, পূর্ণ নৈতিক স্বাধীনতা একটা আদর্শমাত্র; বাস্তবপক্ষে মানুষ সামাজিক জীব হওয়ায় তাহার অনেকখানিই সামাজিক অনুশাসন ও ভাবপ্রবণতার মধ্যে বাঁধা পড়িয়াছে। কিন্তু অপর পক্ষে, বুদ্ধিবৃত্তি বা বিচারশক্তির যে কোনও প্রভাবই নাই এ কথা মনে করিলে চলিবে না। ফরাসী-বিপ্লবের মূল ধারাটি হয় ত একটা সার্ব্বজনীন উত্তেজনা বা ভাবপ্রবণতার মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার পর যে গঠন-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অনেকখানি সৃষ্টিকুশল (creative) সমালোচনা ও বিচারশক্তি ছিল। এমন কি, এ [illegible]ভেজনা বা ভাবপ্রবণতা, যাহা ফরাসী-রাজবিপ্লবের ভিত্তি বলিয়া গণ্য করা হয়, সেই উত্তেজনা বা ভাবপ্রবণতাও একদিনে প্রকাশ পায় নাই; বহুদিন ধরিয়া তাহা সঞ্চিত হইতেছিল, এবং সেই সঞ্চয়ের মূলে ছিল ব্যক্তিবিশেষের (individual) চিন্তার ধারা। মানুষ যে চিন্তা করিতে পারে, কার্য্য-কারণের সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করিয়া ভবিষ্যৎ বিচার করিতে পারে, অন্ধ সংস্কারকে সমালোচনার দ্বারা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে, ইহাই হইল মানুষের প্রতি বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান। এই সমালোচনার শক্তি না থাকিলে জগতে কোনও রূপ উন্নতিই হইতে পারিত না; প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে একটা অতি মন্থর পরিবর্ত্তন হইত বটে, কিন্তু কোনও উন্নতি হইত না। উন্নতি (Progress) বলিতেই আমরা এক বা একাধিক আদর্শ বুঝি—এবং এই আদর্শ-সৃষ্টির মূলে আছে, আত্ম-

(৩) কিন্তু Gabriel Tarde বলেন, অনুকরণই সামাজিক ব্যবহারের মূল ভিত্তি। Prof. Giddings এই মত খণ্ডন করিয়া বলেন, সমাজ-প্রতিষ্ঠানের মুখ্য কারণ, 'স্বজাত্য-জ্ঞান' (consciousness of kind), এবং এই স্বজাত্য-জ্ঞানকে শুধু অনুকরণের ফল বলা যায় না।

সমালোচনা ও সামাজিক সমালোচনা। এখন, এই যে পারস্পরিক আলোচনা ও সমালোচনার ফলে একটা সামাজিক আদর্শের সৃষ্টি হয়, দেখা যাক তাহার উপাদান কি। সমাজতত্ত্ববিৎ ইহার তিনটি উপাদান নির্ণয় করিয়াছেন,—প্রথম, সামাজিক আত্মজ্ঞান বা Social self-consciousness; দ্বিতীয়, সামাজিক স্মৃতিভাণ্ডার (Social Memory) বা সংস্কার (Tradition); তৃতীয়, মানুষের কার্য্যকলাপের সামাজিক মূল্য বা Social values।

১। সামাজিক আত্মজ্ঞান বা Social Self-consciousness। ইহার মূল অর্থ এই যে, সমাজটাকে 'আত্মীয়' অর্থাৎ একান্ত আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। মনে করিলে চলিবে না যে, সমাজটা একটা বাহিরের লোক, একটা ভূতাবিশেষ, যাহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমাকে আমার চিত্তের সমস্ত দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। সামাজিক আত্মজ্ঞানের বিশেষত্ব এই:—যখন আমি নিজের অনুভূতি ও বিচার সমালোচনা করিতেছি, ঠিক সেই সময় আমার প্রতিবেশী বা আমার সম্বন্ধ বন্ধুগণ যাহা ভাবিতেছে ও বিচার করিতেছে, তাহাও আমার চিন্তার অন্তর্গত করিয়া, এই উভয় চিন্তার ধারাই যে এক—ইহার উপাদান লক্ষ্যস্থল ও আদর্শ যে এক—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি; এবং যখন এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্য্য করিব, তখন আমার এই জ্ঞান থাকিবে যে তাঁহারাও এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন এবং এই প্রণালীতে কার্য্য করিতেছেন। বুঝিতে হইবে যে, আমার চিন্তার ধারা অপরের চিন্তার ধারার নিরপেক্ষ নহে, কারণ, সেরূপ ভাবিলে কোনওরূপ সামাজিক আত্মজ্ঞানের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব; এবং তাহা হইলে সমাজের মূল ভিত্তিকে অস্বীকার করা হয়। পরস্পরের বুদ্ধিবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতে সামাজিক আত্মজ্ঞানের উৎপত্তি হয়; কিন্তু এই ঘাত-প্রতিঘাত হয় মানুষের অন্তর্জগতে। আমার প্রতিবেশী বা সম্বন্ধ বন্ধু যাহা ভাবিতেছে এবং আমি যাহা ভাবিতেছি, তাহার ঘাত-প্রতিঘাত যেমন আমার অন্তরে হইতেছে, তেমনি আমার প্রতিবেশীর অন্তরেও হইতেছে, এবং আমরা উভয়েই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া একই ভাবে কার্য্য করিতেছি। বস্তুতঃ, চিত্তের আদান-প্রদান ও পরস্পরের বুদ্ধিবৃত্তির সমন্বয় বা Synthesis এই সামাজিক-আত্মজ্ঞানরূপ অপূর্ব্ব সৃষ্টির উপাদান। এই আদান-প্রদান ও সমন্বয়ের ফলেই সঙ্ঘ-মন একটা রূপহীন অবাস্তব শক্তির ছায়া হইতে একটা বাস্তব সৃষ্টিকুশল অভিব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়। জনমত বা লোকমতও এই সামাজিক আত্মজ্ঞানেরই একটা বিরাট সৃষ্টি। ইহার ধ্বংসের লীলা যেমন প্রচণ্ড, ইহার সৃষ্টির কৌশলও তেমনিই বিচিত্র! রুশিয়ার একছত্র রাজচক্রবর্ত্তী নিমেষে ধূলায় বিলীন হইয়া গেল, পৃথিবীতে অভূতপূর্ব্ব একটা বিরাট প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব হইল, সঙ্ঘ-জীবনের বিচিত্র প্রতিষ্ঠা দেখা গেল। রাজনীতিবিশারদ বা ঐতিহাসিক তাহার যে কোনও কারণই নির্দ্ধারিত করুন না কেন, আমরা বলিব, রুশিয়ার মনোজগতে সামাজিক আত্মজ্ঞানের যে আগ্নেয়গিরি অল্পে অল্পে শক্তি আহরণ করিতেছিল, পৃথিবীব্যাপী একটা মহা-আহবকে সহায় করিয়া সেই শক্তির প্রকাশ ঘটিল; রুশিয়ার বর্ত্তমান সামাজিক প্রতিষ্ঠা তাহারই ফল।

২। দ্বিতীয় উপাদান, সামাজিক স্মৃতি বা সংস্কার। যখন মানুষ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তখনও মানুষের মন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারে না; কেন না, তাহার মত সর্ব্বদাই সমাজের অতীত সুখ দুঃখ ভাব অনুভূতি বিশ্বাস ও আদর্শ-ভার-বিড়ম্বিত। এই সকল ভাব অনুভূতি বিশ্বাস বা আদর্শ, সামাজিক সংস্কারের সৃষ্টি করে। সংস্কাররূপেই মানুষ এই সমস্ত সামাজিক ভাব অনুভূতিগুলিকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ইহাই হইল সামাজিক স্মৃতি, ইহাই সমাজ-মনের ঐক্য সাধন করে। মানুষের মনের বিকাশ যতই অগ্রসর হয়, তাহার মনের একতা ততই পরিস্ফুট হয়। শৈশবাবস্থায় মানুষ তাহার এই মানসিক ঐক্যসম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে; কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত সে জানিতে পারে, অজ্ঞ হইলেও আজিকার এই মানুষটি কালিকার মানুষটির সহিত জন্ম হইতেই একটা বিশিষ্ট ঐক্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে এবং তাহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত এই ঐক্যের ক্রমবিকাশ হইবে। সমাজ-মনেরও যে একটা ঐক্য আছে এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে, এই ঐক্যসম্বন্ধে সমাজ-অন্তর্গত মানুষকে সর্ব্বদা সচেতন থাকিতে হইবে।

তাহার কারণ, সমাজ-মনের যে ঐক্য আছে এই অনুভূতিই এই ঐক্যকে সুদৃঢ় করে। অপর পক্ষে, এই অনুভূতির অভাব সমাজ-বন্ধনকে আপনা হইতেই শিথিল করিয়া দেয়। সামাজিক সংস্কারগুলি এই ঐক্যের ভিত্তি। এই সংস্কারগুলি আর কিছুই নহে, অতীত যুগের মানুষের সামাজিক অভিজ্ঞতা; সুতরাং অতীত যুগের সহিত বর্ত্তমান যুগের ঐক্য রক্ষা করিবার একমাত্র সেতু। বর্ত্তমান যুগের সহিত এই সংস্কারগুলির সামঞ্জস্য আছে কি না এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। দ্রষ্টব্য এই যে, সামাজিক আচার-ব্যবহারের সমালোচনা করিতে বসিলেই, মুখ্যতঃ হউক, গৌণতঃ হউক, আমরা এই সংস্কারগুলির দ্বারা পরিচালিত হইব। কেহ হয় ত এই সংস্কারের নিকট মাথা নত করিয়া তাহার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লইবে, কেহ হয় ত সমাজের বর্ত্তমান-জীবনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য সংস্কারের পরিবর্ত্তনের প্রয়াসী হইবে। কিন্তু সংস্কার যে আছে এবং তাহার শক্তি যে প্রভূত, কারণ সঙ্ঘ তাহাকে গ্রহণ করিয়াছে,—এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। অস্বীকার করিলে হয় বলিব বাতুল, না হয় utopian বলিব।

সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ সামাজিক সংস্কারগুলিকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা :—

(১) যে সকল সংস্কার মানুষের দৈনন্দিন বাস্তব জীবনকে আশ্রয় করিয়া গঠিত হইয়াছে।

(২) যে সকল সংস্কার কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া গঠিত হইয়াছে, ও

(৩) যে সকল সংস্কার তর্ক ও চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই তিন শ্রেণীর সংস্কারকে আমরা যথাক্রমে, প্রাথমিক সংস্কার (Primary traditions), গৌণ সংস্কার (Secondary traditions) ও শাখা সংস্কার (tertiary traditions) বলিব। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও সংস্কারগুলি পরস্পরের নিরপেক্ষ নহে। শাখা সংস্কারের সহিত গৌণ সংস্কারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং কতকগুলি শাখা সংস্কারকে প্রাথমিক সংস্কার হইতে কোনও বিশেষ রীতি মত পৃথক করা যায় না। মানুষের অন্তঃকরণ মাত্র একটি, কিন্তু ভাবের ধারা অসংখ্য। এই একটি মাত্র আধারেই যখন সমস্ত সংস্কারের ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে, সমস্ত সংস্কারের জন্মক্ষেত্র যখন মূলতঃ একটি, তখন এই সংস্কারগুলিকে সুস্পষ্টরূপে ভাগ করিতে যাওয়া সমীচীন হইবে না।

বাস্তবিক জীবনে মানুষের যাহা কিছু অভিজ্ঞতা তাহাতেই প্রাথমিক সংস্কারের সৃষ্টি। মানুষের সাধারণ ও দৈনন্দিন জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রণালী সম্পর্কে যাহা কিছু সংস্কার (economic traditions) তাহা এই শ্রেণীর। জৈব-জীবনের প্রয়োজনীয়তায় ইহার উৎপত্তি,—শুধু প্রয়োজনীয়তা নহে, মানুষ তাহা কিরূপ উপলব্ধি করিয়াছে তাহাও একটা কারণ। জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন, কিন্তু মানুষ খাদ্যেরও বিচার করিয়াছে; তাই ভিন্ন ভিন্ন জাতির খাদ্যও বিভিন্ন। হিন্দুদিগের খাদ্য-সংস্কার একরূপ, মুসলমানদিগের একরূপ, ইংরাজদিগের আর একরূপ। সেইরূপ, গৃহনির্ম্মাণ, স্ত্রীপুরুষের যৌন-সম্বন্ধ, সন্তান পালন ইত্যাদি বিষয়ও বিভিন্ন জাতি বিভিন্নরূপে সমাধান করিয়াছে ও বিভিন্ন সংস্কারের উদ্ভব হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সমাজে মানুষের পারস্পরিক ব্যবহার সম্বন্ধেও সঙ্ঘ-মন অধিকার ও কর্ত্তব্যের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছে। ইহাতেই প্রাথমিক ব্যবহার-বিধি বা Common Law-এর উদ্ভব। এইগুলিকে ব্যবহারিক সংস্কার (jural traditions) বলা যাইতে পারে। অতঃপর, মানুষের বাস্তব জীবনের ধারা ও ব্যবহারিক সংস্কারকে ভিত্তি করিয়া গঠিত হইল মানুষের রাজনৈতিক সংস্কার (Political tradition)। শাসক ও শাসিতের উদ্ভব সমাজ-গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই হইয়াছিল, কিন্তু রাজশক্তির প্রকৃতি কি, এবং প্রজার সহিত রাজার সম্বন্ধ নির্ণয় ও দণ্ডনীতির উদ্ভব—এই সকল সম্পর্কীয় ধারণা প্রাথমিক বলিয়া গণ্য হইলেও অত্যন্ত ধীরে ধীরে সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল; এমন কি, এখনও ইহার সমাধান হইয়াছে বলা যায় না; কারণ, বর্ত্তমান যুগেও রাজা ও প্রজার পারস্পরিক সম্বন্ধ লইয়া ধারণার ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে।

কাল্পনিক জগতে মানুষের যাহা কিছু অভিজ্ঞতা, তাহাই হইল মানুষের গৌণ সংস্কার। মানুষ যে পশু হইতে বিভিন্ন, কল্পনা করিবার ক্ষমতা তাহার অন্যতম কারণ। মানুষের আলোচনাশক্তির উপাদান শুধু যে তাহার বাস্তব জীবনের

অভিজ্ঞতাতেই পাওয়া যায় তাহা নহে, অদৃশ্যমান কাল্পনিক জগতের যত কিছু সংস্কার, মিথ্যা হউক, সত্য হউক, মানুষের বিশ্বাসকে হয় ত তাহা আরও দৃঢ়ভাবে শাসিত করে। যখনই মানুষ কল্পনা করিতে শিখিল, তখন হইতেই এই বাস্তব জগৎ হইতে ভিন্ন একটা জগতের সৃষ্টি হইল। মানব সভ্যতার আদিম যুগে প্রকৃতির লীলা মানুষের মনে বিপ্লব বাধাইয়াছিল। দেহ প্রকাণ্ড হইলেও তখনকার মানুষের মস্তিষ্ক ছিল শিশুর মতই; তাই সে ভাবিল, এই যে পঞ্চভূত, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—ইহারাও এক একটা মানুষ, প্রভেদ শুধু এই যে ইহাদের ক্ষমতা অসাধারণ। তাহাদের প্রাণের পরিচয় তাহাদের গতিশীলতা। প্রকৃতির তাণ্ডব লীলা,—ভূমিকম্প, ঝঞ্ঝা, বন্যা, অগ্নি ইত্যাদি—এই সমস্ত প্রাণীরই ক্রোধের প্রকাশমাত্র; এবং এই ক্রোধ উপশম করিবার নিমিত্ত,—অর্থাৎ, প্রাকৃতিক শক্তির নিকট মানুষের অসহায়তার নিদর্শন স্বরূপ—মানুষের পূজার সৃষ্টি হইয়াছিল। এইরূপেই দেবতার সৃষ্টি হইল,—অবশ্য, মানুষ তাহার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা হেতু এই দেবতাগুলিকে এক একটি অতিমানুষ বলিয়াই ধরিয়া লইল। তখনও বিজ্ঞানের জন্ম হয় নাই, মানুষের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার মধ্যে তাহার প্রথম চাঞ্চল্য অনুভব করা গিয়াছে মাত্র। তাই সেই দেবতা-সৃষ্টির যুগে যাহা কিছু অস্বাভাবিক, তাহাকেই একটা ব্যক্তিগত দেবতার পদে উন্নীত করা হইল। এমন কি, একটা অদ্ভুত আকারের প্রস্তরখণ্ডকে কেবল তাহার আকার অদ্ভুত বলিয়াই, হয় কোনও ব্যক্তিগত দেবতার আবাসরূপে, কিম্বা হয় ত ব্যক্তিগত দেবতারূপেই গণ্য করা হইত। প্রাচীন যুগের সভ্যতার যাহা কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা হইতে দেখা যায়, সেই প্রাগৈতিহাসিক কালে, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনও এই সমস্ত দেবতা সম্বন্ধীয় সংস্কারের দ্বারা কিরূপ গভীরভাবে শাসিত হইত। সমাজতত্ত্বের ভাষায় এই-গুলিকে আমরা দৈব-সংস্কার বলিব (Animistic tradition); প্রকৃতিপূজা ইহার মূল কথা। এই দৈব-সংস্কার হইতেই পরে মানুষের আত্মজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। (৪)

মানুষ যে স্বপ্ন দেখে—দেহ নিশ্চল, অথচ স্বপ্নে সে কত কার্য্য করিতেছে, কত দেশ ঘুরিতেছে, কত অনুপস্থিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইতেছে;—মানুষ যে মরে,—তাহার দেহ পড়িয়া রহিল অথচ 'মানুষ'টা নাই এবং তাহার কোনও শক্তিই নাই;—মানুষ যে অসুস্থ হয়, চিত্ত বিকার হয়, প্রলাপ বলিতে থাকে, পাগল হইয়া যায়, এই সমস্ত ঘটনা, আদিম মানুষের কল্পনাতেও মানুষের একটা অশরীরী আত্মা আছে, এই সন্দেহ উদ্রেক করিয়াছিল; এবং এই সন্দেহের মধ্যেই বর্ত্তমান যুগের আত্মতত্ত্বের প্রথম ধারাটি পাওয়া যায়,—মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ হইল।

দেবতা সৃষ্টি করিয়াই বা আত্মজ্ঞানের উদ্রেক করিয়াই কল্পনা ক্ষান্ত হয় নাই। কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া মানুষের কলাবিদ্যা প্রকাশ পাইল, শিল্পকলা সম্বন্ধীয় সংস্কারের (esthetic tradition) সৃষ্টি হইল। সঙ্গীতে, চিত্রে, নৃত্যে, ভাস্কর্য্যে মানুষ আপনাকে প্রকাশ করিল। এইরূপেই মানুষের শিল্পকলার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইল,—সমাজ তাহা গ্রহণ করিয়া মানুষের জীবনকে ধন্য করিল।

ধর্ম্মের (religion) উদ্ভবও কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া হইল। একজন সর্ব্বশক্তিমান্ ঐশী শক্তিতে বিশ্বাস এই ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংস্কারের (religious tradtion) মূল ভিত্তি। এ বিশ্বাস তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; কল্পনা বলিতে আমরা যাহা বুঝি ঠিক তাহাও হয় ত ইহার ভিত্তি নহে। এ বিশ্বাস ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিলেই আমরা এই সর্ব্বব্যাপী শক্তিমহিমাকে ঠিক অনুভব করিতে পারিব। এই শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণসাপেক্ষ নহে, কেবলমাত্র অনুভূতির উপরই ইহা প্রতিষ্ঠিত।

চিন্তাজগতে বা জ্ঞান (conceptual thought) জগতে মানুষের যাহা কিছু অভিজ্ঞতা তাহাকেই আমরা শাস্ত্র সংস্কার বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। ইহা কল্পনারও ক্ষেত্র নহে, অনুভূতিরও ক্ষেত্র নয়, ইহা গভীর চিন্তার ফল। ব্যক্তিগত (personal) ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা, তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও লীলার স্বরূপ নির্ণয়,—ইহাতেই হইল প্রাথমিক

(৩) অর্থাৎ knowledge of the conscious self। Self-consciousness বলিতে আমরা যাহা বুঝি, 'অহং-জ্ঞান'ই বোধ হয় তাহার উপযুক্ত সংজ্ঞা হইবে। এই 'আত্মজ্ঞান'ই প্রাথমিক দৈবসংস্কারের 'মূল' তথা কি প্রকৃতি-পূজাই ইহার মূল তথ্য, সে বিষয়ে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের (anthropologists) মধ্যে মতভেদ আছে। এখানে আত্মজ্ঞান—the theory of the soul or 'spiritual substance'।

ভাগবত সংস্কারের (theological tradition) সৃষ্টি। সাধারণের ধর্ম্মবিশ্বাস, পূজাপদ্ধতি ইত্যাদি ইহার মূল উপাদান। আমাদের বৈষ্ণবধর্ম্ম এইরূপই এক অতুলনীয় ভাগবত সংস্কারের সৃষ্টি করিয়াছে। এমন কি, একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টানসমাজের ধর্ম্মমতও "ঈশ্বর-পুত্র" যীশুখ্রীষ্টকে অবলম্বন করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। অবশ্য, ইহার মধ্যে কতখানি তর্ক বা চিন্তাসাপেক্ষ এবং কতখানি ভক্তিসাপেক্ষ, বলা কঠিন; কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই বিভিন্ন প্রকারের সংস্কারগুলি পরস্পরের নিরপেক্ষ নহে।* সুতরাং, ইহার মধ্যে যতটুকু ভক্তিসাপেক্ষ অর্থাৎ মাত্র অনুভূতির উপরই নির্ভর করে—মানুষ যাহা শুধু প্রাণ দিয়া অনুভব করিতে পারে মন দিয়া বিচার করিতে পারে না,—আমাদের সংজ্ঞানুসারে সেইটুকুই শুধু ধর্ম্মসংস্কার (religious tradition), পূর্ব্বোক্ত গৌণসংস্কারের অন্তর্গত। কিন্তু যেটুকু আমি মন দিয়া বিচার করিতে পারিলাম এবং সেই বিচারশক্তির ফলে যে ধারণা হইল, তাহা শাস্ত্র সংস্কারের অন্তর্গত। এক কথায় বলিতে গেলে, প্রাথমিক ভাগবত সংস্কার অনুসারে, ধর্ম্ম—অনুষ্ঠান, ঈশ্বর,—'ব্যক্তি', ইহাকে 'প্রাথমিক ভাগবত সংস্কার' আখ্যা দেওয়া হইল, তাহার কারণ, প্রথমে অনুষ্ঠানের দ্বারাই মানুষ ঈশ্বরকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এবং ভগবানকে ব্যক্তিরূপে উপলব্ধি করিয়াছিল। এই চিন্তাশক্তির ফলে মানুষের চিত্তে আর একরূপ সংস্কারের উদ্ভব হইল। পরিভাষা অভাবে ইহাকে আমরা গৌণ ভাগবত সংস্কার বা তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কীয় সংস্কার (metaphysical tradition) বলিতে পারি। (৫) "ততঃ কিম্" হইল ইহার মূল সূত্র। কার্য্য কারণের বিচার স্থির করিতে করিতে পরিশেষে মানুষ পৌঁছিল এক অজ্ঞাত শক্তিরহস্যে, এবং সেইখানেই সে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বিশ্ব বিধাতাকে পাইল। স্পেন্সার প্রমুখ কয়েকজন মনীষী, অণুর কারণ পরমাণু পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন, কিন্তু স্বীকার করিলেন না 'সোঽহং' বিশ্ব-বিধাতাকে; উপরন্তু বলিলেন, যে শক্তিরহস্যের জন্য পরমাণু সৃষ্ট হইয়াছে বা যে সমস্ত কার্য্যের কারণ অনির্ণীত রহিয়া গিয়াছে, সেই শক্তিরহস্য শুধু অজ্ঞাত নহে, অজ্ঞেয়। এইরূপ চিন্তার ধারার উপর ডারুইনের প্রভাব যে কতখানি তাহা বলা বাহুল্য। বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সংস্কার (scientific tradition), জ্ঞানজগতে মানুষের শেষ অভিজ্ঞতা। এই সংস্কার কল্পনা-প্রসূত নয়, বাস্তব জগতের ঘটনাবলীর সম্পর্কে মানুষের যাহা সাক্ষাৎ জ্ঞান, তাহাতেই বিজ্ঞানের সৃষ্টি। কালের পরিবর্ত্তনের সহিত জ্ঞানেরও পরিবর্ত্তন বা উন্নতি হইতেছে, বহু যুগের বৈজ্ঞানিক মতও ভ্রান্ত বা মেকী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে নূতন জ্ঞানের কষ্টি-পাথরে। যেখানে বিজ্ঞান কার্য্য-কারণের কোনও সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারিতেছে না, সেখানে সে নিজের অসামর্থ্যও স্বীকার করিতেছে না, একটা কাল্পনিক উত্তর দিয়াও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতেছে না, নিরুত্তর থাকিয়া অহরহঃ গবেষণার দ্বারা সত্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিয়াছে। এবং তাহার আবিষ্কৃত সত্য, মিথ্যা প্রমাণিত হইলেও, তাহাতে বিজ্ঞানের জয়ই হইতেছে, পরাজয় হইতেছে না।

সুতরাং সংস্কার সম্পর্কীয় আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম :—

প্রাথমিক সংস্কার,—দৈনন্দিন পার্থিব জীবনের সংস্কার :—

(১) আহার বিহার বিবাহ—অর্থাৎ, সাধারণ জীবন-যাত্রা প্রণালীর সংস্কার।

(২) ব্যবহারিক সংস্কার—আইনের সৃষ্টি।

(৩) রাজনৈতিক সংস্কার—শাসক-শাসিতের সম্বন্ধ নির্ণয় ও 'দণ্ডনীতি'র উদ্ভব।

গৌণ সংস্কার,—অপার্থিব বা কল্পনা-জগতের সংস্কার :—

(১) আদিম দৈব সংস্কার—প্রকৃতি-পূজা ও দেবতা-সৃষ্টি, আত্মজ্ঞানের উদ্ভব।

(২) শিল্পকলা-সম্পর্কীয় সংস্কার।

(৩) ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কার; ধর্ম্মের রূপ কেবলমাত্র অনুভূতি, বিধাতার রূপ,—ভক্তি।

শাস্ত্র সংস্কার—চিন্তা ও জ্ঞানজগতে মানুষের অভিজ্ঞতা :—

---

(৫) Metaphysical tradition has been derived from the theological. It refines the theological explanation of the universe by interposing "secondary causes," laws and principles between phenomena and their ultimate cause, the fiat of God."—Giddings : *Principles of Sociology*, *p* 144.

(১) প্রাথমিক ভাগবত সংস্কার ; ধর্ম—অনুষ্ঠান, বিধাতা—'রাজি'।

(২) গৌণ ভাগবত-সংস্কার ;—তত্ত্বজ্ঞানের উত্তর। ধর্ম—তর্ক ও চিন্তা, বিধাতা—শক্তি।

(৩) বৈজ্ঞানিক সংস্কার।

যেমন ধীরে ধীরে এই সকল সংস্কার গঠিত হইতেছে, তেমনিই ধীরে ধীরে এই সকল সংস্কারের পরিবর্তন হইতেছে। এই পরিবর্তনের ফলেই মানুষ সভ্যতার পথে, নীতির পথে, ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। মানুষের প্রচেষ্টার কোনও মূল্য যদি না থাকিত, যদি তাহার ইচ্ছাশক্তি না থাকিত, তাহা হইলে ত সভ্যতার উদ্ভব কেবলমাত্র অন্ধ প্রাকৃতিক ও যৌন নির্ব্বাচনেই রূপান্তরিত হইত। এইরূপ উদ্দেশ্যহীন প্রাকৃতিক বিবর্ত্তন অনেক সময়ে উন্নতির পরিপন্থী। সর্ব্বপ্রকার বন্ধনের সহিতই মানুষের অহরহঃ সংগ্রাম চলিতেছে ; তাহার মধ্যে সংস্কারের বন্ধন সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বন্ধন, কারণ সঙ্ঘের যুগ-যুগ সঞ্চিত শক্তি ইহার আধার। এই সংগ্রামের ফলেই প্রতি যুগের আদর্শ সৃষ্টি হইতেছে, এবং এই সংগ্রামের ফলে বিভিন্ন যুগের আদর্শও বিভিন্ন। বর্ত্তমান যুগেও সমাজের যাহা কিছু আদর্শ তাহাও এই সকল সংস্কারের 'সংস্করণে'র ফল। সাধারণ বাস্তব জীবনের সমুদায় সংস্কারের সহিত বর্ত্তমান যুগের ধারণার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া, বর্ত্তমান যুগের জীবন-যাত্রার আদর্শ (standard of living) স্থিরীকৃত হইয়াছে। ব্যবহারিক সংস্কারও এইরূপ সংস্কৃত হইয়া বর্ত্তমান ব্যবহার-বিধির (penal code) সৃষ্টি করিয়াছে, এবং রাজনৈতিক সংস্কারের পরিবর্ত্তন হইয়া বর্ত্তমান রাজনীতি (policy) তে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে দৈব সংস্কার, শিল্প-সংস্কার ও ধর্ম্ম সংস্কার, যথাক্রমে আদর্শবাদ, রুচি, ও ভক্তিবাদে পরিণত হইল। সেইরূপ প্রাথমিক ভাগবত সংস্কার হইতে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতের সৃষ্টি হইল এবং তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কীয় সংস্কার হইতে প্রত্যেক যুগের ধর্ম্মতত্ত্বের সৃষ্টি হইল। এইরূপে সংস্কার, পরিবর্ত্তিত, রূপান্তরিত ও সংস্কৃত হইয়া নূতন সংস্কারের সৃষ্টি করে, এবং এই নূতন সংস্কারও আবার কালে পুরাতন হইয়া যায়। বিশেষ, এই যে সকল ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারের কথা বলা হইল, কোনও যুগে যে ইহাদের সকলগুলির মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য হইতেই হইবে তাহা নহে, হয় ত যুগবিশেষে ইহাদের মধ্যে কোনওটি বা কোনওটি সমাজে প্রাধান্য লাভ করে। হয় ত এক যুগ ধর্ম্মের নামে পাগল হইল, এক যুগ হয় ত নৃত্যকলাশিল্প সম্পদে অতুলনীয় হইয়া উঠিল, আর এক যুগ হয় ত তত্ত্বকথায় বিভোর হইয়া রহিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন যুগের নিদর্শন পাওয়া যায়। তখন সঙ্ঘের বিচারশক্তি এইরূপ সংস্কার বিশেষের প্রাধান্য দ্বারাই পরিচালিত হয়।

সামাজিক সমালোচনার দুইটি প্রধান উপাদান আমরা লক্ষ্য করিয়াছি—প্রথম, সামাজিক আত্মজ্ঞান ; দ্বিতীয়, সামাজিক স্মৃতি বা সংস্কার। সংস্কারের প্রকার ভেদও আমরা করিলাম।

৩। সামাজিক সমালোচনার তৃতীয় উপাদান, মানুষের কার্য্যকলাপের সামাজিক মূল্য। যখনই মানুষের কোনও ব্যষ্টিগত ব্যবহার সঙ্ঘ গ্রহণ করিল, তখনই তাহার একটা সামাজিক মূল্য (Social value) নির্দ্ধারিত হইল। মানুষের আচার-ব্যবহার বিশ্বাস ইত্যাদির নির্দ্ধারিত সামাজিক মূল্য সামাজিক সমালোচনার একটি প্রধান অঙ্গ। যে সকল কার্য্যকলাপ বিশ্বাস অনুভূতির কোনও সামাজিক মূল্য নাই, সঙ্ঘ বা সমাজ যাহাকে সামাজিক জীবনের সহায়ক বলিয়া গ্রহণ করিল না, সে সকল কার্য্য-কলাপ বিশ্বাস অনুভূতি সমাজে বেশী দিন স্থান পায় না। সঙ্ঘ-মন যখন চিন্তা করিয়া কার্য্য করে, তখন তাহার সেই কার্য্যের মূল কারণটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, আচার-ব্যবহার-সংস্কার-সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠান (institutions) গুলির সামাজিক মূল্য বিচার ও নির্দ্ধারণ, তাহার একটি প্রধান অঙ্গ। এই সকল নির্দ্ধারিত সামাজিক মূল্যগুলিই সামাজিক সমালোচনার গতি নির্ণয় করে। স্থানাভাবে এখানে একটিমাত্র উদাহরণ দিলাম। খ্রীষ্টীয় ১৯১৯ অব্দে ভারতবর্ষে যে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইল তাহার বিরুদ্ধে আমাদের একটা প্রতিবাদ হইল এই যে, উক্ত শাসন-সংস্কার পাশ্চাত্য রাষ্ট্রীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং ভারতীয় রাষ্ট্রীয় প্রতিভার পরিপন্থী। আমরা কহিলাম, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রীয় আদর্শ,—রাষ্ট্রীয় শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা এবং এই কেন্দ্রীভূত রাজশক্তিকে, একজন ব্যক্তিবিশেষেই হউক বা একটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সম্মিলনীতেই হউক, একটা বিশিষ্ট আধারে ন্যস্ত করা। স্থানীয় প্রাদেশিক

রাষ্ট্রগুলি সর্ব্বভাবেই এই বিশিষ্ট রাজশক্তির অধীন, এবং যেটুকু স্বাধীনতা তাহারা পাইয়াছে, তাহাও এই রাজশক্তির অনুমোদন-সাপেক্ষ। ভারতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ ছিল অন্যরূপ। এখানে স্থানীয় রাষ্ট্রগুলিই স্বাধীন ছিল এবং কেন্দ্রগত রাজশক্তি তাহাদের শক্তিকে যেখানে যতটুকু খর্ব্ব করিয়াছিল তাহা তাহাদের স্ব-ইচ্ছায়। ভারতবর্ষে বহুপূর্ব্ব হইতেই সঙ্ঘ-জীবনের বিকাশ হইয়াছিল; সেইজন্য স্থানীয় রাষ্ট্রগুলির এই সঙ্ঘ-জীবনের যোগ্য প্রতিনিধি হওয়ায়, কোনও বিশিষ্ট ও কেন্দ্রীভূত রাজশক্তি উদ্ভূত হইয়া ইহাদের স্বাধীনতা অস্বীকার করিতে পারে নাই। বরঞ্চ, এই সঙ্ঘ বা গোষ্ঠীগুলির সহায়তাতেই রাজা তাঁহার রাজশক্তির আধার পাইয়াছিলেন। এইরূপে, গোষ্ঠীকে আশ্রয় করিয়া আমাদের সামাজিক জীবন গঠিত হইয়াছিল—এখনও ভারতের গ্রামে গ্রামে এই মুমূর্ষু গোষ্ঠী-জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই কারণে আমরা ব্রিটিশ-প্রবর্ত্তিত শাসন-সংস্কারের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছি, ইহা ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতিভার পরিপন্থী। ভারতের গোষ্ঠী-জীবনকে আমরা যাহা সামাজিক মূল্য দিয়াছি, তাহাই আমাদের সমালোচনার গতি নির্ণয় করিল।

এই সামাজিক মূল্যের মূল নিদর্শন, সঙ্ঘের বা সমাজের আচার-ব্যবহার ও অনুষ্ঠান। ইহাদের প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহা সামাজিক জীবনের সহায়ক ও হিতকর। এইরূপ, স্বাজাত্য-জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন, সামাজিক বন্ধন (Solidarity),—এবং সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতারূপ কয়েকটি নৈতিক ধারণা—এগুলির সামাজিক মূল্য খুব বেশী—কারণ ইহারা মানুষের সামাজিকতাকে সর্ব্বাঙ্গীন করিয়া তুলে।

প্রবন্ধের উপসংহারে আমরা একটা কথা বলিব। মানুষ সামাজিক জীব, সেই সমাজ কিরূপে চিন্তা করে ও কার্য্য করে, এই চিন্তা ও কার্য্যের উপকরণ কি, সমাজের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছি,—কিন্তু সামাজিকতার উপর অযথা আস্থা স্থাপন করিলে চলিবে না। উন্নতির মূল তত্ত্ব মনুষ্যত্বের বিকাশ। সমাজ যখন সত্যময়, প্রাণময়, তখন সমাজকে আশ্রয় করিয়া মানুষ মনুষ্যত্বরূপ সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারে, তখনই প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। মানুষের সহিত সমাজের যখন বিরহ হয়, তখনই সমাজ অত্যাচারী, তখনই সমাজ-দানব আপনার যূপকাষ্ঠে মনুষ্যত্ব-বলি দাবী করে; তখন সমাজ সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পরিপন্থী। মানুষ হয় ত ক্ষণকালের জন্য এই সামাজিক অত্যাচারের ভার সহ্য করিতে বাধ্য হয়; কিন্তু ক্রমশঃ চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়, এবং সেই বিক্ষোভ হইতে সঙ্ঘ-মন আবার জাগরিত হয়, সমাজের পুনর্গঠন হয়। ততদিন পর্য্যন্ত, সমাজ অর্থে অনুশাসনের দানব,—যাহার সত্তা লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু নিষ্ঠাটুকু আপিয়া আছে। মনে রাখিতে হইবে, মনুষ্যত্বের দাবী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ দাবী,—সমাজ এই মনুষ্যত্ব-বিকাশেরই প্রধান ও একমাত্র আশ্রয়। সমাজ সঙ্ঘ-মনের ভিত্তির দিয়া কার্য্য করে, সুতরাং মনুষ্যত্বকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে সঙ্ঘ মনের পরিপূর্ণতা-সাধন আবশ্যক। "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্"—আমি আছি, অনন্ত জানি, আমি প্রকাশ করি—ইহাই মনুষ্যত্বের মূলমন্ত্র।

বন্যা

শ্রীসীতা দেবী বি-এ

(১)

ক্ষুদ্র জামগ্রাম, পরাক্রমশালী বিষম নদের ধারেই। নদের মেজাজটা বড়ই উগ্র বলিয়া এ অঞ্চলের লোক তাহার নামেই নমস্কার করে। বন্যাস্রোতে আশেপাশের গ্রাম প্রতি বৎসরই ভাসিয়া যায়, অসহায় নরনারীর আর্ত্তনাদে আকাশ ভরিয়া ওঠে।

সন্ধ্যাবেলা, জানরালের পথ ধরিয়া একটি পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত পাল্কী নদীর ঘাটের দিকে চলিয়াছে, তাহার পিছনে একখানি খোলা ফিটন, ও গোটা দুই ঘোড়ার পাল্কী গাড়ী। গ্রামের লোক বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। একজন বৃদ্ধা অগ্রসর হইয়া পাল্কী-বাহকদের জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাগা, পাল্কী কার জন্যে? এত গাড়ীঘোড়ার ঘটাই বা কেন? বর আনতে যাচ্ছ নাকি? কাদের বাড়ীর?"

বেহারাদের সর্দ্দার ভারিক্কিচালে বলিল, "আমি আগে, তার পর দেখ্‌তেই পাবে।"

গ্রামের ভদ্র গৃহস্থদিগের বাস একটু ভিতরের দিকে। নদীর ধারে নিম্ন শ্রেণীর লোকরা, বিশেষ করিয়া জেলে, মাঝি প্রভৃতিরাই বাস করে। নৌকার সাহায্য ভিন্ন গ্রামে প্রবেশ করা বা গ্রাম ত্যাগ করা কঠিন, সেজন্যই ঘাটে খেয়া নৌকা সারীক্ষণই বাঁধা আছে। নিতান্তই সাদাসিদা সাধারণ নৌকা এগুলি। তবে সমারোহ করিতে হইলে নিকটবর্ত্তী সমৃদ্ধ গ্রাম হইতে আট দাঁড়ের নৌকা, বড় বজরা প্রভৃতি চাহিয়া বা ভাড়া করিয়া আনা হয়।

পাল্কী ও গাড়ীর পিছনে ক্রমেই লোকের ভীড় জমিয়া উঠিতেছিল। সঙ্গের লোকজনরা কেহ অবশ্য তাহাদের বাধা দিতেছিল না, কিন্তু কাহারও প্রশ্নের কোনো উত্তরও দিতেছিল না। নদীর ঘাটের কাছে আসিয়া সকলে থামিল। তখন একখানা পাল্কী গাড়ীর দরজা খুলিয়া ভিতর হইতে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গের লোকজনদের বলিলেন, "ঐ ত ওদের নৌকোর আলো দেখা যাচ্ছে, তোরা গাড়ীর ভিতর থেকে মশালগুলো বার করে জ্বালিয়ে নে।"

মশাল জ্বলিয়া উঠিয়া, সন্ধ্যার অন্ধকারকে আরো প্রকট করিয়া তুলিল। মাঝি এবং জেলেদের ঘর হইতে দলে দলে স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা বাহির হইয়া, অপেক্ষাকারীদের ঘিরিয়া ফেলিল। নানা কণ্ঠে নানা দিক হইতে প্রশ্ন হইতে লাগিল "কাদের বর গো, কাদের বর? ওমা, গাঁয়ের লোক আমরা, আমরাই জানলাম না?"

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন, "এই যে বর এসে পড়ল। ওহে বাজনদাররা, বেরিয়ে এস বাপু। খুব কষে লাগাও এবার।"

সঙ্গে সঙ্গে অন্য পাল্কী গাড়ীখানির দরজা খুলিয়া গেল। চার পাঁচজন মানুষ বাহির হইয়া মহোৎসাহে বাজাইতে সুরু করিল। ঘোড়াগুলা ক্ষেপিয়া তীব্র হ্রেষাধ্বনি করিয়া উঠিল; তাহাদের অনেক কষ্টে শান্ত করা হইল।

একটি বজরা ক্রমেই ঘাটের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। উহা আরোহীতে পূর্ণ এবং আলোকমালায় সুশোভিত। বজরা যতই কাছে আসিতে লাগিল, বাজনদারদের উৎসাহ ততই বাড়িয়া চলিল, মশালধারীরাও মহোৎসাহে নানা রকম চীৎকার করিয়া আসর গরম করিয়া তুলিল।

নৌকা আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক, আগন্তুকদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া গেলেন। গোটা দশ বারো লোক একে একে নামিয়া পড়িল। দলের পাণ্ডা একটি টাকপড়া, স্থূলদেহ ভদ্রলোক; তাঁহার পিছনে একটি ষোলো সতেরো বৎসরের বালক বা যুবক, তাহার পর নানা বয়সের এবং আকৃতির জন দশ মানুষ। বালক যে বর, তাহা তাহার পোষাক দেখিলেই বোঝা যায়। তাহার পরণে গোলাপী রংএর রেশমের পাঞ্জাবী, মিহি ঢাকাই ধুতি, মাথায় টোপর, গলায় ফুলের মালা, কপালে চন্দন। তাহার মুখ সলাজ-হাস্যে বিকশিত।

অভ্যর্থনাকারী ভদ্রলোক অগ্রসর হইয়া মহা বিনয় সহকারে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আসুন, যাদববাবু, স্বাগত। বেশী যে দাঁড় করিয়ে রাখেননি তার জন্যে ধন্যবাদ। এইদিকে বাবাজী, এই পাল্কীতে ওঠ।"

যাদববাবু বরের কাকা, এখন বরকর্ত্তা। খুব ভারিকি চালে বলিলেন, "না, তা দেরি আর কি কারণে হবে? ঘটা করতে গেলেই না দেরি হয়? এতে আর কি? নিতান্ত না হলে নয়, এমন জনকয়েক লোক নিয়ে বেরিয়ে আসা গেল।"

কন্যাকর্ত্তা সাজিয়া যিনি আসিয়াছিলেন, তিনিও কনের পিতা নয়, মামা। তিনি আরো মোলায়েম করিয়া হাসিয়া বৈবাহিকের মন গলাইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ এই ত্রুটিটুকু থেকে গেল বটে। তা এরপর যত খুসি সমারোহ করা যাবে, আগে বিয়েটা ভালোয় ভালোয় উৎরে যাক্। উঠুন মশাই গাড়ীতে, এই যে এই গাড়ীতে আপনারা। ওরে, তোরা সব হাঁ করে দেখছিস্ কি? মশাল ভাল করে বাগিয়ে ধর্, চল্ এগিয়ে চল্। ওহে বাজাও না ভাল করে, হাতে কি জোর নেই? ক'পো চালের ভাত খাও? ওহে গাড়ী হাঁকাও না, আর দেরি কিসের?"

হাঁকডাকে সবাই অগ্রসর হইল। আসিবার বেলা লোক ছিল অল্পই, বরযাত্রী লইয়া যাইবার বেলা লোকের অভাব হইল না, গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা একেবারে শোভা যাত্রার পিছনে ভাঙিয়া পড়িল। পাড়াগাঁয়ের লোক, অত রাখিয়া-ঢাকিয়া কথা বলিতে জানেনা। কন্যাপক্ষ সম্বন্ধে কত মন্তব্যই যে হইতে লাগিল, তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই।

একজন বৃদ্ধা বলিল "ওমা, ওমা, কোথায় যাব, আমাদের সুবির বে, তা জানলাম না গা? মাগী কি অর্থ-পিশেচ, ঐ ত এক মেয়ে, কার জন্যে টাকা রাখছে?"

মধু-মাখি হুঁকো হাতে করিয়াই বরযাত্রীর সঙ্গ লইয়াছিল; সে বলিল "তুমিও যেমন কেষ্টো পিসী, ও-সব বাবুভেইয়ার কথাই আলাদা। তারা কি গরীব মানুষকে পোঁছে?"

তাহার ছোটভাই সাধুচরণ বলিল "আমরাই না হয় ছোটলোক, ভদ্দরদেরও ত কাউকে বলেনি, সব কেমন হাঁ করে তাকাচ্ছে দেখছনা?"

সত্যিই গ্রামের লোক বিস্ময়াকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল। পুরুষরা বাহির হইয়া আসিতেছিল, মেয়েরা ঘরে দাঁড়াইয়া মুখ ছুটাইতেছিল।

এদিকে প্রফুল্লচন্দ্র মিত্রের বাড়ী ততক্ষণে রসুন চৌকী বসিয়া গিয়াছে! প্রফুল্লচন্দ্রের স্ত্রী নারায়ণী অনেক দিন হইতেই অসুস্থ; তবু আজ মেয়ের বিয়ে, কাজ না করিলেই নয়, তিনি কোমর বাঁধিয়া কাজে লাগিয়াছেন। বিশেষ কারণে পাড়াপ্রতিবেশীকে আগে নিমন্ত্রণ করিতে পারেন নাই, এখন তিনি এবং বৃদ্ধা শাশুড়ী মিলিয়া সকলকে মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া বাড়ীতে ডাকিয়া আনিতেছেন। একেবারে লোক না থাকিলে বিবাহ হইবে কি করিয়া? একটা সভা ত চাই, স্ত্রী-আচারের জন্য এয়োও অন্ততঃ কয়েকজন চাই? নারায়ণীর বাপের বাড়ী হইতে তাঁহার এক বিধবা দিদি, এবং এক ভাই আসিয়া জুটিয়াছেন। ভাই গিয়াছেন বরযাত্রী আগাইয়া আনিতে, বোন ঘরের কাজের যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন।

মেয়েদের দল মহা হৈ চৈ বাধাইয়াছে। কনে সুবর্ণ মাত্র আট বৎসরের বালিকা; কোথায় খেলা করিতে গিয়াছিল, তাহাকে ধরিয়া আনা হইয়াছে। বাড়ীতে এত লোকজন, এত কোলাহল, ধুমধাম দেখিয়া সে প্রথমে খুব খুসিই হইয়াছিল, কিন্তু পাশের বাড়ীর মুক্তো পিসী যখন বলিল "কি ধিঙ্গীর মত লাফাচ্ছিস্, তোর না আজ বিয়ে?"

তখন সুবর্ণ রাগিয়া গেল, মুখ ভ্যাঙ্গাইয়া বলিল "ইঃ বিয়ে? বিয়ে আমি করলে ত? বাবা বলেছে বিয়ে পচা।"

মুক্তো হাসিয়া উঠিল। নারায়ণীকে ডাকিয়া বলিল "ও বৌ, শোনো মেয়ের কথা। বিয়ে নাকি পচা, এর বাপ

বলেছে, ও বিয়ে করবেনা। হাঁরে, তোর বাপ বিয়ে করেনি?"

সুবর্ণ বলিল, "যাঃ, আমার বাবা কেন বিয়ে করতে যাবে? বাবা কত লেখাপড়া জানে।" বলিয়া সে মল ঝন্‌ঝন্ করিয়া এক দৌড় দিল।

নারায়ণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ঐ ত পাগল, ওকে যে কি করে পার করব, তা ভগবানই জানেন, এখন মুখ রক্ষা হয় তবেই। যা না ভাই ঠাকুরঝি, ওকে ভুলিয়ে ফুসলিয়ে নিয়ে আয়। আর ত বেশি নেই, লগ্নের সময় হয়ে এল বলে। বরযাত্রী এখনি এসে পড়বে, মেয়েটাকে একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে দে। নইলে অমনি মূর্ত্তি করে ও সকলের সামনে গিয়ে হাজির হবে। আমি যাই, রান্নার কতদূর কি হল দেখি। দিদি ঘরে আছে, বাক্সের চাবী তার কাছে, সব চেয়ে চিন্তে নিস্।"

নারায়ণী চলিয়া গেলেন, মুক্তো চলিল সুবর্ণর খোঁজে। উঠানের ভিতর যেখানে ছাদ্‌নাতলা বাঁধা হইতেছিল, সে সেখানে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে মজুরদের কাজ দেখিতেছে। মুক্তকেশী বলিল "ও সুবু, আজ কত ধুমধাম হবে, তুই এমন ময়লা কাপড় পরে বেড়াচ্ছিস্? চল্ তোকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিই গে।"

সাজগোজ করিতে সুবর্ণর কোনো দিনও আপত্তি ছিলনা, সে তখনি রাজি মানিয়া গেল। মুক্তো পিসীর পিছন পিছন মায়ের শুইবার ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

সুবর্ণর মামী তাড়াতাড়ি চাবির গোছা, মুক্তকেশীর হাতে দিয়া বলিলেন, "এই নাও ভাই, ওই বড় তোরঙ্গটার মধ্যে কাপড় গহনা সব আছে। আমার ত কপাল পোড়া, এ সব চোখে দেখতে নেই, আমি যাচ্ছি ভাঁড়ারে, কিছু যদি দরকার লাগে ত চেয়ে নিও।"

কনে সাজানোর নামেই আর একপাল মেয়ে আসিয়া জুটিয়া গেল। মহোৎসাহে চুল বাঁধা, চন্দনবর্ষা, চেলী পরান, গহনা পরান সুরু হইয়া গেল।

বরযাত্রী আসিয়া পড়িল। ধুমধাম নাই, কিন্তু আদর অভ্যর্থনার ত্রুটী হইলনা। গ্রামের লোকে দেখিতে দেখিতে বাড়ী উঠান সব ভরিয়া গেল। কেহ আহূত, কেহ অনাহূত, কেহ বা স্বয়াহূত। নিমন্ত্রণ হয় নাই বলিয়া আসিতে কেহ ছাড়ে নাই, খাওয়ার বেলায় দেখা যাইবে।

স্ত্রী-আচার সুরু হইল। নারায়ণী কিশোর বরের সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া স্নেহবিগলিত-চিত্তে ভাবিলেন "এর হাতে মেয়ে আমার কখনো অসুখী হবেনা। এত কাণ্ড করে বিয়ে যে দিচ্ছি, সব সার্থক হবে।"

একজন প্রতিবেশিনী বলিল, "আহা একমাত্র মেয়ের বিয়ে, তা বাপ দাঁড়িয়ে দিতে পারলনা। যাই বল বাছা, কাজটা কি ভাল হল? সব ঠিক্ করে খবর দিলেই পারতে, তখন চক্ষুলজ্জার খাতিরে বিয়ে দিতেই হত। আর অমন সুন্দর ছেলে, ওকে কি আর অপছন্দ হত?"

নারায়ণী চোখ মুছিয়া বলিলেন, "তুমি তাকে জানো না দিদি, তার রাক্ষুসে ক্ষেদ; মানুষে তার ক্ষেদ ভাঙতে পারে না। জানতে পারলে এখনও এসে মেয়েকে ছাদ্‌না-তলা থেকে তুলে নিয়ে যাবে। নইলে এমন কাণ্ড করি? জাত-ধর্ম্ম ত রাখ্‌তে হবে? শাশুড়ী শুদ্ধ বল্‌লেন, তাই ভরসা করে এগোলাম, নইলে আমার সাধ্য কি? এর পর কত হেনস্তা আমারই হবে তা দেখ এখন তোমরা।"

প্রতিবেশিনী বলিল, "তা মেয়ে সুখে থাকে তবেই, আর ত তোমার নেই? স্বামী বেশী বাড়াবাড়ি করে না হয় মেয়ে জামাইয়ের কাছেই থাকবে।"

নারায়ণী বলিলেন, "ও আশীর্ব্বাদ আর কোরোনা দিদি। সংসারে আমার সুখ নেই। স্বামীর ঘর করাই যখন কপালে ছুটলনা, তখন আর কারো ঘরে আর ঢুকবনা। ভাবছি শীতকালটা কেটে গেলে, শাশুড়ীকে নিয়ে কাশী চলে যাব।"

বরণ, সাতপাক, সব হইয়া গেল। শাঁখের শব্দে সন্ধ্যাগগন মুখর হইয়া উঠিল। বর সভায় চলিল। রক্তাম্বরা, সালঙ্কারা, হাস্যমুখী কন্যার দিকে চাহিয়া নারায়ণী গোপনে চক্ষু মুছিয়া অন্তরালে সরিয়া গেলেন।

হঠাৎ একটা গাড়ী ঘড় ঘড় করিয়া আসিয়া বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। আশঙ্কায় নারায়ণীর বুকের রক্ত হিম হইয়া আসিল। কে এ অসময়ের আগন্তুক? তাঁহার সব কাজ পণ্ড হইতে বসিল নাকি? তাড়াতাড়ি নিজের শুইবার ঘরের জান্‌লার কাছে ছুটিয়া গিয়া তিনি জান্‌লা খুলিয়া ফেলিলেন। গাড়ীর দরজা খুলিয়া যে বাহির হইল সে তাঁহার স্বামী নয়, কিন্তু আগন্তুককে দেখিয়া তিনি বিশেষ প্রীতও হইলেন না। এটি তাঁহার দূর-সম্পর্কের দেবর

শিবচন্দ্র। দাদার অতিশয় গোঁড়া ভক্ত, সুতরাং মেয়ের এই গোপন বিবাহ যে সে অত্যন্তই নিন্দার চক্ষে দেখিবে, সে বিষয়ে নারায়ণীর সন্দেহ ছিল না।

শিবচন্দ্র গাড়ী হইতে নামিয়া, আর কোনো দিকে না তাকাইয়া, সোজা নারায়ণীর ঘরের দরজার কাছে আসিয়া বলিল, "এ কি কাণ্ড বৌঠান্? আমি আর একটু আগে আসতে পারলে, কখনও এ ব্যাপার ঘটতে দিতামনা। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? যাতে দাদার সব চেয়ে অমত বলে জান, তাই লুকিয়ে লুকিয়ে করছ?"

নারায়ণী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তা কি করব ভাই, তোমরা না হয় সহরে গিয়ে সাহেব হয়েছ, আমরা ত তা হইনি? আমাদের সমাজের মুখ দেখতে হয় ত? নইলে মরলে যে ঘরে পচে মরব?"

শিবচন্দ্র ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তাই আট বছরের মেয়ের বিয়ে দিয়ে স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি করছ? এরি মধ্যে সমাজের বার হয়ে যাচ্ছিলে নাকি?"

নারায়ণী তিক্ত কণ্ঠে বলিলেন, "যাঁর মেয়ে তাঁর কাছে জবাবদিহি কর্ত্ত ঠাকুরপো, তোমার আর কৈফিয়ৎ দিয়ে কি হবে? তুমি এসেছ যখন, শুভ কাজ যাতে ভালয় ভালয় হয় তাই কর। আমাকে দাঁড়িয়ে গাল দিলে ত ফিরে ফিরে যাবে না?"

"এ বিয়ে চোখে দেখলেও পাপ হয়," বলিয়া শিবচন্দ্র যেমন ঝড়ের বেগে প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনি ভাবেই বাহির হইয়া গেল। নারায়ণী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাহার পর অমঙ্গল অশ্রুজল গোপন করিয়া ভাঁড়ার-ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

বৃদ্ধা শাশুড়ী দইয়ের আর মিষ্টির হাঁড়ি পাহারা দিয়া বসিয়া ছিলেন। নারায়ণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওদিকে কাজ হয়ে গেল না বৌমা?"

নারায়ণী বলিলেন, "হ্যাঁ মা, ছোট ঠাকুরপো এসেছিল, অনেক শক্ত শক্ত কথা বলে গেল।"

বৃদ্ধা মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "কুলাঙ্গারের সৃষ্টি। চলে গেল বুঝি?"

নারায়ণী ইঙ্গিতে জানাইলেন, চলিয়াই গিয়াছে। কিন্তু তখন আর দাঁড়াইবার সময় নাই, বিবাহ সমাপ্ত হইয়াছে, এইবার বরযাত্রী খাওয়ানোর পালা। ত্রুটী হইলে রক্ষা থাকিবে না, তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

বড় ঘরখানায় মেয়ের দল বর-কনে লইয়া বাসর জমাইয়া বসিল। হাসির হিল্লোল ক্রমাগত আসিয়া নারায়ণীর কর্ণে আঘাত করিতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার মনের ভিতরটা ক্রমেই আশঙ্কায় কালো হইয়া উঠিতে লাগিল। খোকার মাথায় কাজ ত করিয়া বলিলেন, এখন শেষ ভাগ সামলাইতে পারিবেন ত? শাশুড়ীর উপর ত দোষ পড়িবে না, সমস্তটাই পড়িবে তাঁহার স্কন্ধে! কন্যাকে পতিমুক্তা করিতে গিয়া, তিনি চিরদিনের মত পতিকে হারাইলেন হয় ত। কন্যার অমঙ্গল আশঙ্কাও তাঁহার অশ্রুরোধ করিতে পারিল না, দুই চোখ বাহিয়া ক্রমাগত জলধারা ঝরিতে লাগিল।

যাহার বিবাহ লইয়া এত কাণ্ড, তাহার মনে কিন্তু চিন্তা বা আশঙ্কার লেশমাত্র ছিল না। মহোৎসাহে সে গল্প করিতেছিল, হাসিতেছিল, মেয়েদের ঠাট্টার পটাপট্ জবাব দিতেছিল। বর বেচারীই বরং কনের রকম-সকম দেখিয়া সলজ্জভাবে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। মেয়ের দল বরকে কনে, এবং কনেকে বর সাজাইবার প্রস্তাব করিয়া তাহার কর্ণমূল আরো আরক্ত করিয়া তুলিতেছিল।

খাওয়া দাওয়া, গোলমাল ক্রমে চুকিয়া আসিল। বাসর-ঘরেও মেয়েদের কোলাহল ক্রমে নিভিয়া আসিল, যে যেখানে পারিল, শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। বর একবার চাহিয়া দেখিল, সবাই নিদ্রামগ্ন, তাহার নববিবাহিতা বধূ আর একটি কিশোরীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া পরম নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাইতেছে। ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে নিজেদের জন্য নির্দ্দিষ্ট খাটের উপর গিয়া জড়সড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন বর-কন্যা বিদায়ের সময় মহা গোলযোগ লাগিয়া গেল। সুবর্ণ কিছুতেই যাইবে না, সে কাঁদিয়া, চীৎকার করিয়া, হাট বসাইতে লাগিল। বরকর্ত্তার মুখ ক্রমেই গম্ভীর হইতেছে দেখিয়া নারায়ণী মনে মনে প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। সুবর্ণকে কত বোঝান হইল, সে কিছুতেই কথা শোনেনা। জোর করিবার উপক্রম করিতেই গাটছড়া খুলিয়া ফেলিয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল!

ধরা অবশ্য তাহাকে দিতে হইলই। এক রকম জেলের

কয়েদীর মত করিয়াই তাহাকে পাল্কীতে ওঠান হইল, সেখানেও সে "আমি যাব না, আমি যাব না," করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু তাহার কান্না শুনিবার কেহ সেখানে ছিল না। নারায়ণী ঘরের ভিতর ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতেছিলেন।

নদীর ঘাটের কাছাকাছি আসিয়া বর শ্রীবিলাস সুবর্ণর ক্ষুদ্র একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে তুমি ভালবাস না সুবর্ণ?"

সুবর্ণ এক ঝট্‌কায় হাত সরাইয়া লইল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল, "তোমাকে আমি কোনো জন্মে ভালবাসব না, তুমি ছাই, পচা, কেন আমাকে মায়ের কাছ থেকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছ?"

(২)

প্রতুলচন্দ্র মিত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পল্লীগ্রামে সাধারণ হিন্দু-গৃহস্থ-ঘরে। তাঁহার বংশে ইতিপূর্ব্বে কেহ স্কুলের পড়া সারিয়া কলেজ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় নাই। জমি-জমা, চাষ-বাস লইয়াই বেশীর ভাগের দিন কাটিয়াছে। যাহাদের তাহাতে মন ওঠে নাই, তাহারা রেলের বাবু, পোষ্টমাষ্টার প্রভৃতি হইয়াছে, দু-পয়সা নানা উপায়ে ঘরেও আনিয়াছে। মা লক্ষ্মীর প্রতি অনুরাগ সকলেরই ছিল, কিন্তু দেবী সরস্বতীর ভক্ত বিশেষ কেহ ছিলেননা।

এমন বংশে জন্মলাভ করিয়া প্রতুলচন্দ্র কিরূপে যে এত বড় সাহিত্যানুরাগী এবং আধুনিক হইলেন, তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। তাহার আত্মীয়-স্বজন সবাই চলিত সমাজ, ধর্ম্ম, গুরু, পুরোহিত, থানার দারোগা, সব কিছুকে মানিয়া; প্রতুলচন্দ্র চলিতেন ঠিক তাহার উল্টা পথে। কোনো কিছুকে মানিয়া লওয়া তাঁহার স্বভাবে ছিল না। তিনি এণ্ট্রান্স্ পাশ করিয়া, রেলের চাকুরী পাইয়াও করিলেন না, সামান্য স্কলারশিপের উপর নির্ভর করিয়া গেলেন কলেজে পড়িতে। পাঠ-চর্চ্চার সময় মা বাপের পীড়াপিড়িতে, এবং বালিকাটির সৌন্দর্য্যে প্রলুব্ধ হইয়া তিনি বিবাহ করিয়া বসিলেন, ইহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র পথচ্যুতি। নিজে বাল্য-বিবাহ করিয়া, তাহার দোষগুলি যেন আরো উৎকট ভাবে দেখিতে পাইলেন, এবং অনুতপ্ত চিত্তে তখন যতদূর সম্ভব প্রায়শ্চিত্ত করিবার চেষ্টাও করিলেন। কিন্তু হিন্দু পরিবারে কেবল মাত্র স্বামীর কথায় কিছু হয় না, স্বামীর পিতামাতা বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাদের কথাই মাথা পাতিয়া লইতে হয়। সুতরাং প্রতুলচন্দ্রের চেষ্টায় কিছু হইল না, বিশেষ করিয়া পত্নী নারায়ণীর মনও অনুকূল ছিল না। স্বামীকে ভক্তি করিত ও ভালবাসিত বলিয়া মুখে সে কখনও তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিত না, তাঁহার কথামত কাজ করিতেও চেষ্টা করিত, কিন্তু মনটা তাহার শ্বশুর শাশুড়ীর মতেই মত দিত। প্রতুলচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল অন্ততঃ ষোলো সতেরো বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীকে পত্নীরূপে গ্রহণ না করিয়া, তাহাকে কলিকাতার কোনো বালিকা-বিদ্যালয়ের বোর্ডিংএ রাখিয়া সুশিক্ষা দিবেন, পরে তাহাকে সংসার করিতে দিবেন। কিন্তু মা বাবার প্রবল আপত্তিতে তাঁহার কথা ভাসিয়া গেল, নারায়ণীও শ্বশুর শাশুড়ীর অমতে স্বামীর সহিত সহরে আসিতে রাজী হইল না। প্রতুলচন্দ্র স্ত্রীকে কিছু-দিনের জন্য অন্ততঃ বাপের বাড়ী রাখিতে বলিলেন, কিন্তু তেরো বৎসরের মেয়ে যথেষ্ট বড় হইয়াছে বলিয়া নারায়ণীকে শ্বশুর-ঘর করিবার জন্য লইয়া আসা হইল। বিরক্ত হইয়া প্রতুলচন্দ্র গ্রামের বাড়ীতে আসাই ছাড়িয়া দিলেন। নিজে এম্ এ পাশ করিয়া প্রফেসারের কাজ পাইবার আগে তিনি আর বাড়ীমুখোই হইলেন না।

নারায়ণীর তখন কুড়ি বৎসর বয়স হইয়া গিয়াছে। নিজেকে স্বামী পরিত্যক্তা মনে করিয়া সে একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিত। কিন্তু তবুও আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কার ত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইতে তাহার মন উঠিত না। এতদিন পরে স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া সে তাঁহাকে ভালবাসা ও ভক্তির আতিশয্যে প্লাবিত করিয়া তুলিল বটে, কিন্তু প্রতুলচন্দ্র স্ত্রীর মনের ভাব অনুভবেই বুঝিতে পারিলেন। নারায়ণীকে তিনি ভাল-বাসিলেন, কিন্তু তাহাকে সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণীরূপে পাইবার আশা তাঁহার মন হইতে মুছিয়া গেল। ইহার পর তিনি মধ্যে মধ্যে বাড়ী আসিতেন বটে, কিন্তু নিতান্তই অতিথির মত। সংসারের সহিত মনের যোগ তাঁহার ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল।

সুবর্ণ জন্মগ্রহণ করার পর তিনি আর একবার ফিরিয়া

সংসারী হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নারায়ণী তখনও আসিতে রাজী হইলেন না। বিধবা শাশুড়ীও ঘোরতর আপত্তি করিতে লাগিলেন। শিশু-কন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার দৃঢ় সংকল্প লইয়া প্রফুল্লচন্দ্র আবার ফিরিয়া গেলেন।

কন্যা বড় হইলেই তাহাকে নিজের কাছে লইয়া আসিবেন, এক প্রকার স্থিরই ছিল। নারায়ণী মুখে কখনও আপত্তি প্রকাশ করিতেন না, কিন্তু মনে মনে জানিতেন প্রাণ থাকিতে মেয়েকে তিনি ছাড়িবেন না। তাঁহার একমাত্র সন্তান, এই কন্যা, এও যদি পিতার দলে ভিড়িয়া যায়, তাহা হইলে কাহাকে লইয়া তিনি সংসারে থাকিবেন? শাশুড়ী এবং বধূতে এই বিষয়ে প্রায়ই আলোচনা হইত। দুজনেরই ইচ্ছা ছিল, মেয়েকে সকাল সকাল বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া, না হইলে প্রফুল্লচন্দ্রের উৎপাত এড়াইবার আর কোনোই উপায় ছিলনা।

সুবর্ণ যখন চার পাঁচ বৎসরের তখন তাহাকে লইয়া যাইবার চেষ্টা আর একবার হইল। কিন্তু মেয়ে, মা এবং ঠাকুরমাকে ছাড়িয়া কোনোদিনও থাকে নাই; সে এমন কান্নাকাটি আরম্ভ করিল যে প্রফুল্লচন্দ্র তখনকার মত লইয়া যাইবার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। তাহার পর প্রতি বৎসরই চেষ্টা হইত, এবং মা, ঠাকুরমা এবং মেয়ে মিলিয়া সব ব্যর্থ করিয়া নিশ্চিন্ত হইত।

নারায়ণীর শরীর ক্রমে খারাপ হইয়া আসিতেছিল, বৃদ্ধা শাশুড়ী ত আজ আছেন কাল নাই। এ অবস্থায় শীঘ্র শীঘ্র একটা পাকা বন্দোবস্ত করিবার জন্য দুজনেই মনে মনে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রকে লুকাইয়া সব ব্যবস্থা করিতে হইবে, এইজন্য ব্যবস্থা করাও শক্ত ছিল। গ্রামের ভিতর কোথায়ও সম্বন্ধ করা তাঁহারা সুবিবেচনার কাজ মনে করিতেন না, কারণ খবরটা তাহা হইলে অবিলম্বে প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট পৌঁছিবে। অন্য গ্রামে সম্বন্ধ করিলে চট্ করিয়া ধরা পড়িবার সম্ভাবনা কম, কিন্তু দুইটি হিন্দুঘরের রমণীর পক্ষে গ্রামান্তরে গিয়া কোনো ব্যবস্থা করাও কঠিন।

দৈবক্রমে একটা সুবিধা জুটিয়া গেল। জামতালেরই এক গৃহস্থ কন্যার বিজয় নদের অপর পারে অবস্থিত এক গ্রামে বিবাহ হইয়াছিল। তিনি নিজে এখন প্রৌঢ়া, সংসার ছেলেরা খুব যে ঘনঘন বাপের বাড়ী আসিতে পারিতেন, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার পুত্র শ্রীবিলাস প্রায়ই মামার বাড়ী আসিত। ছেলেটি মধ্যে মধ্যে নারায়ণীর চোখে পড়িত। শ্রীবিলাস মোটের উপর দেখিতে ভালই, স্কুলের পড়া শেষ করিয়া পরীক্ষা দিতে চলিয়াছে। বয়ও ভাল, আনাশোনার মধ্যে। শ্রীবিলাসের মা নিস্তারিণী ডাকসাইটে ঝগড়াটে স্বভাবের। এ ভিন্ন ছেলের আর কোনো খুঁৎ নাই। তা একেবারে নিখুঁৎ সম্বন্ধ আর পাওয়া যাইবে কোথায়? শাশুড়ী ননদের গঞ্জনা খাইয়া সব মেয়েকেই ঘর-সংসারের হাতেপড়ি করিতে হয়। তাহার পর আবার আরাম করিবার দিনও আসে। মোটের উপর ছেলেটিকে নারায়ণীর পছন্দই হইল। শাশুড়ীকে তিনি নিজের ইচ্ছা খুলিয়া বলিলেন। তিনিও আপত্তি করিবার কোনো কারণ দেখিলেননা। নাতনীর বিবাহের জন্য বৃদ্ধাও ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। ছেলে ত ম্লেচ্ছ, তাহার দ্বারা কোনো উপকার হইবেনা। তিনি যতদিন বাঁচিয়া আছেন, বধূ পর্ব্বতের আড়ালে আছে। তিনি যদি সহায় হন, তাহা হইলে সে ভরসা করিয়া স্বামীর অমতে কন্যার বিবাহ দিতেও পারে, কিন্তু তিনি বিদায় হইলে এতখানি সাহসের কাজ আর তাহার দ্বারা হইবেনা। শ্রীবিলাস কিছু মন্দ পাত্র নয়, কাছে-ঘরে আর ইহার চেয়ে ভাল পাওয়া যাইতেছে কই?

লুকাইয়া লুকাইয়া কথাবার্ত্তা, চিঠি-লেখালিখি চলিতে লাগিল। পাত্রপক্ষেরও সুবর্ণকে নানা কারণে বেশ পছন্দ হইল। মেয়ে দেখিতে শুনিতে ভাল, ভাল ঘরের। আর পিতার একমাত্র সন্তান। লুকাইয়া বিবাহ দেওয়ার দরুণ এখন যতই বিরক্ত হোন, কন্যা-জামাতাকে একেবারে ত্যাগ কিছুতেই করিতে পারিবেন না, কালে সুবর্ণই সব ধন-সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। শ্রীবিলাসের পিতা জীবিত নাই, ধনসম্পদও বিশেষ কিছু রাখিয়া যান নাই। জমিজমা, খড়ের চালের ঘর, এই ত তাহাদের সম্বল। সুতরাং একজন পদস্থ মুরুব্বী শ্বশুর থাকিলে যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে। অর্থএর সম্বন্ধ একরকম পাকা হইয়া গেল।

নারায়ণী গ্রামের কাহাকেও একটা কথাও জানাইলেন না। শত্রুর অভাব নাই,—পরদিনই খবর স্বামীর কাণে তুলিয়া দিবে। শ্বশুরকুলেরও কাহাকেও কিছু বলিলেননা, এক শাশুড়ীকে ছাড়া। শুধু নিজের বাপের বাড়ীতে

লুকাইয়া খবর দিলেন। যত নিরাড়ম্বর ভাবেই বিবাহ দিন, এক হাতে একটা বিবাহের কাজ সারা যায়না, বিশেষ বাড়ীতে পুরুষ মানুষ বলিতে কেহই প্রায় নাই। বিবাহের দিন স্থির হইবামাত্র নারায়ণী তাঁহার দিদি এবং দাদাকে আনাইয়া লইলেন। সব আয়োজন তলে তলে হইতে লাগিল। গহনা কাপড় ইত্যাদি সব সহর হইতে একেবারে কিনিয়া আনা হইল। অন্য সব জোগাড়ও ধীরে ধীরে গোপনে হইতে লাগিল। নগদ টাকা কিছু নিজের কাছে সঞ্চিত ছিল, তাহাতে সব খরচ কুলাইবেনা দেখিয়া স্বামীর কাছে নানা অছিলা করিয়া তিন শত টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। টাকাকড়ির বিষয়ে প্রতুলচন্দ্র সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন, নিজের হাতে পয়সা প্রায় কোনো সময়েই থাকিতনা,—বই কিনিয়া, টাদা দিয়া, পরের ধার শোধ করিয়া মাসের মাঝামাঝিই তাঁহার হাত শূন্য হইয়া পড়িত। তবু পত্নী যখন চাহিয়াছেন, তখন অনেক কষ্টে ধার করিয়াই তিন শত টাকা তিনি তাড়াতাড়ি পাঠাইয়া দিলেন।

যত দিন অগ্রসর হইতে লাগিল, নারায়ণীর ভয়ও ততই বাড়িতে লাগিল। হঠাৎ যদি গোলমাল পাকিয়া সম্বন্ধ ভাঙিয়া যায় ত সর্ব্বনাশ। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল তাঁহার, অন্ততঃ এই একটা দিকে,—বিবাহের দিন সন্ধ্যার আগে পর্য্যন্ত কেহ কোনো কথা জানিতে পারিলনা। বিবাহ একপ্রকার সুসম্পন্নই হইয়া গেল। মাঝে শিবচন্দ্র আসিয়া গোলমাল বাধাইল বটে, কিন্তু সেও বাধা দিবার চেষ্টা করিলনা। অবশ্য বাধা দিবার সময়ও তখন ছিলনা।

বিবাহ হইয়া গেল। পরদিন মেয়ে জামাই বিদায়ও হইল,—অবশ্য নিতান্ত ভালয় ভালয় না। সুবর্ণ কাঁদিয়া-কাটিয়া নারায়ণীর ভাঙা মন আরো যেন ভাঙিয়া দিয়া গেল। একদিন, একরাত তিনি আর দরজাই খুলিলেননা। মেয়ের কান্না কেবলি তাঁহার কাণে বাজিতে লাগিল। তাহার কচি হাতের মুঠি জোর করিয়া ছাড়াইয়া, বাছাকে সকলে পাল্‌কীতে তুলিয়া দিয়াছে। না জানি অচেনা, অজানা মানুষের মধ্যে কেমনভাবে তাহার দিন কাটিবে। নিতান্ত অবোধ বালিকা, তাহাকে বিচারের চোখে দেখিলে, তাহার অসংখ্য খুঁৎ বাহির হইবে। একটু স্নেহের চক্ষে তাহারা তাহাকে দেখিবে কি? কন্যার মঙ্গল কামনায় তিনি নিজের জীবনের সুখ শান্তি ত বলি দিলেনই, কন্যাকেও বলি দিলেন না ত!

যেমান ঠাকুরাণীর যা সুনাম, তাহা স্মরণ করিতেই তাঁহার বুক ভয়ে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

তাঁহার মন যদিও মেয়ের চিন্তায় মগ্ন, তবু তিনি নিজের অজ্ঞাতসারেই উৎকর্ণ হইয়া ছিলেন। পদধ্বনির আশায় না আশঙ্কায়? যাহাকে সমগ্র হৃদয় দিয়া তিনি সদাসর্ব্বদা মনে মনে ডাকিতেন, তাহারই আগমনের ভয় তাঁহাকে আজ অভিভূত করিতেছিল। স্বামীর হাতে তাঁহার জন্য কি দণ্ডই না জানি অপেক্ষা করিয়া আছে।

প্রতুলচন্দ্র আসিয়া পৌঁছিলেন তাহার পর-দিন সকাল-বেলা। নারায়ণী তখন সবে স্নান করিয়া রান্না চড়াইবার জোগাড় করিতেছিলেন। আগের দিন তাঁহার সম্পূর্ণ অনাহারে গিয়াছে। শাশুড়ী ঠাকুরাণী তখন পাড়ায় কি কাজে বাহির হইয়াছেন। হঠাৎ দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনিয়া নারায়ণী চাহিয়া দেখিলেন, স্বামী দাঁড়াইয়া আছেন।

স্বামী স্ত্রী মিনিটখানিক পরস্পরের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলেন। কাহারও মুখে কথা নাই। নারায়ণীর বলিবার কিছু ছিলই না, তিনি কেবল মাথা পাতিয়া দণ্ড লইবার জন্য মনকে প্রস্তুত করিতেছিলেন। প্রতুলচন্দ্র ভাবিয়া পাইতেছিলেন না, কি করিয়া কথা আরম্ভ করিবেন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন "তুমি চিরদিন জান, ছেলেবেলায় মেয়ের বিয়ে দেওয়াতে আমার অত্যন্ত আপত্তি ছিল, তবু এই কাজ করলে?"

নারায়ণী মৃদুস্বরে বলিলেন "না করে যদি উপায় থাকত, তাহলে কি আর করতাম?"

প্রতুলচন্দ্র তিক্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপায় ছিলনা কি কারণে? মেয়ে কি ভেসে যাচ্ছিল, না আমি মরে-ছিলাম?"

নারায়ণী শিহরিয়া জিভ কাটিলেন। তাহার পর বলিলেন, "যা বলবে বল, গাল খাবার জন্যে আমি তৈরিই হয়ে আছি।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "গাল দিয়ে কার কি লাভ হবে? কিন্তু এতটা সাহস যে করলে, সব কুঁকি সামলাবার ক্ষমতা

তোমার আছে? মেয়ে যদি অসুখী হয়, তার দায় নেবে তুমি?"

নারায়ণী বলিলেন, "সুখী অসুখী হওয়া ত আর মানুষের হাত নয়? যার যেমন অদৃষ্ট।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "অদৃষ্ট দায়ী হবেনা, হবে তুমি। মানুষে সন্তানের জন্যে যথাসাধ্য করেও যদি তাকে সুখী না করতে পারে, তাহলে অদৃষ্টের দোহাই দেওয়া তার সাজে। কিন্তু তুমি নিজে জেনে-শুনে মেয়েকে বলি দিয়েছ। ছেলেটা একটা অপরিণত-বুদ্ধি বালক, তার শিক্ষাদীক্ষা কিছু এখনও শেষ হয়নি। মা তার দেশ-বিখ্যাত দজ্জাল এবং কৃপণ। এই ঘরে মেয়ে সুখী হবে বলে যে আশা করে সে হয় পাগল নয় মূর্খ। তাছাড়া মেয়ের ভালমন্দ স্থির করবার ভারই বা তোমার উপর কে দিয়েছিল? জগৎ সংসারের কি জান তোমরা? ঘরের চারটে দেওয়ালের মধ্যে যার জন্ম থেকে মরণ অবধি কেটে যায়, সে পৃথিবীকে চেনে কতটুকু? নিজে পা বাড়িয়ে একলা একপা চলবার ভরসা যার নেই, একটা দিন নিজের ভার বইবার সাধ্য যার নেই, সে-কোন্ আক্কেলে যায় অন্যের জীবনের ব্যবস্থা করতে?"

নারায়ণী মাথা হেঁট করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কোনো উত্তর দিলেননা। পিছন হইতে প্রতুলচন্দ্রের মাতা বলিলেন, "অত রাগ করিস্ নে বাবা, বৌমা আমার মত নিয়ে তবে এ কাজ করেছে। আজ কালই না হয় তোরা স্বাধীন হয়েছিস্,—আমাদের সময় বুড়োবুড়ী বাপ মা থাকতে তাদের উপর কেউ কথা কইতনা। তারা যা ব্যবস্থা করত সেই অনুসারে কাজ হত।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "তার ফলেই আজ সমাজের এই দশা হয়েছে। দেশ, নিজেরা যা করেছ, নিজেরা তার ভাল সামলিও। সুবর্ণর বাবা থাকতেও সে পিতৃহীনার মত ব্যবহারই পেয়েছে। সে জানুক তার বাপ নেই। ভবিষ্যতেও সেন বাপের উপর কোনো অভিমান না করে। তোমার বউও খুব অহঙ্কার করে নিজের মতে কাজ করেছেন, এই অহঙ্কার বজায় রাখ্‌বার চেষ্টা করুন। যা একান্ত আমারই করবার কাজ, তা যখন তোমরা করতে দিলেনা, তখন আর কোনো কর্ত্তব্যই আমি করব বলে আশা রেখোনা।"

তিনি দরজার দিকে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া, তাঁহার মা ছুটিয়া আসিলেন, "ও কিরে চল্লি কোথা? বোস্, স্থির হ। মেয়ে-জামাই জোড় ভাঙ্‌তে আসুক, তাদের দেখে আশীর্ব্বাদ করে যা। বিয়ে ত এখন রাগ করলেই ফিরে যাবেনা?"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "বসবার জন্যে আমি আসিনি, আর কোনো দিন আসবও না। আশীর্ব্বাদ কোরব কাকে? তোমরা ত তার গলায় ফাঁসি পরিয়ে দিয়েছ, আমি আটকাতে পারলামনা, এ লজ্জা আমার কোনো দিন যাবেনা। আশীর্ব্বাদ করে আর তাকে ছোটা করবনা।"

তিনি দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। নারায়ণী মূর্চ্ছিতা হইয়া রান্নাঘরের মেঝেতে গড়াইয়া পড়িলেন। (ক্রমশঃ)

আত্মহারা

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

জানি আমি, জীবনের এ যাত্রা আমার
হবে শেষ একদিন আসিয়া তোমার
শ্রীচরণতলে। সকল বিরহ মোর
জানি, ওগো জানি, একদিন ঘুচাইবে
মধুর মিলনে। টুটিবে সকল ঘোর—
সব দুঃখ, সকল বেদনা জুড়াইবে।

তিমির-সরণি-শেষে, জানি একদিন
জাগিবে অমল উষা দিব্য মেঘহীন;
সেই দিন প্রত্যূষের পূর্ব্ব-কিরণের
অপূর্ব্ব আজ্ঞান-তলে হৈম বরণের,
জীবন-তটিনী-নাথ এ মম আসিয়া
তব প্রেম সিন্ধু মাঝে যাইবে মিশিয়া।

তোমার অসীম প্রেমে মিলাইয়া যাত্রা
সেদিন আমার প্রেম হবে আত্মহারা!

মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এস্-আর-ই-এস্

(১)

উপক্রমণিকা

সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র তদীয় পরিণত বয়সের প্রতিভা-প্রদীপ্ত উপন্যাস গ্রন্থাবলীর শেষ গ্রন্থ "সীতারামের" উৎসর্গ-পত্রে লিখিয়াছেন, "সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, সর্ব্বগুণের আধার, সকলের প্রিয়, আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র, ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।"

বঙ্কিমচন্দ্র (প্রথম বয়সে)

উৎসর্গ-পত্রের ভাষা সচরাচর অতিরঞ্জিত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ যখন সেই পত্র কোনও পরলোকগত বন্ধুর উদ্দেশে রচিত হয়। কিন্তু উপরিধৃত উৎসর্গ-পত্রের একটি বর্ণও যে অতিরঞ্জিত নহে, তাহা যাঁহারা মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও কৃত কার্য্যের পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করিবেন। বাস্তবিকই তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।—গণিত, কাব্য, দর্শন, ভাষা-তত্ত্ব, ইতিহাস, রাজনীতি,—তিনি সকল বিষয়েই তাঁহার সুবর্ণময়ী লেখনী বিনিয়োজিত করিয়াছিলেন এবং মনীষার অবতার ডাক্তার জনসন বাণীর বরপুত্র গোল্ডস্মিথ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, রাজকৃষ্ণের প্রতিও তাহা প্রয়োগ করিয়া বলিতে পারা যায়,—তিনি যাহাতেই লেখনী স্পর্শ করিয়াছিলেন তাহাই অপরূপ শব্দ ও অলঙ্কারে উজ্জ্বল-ভাব ধারণ করিয়াছিল—"Nothing did he touch that he did not adorn." রাজকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের একটি প্রধান স্তম্ভ ছিলেন এবং "বেঙ্গলী"-সম্পাদক স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলিয়াছিলেন "He was by far the most brilliant and scholarly contributor to the Bangadarsana, when the Bangadarsana was in the height of its fame." (যখন 'বঙ্গদর্শন' যশঃ-শৈলের সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমাসীন, তখন উহার লেখকগণের মধ্যে তিনিই উজ্জ্বল প্রতিভা ও প্রজ্ঞায় সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন।)

'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক রায় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর লিখিয়াছিলেন :—

"His writings on history, philosophy and general literature were many, varied and valuable, and his able contributions to the *Bangadarsana* long formed a feature of that well-known magazine. He conducted the

Bengalee newspaper for several years with great ablity, and his contributions occasionally enriched the columns of the *Hindoo Patriot* during the life-time of our illustrious predecessor. He was an antiquarian and a linguist and besides English and Sanskrit he had command over Assamese, Uria, Persian, Urdu, Hindi, French, German, Latin and Pali. His knowledge of Pali & Sanskrit enabled him to prosecute original researches

বঙ্কিমচন্দ্র (পরিণত বয়সে)

into the Buddhistic Scriptures which commanded the admiration of his fellow-members of the Asiatic Society. As a member of the committee of the Science Association he took the keenest interest in scientific researches and spread of scientific knowledge in the country. In days when superficial education is so much in vogue, it was refreshing to see this student of forty-one going in for any particular branch of knowledge in a truly scholar-like spirit. To create a noise, to make a name and fame for himself was never in his line. Vast as his erudition was in all departments of philosophy and literature, its extent was never fully known to any who knew him not closely, so quiet, unobtrusive, and unassuring were his manners."

(ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার রচনা প্রচুর, বৈচিত্র্যময় ও মূল্যবান্ এবং 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত তাঁহার সুলিখিত সন্দর্ভাবলী বহুকাল ব্যাপিয়া সেই সুপরিচিত মাসিকপত্রের একটী বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি কয়েক বৎসর অসাধারণ দক্ষতা সহকারে 'বেঙ্গলী' সংবাদপত্র সম্পাদিত করিয়াছিলেন এবং আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ সম্পাদক

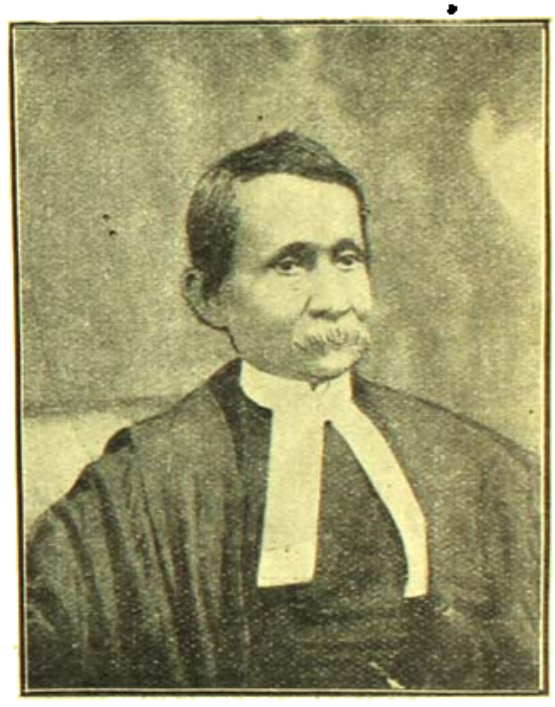

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের * জীবিত কালে মধ্যে মধ্যে "হিন্দু পেট্রিয়টের" স্তম্ভও তাঁহার রচনা দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্নতত্ত্ববিৎ এবং বহুভাষাবিৎ ছিলেন, এবং ইংরাজী ও সংস্কৃত ব্যতীত তাঁহার আসামী, উড়িয়া, পারসী, উর্দ্দু, ফরাসী, জার্ম্মান ও পালী ভাষায় যথেষ্ট অধিকার ছিল। পালী ও সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান তাঁহাকে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিতে সহায়তা করিয়াছিল এবং এই

* রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর সি-আই-ই

23,257

সকল গবেষণা দ্বারা তিনি তাঁহার এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রদত্ত সভ্য-ব্রাহ্মণত্বের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান-সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য রূপে তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। যখন পরীক্ষাগ্রাহিণী শিক্ষারই প্রাদুর্ভাব তখন একচত্বারিংশ বর্ষবয়স্ক এই ছাত্রকে একটি বিশেষ বিষয়ে যোগ্য ছাত্রের ন্যায় অধ্যবসায় সহকারে পরিশ্রম করিতে দেখিয়া আনন্দ হইত। ডক্কানিনাদ দ্বারা নিজের নাম ও খ্যাতি বিস্তার করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। সাহিত্য ও দর্শনের সকল বিভাগে তাঁহার যে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল,

antiquarian, the able officer or the profound linguist. He will be best remembered as the amiable gentleman whose suavity of manners and unruffled temper would shrink from giving the least offence to any one. In his habits and his tastes he was simple, literally as a child, and of him it might truly be said that 'his heart was born a full twenty-five years after his body.' In these days of disgusting scepticism and heartless sophistry it was a relief to come across men of Raj Krishna's stamp. All who knew him could have but one feeling for him; it is

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

তাহার পরিমাণ যিনি তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে না জানিয়াছেন তাঁহার পক্ষে জানা অসম্ভব ছিল, তাঁহার স্বভাব এত ধীর, শান্ত ও আত্মগোপনকারী ছিল।)

কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য বা বিদ্যার গৌরবই রাজকৃষ্ণের স্মৃতিকে মহিমমণ্ডিত করিয়া রাখে নাই। তিনি চারিত্র্যে গরীয়ান ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "সর্ব্বগুণের আধার, সকলের প্রিয়" ছিলেন। সেই জন্য হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক রাজকৃষ্ণের মৃত্যুবিষয়ক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"Those that knew him best will not remember him as the exquisite poet, the deep scholar, the learned professor, the painstaking unique that he was not divided from the love of a single soul that he ever came in contact with."

"যাঁহারা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানিতেন তাঁহারা তাঁহাকে কেবল শক্তিশালী কবি, অসাধারণ পণ্ডিত, বিচক্ষণ অধ্যাপক, শ্রমশীল পুরাতত্ত্ববিৎ, কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজকর্ম্মচারী অথবা অপূর্ব্ব ভাষাবিৎ বলিয়া স্মরণ করিয়া রাখিবেন না। তিনি বিনয় ও শিষ্টাচারের প্রতিমূর্ত্তিরূপে সর্ব্বদা স্মরণীয় থাকিবেন—তাঁহার ধীর ও অকোপন স্বভাব এবং সৌজন্য কাহাকেও কোনও প্রকার ত্রুটি গ্রহণে সুযোগ দেয় নাই। তাঁহার রুচি ও প্রকৃতি শিশুর ন্যায় সরল ছিল, এবং তাঁহার

বিষয়ে যথার্থই বলা যাইতে পারে যে "তাঁহার দেহের পঞ্চিশ বৎসর পরে তাঁহার হৃদয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।" আজি কালিকার এই বিরাগজনক অবিশ্বাস ও হৃদয়হীন ছলনার দিনে রাজকৃষ্ণের মত পুরুষের সংস্রবে থাকিলে আনন্দ হইত। তাঁহাকে যাঁহারা জানিতেন তাঁহাদের মনে শ্রদ্ধা ভিন্ন অন্য কোনও ভাব আসিত না। ইহা আশ্চর্য্য যে যাঁহারা তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছেন তাঁহাদের একজনেরও প্রীতি হইতে তিনি বিচ্যুত হন নাই।"

অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য, শিশুসুলভ সারল্য, ও অমায়িক ব্যবহার রাজকৃষ্ণকে সকলের হৃদয় অধিকার

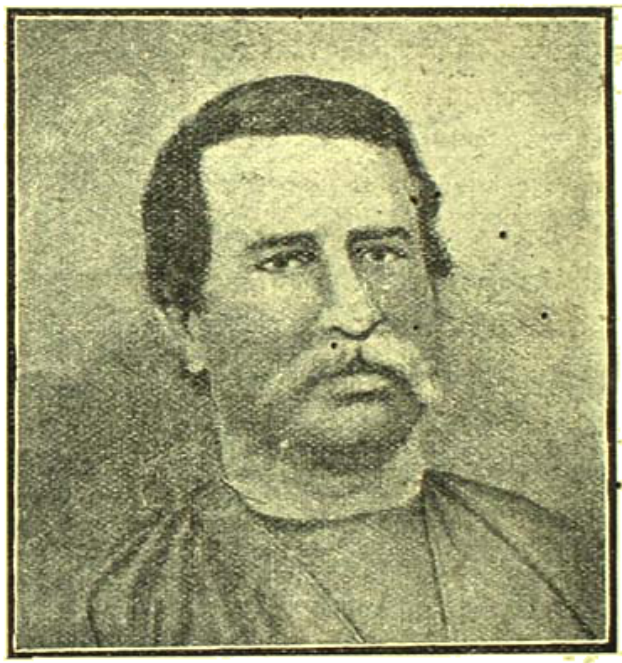

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

করিতে সমর্থ করিয়াছিল। রেইস এণ্ড রায়তের সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও তাহাই লিখিয়াছিলেন :—

"Babu Raj Krishna's talents and versatile acquirements were embellished by his frank manners, and his modesty and simplicity of character endeared him to all who knew him."

"রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রতিভা এবং বহুবিষয়িনী বিদ্যা তাঁহার অকপট ব্যবহার দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল এবং তাঁহার বিনয় ও চরিত্রের সরলতা তাঁহার পরিচিতগণের নিকট তাঁহাকে পরম প্রীতিভাজন করিয়া তুলিয়াছিল।"

আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে সংক্ষেপে মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যসেবার পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইব।

জন্ম ও জন্মস্থান্

১২৪২ বঙ্গাব্দে ১৬ই কার্ত্তিক দিবসে (১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ৩১শে অক্টোবর) নদীয়ার অন্তর্গত গোস্বামী-দুর্গাপুরে জন্মগ্রহণ করেন।

রাজকৃষ্ণের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ কালীচরণ বিবাহসূত্রে সর্ব্ব-প্রথম গোস্বামী-দুর্গাপুরে বসতি করেন। তাঁহার পিতৃনিবাস মুর্শিদাবাদে ছিল। গোস্বামী-দুর্গাপুর গ্রামের পত্তন সম্বন্ধে

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এই কিম্বদন্তী আশ্রয় করিয়া রাজকৃষ্ণ তাঁহার "রাজবালা" নামক "ইতিহাস-মূলক আখ্যায়িকা" প্রণয়ন করেন। প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক হৃত-সর্ব্বস্ব ও নানাপ্রকারে অত্যাচারিত হইয়া এক সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীর তরুণ বয়স্ক পুত্র স্বপ্নে দেবাদেশ প্রাপ্ত হইয়া এক গভীর অরণ্যে রাধারমণের পূজায় ও ধ্যানে কালাতি-পাত করিতেছিলেন, এমন সময়ে মৃগয়াব্যপদেশে রাজা রায়-মুকুট সপরিবারে তথায় উপস্থিত হন। রাজকুমারী-দুর্গাবতী ও নবীন সন্ন্যাসী কৃষ্ণকমল গোস্বামীর হৃদয়ে দর্শন

মাত্রই প্রেমসঞ্চার হয়; কিন্তু দেবাজ্ঞার জন্য গোস্বামী তাঁহার বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে সংসার-ধর্ম্ম পালনে অস্বীকৃত হন। অবশেষে রাজা সেই গভীর অরণ্যই পরিষ্কৃত করিয়া তথায় নূতন নগরের পত্তন করেন। এই নগরের নাম নবদম্পতীর নামানুসারে গোস্বামী-দুর্গাপুর রাখা হয়।

পিতা আনন্দচন্দ্র

রাজকৃষ্ণের পিতা আনন্দচন্দ্র "পাইকপাড়া কন্সারণ" নামক নীলকুঠীর দেওয়ানী করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; কিন্তু হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়া করে অপরিমিত ব্যয় করায় (১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর) ৪৮

ডিক ওয়াটার বেথুন

বৎসর বয়সে মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার পুত্রগণের জন্য বিশেষ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

আনন্দচন্দ্রের স্বর্গারোহণ কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধিকাপ্রসন্নের বয়স পোনের বৎসর এবং রাজকৃষ্ণের বয়স নয় বৎসর মাত্র।

অগ্রজ রাধিকাপ্রসন্ন

রাজকৃষ্ণের অগ্রজ রাধিকাপ্রসন্ন একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়াও স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায়ের দ্বারা কতদূর আত্মোন্নতি করিতে পারা যায় তিনি তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। পিতার মৃত্যুকালে তিনি বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণী হইতেই জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়া সেই বৃত্তি-লব্ধ অর্থে উচ্চ শিক্ষা লাভ করা, সংসার প্রতিপালন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা কতদূর ক্লেশজনক ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। পরে সিনিয়র স্কলারশিপ বৃত্তি ভোগ

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

করিয়া রাধিকাপ্রসন্ন শিক্ষা-বিভাগে প্রবেশ করেন এবং বিদ্যালয় পরিদর্শকের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য প্রশংসার সহিত সম্পাদন করিয়া প্রভূত যশঃ এবং রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। তিনি স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল

প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা বহুদিন বঙ্গদেশের বিদ্যালয় সমূহে অবশ্য-পাঠ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিস্তম্ভ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নৈতিক চরিত্র ও রুচি গঠন এবং মানসিক উন্নতি বিধান।

শৈশব

পিতার মৃত্যুর সময় রাজকৃষ্ণ নিজ গ্রামে জনৈক গুরু মহাশয়ের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার জননী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কন্যা—শুনা যায় তাঁহার মাতামহী চিত্রাদেবী স্বামীর মৃত্যুর পর সহমৃতা হইয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণ শৈশবেই এই ধর্ম্মপরায়ণা জননীর উপদেশে দেবদ্বিজে ভক্তি করিতে শিখিয়াছিলেন। মায়ের পূজার জন্য পুষ্প-চয়ন তাঁহার শৈশবের আনন্দদায়ক কর্ত্তব্য ছিল। জননীর ইচ্ছা ছিল তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ন্যায় সংস্কৃত টোলে শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু দূরদর্শী হিতৈষীদিগের পরামর্শে তাঁহাকে প্রতীচ্য সাহিত্যাদিতে শিক্ষা দেওয়া স্থির হইল।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে রাধিকাপ্রসন্ন রাজকৃষ্ণকে কৃষ্ণনগরের বাসায় লইয়া গেলেন। সেখানে কয়েক মাসের মধ্যেই কয়েকখানি ইংরাজী পুস্তক পড়াইয়া রাজকৃষ্ণকে তিনি তত্রত্য এক মিশনারী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। ৬ মাসের মধ্যেই তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। অতঃপর রাজকৃষ্ণ কৃষ্ণনগর কলেজের স্কুল বিভাগে প্রবেশ লাভ করেন। কথিত আছে যে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার সময় প্রধান শিক্ষক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি জ্যামিতি পড়িয়াছেন কি না? রাজকৃষ্ণ উত্তর দিলেন "পড়িয়াছি।" তখন শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "চারি অধ্যায়ে কয়টি সম্পাদ্য, কয়টী উপপাদ্য প্রতিজ্ঞা আছে বলিতে পার?" রাজকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিয়া শিক্ষক মহাশয়কে বিস্মিত করিয়া দেন।

দুই বৎসর কৃষ্ণনগর কলেজের স্কুল বিভাগে পড়িয়া রাজকৃষ্ণ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া ১৮৲ মাসিক ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন।

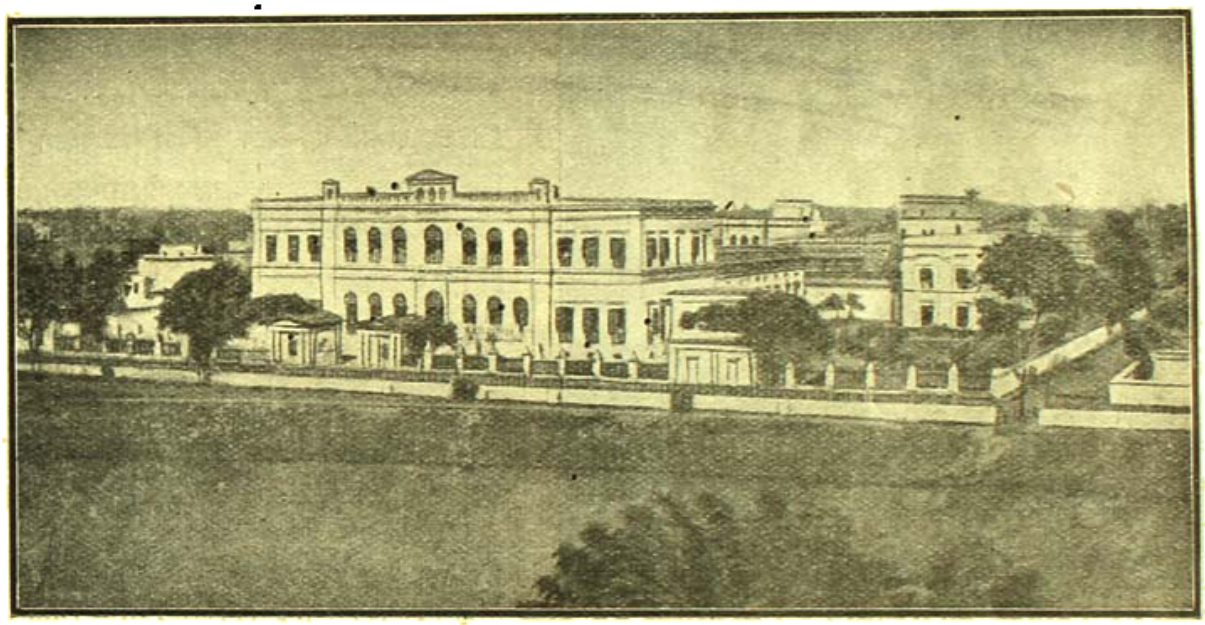

জেনারেল এসেম্‌ব্লি কলেজ

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ এফ্-এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ত্রিশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং ৫০৲ বৃত্তি পান।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে দর্শন-শাস্ত্রে এম্-এ পরীক্ষা দিয়া রাজকৃষ্ণ প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বর্ণ পদক ও পুস্তকরাশি পুরস্কার পান। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় (কন্‌ভোকেশনে) তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলর স্যর হেন্‌রি মেন তাঁহার সম্বন্ধে বলেন যে "তিনি যে প্রতিভা ও শাস্ত্রাধিকার প্রদর্শন..

করিয়াছেন তাহা অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্রগণের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।"

কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশ

এই বৎসরেই রাজকৃষ্ণ জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউসন (এক্ষণে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ) নামক প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। রেভারেণ্ড ডাক্তার জেম্‌স্ অফিলি তখন উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। অধ্যাপনায় রাজকৃষ্ণ বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন।

নবীনচন্দ্র সেন

বেথুন সভায় 'হিন্দু-দর্শন' সম্বন্ধে বক্তৃতা

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর তারিখে প্রধানতঃ মেডিক্যাল কলেজের তৎকালীন সম্পাদক এফ্ জে মৌএটের চেষ্টায় কলিকাতায় বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের স্মৃতিরক্ষার্থ বেথুন সোসাইটী নামে এক সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাতে ইংরাজী ও বাঙ্গালী সমাজের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেন। গবর্ণর জেনারেল বা লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণর উহার অধিবেশনে যোগদান করিতেন, এবং হাইকোর্টের ইংরাজ বিচারপতিরাও উহার অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। রাজকৃষ্ণ এই বেথুন সভায় ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ১৪ই মার্চ্চ তারিখে 'হিন্দু-দর্শন' সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি প্রমাণিত করেন যে, হিন্দু-দর্শন গ্রীক্ দর্শনের নিকট কোনও রূপে ঋণী নহে। বেদে সর্ব্বপ্রথমে Ego এবং Non-Ego, Mind এবং Matterএর প্রভেদীকরণ দৃষ্ট হয়। সূত্র যুগে যে ষড়-দর্শনের উৎপত্তি হয়, তাহাও বৌদ্ধ-দর্শনের নিকট ঋণী নহে। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার পর জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ইংরাজ ব্যতীত আর কোনও জাতিই বোধ হয় হিন্দুর ন্যায় পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার উপর তাঁহাদের দার্শনিক-তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন নাই; এবং উপসংহারে তিনি এই আশা করেন যে স্বভাবসিদ্ধ পরীক্ষা-প্রিয়তা যথোচিত ভাবে পরিচালিত হইলে হিন্দুরা বিজ্ঞানে চরম উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন। রাজকৃষ্ণের প্রবন্ধটি সভার সদস্যগণ কর্ত্তৃক আলোচিত হইবার পর উক্ত সভার সভাপতি বিচারপতি স্যার জন বাড্ ফিয়ার একটি মনোহর বক্তৃতা করেন এবং উপসংহারে প্রবন্ধ পাঠকের উচ্চ সুখ্যাতি করিয়া যাহা বলেন, সভার কার্য্য-বিবরণীতে তাহা এইরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

"He concluded by thanking the lecturer for his excellent essay, and congratulated him upon having successfully vindicated the character of his country's philosophy. So far from Hindu philosophy being visionary and unreal, it appeared to be entirely realistic in its structure. Whatever might be the value of the results which it had yet reached, its foundation was experience and its constant appeal was to observation. The President then after formally conveying the thanks of the meeting to Babu Raj Krisnna Mukerjyea, declared the Meeting at an end."

উপসংহারে তিনি বক্তাকে তাঁহার উপাদেয় প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং তাঁহার দেশের দর্শন-শাস্ত্রের বিশেষত্ব সাফল্যের সহিত প্রদর্শিত করিয়াছেন বলিয়া

আনন্দ প্রকাশ করেন ও তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। হিন্দু-দর্শন অস্পষ্ট ও অসম্ভব নহে, পরন্তু উহার প্রকৃতি বা গঠন বাস্তবানুযায়ী। যে সিদ্ধান্তে উহা এ পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছে তাহার মূল্য যাহাই হউক না কেন, উহার ভিত্তি ভূয়োদর্শন, এবং প্রতিনিয়ত পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

রাজকৃষ্ণের প্রবন্ধটি এতাদৃশ মূল্যবান তথ্যের আকর যে, বেথুন সভার কার্য্যবিবরণীর শেষে সমগ্র প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটী উক্ত বিবরণীর ৩২ পৃষ্ঠা অধিকার করিয়াছিল।

ব্যবহারাজীব

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ বি-এল্ পরীক্ষা দেন এবং প্রথম বিভাগ উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। উক্ত বৎসরে ১৬ই মার্চ তিনি হাইকোর্টের উকীল শ্রেণীভুক্ত হন এবং বহরমপুরে ওকালতী করিতে যান।

সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন: "তখন বহরমপুরে বাঙ্গালা সাহিত্য-চর্চ্চার বড় সুবিধা ছিল। ডাক্তার রামদাস সেনের বাড়ী সেইখানে। তাঁহার লাইব্রেরীতে বিস্তর বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ছিল। আর ভারতবর্ষের সংসৃষ্ট ইংরাজি পুস্তকও বিস্তর ছিল। 'বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' লেখক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বহরমপুর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পিতৃদেব (সুকবি গঙ্গাচরণ সরকার) ঘুরিয়া-ফিরিয়া বহরমপুরেই আসিয়া থাকিতেন। বাঙ্গালার ইতিহাস লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,—এই সময়ে বহরমপুরেই ওকালতি করিতেন। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর এই সময়ে এই বিভাগের পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয় বহরমপুর নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন; আর আমি যাবার কিছুকাল পরেই,—পিওন্স পিও শেষ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র অন্তর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া গেলেন। সুতরাং এ সময়ে বহরমপুরে বাঙ্গালা চর্চ্চার মাহেন্দ্র যোগ বলিতে হইবে। আমি মাহেন্দ্রক্ষণের সুযোগ অবহেলা করি নাই।"

রাজকৃষ্ণও এ মাহেন্দ্রক্ষণের অবহেলা করেন নাই। যদিও তখনও বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে আগমন করেন নাই, উপরি-উল্লিখিত অন্যান্য সাহিত্য-সেবকগণের সাহচর্য্যে যে তাঁহার স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

"যৌবনোদ্যান"

এই সাহিত্যানুরাগ তাঁহার "যৌবনোদ্যান" নামক কাব্যগ্রন্থে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিল। "যৌবনোদ্যান"

গিরীশচন্দ্র ঘোষ

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জুন বহরমপুর হইতে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের মুখপত্রে, শুধু এই গ্রন্থ বলি কেন তাঁহার প্রায় সকল গ্রন্থেরই মুখপত্রে তাঁহার মূলমন্ত্র নিধুবাবুর সেই অমর পংক্তি কয়টি মুদ্রিত ছিল,

"নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
বিনা স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা?
কত নদী সরোবর, কিবা বল চাতকীর,
ধারা-জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা?"

কাব্যগ্রন্থখানি কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের নামে উৎসৃষ্ট হয়। উৎসর্গ-পত্রটি এইরূপ :

বঙ্গকবিকুল-শিরোমণি শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তস্য
মহাশয়—
সদাশয়েষু।

কবিবর!

আপনার প্রদর্শিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বাগ্‌দেবীর পূজায় প্রবৃত্ত হই। যৌবনোদ্যান হইতে কতকগুলি পুষ্পোত্তোলন করিয়া মালা গাঁথিয়া অর্চ্চনারম্ভ করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইব বলিতে পারি না। যদি ভাল ভাল ফুল তুলিতে না পারিয়া থাকি, অজ্ঞতাবশতঃই এরূপ

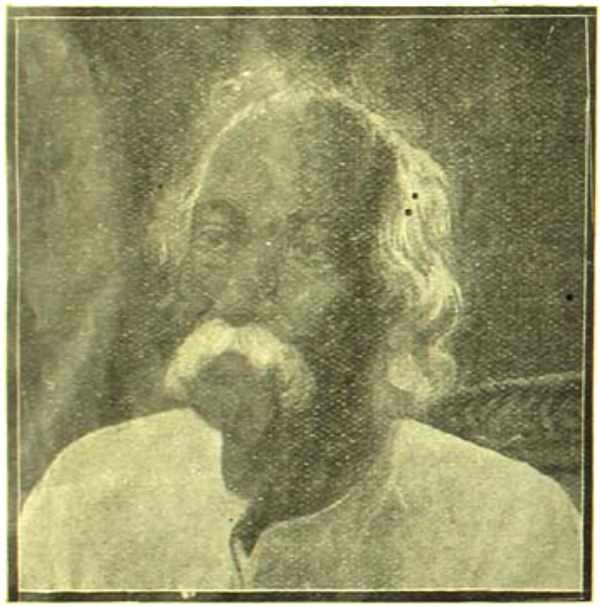

মহেন্দ্রলাল সরকার

হইয়াছে ; কারণ অদ্যাপি দিন হইল কাব্যকারের যৌবনোদ্যানে প্রবেশ ঘটিয়াছে, এখন কি মধ্যদেশ পর্য্যন্ত যাইতে অনেক বিলম্ব আছে।

আপনার করে এই কবিতা-কুসুম-হার উপহার স্বরূপ প্রদান করিলাম। রচয়িতার গুণে যত না হউক আপনার নাম সংযোগে ইহার গৌরব বৃদ্ধি হইবে। চন্দ্রকরে তামসী নিশাও শোভা ধারণ করে। নারায়ণ-নাম-লিখিত তুলসী-পত্রও বিশ্ব হইতে ভারী হইয়া থাকে। ইতি

বহরমপুর
২৯ জুন ১৮৬৮।

গ্রন্থকারস্য।

'যৌবনোদ্যান' একটি রূপক।" "সংসার সাম্রাজ্য" নামক সঙ্কলিত কাব্যগ্রন্থের উহা প্রথম খণ্ড। "সংসার সাম্রাজ্য" কাব্যখানি সম্পূর্ণ হয় নাই। যৌবনোদ্যানের বিষয়টি সংক্ষেপে এই। একদিন প্রত্যূষে, যখন

আলোকের আগমনে হইয়া চকিত,
লজ্জায় শঙ্কায় রক্ত হরিদ্রা আনন,
তমোময় কেশপাশ পাশে বিগলিত,
নিশ্বাসে বিস্তার করি সুগন্ধ পবন,
সূর্য্যাসনে ফুলশয্যা ত্যজিয়া যখন,

রামগোপাল ঘোষ

সুবর্ণ বরণা উষা, কমল চরণে,
পালায় অম্বর পথে বিচলিত মন,
পশ্চিমদিকের পানে ত্বরিত গমনে,
সৌদামিনী জিনি বেগে,
পড়ে কিবা পড়ে না নয়নে,—

তখন যৌবন-উদ্যানে সুখসরোবরের তীরে একজন সুন্দর পুরুষ বসন্তের দেখা পাইল এবং সংসার-রাজ্য ভ্রমণ করিবার কামনা প্রকাশ করিল। বসন্ত বলিলেন যে যৌবন-উদ্যান ভয়শূন্য নহে, চারিদিকে প্রলোভন মায়া বিস্তার করিয়া আছে, ধৈর্য্য, যত্ন, সাহস ও সুমতিকে সঙ্গে লইয়া

ধর্ম্মকে মাথায় রাখিয়া অগ্রসর হইলেই সংসার-যাত্রা সুগম হইবে। এই বলিয়া তিনি ঐ কয়টি সদ্গুণকে আবাহন করিয়া আনিলেন। উহাদের বর্ণনা অতি সুন্দর। একটি উদ্ধৃত করি,

সাহস বিশাল বক্ষ, লৌহময় কায় ;
সম্মুখে সর্ব্বদা দৃষ্টি—পিছে নাহি চায় ;
থর থর ক্ষিতিতল কাঁপে পদভারে ;
কাহারে না কিছু ভয় করে এ সংসারে ;
বহিলে প্রবল বাত্যা নাহি পারে কম্পিতে চকিত।
সিংহনেত্র জিনি নেত্র অলে অন্ধকারে,
শোভা পায় করদ্বয় করী-করাকারে ;
দেবদারু জিনি উচ্চ, দেহে ভীমবল ;
অচল, অটল সদা যথা হিমাচল ;

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন

এই সদ্গুণ

যেমতি সলিল বিশ্ব সলিলে মিশায়,
কিম্বা যথা ইন্দ্রধনু সহসা গগনে,

সেইরূপ যুবকের অঙ্গে মিশাইয়া গেল। এই সদ্গুণের সহায়তায় যুবক নানা প্রলোভন জয় করিয়া সংসার-রাজ্যে অগ্রসর হইলেন।

কাব্যখানিতে ৮৩টা নয় পংক্তি সমন্বিত শ্লোক আছে। উহার স্থানে স্থানে ইংরাজ কবি স্পেন্সারের ছায়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়।

তরুণ বয়স্ক কবির পক্ষে উহা যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য এবং উহা সুধীগণ কর্ত্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিল। সুবিদর্শী সমালোচক ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'রহস্য সন্দর্ভে' এই কাব্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

"ইহাতে অলঙ্কার-বিশেষের আড়ম্বর অনেক আছে এবং রচনা চাতুর্য্যও স্থানে স্থানে প্রদীপ্ত বোধ হয়। অধিকন্তু পদ্যের সারল্য ও সম্বাদিতাও লক্ষ্য হয় ; উদাহরণ স্বরূপ কএকটি পদ্য প্রদর্শিত হইতেছে।

হেরিলা দ্বারের মাঝে, রতন আসনে,
চিন্তাকুলা মৌনভাবে বসিয়া রূপসী ;
খরতর রবিকর জলে সে বদনে ;
নয়নের তেজে যায় নয়ন ঝলসি ;
সৌদামিনী রাশি নাকি পড়িয়াছে শশি ?

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কপাল কিঞ্চিৎ উচ্চ, প্রশান্ত, অঙ্কিত,
ভাবনা-লাঙ্গলে ভাল গেছে যেন চসি ;
বক্রাগ্র নাসিকা ; ওষ্ঠ কি জন্য কম্পিত ;
দৃঢ় গ্রীবা ; অঙ্গ অঙ্গ অলঙ্কার বাসে আচ্ছাদিত

(২৯ পৃঃ)

কিছুকাল গ্রন্থখানি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

বিবাহ

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর রাজকৃষ্ণ বিবাহ করেন। তাঁহার পত্নী কান্তমণি অতি সাধ্বী ও সুশীলা রমণী

ছিলেন। ইনি যে পুণ্যজ্যোতির্ম্ময় শান্তিময় সংসার গঠন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রতিভাশালী পতির সরস্বতী সেবার সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছিল।

কটকে অধ্যাপনা

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২২শে ফেব্রুয়ারী রাজকৃষ্ণ কটক ল-কলেজে ৩০০৲ মাসিক বেতনে অধ্যাপক পদে বৃত হন।

'হিন্দু-দর্শন' সম্বন্ধে বক্তৃতা

এই স্থানে অবস্থানকালে কটক থিয়েটিং ক্লাবে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২৪শে মার্চ্চ দিবসে তিনি হিন্দু-দর্শন সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল।

রমেশচন্দ্র দত্ত

বেথুন সভায় তিনি ইতঃপূর্ব্বে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাই কিঞ্চিৎ সংশোধিত করিয়া কটকে প্রদত্ত হইয়াছিল। সেইজন্য উহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

'মিত্র-বিলাপ'

এই বৎসর ১৯শে মে তারিখে রাজকৃষ্ণের দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ 'মিত্র-বিলাপ' প্রকাশিত হয়। জনৈক বন্ধুর বিয়োগে এই কাব্যের সূত্রপাত হয়। 'মিত্রবিলাপ' ব্যতীত এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত কবিতাগুলিও সন্নিবিষ্ট হয়, যথা, বুদ্ধদেবের সংসার-ত্যাগ, নিশাকালে বিহঙ্গমরব, চিন্তা, নিদ্রা, সংসার, কাল, বঙ্গমাতা, বালকের মুখ, নিজদোষে বিপদের প্রতি, মনের প্রতি উপদেশ, প্রতিধ্বনি, স্বভাবের শোভা, কাব্যের বাগান, উত্তানপাদের প্রতি সুনীতি, বন্ধুহীন কবিতা। কবি বঙ্গ-ভাষার চরণে কাব্যগ্রন্থখানি উৎসর্গ করিয়া লিখিয়াছিলেন,

কবিতা-কুসুম-মালা গাঁথিয়া যতনে
দিলাম মা বঙ্গভাষা তোমার চরণে।
আমি মা অকৃতী অতি, জ্ঞানহীন মূঢ়মতি,
তব যোগ্য উপহার দিব মা কেমনে।

চন্দ্রনাথ বসু

যেমন শকতি ছিল, তনয় মা তাই দিল,
ভুলি নাই তোমায় মা এই ভাব মনে।
পশিয়া "যৌবনোদ্যানে," ফুল তুলি স্থানে স্থানে,
অর্পিয়াছি তব পদে, আছে কি স্মরণে?
আবার গাঁথিয়া মালা, পূরিয়া পূজার ডালা,
আসিয়াছে নন্দন মা তোমার সদনে।

'মিত্র-বিলাপে'র ন্যায় আন্তরিকতাপূর্ণ করুণরসসমন্বিত সুমধুর কাব্যগ্রন্থ তৎকালীন সাহিত্যে দুষ্প্রাপ্য। হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক রায় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর

সেইজন্য একবার রাজকৃষ্ণের কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে 'মিত্র-বিলাপটি'কে যথার্থই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"He was the writer of several very clever poetical works, foremost of which is the *Mitrabilap*, throughout which there runs an exquisite and delicate pathos hardly to be met with in works that have succeeded in creating a greater noise."

"তিনি কতকগুলি লিপিচাতুর্য্য-পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'মিত্রবিলাপ' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থের সর্ব্বত্র একটি সুন্দর কোমল করুণ রস প্রবাহিত হইতেছে যাহা অনেক প্রসিদ্ধতর গ্রন্থেও সচরাচর লক্ষিত হয় না।"

সারদাচরণ মিত্র

প্রতিভার অবতার ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত "রহস্যসন্দর্ভে" এই গ্রন্থের সমালোচন প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধার যোগ্য :—

"যে সময়ে পৃথিবীতে আহার্য্য শোভার প্রতি বিশেষ সমাদর না হইয়া উঠে ততদিন কাব্যরচনার স্বভাবোক্তিই সুচারুরঞ্জিত হইতে পারে। পর্ব্বতাদি স্বাভাবিক বিষয় সকল যেরূপে বর্ণিত হয়, সুচারু কারুনির্ম্মিত প্রাসাদাদির বর্ণনাপ্রণালী কদাপি তাদৃশ স্বাস্থ হইতে পারে না। যে সকল কবিরা সামাজিক আহার্য্য শোভার ভাব পরিজ্ঞাত হইয়াও স্বভাবের কৌশল লিখিয়া কীর্ত্তিলাভ করিতে পারেন তাঁহারাই সহৃদয় শ্লাঘ্য এবং কীর্ত্তনীয়। আমাদিগের সমালোচ্য গ্রন্থ প্রণেতা মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্তরূপ কৌশল প্রকাশ করিয়া কীর্ত্তনীয় হইবার যোগ্য হইয়াছেন। ইঁহার রচনা-প্রণালী স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। গ্রন্থখানি মিত্রবিলাপ আখ্যায় অভিহিত সুতরাং বন্ধু বিরহ বর্ণনই উদ্দেশ্য। বিরহাবস্থায় মানবের প্রকৃতির চারুতা দর্শন অভিলষণীয় হওয়াতে প্রকৃতির বর্ণনাদিও লক্ষিত হয়। ফলতঃ ইনি যেরূপ ভাবে গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে ইঁহাকে বিরহাবস্থার লোক বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। ইঁহার বিরহভোগিত্ব ও কবিত্বের প্রামাণ্য-

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

রক্ষার্থ কতিপয় কবিতা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে, সহৃদয় পাঠকবর্গ অবশ্যই বিবেচনা করিয়া লইতে পারিবেন।

'দেখিলাম স্বপনে মুখে মৃদু মৃদু হাসি কুসুমে কৌমুদী-রাশি, হেরি সুখ নাহি ধরে মনে।
প্রণয় বচন তার, ঢালে কর্ণে সুধাধার, শিহরে পুলকে কায়া
সে কর স্পর্শনে
উল্লাসে সহসা নিদ্রা ভাঙ্গিল আমার। একি উষা দিলে
তুমি আবার আঁধার? ৪র্থ পৃঃ

নিম্নস্থ চারি পংক্তি স্বপ্নাবস্থায় বন্ধু দর্শনে চিত্তের প্রকৃত কার্য্যই প্রকাশ করিতেছে।

'প্রণয়ের পাত্র সহ হইলে মিলন,
উথলে আহ্লাদ চিতে, সুধা বর্ষে চারি ভিতে, বিজলির
সম হাসি উজলে আনন ;
আনন্দ সরস মানে, আশা কমলিনী সাজে, হেরিয়া নয়নে
পুনঃ সুখের তপন ;
রোগ শোক দূরে যায়, ইচ্ছা হয় পুনরায়, সংসার তরঙ্গে
রঙ্গে চালাই জীবন।
প্রণয় বিষয় আজি বুঝি আমি ভালো ;
বহু সনে যে সকল, দেখিতাম নিরমল, আজি সে সকল
আমি দেখি যেন কালো ;

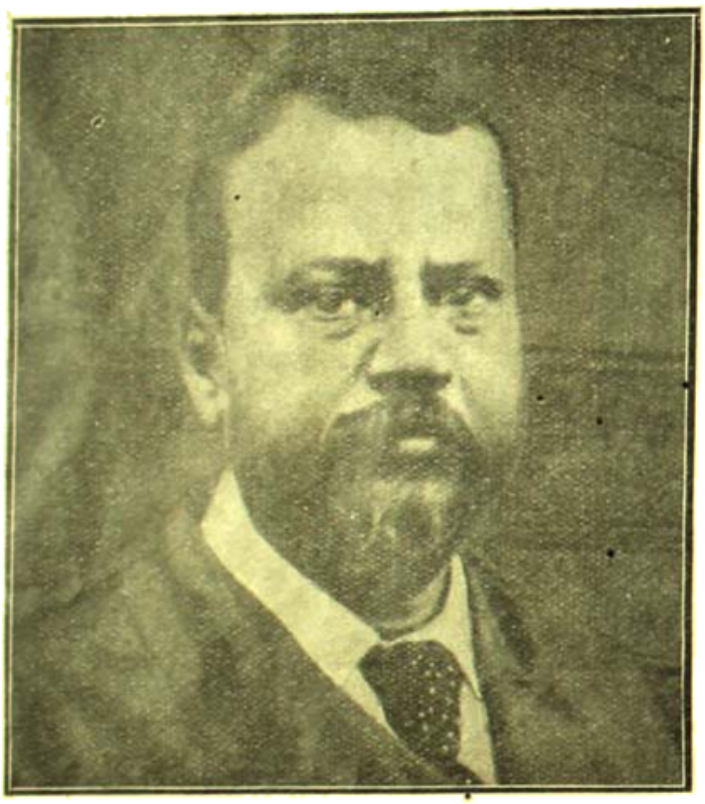

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ

সে কালে শীতল কর, দিতে তুমি সুধাকর, তুমিও এখন
মন মনাগুণ জ্বালো ;
তোমারো মলয়ানিল, শীতলতা গুণ ছিল, এখন কেবল
তুমি শোক শিখা পালো।'

(১৮ ১৯ পৃঃ)

প্রথমোদ্ধৃত কবিতার নিম্নে পংক্তি চতুষ্টয় রূপ অলঙ্কারে লক্ষিত হইয়া মানসি প্রকৃত বৃত্তির বিষয় প্রকাশ করিয়াছে। মিলনাবস্থায় সুরম্যবস্তু দর্শনে মনোমধ্যে যে রূপ আনন্দ লহরী বহিতে থাকে, বস্তু বিচ্ছেদে ঐ সমস্ত রম্য বস্তু দর্শনেও সেইরূপ মনের ক্ষোভ উৎপাদন করিয়া থাকে। গ্রন্থকর্তা ইহা শেষোক্ত কবিতায় সুনিশ্চিত করিয়া পদ্য নিবদ্ধ করিয়াছেন। ফলে ইনি পুস্তকখানি রচনা করিয়া যে কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে এরূপ স্থল অনেক আছে, যাহা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে সুখি করিতে পারি, কিন্তু প্রস্তাব বাহুল্য-ভয়ে তদ্‌বিষয়ে নিরস্ত হইতে হইল।"

'চিত্রবিলাপে' সন্নিবিষ্ট কবিতাগুলি নানা ছন্দে রচিত হইয়াছে। 'উত্তানপাদের প্রতি সুনীতি' নাম্নী কবিতাটি মাইকেলের 'বীরাঙ্গনা'র আদর্শে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।

'কাব্যকলাপ'

কটকে অবস্থানকালেই ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ২৩শে মে রাজকৃষ্ণের আর একটি কাব্যগ্রন্থ—"কাব্য-কলাপ" প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের 'মঙ্গলাচরণে' তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত রচনার উল্লেখ আছে :—

"কৃপা করি, শ্বেতভুজে ভকত বৎসলে,
আমার দেহি মা স্থান চরণ-কমলে।
ভ্রমিব মনের রঙ্গে, পুনঃ কবিকুল সঙ্গে,
তব পদচিহ্ন ধ্যান করি কুতূহলে।
প্রবেশি 'যৌবনোদ্যান' প্রথমে আরম্ভি গান,
'মিত্রের' মরণে পরে ভাসি নেত্র-জলে ;
কখন বিহঙ্গ গীত, চিত্ত করে বিদারিত,
কভু বা 'চিন্তার' সনে বেড়াই বিরলে ;
কভু খুলি ভূতধার, দেখি 'বুদ্ধ' শয্যাগার,
প্রেমের বন্ধন যবে ছিঁড়ে ধর্ম্মবলে।
দীনে যেন থাকে মায়া, দেহি মা গো পদছায়া,
নূতন সঙ্গীত রঙ্গে রসিব সকলে।
শরীরে ত গুণ নাই, তোমার করুণা চাই ;
হিমবিন্দু সূর্য্যালোকে গঙ্গে মুক্তাফলে।"

এই কাব্যগ্রন্থে আশার প্রভাব (১ম কাণ্ড), সন্তোষলাধন, হর্ষ, মনোবৃত্তিগণের নৃত্য এবং গঙ্গাবতরণ কাব্য (১ম সর্গ) এই পাঁচটি দীর্ঘ কবিতা আছে। গঙ্গাবতরণ কাব্যটি অতি সুন্দর সনাতন ভাবোদ্দীপক। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ এই

কাব্যটি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রথম সর্গের অধিক আর লেখেন নাই। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই গ্রন্থটির সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন "মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভাবুক, রসজ্ঞ, এবং সুলেখক; তাঁহার রচনা পাঠে সহৃদয়বর্গের তৃপ্তি জন্মিয়া থাকে। আমরা 'কাব্যকলাপ' পাঠে আনন্দানুভব করিয়াছি।"

Origin of Language. (ভাষাতত্ত্ব)

এই সময়েই, অর্থাৎ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মে মাসে রাজকৃষ্ণ কটক ডিবেটিং ক্লাবে ইংরাজি ভাষায় আর একটি বক্তৃতা দেন। উহার বিষয় Origin of Languge বা ভাষাতত্ত্ব। কয়েক বৎসর পরে 'বঙ্গদর্শনে' ১২৭৯ চৈত্রে রাজকৃষ্ণ এই বিষয়টিই আরও বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমরা সেই প্রবন্ধটির বিচার করিবার সময় এই বিষয়ের আলোচনা করিব বলিয়া এক্ষণে এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে বিরত হইলাম।

Hindu Mythology. (হিন্দু দেবতত্ত্ব)

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ৩১শে জুলাই রাজকৃষ্ণ কটকে আর একটি বক্তৃতা দেন। উহার বিষয় ছিল Hindu Mythology। আমরা এই প্রস্তাবটি দেখিবার সুযোগ পাই নাই। সম্ভবতঃ উহাতে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই পরে 'বঙ্গদর্শনে' ১২৮১-২ সালে 'দেবতত্ত্ব' নামক প্রবন্ধে বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন।

রাজবালা

কটকে অবস্থানকালে রাজকৃষ্ণের আরও একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এখানি কাব্যগ্রন্থ নহে—ইতিহাসমূলক আখ্যায়িকা 'রাজবালা'। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আশ্বিন মাসে উহা প্রকাশিত হয়।

রাজকৃষ্ণের জন্মস্থান গোস্বামী-দুর্গাপুর নামক গ্রামের পত্তন সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে তাহাই এই আখ্যায়িকার আখ্যানবস্তু। যখন বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশ-নন্দিনী, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি অভিনব আদর্শে রচিত উপন্যাসাবলী প্রকাশিত হইয়া গিয়াছিল, তখন এরূপ গ্রন্থ প্রকাশের আবশ্যকতা ছিল কি না প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু এ কথা স্মর্তব্য যে যেখানে সঠিক ইতিহাসের উপকরণ দুর্লভ, সেখানে এরূপ কিম্বদন্তী রক্ষা করার মূল্য আছে এবং বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখক এই আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ করিয়া—একটি নূতন পথ দেখাইয়া—ভালই করিয়াছিলেন।

রাজকৃষ্ণের এই প্রথম গদ্যরচনার কিছু নিদর্শন দিই—

"আশা, তোমার কি মোহিনী শক্তি! তুমি মরীচিকাবৎ বারম্বার ছলনা কর, তাহাতেও তোমার প্রতি লোকের বিশ্বাস যায় না। তুমি দূরস্থ পদার্থপুঞ্জ এমন সুন্দর বর্ণে চিত্রিত কর, যে তাহারা জনমনোহররূপে নিরন্তর নরচিত্ত আকর্ষণ করে। সুখলোভে সকলে তোমার অনুবর্তী হয়, কিন্তু কয়জনে বাঞ্ছিত ফল পাইয়া থাকে? তুমি আলেয়ার ন্যায় মাঝে মাঝে দীপ্তি দান কর, কিন্তু যে তোমার অনুসরণ করে, তাহাকে কত গর্ত্তে, বিলে বা জলাভূমিতে পড়িতে হয়। সঙ্কটে মরণাপন্ন লোকদিগকে তুমি কত প্রবোধ দেও, কত নূতন পথের কথা কহিয়া থাক, কত নূতন দেশের প্রফুল্ল মুখ দূর হইতে দেখাও; কিন্তু কতবার তাহারা পরিশেষে তোমার প্রতারণা বুঝিতে পারে। হয়ত কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই এমন অন্ধকারে পতিত হয়, যে সে স্থান হইতে আর কোন পথ দেখিতে পায় না। অথবা যে বস্তু লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিল, তাহা একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। কিম্বা নির্দ্দিষ্ট প্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখে, যে কুসুমপুঞ্জের উদ্দেশে আসিয়াছিল তাহা কীটে পরিপূর্ণ, যে সুধার জন্য এত যত্ন করিয়াছিল তাহা হলাহলে জড়িত।

"কিন্তু, আশা, তাই বলিয়া তোমায় নিন্দা করি না। সংসারে এত দুঃখ যে তুমি সাহস দিয়া দূরে সুখের চিত্র না দেখাইলে জীবন অসহ্য হইয়া উঠিত। যেখানে সম্পূর্ণ অন্ধকার, সেখানে আলেয়ার আলোও ভাল। যখন নিশাকান্তে গগনমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হয়, যখন তারকাকুল ভয়াকুল হইয়া নেত্র নিমীলিত করে, যখন শশাঙ্ক আতঙ্কে অন্তর্হিত হন, যখন দশদিক্ নিবিড় তিমিরে আবৃত হইয়া অকূল, অতল নদী সাগরের ন্যায় দেখায়, তখন যে চপলার ক্ষণপ্রভাও পথহারা পথিকের একান্ত বাঞ্ছনীয়, তাহার আর অণুমাত্র সংশয় নাই।"

রাজকৃষ্ণের মনোহর রচনা-পদ্ধতির নিদর্শন অধিক দিবার স্থান নাই, কিন্তু যদি কোনও পাঠক এই 'সেকেলে'

আখ্যায়িকা মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন তাহা হইলে অনেক স্থলেই গ্রন্থকারের রচনাশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন।

বহরমপুরে আইন অধ্যাপক

বঙ্গগৌরব স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুরের আইন-অধ্যাপকের কার্য্য ত্যাগ করিয়া কলিকাতার আসিলে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ১৪ই ফাল্গুনারি রাজকৃষ্ণ দুইশত টাকা মাসিক বেতনে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন। অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া তিনি ওকালতী করিবারও অনুমতি পাইয়াছিলেন। এখানে এবারে তিনি প্রায় ছয় মাস ছিলেন। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে স্থানান্তরিত হন এবং সম্ভবতঃ এই স্থানেই বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার আজীবনব্যাপী প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়।

পাটনায় দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপনা

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই রাজকৃষ্ণ পাটনা কলেজে তিন শত টাকা বেতনে দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি কটকে অবস্থানকালে উড়িয়া ভাষা, বহরমপুরে সংস্কৃত এবং পাটনায় উর্দ্দু, পারসী ও হিন্দী ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। তিনি আজীবন ছাত্রের ন্যায় অধ্যয়নশীল ছিলেন।

Theory of Morals (নীতি-তত্ত্ব)

পাটনায় অবস্থানকালে রাজকৃষ্ণ তাঁহার ছাত্রগণের নিকট Theory of Morals বা নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি ইংরাজী বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাটি, কটকে প্রদত্ত Origin of Language নামক বক্তৃতার সহিত একত্র মুদ্রিত হইয়া ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শিক্ষাবিভাগের অলঙ্কার স্বরূপ, সুপণ্ডিত স্যামুয়েল লব্ তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়া লিখিয়াছেন: "I am glad that like your master Hume, you pay as much attention to style as to matter." অর্থাৎ তুমি তোমার গুরু হিউমের ন্যায় রচনাতে প্রতিপাদ্য বিষয়ের ন্যায় মনোযোগ দিয়াছ দেখিয়া আমি প্রীত হইয়াছি।" এই লব সাহেবের নিকট স্যর গুরুদাস প্রভৃতিও দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইনি কোম্‌তের শিষ্য ছিলেন এবং ধ্রুবদর্শন এবং অন্যান্য দার্শনিক বিষয়ে ইঁহার কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। ইনি কিছুকাল কৃষ্ণনগর ও হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত না হইলে ইনি শিক্ষাবিভাগের অনেক সংস্কার সাধিত করিয়া যাইতে পারিতেন।

দামোদরের বিপত্তি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ

নবম পরিচ্ছেদ

নারাণবাবুর উপদেশ

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিতে দামোদরের দেরী হইয়া গেল। দু-একজন ছাড়া সবাই দেরীতেই উঠিল। উঠিয়া দেখিল ৯টা বাজে। তাহার সঙ্গীরা—শচীন, নগেন ও রমেশ তখনও ঘুমাইতেছে। সে উঠিয়া বাহিরে গিয়া মুখ ধুইয়া আসিল। তার পর কি করিবে তাহার একটা তালিকা মনে মনে ঠিক করিতে লাগিল। এবেলায় ত' আর নারাণবাবুর দেখা পাইবার উপায় নাই। বিকালেই যাবে; সন্ধ্যার পর। আপাততঃ একবার চারুবাবুকে সমস্ত বলিয়া একটা পরামর্শ করিলে হয় না? না—দরকার নাই। চারুবাবু এখনি সে সমস্ত প্রচার করিয়া দিবেন—দামোদরের লজ্জার আর অবধি থাকিবে না। বরং এক কাজ করিলে হয়। তাহাদের কলেজের কাছে যে চা-এর দোকান ছিল, সেই দোকানের মালিকের সঙ্গে তাহার খুব সদ্ভাব ছিল; তাহার কাছে গেলে কলিকাতার হালচাল্

কিছু জানা যাইবে। সে লোকটি খুব পাকা, পোড়-খাওয়া। আর তাহাকে দিয়া কোনও কথা বাহির হইবার নহে।

দামোদর উঠিয়া গিয়া কাপড় জামা—নগেনের কাপড় জামা—ছাড়িল। নিজের কাপড় জামা পরিল। তা'র পর চারুবাবুর সন্ধানে গেল। চারুবাবু তখন উঠিয়া চা-পান শেষ করিয়া তেল মাখিতে যাইতেছিলেন। দামোদরকে দেখিয়া বলিলেন, "Hallo! দামোদর! কা'ল কি রকম হো'ল?"

দামোদর উত্তর দিল, "আপনারই দয়া, চারুবাবু।"

চারুবাবু সোৎসাহে বলিলেন, "দয়া কি দামোদর? ওটা তোমার পাওনা। যাক্, দু' একদিন থাক্‌বে ত? এখন কি করা হো'চ্ছে? ঘেঁষেতেই আছ?"

দামোদর জবাব দিল "দু-তিন দিন থাক্‌তে পারি। দেশেই ছিলুম। কিন্তু ভাল লাগলো না। এইখানে এসেছি তাই। দেশের স্কুলেই মাষ্টারি কর্ত্তুম।"

চারুবাবু তেলের বাটিতে হাত দিয়া বলিলেন, "বেশ করেছ। ভিলেজ্ লাইফ্ একটু আধটু ভাল, দামোদর,—বরাবর থাক্‌লে হাঁফিয়ে উঠ্‌তে হয়। আমি তাই ন'মাসে ছ'মাসে বাড়ি যাই। ছেলেপিলেরা, সংসার সব বাড়িতেই থাকে বটে; কিন্তু আমার আর যাওয়া ঘটে উঠে না। আর ও-সব সংসার ছেলেপিলে মাঝে-মাঝেই ভাল। সর্ব্বদা কাছে থাক্‌লে কি বাঁচ্‌তুম। উঃ! এ কেমন আছি, নির্ব্ঝাটে, বল দেখি।"

দামোদর সায় দিল, "তা'তে আর সন্দেহ। বেশ আছেন। এঁরাও সব দিব্য ছেলে, চারুবাবু। আমাদের চেয়ে এঁরা খোলা প্রাণ, আমুদে, সরল।"

চারুবাবু একটু হাসিলেন। তা'র পর আস্তে আস্তে দামোদরকে বলিলেন, "সব গাধা, দামোদর, সব গাধা। সংসারের কিছু জানে না। বাপ মা ছেলেরা কি ক'রে টাকা রোজগার, কিছু ভাবে না। বুঝেছ?' আমি ত সবারই ভিতরের খবর জানি। এর ভিতর আমীরেরও ছেলে নেই, ওমরাহর ছেলেও নেই,—সবই সাধারণ গৃহস্থের ছেলে, কিন্তু দেখেছ বুদ্ধি আর নবাবি সব। এরা সবাই শনি। আমার এ মেস শনিমণ্ডল, দামোদর। লক্ষ্মীছাড়ার বাসা। তবে ওদের নিয়ে চলে ভাল; যদিও মনটা এক এক সময় বড় খারাপ হয়। ওদের ভবিষ্যৎ যে কি তা' ওরা যদি জান্‌তো, তবে আত্মহত্যা করে বস্‌তো। ভগবান মানুষকে অন্ধ করে কি ভালই করেছেন; ভাগ্যে কেউ ভবিষ্যতের কথা জান্‌তে পারে না, দামোদর!"

দামোদরেরও মনে কথাগুলি বড় দাগ রাখিয়া গেল। সে ত ভাবিয়াছিল ইহারা সবাই ধনীপুত্র; না হলে এত সমারোহ, এত অর্থব্যয় কি করিয়া করে? কিন্তু ইহাদের অবস্থা কাহারও বিশেষ ঐশ্বর্য্যশালীর মত নহে; অথচ অপরিণামদর্শিতায় ইহারা এইরূপ করে। দামোদর ভাবিল, যাহা হউক, ইহাদের প্রাণ আছে। ইহাদের মন বেশ উদার; ইহারা আত্মসর্ব্বস্ব বা আত্মম্ভরী নহে। ভগবান ইহাদের ভাল নিশ্চয়ই করিবেন। চারুবাবুকে বলিল, "আমি একটু ঘুরে আসি।"

চারু বাবু উত্তরে কহিলেন, "নিশ্চয়ই যাবে। বেড়াতে এসেছ, বেড়াবে না? এ তোমার নিজের ঘর-দোর, দামোদর। এখানে তোমার কোনও সঙ্কোচ নেই, তুমি যত-দিন ইচ্ছা থাক। বুঝেছ? নগেন্‌কে বলে নেব'খন আমি।"

দামোদর ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া নামিয়া গেল। মেসবাড়ি হইতে সুরেন বাবুর চা-এর দোকান বেশী দূর নহে। দামোদর রাস্তা দেখিতে দেখিতে চলিল। অনেক দিন পরে কলিকাতা তাহার কাছে নূতন বোধ হইল। দু'একবার মোটর-গাড়ির হর্ণ তাহার পিছনে এত কাছে বাজিয়া উঠিল, যে সে চমকিত হইয়া ৪।৫ হাত সরিয়া গেল। রাস্তায় লোকের ভিড়, গোলমাল, গাড়ির চলাচল তাহার কাছে নূতন বোধ হইল। সে হাঁটিতে হাঁটিতে ৫ মিনিটের স্থানে ১৫ মিনিটে সুরেন বাবুর দোকানে পৌঁছিল।

সুরেন বাবু লোকটির বয়স হইয়াছে। প্রায় ৫০, ক্ষীণ দেহ, লম্বাটে; মাথার চুলগুলি সবই প্রায় পাকিয়াছে। একটি গেঞ্জি গায়ে, চটিজুতা পায়ে দিয়া দোকানের সামনে একখানি টুলে বসিয়া ছিলেন। তাঁর সাম্‌নেই লোহার একটি বড় উনানে, একটা মস্ত বড় লোহার কেট্‌লী বসান আছে; তাহা হইতে ধূম নির্গত হইতেছে। দোকানটি লম্বে হাত দশেক, প্রস্থে হাত ৮ হইবে। মধ্যে একটা লম্বাটে ধরণের সস্তা কাঠের টেবল্; উপরে অয়েলক্লথ মারা; টেবলের দু'দিকে দু'খানি লম্বা বেঞ্চ। ইহারই ভিতর আবার একটি কোণে একটা ছোট টেবল; তাহার উপরে একটি পুরান দোয়াত, একটা কলম, ও একখানা লম্বাটে

খাতা, হিসাবের ও ধারের। দেওয়ালের গায়ে একটা আলমারি বসান আছে; তাহাতে চা-এর কপ্, সসার, চা এক্ টিন, চিনির শিশি, চামচে খান ৪।৭; মুরগীর আণ্ডা; ও মস্ত বড় ২।৩ টা এনামেলের বাটি: ১ খানা কড়া; একটা ফ্রাই প্যান; একটা তেলের বোতল; ও একটি ঘিয়ের শিশি ও ২।৩ টা আরও ছোট ছোট শিশি, মরিচ গুঁড়া, লঙ্কা গুঁড়া, নুন প্রভৃতি রাখা আছে। সুরেন বাবু দামোদরকে দেখিয়া বলিলেন, "এ কি! দামোদর বাবু যে! কি সৌভাগ্য! কবে এলেন? আসুন, বসুন। চা দেব না কি?"

দামোদর হাসিয়া বলিল, "কাল এসেছি, সুরেন বাবু। দিন এক কপ্ চা—বহু দিন আপনার দোকানের চা খাওয়া হয় নি। তার পর, কেমন আছেন? কি রকম চল্‌ছে?" দামোদর ভিতরে একখানি বেঞ্চে বসিল। সুরেন বাবু কেট্‌লির ঢাক্না তুলিয়া দেখিয়া, কেট্‌লী নামাইলেন। ভিতর হইতে একটি চা-দানী আনিয়া তাহাতে চা দিলেন ও জল দিলেন। উনানে খানকতক কয়লা ফেলিয়া দিলেন। তার পর চা-দানি লইয়া ছোট টেবলের উপর রাখিয়া, আলমারির ভিতর হইতে একটি কপ্ ও একখানি সসার লইয়া দামোদরের সম্মুখে রাখিলেন। পরে কোথা হইতে মরিচা-পড়া একটা ছাক্নি ও দুধের একটা গেলাস বাহির করিয়া, দামোদরকে চা' দিলেন। সব ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া বলিলেন, "আর জিজ্ঞাসা করেন কেন? বড়ই মন্দা পড়েছে, দামোদর বাবু। বাজার বড়ই খারাপ যাচ্ছে। আজকাল কি আর চা খাইয়ে আছে? সব ছোক্‌রারা আজকাল দেখে দোকানের আস্‌বাব। বড় বড় আয়না চাই, টেরি বাগবার জন্যে, মুখ দেখবার জন্যে। সৌখীন কাপ চাই; পাথর বসানো টেবিল চাই; বেতের চেয়ার চাই, হেলান দিয়ে বস্‌বার জন্যে। ভাল ভাল সুন্দর সুন্দর ছেলে মানুষ দেখে ছোক্‌রা চাই; তা না হইলে আর চায়ের দোকান চলে না। আর আপনাদের কাল নেই, দামোদর বাবু।"

দামোদর সুরেন বাবুর অবস্থা শুনিয়া, নূতন নূতন সমস্ত কারবারের ব্যবস্থা শুনিয়া ঘমিয়া গেল। সুরেন বাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে কি না বুঝিতে পারিল না। বলিল, "বলেন কি?"

সুরেনবাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় একটি লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, "কৈ, বাবু, কেকের দাম দিন!"

সুরেনবাবু উত্তর দিলেন, "কেকের দাম? সেই সন্ধ্যেবেলায়। এখন মাত্র দোকান খুলেছি; এখন দাম কোথায় পাব?"

লোকটি মুখ ভার করিয়া বলিল, "রোজই এই কয়ছেন। সকালে এলে বলেন সন্ধ্যেতে, সন্ধ্যেতে এলে বলেন সকালে। এ কি রকম? এটা কি ভদ্রতা?"

সুরেনবাবু মাথা চাপড়াইয়া বলিলেন, "ভদ্রতা আর বজায় রাখি কিসে, বাবা? রাখ্‌বার উপায় কি রেখেছে কিছু? দিন ত ১২।১৪ কাপ্ চা' বেচি; তা' থেকে তোমাকে কি দিই, বাড়িওয়ালাকে কি দিই, আর ডিমওয়ালাকে কি দিই, চা, চিনি, দুধই বা কোথা থেকে কিনি, আর নিজেই বা খাই কি? ভদ্রতা রাখার 'ত একটা ব্যবস্থা চাই হে!"

লোকটি হাঁ করিয়া শুনিল। তা'র পর বলিল, "দোকান তুলে দিন না তা'র চেয়ে। জিনিসপত্র বেচে, দেনা শুধে অন্য রাস্তা দেখুন। কেন ক্রমশঃ ডুবছেন?"

সুরেনবাবু তিক্তকণ্ঠে বলিলেন, "এ বয়সে আর ঘরের বাড়ির রাস্তা ছাড়া অন্য রাস্তা নেই, বাবা। তাই পড়ে আছি।"

লোকটি শীঘ্র একটা ব্যবস্থা করিতে বলিয়া চলিয়া গেল। দামোদর ব্যথিত হইয়া সুরেনবাবুর দিকে চাহিয়া দেখিল। সুরেনবাবু বলিলেন, "এই 'ত ব্যবসার অবস্থা, দামোদরবাবু। আর কি বল্‌বো?"

দামোদর কহিল, "তাই 'ত! সুরেনবাবু, বড় সমস্যার কথা। আপনার মত একজন বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ লোক—পাকা লোক—যদি এমন করে ডুবতে পড়ে, তবে আর কা'রও আশা নেই।"

সুরেনবাবু বলিলেন, "না! দামোদরবাবু! দিন দিন দেশের অবস্থা যে কি দাঁড়াচ্ছে তা' বলা যায় না। এই দোকানে একদিন আমি রোজ ১০।১৫ টাকা বিক্রি করেছি; আর আজ ১০।১৫ পয়সা বিক্রি কর্ত্তে পারি না। কি করে সংসার চালাই, আর কি ক'রে দোকান রাখি বলুন 'ত?"

সুরেনবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া দামোদর উত্তর দিল, "তাই ত!"

সুরেনবাবু বলিলেন, "তাগাদায় অস্থির হয়েছি। এখানে এই ডিমওয়ালা, কেকওয়ালা, বাড়িওয়ালা; বাড়িতে স্ত্রী ছেলেমেয়ে সবাই কেবলই চাইছে—পয়সা দাও। আরে বাপু, পয়সা কি মনে হয়? আকাশ থেকে পড়ে? আমি কি গাছ পেয়েছি পয়সার? না পিশাচসিদ্ধি লাভ করেছি? বলবো কি,মশা'য়, সবাই ভাবে যেন পয়সা আমার হাত ঝাড়লেই পড়ে। এ দুনিয়াতেও মানুষে থাকে!"

দামোদর ব্যাপার সুবিধা নয় দেখিয়া উঠিল। সুরেনবাবুকে পকেট হইতে ৵০ পয়সা বাহির করিয়া দিয়া বলিল, "এখন যাই, সুরেনবাবু, একটু কাজ আছে। বিকালে আবার আসবো; না হয় কাল সকালে।"

সুরেনবাবু পয়সা চারটি ট্যাঁকে গুঁজিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই আসবেন। ভাগ্যে এসেছিলেন, তাই বউনি হো'ল আজ। সকাল থেকে ৵০ আনার কয়লা পুড়ে গেল; খদ্দের একটাও নেই। সবাই কি চা-খাওয়া বন্ধ করলে কি, কিছু বুঝতে পারি না। একটা খদ্দেরও এ পথ মাড়ায় না। হো'ল কি দেশ? ক্রমশঃ ভদ্রলোক কমে যাচ্ছে, লোপ পাচ্ছে। তা' না হ'লে চা খায় না।"

দামোদর দোকান হইতে বাহির হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল, ভাবিল—কি কুগ্রহ। সে আবার সুরেনবাবুর কাছে পরামর্শ লইতে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার সুরেনবাবুর জন্য সত্যই অত্যন্ত দুঃখ হইল। লোকটা ২।৩ বছরের ভিতরই যেন একেবারে জরাগ্রস্ত হইয়াছে। দু'বছর আগেও তাহার মনে স্ফূর্তি, উৎসাহ ছিল; দেহে চাঞ্চল্য ছিল। আজ যেন তাহার সে সমস্ত একেবারে গিয়াছে।

মেসে ফিরিয়া দামোদর দেখিল তাহার সঙ্গী তিনটি তখনো শুইয়া আছে। ঘুম ভাঙ্গিয়াছে বটে, তবে উঠিতে কাহারও আগ্রহ নাই। তিন জনেরই বিছানার কাছে চায়ের কপ্ দেখিয়া বুঝিল শুইয়াই সব চা পান করিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া শচীন বলিল, "দামোদর বাবু, আপনি ত খুব early-riser, এত সকালে উঠে কি করেন?"

দামোদর বলিল, "সকাল মানে ১১টা।"

নগেন কহিল, "১১টা? বলেন কি? আমার যে ১১টায় (ইতিহাস) History class! বাক্; বাঁচা গেল। আর ২ ঘণ্টা ছুটি; তা'হলে আর একটু আরাম করা যেতে পারে। ২ ঘণ্টা মানে সেই ১৩০টা।"

রমেশ বলিল, "ইতিহাসকে আর বর্ত্তমান করিস্ নি, নগেন,—ওটা past tense-ই (অতীতকাল) থাকুক্। দামোদর বাবু, এখন বলুন, খবর কি? আপনি কি সত্যই সন্ন্যাস নেবেন? কি স্থির কোরলেন?"

দামোদর উত্তর দিল, "প্রায় তাই মনস্থ করেছি। আমার সংসারে বিরাগ হয়ে গেছে। তবে এখনও নিশ্চিত কিছু বলতে পারি না।"

নগেন্ উঠিয়া বসিল; জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? স্ত্রীর প্রণয় নেই বলে? কুছ্ পরোয়া নেই; স্ত্রী চাই না। সংসারে স্ত্রী ছাড়াও ত স্ত্রীলোক আছে, তবে? সবাই পয়সা পেলে স্ত্রীর মত ব্যবহার কর্ব্বে; কিছু ভাব্‌বেন না। শ্বশুরের জন্য? শ্বশুরকে ত্যাগ করুন। বাপের জন্য? নেচার মাইন্ড! বাপ্ আর কিছু এখানে আসচে না। তবে এখানে আপনার কোনও বিরাগ কর্ব্বার জিনিস নেই। এইখানেই থাকুন। সন্ন্যাসের কাজ হবে।"

শচীন বলিল, "যেমন নগেন। দেখ্ নগেন, তুই সকাল বেলাতেই লেক্‌চার সুরু করিস্‌নি। ঐ ভয়ে কলেজে গেলুম না; আর তুই তাই সুরু কোর্‌লি এখানে।"

দামোদর উত্তর দিল, "এখানে থাকলে ত অর্থের দরকার। টাকা চাই; কাজ কর্ম্ম করতে হবে। তার কি ব্যবস্থা? তা' ছাড়া, আমার নিজের জন্য দাসত্ব করা, চাকরি করার কোনও দরকার নেই—বাহুল্য মাত্র।"

শচীন বলিল, "সন্ন্যাসে যদি যান্, আমাকে নিয়ে যাবেন, দামোদর বাবু, আমারও সংসারে আর মতি নেই।"

নগেন ধমক্ দিল "শচীন্, তোর বাবাকে পথে বসাবি? সে কার জন্যে ওকালতি করে টাকা জমাচ্ছে? তুই একেবারে বেহেড হয়েছিস্! সন্ন্যাসী হয়ে যাবার টাকা-গুলো জলে দিবি না কি?"

রমেশ বলিল, "দামোদর বাবু, টাকা রোজগার করার উপায় আমরা বলতে পারি না; খরচ করার পথ অনেক দেখাতে পারি। তবে শুনেছি টাকা লোকে রোজগার করে। দেখুন চেষ্টা করে। এখানে ত' অনেক স্কুল, আফিস আছে; খোঁজ করুন, যদি নিতান্তই কোনও পথ

না পান, তখন সন্ন্যাস নেবার ব্যবস্থা কর্ব্বেন। সন্ন্যাস ত হাতের পাঁচ। ভারতের ইতিহাসে বিষয় ত্যাগ কর্ত্তে সবাই বলেছে; কেন জানেন? কা'রও বিষয় রাখ্‌বার বুদ্ধি নেই, বিষয় কর্ব্বারও নেই।"

দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাদের জানা-শুনা লোক এমন কেউ আছেন, যিনি কাজ-কর্ম্ম কর্ত্তে একটু সাহায্য কর্ত্তে পারেন? কোনো একটা টিউসনি জুট্‌লেও চলবে।"

কেহই কোনও খবর দিতে পারিল না। নগেন বলিল "খোঁজ করে রাখো। তবে কোন ভরসা ত দেখি না। ছেলেরা আর পড়তে চায় না দামোদর বাবু। আর চাকরি? তা'র চেয়ে রামের স্বর্ণমৃগ বেশী real.। ও-সব মতলব ছাড়ুন। সন্ন্যাসই নিয়ে ফেলুন। ও একটা মস্ত বড় ব্যবসা, জমাতে পারেন—ত' মোহান্ত। বলেন ত আমিও সঙ্গে যাই। কিরে রমেশ, যাবি? শচীন যাবে না, ওর বাবার পয়সার মুখ চেয়ে ওকে চিরকাল বি-এ পড়্‌তে হবে ও চার-বাবুর বেসে থাকতে হবে।"

রমেশ উত্তর দিল, "আচ্ছা দামোদর বাবু, আপনি চেষ্টা করুন রোজগার কর্ত্তে, না হয়, শেষে আমরাও আপনার সঙ্গে সন্ন্যাস নেব। ঐ ব্যবসা মন্দ নয়। আমি দেখেছি বটে!"

তিনজনের কেহই সেদিন কলেজে গেল না। ১২টার পর উঠিয়া সব স্নানাহার করিয়া আবার শয়ন করিল। এবার দামোদরও ঘুমাইয়া পড়িল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, দেখিল বেলা পড়িয়াছে। তাহার সঙ্গীরা কেহই নাই; সবাই উঠিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। শচীনের টাইম-পিসে ৫।০টা বাজিয়া গিয়াছে। সে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিল, চা-এর টেব্‌ল আজ প্রায় খালি হইয়া গিয়াছে। দু'একজন মাত্র বসিয়া আছে। সে চা' পানের বিশেষ আগ্রহ অনুভব করিল না; তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল;—নারাণ বাবুর সহিত দেখা করিতে হইবে।

মির্জাপুর হইতে রতনচাঁদ গার্ডেন লেন বহু দূর। তাহার উপর কলিকাতার সমস্ত গলী দামোদরের জানা ছিল না। কাজেই খোঁজ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতে তাহার অনেক বিলম্ব হইল। যখন সে নারাণবাবুর বাড়ির ঠিকানায় পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। অনেক করিয়া নম্বর বাহির করিল। ১, ২, করিয়া বাড়ি গুণিয়া গিয়া দেখিল ১০, ১১, তা'র পর ৩১, ১২, বাদ; একেবারে ১৪, ১৫, প্রভৃতি; ১২।১৩'র কোনও সন্ধান নাই; শুধু ফাঁকের স্থানে একটি অপ্রশস্ত ১½হাত ২ হাত অন্ধকার গলি মাত্র। ১৪ নম্বরের একটি ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করায় সে হাসিয়া গলির ভিতর দেখাইয়া দিল। দামোদরের প্রবেশ করিতে ভয় হইল। ছেলেটি তামাসা করিল না কি? কিন্তু ভাল করিয়া পুনরায় সব দেখায়, তাহার মনে হইল যে সম্ভবতঃ ১২।১৩ নম্বর গলির ভিতরই হইবে। অন্যত্র যাইবার উপায় নাই। সে সাহস করিয়া গলির ভিতর প্রবেশ করিয়া নারাণবাবুর নাম করিয়া উচ্চ স্বরে ৪।৫ বার ডাকিল।

মিনিট ৫।৭ কোনও সাড়া শব্দে উত্তর আসিল না। দামোদর দাঁড়াইবে কি প্রস্থান করিবে মনে মনে বিতর্ক করিতেছে, এমন সময় উপর হইতে কে বলিল, "যাচ্ছি!" তাহার ২।৩ মিনিট পরে একটি কেরাসিনের ডিব্‌রি হাতে করিয়া নারাণবাবু খালি গায়ে শুধু পায়ে আসিয়া দেখা দিলেন। প্রথমটা দামোদরকে দেখিতে পান নাই; জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?"

দামোদর উত্তর দিল, "আমি দামোদর!" নারাণবাবু নিকটে আসিয়া দেখিয়া তবে চিনিলেন। বলিলেন, "ওঃ! তুমি! এসো! এসো!"

দামোদর তাঁহার পদানুসরণ করিয়া বাড়ির ভিতরে পা' দিতে গিয়া পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল। ভিতরটা বাহিরের গলির রাস্তা হইতে প্রায় দেড় হাত নীচু। প্রবেশ করিয়া একটু গিয়া একটা অন্ধকারময় ছোট উঠানে পড়িল। ডিবরির আলোতে দেখিল বাড়িটির ইট্ বাহির হইয়া পড়িয়াছে নহে, ইটের উপর ইহার আর কোন কালেই কিছুর প্রলেপ পড়ে নাই। সেকেলে ইট, ছোট ছোট। একটা দুর্গন্ধপূর্ণ নর্দ্দমা পার হইয়া একখানি ছোট অন্ধকার ঘরের সাম্‌নে ডিব্‌রিটি রাখিয়া নারাণবাবু বলিলেন, "ভিতরে বসো। আমি চট্ করে হ্যারিকেন লণ্ঠনটা নিয়ে আসি। তক্তপোষ পাতা আছে, দেখে বসো।" বলিয়াই নারাণবাবু অন্ধকারে অদৃশ্য হইলেন।

দামোদর ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া একখানি তক্তপোষ ক্ষীণালোকে দেখিতে পাইয়া তদুপরি বসিল।

তাহার মন নিরুৎসাহ হইয়া গেল। অতবড় ভকতরামের অন্তরঙ্গ সঙ্গী, অত ক্ষমতা প্রতিপত্তিশালী, নারাণবাবুর বাড়ির ও জীবনযাত্রার যেটুকু পরিচয় পাইল, তাহাতে তাহার আর বিশেষ আশা ভরসা হইল না। সে ভাবিতে লাগিল যে এমন করিয়া বিশেষ জানাশুনা না করিয়া আসা উচিত হয় নাই। এখন আসিয়াও পলাইতে পারে না। অথচ তাহার বসিয়া থাকিতেও প্রবৃত্তি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইল। এমন সময়ে একটি ১৭।১৮ বৎসরের মেয়ে আসিয়া, ডিব্‌রিটি উঠাইয়া এক হাতে লইল, ও অপর হাতে একটি হ্যারিকেন বাতি লইয়া আসিয়া তাহার সেই ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া, হ্যারিকেনটা তাহার পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া সে ডিব্‌রি লইয়া চলিয়া গেল। দামোদর শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; ভাল করিয়া তাহার দিকে চাহিতেও পারে নাই। কিন্তু তা'র বুকটা খুব জোরে স্পন্দিত হইল। মেয়েটি চলিয়া গেলে সে দাঁড়াইয়াই রহিল, বসিতে পারিল না।

একটু পরেই নারাণবাবু নামিলেন; গায়ে একটা টুইলের সার্ট আর পায়ে একজোড়া তালি দেওয়া চটি জুতা। আসিয়াই চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এঃ! না, এ মেয়েটাকে দিয়ে কোন কাজ হয় না! একটা কথাও যদি বুঝ্‌তে পারে! লণ্ঠনটা এইখানে বসিয়ে দিতে আছে! একটু সরিয়ে দরজার কাছে রাখ্‌লে বাইরেটা সুদ্ধ আলো হয়!"

তার পর দামোদরকে বসিতে বলিয়া নিজে বসিল। দামোদর কি রকম হইয়া গিয়াছিল; কিছুই যেন বুঝিতে পারিতেছিল না। সে অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বসিয়া পড়িল। নারাণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর, বল? আমার 'ত সারা দিন ভকতরাম বাবু'র কাজে ঘুরে ঘুরে আর কিছুরই সময় হয় নি। তোমার কথা একেবারে ভুলে গিছ্‌লুম হে। তা' তুমি কোথায়ও গিছ্‌লে? কা'রও সঙ্গে দেখা করেছ?"

দামোদর উত্তর দিল, "আমি 'ত কাহাকেও চিনি না। এমনি গেলে কেউ হয় 'ত কথাই বল্‌বে না। তাই আপনার কাছে আসা।"

নারাণবাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "সে কথা ঠিক্। কেরাণী হলে কি হয় সব, একেবারে যেন লাটসাহেব। এক কথা পাঁচবার জিজ্ঞাসা কর্লে তবে জবাব পাওয়া যায়। তা' এখন 'ত ২।৪ দিন থাক্‌বে? যখন চেষ্টা কর্ত্তে এসেছ কাজের, চেষ্টা না করে কি যাবে?"

দামোদর জবাব দিল, "না। ২।৪ দিন দেখ্‌বো বৈ কি।"

নারাণবাবু বলিল, "ভকতরামবাবুকে ধরে বলে দেখ্‌বো। তার সঙ্গে বড় বড় বাড়োয়ারির আলাপ আছে যথেষ্ট; এই ধর না ধুধুরিয়া, যা'দের তিনটে কাপড়ের মিল; হালুয়াইয়া, তা'দের একচেটে হিসির আর গালার কারবার, ক্রোরপতি; ঝুন্‌ঝুনওয়ালা, তা'দের পয়সা খায় কে, ছাতা পড়ে যাচ্ছে। সবাইকেই ভকতরামবাবু জানে; বেশ খাতির আছে। বলে কহে তোমার একটা কাজ জুটিয়ে দেওয়া তেমন শক্ত নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, তুমি কি কাজ জান? ব্যবসাপত্র কিছু কোনও দিন দেখ নি। তোমাকে দিয়ে বাজার যোয়াও হবে না; দোকানেও বেচা বা কথা বলা পার্ব্বে না তুমি; খাতাপত্রও রাখ্‌তে পার্ব্বে না, কেন না মহাজনী জান না। সুতরাং কোর্ব্বে কি? এতটা কাল বৃথাই কাটিয়েছ।"

দামোদর কহিল, "শিখে নিতে হবে। চেষ্টা কর্লে কি পার্‌বো না? খুব কি শক্ত? আপনি একটু দেখিয়ে দেবেন।"

নারাণবাবু জবাব দিল, "শক্ত বৈ কি। তবে এক কাজ 'ত ভেবে দেখ্‌ছি, তুমি পার্ত্তে পার। তোমায় যা' শিখিয়ে দেব বল্‌তে পার্ব্বে? এই মনে কর না, যেন আমাদের কারবারে কিছু টাকার দরকার। কেমন? তোমাকে আফিসে বসিয়ে রাখ্‌বো। আর আমি বাইরে থেকে সব মহাজন নিয়ে আস্‌বো। তা'রা এসে কথাবার্ত্তা কইবে। তোমাকে আমি দেখিয়ে তা'দের বল্‌বো, যে ওদামে, ধর, ৫০০০ মণ তিসি আছে; তা' বিক্রি করা চাই। কি দর দেবেন? তুমি বল্‌বে, অমুক দর। আমি বল্‌বো, না, এই দরে দিতে হ'বে। তুমি নিমরাজী হবে; এইরকমে দরদস্তুর শেষ হলে, তুমি বল্‌বে আগাম চাই অর্দ্ধেক আর বাকী মাল দিলে শোধ করা চাই; আগাম কিছু টাকা নেবে।" কর্ত্তে পার্‌বে? দেখ্‌বে টাকা রোজগারের শেষ থাক্‌বে না। ভকতরামকে বড় লোক কর্লে কে? এই শর্ম্মা। এই রকম ক'রেই। বুঝেছ?

চাকরি ক'রে আর কি হবে? আর চাকরি পাবেই বা কোথায়? বরং চল আমার সঙ্গে ২।৪ দিন বাজারে ঘুরে দেখ; তার পর এসো তোমাতে আমাতে লেগে যাই। কিছু পয়সা হাতে এলে বাস্, আর কে পায়? কেমন, রাজী আছ?"

দামোদর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শুনিতেছিল। নারাণ-বাবুর কথা শুনিয়া বলিল, "ভেবে দেখি। বড় ভয়ের কথা! এ একেবারে পুরা জুয়াচুরি; কি ক'রে কোর্ব্ব?"

নারাণবাবু তক্তপোষ চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "জুয়াচুরি? জুয়াচুরি কি এতে আছে? তুমি বাজারের কিছু জান না তাই বল্‌ছো। চল তোমাকে আমি সব কাল দেখাবো। তুমি কাল এস, নিশ্চয়ই এসো, ৯টা-১০টার মধ্যে। তোমাকে দেখিয়ে দেব, যে বাজার কিসের উপর চল্‌ছে। হাওয়া, হাওয়াতে চল্‌ছে, দামোদর! ব্যবসায়ে জুয়াচুরি নেই।"

নারাণবাবু হাঁফাইয়া পড়িল। চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মানদা, একটু তামাক দিয়ে যা।"

একটু চিন্তা করিয়া দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "অন্য কোন কিছু কাজ কি পাওয়া যাবে না?"

নারাণবাবু ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, "অন্য কাজ? তা'রও চেষ্টা করা যাবে'খন। তোমাকে সবই দেখাবো। কি জান, তোমার উপর আমার কেমন স্নেহ পড়ে গেছে। সংসারে আমার থাকবার মধ্যে এক স্ত্রী ও একটিমাত্র মেয়ে। ঐ যে যেটি লণ্ঠন রেখে গেল না, ওটি আমার মেয়ে মানদা। ভাল ছেলে পাইনি বলে ওর বিয়ে দেওয়া হয়নি। আমি যা'র তা'র হাতে ত একমাত্র মেয়েকে দিতে পারি না। সে ওকে বিবাহ কর্ব্বে, তা'কে আমি টাকাকড়ি ত দেবই, এই বাড়ীখানিও সেই পাবে পরে। এটা আমার পৈতৃক বাড়ি; তাই ছেড়ে যেতে পারিনি। কেমন মায়া বসে গেছে যে। প্রাণ ধরে এর উপর চুণবালি দিয়েও একে বদ্‌লাতে ইচ্ছে করে না। তা'হলে পিতৃপুরুষ সব বিরক্ত হবেন। বুঝেছ? তাই এখানেই রয়েছি। না হলে বড় বাড়ি করে আনিও চৌরঙ্গীতে থাকতে পারি। সে ক্ষমতা আমার আছে, বুঝেছ, দামোদর! এ নারাণ নিজির কম পয়সা রোজগার করে নি! বিশ্বাস নয় তোমাকে ব্যাঙ্কের খাতা দেখাবো। তখন বুঝতে পারবে। ব্যবসা না কোর্‌লে কি এ সব হো'ত?"

মানদা তামাক সাজিয়া আনিল। তাহার পরিধানে এক মলিন কাপড়। তামাক আনিয়া সে তাহার বাপের হাতে দিল। নারাণ হুঁকা লইতে লইতে বলিল, "এই আমার মেয়ে, দামোদর। দেখ দেখি, এ মেয়েকে কি আমি যা'র তা'র হাতে দিতে পারি? আমি যে রকম ছেলে চাই, ঠিক সেই রকম নাহলে, ওর বিয়ে দেব না প্রতিজ্ঞা করেছি। আর ওর কোষ্ঠীতে কি আছে জান? ও রাজরাণী হবে। যা'র বাড়ি যাবে, তা'কে রাজা কর্ব্বে। ও জন্মে পর্য্যন্ত আমার অর্থের বরাত খুলে গেছে। বুঝেছ? এমন সুলক্ষণা মেয়ে আর পাবে না।"

দামোদর ভাল করিয়া মানদার দিকে না তাকাইলেও, চাহিয়া যেটুকু দেখিল তাহাতেই বুঝিল, মানদা সুন্দরী বটে, বেশ সুন্দরী। তবে তাহার ভিতর লজ্জা বা সঙ্কোচের চিহ্নমাত্র নাই। বেশ সহজ ও সতেজ সবটা—মুখশ্রী ও চলন। পিতার হাতে হুঁকা দিয়া সে চলিয়া গেল।

নারাণ দু'চারবার হুঁকায় টান্ দিয়া বলিল, "দেখ, দামোদর, তোমার উপর আমার স্নেহ হয়ে গেছে। তুমি আমার কথামত কাজকর্ম্ম কর, দেখ্‌বে তোমায় আমি বড়লোক ক'রে দেবই। আর কি জান? যখন তোমার জন্যে এতটাই এগিয়েছি, তখন খুলেই বলি মনের কথাটা। আমার ইচ্ছা তোমার হাতেই মানদাকে দেব, বুঝেছ? তুমি ঠিক আমার মনের মতন। একালের ডেঁপো ছেলেদের মত কাজিল নও; বক্কার নও; বেশ শান্ত, ধীর। এই রকম ছেলেই চাই। তুমি ভেবে দেখ। মানদাকে ত' দেখলে। নিতান্ত কুৎসিত নয়; তোমার অযোগ্য নয়? না? বেশ বিয়ে থা' করে এইখানে থাক্‌বে, কাজকর্ম্ম কোর্‌বে, দশজনের একজন হবে। কেমন? আমার সবই তোমার হবে।"

দামোদর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়া উঠিতে পারিল না। সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। নারাণ বলিল, "এখন যাও, তবে। অনেকদূর যেতে হবে। সেই নির্ম্জাপুরের মেসেই উঠেছ ত? তা' ভাল। কাল ৯।১০টার ভিতরেই এসো। আর যা' বল্‌লুম ভেবে দেখো।"

দামোদর সম্মতি জানাইল। নারাণবাবু আবার

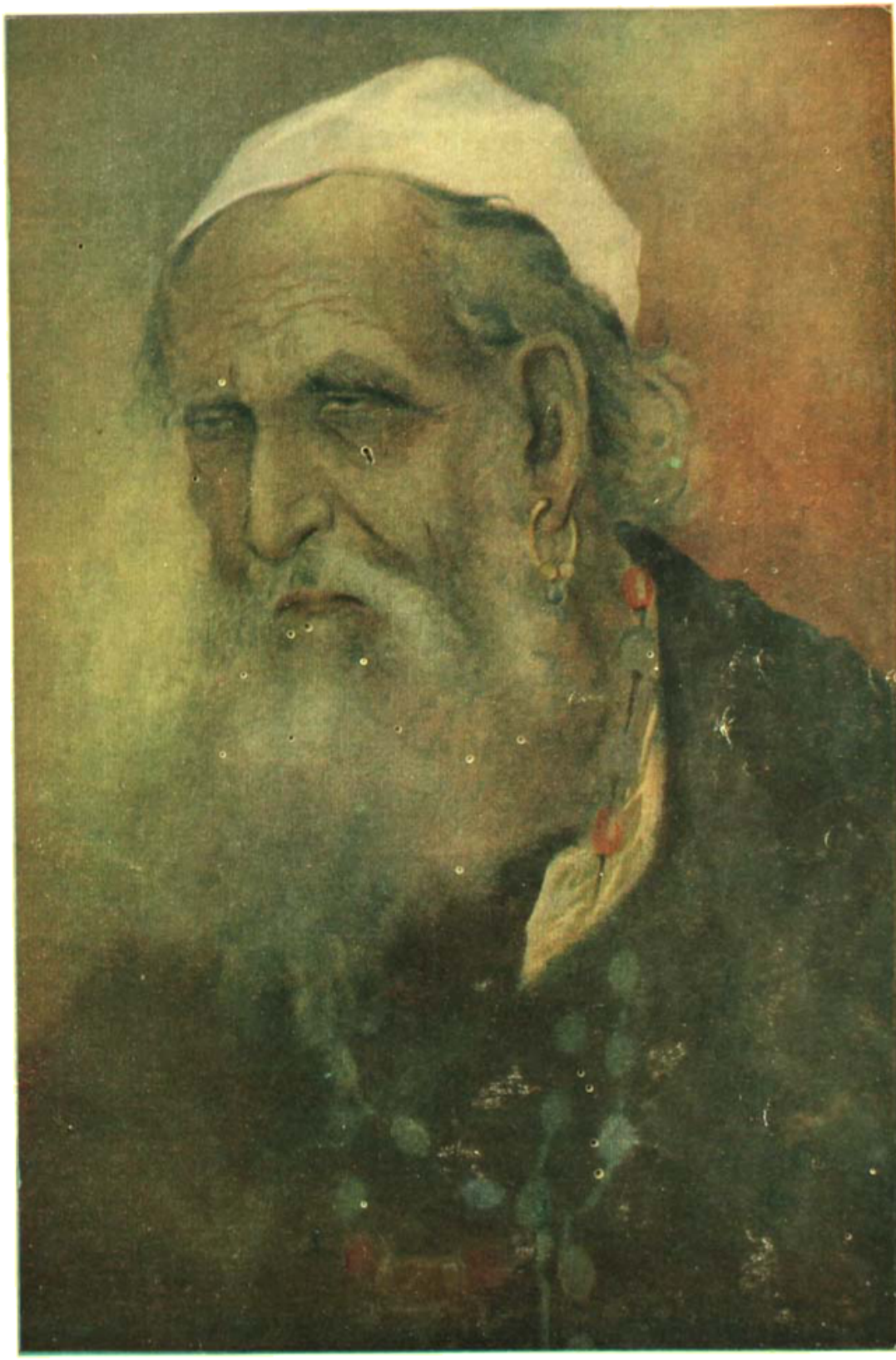

ফকির

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার
প্যারাট অথরমেন্ট আর্ট স্কুল

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

মানদাকে ডাকিয়া বলিল, "মানদা, দামোদরকে আলো দেখিয়ে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আয়।"

মানদা আলো আনিতে যাইতেছিল, নারাণবাবু বলিল, "এই লণ্ঠনটাই নিয়ে যা।"

মানদা লণ্ঠন লইয়া প্রস্তুত হইল। দামোদর উঠিয়া তাহার পিছনে পিছনে চলিল। দরজার কাছে মানদা দাঁড়াইল; দামোদর তাহার কাছে আসিতে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। মানদা স্থির আয়ত চোখে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল মাত্র। দামোদর তাড়াতাড়ি দরজা পার হইয়া গলিতে পড়িল। গলির শেষে যখন আসিয়াছে, তখন নারাণবাবুর বাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ পাইল।

দশম পরিচ্ছেদ

"হাতটা একবার গুণাইতে হইবে"

সদর রাস্তায় পড়িয়া দামোদর দ্রুতপদে চলিল। তাহার বুকের দুরু দুরু তখনও থামে নাই। তাহার মনের ভিতর ভয় ও আশা দুই একত্র দেখা দিল। নারাণবাবুর কথা কিছু বুঝিবার উপায় নাই। যে অবস্থায় থাকেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে চৌরঙ্গীতে বাড়ী করা ও বাস করা সম্ভব বলিয়া দামোদরের মনে হইল না। না হয় পৈতৃক ভিটার মায়াই হইল; কিন্তু তাই বলিয়া কি একটা ঝি, চাকরও রাখিতে নাই? তবে হয় ত লোকটা কৃপণ। বিস্তর উপায় করিয়াছে—করা কিছু বিচিত্র নয়,—বিশেষতঃ লোক ঠকাইয়া—; আর সমস্তই জড় করিতেছে। একটি পয়সার খরচ সম্ভব সহ্য করিতে পারে না। কাহার জন্য জড় করিতেছে? যে উহার মেয়েকে বিবাহ করিবে,—তাহার জন্যই। নিশ্চয়ই তাই। মানদা যে তাহার স্বামীকে রাজা করিবে, তাহা নারাণবাবুরই অমান টাকা দিয়া। দামোদরের ক্রমশই স্থির ধারণা হইল যে—নারাণবাবু কৃপণ, ভয়ানক কৃপণ! শুধু পরের জন্য, জামাই-এর জন্য টাকা জমাইতেছে। কিন্তু হঠাৎ তাহার উপরই বা নারাণবাবুর এত স্নেহ পড়িল কেন? অবশ্য সে দেখিতে কুশ্রী নহে। কিন্তু টাকা থাকিলে ত যথেষ্ট সুপাত্র পাওয়া যায়। হয় ত' ভবিতব্যতা! কিন্তু সে কি করিয়া বিবাহ করিবে। তাহার ত' স্ত্রী বর্ত্তমান; আবার সে কি করিয়া দুইবার বিবাহ করিবে? কিন্তু তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তাহার পিতা বাহাদুর ত' দুইবার বিবাহ করিয়াছে। সেও করিতে পারে। বিশেষতঃ যখন রাধারাণীকে ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু তাহার সংসারে আর আসক্তি নাই। সংসার আর সে করিবে না। চাকরি যদিও করে, শুধু নিজের অভাব মিটাবার জন্যই করিবে। তাহার অধিক কিছুর দরকার নাই। তাই ত'? অথচ এই যে নারাণবাবুর প্রস্তাব—এটা দৈবের দান ত'? একসঙ্গে সুন্দরী স্ত্রী—মানদা সুন্দরীই,—আর ঐশ্বর্য্য, এ তাহার হাতে আসিয়া পড়িতেছে কি করিয়া? ভাগ্য দিতেছে। ভাগ্যের দান অবহেলা করা কি উচিত? না; একবার হাতটা একজন ভাল গণৎকার দিয়া কাল গুণাইতে হইবে। দেখা ভাল, ভাগ্যে কি আছে। তাহা হইলে আর মনে কোনও দ্বিধা থাকিবে না। আনমনে ভাবিতে ভাবিতে দামোদর প্রায় লালবাজারে আসিয়া পড়িল। তখন তাহার চমক্ হইল। তাই ত'! আবার কতটা ঘুরিতে হইবে। একজন চীনা ছুতার দোকানে দেখিল ৯টা বাজিয়াছে। সে ভাবিল, ট্রামে যাইবে। লালবাজার হইতে ট্রামে চড়িয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছিতে বড় জোর ১২ মিনিট লাগিবে—১০ মিনিটও লাগিতে পারে। সেখান হইতে মেস ৭ মিনিট; আর দেরী করা উচিত নহে। দামোদর ট্রামে করিয়াই ফিরিল। তাহার মনের ভিতর নারাণবাবুর কথাগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সে একসঙ্গে দৈবের এতগুলি উপহার কি করিয়া অস্বীকার করিবে? করাটা কি ভাল হয়? জীবনে সুযোগ একবারমাত্র আসে; দুইবার আসে না।

যখন মেসে ফিরিল, মেসে তখন আহারাদি হইতেছিল। একদল খাইয়া উঠিয়া গিয়াছে; আর একদল বসিয়াছে। দামোদর সেই দলে বসিয়া আহারাদি সারিয়া লইয়া একেবারে ত্রিতলে নগেনদের ঘরে গেল। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, নগেন ও রমেশ চারি খানা বাঙলা ও ইংরাজি খবরের কাগজ জড় করিয়া পড়িতেছে। আর শচীন বিছানায় শুইয়া গান গাহিতেছে:—

"যদি বারণ কর তবে আসিব না—আ—আ—
যদি সরম লাগে, তবে চাহিব না—আ—আ—"

দামোদরকে দেখিয়া নগেন বলিল, "দামোদরবাবু,

এসেছেন? আপনার জন্যে আমরা কাজ খুঁজছি কি রকম দেখুন!"

দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "কি? বিজ্ঞাপন? কর্ম্মখালি?"

নগেন বলিল, "হাঁ। অনেক কাজ খালি আছে। একটা লেগে যাবেই; আপনাকে আর সন্ন্যাস নিতে হবে না। আসুন এই দিকে। খাওয়া হয়েছে 'ত?"

দামোদর তাহার পাশে বসিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল খাওয়া হইয়াছে।

নগেন বলিল, "এই দেখুন, একটা। "একজন বীমার কাজে দক্ষ ক্যানভাসার চাই; বেতন ৭৫৲ হইতে ১৫০৲ যোগ্যতা অনুসারে।" কেমন এটা হবে না? এ'ত আর শক্ত কিছু নয়; লোককে গিয়ে বলা যে তুমি লাইফ্ ইনসিওর কর। বস্। লোকে করেই থাকে। পার্ব্বেন না? আমি ও রমেশ না হয় আগেই আপনার খদ্দের হবো।"

দামোদর জবাব দিল, "ঠিকানাটা রেখে দিই। একখানা দরখাস্ত করা যাবে।"

নগেন বলিল, "ঠিক্। আর একটা কোথায় দেখ্‌লুম্? শচী'কে দেখুম একটু দাগ্ দিয়ে রাখ্‌তো' ও কুঁড়ের বাদ্‌শা; যদি কোনও কাজ ওকে দিয়ে হবে? এইটে বুঝি? না। দূর! এ যে ছাই লেডি টাইপিষ্ট চায়। এটা? না, এ নার্স। এইটে নিশ্চয়; না, এ আবার কা'র আয়া বাই! জ্বাল জ্বালাতন! ঐ কাগজে বুঝি, রমেশ?"

রমেশ তাহার কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, "না, এতে কিছু নেই। এটা রদ্দি কাগজ। কেবল ইঞ্জিনীয়র তিনটা, ২টা ওভারসিয়র, ৪টা লেডি ক্যানভাসার ও দু'জন কেরাণী ও ম্যানেজার চায়, ৫০০৲ ও ৫০০০৲ টাকা জমা দিতে হবে। কা'রা বোগাস্ কোম্পানী খুলে টাকা মারবার ফিকিরে আছে।"

নগেন রাগিয়া গেল। বলিল, "তবে কিসে দেখলুম ছাই? শচেটার আলায় কি কোন serious কাজ কর্ব্বার যো' আছে। ঐ বাঙ্গলা কাগজখানা দেখি! হাঁ, এইটাই 'ত? এই যে, একজন সুদক্ষ ও সুসাহিত্যিক সঙ্গী চাই। তাহাকে প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করিতে হইবে। ইংরাজিতে উত্তমরূপ দখল অবশ্যই থাকা চাই। বেতন ১০০৲ হইতে ২০০৲ যোগত্যা অনুসারে।" এইটাই ঠিক হবে, দামোদরবাবু। এর বাড়ির ঠিকানাও আছে, "১০। নং পার্ক ষ্ট্রীট্।" ও বাবা! এ যে পার্ক ষ্ট্রীট্। খুব বড় লোক হবে! রাজারাজড়া না হয়ে যায় না। "সাক্ষাতের সময় সকাল ৯টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত।" এইখানেই যান্ কাল, ৯টার পর। বলেন ত আমরা না হয় সঙ্গে গিয়ে আপনাকে এগিয়ে দেব, সেই রাজবাড়ির দরজা পর্য্যন্ত। কেমন?"

দামোদর বলিল, "আচ্ছা। কাল যাবো।" কিন্তু তাহার মন কেমন সায় দিল না। ৯।১ টার সময় নারাণবাবুর সহিত দেখা করার কথা আছে। কি করিয়া আবার ১টার ভিতর পার্ক ষ্ট্রীটে যাইবে? রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার সার্টিফিকেট, প্রশংসাপত্র, এই সব আছে 'ত?"

দামোদর জবাব দিল, "না। ও সব 'ত কিছুই নেই।"

নগেন বলিল, "তবেই হয়েছে। এতদিনে আর খানকতক প্রশংসাপত্রও জোগাড় কর্ত্তে পারেন নি? তাই 'ত!"

শচীন বলিল, "যোগ্যতা অনুসারে বেতন, ত' প্রশংসা-পত্র কি হবে? কি যোগ্যতা গিয়ে দেখালেই হবে। উনি 'ত কবি ও সাহিত্যিক বটেই।"

নগেন উত্তর দিল, "দেখ্ শচী, তুই বাজে বকিস্‌নি। প্রশংসাপত্র না হলে চাকরি হয় না। কনে না হলে বিয়ে হওয়া বরং সম্ভব, কিন্তু প্রশংসাপত্র না হলে চাকরি অসম্ভব। জানিস্ কিছু? চাকরি করেছিস্?"

শচীন বিরাগের উদাসসুরে বলিল, "না।"

রমেশ কহিল, 'যখন নেই, তখন আর উপায় কি। একখানা দরখাস্ত লিখে নিন্ এই বেলা। আপনার লিখ্‌তে ত বেশী সময় লাগ্‌বে না। কাল সকালে উঠে হয় ত সময় পাওয়া যাবে না। দে'ত, নগেন, কাগজ কলম।"

দামোদর বলিল, "থাক্। কালই হবে!"

নগেন উত্তর দিল, "কাল সকালে সময় হবে না। আটটায় সব বেরুতে হবে। এইবেলা লিখে নিন্, দামোদর বাবু।" নগেন কাগজ কলম আনিয়া দিল। বাধ্য হইয়া দামোদরকে লিখিতে হইল।

লেখা শেষ হইলে, রমেশ, নগেন ও শচীন একে একে তিনজনে পড়িয়া দেখিল। রমেশ বলিল, "লিখেছেন

ভাল। তবে জোর হয়নি তেমন। অনেকগুলো বেশী "respectfully" "beg" " humbly" "state" হয়ে গেছে। অতটা নীচু হওয়া কি ভাল ?"

শচীন কহিল, "নীচু না ত কি উঁচু হ'য়ে যাবে ? আরও বেশী করে দেওয়া দরকার। বাবার সব আদালতের দরখাস্ত দেখেছি যে প্রত্যেক "sentence" এ (বাক্যে) লেখা আছে, "your humble petitioner" আর respectfully"। এ আবার চাকরি। এতে শুধু humbly, "respectfully obediently, your most obedient servant, এই কথাগুলোই উল্টেপাল্টে লিখে গেলেই দেখ্‌তিস্ ঠিক কাজ লেগে যেতো। তা'র ওপর যদি সত্যিই রাজা মহারাজা হয় তবে your Highness your respec ful and most exalted Highness, এই সব লেখা উচিত ছিল। না পেয়ে হয়ত চটে যাবে। তখন শুধু হাতে ফিরতে হবে।"

নগেন বলিল, "একটু আধটু বদ্‌লে দিতে পারেন না, দামোদর বাবু ? একটু লিখে দিন না যে আপনার ইংরাজি বাঙ্‌লা কবিতা আছে। আর একটু জোর দিয়ে বলুন, যে চাকরিটা আমার ঠিক উপযুক্ত। আর ঐ যে "I shall spare no pains in giving you satisfaction (আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব) লিখেছেন ওটার বদলে লিখুন "I am sure you will be satisfied with my services" বুঝেছেন ?

রমেশ কহিল, "না ; দরকার নেই। ও বাঁধা গৎ-ই ভাল, বাবু। সবাই বুঝে ওর কোনও মানে হয়না। মানে-ওয়ালা কথা দিয়ে শেষে অনর্থ বাধবে। ঐ বেশ হয়েছে। বরং শচী যা' বলেছে, ফাঁক পান ত আর ২।৩টা "humbly" "respectfully" ঢুকিয়ে দিন। একেবারে বিনয়ে ভরাট্ হ'য়ে যা'ক্। পাকা দাসখত্ হওয়াই ভাল।"

দরখাস্ত লেখা হইলে, চার জনেই নিশ্চিন্ত হইল। নগেন বলিল, "এ চাকরি হওয়াই, দামোদরবাবু। তা' হলে কালই আবার feast—প্রকাণ্ড ভোজ !"

রমেশ একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু, দামোদর বাবু, আপনার ত জামা কাপড় তেমন নেই।"

দামোদর উত্তর করিল, "এই পরেই যাবো। বেশী ভাল জামা কাপড় পরে যাওয়াও ঠিক নয়। চাকরির উমেদারিই ত।"

কথাটা সকলের যুক্তিযুক্ত মনে হইল। সকলে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিকমত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া নিশ্চিন্তমনে বাড়ি নিভাইয়া শয়ন করিল। দামোদরের ঘুম আসিতে দেরী হইতে লাগিল। সে ভাবিল যে নগেন, রমেশ, শচীন যে রকম তাহাকে লইয়া উৎসাহী হইয়াছে, তাহাতে তাহারা নিশ্চয়ই সকালে তাহার সঙ্গে পার্ক ষ্ট্রীট যাইবে। তাহা হইলে তাহার আর নারাণ বাবুর বাড়ি যাওয়া হইবে না। নারাণবাবু কিছু মনে করবেন না ত ? সে পরে সব কথা শুনিয়া বলিবে না হয়। সে ইচ্ছা করিয়া ত আর কথার খেলাপ করিতেছে না। বরং কাল একবার একজন ভাল জ্যোতিষী দেখিয়া হাতটা গুণাইয়া লইবে। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে তাহার ভাগ্যে কি আছে,—সন্ন্যাস না রাজত্ব ?

(ক্রমশঃ)

প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়

শ্রীহরিহর শেঠ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নানা কথা

প্রথম নোটের প্রচলন—বেঙ্গল ব্যাঙ্কের স্বত্বাধিকারী জাকব হাইভার ও এডওয়ার্ড হের নামে প্রথমে ব্যাঙ্কের নোট চলিত। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের স্বত্বাধিকারীদের স্বাক্ষরযুক্ত পাঁচশত, একশত, পঞ্চাশ; টাকা ও এক মোহরের নোট সাধারণে প্রচলিত হয়।

* * * *

সেকালের লাট দর্শনের ব্যবস্থা—তখনকার দিনে যে কোন ভদ্রশ্রেণীর প্রজা লাট-সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া

জেনারেল সর জন্ এডায়ার্ট

তাহার অভাব অভিযোগ নিজেই জানাইতে পারিত। এজন্য সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইত।

* * * *

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কোম্পানীর অধিকৃত সম্পত্তি—সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের পর ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে ইঞ্জিনীয়ার ও সার্ভেয়ার প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা মিলিয়া কোম্পানীর অধিকৃত বাটীগুলির নিম্নলিখিত রূপ মূল্য নির্দ্ধারণ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন—

দুর্গ ও তাহার মধ্যবর্ত্তী গৃহগুলির মূল্য ১২০০০০৲

ক্লাইবের মর্ম্মর মূর্ত্তি

হাঁসপাতাল

আস্তাবল সমূহ

জেলখানা	৭০০০৲
সোরার গুদাম	৭০০০৲
কাছারি বাটী	১৫০০৲
কোতোয়ালি হাজত	১০০০৲
দুইটী গোল	৭০০০৲

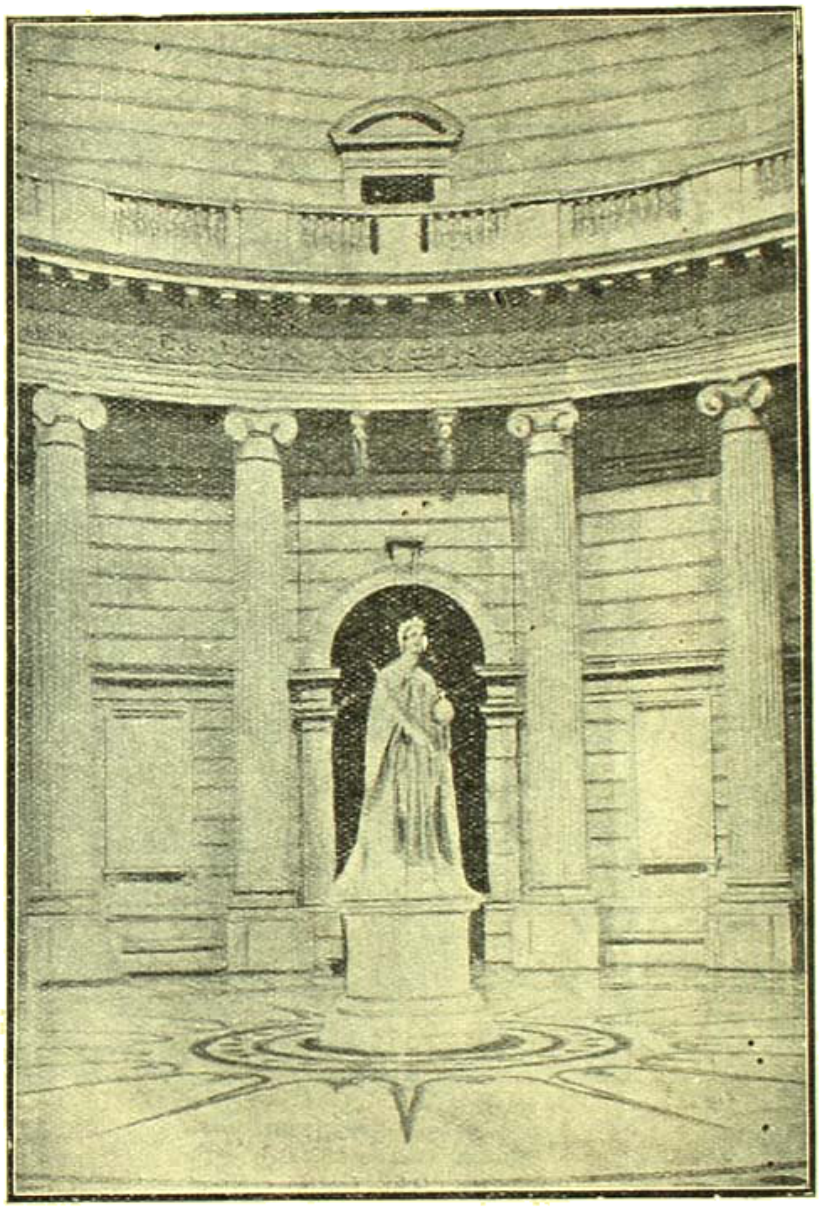

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তি

ছিটে প্রস্তুতকারকের বাটী	৬০০০৲
বারুদখানা	৬৯২৫৲
ডক ও তৎসংলগ্ন গৃহাদি	৭০০০৲
মাল গুদাম	২৫০০০৲
বাগবাজারের রিডাউট্ বা রক্ষামঞ্চ	২১০০০৲

কোম্পানীর দেবতা ব্রাহ্মণে আস্থা—কোম্পানী কর্ত্তৃক সময় সময় কালীঘাটে কালীর পূজা দেওয়ার কথা যেমন জানা যায়, ব্রাহ্মণদের বাৎসরিক দানের কথাও সেইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।

• • • •

রাত্রে চৌকী দিবার ব্যবস্থা—প্রথম প্রথম বক্সী ও পাইক্‌ম্যান্ (সড়কীধারী) বলিয়া পাহারাওয়ালারা পাহারা দিত। কোম্পানী ইহা উঠাইয়া দিয়া চৌকী দিবার জন্য গোরা পুলিসের ব্যবস্থা করেন। তাহারা রাত্রি ১০টা হইতে

চোবদার

ভোর পাঁচটা পর্য্যন্ত সহরের চারিদিকে পাহারা দিত। যাহাতে গুপ্তচর প্রভৃতি সহরের ভিতর প্রবেশ করিতে না পারে সে জন্য নদীতীর ও সহরের মধ্যে প্রবেশদ্বার গুলিতে কঠোর পাহারার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

• • • •

কোম্পানীর আমলে সম্ভ্রান্ত অতিথিদের সিধা দেওয়ার ব্যবস্থা—সেকালে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কোম্পানীর আতিথ্য

গ্রহণ করিলে তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীগণের সিধা দিবার ব্যবস্থা ছিল। আবশ্যক মত মূল্যবান উপঢৌকনও দেওয়া হইত। একবার নবাব মীরজাফর ও তাঁহার সঙ্গীগণকে নিম্নের তালিকা মত সিধা দেওয়া হইয়াছিল—

দ্রব্যের নাম	পরিমাণ	মূল্য
চাউল	৪০/ মণ	৭৫৲
দাউল	৮/ ,,	২০৶০
ঘৃত	৫/ ,,	৭৭৲
তৈল	৬/ ,,	৫১৲
লবণ	৩৷০ ,,	৪৶০

লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রতিমূর্ত্তি

ময়দা	৮/ ,,	২৭৲
চিনি	৫/ ,,	৩৬৷০
মিষ্টান্ন	৬/ ,,	৬০৲
নোয়াকা	১/ ,,	১২৲
বাদাম কিশমিশ	১/ ,,	৩১৷০
খাসি	৫০টা	৫০৲
শাকসব্জী		১৬৲
লেবু		৭৲
মসলা		১৪০৷৶০
পান ও তামাকু		১০৸০
হাঁড়ি ও কাঠ		২৬৲
কুড়ি থলে ইত্যাদি		২৪৲

• • • •

খুনি আসামিকে ধরিয়া দেওয়ার পুরস্কার—১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে দওরাম নাপিত নামক এক ব্যক্তিকে খুনি সন্দেহ হওয়ায় যে তাহাকে হাজির করিয়া দিতে পারিবে সকাউন্সিল্ গবর্ণর জেনারেল্ তাহাকে দুই শত সিক্কা টাকা

লর্ড লিটন্

(ব্যঙ্গ চিত্র—The Indian Charivari হইতে)

পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় তখনকার দিনে পুলিশ হইতে না হইয়া গভর্ণর জেনারেল সাহেবের দপ্তর হইতেই এসব কার্য্য হইত। এবং খুনিকে ধরিয়া দিবার পুরস্কার মাত্র দুই শত সিক্কা টাকা।

• • • •

কোম্পানীর রেশম ও সুতার কারখানার অবস্থা—১৭৫৫

খৃষ্টাব্দে নিম্নলিখিত আড়ঙ্গগুলির দাদনী হইতে কোম্পানীর তৎকালীন ব্যবসার অবস্থা বুঝা যায়। সেকালের সেরেস্তায় যেরূপ অদ্ভুত বানান লেখা আছে সেই মত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শান্তিপুর	(Santipore)	৯৩৫৯২৶/১৫
হরিপাল	(Harrypaul)	৮৫৪৪৩৯১০
ধনেখালি	(Dorneacally)	৩৮৫৩৩৶৫
গলাগোড় (?)	(Gollagore)	৩৮৫১৮৶/১০
কাটোরা (?)	(Cuttorah)	৫১৪০০৸/১০
বুরণ (?)	(Burron)	৮২২৬১৲৪
হরিয়াল (?)	(Hurriall)	২২৪১১০।৵/৫
বুদল (?)	(Budoul)	৭৯৪৮৩৸৵/১০
ক্ষীরপাই	(Keerpye)	১৬২৫৭০৮০

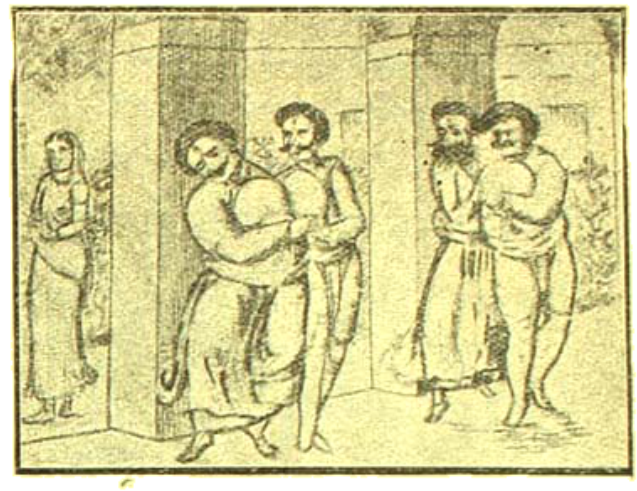

ভারি ভারি নেমলোকদা সাথ নাচনে হোগা.
কসম্ কর্ত্তা (বসন্তক হইতে)

স্যর রিচার্ড টেম্পল্
(ব্যঙ্গ চিত্র—The Indian Charivari হইতে)

মেজর জেনারেল্ স্যর এফ্, ডব্লু, নরম্যান
(ব্যঙ্গ চিত্র—The Indian Charivari হইতে)

মালদহ	(Malda)	২৬৪০৭৵১০
কলিকাতা	(Calcutta)	৪২৪০০৲
বরাহনগর	(Barnagore)	৭৮০১১৵০
সোণামুখী	(Soonamokie)	২২০২৮৵১০

গলাগোড়, কাটোয়া, হরিপাল কোন স্থানগুলি তাহা ঠিক করা যায় না। উহা বলাগড়, কাটোয়া ও হরিপাল হওয়া বিচিত্র নহে। বুরণ ও বুদল এ দুইটী স্থানকে এখন নির্ণয় করা কঠিন।

উলা Railway. শান্তিপুর

শান্তিপুর ভাবে, এস নব পাশে, দিব মনোনত শাড়ী।
উলা বলে দত, শত নানামত, দিব পুরে গাড়ী ॥ (বসন্তক হইতে)

দিবো মহারাণী যমুনা বাইকে হারক বলয় উপহার দেওয়া হইতেছে

(বসন্তক হইতে)

ভোট ভিক্ষা
আমাদের গৌর বুদ্ধী সবে বাটীর দ্বারটি খুলিয়া কি দেখিলেন

দ্বারটি রুদ্ধ করিয়া অগ্নিতে ফুৎকার দিতে পারেন নাই
(বসন্তক হইতে)

প্রথম হিন্দুস্থানী সিপাহী দল—লর্ড ক্লাইভের দলে প্রথম দেশীয়দের মধ্যে মাদ্রাজী ও তেলেঙ্গী সিপাহীই বেশী ছিল; তৎপরে তাঁহারই প্রস্তাবে পশ্চিম দেশীয় ভোজপুরীদের

জন ষ্টক্ হাউস—ফোর্ট উইলিয়মের গভর্ণর

সেনাদলে লওয়া হয়। ইহাই সম্ভবতঃ কোম্পানীর প্রথম হিন্দুস্থানী সিপাহীর রেজিমেণ্ট।

সেকালে কোম্পানীর উপহার দেওয়ার প্রথা—সেকালে ক্ষমতাসম্পন্ন পদস্থ ব্যক্তিদের প্রীতিসাধনার্থ আবশ্যক মত উপহার উপঢৌকন দিবার ব্যবস্থা বেশ ছিল। বর্দ্ধমানের

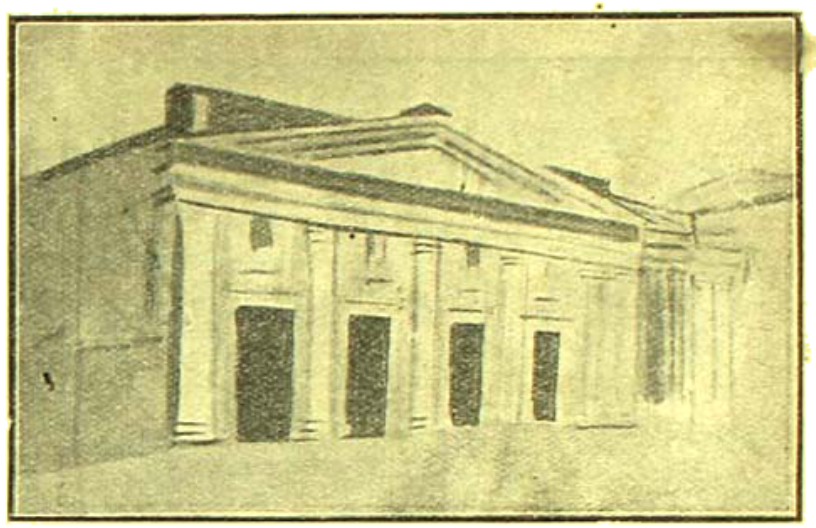

কলিকাতার আদি নাট্যশালা

মহারাজা তিলকচাঁদ বাহাদুরের সহিত কোম্পানীর রাজস্ব সম্বন্ধীয় দেনা-পাওনা লইয়া একটা গোলযোগ ঘটে। ইহার

বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন। ইণ্ডিয়ান লিগ।
ছি ছি ছোট ভাইয়ের সঙ্গে কি ঝগড়া করিতে হয়
(বসন্তক হইতে)

রয়েল একস্‌চেঞ্জ—কথিত আছে লর্ড ক্লাইবের
এবং ফিলিপ ফ্রান্সিসের বাটী

মীমাংসা হইয়া গেলে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা ও তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে নিম্নলিখিত মত উপহার দেওয়া হয়।

উপহারের খাত	উপহারের দ্রব্য	টাকা
রাজা তিলকচাঁদের জন্য	১টী হস্তী	২০০০৲
	১ প্রস্থ পোষাক	৬০০৲
	হীরক-মণ্ডিত শিরপ্যাচ্	৪০০৲

দেওয়ান অমরচাঁদের জন্য	১ প্রস্থ পোষাক	৫০০৲
	১টী অশ্ব	৫০০৲
	১খানি হলোয়ার	৫০৲
	১টী শিরপ্যাচ্	৩০০৲

নবাব মীরজাফর কলিকাতায় আসিলে তাঁহার অতিথি সৎকারের জন্য খাওয়া দাওয়া আমোদ প্রমোদের ব্যয় ছাড়া বিবিধ দ্রব্যাদি উপহার দিতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

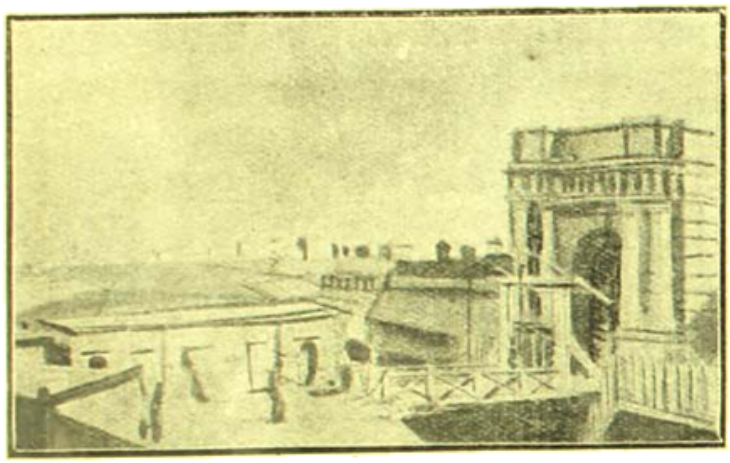

ডুবের নিকট হইতে কলিকাতার দৃশ্য

• • •

তোপে উড়ান প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা—চরম অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদের পূর্ব্বে চাবুকের আঘাতে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইত। উহা জেলের মধ্যে করা হইত। তাহাতে বাহিরের দুষ্ট লোকের মনে ভয়ের উদ্রেক হওয়া বিষয়ে কোন সাহায্য হইত না। এই জন্য কোম্পানীর জমীদারীর মধ্যে চরম অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিকে তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। নয়ান চুতার নামক এক ব্যক্তি প্রথম এই দণ্ড প্রাপ্ত হয়।

• • •

রামচরণ নায়ক	১ প্রস্থ পোষাক	১২৫৲
	১টী অশ্ব	৫০০৲
গোকুল চন্দ্র মজুমদার	১ প্রস্থ পোষাক	২২৫৲
	১টী অশ্ব	৫০০৲
রাজীবেন্দ্র রায়	১ প্রস্থ পোষাক	২২৫৲

কলিকাতার প্রথম ডাক্—কলিকাতা হইতে মুরশীদাবাদ এবং মুরশীদাবাদ হইতে কলিকাতায় ৩০ ঘণ্টার মধ্যে

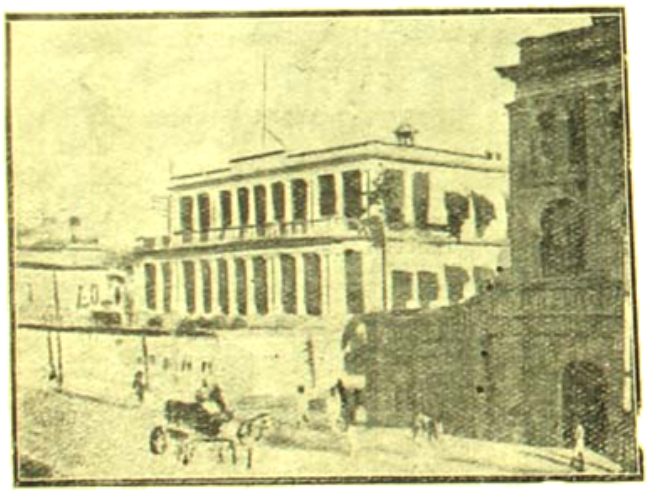

জন পামারের বাড়ী

রাজচন্দ্র রায়, উকীল	১ প্রস্থ পোষাক	২২৫৲
	১টী অশ্ব	৫০০৲
ধনঞ্জয় রায়, উকীল	১ প্রস্থ পোষাক	১৭৫৲
অন্য দুইজন উকীল	৬ জোড়া শাল	৬০০৲

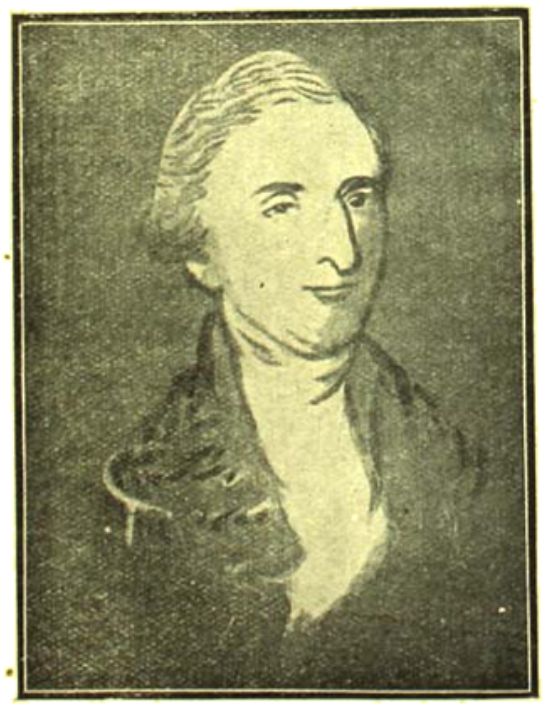

মেজর জেনারেল স্রড্ মার্টিন

সংবাদাদি আসিবার ও যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহাই কলিকাতার প্রথম ডাক-ব্যবস্থা বলিতে পারা যায়!

• • •

এভারেষ্ট পর্ব্বতশৃঙ্গ—হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেষ্ট পর্ব্বতের কলিকাতার সার্ভেয়ার জেনারেল স্যার

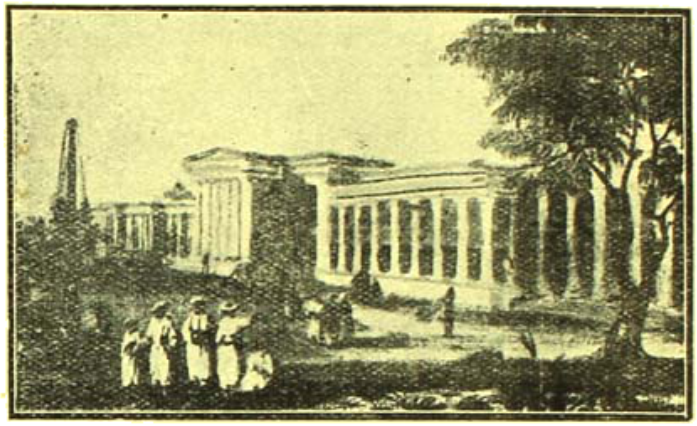

পুরাতন সংস্কৃত কলেজ

জর্জ্জ এভারেষ্টের (Sir George Everest) নামানুসারে নামকরণ হইয়াছে। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী রাধানাথ শিকদার মহাশয়ই গণনা করিয়া উহার উচ্চতা ২৯০০২

পাদরি কিয়ারনান্ডার

ফিট্ স্থির করিয়াছিলেন। রাধানাথবাবু কলিকাতা শিকদারপাড়ার জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তথায় বাস করিতেন।

• •

সেকালের রাজপুরুষ ও অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তিদের প্রতিমূর্ত্তি—কলিকাতার স্থানে স্থানে যে সকল সুন্দর মর্ম্মর ও ধাতুময়ী প্রতিমূর্ত্তি শোভিত আছে, তাহাদের মধ্যে কাহার প্রতিমূর্ত্তি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছে নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইতেছে—

রেভারেণ্ড হেনরী মার্টিন

মহারাণী ভিক্টোরিয়া	মর্ম্মর মূর্ত্তি	ধাতুময়
ওয়ারেণ হেষ্টিংস	মর্ম্মর মূর্ত্তি	টাউন্ হল

বিশপ্ কুরি

লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক	পিত্তল মূর্ত্তি	টাউন্ হলের সম্মুখস্থ ময়দান
স্যর উইলিয়ম পিল্	মর্ম্মর মূর্ত্তি	ইডেন গার্ডেনের সম্মুখে

কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

লর্ড মেটকাফ	পিত্তল মূর্ত্তি	প্রিন্সেপ ঘাটের পূর্ব্বদিকে
লর্ড নর্থব্রুক	ধাতু মূর্ত্তি	গভর্ণমেণ্ট হাউসের দক্ষিণে

অরু ও তরু দত্ত

স্যর জেমস্ আউটরাম্	পিত্তল মূর্ত্তি	পার্ক ষ্ট্রীট ও আউট-রাম রোডের সন্ধিস্থলে
লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড	পিত্তল মূর্ত্তি	ইডেন গার্ডেনের বাহিরে
লর্ড ক্যানিং	পিত্তল মূর্ত্তি	গভর্ণমেণ্ট হাউসের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে

ভারতবর্ষ সমভূম করিবার জন্য নূতন মেক্কেটর রোলার
(বসন্তক হইতে)

লর্ড মেয়ো	পিত্তল মূর্ত্তি	গড়ের মাঠে
প্রসন্নকুমার ঠাকুর	প্রস্তর মূর্ত্তি	সেনেট্ হাউস্
ডেভিড্ হেয়ার	প্রস্তর মূর্ত্তি	প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	প্রস্তর মূর্ত্তি	গোলদীঘির ধার

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের ষ্ট্যাম্প কাগজ

রাজা কালাকৃষ্ণ দেব	প্রস্তর মূর্ত্তি	বিডন্ উদ্যান
কৃষ্ণদাস পাল	প্রস্তর মূর্ত্তি	হ্যারিসন রোড ও কলেজ ষ্ট্রীটের সংসনে

লর্ড হেষ্টিংস্	প্রস্তর মূর্ত্তি	ডালহাউসী ইনস্টিটিউট	জেনারেল রুড্ মার্টিন	ধাতু মূর্ত্তি	ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্
লর্ড নর্থব্রুক্	প্রস্তর মূর্ত্তি	হাইকোর্টের প্রবেশ-পথে।	আরল্ অব্ মিণ্টো	মর্ম্মর মূর্ত্তি	সেণ্ট জন্ চার্চ্চ
			উক্ত সকল ভিন্ন	এসিয়াটিক্	সোসাইটি, বাহুলর,

মাদ্রাসা

এক্সচেঞ্জ ও এসেম্ব্লি রুম

কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন প্রস্তর মূর্ত্তি, বিডন্ উদ্যান
স্যার উইলিয়ম জোন্স প্রস্তর মূর্ত্তি এসিয়াটিক্ সোসাইটি

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্ প্রভৃতি স্থানে বহু প্রতিমূর্ত্তি আছে। শেষোক্ত স্থানে যে সকল প্রাচীন লোকের প্রতিমূর্ত্তি আছে নিম্নে তাহার একটী তালিকা দিলাম—

চাপরাসি

রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর

হরচন্দ্র ঘোষ	প্রস্তর মূর্ত্তি	ছোট আদালত	প্রাচীন লোকের প্রতিমূর্ত্তি—সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড,
লর্ড ক্লাইব	প্রস্তর মূর্ত্তি	ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্	মহারাণী ভিক্টোরিয়া, চার্লস জেম্স্ ফক্স মার্কুইশ্ অব্ হেষ্টিংস, মার্কুইশ্ অব্ ডালহাউসি, জেম্স্ আউটরাম, আর্ল কানিং

ডিউক অব্ ওয়েলিংটন, লর্ড মেট্‌কাফ, থ্যাকারে, জেনারেল নীল আর্ল অব্ অকল্যাণ্ড, লর্ড লরেন্স, জন্ নিকল্‌সন,

সেকালের সরকারি পত্রাদি লিখিবার পোষ্ট কার্ড

হেন্‌রী লরেন্স, ফ্রান্সেস্ মাইটল্যাণ্ড, স্যর উইলিয়ম উইলসন্ হাণ্টার, স্যর হেনরি হার্ডিঞ্জ, মার্কুইস্ ওয়েলেস্‌লি,

কলিকাতা নামের রহস্য—কলিকাতা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ গল্প প্রচলিত থাকিলেও সুতানুটী গোবিন্দপুর ছাড়িয়া কেবলমাত্র কলিকাতা এই নাম ব্যবহারের মধ্যে একটি উল্লেখ ছিল। জব্ চার্ণকের আমাতা স্যর্ চার্ল্‌স্ আয়রের সময়ে ১৭০০ সালের এপ্রেল মাস হইতে কলিকাতা নাম ব্যবহৃত হয়। তৎপূর্ব্বে সুতানুটী এই নামই কোম্পানির সেরেস্তায় ব্যবহৃত হইত। সুতানুটীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কলিকাতা করার গূঢ় রহস্য এই যে, পর্ত্তুগীজরা কালিকটে ভারতের সহিত প্রথম বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া ঐ স্থানের দ্রব্য ভারতীয় দ্রব্য বলিয়া

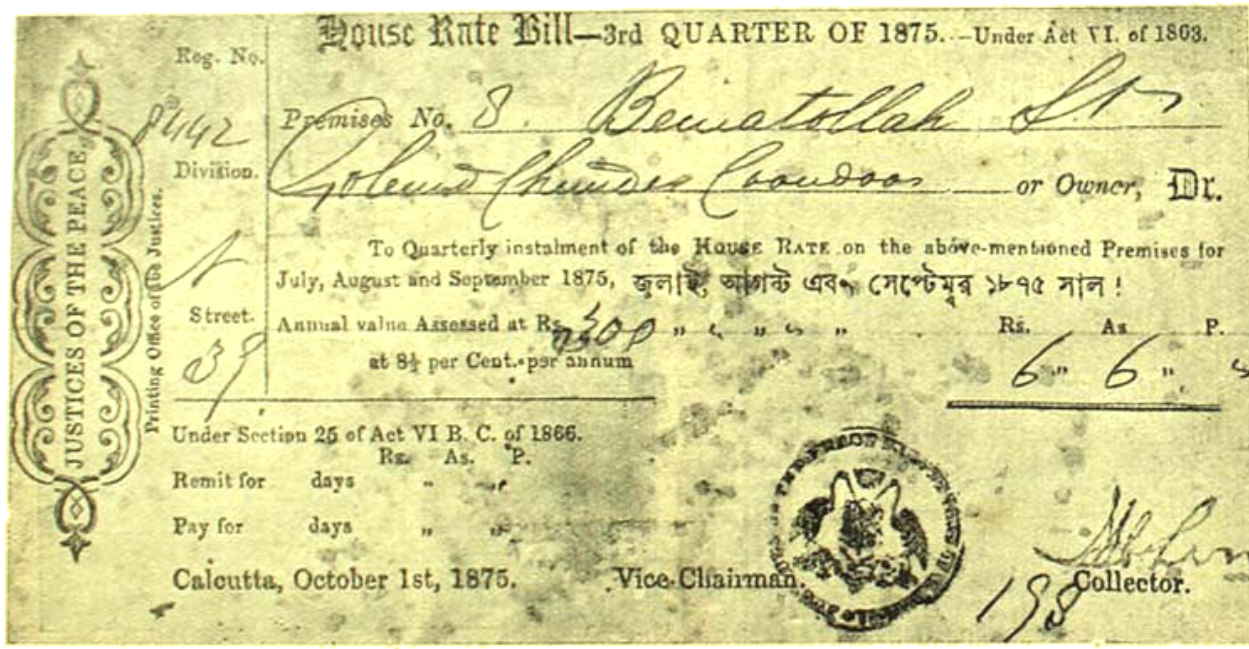

মিউনিসিপ্যালিটির সেকালের হাউস ট্যাক্স বিল

মার্কুইস্ কর্ণওয়ালিস্, ওয়ারেণ হেষ্টিংস্, ও এডওয়ার্ড ক্লেভরিন্ ভেনাক্লস্।

বহুমূল্যে বিক্রয় করিত। ইহা জানিয়া সুতানুটী আরমাণি বণিকগণ তাহাদের প্রেরিত মালপত্র কলিকাতার নাম

কালিকট্‌রূপে ব্যবহার করিয়া চালান দিয়া বিশেষ লাভ করিত। ইংরাজ কোম্পানি ইহা জানিতে পারিয়া এই উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের সেরেস্তার কলিকাতার নামপত্তন করেন।

সম্রাট ফরক্‌শিয়ার প্রদত্ত ৩৮খানি গ্রাম ও উহার রাজস্বের তালিকা—

গ্রামের নাম	রাজস্ব	গ্রামের নাম	রাজস্ব
শালিখা	২৭৭৲	বাহির গুঁড়া	৪০৲

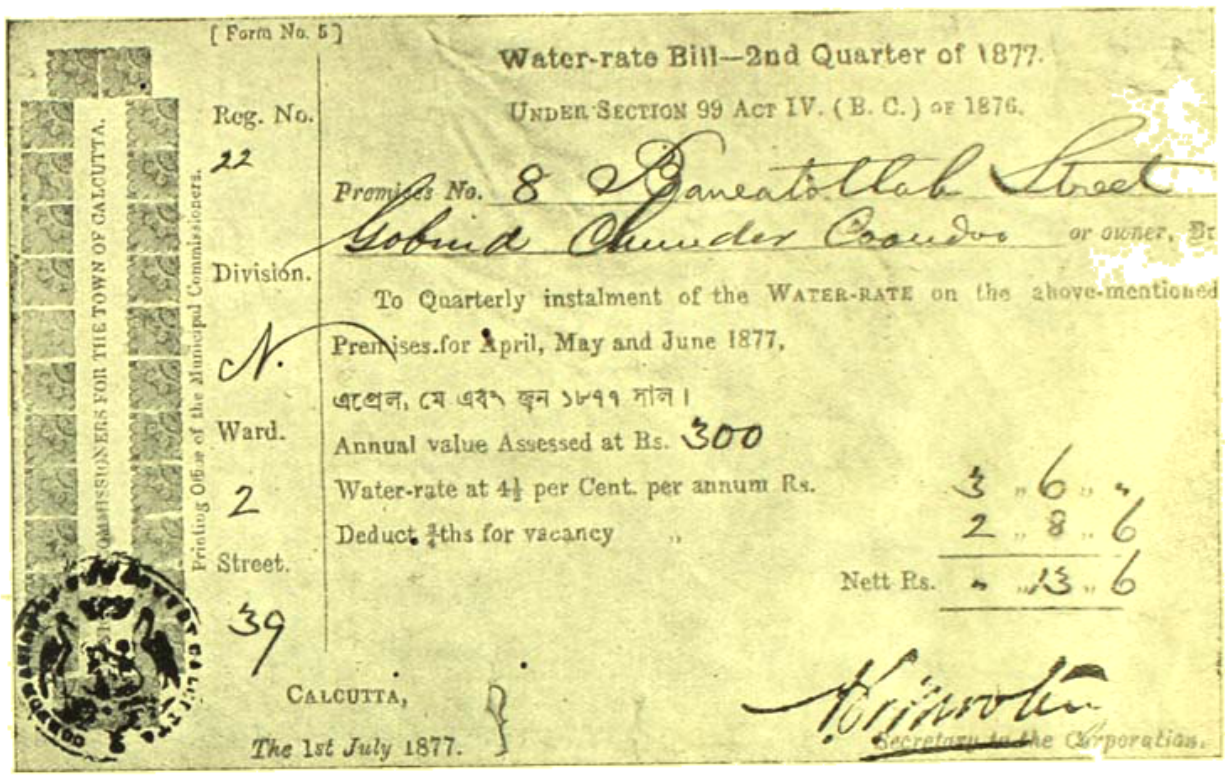

[Form No. 5]

COMMISSIONERS FOR THE TOWN OF CALCUTTA.

Printing Office of the Municipal Commissioners.

Reg. No. 22

Division. N.

Ward. 2

Street. 39

Water-rate Bill—2nd Quarter of 1877.

UNDER SECTION 99 ACT IV. (B. C.) OF 1876.

Premises No. 8 Ganeatollah Street

Gobind Chunder Coondoo or owner, Dr.

To Quarterly instalment of the WATER-RATE on the above-mentioned Premises for April, May and June 1877,

এপ্রেল, মে এবং জুন ১৮৭৭ সাল।

Annual value Assessed at Rs. 300

Water-rate at 4½ per Cent. per annum Rs. 3 „ 6 „ 0

Deduct ⅔ths for vacancy „ 2 „ 8 „ 6

Nett Rs. 0 „ 13 „ 6

CALCUTTA,

The 1st July 1877.

Secretary to the Corporation.

সেকালের মিউনিসিপ্যালিটির জলের টেক্সর বিল

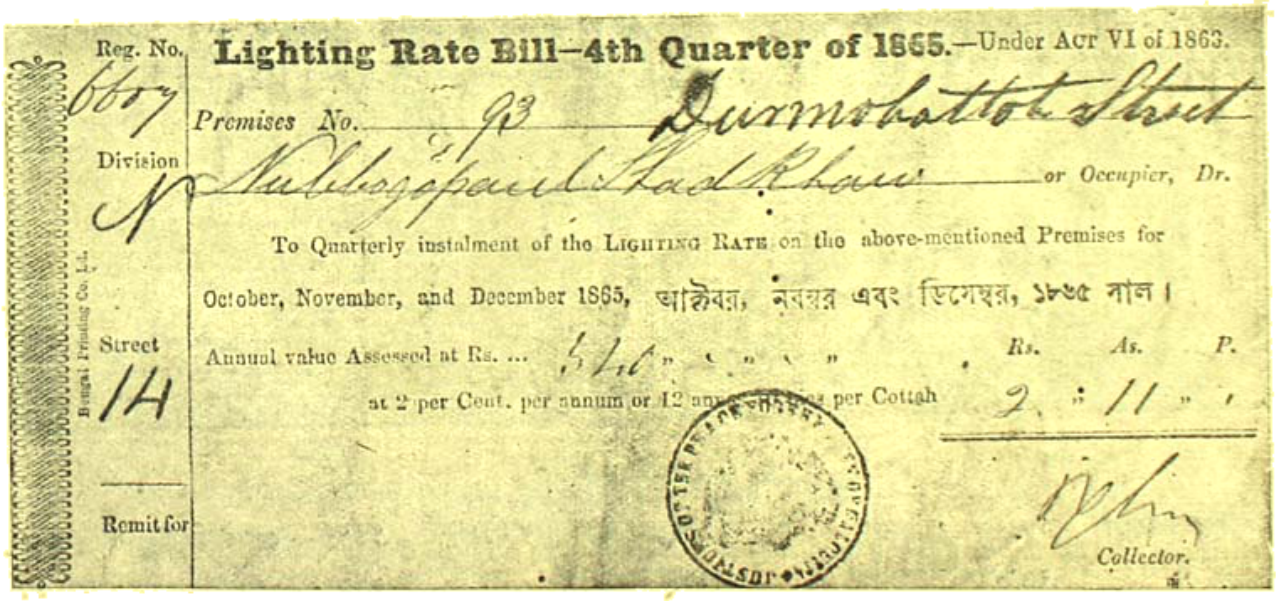

Reg. No. 6807

Division N

Street 14

Remit for

Lighting Rate Bill—4th Quarter of 1865.—Under ACT VI of 1863.

Premises No. 93 Durmohatta Street

Nubinchunder Shaha Khan or Occupier, Dr.

To Quarterly instalment of the LIGHTING RATE on the above-mentioned Premises for October, November, and December 1865, আক্টোবর, নবম্বর এবং ডিসেম্বর, ১৮৬৫ সাল।

	Rs.	As.	P.
Annual value Assessed at Rs. ... 5/16 „ „ „ „			
at 2 per Cent. per annum or 12 annas per Cottah	2	11	„

Collector.

সেকালের মিউনিসিপ্যালিটির আলোক বিল

হাওড়া	৩৮২৲	শিয়ালদহ	১১৮৲	উল্টাডিঙ্গি	৩১৫৲	কলিঙ্গা	৩৮৩৲
কাসুন্দিয়া	১৩০৲	ধলন্দা	৩০৬৲	দক্ষিণ বাড়ী	৪২৫৲	চৌবাগা	৩৭৲
রামকৃষ্ণপুর	১৭০৲	বিড়ি	২৮৩৲	গোবরা	১০০৲	জলা কলিঙ্গা	১১৪৲
বাটরা	৪০২৲	তিলজলা	২০৭৲	বাহির দক্ষিণ বাড়ী	১২৫৲	নির্জ্জাপুর	১৭৩৲

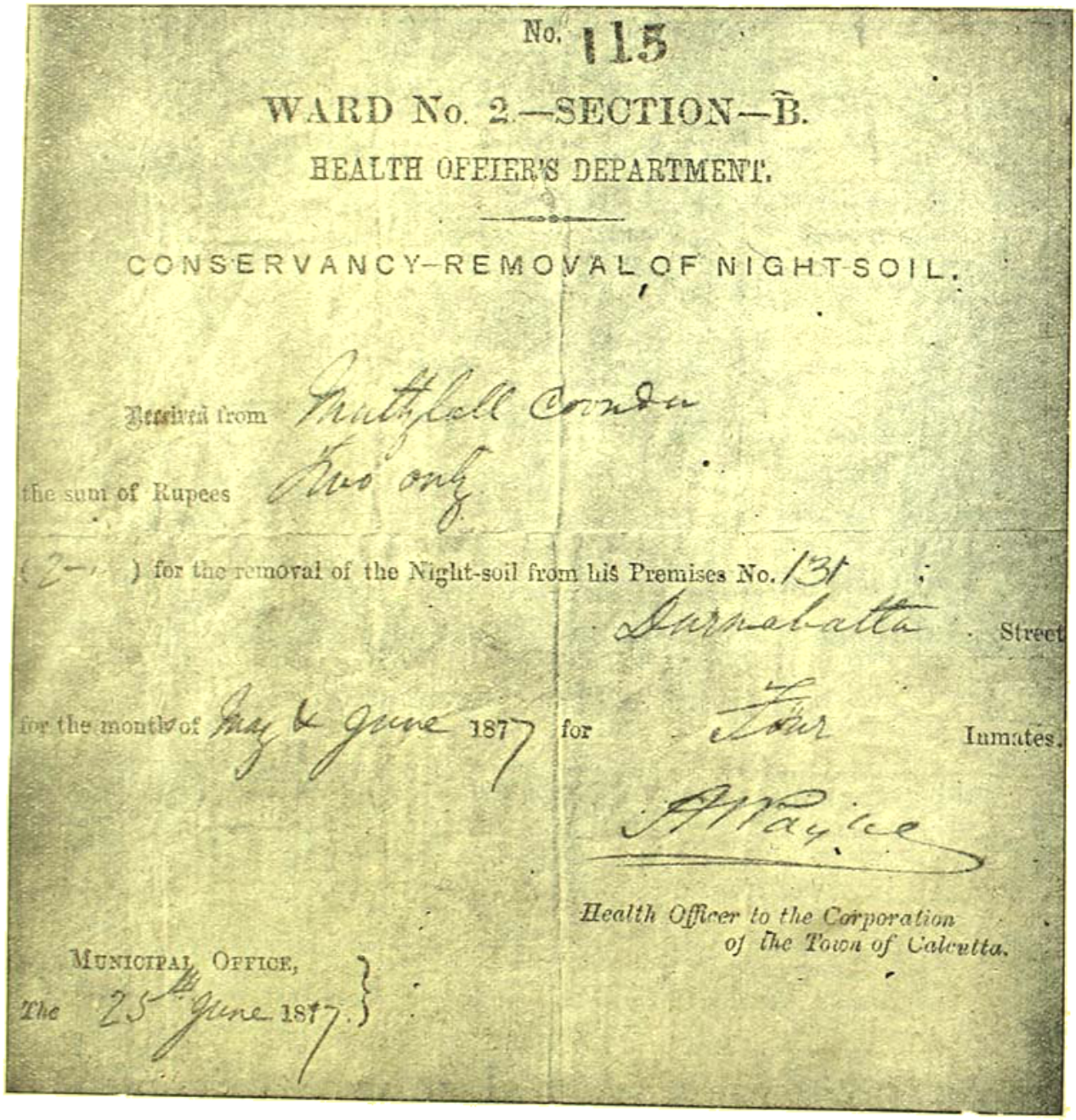

No. 115

WARD No. 2.—SECTION—B.

HEALTH OFFICER'S DEPARTMENT.

CONSERVANCY—REMOVAL OF NIGHT-SOIL.

Received from Smithfield Conda

the sum of Rupees Two only

(2—) for the removal of the Night-soil from his Premises No. 131

Sarnabatta Street

for the month of May & June 1877 for Four Inmates.

J. Payne

Health Officer to the Corporation of the Town of Calcutta.

MUNICIPAL OFFICE,
The 25th June 1877.

সেকালের পায়খানার ট্যাক্স বিল

দক্ষিণ-পাইকপাড়া	১৪৪৲	তোপসে	২৯০৲	শ্রীরামপুর ইটালী	১২৭৲	বেলগাছিয়া	৩০৫৲
চিৎপুর	২৫২৲	সাপগাছি	২১১৲	ইটালী	২২৯৲	শেখপাড়া	৪১৲
হোগলকুড়ে	১৩৭৲	চৌরঙ্গী	৮৯৲	গোঘলপাড়া	১০২৲	সিমলে	৮২৲

কাঁকুড়গাছি	২০৮৲	মাকন্দা	১১৮৲
কুলিয়া	৫১২৲	আর্কুলী	২২৲
গুঁড়া	৬৪৮৲	কামারপাড়া	৬৩৲
টাংরা	২২৮৲	বাঘমারী	৪৯৲

* * * *

কলিকাতায় ছেলে বিক্রী—১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে খিদিরপুরে ছোট ছেলে ও বয়ঃপ্রাপ্ত যুবকদের ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিবার একটি গুপ্ত আড্ডা ছিল। এই স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উহাদের চালান দেওয়া হইত।

* * *

বিক্রেয় পণ্যের উপর ডিউটী—পৌনে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বিক্রেয় পণ্যের উপর ও অন্যান্য ব্যাপারে যে ডিউটী আদায় করা হইত তাহার হার নিম্নে দেওয়া হইল।

পণ্য দ্রব্যাদি	মাসুল বা ডিউটির হার
কাপড়-চোপড় ইত্যাদি	শতকরা ২৲
নৌকা বোট প্রভৃতি বিক্রয় বাবত	„ ৫৲
ক্রীতদাস বিক্রয় বাবত	প্রত্যেক ক্রীতদাস বা দাসী হিঃ ৪।০
পাট্টা লইবার বাবত	প্রত্যেক পাট্টা ৪।০
সালিসি-নামা	২০ পণ কড়ি।
বন্ধকী খত	শতকরা ৫৲
বিবাহের লাইসেন্স	„ ৩৲
রসী সেলামী (বান্দর মরীপি-খরচা)	„ ১৲
নূতন নির্ম্মিত নৌকা, ডিঙ্গী ও বোট প্রভৃতির জন্য	৫০৲ হইতে ১০০৲ আকার অনুসারে।
মদের ডিউটী	২।০ হিসাবে
ঢেঁড়া পিটিবার খরচা	এক কাহন একপণ কড়ি।
চাউলের রপ্তানি	প্রতি মণে দেড় সের চাউল

এতদ্ভিন্ন জরিমানা, ঋণ আদায় প্রভৃতিতেও ডিউটী দিতে হইত।

* * *

প্রথম ইংরাজি অভিধান ও গ্রামার—সেকালে বাঙ্গালীর ইংরাজী শিক্ষার কোন সুযোগ না থাকায় ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা গেজেটে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটী প্রকাশিত হয়—

"We humbly beseech any gentleman will be so good to us as to take the trouble of making a Bengali Grammer and Dictionary in which we hope to find all the common Bengal country words made into English. By the means, we shall be enabled to recommend ourselves to the English Government and understand their orders, this favour will be remembered by us and our posterity for ever."

ইহা হইতে তখনকার দেশীয় লোকদের ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি মনোভাবের বেশ একটা পরিচয় পাওয়া যায়। পর বৎসর ডাক্তার মেকিনান্ নামক এক সাহেব একাধারে ব্যাকরণ, শব্দকোষ ও ইংরাজি ভাষা শিক্ষার জন্য একখানি গ্রন্থ ইংরাজি, পারসী ও বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত করেন। উহা তৎকালে কোম্পানীর নব প্রতিষ্ঠিত The Hon'ble East India Company's Press-এ মুদ্রিত হইয়াছিল।

* * *

সেকালের সাহেব ডাকাত—কোম্পানীর আমলে সাহেবরা দল বাঁধিয়া ডাকাতি করিত ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে একদল সাহেব-ডাকাত কোম্পানীর খাজনা লুঠ করিতে গিয়া ধরা পড়িবার কথা এবং ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন শীলের বাটীতে ডাকাতি করার কথা জানা যায়। এই শেষোক্ত দলে সত্তরজন লোক থাকিত। ইহারা ধরা পড়ে এবং বিচারে ছয়জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। চৈতন শীলের বাড়ীর নিকট এক বাজারে প্রকাশ্য স্থানে তাহাদের ফাঁসির কথা জানা যায়।

* * *

সাহেব পল্লী ও দেশীয় পল্লীর নাম—সেকালে সাহেবরা সহরের যে অংশে বাস করিত তাহাকে White town বলিত এবং দেশীয় অধিবাসীরা যে অংশে বাস করিত তাহাকে Black town বলিত।

* * *

কড়ির পরিবর্ত্তে আনির প্রচলন—কড়িই পূর্ব্বে সকল কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। ১৭৭৭ সালে বহরমপুরে যখন ইংরাজদের একটী ছোটখাট কেল্লা প্রস্তুত হইতেছিল, সেই সময় কুলি মজুরদিগের মেহনতানা দিবার সুবিধার জন্য

তথাকার ইঞ্জিনিয়ার রোহিয়ার সাহেব কলিকাতা কাউন্সিলের অধ্যক্ষ ড্রেক্ সাহেবকে লিখিয়া কড়ির পরিবর্ত্তে তাম্র কিংবা রৌপ্য-নির্ম্মিত আনির প্রচলনের জন্য প্রথম প্রস্তাব করেন। তখন ইহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল কি না তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় নাই।

* * *

সেকালে গভর্ণর সাহেবের সফরের খরচ—প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ১৭৯০ সালে গভর্ণর ভান্‌সিটার্টের একবার মুরশীদাবাদ নবাব-দরবারে যাওয়ার যে ব্যয় হইয়াছিল তাহার কতকাংশের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। যাতায়াতে সময় লাগিয়াছিল এক মাস ছয় দিন।

গভর্ণর সাহেবের নিজের ব্যবহারের জন্য ৩খানি বজরা

ভাড়া—প্রতিদিন ৩৲ হিসাবে—	২১৬৲
২০খানি ৬ দাঁড় নৌকা মাসিক ২৮৲ হি—	৬৭২৲
২২ „ ৮ „ „ ৩৮৲ হি—৪৯০৲	
১২ „ ১০ „ „ ৪০৲ হি—৫৭৬৲	
২ „ ৪ „ „ ২৪৲ হি— ৫৭৲	
মোট নৌকা ভাড়া—	২০১১৲
নবাবের ভৃত্যদিগকে বক্‌সীস প্রদান—	১৯২৩৲
নবাবের নজর (সোনার মোহর ৪০খানি ও ৬৯টী সিক্কা টাকা)—	৬৭৪৷৷০
মুরশীদাবাদের উকীলকে খেলাৎ (পোষাক) প্রদান—	২৪৭৲
চোবদার, পেয়াদা, বরকন্দাজ, বেহারা সরকার, মসালচী প্রভৃতি ১৬৯জন চাকরদিগের ভাড়া মোট—	৭২৪৷৷০
পাল্কী বেহারাদের ভাড়া (কাশিমবাজার হইতে)	৮৩৫৷৷০
৩০জন মসালচীর মেহনত-আনা	১২০৲
খানা ও মস্তাদির খরচ—	৩৫০০৲
বেহারাদের পোষাক ও বন্দুকের আন্দাজনীর জন্য লাল কাপড়	২৪০৷৷০
তৈল মশাল ইত্যাদি—	২৩৮৷৷০

* * *

কলিকাতায় প্রথম বাঁধাকপির চাষ—গোল আলু যেমন ইংরাজদের দ্বারা এ দেশে আনীত হয়, কপিও তেমনই তাঁহারাই আনেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কলিকাতায় ইহার চাষ প্রচলন হয়। চাঁদপাল ঘাটের সন্নিকট পুরাতন অর্ফান হাউসের একটু দক্ষিণে কাপ্তেন্ ম্যাকিন্‌টায়রের বাগানে তখন ইহার চাষ হইত।

* * *

প্রথম সাহেবী হোটেল—ঠিক হোটেল প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে কলিকাতায় ট্যাভার্ণ্ বা সরাইয়ের মত ছিল। তথায় পান ভোজন ও বিশ্রামাদি চলিত। সে সকলের মধ্যে হায়-মোনিক্ ট্যাভার্ণ-ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল। এই ট্যাভার্ণের প্রধান পাচক ট্রেণ্ হোম সর্ব্বপ্রথম ভদ্রলোকের উপযোগী ডিনার, সরাপ, ব্রেকফাষ্ট ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবসা করেন। তাঁহার এই হোটেল কসাইটোলার বাজারে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

* * * *

কলিকাতা আক্রমণ জন্য ক্ষতিপূরণ—নবাব সিরাজ-দ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রান্ত হওয়ায় বহু ইংরাজ ও দেশীয় বাসিন্দাক সম্পত্তি ধ্বংস ও লুণ্ঠিত হয়। নবাব মীরজাফর এজন্য কোম্পানীকে মোট এক কোটী সত্তর লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিয়াছিলেন। যে সকল ক্ষতিগ্রস্ত বাঙ্গালী আক্রমণের সময় কলিকাতা ত্যাগ করেন নাই, এবং কোম্পানীর কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, তাঁহা-দিগকে উক্ত টাকার অংশ দেওয়া হয়। ইহা বিতরণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন—

গোবিন্দরাম মিত্র	রঘুনাথ মিত্র
শোভারাম বসাক	আলিজান ভাই
রতু সরকার বা রতন সরকার	শুকদেব মল্লিক
নয়নচাঁদ মল্লিক	দয়ারাম বসু
নীলমণি মিত্র	ঘরেরুফ ঠাকুর
দুর্গারাম দত্ত	রাম সন্তোষ
মহম্মদ সাদেক	আইনুদ্দিন

যে সকল লোক ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়াছিলেন তন্মধ্যে যাঁহারা এক হাজার টাকার অধিক পাইয়াছিলেন, নিম্নে তাঁহাদের নামের, দাবীর পরিমাণ ও যাহা মঞ্জুর হয় তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

নাম	ক্ষতিপূরণের দাবী	যাহা মঞ্জুর হয়
গোবিন্দরাম মিত্র ও রঘুনাথ মিত্র	৪১২৬৮০৷৷/০	৩৭৬৮০৷৷/০

শোভারাম বসাক	৪৪১২৭৮৶০	৬৬১৭৮৶০
আলিজান ভাই	৩৪৪৫৭৶০	১৭৪৫৭৲
রঘু সরকার	১৮০৩২২৶০	৪০৩২২৶০
শুকদেব মল্লিক	৫০৯৪২৷০	১০৯৪২৷০
নয়নচাঁদ মল্লিক	৪৩৯২২৲	৫৯২২৲
দয়ারাম বসু	৫১৫৩৲	১১৫৩৸০
নীলমণি মিত্র	২৮১১৩৲	১০১১৩৸০
হরেকৃষ্ণ ঠাকুর	১৩৭৮৮৶০	৩৭৮৮৶০
দুর্লভ লস্কী কান তরণী চরণ বসাক	৮২৩৪৪৶০	১২৩৩৪৶০
কুড়রাম বিশ্বাস	৫৯৮৩৷০	১৯৮৩৷০
রামদেব মিত্র	৭৩১৩৫০	১০১৩৫০
রাজারাম পালিত	৪২১৫৮০	১০১৫৮০
বৃন্দাবন ও কুলচাঁদ	১২৩৯৫৷০	২৮৯৫৷০
গোপীচরণ বসাক	৪০৫৬৸০	১০৫৬৸০

• • • •

সেকালের পদস্থ ইংরাজের আচরণ—সেকালের বড় বড় ইংরাজদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব যুদ্ধ কোন দোষের ছিলনা। এরূপ যুদ্ধে অনেককে প্রাণ দিতে হইয়াছে এ উদাহরণের অভাব নাই। হেষ্টিংস্ গভর্ণর হইবার পূর্ব্বে রিচার্ড কোর্টের বাটীতে ভাম্পিটার্টের সভায় একবার যখন সভার কার্য্য চলিতেছে সেই সময় মিঃ ব্যাট্‌সন্ (Mr. Bateon) হেষ্টিংসকে মিথ্যাবাদী বলিয়া গালে চড় মারেন। অবশ্য এজন্য তাঁহাকে সভ্যপদ হইতে অপসারিত করা হইয়াছিল এবং ক্ষমা ভিক্ষার পর পুনরায় সেই পদ দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু এরূপ ব্যাপারও তখন গভর্ণরের সভায় সম্ভব ছিল।

• • • •

পূর্ব্বে ব্যঙ্গাত্মক চিত্র—আজকালের মত পূর্ব্বে এ দেশে অধিক পরিমাণে ব্যঙ্গচিত্রের প্রচলন না থাকিলেও পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বের কতকগুলি চিত্র পাওয়া যায়। ইংরাজী "The Indian charivari" এবং বাঙ্গালা "বদমাস" হইতে তাহার কতিপয় নমুনা দিলাম। এই দুইখানি পত্রই প্রায় ষাইট বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

• • • •

ইট প্রস্তুত নিষিদ্ধ—১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সহরের মধ্যে এবং পুরাতন দুর্গের ছয় মাইলের মধ্যে কোম্পানীর বা সরকারি কার্য্যের জন্য কণ্ট্রাক্টরগণ ব্যতীত অন্যের পক্ষে ইট প্রস্তুত নিষিদ্ধ হয়।

• • • •

প্রথম দেশীয় জুরি—১৮৩৪ সালে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সুপ্রীম্ কোর্টে প্রথম জুরির কার্য্য করেন।

আশুতোষ দে	দ্বারকানাথ ঠাকুর
রসময় দত্ত	বীর নরসিং মল্লিক
রাধাকৃষ্ণ মিত্র	কালীপ্রসাদ ঘোষ
রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়	

• • • •

চৌরঙ্গীর পুষ্করিণী—এই জলাশয়টি বেনারসের ব্যাঙ্কার মনোহর দাস দ্বারা ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে খোদিত হয়। ইহার সমস্ত ব্যয়ভার তিনিই বহন করিয়াছিলেন। পুষ্করিণীটি লম্বে ৩৫০ ফিট্, এবং প্রস্থে ২২৫ ফিট।

• • • •

শত্রুরাজ্যের অধিবাসীদের প্রতি আদেশ—সমস্ত ফরাসী বা ফ্রান্সের মিত্র রাজ্যের লোক, অথবা যে সব দেশের সহিত গ্রেট্ বৃটেনের যুদ্ধ বাধিয়াছে তাহাদের দেশের যে সকল লোক কলিকাতায় বাস করিতেছে, তাহাদের পুলিশে নাম লেখাইবার জন্য এবং তাহারা বিনা অনুমতিতে কলিকাতা ত্যাগ করিলে বা উক্ত প্রকারের লোক অন্য বিভিন্ন উপনিবেশ হইতে বিনা অনুমতিতে আসিলে দণ্ডনীয় হইবে বলিয়া ১৮০০ সালের ১৯শে মে এবং ১৮০৩ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল।

• • • •

রবিবারে ঘোড়দৌড় ও জুয়াখেলা বন্ধের আদেশ—১৭৯৮ সালের ৯ই নভেম্বর গভর্ণর সাহেবের আদেশে রবিবার ঘোড়দৌড় ও সকল প্রকার জুয়াখেলা বন্ধ হইয়াছিল।

• • • •

বিলাতি মসলিনের প্রথম আমদানী—১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলিশ্ মস্‌লিনের নমুনা বাঙ্গালায় প্রথম আইসে। •

• এবার যে সকল চিত্রাদি প্রকাশিত হইল তাহার অনেকগুলির সহিত এ প্রবন্ধের কোন সম্বন্ধ নাই, উহা পূর্ব্বে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। সময়ে যা পাওয়া গেল এখন দিলাম।

শেষের পরিচয়

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১)

রাখাল-রাজের নূতন বন্ধু জুটিয়াছে তারকনাথ। পরিচয় মাস তিনেকের কিন্তু 'আপনি'র পালা শেষ হইয়া সম্ভাষণ নামিয়াছে 'তুমি'তে। আর এক ধাপ নিচে আসিলেও কোন পক্ষের আপত্তি নাই ভাবটা সম্প্রতি এইরূপ।

বেলা আড়াইটায় তারকের নিশ্চয় পৌঁছিবার কথা, তাহারই কি-একটা অত্যন্ত জরুরি পরামর্শের প্রয়োজন, অথচ, তাহারই দেখা নাই, এদিকে ঘড়িতে বাজে তিনটা। রাখাল ছট্‌ফট্ করিতেছে,—পরামর্শের জন্যও নয়, বন্ধুর জন্যও নয়, কিন্তু ঠিক তিনটায় তাহার নিজেরই বাহির না হইলেই নয়। ভবানীপুরে এক সুশিক্ষিত পরিবারে সন্ধ্যার পরেই মহিলা-মজলিসের অধিবেশন, বহু তরুণী বিদুষীর পদার্পণের নিঃসংশয় সম্ভাবনা জানাইয়া বেগার খাটিবার সনির্বন্ধ আহ্বান পাঠাইয়াছেন গৃহিণী স্বয়ং। অতএব, বেলা-বেলি না যাইলে অতিশয় অন্যায় হইবে; অর্থাৎ, কি না খাওয়াই চাই।

এদিকে যাত্রার আয়োজন তাহার সম্পূর্ণ। দাড়ি-গোঁফ বার দুই কামাইয়া বার চারেক হিমানী লাগানো শেষ হইয়াছে, শয্যার পরে সু-বিন্যস্ত গিলে-করা পাঞ্জাবী, সিল্কের শেরওয়ানি, কোঁচানো দেশী ধুতি-চাদর, খাটের নিচে সদ্য ক্রিম-মাখানো বার্ণিশ করা পাম্প, তে-পায়ার উপরে রাখা সুবর্ণ-বন্ধনী সংবদ্ধ সোনার চৌকা-ফিট ওয়াচ—মেয়েদের চিত্ত-হারিণী বলিয়াই ছেলেমহলে প্রখ্যাত—সবই প্রস্তুত। টেবিলে টি পটে চায়ের জল গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া প্রায় অপেয় হইয়া উঠিল, কিন্তু বন্ধুবরের সাক্ষাৎ নাই। সুতরাং দোষ যখন বন্ধুরই তখন, দ্বারে তালা দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেই বা দোষ কি! কিন্তু কোথায় যেন বাধিতেছে। অথচ, ও-দিকের আকর্ষণও দুর্নিবার্য্য।

প্রবল চঞ্চলতায় রাখাল চটি পায়ে দিয়া বড় রাস্তা পর্য্যন্ত একবার ঘুরিয়া আসিল, তারপরে চা ঢালিয়া একলাই গিলিতে সুরু করিয়া মনে মনে শেষবারের মত প্রতিজ্ঞা করিল, এ পেয়ালা শেষ হইলেই ব্যস্! আর না। মরুক্‌গে তার পরামর্শ। বাজে—বাজে, সব বাজে। সত্যকার কাজ থাকিলে সে আধঘণ্টা আগেই হাজির হইত, পরে নয়। না হয়, কাল সকালে একবার তার মেস্‌টা ঘুরিয়া আসা যাইবে,—ব্যস্!

তারকের পরিচয় পরে হইবে, কিন্তু রাখালের ইতিহাসটা মোটামুটি এইখানে বলিয়া রাখি।

কিন্তু ওকে জিজ্ঞাসা করিলেই বলে, আমি তো সন্ন্যাসী মানুষ হে। অর্থাৎ, মাতৃ-পিতৃকুলের সবাই গেছেন লোকান্তরে, সে-ই শুধু বাকি। ইহলোক সমুজ্জ্বল করিয়া একদিন তাঁহারা ছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু সে-সব খবর রাখাল ভালো জানেনা। যদি বা কিছু জানে, বলিতে চায়না। অধুনা পটল-ডাঙায় তাহার বাসা। বাড়ী-আলা বলে দুখানা ঘর, সে বলে একখানা। ভাড়ার দিক দিয়া শেষ পর্য্যন্ত দেড়খানায় রফা হইয়াছে। একতালা, সুতরাং যষ্ঠে সাঁত্‌-সেঁতে। তবে, হাওয়া না থাকিলেও আলোটা আছে,—দিনে দেশলাই জ্বালিয়া সূতা খুঁজিয়া ফিরিতে হয়না। ঘর যাই হৌক, রাখালের আসবাবের অভাব নাই। ভালো খাট, ভালো বিছানা, ভালো টেবিল-চেয়ার, ভালো দুটা আলমারি,—একটা বইয়ের, অন্যটা কাপড়-জামা পোষাকে পরিপূর্ণ। একটি দামী ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান্, দেয়ালের ঘড়িটাও নেহাৎ কম মূল্যের নয়,—এমন, আরও কত-কি সৌখীন ছোট খাটো টুকি টাকি মিলিল। একজন ঠিকার বুড়ী-ঝি রাখালের কুকার, চায়ের

সাজ-সরঞ্জাম মাজিয়া ঘষিয়া দিয়া যায়, ঘর-দ্বার পরিষ্কার করে, ভিজা কাপড় কাচিয়া শুকাইয়া তুলিয়া দিয়া যায়,—সময় পাইলে বাজার করিয়াও আনে। রাখাল পাল-পার্ব্বণের নাম করিয়া টাকাটা সিকাটা যাহা দেয় তাহা বহু সময়ে মাস-মাহিনাকেও অতিক্রম করে। রাখাল মাঝে মাঝে আদর করিয়া ডাকে নানী। রাখালকে সে সত্যই ভালোবাসে।

রাখাল সকালে ছেলে পড়ায়, বাকি সমস্ত দিন সভা-সমিতি করিয়া বেড়ায়। রাজনীতিক নয়, সামাজিক। সে বলে সে সাহিত্যিক,—রাজনীতির গণ্ড-গোলে তাহাদের সাধনার বিঘ্ন ঘটে।

ছেলে পড়ায়, কিন্তু কলেজের নয়,—স্কুলের। তাও খুব নিচের ক্লাসের। পূর্ব্বে চাকুরির চেষ্টা অনেক করিয়াছে, কিন্তু জুটাইতে পারে নাই। এখন সে চেষ্টা ছাড়িয়াছে।

কিন্তু একবেলা ছোট ছেলে পড়াইয়া কি করিয়া যে এতটা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্ভবপর তাহাও বুঝা যায়না। সে সাহিত্যিক, কিন্তু প্রচলিত সাপ্তাহিক বা মাসিকপত্রে তাহার নাম খুঁজিয়া মেলেনা। রাত্রে, অনেক রাত্রি জাগিয়া খাতা লেখে, কিন্তু সেগুলা যে কি করে কাহাকেও বলেনা। ইস্কুল-কলেজে সে কি পাশ করিয়াছে কেহ জানেনা, প্রশ্ন করিলে এমন একটা ভাব ধারণ করে যে সে ওয়ন-ট্রেনিং হইতে ডক্টরেট পর্য্যন্ত যা-কিছু হইতে পারে। তাহার আল-মারিতে সকল জাতীয় পুস্তক। কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান—মোটা মোটা বাছা বাছা বই। কথাবার্ত্তা শুনিলে হঠাৎ বর্ণ-চোরা মহামহোপাধ্যায় বলিয়া শঙ্কা হয়। হোমিও-প্যাথি শাস্ত্র হইতে wireless পর্য্যন্ত তাহার অধিগত। তাহার মুখে শুনিলে বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ-প্রবাহের জ্ঞান মার্কোনির অপেক্ষা নিতান্ত কম বলিয়া সন্দেহ হয়না। কন্টিনেন্টাল গ্রন্থকারদের নাম রাখালের কণ্ঠস্থ,—কে কয়টা বই লিখিয়াছেন সে অনর্গল বলিতে পারে। হিউমের সহিত লকের পরমিল কতটুকু এবং স্পিনোজার সঙ্গে ডেকার্ডের আসল মিল কোন্‌খানে, এবং ভারতীয় দর্শনের কাছে তাহা কত অকিঞ্চিৎকর এ সকল তত্ত্বকথা সে পণ্ডিতের মতোই প্রকাশ করে। বুয়ার-ওয়ারের সেনাপতি কে-কে, রুশ-জাপান যুদ্ধে কিসের জন্য রুশের পরাজয় ঘটিল, আমেরিকানরা কি করিয়া এত টাকা করিল এ সকল বিবরণ তাহার নখাগ্রে। ভারতীয় মুদ্রা বিনিময়ে বাট্টায় হার কি হওয়া উচিত, রিভার্স কাউন্সিল বেচিয়া ভারতের কত টাকা ক্ষতি হইল, গোল্ড ষ্টাণ্ডার্ড রিজার্ভে কত সোনা আছে এবং করেন্সি আইনতে কত টাকা থাকা উচিত এ সম্বন্ধে সে একেবারে নিঃসংশয়। এমন কি নিউটনের সহিত আইন্‌ষ্টাইনের মতবাদ কতদিনে সামঞ্জস্য লাভ করিবে এ ব্যাপারেও ভবিষ্যদ্বাণী করিতে তাহার বাধেনা। শুনিয়া কেহ-কেহ হাসে, কেহ বা শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া যায়। কিন্তু একটা কথা সকলেই অকপটে স্বীকার করে যে রাখাল পরোপকারী। সাধ্যে কুলাইলে সাহায্য করিতে সে কোথাও পরাঙ্মুখ হয়না।

বহু গৃহেই রাখালের অবাধ গতি, অবারিত দ্বার। খাটাইয়া লইতে তাহাকে কেহ ছাড়েনা। যে-সব মেয়েরা বয়সে বড়, মাঝে মাঝে অনুযোগ করিয়া বলেন, রাখাল এ তোমার ভারি অন্যায়, এইবার একটা বিয়ে-থা কোরে সংসারী হও। কত কাল আর এমনভাবে কাটাবে,—বয়স তো হোলো।

রাখাল কানে আঙুল দিয়া বলে আর যা বলেন বলুন, শুধু এই আদেশটি করবেননা। আমি বেশ আছি।

তথাপি আদেশ-উপদেশের কার্পণ্য ঘটেনা। যাঁহারা ততোধিক শুভানুধ্যায়ী তাঁহারা দুঃখ করিয়া বলেন, ও নাকি আবার কথা শুনবে! স্বদেশ ও সাহিত্য নিয়েই পাগল।

কথা সে না শুনিতে পারে, কিন্তু পাগলামি সারে কি না সারাই করিয়া আজও কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী দেখে নাই। কেহ বলে নাই রাখাল তোমার পাত্রী স্থির করিয়াছি,তোমাকে রাজি হইতে হইবে।

এম্‌নি করিয়া রাখালের দিন কাটিতেছিল এবং বয়স বাড়িতেছিল।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। দর্শন-বিজ্ঞানে যাই হোক, সংসারে আপনার বলিতে তাহার যে কোথাও কিছু নাই এবং ভবিষ্যতের পাতেও শূন্য অঙ্ক দাগা এ খবরটা আর যাহার চোখেই চাপা পড়ুক, মেয়েদের চোখে যে চাপা পড়ে নাই এ কথা রাখাল বোঝে। তাই বিবাহের অনুরোধে,সে তাঁহাদের সদিচ্ছা ও সহানুভূতিটুকুই গ্রহণ করে। তাঁহাদের কাজ করে, বেগার খাটে, তার

বেশিতে প্রলুব্ধ হয়না। এক ধরণের স্বাভাবিক সংযম ও মিতাচার ঐখানে তাহাকে রক্ষা করে।

চা খাওয়া শেষ করিয়া রাখাল কোঁচানো কাপড়টি পরিপাটী করিয়া পরিয়া সিল্কের গেঞ্জি আর একবার ঝাড়িয়া গায়ে দিবার উপক্রম করিতেছে এমনি সময়ে তারক আসিয়া প্রবেশ করিল।

রাখাল কহিল, বাঃ—বেশ তো! এরই নাম জরুরি পরামর্শ? না?

কোথাও বেরুচ্চো না কি?

না, সমস্ত বিকেলটা ঘরে বসে থাকবো।

না সে হবেনা। বিকেলের এখনো ঢের দেরি—বোসো।

না হে না—তার যো নেই। পরামর্শ কাল হবে। এই বলিয়া সে গেঞ্জির উপরে পঞ্জাবি চড়াইল।

তারক তাহার প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তাহলে পরামর্শ থাকলো। কাল সকালে আমি অনেক দূরে গিয়ে পড়বো। হয়ত আর কখনো,—না, তা না হোক্—অনেকদিন আর দেখা হবার সম্ভাবনা রইলনা।

রাখাল ধপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল,—তার মানে?

তার মানে আমি একটা চাকরি পেয়েছি। বর্দ্ধমান জেলার একটা গ্রামে। নতুন ইস্কুলের হেড্ মাষ্টারি।

প্রাইমারি?

না, হাই-ইস্কুল।

হাই-ইস্কুল? ম্যাট্রিক? মাইনে?

লিখ্চে তো নব্বুই টাকা। আর একটা ছোট-খাটো বাড়ী,—থাকবার জন্যে অম্নি দেবে।

রাখাল হাঃ হাঃ করিয়া একচোট হাসিয়া লইল, পরে কহিল, ধাপ্পা—ধাপ্পা—সব ধাপ্পাবাজি। কে তামাসা করেচে। এ তো একশ টাকার ওপরে গেলো হে। কেন, তারা কি আর লোক পেলেনা?

তারক কহিল, বোধ হয় পায়নি। পাড়াগাঁয়ে সহজে কি কেউ যেতে চায়?

না চায়না! একশো টাকার যমের বাড়ী যেতে চায় এ তো বর্দ্ধমান! ইঃ—তিনটে দশ। আর দেরি করা চলে না। না না, পাগ্‌লামি রাখো,—কাল সকালে সব কথা হবে। দেখা যাবে কে লিখেচে আর কি লিখেচে। এটা বুঝ্চোনা যে একশো টাকা! অজানা—অচেনা—ছ্যাৎ! অ্যাপ্লিকেশনের জবাব তো? ও ঢের জানি, হাড়ে ঘুণ ধরে গেছে। ছ্যাৎ! চল্‌লুম। বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল।

তারক মিনতি করিয়া কহিল, আর দশ মিনিট ভাই। সত্যি মিছে যাচ্চি, আজ রাতের গাড়ীতে যেতেই হবে।

রাখাল বলিল, কেন শুনি? কথাটা আমার বিশ্বাস হোলোনা বুঝি?

তারক ইহার জবাব দিলনা, কহিল,—অথচ, এম্‌নি অভ্যাস হয়ে গেছে যে দিনান্তে একবার দেখা না হলে প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

রাখাল কহিল, আমারই তা' হয়না বুঝি?

ইহার পরে দুজনেই ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল।

তারক বলিল, বেঁচে যদি থাকি বড়দিনের ছুটিতে হয়ত আবার দেখা হবে। ততদিন—

রাখালের চোখে সামান্যতেই জল আসিয়া পড়ে, তাহার চোখ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

তারক আঙুল হইতে একটা বহু ব্যবহৃত সোনার সিল-আঙটি খুলিয়া টেবিলের একধারে রাখিয়া দিল, কহিল, ভাই রাখাল, তোমার কাছে আমি কুড়িটা টাকা ধারি—

কথাটা শেষ হইল না—এ কি তার বন্ধক না কি? বলিতে বলিতে রাখাল ছোঁ মারিয়া আঙটিটা তুলিয়া লইয়া বোঁকের মাথায় জানালা দিয়া ফেলিয়া দিতেছিল, তারক হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া মিনতিকণ্ঠে কহিল, আরে না না বন্ধক নয়,—বেচ্‌লে এর দাম দশটা টাকাও কেউ দেবেনা,—এ আমার স্মরণ-চিহ্ন, যাবার আগে তোমার হাতে নিজের হাতে পরিয়ে যাবো, এই বলিয়া সে জোর করিয়া বন্ধুর আঙুলে পরাইয়া দিল। বলিল, দশ মিনিট সময় চেয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু পোনর মিনিট হয়ে গেছে, এবার তোমার ছুটি। নাও, পোষাক টোষাক পরে নাও,—এই বলিয়া সে হাসিল।

মহিলা-মজলিসের চেহারা তখন রাখালের মনের মধ্যে ম্লান হইয়া গেছে, সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার পাশাপাশি দুই বন্ধুর ছবি পড়িল। রাখাল বেঁটে, গোল-গাল, গৌরবর্ণ, তাহার পরিপুষ্ট মুখের পরে একটী সজ্জন সরলতা যেন অত্যন্ত ব্যক্ত—মানুষটি যে সত্যই ভালোমানুষ তাহাতে সন্দেহ জন্মায়না, কিন্তু

তারকের চেহারা সে শ্রেণীরই নয়। সে দীর্ঘাকৃতি, কৃশ, গায়ের রঙটা প্রায় কালোর ধার ঘেঁসিয়া আছে। বাহিরে প্রকাশিত নয় বটে, কিন্তু ঠাহর করিলেই সন্দেহ হয়, লোকটি বোধহয় অতিশয় বলিষ্ঠ। মুখ দেখিয়া হঠাৎ কোন ধারণা করা কঠিন, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে একটি আশ্চর্য্য বৈশিষ্ট্য আছে। আয়ত বা সুন্দর নয়, কিন্তু মনে হয় যেন নির্ভর করা চলে। সুখে দুঃখে ভার সহিবার ইহার শক্তি আছে। বয়স সাতাশ আটাশ, রাখালের চেয়ে দুই-তিন বছরের ছোট, কিন্তু কিসে যেন তাহাকেই বড় বলিয়া ভ্রম হয়।

রাখাল হঠাৎ জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু আমি বল্‌চি তোমার যাওয়া উচিত নয়।

কেন?

কেন আবার কি? একটা হাই-ইস্কুল চালানো কি সোজা কথা! ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলে পড়াতে হবে, তাদের পাশ করাতে হবে—সে কোয়ালিফিকেশন কি—

তারক কহিল, কোয়ালিফিকেশন তারা চায়নি, চেয়েছে য়ুনিভারসিটির ছাপ ছোপের বিবরণ। সে সব মার্কা কর্ত্তৃপক্ষদের দরবারে পেশ করেছি, আজি মঞ্জুর হয়েছে। ছেলে পড়াবার ভার আমার কিন্তু, পাশ করার দায় তাদের।

রাখাল ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিল, সে বল্‌লে হয়না হে হয়না। পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, কিন্তু আমাকেও তো তুমি সত্যি কথা বলোনি তারক। বলেছিলে পড়া-শুনা তেমন কিছু করোনি।

তারক হাসিয়া কহিল, সে এখনও বল্‌চি। ছাপ-ছোপ আছে, কিন্তু পড়া-শুনা করিনি। তার সময় পেলাম কই? পড়া-মুখস্তর পালা সাঙ্গ হতেই লেগে গেলাম চাকরির উমেদারিতে,—কাট্‌লো বছর দু'তিন—তার পরে দৈবাৎ তোমার দয়া পেয়ে কলকাতায় এসে দুটো খেতে পরতে পাচ্চি।

ভাখো তারক, ফের যদি তুমি—

অকস্মাৎ, আয়নার দুই বন্ধুর মাথার উপরে আর একটি ছায়া আসিয়া পড়িল। নারীমূর্ত্তি। উভয়েই ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল একটি অপরিচিতা মহিলা ঘরের প্রায় মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মহিলাই বটে। বয়স হয়ত যৌবনের আর এক প্রান্তে পা দিয়াছে, কিন্তু সে চোখেই পড়েনা। বর্ণ অত্যন্ত গৌর, একটু রোগা, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিয়া মর্য্যাদার সীমা নাই। ললাটে আয়তির চিহ্ন। পরনে গরদের শাড়ী, হাতে গলায় প্রচলিত সাধারণ দু-চার খানি গহনা, শুধু যেন সামাজিক রীতি পালনের জন্যই। দুই বন্ধুই কিছুক্ষণ স্তব্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রাখাল চৌকি ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল,—এ কি! নতুন-মা যে! তাহার পরেই সে উপুড় হইয়া তাঁহার পায়ের উপর গিয়া পড়িল, দুই পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম যেন তাহার আর শেষ হইতেই চাহেনা।

উঠিয়া দাঁড়াইলে রমণী হাত দিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন। তিনি চৌকিতে বসিলে রাখাল মাটিতে বসিল, এবং তারক উঠিয়া গিয়া বন্ধুর পাশে বসিল।

হঠাৎ চিন্‌তে পারিনি মা।

না পারবারই তো কথা রাজু।

মনে মনে ভাব্‌ছি, চোখ পড়ে গেল আপনার চুলের ওপর। রাঙা আঁচলের পাঁড় ডিঙিয়ে পায়ে এসে ঠেকেছে। এমনটি এ দেশে আর কারু দেখিনি। তখন সবাই বল্‌তো এর খানিকটা কেটে নিয়ে এবার প্রতিমা সাজানো হবে। মনে পড়ে মা?

তিনি একটুখানি হাসিলেন, কিন্তু কথাটা চাপা দিলেন। বলিলেন, রাজু, ইনিই বুঝি তোমার নতুন বন্ধু? নামটি কি?

রাখাল বলিল, তারক চাটুয্যে। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?

তিনি এ প্রশ্নও চাপা দিলেন, শুধু বলিলেন, শুনেচি তোমাদের খুব ভাব।

রাখাল বলিল, হাঁ, কিন্তু সে বুঝি আর টেঁকেনা। ও আজই চলে যেতে চাচ্চে বর্দ্ধমানের কোন্ এক পাড়াগাঁয়ে,—ইস্কুলের হেড্-মাষ্টারি জুটেছে ওর, কিন্তু আমি বলি, তুমি এম-এ, পাশ করেছো যখন, তখন মাষ্টারির ভাবনা নেই, এখানেই একটা যোগাড় হয়ে যাবে। ও কিন্তু ভরসা করতে চায়না। বলুন তো অন্যায়।

শুনিয়া তিনি মৃদুহাস্যে কহিলেন, তোমার আশ্বাসে বিশ্বাস করতে না পারাকে অন্যায় বল্‌তে পারিনে রাজু। তারকবাবু কি সত্যিই আজ চলে যাচ্ছেন?

তারক সবিনয়ে কহিল, এটি কিন্তু তার চেয়েও অন্যায় হোলো যে। রাখাল-রাজের পৈতৃক মুড়োটা স্বচ্ছন্দে বাদ দিয়ে করে দিলেন ওকে ছোট একটুখানি রাজু, আর

আমারই অদৃষ্টে এসে জুটলো এক উট্‌কো বাবু? তার সইবেনা নতুন-মা, ওটা বাতিল করতে হবে।

তিনি ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তাই হবে তারক।

সম্মতি লাভ করিয়া তারক সন্তুষ্টচিত্তে কি-একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সময় পাইলনা, তাঁহার সস্মিত মুখের উপর হঠাৎ যেন একটা বিবর্ণতার ছায়া আসিয়া পড়িল, গলার স্বরটাও গেল বদ্‌লাইয়া, বলিলেন, রাজু, আজকাল ও-বাড়ীতে কি তুমি বড়-একটা যাওনা?

যাই বই কি নতুন-মা। তবে, নানা ঝঞ্ঝাটে দিন পনেরো জুড়ি—

রেণুর কাল বিয়ে,—জানো?

কই না! কে বল্‌লে?

হাঁ, তাই। আজ বেলা দশটায় তার গায়ে-হলুদ হয়ে গেল। এ বিয়ে তোমাকে বন্ধ করতে হবে।

কেন?

হওয়া অসম্ভব বলে। বরের পিতামহ পাগল হ'য়ে মারা যায়, এক পিসী পাগল হয়ে আছে, বাপ পাগল নয় বটে, কিন্তু ছেলে ছিল ভালো। হাতে-পায়ে দড়ি বেঁধে লোকে ফেলে রাখতে পারতো।

কি সর্ব্বনাশ! কর্ত্তা কি এ সব শোনে করেননি?

রমণী কহিলেন, জানেই ত কর্ত্তাকে। ছেলেটি রূপবান, লেখা-পড়া করেছে, তাছাড়া ওদের অনেক টাকা। ঘটক সম্বন্ধ এনেছে, যা বলেছে তিনি বিশ্বাস করেছেন। আর জান্‌লেই বা কি? সমস্ত শুনেও হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তিনি বুঝ্‌তেই পারবেননা এতে ভয়ের কি আছে!

রাখাল বিষণ্ণ-মুখে কহিল, তবেই তো!

তারক চুপ করিয়া শুনিতেছিল, বন্ধুর এই নিরুৎসুক কণ্ঠস্বরে সে সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিল,—তবেই তো মানে? বাধা দেবার চেষ্টা করবেনা, আর এই বিয়ে হয়ে যাবে? এত বড় ভীষণ অন্যায়?

রাখাল কহিল, সে বুঝি, কিন্তু আমার কথায় বিয়ে বন্ধ হবে কেন ভাই? আর কর্ত্তাই তো শুধু নয়, আর সবাই রাজী হবে কেন?

তারক বলিল, কেন হবেনা? বরের বাড়ীর মত মেয়ের বাড়ীরও কি সবাই পাগল যে বল্‌লেও শুন্‌বেনা,—বিয়ে দেবেই?

কিন্তু গায়ে-হলুদ হয়ে গেছে যে। এটা ভুল্‌চো কেন?

হলোই বা গায়ে-হলুদ! মেয়েকে তো অন্যত্র চিতায় তুলে দেওয়া যায়না! বলিয়াই তাহার চোখ পড়িল সেই অপরিচিতা রমণী তাহার প্রতি নীরবে চাহিয়া আছেন। লজ্জিত হইয়া সে কণ্ঠস্বর শান্ত করিয়া বলিল, আমি জানিনে এঁরা কে, হয়ত কথা কওয়া আমার উচিত নয়, কিন্তু মনে হয় রাখাল, তোমার প্রাণপণে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। কোন মতেই এ ঘট্‌তে দেওয়া চলেনা।

রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, এঁরা কারা রাজু? মেয়ের সৎ-মা তো? তাঁর আপত্তি করার কি অধিকার?

রাখাল চুপ করিয়া রহিল। তিনি নিজেও ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া কহিলেন, তোমাকে তাহলে একবার বাগবাজারে যেতে হবে, ছেলের মামার কাছে। শুনেচি, ও-পক্ষে তিনিই কর্ত্তা। তাঁকে মেয়ের মায়ের ইতিহাসটা জানিয়ে বারণ করে দিতে হবে। আমার বিশ্বাস এতে কাজ হবে; যদি না হয়, তখন সে ভার রইলো আমার। আমি রাত্রি এগারোটার পরে আবার আস্‌বো বাবা,—এখন উঠি। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাখাল ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু তার পরে যে রেণুর আর বিয়ে হবেনা নতুন-মা। জানা-জানি হয়ে গেলে—

না-ই হোক্ বাবা, সে-ও ভালো।

রাখাল আর তর্ক করিলনা, হেঁট হইয়া আগের মতই ভক্তিভরে প্রণাম করিল। তাহার দেখা-দেখি এবার তারকও পায়ের কাছে আসিয়া নমস্কার করিল। তিনি দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াই হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, তারক, তোমাকে বলা হয়ত আমার উচিত নয় কিন্তু তুমি রাজুর বন্ধু, যদি ক্ষতি না হয়, এ দুটো দিন কোথাও যেওনা। এই আমার অনুরোধ।

তারক মনে মনে বিস্মিত হইল, কিন্তু সহসা জবাব দিতেও পারিলনা। কিন্তু এ জন্য তিনি অপেক্ষাও করিলেননা, বাহির হইয়া গেলেন। রাখাল জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল তিনি পায়ে হাঁটিয়াই গেলেন, শুধু গলির বাঁকের কাছে দরওয়ানের মতো কে-একজন অপেক্ষা করিতেছিল সে তাঁহাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করিল।

(ক্রমশঃ)

বিদায়

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

"My native land 'Good Night."
Child Harolde.

বিদায় বিদায় তবে স্বদেশ আমার—
বিস্তৃত জলধি-পারে তব ক্ষীণ রেখা
ধীরে ধীরে ঘিরি নেয় সন্ধ্যার আঁধার,
বুঝি হায় তোর সনে এই শেষ দেখা!

ওই যে বিহঙ্গকুল চলিয়াছে ছুটি'
আপন কুলায় বুঝি কাননে তোমার;
শুধু মোর তরে আর রহিবে না ফুটি'
সান্ধ্য দীপ কোন ঘরে জননী আমার।

ওই নামে সন্ধ্যা ধীরে স্নিগ্ধ করি' দিন
সিন্ধুবুকে ছল ছল শুধু উছলায়,
ক্ষীণ রেখা তটভূমি নিমেষে বিলীন,
পুনঃ আর বার তবে—বিদায়—বিদায়!

বিদায়—বিদায় মোর অতি আপনার,
বিদায় কাননে তোর শ্যামল অঞ্চল,
যে আঁখি মোছেনি কভু নয়ন-আসার
আজি দেয় তোর তরে দুটী বিন্দু জল।

যদি কভু দূর দেশে হিয়ার মাঝার
উঠি ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস গগনে মিলায়,
জানিস্ জানিস্ তবে জননী আমার
তোরি তরে উচ্ছ্বসিত ক্ষুব্ধ নিরাশায়।

স্বপ্ন এ কি? নহে নহে স্বপ্ন এ তো নয়,
ওই যে সিন্ধুর বুকে ঊর্ম্মিমালা দলি'
কোন্ দিগন্তের পানে অশান্ত হৃদয়
হায় বুঝি চিরতরে ছুটিয়াছি চলি'।

আর কি ফিরাবে মোরে জননী আমার
তোমার স্নেহের কোলে শ্যামল অঞ্চল,
কিম্বা আজীবন হায় সপ্ত পারাবার
তোমায় আমায় মাঝে রবে ছল্ ছল্।

আর কি কভু গো হায় সন্ধ্যা আগমনে
ফিরিব না ক্লান্ত দেহে আপনার মাঝে?
কভু কি স্নেহের ডাক শ্রান্ত প্রাণ মনে
করিবে না ক্লান্তি দূর জীবনের কাজে?

একে একে সান্ধ্য নভে ওই ফোটে তারা
না জানি মা তোর কত কোটী পল্লী মাঝে,—
হেথা শুধু চতুর্দ্দিকে তরঙ্গের সাড়া,
বিশ্বের বেদনা বুঝি এই বুকে বাজে!

কত গৃহে ফিরিল মা, বৎস ধেনু সবে,
ঘরে ঘরে জ্বলিল মা সন্ধ্যার প্রদীপ,
মুখরিত গৃহাঙ্গন শিশু-কলরবে
কিশোরী বধূর ভালে সযত্নের টীপ্।

কত গৃহে পল্লীবধূ দীপ লয়ে হায়
তুলসীর মঞ্চতলে লাজ নত-আঁখি
অঞ্চল আড়াল করি পাছে নিভে যা'য়,—
বংশ-বটমূলে কত ঝিঁ ঝিঁ ওঠে ডাকি'।

লক্ষ দেবালয়ে বাজে সন্ধ্যার আরতি
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশরের ওঠে ভীম রোল,
ধূপের সৌরভ ছায় চতুর্দ্দিক মথি',—
হায় হেথা বিশ্বে শুধু তরঙ্গের দোল।

কত ঘাট পারে হ'ল শেষ খেয়া পার—
—পারাণির কড়ি নিয়া বুঝি কোলাহল—
ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকিরা ঘেরে দীঘিধার
বাঁশবনে জেগে ওঠে বাদুড়ের দল।

হাট থেকে হাটুরেরা ফিরে যায় গেহ—
—সঙ্গীহারা পথে বুঝি কেহ ঘন হাঁকে—
সান্ধ্যদীপ সনে যেথা পথ চলে স্নেহ,
ওই সেই গ্রামখানি নদীটির বাঁকে।

কত ঠাকুমারে ঘিরি' শিশুদের মেলা,
কন্যাবতী তুলাবতী বেহুলা অশেষ,
কোথায় রাক্ষসপুরী দূর সিন্ধু-বেলা
রাজকন্যা অচেতন যার হাত কেশ;

কোথা বা পারুলদিদি, চম্পা সাত ভাই,
সাতটী চাঁপার মাঝে ঢুলু ঢুলু চোখ,
রাজা ডাকে রাণী ডাকে কোন সাড়া নাই,
ঘুঁটে-কুড়ুনির ডাকে ফুটিবে আলোক;

রাজপুত্র ওই কোথা রাজ্য ছেড়ে যায়
তেপান্তর মাঠ পানে কোন্ ডাক শুনি';—
কত লক্ষ গৃহে মাগো সন্ধ্যার ছায়ায়
রূপকথা চলে তার জাল বুনি' বুনি'।

কিন্তু হায় স্বপ্ন সব—সব আজি মায়া!
কোথা বঙ্গপল্লী-মার শ্যামল অঞ্চল,
কোথা তার সুনিবিড় সুশীতল ছায়া—
আর কোথা কূলহীন বারিধি চঞ্চল!

সেই বারিধির বুকে চলিয়াছি ছুটি'
কোথা কোন্ দিগন্তরে না-জানি সন্ধান;
সান্ধ্য নভে ও মা তোর তারাগুলি ফুটি'
সুধাবে কি—"কোথা তোর একটী সন্তান?"

"কোথা সে ছুটিয়া গেছে বিশ্রান্ত একাকী—
তোর কোলে কভু আর ফিরাবি কি তায়?"
দিক ঊর্দ্ধ হয়ে আছে অন্ধকার মাখি'
ও মা তবে শেষ বার—বিদায়—বিদায়।

রুদ্রের আবির্ভাব

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন-গুপ্ত

বিবাহের পর ব্যোমকেশ কয়দিন হইতে আমার কাছে একটা চাকুরির জন্য ঘুরিতেছে। বলিলাম,—এখেনে চাকরি আমি পাবো কোথায়? তবে কল্‌কাতায় যেতে চাও ত' মামার কাছে লিখে দিতে পারি।

বড়োবাজারে পিপুলের দোকান করিয়া মামা বিস্তর পয়সা করিয়াছেন। তাঁহাকে লিখিয়া দিলাম। উত্তরে তিনি লিখিলেন: পরের জন্য মাথা না ঘামাইয়া নিজেই সোজা চলিয়া এস। গ্রামে বসিয়া কী কেবল পচিয়া মরিতেছ? চাকরি করিতে চাও ত' একটা বন্দোবস্ত অনায়াসেই করিয়া দিতে পারিব। লোক আমারো চাই বটে, কিন্তু অনাত্মীয় অপরিচিতকে আমার একেবারেই ভরসা হয় না। কি করিব, ব্যবস্থা করিতেছি। কতো লিখিব, নিজে তুমি একবার আসিতে পারো না?

মামার চিঠি পাইয়া মনে-মনে হাসিলাম। গ্রামে বসিয়া পচিয়াই মরিতেছি বটে!

ব্যোমকেশকে বলিলাম,—চাকরি করে' কী হ'বে? তোমাকে কিছু জমি ছেড়ে দিচ্ছি, চাষ করো! খাবনা বাবদ কিছু চাই না, ফসল হ'লে কিছু ভাগ দিয়ো না-হয়। কেমন, রাজি?

ব্যোমকেশ লাফাইয়া উঠিল। গরু-লাঙল কিনিবার পয়সা নাই, আমিই ধার দিলাম। কিছু একটা মহৎ কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতেছি এমনি ভাবে কহিলাম,—জমিতে সুবিধে যদি কিছু না করতে পারো ত' এই ধার তোমার শোধ করতে হ'বে না।

মহাসমারোহে ব্যোমকেশ লাঙল ঠেলিতে লাগিল। ঝাঁকালো ভাষায় খবরের কাগজে এক রিপোর্ট পাঠাইয়া

দিলাম। বি-এ পাশ-করা ছেলে চাকুরির খোঁজে ক্যা-ক্যা না করিয়া নিজ হাতে জমি চষিতেছে—বড়ো-বড়ো হেড্‌লাইনে খবরটা দিগ্বিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। যোমকেশ ভাবিল কী যেন একটা করিতেছি! আমি ভাবিলাম মামার উপর খুব একটা প্রতিশোধ নেওয়া হইল যা হোক্!

বাসন্তী প্রথমে এখানে আসিতে রাজি হয় নাই। কিন্তু চারদিকের খোলা মাঠ, দূরে নদী ও নতুন ছবির মতো ঝক্‌ঝকে বাড়িখানি দেখিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল। ছেলে-বেলা হইতে শহরে মানুষ হইয়াছে, গ্রামের কথা শুনিতেই তাহার মনে গরুর গাড়ির চাকার একঘেয়ে করুণ আর্ত-নাদের মতো একটা ক্লান্তিকর অবসাদ আসিত। কিন্তু অপর্যাপ্ত বাতাসে আঁচল ফুলাইয়া নদীর পাড়ে যখন আসিয়া সে দাঁড়াইল, তখন স্পষ্ট অনুভব করিলাম তাহার চোখের দৃষ্টি আরো কালো ও গভীর এবং শরীরের শহুরে রুক্ষশ্রী সবুজ ও ঠাণ্ডা হইয়া উঠিয়াছে। এতো বড়ো সাম্রাজ্যে তাহার কর্ত্রীত্ব অসীম; তাহার মুখের একটি কথায় মন-মজুর একশোখানা কাজ নিমেষে সমাধা করিয়া আনে;—দেখিতে দেখিতে তাহার হুকুমে সামনের জমিটা ফুলন্ত বাগান হইয়া উঠিল; দুইটি শিশু গাছ যেখানে ঘেঁসাঘেঁসি হইয়া ছায়া করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার নিচে বাঁশের একটি মাচা বাঁধা হইল;—সেখানে সকালবেলা সে পড়িবে ও বিকেলে বেড়াইয়া আসিয়া বিশ্রাম করিবে। বেড়ার গা বাহিয়া মালতীর লতা উঠিল, লোক লাগাইয়া আগাছা দূর করিয়া ছোট উঠানটি সে তাহার পায়ের তলার মতো নরম ও তকতকে করিয়া তুলিল। দিল্লির দেওয়ানি-খাস্‌এর সিলিঙের মতো বাসন্তীও এইখানে ফুলের অক্ষরে লিখিয়া দিল যে স্বর্গ, বলিয়া যদি কিছু থাকে ত' এইখানে, এইখানে।

বিবাহের দান-সামগ্রীর যাবতীয় জিনিস আসিয়া পৌঁছিল—দক্ষিণের ঘরটাকে ছোটখাটো একটা ড্রয়িং-রুম বানাইয়া ফেলিলাম। বন্ধু-বান্ধবের বালাই নাই, আমরাই পরস্পরের নির্জ্জনতা কথায় ও স্পর্শে, হাসিতে ও দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছি। বাসন্তী যখন একা ঘরে বসিয়া রান্না করে ও আমি যখন একা ঘরে বসিয়া গল্প লিখি তখনো আমরা নির্জ্জন নই—যখন কিছুই নেহাৎ করি না তখনো আকাশ ও আলো, তারা ও অন্ধকার মিলিয়া আমাদের পরিপার্শ্বের শূন্যতাকে স্বপ্নের মতো আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

মা মারা যাইবার পর বাবা একা-একা এইখানে বসিয়া বিস্তৃত আকাশের সঙ্গে অপরিসীম বিরহ-ভোগ করিতে-ছিলেন। আমি তখন কলিকাতায় মেস্-এ থাকিয়া কলেজে পড়িতেছি ও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের যুবকের মতো কলেজ ঠিক না পলাইলেও শনিবার-শনিবার শ্বশুরালয়ে নিয়মিত আতিথ্য নিতেছি। এবং আশ্চর্য্য এই, গল্পে-গুজবে খাওয়া-দাওয়ার অসাবধানে রাত্রি যখন বেশি করিয়া ফেলিতাম ও জোরে ঘণ্টা বাজাইয়া লাষ্ট ট্রামকে যখন অনায়াসে চলিয়া যাইতে দিতাম, তখন চট্ করিয়া মনে পড়িয়া যাইত যে আজ রাত্রে মেস্-এ যাইবার কোনো পথই আর খোলা রাখি নাই। এবং শনিবারের রাতটাই যখন যাই-কি-না-যাই এমনি বিধা উত্তেজনার মধ্য দিয়া কাটাইয়া দিলাম, তখন নিশ্চিন্ত হইয়া রবিবারের রাতটাই বা ঘুমাইয়া লইতে কী হইয়াছে! এমনি এক সোমবার জোরে অনিদ্রা-ক্লিষ্ট চক্ষু লইয়া মেস্-এ ফিরিয়া আসিয়া দেখি আমার নামে একটা টেলি কখন হইতে পড়িয়া আছে। খবর আর কিছু নয়, বাবা হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে মারা গিয়াছেন।

সে সব অনেক কথা। শ্বশুর-মহাশয় এখানেই একটা কাজ দেখিয়া লইতে বলিলেন—মেয়েকে চোখের কাছে রাখিবেন ও পচা পুকুরের জল ঘাঁটিতে দিবেন না এমনি একটা অজুহাতে আমার জন্য বাড়ি-ভাড়ার টাকা গুণিতেও রাজি হইয়া গেলেন। কিন্তু গ্রামে যাইবার কী যে গোঁ ধরিয়া বসিলাম, মনে হইল ত্রেতা যুগে রাম হইয়া অবতীর্ণ হইলে সেই জোরে অনায়াসে হরধনু চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারিতাম। গ্রামে ত' আসিলামই, বাসন্তীকেও সঙ্গে লইয়া আসিলাম। সে যতোই কেন না নাসাগ্রভাগ কুঞ্চিত করুক, এতো বড়ো আকাশ ও মাঠ-নদী ভরিয়া এতো প্রচুর জ্যোৎস্না তাহার দুই চোখে আর ফুলাইয়া উঠিতেছে না। বাপের বাড়িতে নিতান্তই সে পরগাছা ছিল, কিন্তু এইখানে সে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া উঠিয়াছে। জীবনে কোথায় যে তাহার আসন, এতো দিনে তাহা আবিষ্কার করিতে পারিয়া তাহার অহঙ্কারের আর সীমা নাই।

বাসন্তীকে লইয়া আসিবার সময় শ্বশুর-মহাশয়ের সঙ্গে

ছোটখাটো একটা কসার সূত্র ধরিয়া ভীষণ কলহের অবতারণা হইয়া গেল। তিনি সরাসরি বলিয়া বসিলেন: বাসন্তী যদি আমার কথার অবাধ্য হয়, তবে ওর মুখ আমি কখনো দেখ্‌বো না।' বাসন্তীর মুখের দিকে তাকাইলাম, —সে ধীরে আমারি পাশে সরিয়া আসিল। মেয়ের এই দুর্বিনীত ঔদ্ধত্য তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অস্ফুট একটা চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বাসন্তীকে লইয়া ট্যাক্সি করিয়া ষ্টেশনের পথে আসিতে-আসিতে কহিলাম,—তুমি রামায়ণে সীতার মতোই একটা অসমসাহসিক সতীর দৃষ্টান্ত দেখালে।···

রিক্তহস্তে আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু বিয়ের সময় শ্বশুর-মহাশয় সখ করিয়া যাহা-যাহা যৌতুক দিয়াছিলেন স্পষ্ট রূঢ় কণ্ঠে তাহা দাবি করিয়া বসিলাম। খাট টেবিল আল্না-দেরাজ বাসন-কোসন হইতে সুরু করিয়া বাসন্তীর চুলের পিন্ ও আমার ফাউণ্টেন-পেন্‌এর ক্লিপটি পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিল। সঙ্গে শ্বশুর-মহাশয় কড়া করিয়া একটা চিঠি দিয়াছিলেন বটে যে এই সব জিনিস ঘরে পুঁজি করিয়া রাখিতেও তাঁহার ঘৃণা হইতেছে, কিন্তু নিজের ঘরে পুঁজি করিয়া রাখিবারো যে কোন কালে তাঁহার অধিকার ছিলনা সবিনয়ে এই কথাটাও তাঁহাকে জানাইয়া রাখিলাম। যাহা হোক্, সেইখানেই যবনিকা পড়িল। কিন্তু বাসন্তী এততেও ক্ষান্ত হইল না,—সময়ে-অসময়ে কেবল নানাজাতীয় ক্যাটালগ্ লইয়া নাড়া-চাড়া করে, আর এটা-ওটা ফরমাজ করিয়া কলিকাতার সাহেব-পাড়ার দোকানগুলিকে ব্যতি-ব্যস্ত করিয়া তোলে। বিয়েতে নগদ যাহা কিছু পাইয়াছিলাম তাহা দিয়া বইয়ে-আদবাবে ঘর-দুয়ার ভরিয়া ফেলিলাম। পা-পোষের মতো পুরু কার্পেট হইতে সুরু করিয়া দেয়াল-জোড়া বড়ো-বড়ো দিশি-বিলিতি ছবিতে ঘর-দুয়ার গম্‌গম্ করিতে লাগিল।

নিজের শরীর সম্বন্ধে যতোটা না হোক্, গৃহ-প্রসাধনে বাসন্তী একেবারে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমি কিন্তু গৃহ ছাড়িয়া গৃহস্বামিনীকেই শুধু দেখিতেছি। বাসন্তীকে দেখিতে এখন কতো যে সুন্দর হইয়াছে ভাবিয়া তৃপ্তির কূল পাইতেছি না। প্রত্যেক ছবির প্রকৃত আবেদন যেমন তাহার পটভূমিতে, তেমনি অন্তরালহীন আকাশের প্রতি-বেশের মধ্যে এতদিনে তাহার সত্যিকার রূপ উদ্ঘাটিত হইল! পায়ের রক্তাভ নখকণা হইতে সুরু করিয়া কৌতূহলা-বিষ্ট ভুরু দুটির চঞ্চল সঙ্কেতে লাবণ্যের তরল একটি নদী-রেখা নিঃশব্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

বলিতাম,—এতো সব জিনিস-পত্রে ঘর বোঝাই করছ, এ তোমার দেখবে কে? লোককে দেখাতে না পারলে বিলাসিতার সুখ কী!

বাসন্তী কোমরে আঁচলটা জড়াইতে-জড়াইতে কহিত,— কে আবার দেখবে? আমি আর তুমি।

হাসিয়া বলিতাম,—নিজেদের দেখবার জন্য নিজেরাই ত' যথেষ্ট আছি। এ-সব বাজে আড়ম্বরে নিজেদের খালি সঙ্কীর্ণ করে' রাখা!

বাসন্তী সেই সব কথা শুনিবারই মেয়ে বটে! ততক্ষণে পেট্রোম্যাক্সটা ফিট্ করিলে তাহার কাজ দিবে।

জীবনে নূতন একটি আবহাওয়া আসিয়াছে। প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত গাঢ়, প্রথম চুম্বনের মতো রোমাঞ্চময়। চারিদিকে কেমন একটা মুক্তির নিমন্ত্রণ পাইতেছি, আকাশের প্রত্যেকটি তারা বাসন্তীর দেহের প্রত্যেকটি রোমকূপের মতো পরিচিত, ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। বাসন্তীর দেহে নূতন স্বাদ, আমার অনুভূতিতে নূতন তীব্রতা! গ্রামের এই বিরাট সঙ্গহীনতায়ও নিজেদের কিছুমাত্র নির্জ্জন লাগে না; যখন আমি ঘরে বসিয়া লিখি ও বাসন্তী রান্নাঘরে বসিয়া রান্না করে, তখনও প্রকৃতি সঙ্গে নিঃশব্দে আমাদেরই মতো পরস্পরের কাছে অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে। অথচ শহরের জন-বহুল বিপুল উৎসব-আয়োজনের মধ্যেও নিজেকে কতো একা ও অনর্থক মনে হইয়াছে।

এই নতুনতরো নেশা ছাড়িয়া আমি শহরে গিয়া চাকুরি করিব ও রাস্তায় চলিতে প্রতিমুহূর্ত্তে গাড়ি ঘোড়ার উৎপাত হইতে বাঁচাইয়া চলিবার মায়বিক উত্তেজনায় দিনের পর দিন ক্লান্ত হইতে থাকিব—শ্বশুর-মহাশয় আমাকে কী ভাবিয়াছেন!

বাবা নগদ টাকা কিছু রাখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু এই ছোট সুন্দর বাড়িখানি, বিঘে পাঁচ-সাত আবাদি জমি, কয়েক ঘর প্রজা এই নিয়াই আমি আমার জীবনকে সুদীর্ঘ একটি রবিবারের সুরে ভরিয়া নিতে পারিব। চাকুরি করিব কোন্ দুঃখে? জীবিকা-নির্ব্বাহের ক্ষমাহীন কঠিন প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব এড়াইয়া এই যে অবারিত একটি

আলস্য ভোগ করিতেছি কী বলিয়া ইহার তুলনা দিব। আমার এই অবকাশের আকাশ হইতেও তারার ধূলিজের মতো কত কাহিনী কত ঘটনা কত চরিত্র মূর্তিমন্ত হইয়া উঠিবে কে বলিতে পারে।

রাত করিয়া গাছ-পালা ঝাপসা করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল। শিয়রে মোমবাতি জ্বালিয়া নতুন একটা গল্প লিখিতেছি। ইজিচেয়ারের গভীর কোলে ডুবিয়া গিয়া বাসন্তী কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!

কান পাতিয়া দূরে নদীর তরল কোলাহল শুনিতেছি!

আবছা অন্ধকারে বাসন্তীকে কেমন-যেন অত্যন্ত ক্লান্ত বলিয়া মনে হইল। মনে হইল গ্রামের এই অজস্র প্রশান্তি ধীরে-ধীরে তাহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। সে হয়ত' গভীরতার বদলে বিস্তার কামনা করে—প্রচুর বৈচিত্র্যের মাঝে নিজেকে সে প্রকাশিত, বিকীর্ণ করিতে চায়—এইখানে তাহার আর ভালো লাগিতেছে না। একটানা বৃষ্টির শব্দে তাহার দীর্ঘশ্বাসটি স্পষ্ট কানে বাজিল।

পায়রার বুকের মতো তাহার নরম তপ্ত দেহটিকে কোলে করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলাম। জাগিয়া উঠিয়া সে আমাকে জাঁকড়াইয়া ধরিল। কহিল,—আমার বড্ড ভয় করছে।

বলিলাম,—ভয়? ভয় কিসের?

আর সে কথা কহিল না। আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ঘুমাইতে লাগিল।

মোমবাতিটা নিবাইয়া শুইয়া পড়িলাম। চারিদিকের রাশি-রাশি কোলাহল যোজনব্যাপী বিরাট স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করিয়া দিতেছে। এই কোলাহলও বাসন্তী সহ্য করিতে পারে না, তাহার ভয় করে। জনবিরল মাঠের মধ্য দিয়া ঝোড়ো হাওয়ার উদ্দাম দীর্ঘশ্বাস তাহাকে অস্থির করিয়া তোলে, সারা রাত ঘুমাইতে দেয় না।

কিন্তু ভোর হইতেই আবার সেই নিঃশব্দতা! বাসন্তী পরিচিত জগতে নামিয়া আসিয়া হাঁফ ছাড়ে। হাসিমুখে জিনিস-পত্র ঝাড়ে-পোঁছে, ঘর-দুয়ার ছুরির ফলার মতো ঝক্‌ঝকে করিয়া তোলে।

নদী কাল রাত্রে নাকি অনেক দূর ভাঙিয়া আসিয়াছে—বাসন্তীকে লইয়া তাহাই দেখিতে চলিলাম।

বৃষ্টি পাইয়া ব্যোমকেশের ক্ষেত মাতামাতি সুরু করিয়াছে। গাঢ় সবুজে দিকে সোনালির আভা দিয়াছে দেখা যায়। ব্যোমকেশের স্ফূর্তি আর ধরে না। সেও আমাদের সঙ্গে চলিল।

বেশি দূর যাইতে হইল না—নদীই যা-হোক অনেকটা আগাইয়া আসিয়াছে। এখনো তাহার আর্তনাদ থামে নাই। সর্বাঙ্গ ভরিয়া এখনো তাহার উত্তাল উৎসাহ। ভীষণ খাড়া পাড়, নিচে চাহিলে দস্তুরমতো পা কাঁপিতে থাকে। দাঁড়াইয়া আছ, অমনি তোমাকে বেষ্টন করিয়া মাটিতে প্রকাণ্ড একটা চিড় ধরিয়া গেল, সাবধান না হইলেই অমনি তোমাকে শুদ্ধ গ্রাস করিয়া বসিবে। দূরে চাহিলে মনে হয় একটা ঝিন্‌ঝিনে সাদা সিল্কের আঁচল ফাঁপাইয়া কে যেন সাঁতার কাটিতেছে—খালি পাড়ের কাছেই তাহার দিগ্‌বসনা রাক্ষুসি মূর্তি! কাল শেষরাত্রের দিকে নটবর ভূনালির ঘরটা নিয়াছে—অন্নের জন্য ছেলেপিলে লইয়া সে বাহির হইতে পারিয়াছিল; চালের কুটাটি পর্যন্ত বাঁচাইতে পারে নাই। নদী একটু জুড়াইলে সে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে অন্তত তাহার স্ত্রীর গলার হাঁসুলিটা সে উদ্ধার করিতে পারে কি না। স্ত্রী মারা গিয়াছে পর এই একটিমাত্র চিহ্নই সে কোনোক্রমে আঁকড়াইয়া ছিল,—শত অভাবে পড়িয়াও তাহা সে বিক্রি করে নাই। কাহারো বাধা সে মানিবে না, জলটা একটু জুড়াইলেই সে নামিয়া পড়িবে। অমাবস্যা ছাড়িতে আর ঘণ্টা দুইমাত্র বাকি।

বাসন্তী বেশিক্ষণ সেইখানে আমাকে দাঁড়াইতে দিল না। গর্জমান বিরাট নদীর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া থাকিতে তাহার ভয় করে। মনে হয় কেনময় বাহু বাড়াইয়া অলক্ষ্যে সে আমাদের দুইজনকে ডাকিতেছে। পায়ের কাছের মাটিতে হঠাৎ একটা চিড় ধরিতেই সন্ত্রস্ত হইয়া বাসন্তীকে লইয়া পলাইয়া আসিলাম।

বিকেল হইলেই মা'র কোলে ঘুমন্ত খুকিটির মতো নদীর জল স্তিমিত হইয়া আসিল। বাসন্তী এতক্ষণে হাসিয়া কথা কহিতে পারিতেছে। দুইজনে আবার বেড়াইতে বাহির হইলাম—ব্যোমকেশ অবশ্য এইবার সঙ্গে

আসিল না। চলিতে-চলিতে শ্মশান ছাড়িয়া একটা নির্জ্জন মাঠের উপর আসিয়া পড়িয়াছি। নদী-ভাঙা প্রকাণ্ড একটা অশ্বত্থের গুঁড়ির উপর পাশাপাশি দুইজনে বসিলাম। সামনেই নদী—এখন দেখিতে নিতান্তই বাঙালি মেয়ের মতো নিরীহ, রূপালি গলায় মৃদু-মৃদু কথা কহিতেছে। যতো ভাবি নদীর দিকে বেড়াইতে আসিব না, ততোই নদী আমাদের কাছে টানিয়া আনে। আর যাইবারই বা জায়গা কোথায়? যেখানে যাইব সেইখানেই নদী তাহার চঞ্চল ও সুনীল চক্ষু মেলিয়া রাখিয়াছে! দেখিতে-দেখিতে কতো কাছে যে আগাইয়া আসিল। আমাদের বাড়ির দক্ষিণে যে ঝাউগাছের সারি ঘন হইয়া দাঁড়াইয়া আকাশকে সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল, দেখি তাহা হঠাৎ কোন্‌দিন ফাঁকা হইয়া গেছে! এখন দক্ষিণটা একেবারে শাদা, সবুজ বা নীলের কোথাও এতটুকু বাধা নাই—যেন অখিলম্বরতার গাঢ় হ্রদ। এত বড়ো মুক্তির চেহারা দেখিয়া দুইজনে মনে-মনে ভীত হইয়া পড়ি, কিন্তু সেই ভয় পরস্পরের থেকে লুকাইতে গিয়া আরো সহজে ধরা পড়িয়া যাই।

যে-জায়গাটায় আসিয়া বসিলাম তাহা গাছ-পাতার আড়ালে, কা'র একটি কুটীরের নিভৃত আঙিনায়! কোন চাষা-ভুষোর বাড়ি হইবে, নদী কাছে আসিয়া পড়ায় আগেই বিদায় নিয়াছে। ছোট উঠানটি ঘিরিয়া সংসারের ছোট-ছোট চিহ্ন এখনো এখানে-সেখানে ছড়ানো আছে দেখিলাম। তাড়াতাড়িতে সব জিনিস হয় ত' সরাইতে পারে নাই—মানুষের প্রাণের চেয়ে কতকগুলি ভাঙা-কুলোর দাম ত' আর বেশি নয়। তবু সেই পরিত্যক্ত শূন্য ঘরের নিরানন্দ চেহারা দেখিয়া মন ভারি বিমর্ষ হইয়া উঠিল। এখন তাহারা কোথায় উঠিয়া গেছে না জানি!

বাসন্তী হাল্‌কা সুরে অনেক সব কথা কহিতে লাগিল। সম্প্রতি এখানে সে ছোটখাটো একটা পাঠশালা করিতে চায়—বিনে-মাইনের ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে পড়াইয়া তবু যা-হোক্ করিয়া দিন তাহার কাটিবে। আমি উহার আবদার চিরকাল পালন করিয়াছি, আজো কহিলাম,—সরকার-মশায়কে বলে' দেব, সামনের বাগানের ধারে তালপাতার ছাউনি দিয়ে একখানা ঘর তুলে দেবেন।

বাসন্তী ঠোঁট কুলাইয়া কহিল,—একটুখানি ত' ঘর, তা আবার তালপাতার কেন? রাণিগঞ্জের টালি দেবে।

—একটুখানি বলে'ই ত' তালপাতার বল্‌ছি।

—গরিব ছেলে-মেয়েরা পড়বে বলে'ই বুঝি এমনি হেনস্তা করতে হয়? বেশ পাকা দালান হ'বে—উঁচু ক্লাশের ছাত্র জুটলে তুমিও মাষ্টারি করতে পারো,—অবশ্যি আমি যদি ঘরখাত মঞ্জুর করি। দু'জনে কাজ পেয়ে বেঁচে যাবো। এমনি আর পারিনে।

বলিলাম,—খালি পাকা দালান হ'লেই চল্‌বে?

—বাঃ, বেঞ্চি-চেয়ার কিনতে হ'বে না? ম্লোব, ম্যাপ, ব্ল্যাকবোর্ড, আলনারি—সে-সব ফর্দ্দ আমি ঠিক করে' রাখ্‌বো। সরকার-মশায়কে বলে' তুমি কেবল টাকা জোগাড় করে' দেবে।

—সে যে অনেক খরচ।

—টাকা তবে আছে কী করতে? এ ত' আর বাজে কাজে উড়োচ্ছি না—দস্তুরমতো দেশের কাজ।

—কিন্তু টাকা পাবো কোথায়?

—সরকার-মশায়কে বল্‌লেই তিনি বন্দোবস্ত করে' দেবেন। কাজ ছাড়া আমি বাঁচি কী করে' বলো? ওদিকে আমার ভারি-হাতে একটা অসুখ করুক্, তখন ত' উঠে পড়ে' খরচ করতে সুরু করবে! কেমন, ঠিক কি না।

তাহার একটি হাত নিজের মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিলাম। মাথার উপর দিয়া এক ঝাঁক গাঙ-শালিক উড়িয়া গেল। পাখার চাঞ্চল্যে সমস্ত নিঃশব্দতা হঠাৎ স্বচ্ছ, তরল হইয়া আসিল। দূরে খেজুর গাছের দীর্ঘ পাতার ফাঁকে একটি তারা উঠিয়াছে। সূর্য্য কখন-ডুবিয়া গিয়াছে খেয়াল করি নাই।

অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেই নদীকে পিছনে রাখিয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলাম। যতো এগোই ততোই মনে হয় নদীও যেন নিঃশব্দে আমাদের অনুসরণ করিতেছে। পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখি নিঝুম কালো নদী বালির বিছানায় গা এলাইয়া ঘুমাইতেছে—কোথাও যেন এতটুকু নিশ্বাসের স্পন্দন নাই। দেখিয়া ভারি নিশ্চিন্ত হইলাম। বাসন্তী আমার দিকে চাহিয়া কেমন করিয়া যেন একটু হাসিল।

দিন পনেরো-কুড়ির মধ্যে বাসন্তীর স্কুলের দালান উঠিয়া গেল।

বাসন্তীর আনন্দ দেখে কে! নিতাই কামারের দুইটি ছেলে নিয়া সে অ-আ সুরু করিয়া দিল। ইহাদের একটিও যে ভবিষ্যতে হাইকোর্টের জজ হইবে না এমন কথা হলফ করিয়া বলিবার আর সাহস রহিল না।

দুপুরের আগেই বাসন্তী খাওয়া-দাওয়ার পাট তুলিয়া 'ভাষ্টার' ও খড়ি লইয়া ইস্কুলে গিয়া ঢোকে, আর নিতাই কামারের দুরন্ত দুই ছেলে অক্ষর ভুলিয়া যতোই ঘরময় দাপাদাপি করিতে থাকে, বাসন্তীর উৎসাহ ততোই বাড়িয়া যায়। শাসন করিবার পদ্ধতিটা তাহার অতিমাত্রায় আধুনিক। একটুও রাগে ত' সে না-ই, বরং দুরন্ত ছেলে দুইটাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুমায়-চুমায় চোখ-মুখ আচ্ছন্ন করিয়া উহাদের সায়েস্তা করিতে চেষ্টা করে।

দক্ষিণের কোঠায় বসিয়া আমি তাহা দেখি ও লিখিবার কিছু প্লট্ খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে একটি সন্তানকামনাতুরা নারীর নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতা লইয়া গল্প লিখিবার ভাবা খুঁজিয়া বেড়াই।

গ্রামে সম্প্রতি কে-একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছে। বাগ-যজ্ঞ করিয়া নদী শুকাইয়া দিবে বলিয়া আমাদেরই সম্মুখের মাঠে তাঁবু গাড়িয়াছে। সেখানে আজ বড়ো ভিড়। পূজা যখন একটা হইবেই, প্রসাদ নিশ্চয় আর বাদ পড়িবে না,—অতএব সেইখানে না গিয়া এইখানে বসিয়া ভালুকের মতো ভীষণ দুইটা অক্ষরের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিয়া তাহাদের অবয়বের অলৌকিক গঠন-প্রণালীটা আয়ত্ত করিতে হইবে নিতাই কর্মকারের ছেলেরা তাহা বরদাস্ত করিতে পারিল না। বাসন্তীর আঁচলের তলা হইতে কখন্ ছুটিয়া পলাইল।

বাসন্তী বিরত হইবার মেয়ে নয়। কখন আবার ইস্কুলের জন্য উমেদারি করিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে!

মাসখানেক কাটিয়া গেল। এত করিয়াও ছেলেতে-মেয়েতে মিলাইয়া চার-পাঁচটির বেশি সে জোগাড় করিতে পারিল না। নদীতে গ্রাম লোপাট হইতে চলিল, বাসন্তীর হাতে দিগ্‌গজ হইবার জন্য কে এখানে সখ করিয়া বসিয়া থাকিবে?

সন্তানকামনাতুরা নারীর সেই গল্পটা আজ রাত্রে ঘুমাইবার আগে বাসন্তীকে শুনাইব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু নদীর গর্জ্জনের সঙ্গে রাত্রির অপার নিঃশব্দতা মিলিয়া তাহাকে এমন অভিভূত ও ক্লান্ত করিয়া ফেলিয়াছে যে প্রস্তাবটা পাড়িবার আগেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার শুইবার ভঙ্গিটা এত করুণ ও কৃশ যে মায়া করিতে লাগিল। দুইয়া পড়িয়া তাহার দেহে—রাত্রির নিঃশব্দতার মতো শীতল দেহে চুমা খাইলাম, কিন্তু সে একটুও সাড়া দিল না। ভাটার নদীর মতো নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া রহিল।

আশ্চর্য্য, আমার কেবল এই কথাই মনে হইতে লাগিল নদীর এই ক্ষিপ্ত উদ্বেলতা বাসন্তীর যৌবনকে ক্রমে-ক্রমে ম্লান, স্তিমিত করিয়া আনিয়াছে। নদীর লবণাক্ত তিক্ত স্বাদের কাছে বাসন্তীর দেহের মদিরা অনেকাংশে জলীয়, তাহাতে আর সেই আনন্দময় জ্বালা নাই। নদী এখন এত প্রত্যক্ষ, এত নিদারুণ, এত অজস্র-উচ্ছ্বসিত যে বাসন্তীকে সে অনায়াসে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল। প্রকৃতির কাছে মানুষের এই অপ্রতিবাদ পরাভব ইহার আগে আর কখনো দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

বাসন্তীর আর সেই লীলা নাই, সেই আবেগের আগুন তাহার নদীর জলে নিভিয়া গেছে। আমি বোধ হয় দিনে-রাত্রে নদীর এই উন্মাদনায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিলাম—বাসন্তীকে আর চোখে ধরিল না।

গরুর তরি-তরিকারি বেচিয়া দিন গুজরাইত—একদিন সপরিবারে সে আসিয়া আমার কাছে ইস্কুল ঘরে থাকিবার মিনতি জানাইল,—কাল রাত্রে তাহার ঘর-বাড়ি কেত-খামার নদীর জলে উজাড় হইয়া গেছে। আজ রাতটা কোনো রকমে কাটাইয়া সে অন্য কোথাও চলিয়া যাইবে—কোথায় যে যাইবে এখনো তাহা ঠিক করে নাই। বাসন্তীর থেকে চাবি চাহিয়া সরকার-মহাশয়কে দিয়া দরজা খুলাইলাম। উহাদের আয়গা হইল—এবং দেখিতে দেখিতে ইস্কুল-ঘরটা বিচিত্র একটা ধর্ম্মশালার চেহারা নিয়া বসিল। কাহারো নড়িবার নাম নাই। শেষে কেবলই মনে হইতে লাগিল নদী এই হতভাগাদের খুঁজিয়া ফিরিতেছে—উহাদের না সরাইলে হয়ত' আমারই দরজার কাছে আসিয়া হানা দিবে! গরুর গাড়ি ডাকাইয়া পোঁটলা-পুঁটলিতে চিড়ে-চাল বাঁধিয়া উহাদের

পথ দেখিতে বলিলাম। রাজি না হওয়া ছাড়া উহাদের উপায় ছিল না—উহাদের তাড়াইবার জন্য বাসন্তী এমন বিজাতীয় গো ধরিয়াছে! যদি ক্ষুধার তাড়নায় একদিন সকলে মিলিয়া লুঠ-তরাজ করিয়া আমাদের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ফেলে! উহারা একে-একে বিদায় নিল বটে, কিন্তু নতুন গৃহ-প্রবেশের সম্ভাবনায় কেহ যে বিশেষ খুসি হইল এমন মনে হইল না। রাজা মিঞা ত' কাঁজালো গলায় দস্তুরমতো শাসাইয়া গেল যে, এমন করিয়া যে গৃহহীনদের তাড়ায় রাক্ষুসী নদী তাহাকেও তাড়াইয়া ফিরিবে!

আমাদের অতিথিবৎসল না হওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না, কয়েকদিন পরেই আরেক দল লোক আসিয়া হাজির—ইস্কুল-ঘরে আজ রাত্রের জন্য তাহাদের ঠাঁই দিতে হইবে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল,—কণ্ঠস্বরটা যে কাহার প্রথমে ঠিক চিনিতে পারিলাম না। জান্‌লা ফাঁক করিয়া দেখিলাম লোকটার পিছনে একটি স্ত্রীলোক ও তাহাকে ঘন করিয়া ঘেরিয়া কতগুলি শিশু ভিজা কাপড়ে হি-হি করিয়া কাঁপিতেছে—এতো বড়ো আকাশের তলে কোথাও তাহাদের এতটুকু আশ্রয় নাই। লণ্ঠন জ্বালিয়া ছাতা মাথায় দিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম এ আর কেহ নয়, আমারই প্রজা—নবীন মাইতি। বুঝিতে বাকি রহিল না, নদী আমাদের জমিতে থাবা বসাইয়াছে!

বলিলাম,—ঘর-দোর সব গেলো?

নবীন গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল,—সব বাবু, কোনো রকমে সেরে আসতে পেরেছি। আজই এমন ঝড়-বৃষ্টি করে' না এলে আরো কিছুদিন থাকতে পারতাম। এখন আপনি জায়গা না দিলে ছেলেপুলে নিয়ে কোথায় যাই বলুন।

পরিষ্কার বুঝিলাম তাহার কাছে যে বাকি-খাজনা পাওনা ছিল নদী তাহাও কাড়িয়া নিয়াছে।

ধমক দিয়া উঠিলাম: সময় থাকতে সরতে পারিস নি? জিনিসপত্র কতক ত' অন্তত বাঁচতো।

কিন্তু ধমকাইয়া তাহাকে কী করিব? স্ত্রী-পুত্র লইয়া যে বাঁচিতে পারিয়াছে, এই ঢের—তুচ্ছ কতকগুলি জিনিস দিয়া তাহার কী হইবে?

নবীন মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কহিল,—তাড়াতাড়িতে এই মাদুর আর বালিশ দুটো শুধু নিতে পেরেছি—

ও-দিক হইতে নবীনের ছোট ছেলে বলিয়া উঠিল:—আর আমি আমার এই নাটাইটা, বাবা!

মুখ-চোখ বিবর্ণ করিয়া সরকার-মহাশয় ভয়ে-ভয়ে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। লেখা হইতে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলাম: আজকে কী নতুন খবর?

সরকার-মহাশয়ের মুখে তখুনি ভাষা জুয়াইল না। অনেক ঢোঁক গিলিয়া পরে কহিলেন,—আমগাছগুলি কাল গেছে।

বিস্মিত হইব না ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু খবরটা এমন মর্ম্মান্তিক যে মনে হইল যেন এইমাত্র কোনো আত্মীয়তম পরমবন্ধুর মৃত্যুর খবর শুনিতেছি। চমকাইয়া উঠিলাম: কোন্ আমগাছ? সিঁদুরেটা?

—সব। সরকার-মহাশয় ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারিলেন না।

মনে আছে গত বৎসর এমনি বৈশাখের সন্ধ্যায় বাসন্তীকে লইয়া এই আমবাগানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বিন্দুমাত্র আভাস না দিয়া নির্লজ্জ এই নদীর বন্যার মতো অকস্মাৎ আকাশে তুমুল ঝড় উঠিয়াছিল। জোরে বাতাস ছাড়িতেই কচি-কচি আম অজস্র শিলাবৃষ্টির মতো এখানে-ওখানে করিয়া পড়িতে লাগিল,—কোঁচড় বাঁধিয়া বাসন্তীর সে কী আম কুড়াইবার ঘটা! ধূলায় সমস্ত মাঠ-বাড়ি একাকার হইয়া গেছে, খানিকটা গরম থাকিয়া সমস্ত শূন্য পাথরের মতো ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, কোথায় কাহাদের গরু-ছাগল ভয় পাইয়া চীৎকার পাড়িতেছে—বৃষ্টি এই আসিল বলিয়া! আর, আকাশের যেমন চেহারা, বৃষ্টি একবার আসিলে সহজে থামিবার নাম করিবে না। কিন্তু কথা শুনিবার মেয়ে বাসন্তী নয়। হাওয়ায় চুল ও আঁচল এলো করিয়া প্রাণপণে সে আম কুড়াইতে লাগিল। ঝড় এমন দুর্দ্দান্ত যে তাহাকে প্রবল পুরুষ-স্পর্শের আলোড়নে একেবারে বিপর্য্যস্ত ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিতেছে। বলিলাম,—কেন এত ব্যস্ত হচ্ছ? ঝড় থামলে চাকরকে পাঠিয়ে দেব, সব আম কুড়িয়ে নেবে।

বাগান ত' আমাদেরই—ভাবনা কিসের? বাসন্তী তবুও কথা শুনিল না। উন্মত্ত বাতাসে কাপড়ের প্রান্ত উড়াইয়া পিঠময় চুলের ঢেউ তুলিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে আম কুড়াইতে লাগিল। আবহাওয়াটি এতো গম্ভীর ও এতো ভয়ঙ্কর যে তাহাকে আমার অত্যন্ত অপরিচিত ও অপরিচিত বলিয়াই প্রখরতররূপে সুন্দর বলিয়া মনে হইল।

বাসন্তীকে বলিলাম,—চলো, দৃশ্যটা একবার দেখে আসি।

নিজে ত' যাইবেই না, আমাকেও সে জোর করিয়া আঁকড়াইয়া রহিল। খবরটা তাহার কাছে এতো নিদারুণ যে শতপুত্রশোকে গান্ধারীর মতো সেও বোধহয় অন্ধ হইয়া যাইবে।

আজকাল আমরা আর বেড়াইতে বাহির হই না, স্থানের ও সময়ের সমস্ত পরিধি নদী অনায়াসে লুপ্ত করিয়া দিয়াছে। ঘরে বসিয়াই নদী দেখি, প্রচুর হাওয়ার খেয়ালের প্রকাণ্ড ছবিগুলি মেঝের উপর ভাঙিয়া পড়ে। বিস্তৃত জলরাশির কিনারে মর্ত্যের দুইটি প্রাণী মৃত্যুর প্রলোভন এড়াইয়া কোনোরকমে একের পর এক মুহূর্ত গুণিতেছি!

তারপরে আসিল ব্যোমকেশ। খবরটা ব্যাখ্যা করিয়া বলিবার দরকার ছিল না, সময় থাকিতে বুদ্ধিমানের মতো হাটে গিয়া সে যে লাউল ও বলদ-জোড়া বিক্রি করিয়া আসিয়াছে তাহার জন্য তাহাকে তারিফ্ করিলাম—পয়সাটা ঠিক তাহারই প্রাপ্য কি না তাহা আর বিচার করিয়া দেখিলাম না। কেবল এই-ই দুঃখ হইতে লাগিল যে তাহাকে এইবার সত্যি-সত্যিই চাকরির জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। কিন্তু খবরের কাগজের সম্পাদক সেই কথা জানিতে আসিবেন না। জানিলেও এতো বড়ো ব্যর্থতার কথা সসম্মারোহে ছাপিবার আর তাঁহার আগ্রহ থাকিত না। প্রকৃতির কাছে মানুষের এই পরাভবের ব্যর্থতার মধ্যে মহিমা নাই, এই পরাজয় মানুষের নিজের সৃষ্টি নয় বলিয়া। এতো দুঃখেও ব্যোমকেশ তাই সুখী হইতে পারিল না।

এইবার সময় হইল। শত-লক্ষ হাত মেলিয়া নদী ইস্কুল-ঘরটাকে আক্রমণ করিয়াছে।

নবীন আগেই সরিয়াছে, অতএব কাহারো জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইবার নাই।

বাসন্তী বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল,—অমনি-অমনি যেতে দেবে নাকি?

এতো বড়ো বিপদের সমুখে পড়িয়াও যদি বাসন্তী দার্শনিক না হয় তবে কী করিতে পারি? বলিলাম,—কোন্ জিনিস তুমি আঁকড়ে ধরে' রাখতে পারো শুনি? যা যায়, যাক্।

বাসন্তী কহিল,—কিন্তু টুল-চেয়ারগুলিও ত' বেচ্‌তে পারতে?

—কোথায় বেচ্‌বো? কিনবে কে? কতোই বা দাম পাওয়া যাবে? পয়সা যা পাবে তাও কি অমনি যাবে না খরচ হ'য়ে? ও নিয়ে মিথ্যে মন খারাপ করো না—দেখ, মৃত্যুর এমন চমৎকার চেহারা আর দেখেছ কখনো?

দক্ষিণের কোঠার পাশাপাশি চেয়ারে দুইজনে বসিলাম। দেখিলাম সরকার-মহাশয় লোক লাগাইয়া ইস্কুল-ঘরের জিনিস পত্রগুলি বাহির করিতেছেন। মনে-মনে হাসিলাম, কোথায় এগুলি তিনি সরাইয়া রাখিবেন—কত দূরে? কে ইহাদের বোঝা টানিয়া বেড়াইবে? তবু নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ইহাদের তুলিয়া দিতে সরকার-মহাশয়ের মন যেন কেমন করিতেছিল।

হাওয়ার বাসন্তীকে একেবারে উড়াইয়া নিতেছে। নদী যতো তাহার আবরণ কাড়িয়া লইবার জন্য কাড়াকাড়ি করিতেছে ততই সে কুণ্ঠিত, ম্রিয়মাণ হইয়া এতটুকু হইয়া যাইতেছে। ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মতো তাহাকে এমন দুর্বল লাগিল—এই বিরাট সৌন্দর্য্য-সমারোহের মাঝে সব এমন অকিঞ্চিৎকর মনে হইল যে সেই মুহূর্তে বাঁচিয়া থাকিবার কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাইলাম না!

আমাদের চোখের সমুখে ইস্কুল-ঘরের একটা ধার নদীর মধ্যে ধসিয়া পড়িল। বাসন্তী সভয়ে একটা চীৎকার করিয়া উঠিতেই তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া কহিলাম,—ভয় কী!

বুকে মুখ গুঁজিয়া বাসন্তী কাঁপিতেছে; চাপা গলায়

কহিল,—একেবারে আমাদের পায়ের কাছে এসে পড়লো যে।

—আসুক। বাড়ি নিতে এখনো দেরি আছে। পুব দিক ঘেঁসে চরও পড়ছে শুনছি—সবাই ত' বলছিল এই বর্ষাটা কোনো রকমে কাটিয়ে উঠ্‌তে পারলেই বেঁচে গেলাম। ভয় কী, বাসন্তী? আর যদি যায়-ই, যাবে—জিনিসপত্র স্তূপাকার করে' রেখে লাভ কী? দু'জনে আবার ফাঁকা হ'য়ে যাবো।

বাসন্তী তেমনি মুখ গুঁজিয়া কহিল,—আমি চোখ মেলে তা দেখতে পারবো না। তার আগেই আমরা এখান থেকে পালাবো।

আস্তে-আস্তে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলাম। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ইস্কুল-ঘরটা নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। নিতাই কর্ম্মকারের ছেলেও: মুন্সেফ-কোর্টের সামান্য একটা পেস্‌কারও আর হইতে পারিল না।

এখন একেবারে নদীর কোলে শুইয়া আছি। স্কুলের বাগানটাও গেছে এখন এক পারে আমি আর বাসন্তী, আর আমাদের সুখে নদী—স্রোতমুখর, ফেনিল, লালায়িত,—সমস্ত বন্ধন ছিঁড়িয়া-কাড়িয়া তাহারই মতো আমাদের সে বস্তুর জগতে একেবারে উলঙ্গ করিয়া দিবে!

কৌচগুলিতে ধূলা জমিতেছে, আলমারির কাঁচগুলি আর পরিষ্কার করা হয় নাই। কার্পেটটা জায়গায়-জায়গায় ফুটা হইয়া গিয়াছে—সেই দিকে কাহারো লক্ষ্য নাই। টিপয়ের উপর পিতলের বড়ো ডাবরে পাতাবাহারের গাছ দুইটা কবে মরিয়া গেছে—কে আর উহাদের আদর করিয়া জল দিবে! দেয়ালের বড়ো ক্লকটা বন্ধ—চাবি দিতে ভুলিয়া গেছি। অনেক দিন ধোপা আসিতেছে না—বিছানার চাদর ও বালিশের ওয়াড়গুলো এত ময়লা হইয়া গেছে যে যেন তাহারই জন্য আমাদের চোখে ঘুম আসে না। ক্যালেণ্ডারের তারিখ বদলানো হয় নাই কত দিন—জানিবার কিছু প্রয়োজন বোধ করি না। আমরা পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া কেবল সেই পরম ক্ষণটির প্রতীক্ষা করিতেছি।

বাসন্তী অস্থির হইয়া বলিল,—এখানে থেকে আর কী হ'বে—চলো পালাই।

বলিলাম,—নাটকের শেষ অঙ্কটাই নাটকের সমস্ত। একেবারে যবনিকা পড়লে তবে উঠবো। এমন একটা চমৎকার দৃশ্য দেখতে তোমার কুণ্ঠা কিসের?

—এ আমি সইতে পারবো না।

—যা কিছু অসহ্য তাইতেই ত' তীব্র আনন্দ আছে। বলিয়া বাসন্তীর মুখে চুমা খাইলাম। কেমন যেন ভালো লাগিল না। উহার চেহারা এই ঘর বাড়িরই মতো কেমন রুক্ষ, বিবর্ণ হইয়া গেছে। কতদিন উহাকে একটু আদর পর্য্যন্ত করি নাই। মৃত্যুর এই অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যের মাঝে ক্ষণ-ভঙ্গুর প্রেমের অভিনয় করিতেও কেমন যেন হাসি পায়।

ভিতরের উঠান ছাড়াইয়া খানিক দূরে সরকার-মহাশয় সময় থাকিতে ছোট-খাটো একখানি ঘর বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। সময় আসিলে এই বাড়ি ছাড়িয়া সেখানে উঠিয়া যাইব। তাহার পরেও যে নিস্তার নাই তাহাও সরকার মহাশয় ভালো করিয়া জানিতেন; তবু আবশ্যকীয় জিনিস-পত্র সরাইয়া রাখিবার জন্য হাতের কাছে একটা আশ্রয় থাকা উচিত। কোন্ জিনিসগুলি যে অধিকতর আবশ্যকীয়, ঘরের চারদিকে চাহিয়া চট্ করিয়া ভাবিয়া নিতে পারিলাম না। বাসন্তীকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন লাভ নাই—সবগুলি জিনিসই তাহার একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার;—কোন্‌টা ছাড়িয়া কোন্‌টার প্রতি যে সে পক্ষপাতিতা দেখাইবে সে একটা কঠিন সমস্যা। অতএব মাত্র শুইবার খাটখানা, বিছানা-পত্র, কাপড়-চোপড় ভরিয়া একটা বড় ট্রাঙ্ক, লিখিবার ছোট একটি টেবিল এমনি মোটামুটি কয়েকটা জিনিস সরাইয়া রাখিলাম। আমার গল্পের খাতা ও বাসন্তীর গয়নার বাক্সটা হাতের কাছেই রহিল—নদী আসিয়া পড়িলে সেগুলিও সঙ্গে নিতে হইবে।

ছোট ঘরখানি—রাণিগঞ্জের টালিতে নয়, উলুখড়ে কোন রকমে ছাওয়া হইয়াছে। চাকর সেই ঘরে একটা বাতি জ্বালিয়াছে দেখিলাম। বিপুলকায় গর্জ্জমান নদীর পাড়ে বসিয়া ঐ মৃদু শিখাটিকে ভারি করুণ মনে হইতে লাগিল। বাসন্তী বলিল,—চলো ঐ ঘরে আজই উঠে যাই।

অভয় দিয়া বলিলাম,—আজই কী! এখনো হাত পঞ্চাশ দূরে আছে। আজ রাতটা অনায়াসে এখানেই ঘুমিয়ে নিতে পারবো।

জল, জল, ক্ষুরের মতো ধারালো, বিদ্যুতের মতো দ্রুত,—ধাবমান ঘোড়ার মতো ঢেউগুলি পাড়ের কাছে আছড়াইয়া পড়িতেছে। কোথাও এতটুকু বিশ্রাম নাই, স্তব্ধতা নাই—ফুঁসিয়া গর্জ্জিয়া ছিঁড়িয়া-কাড়িয়া অনড় স্থবির মৃত্তিকাকে একেবারে চূর্ণ-বিদীর্ণ করিয়া দিবে। অমন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দিবে না। সেই নিয়ত বেগবান বিরাট শক্তির কাছে আমাদের অস্তিত্ব কেমন ম্লান, সঙ্কুচিত হইয়া গেছে। পরিমিত নিশ্বাস ফেলিয়া আমাদের এই জীবনধারণের তুচ্ছতাকে নদী যেন চারিদিকের উগ্র গলহাস্যে বিদ্রূপ করিয়া উঠিল।

জল আর জল—শাদা, গাঢ় জল! বেগের প্রাবল্যে কোথাও এতটুকু বিশ্রামের রঙ নাই—ফেনায়িত, প্রখর শাদা! অমন তীব্র শুভ্রতা চক্ষু মেলিয়া সহ্য করিতে পারি না।

রাত্রে কখন একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম—ঘুমের মধ্যেও নদীর সেই ডাক শুনিতেছি। তাহার আর ঘুম নাই, প্রবল আর্ত্তকণ্ঠে কী যেন সে চাহিতেছে! তাহার ভাষা বুঝিতে পারি না, ঘুমের মধ্যে বাসন্তীকে শরীরের সঙ্গে চাদরের মতো আলিঙ্গন করিয়া ধরি। কী যেন সে চাহিতেছে—সেই ভাষা আমরা কী করিয়া বুঝিব!

হঠাৎ কোথায় কী একটা শব্দ হইল—হয় ত' এক চাক্ মাটি পড়িল—সঙ্গে সেই শিমুল গাছটাও। ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিলাম—দেখি পাশে বাসন্তী নাই। চারিদিকে প্রবল শব্দে ঝড় বহিতেছে—চীৎকার করিয়া উঠিলাম: বাসন্তী।

কোথাও এতটুকু সাড়া মিলিল না।

তাড়াতাড়ি খাট হইতে নামিয়া পড়িলাম। আলো জ্বালিবার কথা মনেও হইল না। দেখি দক্ষিণের দরজাটা খোলা, প্রচুর উচ্ছ্বসিত হাওয়ার ঘরের মধ্যে ধূলা উড়িতেছে—এতো বাতাসে ও ধূলায় নিশ্বাস টানিতে কষ্ট হইতে লাগিল। আবার ডাকিলাম: বাসন্তী। অন্যস্বরকণ্ঠে নদী ব্যঙ্গ করিয়া উঠিল। স্পষ্ট মনে হইল নদীর ডাকে বাসন্তী কখন দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

পাগলের মতো সামনের জমিতে ছুটিয়া আসিলাম। ঝাপ্সা অন্ধকারে খেজুর-গাছের নিচে কি-একটা কাপড়ের মতো চোখে পড়িল। কাছে আসিয়া দেখি—বাসন্তী; নদীর পাড়ে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

ব্যস্ত হইয়া কহিলাম,—এখানে উঠে এসেছ যে!

সে যেন কেমন করিয়া হাসিল; কহিল,—একটুও ঘুম আসছে না। বলিয়া আবার স্তব্ধ হইয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহিল। প্রবল চাঞ্চল্যের তীরে তাহার এই ধ্যাননম্র স্তব্ধতা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মনে হইল। তাহাকে বেষ্টন করিয়া এই নির্জ্জনতা এমন ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে যে তাহাকে আমার অতি-পরিচিত বাসন্তী বলিয়া যেন চিনিতে পারিলাম না।

গায়ে ঠেলা দিয়া কহিলাম,—এখানে বসে' আছ কী করতে? ঘরে চলো।

বাসন্তী কহিল,—এই বেশ লাগছে। তুমিও আমার পাশে এসে বোস না।

তাহার পাশে বসিলাম; কিন্তু তাহার পর কী যে বলিব বা বলা যাইতে পারে—সমস্ত ভাষা নীরব হইয়া গেল। উহার সঙ্গে দৃষ্টি মিলাইয়া আমিও জল দেখিতেছি। তাহার পর জল কখন চোখ হইতে মিলাইয়া গিয়াছে—বাধাহীন অশরীরী বেগ ছাড়া কিছুই আর চোখে পড়িতেছে না।

বাসন্তীকে এত কাছে রাখিয়াও নিজেকে এই নদীর মতো অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হইতে লাগিল। আগে তবু এখানে-সেখানে কয়েকখানা নৌকা দেখা যাইত, ছইয়ের তলায় বসিয়া মাঝিদের রান্না ও গল্পগুজবের শব্দ কানে আসিলে কতকটা যেন নিশ্চিন্ত বোধ করিতাম। সামনের রাস্তাটা ভাঙিয়া গেছে বলিয়া একটা গরুর গাড়ির চাকার শব্দও আর শুনিতে পাই না। সব যেন বিরাট গতির ঘূর্ণিতে পড়িয়া কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেছে!

একটা শকুন অন্ধকারে পাখার শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল। সচেতন হইয়া চাহিয়া দেখি বাসন্তীও কেমন অসাড়, উদাসীন হইয়া বসিয়া আছে। উহাকে আমার যেন কেমন ভয় করিতে লাগিল। গায়ে ঠেলা দিয়া কহিলাম,—এখান থেকে উঠে চলো, নইলে এবার ভেঙে পড়বো।

বাসন্তী তবু নড়িল না। চকিতে মনে হইল উহার চোখে মৃত্যুর স্পর্শ লাগিয়াছে, এমন স্তব্ধ-নম্রতায় তন্ময় হইতে আর কখনো উহাকে দেখি নাই। নদী যেন এখুনি উহাকে আমার বাহুবন্ধন হইতে ছিনাইয়া নিবে! আর দেরি নাই।

আমাদের ঘেরিয়া সত্য-সত্যই অনেকখানি জায়গা লইয়া মাটিতে চিড় ধরিল। দুই বলিষ্ঠ হাতে মাটি হইতে উহাকে বুকের মধ্যে কাড়িয়া লইলাম। কোনোদিকে না চাহিয়া বাসন্তীকে বুকে করিয়া ঘরের মধ্যে ছুটিয়া আসিলাম,—দেখি আমারই বুকের উপর কখন সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে!

অবশ ভাবটা কাটিলে জিজ্ঞাসা করিলাম,—এখন কেমন লাগছে বাসন্তী?

দুর্ব্বল হাত দুইটি দিয়া আমার গলা জড়াইয়া সে কহিল,—ভীষণ ভয় করছে। আমাকে তুমি ধরে' রাখো। আমাকে ছেড়ে দিয়ো না।

আমার দেহ দিয়া তাহাকে আবৃত করিয়া রহিলাম। কহিলাম,—কেন তোমাকে ছেড়ে দেবো? কা'র সাধ্য তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে রাখে?

লক্ষ লক্ষ ঢেউ তুলিয়া নদী আমাদের এই গভীরতম নিগন মুহূর্ত্তকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। যেন উদ্দাম প্রবাহে এই মুহূর্ত্তটিকে সে ভাসাইয়া নিয়া যাইবে।

তাহার পর আমাদের জীবনে সেই পরম লগ্নের আবির্ভাব হইল।

রাত অনেক হইয়াছে—অকূল আকাশ ভরিয়া জ্যোৎস্নার আর অবধি নাই। সেই পরিপূর্ণতম প্রশান্তির নিচে নদীর এই লেলিহান উন্মত্ততার কোথাও এতটুকু সঙ্গতি খুঁজিয়া পাইতেছি না।

সময় থাকিতেই ছোট খড়ের ঘরে উঠিয়া আসিয়াছি। চাকর ছোট টেবিলের উপর তেমনি বাতি জ্বালাইয়া খাট জুড়িয়া বিছানা করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু আজ রাতে গল্প লিখিবার বা ঘুমাইবার কথা ভাবিতে গেলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

লিখিবার খাতা ও গয়নার বাক্সটার সঙ্গে আরো কিছু গুছাইয়া জিনিস সরাইয়া ফেলিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু শেষকালে কেন জানি না আর হাত উঠিল না। কী ফেলিয়া কী নিব, নিয়াই বা কী করিব, কোথায় রাখিব, এমনি একটা মূঢ় সন্দেহে বা বৈরাগ্যে স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। তাহার চেয়ে বাসন্তীকে লইয়া মৃত্যুর এই উজ্জ্বল ও প্রখর উলঙ্গতা দেখিতে শরীরে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল।

লক্ষ-লক্ষ অমিতবিক্রম শ্বেতহস্তী আমাদের বাড়িটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল—যে-বাড়িতে বাসন্তী কার্পেট ও কৌচ বিছাইয়া ড্রয়িংরুম তৈরি করিয়াছিল, যে-বাড়ির ছোট একটি নিভৃত কোঠায় বসিয়া আমি যতো না লিখিয়াছি তাহার চেয়ে ভাবিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি বেশি, যে-বাড়িতে বিছানা পাতিয়া বাসন্তীকে লইয়া দুই দেহের নিগূঢ় রহস্য সন্ধান ও সমাধান করিয়াছি, যে-বাড়িতে বাবা মা'র অপূর্ব্ব বিচ্ছেদ-স্মৃতির স্বপ্নটি রাখিয়া গিয়াছেন।

অথচ, আকাশে যে এখন প্রচুর নির্মেঘ জ্যোৎস্না—এই জ্যোৎস্না-রাতে আমরা দুইজনে যে শিশু-গাছের তলায় বাঁশের মাচার উপর বসিয়া কতো গল্প করিয়াছি—এ কথা কে বিশ্বাস করিবে?

অসহায় চোখের সামনে বাড়িটার মৃত্যু দেখিতে লাগিলাম।

বড়ো বড়ো ছবি, কৌচ টেবিল চেয়ার আলমারি বাসন-কোসন খেলনা-পুতুল বিম বরগা ইট-কাঠ জান্‌লা-দরজা—সব যেন একসঙ্গে কানের কাছে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সমস্ত কিছুর যেন প্রাণ আছে, চেতনা আছে, দুঃখ অনুভব করিবার তীব্র ক্ষমতা আছে—আর আছে মৃত্যুর আক্রমণে আমাদেরই মতো কঠিন পরাঙ্মুখতা। কিছুতেই আশ্রয় ছাড়িবে না, মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে, সাধ্যমত সংগ্রাম করিবে, বাধা দিবে, আর্ত্তনাদ করিবে। সহজে হার মানিবে না। বেগের সঙ্গে বন্যার সেই অপরূপ যুদ্ধ দেখিতে-দেখিতে সারা দেহে ভয় ও বিস্ময়ের রোমাঞ্চ হইতে লাগিল।

কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে কে কবে পারিয়াছে? ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বাড়িটার আর চিহ্ন পর্য্যন্ত রহিল না।

মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকাণ্ড একটা মুক্তির আকাশে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। সমস্ত কিছু আকাশের মতো শাদা হইয়া গিয়াছে।

সকালবেলার দিকে সরকার-মহাশয় গরুর গাড়ি ডাকিয়া আনিলেন। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা

গাড়িতে বোঝাই হইল। বাসন্তীকে লইয়া দূর-পথে রেল-ইষ্টিশান্‌এর দিকে রওনা হইলাম।

খড়ের ঘরে সরকার-মহাশয় কিছুকাল আরো থাকিবেন ও বর্ষার শেষেও যদি পুব দিকের চর মাথা চাড়া দিয়া না উঠে তবে একদিন বাড়ির দিকে রওনা হইলেই চলিবে।

ট্রেনে চড়িয়া এতক্ষণে বাসন্তী সহজ করিয়া কথা কহিতে পারিল। আমরা কলিকাতায়ই যে যাইতেছি ও আশ্রয় ভিক্ষা করিতে যে বাগবাজারে তাহার বাপের বাড়িতে গিয়া উঠিব না ইহাতে সে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত বোধ করিল। তাহার বাবা যে আমাদের এই পরাজয়ের লজ্জাকে সগৌরবে ব্যঙ্গ করিবেন আমার স্ত্রী হইয়া তাহা তাহার অসহ্য।

বলিতে কি, মামার কাছে গিয়াও হাত পাতিলাম না। কালিঘাটের অঞ্চলে একটা বাড়ির একতলাটা ভাড়া লইলাম। দুইখানি মাত্র ঘর—একটিতে সামান্য কয়টি বাসনের সরঞ্জাম ও অন্যটিতে মেঝের উপর মাদুর-বিছানো শয্যা ছাড়া আর কোন উপকরণ নাই। বেয়ালে একটিমাত্র ল্যাম্প জ্বলে ও গল্প লিখিবার কথা মনে না আনিয়া সেই আলোতে বসিয়া কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া-দেখিয়া দরখাস্ত লিখি।

নদী-স্রোতের মতো সময়ও উত্তাল বেগে সমানে আগাইয়া আসিতেছে।

একটা ছোটখাটো চাকরি জোগাড় করিয়াছি—নিজেরই একার চেষ্টায়। সেই অহঙ্কারে কিছু দরকারি জিনিস-পত্র কিনিবার ইচ্ছা হইল। বউবাজারে কোথায় খুব সস্তায় নিলাম হইতেছে—চার টাকা দিলে অনায়াসে ঘরে একখানা করিয়া টেবিল ও চেয়ার আসে। কথাটা ভয়ে-ভয়ে বাসন্তীর কাছে উত্থাপন করিলাম। বাসন্তী ম্লান হইয়া হাসিয়া কহিল,—ভাড়াটে বাড়ি, কখন উঠে যেতে হয় ঠিক নেই, জিনিসপত্র কাঁধে করে' কোথায় ঘুরে বেড়াবে? এই বেশ আছি।

টেবিল চেয়ার আর কেনা হইল না। চার টাকা দিয়া ঠিকে একটা ঝি রাখিলে বরং কাজ দিবে।

ভাড়াটে বাড়ি! কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তীরের বন্ধন হইতে নদী আমাদের বিরাট অনিশ্চয়তার মধ্যে লইয়া আসিয়াছে!

নদী আমাদের বাড়ি ভাঙিয়াছে, কিন্তু সময়ের স্রোত আমাকে ও বাসন্তীকে ধীরে-ধীরে জীর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিল।

গেল সোমবার হইতে ছোট খোকাটার জ্বর—ডাক্তার একজন ডাকিয়া আনিলে হয়। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে যদি সারে, মিছামিছি কয়েকটা টাকা খরচ করিয়া এখন আর বিশেষ কী লাভ হইবে? আরো কয়েক দিন যাক্।

ঝি-র সঙ্গে বাসন্তী নিতান্ত খেলো শহুরে ভাষায় ঝগড়া করিতেছে। উনুনের ধোঁয়ায় ঘর-দুয়ার সব আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। কে যেন কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ঝি-কে তাড়াইবার জন্য তাগিদ দিতে বাসন্তী আসিল, না, বাকি মাসের মাহিনা লইয়া বিদায় হইতে ঝি আসিল সহসা বুঝিতে পারিলাম না।

আফিসে যাইবার জামাটা বাসন্তীকে কত দিন সেলাই করিয়া রাখিতে বলিয়াছি, তাহাতে তাহার গ্রাহ্য নাই। রোদে তোবক মেলিবার জায়গা নাই বলিয়া ছারপোকার কামড়ে রাত্রে একটু ভালো করিয়া ঘুমাইতেও পারি না। চাহিয়া-চিন্তিয়া তাজমহলের ছবি-ওয়ালা সুন্দর একটা ক্যালেণ্ডার আনিয়া দেয়ালে টাঙাইয়া রাখিয়াছিলাম, দুরন্ত ছেলে দুইটা কাড়াকাড়ি করিয়া ছিঁড়িয়া দিয়াছে।

নদীর হাত হইতে রক্ষা পাইলেও সময়ের হাতে আমাদের আর নিস্তার নাই।

শুনিতেছি আফিসে কর্মচারীদের ছাঁট সুরু হইয়াছে। আমি এখনো কোনো রকমে টিঁকিয়া আছি—তবে বলা যায় না। নদী আমাদের বিরাট অনিশ্চয়তার মধ্যে লইয়া আসিয়াছে।

তবু রাশি-রাশি ফেনিল জলের থেকে এ অনেক ভালো। টাইম্‌পিস্ ঘড়িটির মতো হৃৎপিণ্ড মৃদু-মৃদু ধুক্ ধুক্ করিতেছে—কোনো রকমে যে নিশ্বাস নিতেছি এই একরকম ভালো লাগিতেছে। তীব্র সুখের মধ্যে এই যে শত দারিদ্র্যেও শ্বশুরের কাছে গিয়া হাত পাতি নাই—ব্যোমকেশের সঙ্গে দেখা হইলে তাহাকেই না-হয় আরেকবার মামার পিপুলের দোকানে পাঠাইয়া দিব। সে না-জানি এখন কী করিতেছে!

প্রাচীনার প্রলাপ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

চারকুড়ি তো বয়েস হ'ল, একটা বছর বাকী—
যমও পোড়া আমার মতন কালাই হ'ল নাকি!
অষ্টপ্রহর খুঁড়ছি বাপা, ডাকছি এত তা'কে,
তবু কি তার হুঁস্ আছে এই হতভাগীর ডাকে?
পাঁচটা ছেলে পোড়ার মুখে দিয়েছে পর-পর,
তবু বলে, হয়নি সময়—এখনো ঘর কর!
কিসের ঘর লা? পাঁচ-পাঁচটা বেটার মত বেটা—
পাড়ার লোকে মরত ফেটে—যমের মুখে ঝেঁটা!
স্বামী গেল, পুত্তুর গেল—একটা তো ঐ মেয়ে—
তাও বিধবা—ফিরে' এলেন হাতের নোয়া খেয়ে!

—দাঁড়িয়ে কে ও? বৌমা নাকি? এত ঠাটও জানো,
আচ্ছা, কেন নিত্যি ঘরে পিণ্ডি টেনে আনো?
খুঁড়িয়ে হোক্ হেঁচড়িয়ে হোক্, নড়তে যখন পারি,
ঘরের মধ্যে রাখ্ গেলা'তে কি সাত-তাড়াতাড়ি?
ঐ যে তখন, কথার পিঠে পারবে খোঁটা দিতে!
সব জানি লো, জানিনেক অমনি কবে চিতে।
এবার যদি আনবে টেনে, বেটার মুখে ছাই—
বালাই বালাই—কি বলি আর কি বলতে বা যাই!
—বাপা গেল, শ্বশুর গেল, গিয়েছে চোখ কান—
তবু পোড়া মরণ নাইরে, হায়রে ভগবান!

বিশ্বি ছুঁড়ী এমন সময় কোথায় গেল আবার?
আড়াই প্রহর বেলা হ'ল—হুঁস্ আছে তার খাবার!
বৌ ক'টা যে খেটে ম'লো সকাল থেকে কাজে,
হাত লাগিয়ে শেষ করে' তা' নে না ননদ-ভাজে।
তা না, পাড়ায় ঘুরে' ঘুরে' অষ্ট-প্রহর কাল,
সাধে অমন দশা তোদের, সাধে বেরোয় গাল?
ঝেঁটা মারি কপাল খানায়,—অমন খাসা বর,
—সইবে কেন? দুটো বছর গেল কি পর-পর?
দিব্যি ভাজা বোয়ান ছেলে, এক বয়সী বিধুর—
কি কাল রোগেই ধরল এসে, ঘুচল সীঁথের সিঁদুর!

মিন্সেকে তো বলেইছিলাম—কুষ্টিখানা মিলাও,
একটা মেয়ে, বুঝে'-সুঝে' পরের হাতে বিলাও,—
শুনলো না তো মাগীর কথা—শুনবে কেন কাণে?
আপন লোকে পর হয়ে যায়, ভাগ্যি যেদিন টানে!
বুঝলো শেষে, মেয়ে যখন ফিরল কেঁদে ঘরে,
সেই থেকে আর হাসেননিক একটি দিনের তরে;
ধন্দ হয়ে গেলেন যেন,—ঘুড়ুক ঘুড়ুক টান—
তামাক নিয়েই কাটত সময়, ম'দিন ছিল প্রাণ।
গেলেন যদি, আমায় কেন নিলেননাক' সাথে?
আশী বছর এক সাথে ঘর—সহ্য হ'ল তাতে!

ভালোই গেছেন, আমার মতন পাপী তো আর নয়,
নইলে যা সব ঘটল পরে—মানুষ পাথর হয়!
—আবার কেন দাঁড়িয়ে বৌমা? সবাই মিলে গিয়ে
সেরে-সুরে' নেওনা হেঁসেল, মুখে যা-হোক্ দিয়ে।
বেলার কি আর কসুর আছে? বাঁড়ীভুঁড়ির বাড়ী—
এঁটো-কাঁটা নিয়ে তখন লাগবে কাড়াকাড়ি!
ঐখানটায় থাকনা পড়ে'—যখনই হোক্ উঠে,
—আমার আবার ক্ষিদে-তেষ্টা ছিষ্টি গিলে' কুটে'!
তসরখানা সরিয়ে রাখো গঙ্গাজলের কাছে—
আচার-বিচার শিখবে কবে—বয়েস কি আর আছে?

ফেলনে ছুঁয়ে জপের মালা, সাধ করে' কি রাগি?
বলব কত গুণের কথা—কি যে বেহুঁস্ মাগী!
বংশী আমার থাকত বেঁচে, তাকে দিয়েই আজ
শিখিয়ে দিতাম কেমন করে' করে ঘরের কাজ।
—রাজার মতন ছেলে আমার, মুখের কি বা ছিরি,
মায়ের উপর ছেদ্দা কত!—থাকুক বাবুগিরি—
আমার কাছে কেঁচো হয়ে থাকত, সবাই জানে,
—সাধ্যি ছিল চোখের সাম্নে তাকায় বৌ-এর পানে?
খীতের জ্বালায় গেল তো সে—পাহাড় পড়ল খসে',
—আর ঐ মাগী, আমার সঙ্গে পিণ্ডি গিলছেন বসে'।

শরৎ ছিল আরেক ধরণ—পাংলা তাঁরি মতো,
ছিপ্‌ছিপে তার গড়ন, তবু সাহস ছিল কতো!
মামার বাড়ী যেতে সেবার—চণ্ডীতলার বিলে—
হাকাৎ পড়ে' গাড়ী যখন ঘিরল সবাই মিলে!
—ঐ তো ছিল সঙ্গে সেবার, তাইতো পেলাম পার,
নইলে কি আর রক্ষা ছিল—সাধ্যি হ'ত কার?
আমি তো মা ভয়েই মরি—আকাট হয়ে প্রাণে,
কতই বয়েস? কি করে' যে বাঁচালো, সেই জানে!
অমন ছেলে—কি যে হ'ল কোন্ সাহেবের সাথে,
বিদেশ-ভূঁয়ে প্রাণটা দিল বে-ঘোরে কার হাতে!

ওগো, তুমি কোথায় গেলে—একলা আমায় ফেলে,
আশীর পারে এমন দাসী কোথায় আবার পেলে?
আমার উপর বিরাগ তোমার দু'দিন টেকেনি তো,
সেই আমি আজ তোমার কাছে নিমের মতন তিতো!
পুরুষ হ'লেও এতোদিনের মন তো তোমার চিনি,
তাইতো আজও আগের কথা সম্মাতে পারিনি।
নইলে আমার বয়েই গেছে—এই ভরা দুপুরে
বাসি-মুখে তোমার কথায় মরতে জলে-পুড়ে'!
পুরুষ কখন্ আপন হয় লা? শত্রুর চিরকাল,—
সংসারে সে সুনের ছিটে—সগ্‌গে গেলেও ঝাল।

ওরে আমার সত্যিবাদী! বুঝ্‌ছি তারি ব্যথা;
কেন তখন বল্‌লে আমায় মন-ভুলানো কথা?
ভুলে' গেছ? সেই সেবারে পঞ্চু সেবার পেটে,
তোমার সাথে বদ্দিনাথের তীর্থি সেরে হেঁটে,
বল্‌লে কত—তোমায় ছেড়ে কোথাও যাবনাকো;
তীর্থি পথের বাকি আমার সত্যি ধরে' রাখো।
—রাখ্‌বনাতো, তোমায় আমি একলা দিব ছেড়ে,
যমের সঙ্গে ফিসির-ফিসির দিচ্ছি এবার ঝেড়ে!
কান্ত-বান্‌নি ভয় করে না যমের বাবা এলে;
—ধর্ম্মবাক্যি মিথ্যা হবে?—যাওনা দেখি ফেলে!

ওমা! ঐ তো বাহির-দোরে দিচ্ছে কড়া নাড়া—
স্পষ্ট কানে শুনতে পাচ্ছি, কর্ত্তারি তো সাড়া!
ওরে বিন্দি, ওগো বৌমা—দুয়োর খুলে' দে'না—
এত ডাকেও খল নারীদের টন্‌ক কি নড়ছে না!
পোড়ার-মুখী শতেক-খাকি—কানের মাথা খেয়ে
জট্‌লা বেঁধে মরে' আছিস্—আমার দিকে চেয়ে!
মরুক মরুক,—আমিই যাচ্ছি,—ধর্‌তো একটু তুলে,
কি আর করি, নিজেই গিয়ে দিচ্ছি দুয়োর খুলে';
যাচ্ছি—যাচ্ছি—শ্মশানপুরে কেউ কি আছে তোমার?
দুয়োর খুলে' দিবে উঠে'? স্মরণ হ'ল আমার!

উদয়-পথের সহযাত্রী

শ্রীতিগিরবরণ ভট্টাচার্য্য

এবারের পত্রখানি একটু বড় করে লেখবার ইচ্ছা আছে,—শেষ পর্য্যন্ত দেখি কতদূর হয়! সময় আমার এত কম যে আপাততঃ সব জায়গার সব বর্ণনা দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। অবশ্য আমরা এখন জার্ম্মাণী পরিভ্রমণ কচ্ছি এ খবরটা বোধ হয় আগেই পেয়েছ। ভ্রমণকাহিনী লিখ্‌তে হলে আবার একটু প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা কর্ত্তে হয়। তা ছাড়া, সোজা জিনিষটা কবিরা যে ভাবে বাঁকা ক'রে দেখে থাকেন, সে সূক্ষ্ম দৃষ্টিও আমার নাই। যদিও বা চেষ্টা করে কিছু লিখে ফেলি, তাহলে দেখি, এদিকে আমি অনেক পিছিয়ে পড়ে আছি, দেশের কবিরা এগুলো এমন ভাবে বর্ণনা করেছেন যে আমাদের জন্য আর কোন ফাঁক রাখেন নাই। তবে আমার বর্ণনা ইওরোপে সকলের সুনজরে পড়বে না এটা ঠিক; কারণ, "ভারতবর্ষ" আমার চোখে আরও সুন্দর লাগে—আর এদেশের বিখ্যাত জায়গার দৃশ্য আমার কাছে ভারতের দৃশ্যের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয় না—তুলনা কর্ত্তে গেলেই মনে হয় অমর কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কথা—"ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ"। এ আমার অত্যুক্তি নয়, নিছক সত্য। ভারতের বাইরে না এলে ভারতকে বোঝা যায় না—

আমরা এবারে খুব বড় সফরে ঘুরছি। জার্ম্মাণীর

প্রায় সমস্ত প্রধান ও অপ্রধান সহরে আমাদের Show দিতে হবে। ইতিমধ্যে আমরা Holland ও Belgium ঘুরে এসেছি। Hollandএ একটু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গিয়েছে। প্রথমতঃ এরা কিছুতেই আমাদের হল্যাণ্ডে ঢুকতে দিল না; তাদের কি রকম ধারণা হল, এত যন্ত্র এবং কাপড় কখনো Artistদের সঙ্গে যেতে পারে না—এরা নিশ্চয় ব্যবসাদার। তারা এই সমস্ত বহের দাম চেয়ে বসল এবং অনুকম্পা একটু দেখাল যে, যন্ত্র এবং বস্ত্রের দামগুলি রেখে যান—ফিরে যাবার সময়—যদি বিক্রয় না করি—তবে দাম ফেরৎ দেওয়া যাবে। অনেক তর্ক-বিতর্কে কোন ফল হোল না দেখে বাক্স খুলে আমার "বয়ন্" বের করে বাজাতে আরম্ভ করলুম (ভেবে দেখ স্থান, কাল এবং পাত্রের কথা)। যাই হোক, বোধ হয় এই অভিনব যন্ত্র,—তার আওয়াজে এই কর্ত্তব্যপরায়ণ ভদ্রলোকটি খুসীই হলেন; যেহেতু খানিক বাজাবার পর তাঁর রুদ্র মূর্ত্তি প্রশান্ত হল এবং আমরাও নিষ্কৃতি পেলুম। এই সব কর্ত্তে সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত্রি ৮টা বেজে গিয়েছিলো, তখনও Amsterdam এর দূরত্ব ১১০ কিলোমিটার (প্রায় ৬৭ মাইল)।

এই দেশটা জলপথের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। বড় বড় নদী বা Canal পার হবার জন্য পোল নাই। বড় বড় Steamerএ গাড়ী বা মোটর পার হয়, অবশ্য পয়সা দিয়ে। ছোট ছোট পোল যাও বা ২।১টা আছে, তা পার হতেও পয়সা দিতে হয়। যাই হোক, আমরা রাত্রি ১১টায় "আমষ্টারডাম"এ এসে পৌঁছুলাম। এখানে আর এক বিপদ। যতগুলি হোটেল সব আলো নিভান, অথচ সেগুলি খোলা আছে। শুধু শুধু এরা আলো জেলে পয়সা নষ্ট করতে চায় না। বরদস্তর হবার পর আমরা যেমন বাক্সগুলি নামিয়েছি, আর একজন লোক এসে খবর দিলেন,—ম্যানেজার তাঁর মত বদলেছেন—আরো কিছু দক্ষিণা না দিলে হোটেলে থাকতে দেওয়া হবে না। আমরা ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া করবার জন্য যেমন তার ঘরে ঢুকবো—সঙ্গে সঙ্গে আলোও নিভে গেল; অন্ধকারে হাতড়ে তাকে বের করা অসম্ভব ভেবে অন্য হোটেলে আস্তানা নেওয়া গেল। এখানকার আসরে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই। পরে Hague, Antwerp, Brussels ও Liegeএ আমাদের Show দেওয়া হয়েছিল। শেষের তিনটি সহর Belgiumএ। এ সমস্ত বিবরণ পরে জানাব। জার্ম্মাণীতে আজ পর্য্যন্ত যতগুলি সহরে গিয়াছি, সে সমস্ত স্থানে জনসাধারণ আমাদের যে কি ভাবে অভ্যর্থনা ও সমাদর করেছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না—এবং তোমরা ভাবতেও পার্বে না। অবশ্য প্যারিসের খবর ত জানই। Spainএ একরকম হয়েছে। Switzerlandএর জেনেভা ও জুরিচের কথা চিরকাল মনে থাকবে। কিন্তু জার্ম্মাণীতে আমরা যে আদর পাচ্ছি তার তুলনা নাই। এবং আমরা এখানে সময় সময় অতি আদরে ও অভ্যর্থনায় সত্যই লজ্জিত হয়ে পড়ছি। ইতিমধ্যে আমরা Berlin, Permasens, Wiesbaden, Manheim, Gieben, Gelsenkirchen, Rhein, Duesselsorf, Freiburg, Koln, Lihehmgal, Saal, Heidelburg, Dillingen, Saarbrucken, Munich, Hamburg, Leipzig, Baden-Baden, Karlsruhe, Heilbrown, Pforzheim, Cologne, Charlottenburg, Settin, Meinihgen, Chemnitz, Dresden, Halle, Hallerstadt, Hannover. Frankfurt, Dusseldorf, Gieben, Griefswald, Rostock, Selwerin. Kiel, Flensburg, Bremen প্রভৃতি স্থানে Show দিয়াছি। এখানকার আরোও প্রায় ২৫টি সহরে এক মাসের মধ্যে যেতে হবে। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক স্থানেই আমাদের Showতে full house তো হয়েই ছিল; তা ছাড়া কত লোক যে ফিরে গিয়েছে তার ঠিকানা নাই। আমাদের programme অনুযায়ী কোথাও একদিন বা দুদিনের বেশী থাকবার উপায় ছিল না—তবে প্রত্যেক জায়গায় পুনরায় আস্বার প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে। এদের আতিথ্য আমাদের মুগ্ধ করেছে। আমরা যেখানেই গিয়েছি, রাস্তায় বেরুলেই ৫।৬ শত লোক আমাদের সঙ্গ নিয়েছে এবং আমাদের সামান্য উপকারের বা সাহায্যের জন্য যেন এরা লালায়িত। Hamburgএ যখন আমরা Show দিই, শেষ হয়ে যাবার পর প্রায় ২০ মিনিট ধরে দর্শকরা হাততালি ও আনন্দধ্বনি করেছিলেন। তার পরে আমাদের জিনিষপত্র Pack করে রঙ্গালয় থেকে বেরুতে অনেক দেরী হয়েছিল—বাইরে প্রায় সমস্ত লোকই আমাদের জন্য অপেক্ষা কচ্ছিলেন। আমাদের দেখেই সকলে হর্ষধ্বনি ও হাততালি দিতে

মেবার চৌহানরাণী

চিত্র—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

আরম্ভ করলেন—আমরা সেদিন সত্যই ভারী লজ্জিত হয়ে পড়েছিলাম, অত রাত্রে ঐ শীতে ওখানকার সমস্ত বড় বড় মনীষী, ধনকুবের এবং মহিলারাও ঐ ভাবে অপেক্ষা কচ্ছিলেন দেখে। একটা কথা—ফ্রান্স বা অন্যান্য দেশের মত জার্ম্মাণীতে সকলেই Showর পরে Dressing roomএ আসেন না—যাঁরা অত্যন্ত পরিচিত শুধু তাঁরাই ভেতরে এসে দেখা করেন—বাকী সকলেই বাইরে অপেক্ষা করেন। ৪৫ মিনিটের বেশী সেখানে আমাদের অপেক্ষা কর্ত্তে হয়েছিল। Manheimএর "জাতীয় রঙ্গালয়ে"ও ঠিক এই ব্যাপার ঘটেছিল। এই "জাতীয় রঙ্গালয়ে" অমর নাট্যকার Schillerএর অপূর্ব্ব নাটকগুলির প্রথম অভিনয় হয়েছিল। এখানেও Parisএর Champs-Ellyseesএর মত শুধু উচ্চ-শ্রেণীর art ছাড়া কিছুই প্রদর্শিত হয় না। Lihenmgul Saalএ দর্শকের সংখ্যা ছিল ৩৫০০। শ্রীযুক্ত উদয়-শঙ্করের শিব তাণ্ডব দেখে এরা প্রায় পাগল হয়ে গেছে—সে স্মৃতির আনন্দ অনির্ব্বচনীয়। আর একদিনের একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাণ্ডব নৃত্যে—রবীন্দ্র, উদয়শঙ্কর, তিনিবরণ

১৪ই জানুয়ারী সকাল ৮টার সময় Stuttgurt থেকে রওনা হলুম Meiningenএ যাবার জন্য। একটা কথা লিখতে ভুল হয়েছে। আমরা এই যে জার্ম্মাণী পরিভ্রমণ কচ্ছি, তাহা Train এ নয় একটি Auto-Bus এ। শুধু একবার Hamburgএ Hanging trainএ উঠেছিলুম—সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। যদি কখনো চড়বার সুযোগ হয় তা হলেই বুঝতে পার্ব্বে। যাক্—সেদিন বৃহস্পতিবার ছিল। আমাদের ৩৬৭ কিলোমিটার অর্থাৎ প্রায় ২৩০ মাইল যেতে হবে। সকাল থেকে বৃষ্টি সুরু হয়েছিল—আমাদের Auto-Bus ধীরে ধীরে চলছিল; কারণ, রাস্তাটা বড় পিছল হয়েছিল,—তা ছাড়া রাস্তাটা পাহাড়ের উপর দিয়ে। বেলা ১টা পর্য্যন্ত আমরা বেশ নির্ব্বিঘ্নে এলুম। এক জায়গায় ৭।৪ জন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, তারা আমাদের বেশী অগ্রসর হতে বারণ কর্লে; কারণ, কিছু দূরে একটা পোল আছে—সেটার উপর দিয়ে ৪ টনের উপর ভার নিয়ে যাওয়া যায় না। আমরা তাদের কথা বিশ্বাস না করে এগিয়ে গেলুম—আমাদের Auto-Busটার ওজন ৯টন। খানিক এগিয়ে পোল পাওয়া গেল। আমাদের সকার সেটা পার হতে রাজী হলেন না—জিজ্ঞাসা করায় বল্লেন ৫টনটা পার হতে পারি—তবে ৪টন পার হবে আর বাকী ৪টন পড়ে থাকবে। আরো মুস্কিল অত বড় বাস ঘোরাবার জায়গা নাই; আর তেলও ফুরিয়ে এসেছে। অনেক ভেবে নিরুপায় হয়ে সেটাকে পেছু হটাতে আরম্ভ করা গেল। আধ মাইল এই ভাবে আসার পর ঘোরাবার জায়গা পাওয়া গেল। তখন আমরা অন্য রাস্তা দিয়ে যাত্রা সুরু করলুম। বেলা ৪টায় আমরা Rotteuburg গ্রামে এসে হাজির হলুম। এই গ্রামটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এবং ইহা না কি জার্ম্মাণীর একটা অতি

পুরাতন গ্রাম। সমস্ত দিন উপবাসের পর এখানে এসে পেটে কিছু পড়ল। তখন আবার রওনা হলুম। এখানকার পাহাড়ের রাস্তা অত্যন্ত খারাপ। যদিও তখন ৬টা বেজেছে, তবু রাত্রি হয়ে গেছে। একেই বৃষ্টিতে পিছল, তার উপর ঘন কুয়াসা। এ ধরণের ঘন কুয়াসা চোখে না দেখলে ধারণা করা যায় না। সামনে থেকে যে দু একটা Motor আসছে, আলো দেখে মনে হয় এক মাইল দূরে আছে, কিন্তু বাস্তবিক সেটার দূরত্ব মাত্র ১০ হাত। আমাদের Busএর তীব্র Head lightএ ৩।৪ হাত দূরের বেশী কিছুই

Koln গির্জ্জার সম্মুখে ভারতীয় নর্ত্তক-দল

দেখা যায় না। আমাদের সোফার গাড়ী দাঁড় করিয়ে lightএর উপর হলদে রঙের কাচ পরিয়ে দিল, তাতে না কি কুয়াসা ভেদ করে কিছু কিছু দেখা যায়। আমরা কিন্তু বিশেষ তফাৎ বোধ করলুম না। শুধু এতক্ষণ আমরা সাদা কুয়াসা (ধোঁয়া) দেখ্‌ছিলুম—এইবার সেগুলো হলদে হয়ে গেল (কতকটা সরষে ফুলের মত !)। আমরা যতই পাহাড়ের উপর উঠতে লাগলুম—ততই কুয়াসা ঘন হতে লাগল। আমরা সামনে তো কিছুই দেখতে পাচ্ছিলুম না, শুধু পাশে দেখতে পাচ্ছিলুম যে, আমরা রাস্তার উপর দিয়ে চলেছি। রাত্রি ৯।০টা পর্য্যন্ত এইভাবে চলবার পর আমাদের বাস্‌টা পিছলে এক ধারে গিয়ে পড়ল—সোফার অনেক চেষ্টাতেও থামাতে পারল না। পাশে একটা খানার মত ছিল—এক দিকের দুটো চাকাই তার মধ্যে ঢুকে গেল, সঙ্গে সঙ্গে Busটাও কাত হয়ে পড়ল। একেবারে উল্টে যায় নাই এই ভাগ্য। আমরা তাড়াতাড়ি নেমে পড়লুম। সোফার আর একবার চেষ্টা করল গাড়ীকে তুলতে। ফলে কাদার মধ্যে চাকাগুলো আরো এক ফুট বসে গেল। তখন নিরুপায়। বাইরে কন্‌কনে ঠাণ্ডা, তার উপর তুষারপাত ; সারা রাত্রি এ ভাবে থাকলে তুষার-সমাধি নিশ্চিত। ইতিমধ্যে দূরে একটা Motorএর আলো দেখা গেল। আমাদের সেক্রেটারী Mr. Lusto Bogner তাদের হাত নেড়ে থামিয়ে জার্ম্মাণ ভাষাতে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। তাঁরা বল্লেন প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে একটা গ্রাম আছে ; সেখান থেকে সাহায্য নিতে হবে। এই বলে Mr Bognerকে সঙ্গে করে তাঁরা নিয়ে গেলেন। আমাদের ব্যবস্থা হল, ততক্ষণ না সাহায্য আসে আমরা শীতে কাঁপব। আমাদের সেক্রেটারী Mr. L. Bogner একজন হাঙ্গেরিয়ান (Hungarian) ভদ্রলোক। এঁর একটি বিশেষত্ব—কোন বিপদে না পড়লে ইনি বড় বিমর্ষ থাকেন যেন ;—বিপদে পড়তে পাল্লেই বাঁচেন—কাজেই এই ব্যাপারে তাঁর যে বিশেষ আনন্দ হয়েছিল সে কথা বলা বাহুল্য। কিছুক্ষণ পরে একটা Motor cycle ভীষণ বেগে আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কিন্তু খানিকটা গিয়ে সেটা আবার ফিরে এল। তাতে দুজন ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁরা আমাদের ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করলেন। সেটা আমরা ভাবে বুঝলুম—ভাষা এক বর্ণও বুঝতে পারলুম না। আমরাও "মুদ্রা" অভিনয় দ্বারা তাঁদের সব বুঝিয়ে দিলুম। তাঁরা বুঝতে পেরে খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং আমাদের সাহায্য করতে চাইলেন। এটা জার্ম্মাণদের মজ্জাগত স্বভাব—ইওরোপের অন্য কোন জাতি এ অবস্থায় সাহায্য করতে রাজী হত না। আমরা তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে বুঝিয়ে দিলুম যে আমাদের লোক নিকটবর্ত্তী গ্রামে

গিয়েছে এবং আপনাদের দুজনের দ্বারা এ কাযটা মোটেই সম্ভব নয়। অগত্যা তাঁহারা ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় নিলেন—

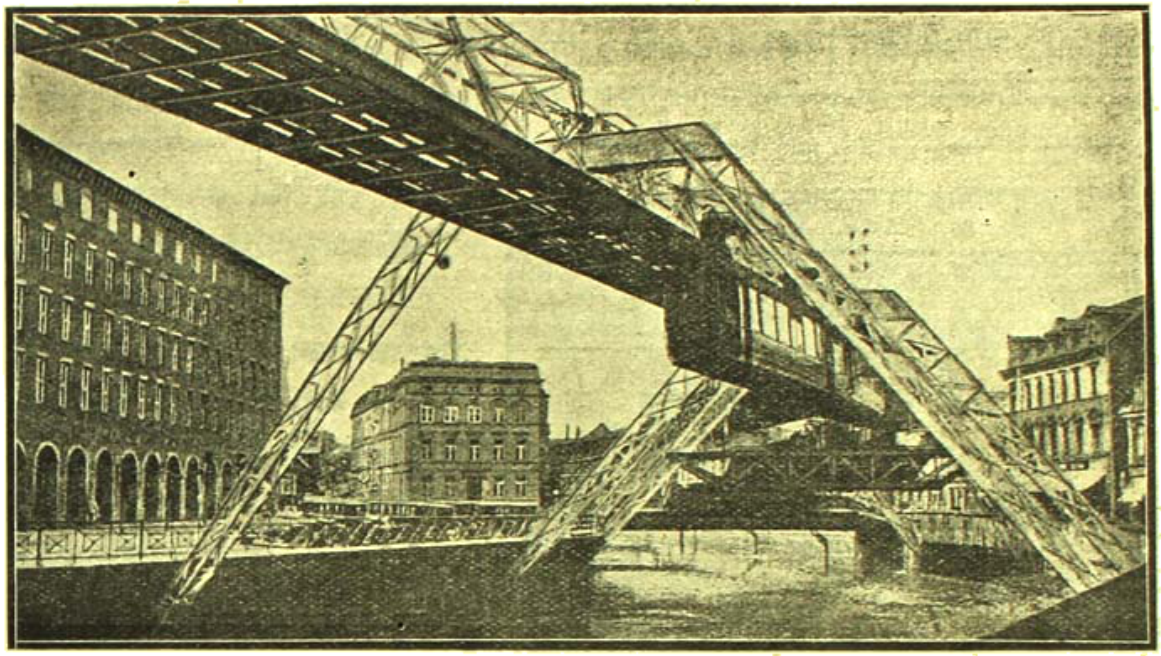

শূন্যে রেলপথ—এরবার কেও

আমরাও শীতে কাঁপতে লাগলাম। আমাদের একটা বিশ্বাস ছিল যে Bogner যখন গিয়েছে, সে একটা না একটা

ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর সীমান্তে তিমিরবরণের বস্ত্রাদি কাষ্টম অফিসাররা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছে—সিগারেট আছে কি না

ব্যবস্থা করবেই। আমরা খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর দেখা গেল যে সেই দুজন লোক Motor cycleএ আবার ফিরে এসেছেন। তাঁরা জানালেন, কাছেই একটি ছোট গ্রাম আছে এবং সেখানে একটি ছোট Hotel আছে। খাবার পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কমই; তবে শোবার জায়গা হতে পারে। তা ছাড়া এই রাত্রে এ রকম কুয়াসাতে কেউ সাহায্য করতে আসবে না। আমরা কিন্তু যেতে রাজী হতে পারলুম না নানা কারণে। তা ছাড়া এই সব জিনিষ পত্র অজানা জায়গায় ফেলে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। যাই হোক লোক দুটি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় নিলেন। এই ভাবে রাত্রি ১১টা বেজে গেল। কিছু পরেই Bogner একটা Tractor ও কয়েকজন লোক সঙ্গে করে নিয়ে এল। অত রাত্রে এদের আনতে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় তৎক্ষণাৎ আর একটি ঐ রকমের Tractor এবং কয়েকজন লোক এসে হাজির হল। এদের যোগাড় করে নিয়ে এলেন সেই দুজন লোক যারা Motor cycle করে এসেছিলেন। যাই হোক তারা খুব তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ কর্ল। Busএ মোটা শিকল বেঁধে Tractor দিয়ে টানাটানি আরম্ভ কর্ল। আমরাও সকলে মিলে Busটাকে ঠেলে রেখেছিলুম যাতে না উল্টে যায়। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেটা রাস্তার উপর উঠে এল। আমরাও উদ্ধার পেলুম।

এ যাত্রা আমাদের এত সহজে উদ্ধার পাবার প্রধান কারণ যে এ দেশটা জার্ম্মাণী। অন্য কোন দেশের লোক এত রাত্রে বিদেশী লোককে সাহায্য কর্ব্বার জন্য আসত না। পরোপকার-বৃত্তি এই জার্ম্মাণ জাতির একরকম মজ্জাগত। যেই হোক, আমরা সকলকে যথেষ্ট ধন্যবাদ ও বক্‌শিষ দিয়ে রওনা হয়ে পড়লুম। রাত্রি একটার সময় নিকটস্থ একটি ছোট গ্রামে এসে পৌছুলাম। সেখানে কিছু খাবার

Chemnitzএর রাস্তায় তুষার-রাশি

যোগাড় হল অনেক কষ্টে। অত রাত্রেও আমাদের চারি পাশে ভীড় জমে গেল। আমরা যে কোন্ দেশের লোক তা তারা বেশ বুঝতে পেরেছিল। তাদের মধ্যে একজন Auto Busএর কাচের উপর যে কুয়াশার জলীয় পর্দ্দা জমে

বার্লিনের পথে

ছিল, তাতে আঙুল দিয়ে লিখে দিল "Gandhi Bravo"। যাই হোক আমরা রওনা হয়ে অতি কষ্টে সেই পাহাড়ের রাস্তা অতিক্রম করে গন্তব্য স্থানে রাত্রি ৪টের সময় এসে পৌছিলাম। সে রাত্রে ঐ পিছল পাহাড় থেকে যে কোথাও গড়িয়ে পড়ে নিশ্চিহ্ন বা লোপ পেয়ে যাই নাই এই যথেষ্ট।

২৪শে জানুয়ারি আমরা বার্লিনে পৌছুলুম—তার পরের দিনই Stettinএ আমাদের Show ছিল। আমরা Chemnitzএ যে Show দিয়েছিলাম সেটা সকাল ১০টায় আরম্ভ হয়েছিল। সেই অসময়েও অসম্ভব ভীড় হয়েছিল। সেই দিন সন্ধ্যাতেই Leipzigএ আর একটি Show দিতে হয়েছিল। এখানে নানা দেশের Stage, সাজঘর, আলোর ব্যবস্থা সম্বন্ধে লিখতে গেলে অনেক কথাই লিখতে হয়। প্রত্যেক জায়গায়ই নূতন নূতন ব্যবস্থা দেখতে পাই। এই সমস্ত আধুনিকতম-বৈজ্ঞানিক আলোর বন্দোবস্ত, ষ্টেজ ঘোরাবার বন্দোবস্ত, এ সমস্ত সত্যই দেখবার মত। আমরা এখানে জার্ম্মাণ বায়স্কোপ ও থিয়েটার দেখলাম। এদের বায়স্কোপে আখ্যান-ভাগ ফ্রান্সের মত একেবারে বাজে, কিন্তু ফটো-গ্রাফী ও টেক্‌নিক্ এত উচ্চ ধরণের যে মনে হয় আমেরিকার ফটোগ্রাফী এর কাছে তুচ্ছ।

জার্ম্মাণীর কয়েক জায়গায় Anti-French feeling অত্যন্ত বেশী। সেই জন্য আমাদের প্রধান ভয় ছিল যে আমাদের মোটর চালক একজন ফরাসী এবং আমাদের নিজেদের যে মোটর Bus সেটিও ফরাসী দেশে প্রস্তুত—Made in France! গাড়ীর মেকার ছিল প্রসিদ্ধ "Renault"। অতএব হয়ত জার্ম্মাণীতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হবে। কিন্তু সুখের বিষয় যে দু-একটা সামান্য ঘটনা ছাড়া এখন আমাদের বিশেষ কোনো অসুবিধায় পড়তে হয়নি। একবার Gronburgএর হোটেলের ম্যানেজার আমাদের ফরাসী বাস ও বাসচালককে কিছুতেই তাদের Garrageএ স্থান দিতে চায়নি। অতি কষ্টে দ্বিগুণ ভাড়া দণ্ড দিয়ে তবে এক রাত্রির জন্য রাখবার উপায় হলো!

২০শে জানুয়ারী আমরা Halleএ ইউরোপের শত সংখ্যক Show দিলাম। (গত বৎসর 3rd March 1931এ Parisএ প্রথম আমরা অবতীর্ণ হই—এ কথা বোধ

হয় মনে আছে।) সেদিন আমরা এখানে ডিনারএ এখানকার বড় বড় লোক এবং ছাত্রদের নিমন্ত্রণ করেছিলাম। সে রাত্রি খুব আমোদে কেটেছে।

১৯শে তারিখে Dresdenএ Concert Hallএ আমরা Show দিয়েছিলাম। এখানে সবশুদ্ধ দেড় হাজার লোকের বসবার আসন ছিল; লোক হয়েছিল দু'হাজারেরও উপর—বাকী সকলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এখানে Mary Wigmanএর বিখ্যাত নাচের স্কুল আছে। এখানে একজন ভারতীয় মহিলাকেও (মুসলমান) দেখিলাম। তিনি দিল্লী হইতে এখানে নৃত্য শিখতে আসিয়াছেন। এখানে সাধারণতঃ আমেরিকা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা নৃত্য শিখতে আসেন, কারণ টেক্‌নিকের দিক্ দিয়ে এত ভাল নাচের স্কুল না কি ইওরোপে আর নাই। এখানে যতগুলি জায়গায় আমাদের Show দেওয়া হয়েছে, প্রায় সর্ব্বত্রই পুনরায় আসতে হবে এই রকম কথা দিতে হয়েছে। এরা আমাদের মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত আটকে রাখতে চায়, কিন্তু "মার্কের" দাম যদি হঠাৎ নেমে যায় (এর সম্ভাবনা খুব বেশী), তাহলে আমাদের বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে, তাই তাড়াতাড়ি যেখানে যেখানে Show দেবার কথা আগে থেকে ছিল, সেইগুলি শেষ করে প্যারীতে ফিরে যাব।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটী কথা লেখবার আছে। গত অগ্রহায়ণ মাসের "ভারতবর্ষে" ডাঃ শ্রীযুক্ত রবেন্দ্রকুমার পালের "প্যারিসে কয় রাত্রি" পড়লাম। তিনি তাতে আমাদের নামেরও উল্লেখ করেছেন দেখলাম। এঁর প্রবন্ধ পড়ে প্যারীর লোকেরা, আমরা যে ভাবে মিস্ মেয়োকে দোষ দি, সেই ভাবেই দোষ দিবেন। তিনি এখানকার খারাপ জিনিষগুলির বর্ণনাই বেশী করেছেন; কিন্তু এর ভাল জিনিষগুলি এত ভাল বা অন্য কোন সভ্য দেশে পাওয়া দুষ্কর। তবে তাঁকেও বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। এখানে যাঁরা নূতন আসেন Thos. Cook তাঁদের Paris by night দেখাবার ভার নেয়, অবশ্য উপযুক্ত দক্ষিণা নিয়ে; এবং তাঁরা যা দেখায় তা তো ভদ্রলোক বর্ণনা করেছেন। আমি এখানকার অনেক লোককে জানি যাঁরা জীবনে "ক্যাসিনো দি প্যারী" বা ফলি বার্জা প্রভৃতি উল্লিখিত স্থানে জীবনে যান নাই। এই সমস্ত স্থানে বিদেশীর ভীড়ই বেশী হয় এবং তাদের অর্থেই এগুলি পরিপুষ্ট।—

আমরা এত জায়গায় যাচ্ছি—সমস্ত দেশের বড় বড় লোকের ও বড় বড় সাময়িক পত্রে আমাদের যে সমস্ত সুখ্যাতি বেরুচ্ছে—সত্য কথা বলতে গেলে সেগুলি আমাদের প্রাপ্য নয়। তারা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের

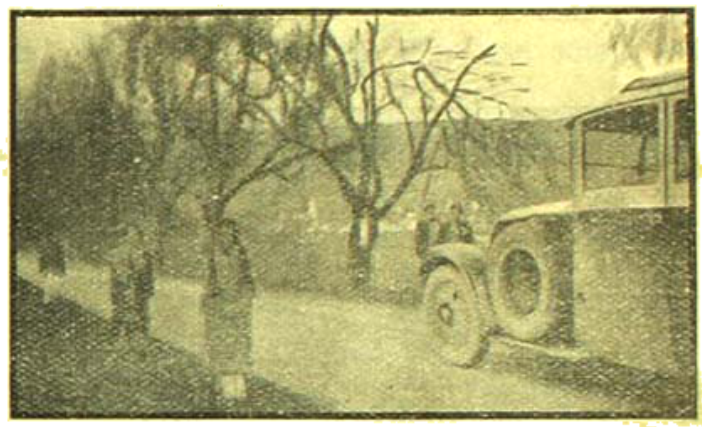

ড্রেসডেনের রাস্তায়

হিন্দু সভ্যতা, তার সঙ্গীত ও নৃত্যের নমুনাতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে, আর প্রত্যেকেই বলে হিন্দু সভ্যতা বা "কাল্‌চার" যে কত উচ্চ স্তরে গিয়েছিল, তা আমরা ধারণা কর্ত্তেই পার্ব্ব না। আমাদের দেশ, ও সভ্যতার

হাম্বার্গে জনতা

এই ভারতীয় দল যেখানেই গিয়াছে সেইখানেই এইরূপ জনতা হইয়াছে

প্রতি তাদের এ ধরণের ভক্তি ও উচ্ছ্বাস আমাদের মনে যে কি আনন্দ আনে তা ভাষায় বর্ণনা অসম্ভব। এক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের নিন্দা, সুখ্যাতি, লাভ বা ক্ষতির কথা আমাদের মনেই আসে না। তা ছাড়া আর একটা

কথা—এখানে সমস্ত দেশের বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞগণের সঙ্গে আলাপ-কর্ব্বার এবং তাঁদের গান বা বাজনা শোনবার এবং তাঁদের সঙ্গে সঙ্গীত-আলোচনা কর্ব্বার সৌভাগ্য হয়েছে। আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতের "আলাপ" সম্বন্ধে আলোচনায় যখন এঁদের বুঝিয়ে দিই যে আমাদের রাগের আলাপের কোন সীমা নেই এবং এখানে শুধু গায়ক বা বাদকের ভাব অনুযায়ী সেটা যত ইচ্ছা বাড়ানো যেতে পারে এবং সঙ্গীতের রস-সৃষ্টি শুধু

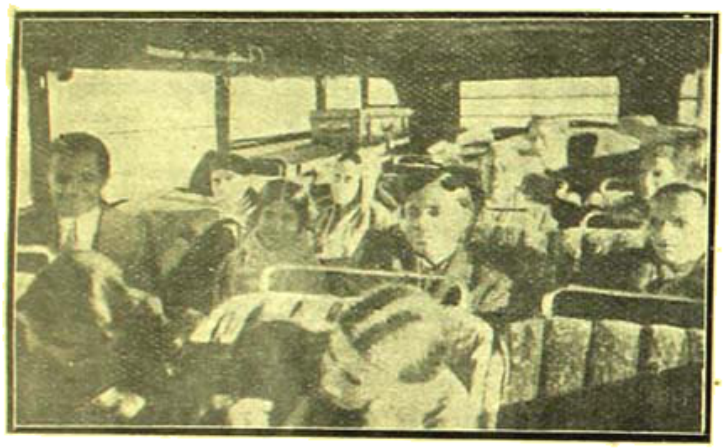

Auto Bus-এর ভিতরের দৃশ্য

গায়ক বা বাদকের চরিত্রের উপর নির্ভর করে—ইওরোপের মত সঙ্গীত রচয়িতার (composer) স্থান ভারতীয় সঙ্গীতে নাই, ইত্যাদি এঁদের ভাল করে বুঝিয়ে দিলে তাঁরা বেশ বুঝতে পারেন এবং সকলেই বলেন স্মরণাতীত কাল থেকে এ সঙ্গীত আপনাদের মধ্যে চলে আসছে—আমরা ধারণা কর্ত্তেই পারি না' সভ্যতা কোন স্তরে উঠলে এ ধরণের সঙ্গীত সৃষ্ট হতে পারে!! কেউ কেউ বলেন—আমরা এখন বিশ্বাস কর্চ্ছি আপনাদের সঙ্গীত মনুষ্য-সৃষ্ট নয়,—দেব-সৃষ্ট। আমাদের দেশের সঙ্গীত সম্বন্ধে এখানে বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞের এ ধরণের উচ্ছ্বাস—আমাদের যে কোথায় নিয়ে যায়—তা তোমরা ভাবতেই পার্ব্বে না। এই ত গেল সঙ্গীতের কথা। হিন্দু-নৃত্য সম্বন্ধে ওদের যা ধারণা শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর করিয়ে দিয়েছেন, তা' তোমরা ধারণা কর্ত্তে পার্ব্বে না। যেখানেই আমাদের 'Show হয়েছে, প্রত্যেক স্থানেই ২০।২৫ বার করে Encore হয়েছে এবং এক একটা নৃত্য ২।৩ বার দেখাবার পর তাঁর শরীরের অবস্থা যা হয় বুঝতেই পাচ্ছ। কাযেই অধিকাংশ সময়েই দর্শকবৃন্দের উল্লাসধ্বনি এবং Encore উপেক্ষা করেই চলে আসতে হয়। তা'ছাড়া এ দেশের সমস্ত ছোট-বড়ো সাময়িক পত্র এবং গুণগ্রাহী মনীষীরা উদয়শঙ্করকে যে ভাবে স্তুতি ক'রেছে, তা' দেবতারই যোগ্য। আমাদের প্রধান গর্ব্ব আমরা উদয়শঙ্করের সঙ্গী এবং তার এই পাশ্চাত্য প্রদেশাভিযানের সহযাত্রী! এবং আরও বড় গর্ব্ব যে প্রাচীন হিন্দু-নৃত্যকলার যিনি পুনরুদ্ধার করেছেন এবং বিশ্বের দরবারে তাকে মহনীয় ক'রে তুলেছেন, তিনি আমাদেরই একজন বাঙালা।

আমাদের আপাততঃ এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত এইভাবে ঘুরতে হবে। দক্ষিণ ইওরোপের প্রায় পঞ্চাশটি শহরে আমাদের Show শেষ করে যদি জীবিত অবস্থায় প্যারিসে ফিরতে পারি আবার বড় ক'রে চিঠি লিখবো।

Hotel Excelsior
Bremer haven
(Germany)

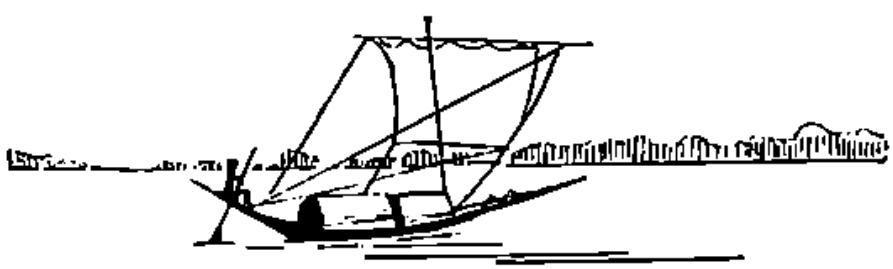

দেবদাসী *

শ্রীঅনুরূপা দেবী

(নাটিকা)

স্থান—ত্রিপাবেলোর শ্রীরঙ্গনাথজীউর মন্দির

পাত্রগণ	পাত্রীগণ
প্রধান পুরোহিত	বিশোকার মাতা
(বিজয় রাঘবাচারিয়ার)	বিশোকা
মহারাজা উৎপলাদিত্য	চম্পা, ভদ্রা, চিন্তা, রম্ভা, আর্দ্রা — দেবদাসীগণ
পুরোহিতগণ, দেবসেবকগণ, সারেঙ্গীওয়ালা, তবলচী প্রভৃতি	
দর্শকগণ	রঙ্গিলা—গৃহস্থবধূ
	শিশু
	দর্শিকাগণ

প্রথম দৃশ্য

স্থান—শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির-চত্বর

প্রধান পুরোহিত বিজয় রাঘবাচারিয়ার অন্যান্য দেবসেবকগণ, দেবদাসী, চম্পা, বিশোকার মাতা, বিশোকা (আদরিণী)

বিশোকার মাতা। (প্রধান পুরোহিতের প্রতি) ঠাকুরমশাই! আপনি তো জানেন সবই; যখন উপরি উপরি পাঁচটী ছেলেমেয়ে জন্মেই মরে গেল, কেঁদে এসে বাবার দরজায় লুটিয়ে পড়লুম, তখন আপনিই তো আমার হাতে ধরে তুলে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, কেঁদো না বাছা, বাবার কাছে মানত করে যাও যে, এবার যদি ছেলে হয় তাকে দেবসেবক করে দেবে, আর মেয়ে হয় ত সে হবে দেবদাসী। তা'ই করে এই আমার সাত রাজার ধন আদরিণীকে পেয়েছিলুম; কিন্তু বাবা! লোভে পড়ে ওকে আমি বাবার দোরে দিতে পারিনি, ওর কাছ থেকে চুরি করে লুকিয়ে রেখেছিলুম, তার ফলও আমি পেতে বসেছিলুম বাবা! মেয়ে আমার যমের দোয়ারে পৌঁছে গিয়েছিল; আবার কত কেঁদেকেটে বাবার উদ্দেশে মাথাকুড় খুঁড়ে কের মানত করে তবে আবার এই মেয়ে আমি ফেরৎ পেয়েছি। আর না, আর লোভে পড়ে দত্তাপহারী হয়ে মহাপাতক করবো না। এই নিন বাবা ঠাকুর! আমার— (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমার সর্ব্বস্বধন, আ—আ—আমার ঘরের আ—আলো, অ—অন্ধের নড়ি আপনার (জিভ কাটিয়া শিহরিয়া উঠিয়া একটু সংযত ভাবে) ভগবান শ্রীরঙ্গজীর চরণে সমর্পণ করে দিলুম (আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল)। ওরে আপনারা দেখবেন, যত্ন কর্ব্বেন (মুখে কাপড় গুঁজিয়া দুলিয়া দুলিয়া কান্না)।

প্রধান পুরোহিত। (অগ্রসর হইয়া আসিয়া আদরিণীর হাত ধরিল) দেবতার গচ্ছিত ধন দেবতাকে ফিরিয়ে দি'তে এসেছ, এতে এতো কাঁদবার কি আছে? অশ্রদ্ধার সঙ্গে যে দান সে কি দেবতা গ্রহণ করেন? গীতায় ভগবান বলেছেন—

"অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ।"

বিশোকার মাতা। অশ্রদ্ধা যদি করবো বাবা! তবে আমার অন্ধের নড়িটুকু তাঁর চরণে সঁপে দিতে এলুম কেন? তবে কি জানেন বাবা! মায়ের প্রাণ, পাষাণে বুক বাঁধলেও বুকের পাষাণ খসে পড়ে;—পোড়া চোক (মুখ ফিরাইয়া চোক মুছিতে লাগিল)।

প্র·পুরোহিত। (মৃদুহাস্যে) কেমন করে জান্‌বো

---

* প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ভারতী-পত্রিকায় এবং পরে আমার চিত্রদীপ নামক ছোট গল্পের বইএ দেবদাসী ছোট গল্পরূপে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে ছেলেমেয়েদের অভিনয়োপযোগী ভাবে ইহাকে একখানি ক্ষুদ্র নাটিকারূপে পরিবর্ত্তিত করিলাম। অভিনয়কালে পাত্র পাত্রীগণের বেশভূষাদি যতদূর সম্ভব দক্ষিণ দেশের উপযোগী করা আবশ্যক; যেহেতু দেবদাসী-প্রথা প্রধানতঃ দক্ষিণ দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। —লেখিকা

বাপু! মা' তো হই নি, মায়ের প্রাণের খবর কে রাখে? জানি ঐ ওঁকে, ঐ একমাত্র ওঁকেই পেয়েছি, ওঁকেই চিনেছি, তাই জানি। ওঁর কাছে সংসারের কান্না-হাসি কিছুই কিছু নয়। ক্ষুদ্র মোহ, তুচ্ছ স্নেহ ওঁর চরণে এসে লয় হয়ে গেছে।

বিশোকার মাতা। (ঈষৎ শান্ত ভাবে) মৃদু মেয়েমানুষ, কিছুই তো জানিনে বাবা! ঘর সংসার, স্বামী, সন্তান এই-ই চিনেচি। তবে এ সবই যে ওঁর মায়ার দান এটুকুই শুধু জানি।

প্র-পুরোহিত। বেশ বেশ! তা মেয়েটাকে একটু গানটান শিখিয়েছ, না, শুধু ভাত ডাল নেড়ে হাত পাকিয়েছে?

মাতা। গান বাবা! গরীব গেরস্তর মেয়ে কার কাছে শিখবে বাবা ঠাকুর! তবে পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এমনি আপন মনেই যা গায়। গা' তো মা! আদর! সেই তোদের খেলার গানটা গেয়ে বাবা ঠাকুরকে শোনা ত মা! ভয় কি মা, গাও, গাও, মা, কিছু লজ্জা নেই! এঁদের কাছে গাইতে হয়।

বিশোকা। (অনিচ্ছার সহিত) আমি পারবো না মা!

প্র-পুরোহিত। এ মেয়ের তো দেখি বড্ডই অবাধ্য! পারবো না কি কথা? ও রকম ঠ্যাঁটামো এখানে চলবে না। গাও।

মাতা। (গায়ে হাত বুলাইয়া) গাও মা, গাও।

বিশোকা। (ছল ছল চোখে) একলা একলা কেমন করে গাইব (প্রধান পুরোহিতের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সভয়ে) গাচ্ছি গাচ্ছি—

গীত

চলরে ও ভাই খেলতে চল, খেলতে চল।
সঙ্গীরা সব খেলতে গেল কেমন করে থাকবো বল্?
বনের ছায়ায় রচবো মোরা লুকোচুরির ঘর,
আবার, আমি হবো বৌটী তোমার, তুমি আমার বর।
তুলবো কুসুম, গাঁথবো মালা, পাড়বো গাছের পাকা ফল।

প্র-পুরোহিত। গলা ভাল, তবে শেখাতে হবে। দেখ, এ সব গান এখানের জন্যে নয়। এখানে শুধু ভগবানের বন্দনা-গান গাইতে হবে। তুমি সে রকম গান জানো?

বিশোকা। (ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়িল) না—

প্র-পুরোহিত। এঃ, মেয়েকে কোন শিক্ষা দাওনি! আচ্ছা হয়ে যাবে। শিখিয়ে নেওয়া যাবে। দেখ বাপু! কান্না কি তোমার শেষ হবে না? কি বিপদ!

বিশোকার মাতা। (সভয়ে চোক মুছিবার চেষ্টা করিয়া ভগ্নস্বরে) না না, কাঁদছি কই? কাঁদিনি, কাঁদিনি, এ আমার চোখের বারামের জন্যে জল পড়চে। (আদরিণীর হাত লইয়া পুরোহিতের হস্তে দিল) আপনার চরণে সঁপে দিলুম বাবাঠাকুর! ওকে দেখো। (ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল)

আদরিণী। (মাকে জড়াইয়া) না না, আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না। না, না, আমায় ছেড়ে যেও না—(কান্না)

প্র-পুরোহিত। (মায়ের প্রতি) দেখ বাপু! যদি দেবতার সঙ্গে খেলা করতে না চাও, তাহলে ওঁর দরজায় দাঁড়িয়ে আর এ অভিনয় করো না। এতে প্রত্যবায় হচ্ছে, তা কি বুঝতেও পারচো না? যেন উনিই জোর করে তোমার কোল থেকে তোমার মেয়ে ছিনিয়ে নিচ্ছেন! কেন, রাখতে পারলে না মেয়েকে? চুরি তো করেই ছিলে,—চোরাই মাল পৌঁছে দেবার জন্য ফের এলে কেন?

মা। (সভয়ে) না না, আর কাঁদবো না, আর কাঁদবো না, এই চোক মুছলুম। আদর! তুই এইখানে থাক্ মা! বাবা রঙ্গনাথজীকে তোকে তোর জন্মের আগেই সঁপে দিয়েছি,—আমি আর তোর মা নই, কেউ নই, তুই ওঁর, ওঁর শুধু—ওঁর, আমি—আমি—আমি চল্লুম,……

বিশোকা। (সবলে হাত ছাড়াইয়া মাকে ধরিল) না, না—যেও না, আমায় ফেলে যেও না, আমি থাকতে পারবো না মা!—

প্র-পুরোহিত। দেখ, অত আহ্লাদেপানা এখানে থেকে চলবে না,—এ দেবতার ঘরকন্না, এখানে ও সব ন্যাকামীর জায়গা নেই। (সবলে টানিয়া লইল)

মাতা। আমি যাই—চল্লেম রে আদর! জন্মের মতন এই শেষ—(উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিয়া দুই হাতে মুখ চাপিয়া ধরিয়া ছুটিয়া প্রস্থান)

বিশোকা। মা! মা। (লুটাইয়া পড়িল)

চম্পা। (ছুটিয়া আসিয়া কোলে তুলিয়া লইতে গেল) চুপ কর মা! চুপ কর। ভয় কি? কান্না কিসের? আমি—আমরা রয়েছি, আমি—আমরা তোমায় দেখবো, যত্ন করবো, ভয় কি তোমার ওঠো, মা, ওঠো।

প্র-পুরোহিত। (সব্যঙ্গে হাসিয়া) বড়-ঠাকরুণের বুঝি একটী পুষ্যি কন্যের দরকার হয়েছে? মেয়ে জামাই নাতিপুতি নিয়ে ঘরকন্না পাতাবে বুঝি? বাঃ বাঃ।

বিশোকা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) মা! মা! (চম্পার গলা জড়াইয়া ধরিল)

চম্পা। (পুরোহিতের বিদ্রূপের ভয়ে ত্রস্তে সরিয়া গিয়া) না না, মা নয়, মা নয়, আমরা যে দেবদাসী, আমাদের তো মা বাবা ভাই বন্ধু কেউ থাকতে নেই, আমাদের শুধু ঐ উনি আছেন। (হাত দিয়া মন্দিরাভিমুখে প্রদর্শন) ঐ উনিই আমাদের সব, ঐ উনিই আমাদের সব। পাতা পতি পরমসখা স্বামী।

বিশোকা। (আকুল চক্ষে চাহিয়া কাঁদিয়া) না না, না, ও নয়, ও নয়, ও তো ঠাকুর! ও আমার কেউ নয়, আমার মা!—(কান্না)

প্রধান-পুরোহিত। চম্পা! কাল থেকেই এর শিক্ষা আরম্ভ করবে; নাচ গান কলাবিদ্যা সমস্ত খুব ভাল করে শেখাবে; এর নাম হলো বিশোকা। ও আদর টাদর এখানে চলবে না, একটু বয়েস হয়ে গ্যাছে, শীঘ্র শীঘ্র সব শেখানো চাই। তারপর শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে শুভ দিনে শুভ মাল্য-বিনিময় হবে। আরতির সময় হয়ে এলো, আমি যাই।

[সকলের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—প্রথম দৃশ্যের স্থান। পুরোহিতগণ, দেবসেবকগণ, বিশোকা। প্রধান পুরোহিতের হস্তে আরতি-প্রদীপ, দেবদাসীগণের নৃত্য ও গীত।

গীত

জীবন যমুনাকূলে, দুলে দুলে ওঠে আনন্দ তরঙ্গ-মালা,
বাঁশরী বাজায় কালা—
বাজে বাজে বাঁশী বাজে, বাঁশি বাজে ভরা সাঁঝে, চিত্তমাঝে,
এ কি রে বিষম জ্বালা—
বাঁশী গাহিয়া ডাকে রাধা রাধা, বাঁশি ভুলায়ে দেয় সব বাধা,
বাঁশির রবেতে প্রাণ পড়ে বাঁধা, কালার চরণে পরাণ ঢালা।

পটক্ষেপণ

তৃতীয় দৃশ্য

শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দিরের একাংশে দেবদাসীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট একটী ক্ষুদ্র কক্ষে, শয্যাশায়িত বিশোকা

বিশোকা। উঃ, মাথায় কি রকম কষ্ট হচ্ছে! আমি সইতে পারছিনে। কে আমার মাথা টিপে দেবে? জল, জল কে দেয়? মা! ওমা! মাগো! তুমি কোথায়? এখানে কি করে থাকি, এখানে কাউকে মা বলতে পাই না, দুঃখ হলে কাঁদতে পাই না, পুজো না হলে কিছু খেতে পাই না,—আর রাত নেই, দিন নেই, কেবল গান বাজনা নাচ শেখা! কখন ও সব ভাল লাগে? বাবার সঙ্গে কেমন বেড়াতে যেতুম, সেখানে কত ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা সব আসতো, খেলা করতুম। এখানে কিছু করলেই বকে, বলে তুমি দেবদাসী, তোমার কি ছেলেমানুষী করতে আছে! আমি দেবদাসী হতে চাইনে, বড়-ঠাকরুণ!

(চম্পার প্রবেশ)

চম্পা। বিশোকা আমায় তুমি ডাকচো?

বিশোকা। হ্যাঁ, ডাকচি, এসো—

চম্পা। (কাছে আসিয়া) কি বলচো? কি চাই?

বিশোকা। (হাত ধরিয়া) তুমি বসো, আমার কাছে বসে থাকো, চলে যেতে পাবে না।

চম্পা। (বসিয়া) পাগল আর কাকে বলে।

বিশোকা। হাসলে হবে না, আমি একলা থাকতে পারিনে, একলা থাকতে আমার ভয় করে, আমার ঘুম হয় না, কান্না পায়, কেন আমি একলা থাকবো? তুমি আমার কাছে থাকো।

চম্পা। ছিঃ মা! (সচকিতে) ছি বিশোকা! এখন তুমি বড় হচ্চো, এখনও কি আর অত ছেলেমানুষী কর্ত্তে আছে! ভয় কিসের? এই তো সাম্‌নের ঘরেই আমি আছি, দরকার হলেই তুমি ডেকো, ডাকলেই আসবো। নাও এখন ঘুমোও, আমি যাই।

বিশোকা। কেন, তুমি আমার ঘরে শোবে না? এতদিন তো শুতে···

চম্পা। জানো ত দেশপাণ্ডে মশাই তার জন্যে আমায় ভর্ৎসনাও তো কম করেন নি। এখন তুমি শীঘ্রই দেবদাসী হবে, তব ভাবনা মোহ এ-সব কি দেবদাসীদের সাজে? তাই তোমার চিত্ত নির্ব্বিকার কর্ব্বার জন্যেই উনি আমায় তোমার কাছে বেশি থাকতে বারণ করেছেন। জানতে পারলে রাগ কর্ব্বেন, আমি যাই। (গমনোদ্যত)

বিশোকা। বেশ যাও, আমি মরে যাবো।

চম্পা। (ফিরিয়া আসিয়া বিশোকাকে জড়াইয়া ধরিল) নিঠুর মেয়ে! আমায় খুন না করে তুই ছাড়বি না? তুই আমায় মারতে এসেছিস্! ধর্ম্ম কর্ম্ম আমার সব ধলাঞ্জলি গেছে,—তোর চিন্তায় আমার একদণ্ড শান্তি নেই। ওদিকে তিনি এদিকে তুই—আমায় কেটে কেটে দিনরাত হুন দিচ্ছিস্। না, ও-সব ছেলেমানুষী ছাড়! মনকে শক্ত করতে শেখ, খা-দা, গান গা, সুখে থাক, সবাই তো আছে, তুই অমন কেন? (চোখ মুছিতে মুছিতে) ঘুনিয়ে পড়ো।

বিশোকা। (গলা ধরিয়া) মা! তুমি কাঁদলে? কখন তো কাঁদো না?

চম্পা। ওরে এ বুক পাষাণ হয়ে গেছলো, পাষাণ দেবতাকে বুকে রেখে। তা'তে কোমলতা ছিল না। তুই কোথা থেকে এসে তা'তে এমন করে প্রাণ ফিরিয়ে আন্লি জানিনে। জানিনে কেন মিথ্যে এ দুঃখ পাওয়া, যখন এর কোন প্রতিকার নেই;—না না, আমি যাই, যদি পাণ্ডে মশাই জান্তে পারেন— [দ্রুত প্রস্থান।

বিশোকা। মা! মা! বড়-ঠাকরুণ! আর আমি তোমায় মা বলবো না, সত্যি বলছি আর বলবো না, তুমি এসো—তুমি এসো! উঃ এমন ভয় করছে, কেন এরা আমায় দেবদাসী করবে, আমি দেবদাসী হ'তে চাইনে!

(রোদন)

পটক্ষেপণ

চতুর্থ দৃশ্য

শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দিরের নাট্যশালা

বিবাহ-বেশে সজ্জিতা বিশোকা (মাল্যহস্তে)

দর্শকগণ ও অন্যান্য দেবদাসী, পুরোহিত, সদাশিব প্রভৃতি।

বিশোকার লীলা-নৃত্য ও গীত

যে চরণ যোগীজনে সুধীজনে পায় না ধ্যানে।
ফুলের মালার কোমল বাঁধন বেঁধেছি আজ
সেই চরণে, আমার সনে।
প্রাণে প্রাণে, হৃদয় মনে, সযতনে।
কি পুলক উথ্‌লে ওঠে অন্তরে, আজ-আশার
নাহি অন্ত-রে,
বিপুল সুখে বাজ্‌ছে হৃদয় যন্ত্রে, জীবন-বীণা পূর্ণ
কেবল তোমার গানে, তোমার গানে।

বিশোকার পুনশ্চ গীত

জীবন যৌবন হৃদয় প্রাণ
নাথ, সকলি তোমারে করেছি দান।
আর, কি দিব? কি আছে? সবই তো গিয়াছে,
বিষাদ আনন্দ মান অভিমান,
আমি সবই যে তোমারে করেছি দান।

পটক্ষেপণ

পঞ্চম দৃশ্য

শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত চত্বর

ঝুলনোৎসব উপলক্ষে অধিকতররূপে সজ্জিত। বহুতর দর্শকমধ্যে মহারাজা উৎপলাদিত্য সমাসীন। এক ধারে ওস্তাদ ও তবলচী ও দেবদাসীগণ বসিয়া আছে। ঝুলনের উপর বিগ্রহ সংস্থাপিত।

বিশোকার ও অন্যান্য দেবদাসীদের নৃত্যসহ গীত

কানাইয়া আজে ঝুলন্ খেলাবে,
কদম্বকে পেঁড় পরে ঝুল্না ঝুলাবে।
ঝুলে কালা, দুলে বনমালা
মাতোয়ারা বায়ু চন্দনওলাবে।

ঐ— গীত

ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ বাজে নূপুর, ঝুলে কানাইয়া,—
ঝুলে কানাইয়া।
বন্সী বাজত বাজত মধুর খেলে কানাইয়া মেরে
খেলে কানাইয়া।

বন্‌শী রাবে, চিত্ত দোলাবে, কুল ছোড়াবে,
আপ্‌না ভুলাবে,
পাওয়ে লুটাবে, বড়ি খল-নিঠুর, শঠ কানহাইয়া।

(দর্শকগণের প্রশংসাধ্বনি ; কুলনের উপর পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ। পট পরিবর্ত্তন)

ষষ্ঠ দৃশ্য

মন্দির নাট্যশালা

মহারাজা উৎপলাদিত্য, সদাশিব, অন্যান্য দর্শকগণ, দেবদাসীগণ, ওস্তাদগণ।

বিশোকার লীলা-নৃত্য ও গীত

মম হৃদয়-সরসী-নীরে,—
শতদল হয়ে ফুটে উঠ বঁধু! ধীরে অতি ধীরে।
মলয় পবন সঙ্গে, তোমার অঙ্গবাস যেন সখা!
দিশে এসে মম অঙ্গে,
উষার শিশির মুকুতায়, তোমারই গলার
মালাটী গাঁথিব,—
কুন্দ শেফালি দিব পায়।
ললাটে আমার ললাটিকা হয়ো, হেমহার হয়ো বক্ষে,
সুনীলাকুল হৃদয়ের পরে, কাজল চোখের তীরে,
কুণ্ডল কানে হয়ো নাথ! সদা সও পরশি রবে,
নাসার মুকুতা হয়ে থেকো মিতা! অধর পরশ লবে,
কঙ্কন হয়ে কলকল রবে কহিও হে প্রেমবাণী,—
শুধু চরণ নূপুর হয়ো নাকো প্রিয়!
সেবে লোকে হবে জানাজানি।
ভিতরে বাহিরে তোমারই পরশ থাকে যেন
মোরে ঘিরে।

উৎপলাদিত্য। (স্বগতঃ) বিধাতার কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি, এই দেবদাসী! যতই দেখছি ওকে, দর্শন-পিপাসা নিত্যই যেন বর্দ্ধিত হচ্ছে! যতই শুনছি ওর গান, মনে হচ্ছে কল-কণ্ঠী কোকিলার সঙ্গীত-লহর কাণে ঢুকছে! এ কি অজ্ঞেয় আকর্ষণে পড়ে গেছি, সেদিন নিমন্ত্রিত হয়ে এসে! এমন্ জান্‌লে যে আসতাম না! কিন্তু তাই কি? একে যে চোখে দেখে নি, তার চোখের সার্থকতা কোথায়? এ গান যে না শুনেছে সে বৃথাই বধির হয় নি। (সম্মোহিত ভাবে চাহিয়া থাকিল)

রাঘব। (মনে মনে) এ রাজা ব্যাটা তো ভাল আপদ ঘটালে দেখছি! কুলনের দিনে বরাবরের নিয়ম আছে রাজা এসে কুলনা খাটায়। এতদিন নাবালক ছিল, বিদেশে থাকতো, প্রতিনিধিতেই কাজ হচ্ছিল ; এবার দেশে এসে সিংহাসনে বসেছে,—ভাবলাম, চিরকালের প্রথাটা ওকে দিয়েই করাই। নাঃ, ভুল করেছি! একে তো মেয়েটা একবগ্গা, একরোখা, আবার যদি তরুণ কন্দর্পের মতন এই ছোঁড়াটার ওপোর চোখ পড়ে, সামলানো দায় হবে। উপায়ই বা কি? একটা তো যে সে নয়, স্বয়ং রাজা! তাড়িয়ে দেওয়া তো যায় না।

উৎপলাদিত্য। (মৃদুকণ্ঠে) সুন্দরি! এ সুর কেন অনন্ত হয়ে রইলো না!

বিশোকা। (চমকিত হইয়া আসন গ্রহণোদ্যত হইতে হইতে দাঁড়াইল) কে এ? এ কথা কে বল্লে? প্রশংসা তো আজ দু-বছর ধরে অনবরতই শুনছি, কিন্তু এঁর সুর, এঁর ভাষা, এতে যেন অন্য কিছু আছে,—এ যেন আমার প্রাণকে মাতাল করে দিলে! কে'এ?—কে'এ? (চাহিয়া দেখিয়া) এ যে স্বয়ং রাজ্যাধিপতি! (দৃষ্টি-বিনিময় হইতেই সলজ্জভাবে নতমুখী হইল।)

রাঘব। (স্বগতঃ) এই যে! আর একতরফা নেই! চোখে চোখে একটি বেশ একটুখানি গোপন অভিনয়ও হয়ে গেল! নাঃ, আর না, আর এ খেলার প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। সময় থাকতে থাকতে ঘর সামলে নিতে হবে, নৈলে সিঁধ কেটে চোর ঢোকা তো বিচিত্র নয়।

পটক্ষেপণ

সপ্তম দৃশ্য

উৎপলাদিত্যের বিশ্রামাগার

রাজা, বয়স্য ও নর্ত্তকীগণ

নর্ত্তকীগণ। নৃত্য ও গীত

কোয়েলী শুনাও কুহু তান,
ধর ধর পঞ্চমে গান—
ফুল গন্ধে ভরা মধু সাঁঝে, অলস সুরে বাঁশি বাজে,
শিহরে পরাণ হিয়া মাঝে, আবেশে অবশ দেহ প্রাণ।

রাজা। থাক, থাক, গান আমার আজ একটুও ভাল লাগছে না, বন্ধু! ওদের যেতে বলো। আমার নির্জ্জনে থাকতেই ভাল লাগছে।

বয়স্য। ওগো, তোমরা এখন যাও গো! তোমাদের গান আজ এঁর ভাল লাগছে না।

[নর্ত্তকীদের প্রস্থান।

হুঁ! বটে! গান ভাল লাগছে না,—নির্জ্জনে থাকতে ভাল লাগছে! লক্ষণটা অভিজ্ঞান শকুন্তলের রাজা দুষ্মন্তের সঙ্গেই দেখছি ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে! কিন্তু—কই মৃগয়া-ব্যপদেশে মহারাজাধিরাজের তো ইতিমধ্যে বনগমন ঘটেছিল বলে মনে পড়ছে না? কণ্বসুতা শকুন্তলার সঙ্গে পরিণয়-ঘটা—

রাজা। নিশাকর! কি উন্মাদের মতন যা'তা বকতে লাগলে? সব দিনই কি মানুষের মন এক সুরেই বাঁধা থাকতে হবে? সেই একই নিয়মে খাওয়া, বেড়ান, নাচদেখা, আর গান শোনা, এর কি আর কোনই ব্যতিক্রম হতে নেই? হলে কোন পাপ আছে?

বয়স্য। কি কর্ব্বেন মহারাজ! এ সব যে রাজ-কায়দা! রাজার ঘরে যখন জন্মেছেন, তখন কেমন করে রাজবাড়ীর বেদস্তুর চালে চলবেন বলুন তো? রাজা যে সকল অবস্থাতেই রাজা।

রাজা। (উৎক্ষিপ্তভাবে) না, না—এমন করে নিয়মের নিগড়ে আমি আর চিরদিন ধরে নিজেকে বেঁধে রাখতে পারছিনে। আমি আর পারবো না, রাখতে পারবো না। ইচ্ছে করছে—সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে যে-দিকে দু-চোখ যায় সেই দিকেই চলে যাই।

নিশাকর। বটে! এত দূর! নাঃ, এটা দুষ্মন্তের সঙ্গে ঠিক ঠিক মিল হচ্ছে না,—এ যেন আর এক গ্রাম ওপোরে উঠে গ্যাছে। আচ্ছা, বুদ্ধদেবের ব্যাপার নয় ত? রাজবাড়ীর নদীর ঘাটে চিতার ধুম দেখতে পেলেন না কি? না—

রাজা। আঃ, কি পাগল তুমি নিশাকর! কোথায় ভগবান গৌতম, আর কোথায় নরকের কীট আমি! বিবেক বৈরাগ্য সে-সব কিছুই না, শুধুই একটা প্রাণের জ্বালা,—শুধুশুধু আশাহীন বেদনার একটা অভিব্যক্তি—আর কিছু না।

নিশা। হুঁ! আশাহীনও আছে, বেদনাও আছে! তবে কি মহারাণী-মাতার কাছে কানমলা খেয়েছেন না কি? শুনতে পাই ইদানীং তাঁর মেজাজটা একটু বেশী রকম রুক্ষ হয়ে উঠেছে! কাশী যাবার জন্ত বেশীর তাগিদ দিচ্ছেন?

রাজা। কে, মা? হাঁ, তা দিচ্ছেন বটে, কাশী যাবার দিন স্থিরও হয়েছে; কিন্তু তার জন্ত নয়, মার মত স্নেহময়ী মা কে পেয়েছে? শৈশবে বাপ হারিয়ে পিতা মাতা শিক্ষক সবই যে তাঁকে পেয়েছি।

নিশা। ঠিক্! ঠিক্! মহারাণী-মা কাশী যাবেন, সেই জন্তই আপনার এতটা মন খারাপ হয়েছে। আচ্ছা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি এখনি যাচ্ছি, দেখছি কেমন করে তিনি আপনাকে ফেলে কাশী যান।

[প্রস্থান।

রাজা। না না, তাঁকে বাধা দিও না। জননীর পুণ্য-কর্ম্মে সন্তানের কি বাধা দেওয়া উচিত? (স্বগতঃ) শুধু তা নয়, তা নয়,—আমার মন একান্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বিশোকার চিন্তা আমি বাহ্যের জন্তও ত্যাগ করতে পারছি না। গান ভাল লাগবে কি? তার মধুর কণ্ঠ যে আমার দুই কানকে ভরিয়ে রেখেছে। তার চিন্তাও আমার পক্ষে পাপ। (ক্ষণকাল নিমিলিতনেত্রে উপাধান-পৃষ্ঠে মস্তক রাখিয়া নীরবে চিন্তা) সে দেবতার জিনিসে লোভ করা অর্থ ধ্বংস;—কিন্তু সত্যই কি সে দেবতার? (মৃদুহাস্ত) মিথ্যা ছল মাত্র! সে দেবদাসী নামে পুরোহিতেরই সেবাদাসী! উঃ অসহ্য! অসহ্য! না—তা' হবে না, আমি তাকে রক্ষা কর্ব্বো। তাকে এত-বড় অধঃপতনে নেমে যেতে কিছুতেই দিতে পার্ব্বো না। তাকে রক্ষা কর্ব্বো, দেবদাসীকে দেবী রাখবো, রক্ষা কর্ব্বো, ওদের হাত থেকেও, আর আমার নিজের হাত থেকেও। যখন তাকে রাণী করতে পার্ব্বার অধিকার আমার নেই, তখন, তাকে ভোগের সহচরী কর্ব্বার চেষ্টা, না,—সে অসম্ভব! অসম্ভব! হাঁ তাই কর্ব্বো, তাকে জগতের লোভের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে জগদ্ধাত্রীরই পায়ে সত্যি করে সঁপে দোব। না হলে, না হলে আমি বাঁচবো না—।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

নাট্যশালার স্তম্ভপার্শ্ব

(বিশোকার অন্যমনস্কভাবে প্রবেশ)

বিশোকা। 'সুন্দরি! এ সুর কেন অনন্ত হলো না!' আমার মনে হচ্ছে ফিরিয়ে যদি বলি, "ওহে সুন্দর, তোমারই ওই কণ্ঠস্বর তার চেয়ে অফুরন্ত হোক!" কি মধুর কণ্ঠ! কি সস্নেহ আহ্বান! মনে হচ্ছিল যেন জগতের সমস্ত ফুলের সমুদয় মধু নিংড়ে নিয়ে কে ওঁর গলায় ঢেলে দিয়েছে! 'সুন্দরি! ও স্বর কেন অনন্ত হলো না!' আঃ প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল! কানে যেন অমৃত বর্ষণ হলো! আর রূপ! ফুলশর রেখে কন্দর্প নিজেই যেন মূর্ত্তি ধরে এসে বসেছিলেন। অনেক দিন ধরেই দেখছি—এত দিন ভাল করে দেখি নি,—আজই প্রথম যেন দেখলুম। রাজা! হাঁ—রাজা বটে! যাকে রাজা বলে! কিন্তু—(চিন্তামগ্ন)

(স্তম্ভ-পার্শ্ব হইতে মৃদুকণ্ঠে উচ্চারিত হইল) সুন্দরি!

বিশোকা (সচকিতে) কে? (স্বগতঃ) সেই স্বর! সেই সম্বোধন! আমি স্বপ্ন দেখছি না ত?

উৎপলাদিত্য। (সম্মুখীন হইয়া) ভয় পেয়ো না, আমি তোমায় শুধু এই কথাটী বলতে এসেছি, তুমি স্বর্গের পবিত্র ফুল, ভয় হয় পৃথিবীর পাপ-পঙ্কে পাছে কোন দিন মলিন কলুষিত হও। যদি অভয় পাই, একটী আবেদন আছে, নিবেদন করি।

বিশোকা (বিস্ময়ানন্দে নির্ব্বাকভাবে চাহিয়া থাকিল)

উৎপলাদিত্য (একটু নিকটস্থ হইয়া) এ দেবধাম পুণ্যভূমি সন্দেহ নাই, কিন্তু দেবদাসীর পক্ষে পবিত্র জীবন যাপন করা সুকঠিন! দেবদাসী নামেই শুধু দেবদাসী, প্রকৃত পক্ষে তারা পুরোহিতের সেবাদাসী ব্যতীত আর কিছুই নয়। শিউরে উঠছো? তুমি বালিকা, হয় ত অত্যন্ত সরলা; তাই যে জীবনের মধ্যে বর্দ্ধিত হয়েছ, তাকে ভাল করে এখনও চিনতে পারো নি। কিন্তু জেনো, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য! আর তোমার বিপদের দিন আসতেও বেশি বিলম্ব নেই। যদি এমনই পবিত্র, নির্ম্মল থাকতে চাও, অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ করো—

বিশোকা। (ভয়বিবর্ণ কম্পিত দেহে পতনোন্মুখ হইতেই রাজা তাহাকে ধরিয়া পতন হইতে রক্ষা করিলেন) (স্বগতঃ) এ' সমস্ত কি বলছেন! না—না, আমি দেবদাসী, দেবদাসীর আবার বিপদ কি? (সংজ্ঞভাবে সরিয়া দাঁড়াইল)

রাজা। বিশোকা! এ বুকের মধ্যে যা আছে তা' চিরকাল এমনই অব্যক্তই থাক। দেবনির্ম্মাল্য মাথায় শুধু মস্তকে ধারণ করবার অধিকারী, তাতে ভোগাধিকার নেই। সেই অধিকার আজ তুমি আমায় দাও,—এমন কোন নিরাপদ স্থানে তোমায় রক্ষা করি, যেখানে এমন কি, আমি নিজেও তোমায় আর কখনও না দেখতে পাই। মা আমার কাশীধামে যাত্রা করছেন, তুমি তাঁর সাথী হও।

বিশোকা। (স্বগতঃ) কিছু যে ভেবে পাচ্ছিনে! কি বলছেন? কি চাচ্ছেন? কেন এ-সব বলছেন? কি বলি? কি উত্তর দিই?

রাজা। (ক্ষণকাল প্রতীক্ষান্তে) ত্বরা নেই, সময় নাও, ভেবে দেখ, কাল এইখানে আবার সাক্ষাৎ হবে। যথার্থ কথা স্বীকার করতে লজ্জা নাই;—আমার নিজের উপরেও আমার খুব বেশি বিশ্বাস হয় না। কি জানি, বিশ্বাসঘাতক চিত্তে কখন কি ভাব প্রবল হয়ে উঠে, কি না জানি বিপদ ঘটিয়ে বসে! দেবতার জিনিষে মানুষের এ লোভ কেন? এ কি ধ্বংসে আনবার জন্য? কিন্তু হায় হায়, দেবতাই বা কোথায়? তুমি তো সম্পূর্ণরূপেই পুরোহিতের! ঐ বিজয় রাঘবাচারিয়ারের! সে তোমায় প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করতে সমর্থ; তার হাত থেকে তোমায় রক্ষা করতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নেই—কারু নেই। তাই অনেক ভেবেচিন্তে এই উপায় আমি স্থির করেছি। তোমায় নিরাপদ করে তোমার সঙ্গে পার্থিব জগতের সকল বন্ধন এ জন্মের মতই আমি বিচ্ছিন্ন করে ফেলবো; এ না হলে বুঝি তা' পারবো না, পারবো না।

(একটা ছায়ামূর্ত্তি যেন ধীরে ধীরে সরিয়া গেল)

উৎপলাদিত্য। (সচকিতে) আর তবে বিলম্ব নয় বিশোকা! কাল এমনি সময় এইখানে—

(উৎপলাদিত্যের প্রস্থান। বিশোকার মুহ্যমানভাবে অবস্থিতি)

নবম দৃশ্য

বিশোকার কক্ষে নর্ত্তকীবেশে সজ্জিতা হইয়াই গভীর চিন্তামগ্না বিশোকা শয্যাতলে অর্দ্ধশয়নাবস্থায় মৃদুমৃদু হাসিতেছিল।

গীত

দুঃখের কালো মেঘ আইল রে,
হৃদি গোপন বিষাদে ছাইল রে।
আঁখি অশ্রুহারা, চিত্ত উদাসপারা,
কে' এ বেদনার রাগিণী গাইল রে।

(চিন্তিতভাবে) আজ কেন, আজ কেন উনি অমন করলেন? ও-সব কথা আমায় এসে বল্লেন কেন? এ কথার অর্থ কি? কেন বল্লেন, 'দেবতা কোথায়? তুমি পুরোহিতের। সদাশিব তোমার 'পরে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে। তার হাত থেকে তোমায় রক্ষা করতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নেই।' এ কি কথা? সে পুরোহিতের? কে এমন কথা বলে? সে দেবতার, সে একান্তভাবেই শুধু দেবতার, সে দেবী—সে দেবী! কার সাধ্য তার এই দেবভোগ্য দেহের উপর অধিকার স্থাপন করতে আসে। রাজা নিশ্চয় ভ্রমে পতিত হয়েছেন। (নেপথ্যে বিশোকা!) কে? কে আমায় ডাকে?

(রাঘবাচারিয়ারের প্রবেশ)

রাঘবাচারিয়ার। (স্মিতহাস্যে অগ্রসর হইয়া) কি বিশোকা! গভীর চিন্তায় মগ্ন যে! তা' থাকো, থাকো, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি রাজা তোমায় অতি গোপনে কি পরামর্শ দিচ্ছিলেন দেবদাসি? হয় ত তেমন কিছু গূঢ় রহস্য তাতে নেই, যা আমায় বলতে পার্ব্বে না?

বিশোকা। (আত্মগত) সেই সুর সেই বাণী ক্রমাগতই কানে বেজে উঠ্‌ছে, দেবদাসী নামেই তারা দেবদাসী, যথার্থ ত তারা পুরোহিতেরই সেবাদাসী—(শিহরিয়া) সত্য কি? তাই কি? হয় ত, হয় ত এ ভ্রান্তি নয়, হয় ত এই ঠিক! তন্দ্রা, চিন্তা, রম্ভা, স্বয়ং বড়-ঠাকুরণ চম্পাদেবী—

রাঘব। (আর একটু কাছে আসিয়া) কি দেবদাসি! রাজার পরামর্শটা বড়ই গোপন না কি? নীরব হয়ে রইলে যে?

বিশোকা। (আহত চিত্তে মাথা তুলিল) দেখুন, কারু সঙ্গে আমার কোন গোপন কথা নাই। তিনি শুধু আমায় এ স্থান শীঘ্র করে ত্যাগ করতে বল্লেন। বল্লেন, আমার বিপদের দিন শীঘ্রই আসবে;—যদি পবিত্র থাকতে চাই, যেন এ মন্দির ত্যাগ করে যাই।

রাঘব। (বক্র হাসিয়া) বেশ!—কোথায়? রাজোদ্যানে? মন্দিরের চেয়ে স্থানটা পবিত্র বটে!

বিশোকা। (বিরক্তি-বিরস-কণ্ঠে) না, তা' তিনি বলেন নি, রাজোদ্যানে আমায় ডাকেন নি, তাঁর মায়ের সঙ্গে কাশীধামে পাঠিয়ে দিতে চান। বল্লেন, দেবদাসী নামেই শুধু দেবদাসী, প্রকৃতপক্ষে সে পুরোহিতেরই সেবিকা। নিশ্চয়ই তিনি ভ্রমে পড়ে—

রাঘব। রাজা তো ঠিক কথাই বলেছেন! তাঁর তো কোনই ভুল হয় নি! ও কি! অমন করে চমকালে কেন? যেদিন বিগ্রহের কণ্ঠে মাল্যদান করেছ, সেইদিনই কি বুঝতে পারো নি, সে মালা কার গলায় পড়েছে? পুরোহিত দেব-প্রতিনিধি; সমস্ত দেব-সম্পত্তিতে তাঁরই অপ্রতিহত অধিকার। দেবতা তো নিজের শরীর দিয়ে কিছুই ভোগ করেন না, ভোগ করে তাঁর প্রতিনিধি। এ'তে রাজার কোনই হাত নেই; তাঁর সাধ্য কি যে তোমায় তিনি এখান থেকে নিয়ে যান! তুমি সম্পূর্ণরূপেই আমার,—আমার!

বিশোকা। (সমস্ত বুঝিয়া আত্মগত) এই সত্য! রাজার ভ্রম নয়, ভ্রম আমার? দেবদাসী দেবতার নয়, সে দেবতার উৎসর্গিতা পুরোহিতের সেবাদাসী! এরই এত গৌরব? এর জন্য মা সন্তান দান করে যায়? ওঃ রঙ্গনাথজী!

রাঘব। (শয্যার নিকটস্থ হইয়া তদুপরি আসন গ্রহণ করিলেন ও মৃদুহাস্যের সহিত) তুমি নিতান্ত শিশু-প্রকৃতি এবং অত্যন্ত নির্ব্বোধ; তাই এ'তে এতই বিচলিত হয়েছ। না হলে আশ্চর্য্য বা অধীর হবার কথা এর মধ্যে এমন কিছুই নেই; এ তো আবহমান কালের লোকাচার-সম্মত; নূতন সৃষ্টি নয়!—আসল কথা, তুমি রাজার রূপে মুগ্ধ, রাজাও নিজে তাই;—কিন্তু এর কি প্রয়োজন ছিল? রাজার অনেক আছে, মন্দিরসেবিকা রাজার জন্য নয়। এ দুরাশা তাঁকে বাধ্য হয়েই ত্যাগ করতে হবে। আর আমি বলি কি, তুমিও করো। রাজরাণী তো হতে পার্ব্বে না; যে পদ পাবে, তার চেয়ে

শ্রেষ্ঠ পদেই আছ। রাজার শত চেষ্টা তোমায় এই মন্দির-সীমার বাইরে এক পাও নিয়ে যেতে পার্বে না; বরং দরকার মনে করলে আমিই তাঁর এ মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ করতে পারি। এমন ক্ষমতা আমার আছে। তুমি দেবদাসী, ধরিতে গেলে দেব-প্রতিনিধিত্বে আমার স্ত্রী, আমি সে অধিকার আজ থেকে গ্রহণ করলেম। তুমি আমার। (হাত ধরিল)

বিশোকা। (সচমকে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভয়ে বিস্ময়ে ক্রোধে উচ্চৈঃস্বরে) না, আমি দেবতার! প্রভু শ্রীরঙ্গনাথজী আমার স্বামী! আপনি আমায় অমন অপমানজনক কথা বলবেন না।

রাঘব। বটে! আমি বল্‌বো না? আর রাজা যখন বলছিলেন, তখন শুনতে তো বেশ মিষ্টি লাগ্‌ছিল! সে আমার চেয়ে সুন্দর বলে বুঝি?

বিশোকা। (সতেজে) না, তিনি অমন খারাপ লোক নন, তিনি আমায় ও-সব কথা কিছুই বলেন নি। আপনি যান্,—শীঘ্র যান, না হলে আমি এক্ষণি বড়-ঠাকরুণকে ডাকবো।

রাঘব। (আসন ছাড়িয়া উঠিয়া সহাস্যে) ডেকে কি হবে? চিরদিনই এই প্রথা। দেবদাসী মাত্রেই পুরোহিতের সম্পত্তি; তোমার বড়-ঠাকরুণটীই কি দেবদাসী ছাড়া? না, তিনি দেখেশুনে অবাক হয়ে যাবেন? পাগল! দেব-প্রতিনিধির স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য বড় তুচ্ছ ভেবো না। থাক, আজ আমি চল্লাম, রাজার আশা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আজ নিদ্রা যাও। কাল রাত্রে এসে যেন তোমায় ব্যর্থ চিন্তায় উত্তেজিত না দেখি। মাথা ঠাণ্ডা রেখো। তুমি কার নও, শুধু আমার। [প্রস্থান।

বিশোকা। (শয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া) রঙ্গনাথ! এই আমি পেলেম?

পটক্ষেপণ

দশম দৃশ্য

মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগ

প্রাচীর-গাত্রে হেলান দিয়া বিমনা বিশোকার মৃদুকণ্ঠে গান।

যেতে দাও—দাও যেতে দাও, যেতে দাও, যাক সে চুকে।
যা' গেছে যা' ফুরায়েছে; যাক্ তা যাক্ তা মুছে!
ফিরাতে যায় পারিবে না, কেন তাকে পিছু ডাকি,
ফাঁকি দিতে দিতেই হবে, সে তোমারে দেবেই ফাঁকি,
ধরতে তারে পারচিনেরে, মিছে কেঁদেই বৃথা বারে বারে,
বৃথা ফেরা দ্বারে দ্বারে সেই হারিয়ে যাওয়ার পিছে পিছে।

(শিশুপুত্র-ক্রোড়ে রঙ্গিলার প্রবেশ। পশ্চাতে দাসী-হস্তে পূজা-সম্ভার)

রঙ্গিলা। হ্যাগা! তুমি এখানে আজ এমন করে বসে কেন গো? যেদিনই আসি, তোমায় দেখি, মুখ সাদাচ্ছো নয় গান গাচ্ছো। হাসিটী তো মুখখানিতে লেগেই থাকে। আজ কেন তোমার চোখে জল?

বিশোকা। (চোখ মুছিতে মুছিতে) কিছু ভাল লাগছে না। (নতমুখী হইল)

রঙ্গিলা। কেউ বুঝি বকেছে?

বিশোকা। (নীরবে মাথা নাড়িল)

[রঙ্গিলার শিশু কোল হইতে নামিয়া বিশোকার কাছে আসিল। তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া গলা জড়াইয়া মুখে মুখ দিয়া ডাকিল—]

শিশু। মা-ম্-মা! মা-ম্-মা! মাঃ!—

বিশোকা। (চমকিয়া চাহিয়া ব্যগ্রভাবে শিশুকে টানিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া অজস্র চুম্বন করিতে লাগিল, তার চোখ দিয়া অবাধে অশ্রু ঝরিতে লাগিল)

বিশোকা। ধন! ধন! ধন! মাণিক! (স্বগতঃ) কি সুখের এই ছেলেটী! ও আমায় মা বল্লে! মা! মা! আমার মনে হচ্ছে ও যদি আমার ছেলে হতো, ও যদি আমার কাছে থাকতো, আমায় মা বলতো, আমি—আমি ওকে এক মুহূর্ত্ত মাটীতে নামাতুম না,—এই এম্‌নি করে বুকে চেপে রাখতুম, বুক জুড়িয়ে যেত। (পুনঃ পুনঃ চুম্বন)

রঙ্গিলা। (শিশুকে টানিয়া লইয়া চারিদিকে চাহিল) দাও গো ছেলে দাও, কেউ যদি দেখে, আমায় নিন্দে করবে।

বিশোকা। (তৃষিতভাবে শিশুকে বুকে চাপিয়া) কেন ভাই? তা' কেন করবে?

রঙ্গিলা। ও মা, বল কি? তা' করবে না? তোমরা

হচ্ছো নাচ্‌নেওলি. তোমাদের সঙ্গে কি আমাদের মতন ঘর-গেরস্থালীর ঝি-বউদের মিশতে আছে? তবে তুমি না কি বড্ড ছেলেমানুষ, আর এত সুন্দর, তাই দু'একটা কথা না কয়ে পারিনে। তা' আহা. তুমি যদি এ কাজ না করে বে'থা করে সংসার-ধর্ম্ম করতে, বেশ ভাল হতো! দেখ দেখি, মেয়েমানুষ হয়ে এমন পোড়া কপাল! তোমাদের তো বে'থা হয় না?

বিশোকা। (আহতভাবে) শ্রীরঙ্গনাথজীই আমার স্বামী।

রঙ্গিলা। ও মা! এ যে ক্ষ্যাপার কথা। মানুষের আবার ঠাকুর স্বামী হয়? ও ভাই, একটা মিথ্যে বাজনাকা, আসলে হচ্ছো তোমরা নাচনেওলি! বড় ছোট কাজ! মন্দিরে বসে বসে পাপ করা, বুকের পাটা কিন্তু তোমাদের খুব শক্ত! ভয় করে না? আয়রে খোকা, পুজো দিই গে, আয়।

(শিশুকে টানিয়া কোলে লইয়া চলিয়া গেল)

বিশোকা। রঙ্গনাথ! ভাল রঙ্গ দেখালে! এই আমার পদ? এইখানে আমার স্থান? এই কি আমার দেবীত্ব? এই গর্ব্বেই আমি এতদিন নারীর পৃথিবীকে তুচ্ছ করে চলেছি? বিশ্বাস করে চলেছি, আমার দেহ এখানে বাঁধা থাকলেও, আসন পাতা আছে আমার জন্যে বৈকুণ্ঠে! ওঃ! গৃহস্থ-বধূ আমার সঙ্গে কথা কইতে ঘৃণা বোধ করে। পবিত্রতম শিশু দেহ তৃষা-কাতর স্পর্শে কলুষিত হয়ে যায়। জগদীশ্বর! কি দুর্ব্বহ এ জীবন!—পিতা নেই, মাতা নেই, স্বামী পুত্র সখা কিছু না, কেউ না! কেউ থাকবে না! একটী সেবা-স্নিগ্ধ দুঃখে-সুখে ভরা আপনার বলতে কুটীর-গৃহ পর্য্যন্ত না। এই আশা-বাসনায় ভরা তরুণ জীবনে আশাহীন অন্তহীন অপার দুঃখ-সমুদ্র মাত্র সাথী হয়ে আছে। ইহকাল তো ফুরিয়ে গেছেই, পরকালের পথও কণ্টকাকীর্ণ, আতপ-তপ্ত মরু-ক্ষেত্রের মধ্যগত। রঙ্গনাথ! রঙ্গনাথ! এ কি করলে? আমায় কেন দেখালে? হায় রাজাধিরাজ! ওরে ক্ষুদ্র শিশু! তোমরা এ কি দুরন্ত ক্ষুধা আমার প্রাণে জড়িয়ে দিলে? এই বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে এই মহা শূন্যতার মধ্যে মানুষে কি বেঁচে থাকতে পারে?—

(জানুর মধ্যে মুখ ঢাকিল)

শেষ দৃশ্য

(পূজার আসনের নিকট পুষ্পাঞ্জলি হস্তে বিশোকা।)

নৃত্যগীত

তোমারই গীতি বন্দনে, কুসুমে, সুরভিচন্দনে,
অঞ্জলি ভরে এনেছি নাথ দিতে ঐ দুটি রাঙ্গা পায়।
কণ্ঠে ফুটে না ভাষা গান, বেদনা-বিধুর সারা প্রাণ,
অবসাদে ভরা দেহখান, চরণে লুটায়ে স্থান চায়।
তুমি সৎ, তুমি সুন্দর, হে মম চির-নির্ভর,
নহ এ জীবন দুর্ভর, শান্তি শীতল পদছায়।

(ধীরে ধীরে আসনের উপর শুইয়া পড়িল)

(অদূরে ছদ্মবেশী রাজার প্রবেশ)

উৎপলাদিত্য। (অনুচ্চকণ্ঠে) বিশোকা! বিশোকা! কই তুমি? কোথায় তুমি বিশোকা? যান-বাহন প্রস্তুত, মহারাণীর পার্শ্বচারিণী মন্ত্রাদেবী স্বয়ং তোমায় নিতে এসেছেন। কই? বিশোকা তো নেই? (অগ্রসর হওন) কেন, কেন সে এলো না? সময় যে বয়ে যাচ্ছে। এ কি? কিসের এ কলরব? কি যেন একটা আকস্মিক আশ্চর্য্য-জনক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, এম্‌নি করে সবাই মন্দিরাভিমুখেই ছুটে যাচ্ছে! (অগ্রসর হওন)

মন্দিরের সম্মুখে অত্যন্ত জনতা। সকলেই মন্দিরের ভিতর ঢুকিবার জন্য পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করিতেছিল। ছদ্মবেশী রাজা সন্দিগ্ধকণ্ঠে একজনকে প্রশ্ন করিলেন।

রাজা। মন্দিরে কি এমন ঘটেছে যার জন্য সকলে এমন উৎসুক হয়ে উঠেছে?

লোক। কি এমন ঘটেছে বলছো কি হে? কি এমন ঘটে নি তাই বললেই পারতে! যা ঘটেছে, শ্রীরঙ্গনাথজীর এ মন্দির বর্ত্তমান থাকতে আর তা' কোনদিনই পূর্ণ হবে না। কনিষ্ঠা দেবদাসী দেবমন্দিরে পূজা করতে করতে দেবলোকে প্রস্থান করেছে। যেমন তার অলৌকিক রূপ, যেমন তার অশ্রুতপূর্ব্ব সুকণ্ঠ, যেমন তার অনন্যসাধারণ দেবনিষ্ঠা, তা'রই উপযুক্তই এ মহাপ্রস্থান।

[প্রস্থান।

রাজা। (আর্ত্তকণ্ঠে) দেবদাসি! ভেবেছিলেম আমি

তোমার সংসারের অপবিত্রতা থেকে রক্ষা কর্ব্বো ; কিন্তু নিজের চিত্ত আমার দেব-নির্ম্মাল্যের প্রতি যে লোভাকৃষ্ট হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই ; তাই বুঝি দেবতা তাঁর নিজের দাসীকে নিজেই নিজের সর্ব্বনিরাপদ নিষ্কলুষ অঙ্কে আশ্রয় প্রদান করে—সকলকেই নিশ্চিন্ত করলেন ?

বিজয়রাঘবের প্রবেশ

বিজয়রাঘব। ঠিক বলেছ মহারাজাধিরাজ উৎপলাদিত্য ! ঠিক বলেছ ; আমি তাকে তাঁর সর্ব্বনিরাপদ চরণাশ্রয়ী হতে দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছি, কিন্তু তোমার হাতে তাকে দিতে পারতেম না। প্রধান পুরোহিত আরতি করবার জন্যে এসে দেখেন সূর্য্যের কনিষ্ঠা দেবদাসী বিশোকা পূজার আসনের উপর চির নিদ্রাগতা। স্বর্গের উর্ব্বশী হরণ ইন্দ্রের অভিশাপে দুদিনের খেলা খেলতে ধরাধামে নেমে এসেছিলেন, শাপান্ত হয়ে স্বর্গে ফিরে চলে গেলেন। আহা, অত রূপ, অমন কণ্ঠ আর কখন কেউ দেখবে না।

উৎপলাদিত্য। (প্রাচীর ধরিয়া আর্ত্তকণ্ঠে) বিশোকা, আমিই তোমার মৃত্যুর কারণ। ওঃ ওঃ কেন আমি তোমার সঙ্গে দেখা করেছিলেম !

প্রধান পুরোহিত। (ধীর পদে আসিয়া রাজার কাঁধে হাত রাখিলেন) ভুল ভুল, ভুল করেছেন, মহারাজাধিরাজ ! যদি বিশোকার হত্যাকারী বলে কেউ গৌরব কর্ব্বার অধিকারী থাকে, সে আমি।

পটক্ষেপণ

বিবিধ-প্রসঙ্গ

গীতার পরিচয়

প্রতিবাদ

বিগত বৈশাখ মাসের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় 'গীতার-পরিচয়' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি প্রতিবাদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য উক্ত প্রবন্ধের শেষ ভাগে প্রদত্ত হইয়াছিল। এক্ষণে যে কয়েকটী প্রতিবাদ আসিয়াছে, তাহার সকলগুলি আদ্যোপান্ত প্রকাশিত হওয়া সম্ভবপর হইবে না বলে আমরা কয়েকজন প্রতিবাদকারীর মূল বক্তব্য তাঁহাদেরই ভাষায় নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

শ্রীযুক্ত বরদাবাবুর চট্টোপাধ্যায় এম-এ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

বীরেশ্বর বাবু বলিয়াছেন যে গীতার পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিবরণ শুনিতেছিলেন। তাহার পর যে ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবেন যে কৌরব ও পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি করিয়াছিল—ইহা হইতেই পারে না ; কারণ, এই প্রশ্নের সহিত পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষ অংশের বা অন্য অংশের কোন সম্বন্ধ বা ধারাবাহিকতা নাই। কিন্তু ধারাবাহিকতার অভাব গীতার অন্যত্রও দেখা যায়, এবং অন্য পুরাণেও দেখা যায়। গীতার পূর্ব্বাধ্যায়গুলির যে বিবরণ বীরেশ্বরবাবু সংকলন করিয়া দিয়াছেন তাহাতেও ধারাবাহিকতার অভাব দেখা যায় ; যথা, প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, পাণ্ডবেরা পশ্চিম ভাগে এবং কৌরবেরা পূর্ব্ব ভাগে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে কোন্ কোন্ দেশ হইতে পাণ্ডবেরা সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সৈন্য-সংগ্রহ পূর্ব্বে হয়, শিবির-সন্নিবেশ পরে হয়, সুতরাং এখানে ধারাবাহিকতার ব্যত্যয় হইল। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হইল যে ভীষ্ম মারা গিয়াছেন, তাহার পর ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে যুদ্ধারম্ভের বর্ণনা হইল, এখানেও ধারাবাহিকতার ব্যত্যয়। কি উদ্দেশ্যে ধারাবাহিকতা ব্যাহত হইয়াছে এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এরূপ ব্যত্যয় যে বহু স্থলে দেখা যায়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যিনি গীতা রচনা করিতে পারেন, তাঁহার কিছু বুদ্ধি ছিল ইহা বীরেশ্বর বাবু অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সুতরাং তিনি যদি ধারাবাহিকতা রক্ষিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে ভীষ্মপর্ব্বের ২৫ অধ্যায়ের পরে গীতা না বসাইয়া ১৫ অধ্যায়ের পর গীতা বসাইলেই পারিতেন। মহাত্মা তিলক বলিয়াছেন যে গীতার ভাষা ও মহাভারতের ভাষা একইরূপ। তিলকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বীরেশ্বর বাবু ইহা বলাই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন যে, গীতায় যেমন নানা প্রকার ছন্দের শ্লোক আছে মহাভারতে অন্যত্র তেমন নাই, এবং গীতায় যেরূপ অপাণিনীয় প্রয়োগ আছে মহাভারতে সেরূপ নাই। এ কথা বীরেশ্বর বাবুর মনে হইল না যে, গীতাকার যখন গীতাকে মহাভারতকারের রচনা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তখন কয়েকটা নূতন ছন্দের শ্লোক রচনা না করিলেই অথবা পাণিনি মানিয়া চলিলেই যদি তাঁহার শ্লোক কি বেদাপুষ চলিয়া যাইত, তাহা হইলে কেন তিনি সেরূপ করিলেন না ? মহাভারতে অন্যত্র ভিন্ন ছন্দের শ্লোক বিরল—বীরেশ্বর বাবুর এই উক্তি কিরূপ যথার্থ তাহা দেখাইয়া দিবার জন্য এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই ভীষ্মপর্ব্বের প্রথম ২২ অধ্যায়ের মধ্যে

অনুষ্টুপ্ ছন্দে ভিন্ন মত ছন্দের শ্লোক ৩১টি পাওয়া যায়*। সমগ্র গীতায় এরূপ শ্লোক ৪৩টি। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ১১শ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ-দর্শনে। ১১শ অধ্যায় বাদ দিলে অপর অধ্যায়গুলিতে মোটে ২০টি এরূপ শ্লোক আছে। গীতার ১৮টি অধ্যায়ের মধ্যে ১৩টি অধ্যায়ে এরূপ শ্লোক একটিও নাই। গীতার অপাণিনীয় প্রয়োগ সম্বন্ধে 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক মহাশয় যথার্থই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে বীরেশ্বর বাবু "যদি দেখাইতে পারিতেন যে গীতার আলোচ্য পদগুলির ব্যাকরণ-সঙ্গত রূপে তাহার প্রমাণ দৃঢ়তর হইত"। বীরেশ্বর বাবু কি বলিতে চাহেন যে মুগ্ধবোধব্যাকরণ অনুসারে "ত্রিয়ায়াঃ + অর্থসি" সন্ধি করিয়া "ত্রিয়ায়ার্থসি" হয়, এবং সেনানী শব্দের ইহার বহুবচনে সেনানীনাং হয়? বাস্তবিক এগুলি আর্ষ-প্রয়োগ। ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে এরূপ হয় না।

শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু অভিযোগ লিখিয়াছেন :—

"বীরেশ্বর বাবু তাঁহার প্রবন্ধের যে অংশে প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে গীতায় "অনেক নূতন মত সন্নিবেশিত (সন্নিষ্টি?) হইয়াছে" সেই অংশে বড় বেশী ভুল দেখা যায়। তিনি বলিয়াছেন "সাধারণতঃ ভারতবর্ষবাসীর এই মত যে পরমাত্মা এবং জীবাত্মা দুইটি পৃথক বস্তু; কিন্তু ৺মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রদর্শন করিয়াছেন যে গীতায় জীবাত্মা ও পরমাত্মা প্রভেদ স্বীকৃত হয় নাই।" বীরেশ্বর বাবু নিশ্চয় অদ্বৈতবাদ সাধক মতের কথা বলিয়াছেন। বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বলা যাইতে পারে। এই অদ্বৈতবাদ অনুসারে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। বীরেশ্বর বাবু যেন না মনে করেন যে অদ্বৈতবাদ গীতার উপর প্রতিষ্ঠিত। অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদ সকল মতগুলিই শ্রুতিবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেরূপ কোন শ্রুতিবাক্য অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদক এবং কোন শ্রুতিবাক্য অদ্বৈতবাদ বিরোধী বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়, সেইরূপ গীতার কোন বাক্য অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদক এবং কোন বাক্য অদ্বৈতবাদ-বিরোধী বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে গীতা কোন নূতন মত প্রতিপাদন করেন নাই।

বীরেশ্বর বাবু বলিয়াছেন "ভারতীয় ধর্ম-প্রবর্ত্তকেরা সকলেই কত যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান, কত কৃচ্ছ্র সাধন, কত ব্রত উপবাস করিতে বলিয়াছেন; কিন্তু গীতাকার বলিয়াছেন কেবল জ্ঞান করিয়া কর্ত্তব্য-কর্ম করাই ধর্ম-যোগঃ কর্মসু কৌশলম্"। সকল ধর্ম-প্রবর্ত্তক যাগযজ্ঞ করিতে বলেন নাই। জ্ঞানমার্গের সাধক তাঁহারা বলেন, কেবল জ্ঞান দ্বারাই মুক্তি হইবে, অপর কিছুর প্রয়োজন নাই। ভক্তিমার্গের সাধক বলেন কেবল প্রেম-ভক্তি দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায়। প্রত্যুত গীতা যাগ-যজ্ঞ করিতেও বলিয়াছেন। যথা,

"অজো দানং তপশ্চৈবম ত্যাজ্যং কার্য্যমেবতৎ," "যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা ত্যাগ করিবে না, ইহাদের অনুষ্ঠান করিবে।"

কৃচ্ছ্র সাধন না করিলে তপস্যা হয় না; সুতরাং গীতা কৃচ্ছ্রসাধন করিতেও বলিয়াছেন।

"মৎকর্মপরমো ভব" অর্থাৎ আমার উদ্দেশে কর্ম কর। ভগবানের উদ্দেশে ব্রত উপবাসাদি কর্ম করিলেও সিদ্ধিলাভ করা যায় ইহাও গীতার মত। বীরেশ্বর বাবু বলিয়াছেন, "জ্ঞান করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম করাই ধর্ম" ইহার অর্থ কি বুঝিলাম না। "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্" বাক্যের ত এরূপ অর্থ হয় না। এই বাক্যের অর্থ "কর্ম করিবার কৌশলকে যোগ কহে।" সে কৌশল কি তাহা গীতা অন্যত্র বলিয়াছেন—ফললাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না, কর্মের প্রতি আসক্তি থাকিবে না, এই ভাবে কর্ম করিতে হয়, তাহা হইলে কর্মফল বন্ধনের কারণ হয় না। কিন্তু ইহা ছাড়া গীতার মতে অন্য ধর্ম কর্তব্য নাই, বীরেশ্বর বাবু ইহা কোথায় পাইলেন? বীরেশ্বর বাবু বলিয়াছেন "ভারতীয় ধর্ম-প্রবর্ত্তকেরা খাদ্যাখাদ্য বিচার শুদ্ধ করিয়াছেন। গীতাকার কিন্তু সে সকল বিচার কর্ত্তব্যের মধ্যেও আনেন নাই। তাঁহার মতে যাহা শরীর মনের পক্ষে ভাল তাহাই সাত্ত্বিক আহার।" ভারতীয় অন্য ধর্ম-প্রবর্ত্তকেরা যে খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিয়াছেন, সে বিচারও ত এই বিচার,—প্রত্যেকের মধ্যে তাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন যে এই এই দ্রব্য খাইলেই শরীরের উত্তেজনা হয়, তমোগুণ বৃদ্ধি হয়। গীতাকার সকল দ্রব্যের উল্লেখ করেন নাই। রাজসিক ও তামসিক আহার কিরূপ, গীতা তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে শাস্ত্র-নির্দিষ্ট বিচার গীতা পুনরুল্লেখ করেন নাই। কিন্তু সেই বিচার যে গীতাকারের অভিমত তাহা গীতাকারের সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক আহারের উল্লেখ হইতে বুঝিতে হইবে। গীতা অন্যত্রও স্পষ্ট বলিয়াছেন।—

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি।

"কোন্ কার্য্য করা উচিত, কোন্ কার্য্য করা উচিত নয়, এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ, শাস্ত্রের বিধান জানিয়া তোমার কর্ম করা উচিত। এই সকল স্পষ্ট বাক্য থাকা সত্ত্বেও বীরেশ্বর বাবু কি করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে অপর সকল শাস্ত্রের বিধান পরিত্যাগ করিয়া গীতা নূতন মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা বীরেশ্বর বাবুই বলিতে পারেন।

তাহার পর বসন্তবাবু বলিয়াছেন—

গীতায় আছে—

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতং।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং।

বীরেশ্বর বাবু বলেন এখানে "অপর্য্যাপ্ত" মানে প্রয়োজনের অধিক অর্থাৎ বাঙ্গলা ভাষায় অপর্য্যাপ্ত পদের যে অর্থ হয়, তাহা। কিন্তু ইহা ঠিক মনে হয় না। দুর্য্যোধনের বল যদি প্রয়োজনের অধিক হয়, তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের বল প্রয়োজনের কম হয়। কিন্তু বলা হইয়াছে যে যুধিষ্ঠিরের বল "পর্য্যাপ্ত" অর্থাৎ প্রয়োজনানুরূপ। সুতরাং অপর্য্যাপ্ত পদের অর্থ প্রয়োজনের কম। সত্য বটে যে, পাণ্ডবদের সাত অক্ষৌহিণী এবং কৌরবদের এগার অক্ষৌহিণী। কিন্তু সেনাবল কেবল সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, বিশেষতঃ পৌরাণিক যুদ্ধ-কাহিনীতে দেখা যায় যে বড় বড় বীর একা বহু

---

* ২য় অধ্যায় ৬৪-৬৯ শ্লোক; ৩য় অধ্যায় ১—১৯, ১৯ শ্লোক; ২২ অধ্যায় ৪—১৫, ১৯, ১৬।

† ২য় অধ্যায় ৪—৮, ১০-১২, ২৯, ৭০; ৮ অধ্যায় ৯-১১, ২৮; ৯ অধ্যায় ২০-২১; ১১ অধ্যায় ১৫—৪০; ১৪ অধ্যায় ২—৪, ১৪

সংগ্রাম পক্ষসৈন্য বিনাশ করিতেছেন। দুর্য্যোধন এখানে উভয় পক্ষের সেনাপতির নাম উল্লেখ করিয়া দেখিলেন যে পাণ্ডবপক্ষে বড় বীর বেশী। যদি দুর্য্যোধনের মনে বিষাদ না হয় তাহা হইলে পরবর্ত্তী শ্লোকের অর্থ সুসঙ্গত হয় না। পরবর্ত্তী শ্লোকে দুর্য্যোধন বলিতেছেন সকলে ভীষ্মকে রক্ষা করুন। অর্থাৎ তিনি পরাজয় আশঙ্কা করিতেছেন। পুনশ্চ গীতায় আছে—

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃশঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥

ভীষ্মদেব দুর্য্যোধনের মনে হর্ষ সঞ্চার করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। দুর্য্যোধনের মনে পূর্ব্বে বিষাদভাব থাকিলেই হর্ষ উৎপাদনের কথা সুসঙ্গত হয়।

"হে" শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া বীরেশ্বরবাবু অনুমান করিয়াছেন যে গীতাকার বাঙ্গালী। কিন্তু "অয়ি" "ভোঃ" যেরূপ সংস্কৃত শব্দ, "হেও" সেরূপ সংস্কৃত শব্দ। কাব্যে 'হে' শব্দের প্রয়োগ কম, ইহার কারণ, অনাদর অর্থে হে শব্দের প্রয়োগ হয়। গীতায় অনাদর অর্থেই প্রয়োগ হইয়াছে।

বীরেশ্বরবাবু যে যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে গীতাকারের নাম পদ্মনাভ, সে যুক্তি একেবারেই বিচারসহ নহে। বীরেশ্বরবাবু এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন :

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্র বিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা॥

ইহার অর্থ,—গীতা ভাল করিয়া পাঠ করা উচিত, অন্য বড় শাস্ত্র পাঠ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ গীতা স্বয়ং পদ্মনাভের মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। এখানে পদ্মনাভ শব্দের অর্থ বিষ্ণু বা ভগবান। স্বয়ং ভগবানের মুখ হইতে গীতা বাহির হইয়াছে, এজন্য অপর শাস্ত্র পাঠ না করিলেও চলে। কারণ অপর সকল শাস্ত্র ঋষিমুখ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং সেই ঋষিদিগের মধ্যে অনুপ্রেরণা দিয়াছেন ভগবান। *

ভগবান অন্যের মুখ দিয়া যে সকল শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা নিজমুখে যাহা বলিয়াছেন তাহার মূল্য বেশী। কিন্তু পদ্মনাভ শব্দের অর্থ যদি সুপদ্ম-প্রণেতা পদ্মনাভ ধরা হয়, তাহা হইলে এই শ্লোকের কোন অর্থ হয় না। কারণ অপর শাস্ত্র সকলও ত পদ্মনাভ ধরের অনুপ্রেরণায় রচিত হয় নাই। বস্তুতঃ উপরিউক্ত শ্লোকে পদ্মনাভ শব্দের অর্থ এত সুস্পষ্ট যে ইহাতে কোন সন্দেহই হয় না।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রতিবাদে বলিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় বলেন, গীতাকার বাঙ্গালী। তাঁহার প্রথম যুক্তি এই—বঙ্গদেশে বড় কবির জন্ম হইয়াছে, বড় বড় ধার্ম্মিকের আবির্ভাব হইয়াছে, অতএব গীতাকার বাঙালী হওয়া অসম্ভব কি? আর একটী যুক্তি এই যে গীতার কতকগুলি কথা আছে তাহা কেবল বঙ্গদেশে ব্যবহৃত হয়; যথা,—

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ১।১০

এই স্থলে তিনি বলেন, বঙ্গদেশে অপর্য্যাপ্ত অর্থে প্রয়োজনাতীত, অনেক বুঝায়। গীতাতেও তাহাই অর্থ। বাস্তবিক তাহা নহে। এঞ্চলে অপর্য্যাপ্ত অর্থ পর্য্যাপ্ত নয়, অপ্রচুর। গীতার টীকা সমূহেও সেই অর্থ ধৃত হইয়াছে।

নব্য ও প্রাচীন অভিধানেও ঐরূপ অর্থই আছে। কাজেই সেন মহাশয়ের অর্থ ব্যর্থ হইতেছে। সেন মহাশয় বলেন যে একাদশ অধ্যায়ের ৪১ শ্লোকে আছে—

"হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি"

'হে' শব্দ সম্বোধনে কেবল বাঙ্গালী লোকেই ব্যবহার করে। অতএব গীতাকারও বাঙ্গালী। হে, সংস্কৃত কথা। সংস্কৃত কোন অর্থে অমরকোষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অমর খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে অবস্থান করেন, এরূপ পাশ্চাত্য মনীষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই অমরকোষে সম্বোধনবাচক শব্দের পর্য্যায়ে এইরূপ আছে "সম্বোধনার্থ কাঃ স্যাঃ পাটপাড়ুস (পাটু, অজ) হে হে ভোঃ।" শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত মেদিনী-কোষে আছে—"হে সম্বোধনম্, আহ্বানম্। অতএব হে যে সংস্কৃত শব্দ তাহাতে ভুল নাই। পৌরাণিক প্রমাণ যথা আছে—"

"হে কৃষ্ণ দ্বারকানাথ কালি ব্যাসবন্দন
মধুসূদন হৃষীকেশ ত্রাহি মাং জনার্দ্দন।"

কবিবর শঙ্করাচার্য্য কৃত শিবের নাম স্তোত্রে আছে

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে
* * *
হে পার্ব্বতী হৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে
* * *
হে ভূতনাথ ভবশঙ্কর দিনাকপাণে
ইত্যাদি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিতেছেন :—

ইহার পর সেন মহাশয়ের দেওয়া শ্লোক প্রভৃতির অবতারণা নিষ্প্রয়োজন হইলেও পাঠক মহোদয়গণের অবগতির জন্য এইটুকু আলোচনা করিব।

মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্বের ২৫ অধ্যায়ের পর, অর্থাৎ ঐ পর্ব্বের ২৬ অধ্যায় হইতে ৪২ অধ্যায় পর্য্যন্ত, অষ্টাদশ অধ্যায়ে গীতা সমাপ্ত। ৪২ অধ্যায়ের পরে ৪৩ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিং মাত্রৈঃ শাস্ত্র বিস্তরৈঃ
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা।

কোন কোন স্থলে "বিস্তরৈঃ" স্থলে "সংগ্রহৈঃ" পাঠ দৃষ্ট হয়। ইহার সরলার্থ এই—

যে গীতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম হইতে পতিত হইয়াছে, সেই গীতাই সুন্দররূপে পঠিত হওয়া উচিত। অন্য শাস্ত্র সংগ্রহ নিষ্প্রয়োজন।

সেন মহাশয় মহাভারতের এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া বলিতে সাহস

---

* "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই ব্রহ্মসূত্রে বলা হইয়াছে যে সকল শাস্ত্রের মূল কারণ ভগবান।

করিয়াছেন যে "স্বয়ং পদ্মনাভ" মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ রচয়িতা পদ্মনাভ দত্ত। অবশ্য তিনি জানিতেন না যে এই শ্লোকটী মহাভারতের স্তীপর্ব্বের, এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমাপ্তির, অব্যবহিত পরের শ্লোকই। তাহা হইলে তিনি বালুকাময়ী ভিত্তির উপর তাঁহার এই সিদ্ধান্তরূপ অট্টালিকার নির্ম্মাণ-কার্য্যের প্রচেষ্টা করিতে সাহস পাইতেন না। যাহা হউক একটুকু কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান বিশিষ্ট বালকও বুঝিবে যে "স্বয়ং পদ্মনাভ" বলিলে সেই পদ্মপলাশলোচন শ্রীবিষ্ণুকেই বুঝায়। ভগবানের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে বলিয়াই "মুগ্ধবোধ হইতে বহির্গত" লিখিত হইয়াছে। ইহা যদি ব্যক্তি-বিশেষের সম্বন্ধে লিখিত হইত তবে "মুগ্ধবোধ" বা "বিনির্গত" লিখিত হইত না। কারণ পদ্মনাভ দত্ত মহাশয় তাঁহার প্রণীত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন, তাঁহার মুগ্ধবোধ বিনির্গত হয় নাই। দেখা যাইতেছে যে গীতায় অনেক আধুনিক ব্যাকরণ-দুষ্ট শব্দ, সন্ধি ও ছন্দঃ আছে। মুগ্ধবোধকার একজন বড় বৈয়াকরণ, তিনি ঐরূপ কেন লিখিবেন? মুগ্ধবোধ কেন এমন কোন ব্যাকরণ নাই যাহাতে অধ + ইতি = অধেতি, শুদ্ধ বলিবে। অথবা, সেনান্যাং মুখে সেনানীনাং বলিবে।

শ্রীযুক্ত রামনরণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

বীরেশ্বরবাবু তিন জন পদ্মনাভের সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ২।৩ শত বৎসর পূর্ব্বে ছিলেন এবং আর একজন ৫।৬ শত বৎসর পূর্ব্বে ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের কেহ গীতাকার হইতে পারেন না; কারণ, গীতা শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় ১১০০ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল যেহেতু শঙ্করাচার্য্য (৮৮৮—৯৪০) গীতার ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। অতএব অবশিষ্ট পদ্মনাভ অর্থাৎ মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণকারই গীতাকার ছিলেন। বীরেশ্বরবাবু যদি মুগ্ধবোধব্যাকরণকার পদ্মনাভের সম্বন্ধে একটু সন্ধান লইতেন তাহা হইলে তিনি কখনও ঐ দুই পদ্মনাভের অস্তিত্বের স্থাপনের চেষ্টা করিতেন না। বৈয়াকরণ পদ্মনাভ দত্ত মুগ্ধ ব্যাকরণ, মুগ্ধ পঞ্জিকা, পরিভাষা, ধাতুপাঠ প্রভৃতি, ঢৈবাদিপ্রকৃতি ধাতুকৌমুদী, প্রয়োগদীপিকা, লোপাগম-চরিত, আনন্দলহরী টীকা, কৃত্তিপ্রয়োগ ও আচারপদ্ধতিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন

"বিশ্বপ্রকাশাবয়বকোষলীকাত্রিকা ওষ্ঠ্যোজ্জ্বল ধাতুবৃত্তী।
হারাবলীরৌদ্রিণী কোমলব্যাখ্যালোকা লক্ষ্যঃ লিখিতঃ ময়েতৎ"।

ইহাদের মধ্যে উজ্জ্বলদত্ত ত্রয়োদশশতাব্দীর এবং ত্রিলোচনের রচয়িতা পুরুষোত্তম দেব চতুর্দ্দশ শতাব্দীর। সুতরাং পদ্মনাভ দত্ত চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহে।

বীরেশ্বরবাবু লিখিয়াছেন মুগ্ধকার সম্পূর্ণরূপে পাণিনিকে মানিয়া চলিতেন না। এ কথা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া গীতায় যে সমস্ত অপাণিনীয় শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা যে মুগ্ধব্যাকরণের অনুমোদিত তাহা নহে।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

মুগ্ধকার পদ্মনাভ দত্ত ও গীতাকার অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন ইহা প্রমাণ করিবার জন্য সেন মহাশয় প্রধানতঃ—নিম্নলিখিত যুক্তি কয়েকটীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন,— (১) গীতায় অপাণিনীয় বহু প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, পদ্মনাভ দত্ত সম্পূর্ণরূপে পাণিনিকে মানিয়া চলিতেন না, (২) গীতায় কতিপয় সংস্কৃত শব্দের বহুস্থলে প্রচলিত অসংস্কৃত (?) অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, (৩) গীতার মূল উপনিষদ্ হইলেও ইহার সর্ব্বত্র উপনিষদের অর্থ অবিকল গৃহীত হয় নাই। আপাততঃ এই কয়েকটী বিষয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। লেখকের অন্য কয়েকটী যুক্তির উত্তর না হউক, অন্ততঃ প্রতিপ্রশ্ন স্বয়ং 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক মহাশয় করিয়াছেন। আশা করি এই সকল প্রতিপ্রশ্নের সম্বন্ধে বীরেশ্বর বাবুর বক্তব্য 'ভারতবর্ষ' পত্রের সৌজন্যে আমরা জানিতে পারিব। সুতরাং বীরেশ্বর বাবুর উত্তর শুনিবার পূর্ব্বে এই সকল বিষয়ে কোনও আলোচনা না করাই ভাল।

'পদ্মনাভ দত্ত পাণিনি মানিয়া চলিতেন না এবং গীতায় বহুস্থলে অপাণিনীয় পদের প্রয়োগ আছে, সুতরাং গীতাকার ও পদ্মনাভ দত্ত এক ব্যক্তি' এই সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য :—

(১) পদ্মনাভ দত্ত মুগ্ধ ব্যাকরণের প্রারম্ভে পরমদেব, বাগ্‌দেবী, কবি ও তন্ত্র সমূহকে নমস্কার করিয়া বলিতেছেন, "অথ বিবরণক্ষম শব্দানুশাসনের মহ পাণিনীয়াদি শব্দবৃত্তী প্রত্যালক্ষ্য লৌকিকোপাধ্যের প্রতিসংস্কৃতস্য শব্দ লক্ষণম্ (আহ)।" ইহা দ্বারা গ্রন্থকারের পাণিনি প্রভৃতির প্রতি অভিন্ন শ্রদ্ধাই প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) "অবস্থাচাং গড়ুবাং দ্বিতীয়ঃ সংযোগঃ" মুগ্ধ ব্যাকরণের এই সূত্রের বিবরণে পদ্মনাভ 'মৃগাদিৎ' প্রভৃতি স্থানে পাণিনি-বিরোধী বিবরণে মৃগাদিৎ প্রভৃতি পদের সমর্থন না করিয়া ও "অপাণিনীয়াঃ কেচিদিহ বিকল্পন্তে" এইরূপ বলিয়া তিনি স্বয়ং যে পাণিনির মতাবলম্বী তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

(৩) পদ্মনাভ দত্তের ব্যাকরণে পাণিনি-বিরোধী "মনুষ্য" প্রভৃতি কয়েকটী শব্দ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই জন্য তাঁহাকে পাণিনি-বিরোধী বলা যায় না; কেন না, পরবর্ত্তী বৈয়াকরণ পণ্ডিতেরা পাণিনির সূত্রানুসারে অসিদ্ধ, অথচ ভাষায় প্রযুক্ত কতিপয় পদ-সিদ্ধির জন্য সূত্র করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা কদাপি পাণিনির রীতি ব্যতিক্রম করিয়া চলেন নাই। পাণিনির মতে অসিদ্ধ পদের সিদ্ধির জন্য সূত্র করিলেই যদি পাণিনি-বিরোধী হইতে হয়, তাহা হইলে বার্ত্তিককার কাত্যায়ন হইতে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ প্রণেতা ক্রমদীশ্বর পর্য্যন্ত সকলেই পাণিনির ঘোর শত্রু, কিন্তু কোনও পাণ্ডিত্য তাহা স্বীকার করেন না। বলা বাহুল্য—যাঁহারা পাণিনি প্রভৃতি বিরুদ্ধ পদ স্বীয় ব্যাকরণে সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য পাণিনির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা নহে। তাঁহাদের যুক্তি এই যে ভাষা বুঝিয়াই ব্যাকরণ হইয়া থাকে, ব্যাকরণ বুঝে ভাষা হয় না। যদি পাণিনি প্রভৃতির ন্যায় কতিপয়ও ব্যাকরণ প্রণয়নকালে দুই একটী বিষয় লক্ষ্য করিতে না পারিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের অপরাধ কি? তাঁহারা যাহা করিয়াছেন তাহার জন্যই জগদ্বন্দ্য হইবার উপযুক্ত। এই সম্বন্ধে পদ্মনাভেরই মত একজন পরবর্ত্তী বৈয়াকরণের কথা স্মরণীয়। কলাপ পরিশিষ্টকার শ্রীপতি দত্ত বলিয়া গিয়াছেন—

সমীক্ষ্য তত্রাপি যথা যুনীনাং
যত্র ভাষাদি বিরুদ্ধ মুক্তম্।
তত্র দ্বিষেয়ং কৃতিভির্মনীনাং
সাধারণী বাচি খলু প্রতিষ্ঠা ॥

পরন্তু পতঞ্জলি যদি ভাষ্যোক্তিবিরুদ্ধ কিছু সমর্থন করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারও যুক্তি শ্রীপতির যুক্তির অনুরূপ হওয়াই সম্ভব। পাণিনি ব্যাকরণে— 'ক্তে' শব্দযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তির ব্যবস্থা নাই, কিন্তু ভাষার প্রয়োগ আছে বলিয়া চান্দ্রব্যাকরণে "ক্তে দ্বিতীয়া চ" ও সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণে "ক্তে যুক্তাদ্ দ্বিতীয়া চ" সূত্র করা হইয়াছে। পূর্ব্বকালের ক্রিয়া-বোধক সমান কর্ত্তৃক ধাতুর উত্তর ক্ত্বা প্রত্যয় হয় ইহাই পাণিনির মত, কিন্তু ভাষায় তাহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ক্রমদীশ্বর "ক্বচিৎ প্রাক্কালেঽপি" ও ক্বচিৎ দ্বিতাদি পদার্থান্তরেণৈক কর্ত্তৃতা" ইত্যাদি বিশেষ সূত্র করিয়াছেন; কিন্তু সেই অপরাধে কেহ তাঁহাকে পাণিনি-বিরোধী বলিয়া স্থির করেন নাই।

তাহার পর সেন মহাশয় বলিয়াছেন—

শঙ্করাচার্য্য খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে গীতার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, অতএব পরমানন্দ যতিকে তাহার পূর্ব্বে স্থাপন করা প্রয়োজন, ইহা বীরেশ্বর বাবুও বুঝিয়াছেন। কিন্তু সিলভাঁ লেভিও যখন সংস্কৃত গ্রন্থকারদিগের সময় নির্ণয় করিতে পারেন নাই, এবং পঞ্চম শতাব্দীর হিন্দু উপনিবেশ যবদ্বীপে গীতাহীন মহাভারত পাওয়া গিয়াছে, তখন বীরেশ্বর বাবু এই দুই অতিশয় দৃঢ় প্রমাণের বলে নিঃসঙ্কোচে পুষ্পদন্তের পরমানন্দকে পরমদা এক লাফে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নিয়া ফেলিয়াছেন। এখন দেখা যাউক এই যুক্তি (?) বিচারসহ কি না! পরমানন্দ যতি তাঁহার ব্যাকরণে বাক্য-পদীয়, মহাভাষ্য, ও ভাগবৃত্তি হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন, বিশেষ্যবিশেষণভাবসমানকর্ত্তৃকো- কর্ত্তা, ক্রিয়াব্যাপ্য কর্ম্ম, ইত্যাদি কারকপ্রকরণের সূত্র সমূহের বৃত্তি দেখিলেই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। অধ্যধ্যুক্তাধ্যানেঽধ্যাৎ কৃঞ্চ্ক্ত্বা বা' এই সূত্রের বৃত্তিগ্রন্থে জয়াদিত্য হইতে শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। বাক্যপদীয়কার ভর্তৃহরি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে (৬১৮ খ্রীঃ) ও জয়াদিত্য খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে (৬২৯ খ্রীঃ) বর্ত্তমান ছিলেন। পরমানন্দ যতি যে কিরূপে ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক হইতে পারেন তাহা বীরেশ্বর বাবুরই বিবেচ্য। কারক প্রকরণের ষট্‌ত্রিংশ সূত্রের বৃত্তিগ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে "লক্ষণাঃ পক্ষ লেতে যন্নপচি রিতি কালিদাসঃ।" বলা বাহুল্য এই কালিদাস শকুন্তলা প্রণেতা কালিদাস নহেন, ঐ উক্তি যে কালিদাসের তিনি একাদশ শতাব্দীর লোক। "ণেরাৎ কর্ত্তরি পরস্মৈপদম্" এই সূত্রের বৃত্তিতে আত্মনেপদী ধাতুর কখনও কখনও পরস্মৈপদের শিষ্টপ্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় ইহা দেখাইবার জন্য পরমানন্দ যতি "বলদ্‌ঘোষাঃ গ্রামাঃ শিবদুবলাঃ" এই কবিপ্রয়োগটীর উদ্ধার করিয়াছেন। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, এমন কি (বীরেশ্বর বাবুর মতে আধুনিক) ভাগবতেও গ্রামার উল্লেখ নাই। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণে গ্রামার উল্লেখ আছে, কিন্তু উক্ত পুরাণ সকলের মতেই অতিশয় আধুনিক গ্রন্থ। বীরেশ্বর বাবু যে যোগেশবাবুর উক্তি প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধার করিয়াছেন তাঁহার মতেই ত উক্ত পুরাণ ৪।৫ শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত, সুতরাং পরমানন্দ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত উক্ত বাক্য জয়দেবাদির সমকালীন বা পরবর্ত্তী কোনও কবির লিখিত। অর্থাৎ পরমানন্দ যতি নিজেই প্রমাণ দিতেছেন যে তিনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী দূরে থাকুক অষ্টম শতাব্দীরও অনেক পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। জানি না বীরেশ্বর বাবুর ইহার বিরুদ্ধে কোনও বক্তব্য আছে কি না!

কলিকাতায় স্বাস্থ্যতত্ত্বের ক্রমবিকাশ

ডাক্তার শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম-বি

(১)

জল

এল, বায়ু, খাদ্য ও আবাস, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-মন্দিরের এই চারিটী প্রধান স্তম্ভ। এ ভেদে জলের নাম জীবন। বিশ্বসৃষ্টি প্রকরণের প্রথম অধ্যায় নারায়ণের জলশয্যা। সমুদ্রমন্থন হইতে উত্থিত অমৃত। ধন্বন্তরীর কমণ্ডলুস্থিত সেই অমৃত পান করিয়া দেবতারা মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

পবিত্র জলের প্রতিনিধি ও আধারস্বরূপা গঙ্গা। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ বলেন :—

স্নানমাত্রেণ গঙ্গায়াঃ সর্ব্ব পুণ্যফলং ভবেৎ

ভবিষ্য পুরাণ বলেন :—

"গঙ্গেতি স্মরণাদেব অকৃত্যেষু কৃতেষু চ।
যজ্ঞন্তং যঃ পিবেদ্গঙ্গাস্তস্য মুক্তি করে স্থিতা।"
"আরোগ্য বিত্তসম্পত্তির্গঙ্গা স্মরণতঃ নৃণাং।"

গঙ্গায় কি কি কার্য্য নিষেধ, তৎসম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলিতেছেন :—

শৌচাচমনং নেষ্টং নির্ম্মাল্যং বল বর্জ্জয়েৎ।
গাত্র সংবাহনং ক্রীড়াং প্রতিগ্রহমথো রতিং।
বস্ত্রত্যাগমথাপাতং সন্তারক বিশেষতঃ।

গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, নর্ম্মদা, কাবেরী, গোদাবরী প্রভৃতি বড় বড় নদী সকলকে তীর্থ বলা হইয়াছে। স্নান-বিশেষে করণার নির্ম্মল জলেও মহাজনেরা সর্ব্বতীর্থ কল্পন করিয়াছেন। অদ্বৈতাচার্য্য যখন ছিলেন বালক কমলাক্ষ, তাঁহার মাতা লাভা দেবী স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাঁহার কোলে যে শিশু কমলাক্ষ, তিনিই শঙ্খচক্রগদাধারী মহাবিষ্ণু। লাভা দেবী তাঁহার পাদোদক প্রার্থনা করিয়া বলিলেন "তোমার চরণে কোটী কোটী তীর্থ আছে, অতএব তোমার পাদোদক দাও।" কমলাক্ষ বলিলেন "এমন কথা আর বলো না মা। আমি কাল সকালেই এইখানে সর্ব্বতীর্থ এনে দেব।"

"প্রভাতে অদ্বৈতপ্রভু কহে জননীরে।
সর্ব্বতীর্থের আবির্ভাব হৈল শৈশোপরে।"

নাড়া করে কৈবে দুই করিহ প্রস্তাব।
প্রভু করে, অত্যাশ্চর্য্য দেখিনু বিস্তর।
এত বলি নবদ্বীপে সঙ্গে করি লেনা।
গঙ্গাতীর পার্শ্বে শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইলা।
উচ্চস্বরে হরিধ্বনি করিলা আরম্ভে।
যত যত ঈশ্বরের নাম্নি সব লভে।
প্রভু করে দেখ মাতা সবা জল করে।
শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি কৈলে যত জল পড়ে।
ঐ দেখ ঈশ্বরী গঙ্গাবরদাতৃত্বে।
দেখেন দুর্গা সব দৈল আসিয়াছে।
ইহাই ঐ দেখ গঙ্গা কটিক নিবিয়া।
পুণ্যরূপ কলে হৈয়ে দেখিল ভাবিয়া।
পুন দেখে ছত্রদণ্ড আদি পুণ্য জল।
ইহা দিয়ে পড়িতেছে কটি কল কল।
আশ্চর্য্য দেখিয়া মাতা নবদ্বীপ কৈলা।
ভক্তি করি স্নান পূজাদিক সমাপিলা।
ত্রিবেণি গঙ্গাতীর্থ হইল বিখ্যাত।
বারুণী যোগেতে স্নান বহু পুণ্যফল।

অদ্বৈতপ্রকাশ

বিষ্ণুর চরণবিধৌত নদী প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থস্থানে পূজিত হইত বলিয়া তাহার পবিত্রতা রক্ষার জন্য চেষ্টা করা হইত। এখন এই গঙ্গার জলে সহরের ময়লার জল এমন কি কলের সাহেব ও কুলীদের বমনা পড়ে। ইতিপূর্ব্বে তাহার প্রমাণের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছি। গঙ্গায় নৌকা, জাহাজ, গা ধোয়ান, কাপড় ধোয়া বা কাচা, জলকীড়া, সাঁতোর প্রভৃতি নিষিদ্ধ ছিল। তাই বোধ হয় গঙ্গাজল ইতিপূর্ব্বে এত অপবিত্র ছিল না। তীর্থস্থানে নদীর জলের পবিত্রতা রক্ষা করা হইত। স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ সাইমন বলেন পুরাকালে উচ্চ শ্রেণীর জাতির মধ্যে এই ধর্ম্মবুদ্ধি জাগ্রত ছিল বলিয়া নদীজলের পবিত্রতা রক্ষিত হইত, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে।

"Among the best known branches of the Aryan stock, as notably in India (when it still holds its sway) it seems to have been general". *Simon's English sanitary Institutions.*

এই ধর্ম্মবুদ্ধির অভাবে সভ্যতাভিমানী লণ্ডনবাসীরা তাঁহাদের টেম্‌স নদীর কি প্রকার অবস্থা করিয়াছেন, ১৮৫৪ সালের ল্যান্‌সেট পত্রিকা তাহা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন :—

"The Thames, for a mile's length of its course, where supposed to be sacred to the water supply of London had had, on and about of its surface, a floating and riparian encampment of some thousands of holiday-makers, using the river as their latrine and midden-stead."..."What sentiment of cleanliness prevailed among the thousands who could thus deal with their neighbour's drinking water, and among the millions who were placidly bearing the outrage, is a question which may be left for such future historians as will discuss the curiosities of English civiliration at the close of the nineteenth century—"*Simon.*

উনবিংশতি শতাব্দীর শেষভাগেও সুসভ্য ইংরাজেরা টেম্‌স নদীর প্রশস্ত বক্ষে প্রমোদ-তরণীতে বসিয়া মলত্যাগ করিতেছেন এবং মহানন্দে খেলিতেছেন, এই বর্ণনা পাঠ করিয়া সাইমন বলিতেছেন হাজার হাজার ব্যক্তির পানীয় জল এইভাবে দূষিত করিয়া এবং লক্ষ লক্ষ লোক অবাধে সেই জল পান করিয়া কি প্রকার স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞান ও পরিচ্ছন্নতার পরিচয় দিতেছে, ঐতিহাসিকেরাই তাহার বিচার করিবেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজেরা যখন লালদীঘীর চারিদিক বেষ্টন করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন কলিকাতার পানীয় জল উনবিংশ শতাব্দীর জলের মতন এত দূষিত ছিল কি না জানিবার উপায় নাই। বরং ভাল ছিল বলিয়াই বোধ হয়। সুতানটি এবং গোবিন্দপুরের মাঝখানে যে কলিকাতা ছিল তাহার নাম নাকি ছিল ডিহি কলিকাতা। সেখানেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আফিস ও ইংরাজদের আদি বসতি বা ব্রিটিশ কলিকাতা।

ইংরাজেরা লালদীঘীর জল ব্যবহার করিতেন। লালদীঘীকে বলা হইত Great Tank বা বড় দীঘী। কখন এবং কেন যে ইহার নামকরণ হইল লালদিঘী তাহা ঐতিহাসিকেরাই বলিতে পারেন। লালমুখের ব্যবহার্য্য বলিয়া কি? অল্প অল্প সহরেও দেখা যায় আফিস অঞ্চলের নিকটস্থ বড় পুষ্করিণীকে লালদীঘী বলা হয়। ১৭০৯ সালে সেই পুষ্করিণীর সংস্কার ও আয়তন বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। ইহারই মিষ্ট জলের লোভে নাকি ইংরাজেরা আশেপাশে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৭৭৭ সালে যদিও মিউনিসিপাল শিশুর জন্ম, কিন্তু তাহার পোষণের ভার ছিল সরকারের উপর। ট্যাক্স আফিসের তীতি ছিল না, ট্যাক্সের বালাইও ছিল না। বৃষ্টিপেলায় টাকা উঠিত; সেই টাকার কিয়দংশ জল ও রাস্তার উন্নতিকল্পে ব্যয় করা হইত। বিলাতে যাঁহারা গোড়ঘোড় প্রভৃতি মৃগয়েলায় উত্তম, তাঁহাদের প্রয়োজনায় তাজতে এই বৃষ্টিপেলা নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া রহিত হইল। যাহা হউক ১৮০৫ হইতে ১৮৩৬ সাল পর্য্যন্ত বৃষ্টি-কমিটী-উপার্জ্জিত টাকায় বেণ্টিঙ্কের, পটলডাঙ্গার গোলদীঘী, বহুবাজারের গোলদীঘী, বাগবাজার দীঘী, চাঁপাতলার তালাও, সুরতীবাগান পুকুর প্রভৃতি খনন করা হইয়াছিল। এই সব পুষ্করিণীর জল নাকি বিশুদ্ধ ছিল। উত্তর কলিকাতার বাড়ীর ভিতরে যে সব পুষ্করিণী ছিল তাহার জল তত ভাল ছিল না। ভাটার সময় কাদা জমিতে গঙ্গার জল সঞ্চয় করিয়া রাখা হইত। আশ্বিন হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত নাকি জল ভাল থাকিত। গ্রীষ্ম ও বর্ষার জল অপরিষ্কার এবং অব্যবহার্য্য। শরৎকালীন জল ছিল ঘোলা; ফটকিরি দিয়া পরিষ্কার করিয়া কলসী কাপড়ে ছাঁকা হইত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা হুগলী ও খুলনা হইতে জল আনিতেন। দরিদ্র মুসলমানেরা ভিস্তির জল এবং গরীব হিন্দুরা ঘড়ায় করিয়া ব্যবহার করিত। সাহেবেরা বর্ষাকালে বৃষ্টির জল

করিয়া রাখিতেন। ফ্রট টমসন্ গার্ডেনরীচের জলে সোডা ওয়াটার প্রস্তুত করিতেন এবং বিলাত-যাত্রীদের নিকট তিনি এই জল বিক্রয় করিতেন।

১৮২০ সালে পাকা জলপ্রণালী (aqueduct) প্রস্তুত হইয়াছিল। চাঁদপাল ঘাটে ছিল বন্দকল। এই কলের সাহায্যে প্রণালীতে গঙ্গাজল তোলা হইত। ধর্মতলা, চৌরঙ্গী, লালবাজার, বহুবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে এই জল ব্যবহৃত হইত।

লাটচরণের পূর্ব্বে যে প্রণালী ছিল তাহার চিহ্ন দেখা যায় প্রণালী হইতে জল সংগ্রহ করা হইতেছে।

১৮৪৪ সালে কলেজ ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত এই প্রণালী বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৮৫৫ সাল পর্য্যন্ত এই প্রথাই প্রচলিত ছিল। এই প্রণালীস্থিত জল ব্যবহারেও আপত্তি ছিল। বাইবেলেও পাইতেছি :—

ফুলোনা মন হরিষল।
আমাদের জাতের ধর্ম্ম
জন্মে জন্মে রক্ষা হল।
খেলে জাত ইষ্টিশনে, ইষ্টিমনে, কেশব সেনে,
ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপশনে
মুরগীর কোলটা চল্‌বে ভাল।
ইংরেজে ওয়ুধ টেনে, গঙ্গাজল দিচ্ছে এনে,
সে চরণামৃত পানে
চৌদ্দপুরুষ তরে গেল।

উনবিংশ শতাব্দী যখন ঘাটের কোঠায় ঘুরিতেছিল, ৺ডাক্তার গুরুদাস চক্রবর্ত্তী কলিকাতার পানীয় জল সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। জন-সাধারণ বক্তৃতা শুনিল না। শুনিয়া কাজ করিবার লোক ছিলেন যাঁহারা তাঁহারা একাগ্রচিত্তে গঙ্গার ঘাটের মাঝি-ভাঙ্গ জাসমান মলের বর্ণনা এবং স্নানের ফলে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ গ্রাহী ও গ্রাহিনীদের মস্তকে ঐ মল-ধারণের কথা শুনিলেন। যাঁহারা শুনিলেন তাঁহাদের এবং কমিশনরদের চেষ্টায় ১৮৬৮ সালে জল-কল-প্রতিষ্ঠার আরম্ভ। বর্ষা গেল বলিয়া- যাঁহারা চীৎকার করিলেন কিছুদিন তাঁহারা গো-চর্ম্ম স্পৃষ্ট জল পান করিলেন না। অবশেষে 'আপঃ নারায়ণ স্বরূপ' বলিয়াই হউক আর যে কারণেই হউক তাঁহারা এবং তাঁহাদের বংশধরেরা সেই জল অমৃতজ্ঞানে পান করিলেন।

কাল-ভয় বড় ভয়। কলিকাতা তখন ছিল ওলাইচণ্ডীর লীলাভূমি। ধনিবাবুর এবং রাজেন্দ্র মল্লিকের শিবদের নাকি স্নানাহারের অবসর ছিলনা, ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবের জন্য। জল-কল-প্রতিষ্ঠার পর সেই রোগের হ্রাস কেন বুঝিতে পারা গেল। জল-কল পানে আর আপত্তি রহিল না।

কলের জল চলিয়াছে, গঙ্গা-স্নানও সমান ভাবে চলিয়াছে। কলের জল প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ওলাউঠার যে প্রকার প্রকোপ ছিল, তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সময়ে সময়ে, বিশেষতঃ যোগ-বাগ পর্ব্ব উপলক্ষে রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। চন্দ্র গ্রহণ, অর্দ্ধোদয় যোগ, গঙ্গা-সাগর মেলা, বারুণী স্নান প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে রেল-ষ্টীমার প্রভৃতিতে যাতায়াতের অধিকতর সুবিধাবশতঃ যাত্রীর খুব ভিড় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়। দূষিত জলই যে ইহার একমাত্র কারণ, এ কথা বলিলেও স্নান-যাত্রীদের মর্ম্মে তাহা প্রবেশ করে না।

তীর্থ যাত্রা ও গঙ্গাস্নান করিলেই যে সকল পাপ ধুয়ে মুছে ফেলা যায় না, মহাপ্রভু একদিন এই কথা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীকে বলিয়াছিলেন—

যদি: স্নানপরঃ কর্ণিপবমুত্তম্ মেধোঽপিপর্শিনাপনঃ:
পবমন্ত্রমোতি চক্রিপো পরিচরণ যেবান্ সদাযেবনঃ।
স্বর্গে তিষ্ঠতি মুক্তিকোঽপি গহনে সিংহো বকঃ যানবান্।
কিংতেষাং ফলমস্তি হন্ত তপসা সন্ত্যাবসিদ্ধিং কুরু॥

তীর্থস্নান করিলেই যদি পুণ্যবান।
কার এত পুণ্য আছে নাকের সমান?
যাতায়াতী হইলেই যদি হয় যোগী।
যোগীর প্রধান হয় সর্প বায়ুভোগী॥
যতি হয় করিলেই যদি তৃণাহার।
মেষের সমান যতি কেবা আছে আর?
বনে বনে বেড়ালেই যদি ঋষি হয়।
শৃগাল ভল্লুক তবে কেন ঋষি নয়?
পূজা করিলেই যদি মুক্তি অধিকারী।
কীটমুক্ত হইয়াছে যতেক পূজারি।
গৃহবাসে শুধু যদি হইল সন্ন্যাসী।
মূষিক সন্ন্যাসীগণ হয়ে সর্ব্ববাসী।
জল থাকিলেই যদি হইল তপস্বী।
তপস্বীর মধ্যে তবে সিংহই যশস্বী।
চক্ষু বুজিলেই যদি করা হল ধ্যান।
এত বড় ধ্যানী কেবা বকের সমান?

সন্তাবে গৃহে থাকিয়া শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম পালন করিয়া ধার্ম্মিক হওয়া যায় ইহাই-প্রভুর শ্রীমুখ নিঃসৃত উপদেশের এই মর্ম্ম। এই মর্ম্ম জন-সাধারণ যতদিন না হৃদয়ঙ্গম করিবে ততদিন কেবল স্নানাদিবিধি প্রবর্ত্তনের দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতি বিধান হয় না। জনশিক্ষার প্রয়োজন।

প্রত্যেকে প্রত্যেকের শুভাশুভের জন্য দায়ী; একের মঙ্গল অপরের মঙ্গলের উপর নির্ভর করে। এই সত্যের উপলব্ধি যতদিন পর্য্যন্ত হয় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য দেশেও সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় নাই।

১৮৫৯সালে নববিধি প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা কর্পোরেশন এই সত্য প্রচারে উদ্দেশ্যেই ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে স্বাস্থ্যসমিতি বা ওয়ার্ড হেল্‌থ্ এসোসিয়েশন-সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে কলিকাতার স্বাস্থ্য ও সম্পদের ভার ছিল এক বা কতিপয় কর্ম্মচারীর উপর। ১৮৫৬ সালে হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন কমিশনর বোর্ড নামক ত্রিমূর্ত্তি। ১৮৫৯ সালে সেই ত্রিমূর্ত্তি ভাঙ্গাই হইয়া সর্ব্বশক্তিমান চেয়ারম্যান বিগ্রহে পরিণত হইলেন। করদাতাদের প্রতিনিধি রূপে যাঁহারা তাহাদের শুভাশুভ লইয়া বাদানুবাদ করিতেন, তাঁহারা জন-সাধারণের মতামতের ততটা অপেক্ষা রাখিতেন না, যতটা নির্ভর করিতেন চেয়ারম্যান বা উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের শুভ-দৃষ্টির উপর। করদাতারা

আনিত ঐ কর্ম্মচারীরাই তাহাদের ধুনিব। উঁহারা ভ্রষ্ট হইলে ট্যাক্সবৃদ্ধি হইবে। মিউনিসিপাল আফিস ট্যাক্স আফিস নামেই অভিহিত হইত।

জনসাধারণের বহুাপেক্ষা বোধ হয় নূতন কর্পোরেশনের হেল্থ কমিটীই প্রথম করিয়াছিলেন। কলিকাতায় মৃত্যুর প্রধান কারণ ছিল তিনটী রোগ,—ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও বসন্ত। এই তিনটী নিবার্য্য রোগ নিবারণ সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিতে অনেক দিন হইতে চলিতেছিল। সেই মন্ত্রণা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য হেল্থ অফিসার ডাক্তার ক্রেক্ ষাট হাজার টাকা (৬০০০০৲) ব্যয়-সাধ্য এক ব্যবস্থা নূতন স্বাস্থ্য-কমিটীর নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন। ব্যবস্থা মামুলী—কতিপয় কর্ম্মচারী এবং কিঞ্চিৎ অর্থ। কমিটী বলিলেন জনসাধারণের পরামর্শ ও সহানুভূতি ভিন্ন প্রকৃত স্বাস্থ্যোন্নতি অসম্ভব। স্বাস্থ্যবিধি-রক্ষণকারীদের বিরুদ্ধে নালিশ ও চরিবানা বহুদিন হইতে চলিতেছে, কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে রোগের হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধিই হইতেছে। সুতরাং জন-সাধারণকে ডাকিয়া তাঁহাদের পরামর্শ লইয়া কোন নূতন প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক। সহরের বিখ্যাত কর্ম্মী ও চিকিৎসকদের পরামর্শে পল্লীতে পল্লীতে ওয়ার্ড হেল্থ এসোসিয়েশন বা পল্লীস্বাস্থ্য-সমিতি সংস্থাপনের ব্যবস্থা হইল। ঐ সমিতি-গুলীর কার্য্য-সহায়ের জন্য পূর্ব্বোক্ত ৬০০০০৲ টাকা দেওয়া হইবে; কিন্তু তাঁহারা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবেন।

প্রত্যেক সমিতির একটী চিকিৎসা-কেন্দ্র থাকিবে, পূর্ব্বোক্ত তিনটী রোগ চিকিৎসার জন্য। চিকিৎসা মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, মুখ্য উদ্দেশ্য—রোগীদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা জানিয়া রোগ নিবারণ করা।

এ যাবৎ ১২টী স্বাস্থ্য-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলা সরকারকেও ইহাদের কৃতকার্য্যতা স্বীকার করিতে হইয়াছে! এ বৎসর বাদুড়বাগে যে সরকারী স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে স্বাস্থ্য-সমিতির কার্য্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে কৃতপূর্ব্ব বঙ্গীয় লাট-পত্নী লিখিয়াছেন—

"আপনাদের প্রশংসনীয় কার্য্য অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।"

এই চিত্রে দেখান হইয়াছে ১৯২০ সালে সমিতি কর্ত্তৃক সওয়া দুই লক্ষ রোগী রোগিণী চিকিৎসিত হইয়াছে এবং বিনামূল্যে কেবল ঔষধ নয়, দুগ্ধ, কড্‌লিভারের তেল প্রভৃতি পথ্য, খুস্ খেলিবার পাম্প, ডিস্‌ইনফেক্‌টেণ্ট্ প্রভৃতি পাইয়াছেন। রোগীদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতির জন্যও বিশেষভাবে চেষ্টা করা হইয়াছে।

বাদুড়বাগে যে সকল চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার একটীতে দেখান হইয়াছে, সমিতির কার্য্যারম্ভের পর হইতে সহরের মৃত্যু-সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ—নাগরিক ও নাগরিকাদের স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে আগমন। এই আগমনের কারণ সমিতি সমূহ কর্ত্তৃক স্বাস্থ্য-তত্ত্ব প্রচার।

বৎসরে বৎসরে সমিতি যে সমূহ স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতে সহস্র সহস্র নরনারী প্রতিদিন সমবেত হইয়া স্বাস্থ্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্রাদির ব্যাখ্যা আগ্রহ সহকারে শুনিয়া থাকেন। সঙ্গীতের ভিতর দিয়াও বালক বালিকাদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

এবার ৩নং ওয়ার্ডের প্রদর্শনীতে বালক বালিকারা উপস্থিত অভিভাবকদের সহকারে এই সঙ্গীত গাহিয়াছিল—

বাউলের সুর

ওরে ভাই সজাতা,
কাল সাপের ভাবনায় কেন
কাঁপিস্ রে দিন রাত?
ভবের খেলায়, কর রে হেলায়,
হেসে খেলে বাহী যাত।
ঐ আকাশ বাতাস,
দিনে কড়ি ভরি ভরি
চাইলেই ত পাস্;
রাখলে খোলা, কোনো বেলা,
আসবে না কাল তোর সকাশ।
ঐ জল নারায়ণ,
তার গায়ে না ফেলিস্ ধরি -
মল নির্জ্জীবন;
চণ্ডী ওলাই, বসন্ত বালাই,
থাকবে দূরে হাজার হাত।
ঐ টাটকা ফল মূল,
সহজেই ত পাসরে ও ভাই,
দু এক পয়সা মূল;
চাল আঁটা, ধাঁতার আটা,
দেশের এই সম্পদ অতুল।
সেই খাতার যে রোগ,
দুধ নবীন ফেলে কাছে
আসবে না ভাই রোগ;
আঠে পাঠে, মোহন নাটে
বাজাস্ বাঁশী রাখাল সাথ।
এ দেহ হরির,
সাফ্ করে সাজাস্ রে ও ভাই
এ দেব-মন্দির;
শাঁখ বাজায়ে, নাচ রে গা রে,
পড়বে না দুঃখ-রেখাপাতে।

হেল্থ কমিটীর সভাপতি ডাক্তার কুনুখপক্কর রায় জনসাধারণের এবং পল্লী সমিতির প্রতিনিধিদের পরামর্শ লইয়া ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। এ বিষয়েও জনশিক্ষার প্রয়োজন। অনেকে পুষ্করিণীতে বা বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া পাইখানার জলের ট্যাঙ্কে কেরোসীন ঢালিতে দেয় না। পুষ্করিণী সম্বন্ধে আপত্তির কারণ মাছের মৃত্যু সম্ভাবনা। চাপরাশহীন কর্ম্মচারীকে কেহ আসলই দেয় না; আর ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু হইলে বাঘ খাবে কে এ কথাটা বুঝাইবারও তাহার

পড়ি নাই। ময়লা জলে কেরোসীন ঢালার আপত্তির মূল কারণ আছে। এখনও অনেক বাড়ীতে ময়লা জলে বাসন মাজা এবং স্নান চলে। জল সরবরাহ বিভাগের কর্ম্মচারীরা চক্ষু বুজিয়া কাজ করেন। তাঁহাদের চক্ষের সামনেই কাঁকা ক'াপানল হাইড্রেণ্ট গুলিয়া লোকেরা অবাধে স্নান করে, কাপড় কাচে এবং মহিষকে স্নান করায়। এই কার্য্য প্রত্যহ দিবা দ্বিপ্রহরে চলিতেছে; কর্ম্মচারীরা বোধ হয় মাহিক-সূত্রের তাড়নায়ই হউক আর যে কারণেই হউক, "দৃশ্যিণঃ ধনঞ্জয়েন" এই মন্ত্র স্মরণ করিয়া, দশ হাত দূরে দাঁড়াইয়াই" এই জলপীড়া দর্শন করেন। শুধু হাইড্রেণ্ট পরিবর্ত্তনের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন বৎসরে ৪।০ হাজার টাকা (৩,৩০০৲) ব্যয় করেন। ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের বেতন ১৩৲ হাজার; কিন্তু তাঁহার কার্য্য যন্ত্র উচ্চতর তত্ত্বাবধান, তাঁহার উচ্চ দৃষ্টি নিম্নে পড়িতে পারে না। তাঁহারে এবং তাঁহার নিম্নতর কর্ম্মচারীদের বেতন প্রায় পৌণে দুই লক্ষ (১,৬৮,০০০৲)। সংখ্যায়ও তাঁহারা কম নহেন। আশা করা যায় তাঁহারা যদি ময়লা জলের এই অসদ্ব্যবহার রহিত করিতে পারেন, তাহা হইলে পাইখানার-জলের অভাব মোচন হইতে পারে এবং নাগরিকেরা নানাবিধ সংক্রামক রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে।

বানরের মানবত্ব প্রাপ্তি

শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়

মানবজাতির আদি-উৎপত্তি-স্থান নিরূপণ করিবার জন্য বৃত্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। অদ্যাপি তাঁহারা উহা নিশ্চয় করিয়া জানিতে পারেন নাই; তবে ভূমিস্থ শৈলস্তর সকল অনুসন্ধান করিয়া এ বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে অগ্রসর হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মৎপ্রণীত বৈজ্ঞানিক হৃষ্টিতত্ত্ব নামক পুস্তকে "মানবের ইতিহাস" প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ কি প্রকার প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কোন এক বানর জাতির ক্রমবিকাশ হইয়া মানবের উৎপত্তি হইয়াছে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর আদি স্তরের উৎপত্তি কালকে আরকেইক (Archaic) যুগ, তৎপরবর্ত্তী স্তরের উৎপত্তি কালকে পেলিওজোয়িক (Paleozoic), তৎপরবর্ত্তী স্তরের কালকে মেসোজোয়িক (Mesozoic) এবং শেষ স্তরের উৎপত্তি কালকে হোলিওসিন (Holocene) যুগ আখ্যা দিয়া থাকেন। আরকেইক যুগে পৃথিবীর উপরিভাগে কোন প্রকার উদ্ভিদ বা প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল না, পেলিওজোয়িক যুগে কেবলমাত্র শামুক, শেঁড়ি, চিংড়ি মাছ জাতীয় জীব সকল উৎপন্ন হইয়াছিল; মেসোজোয়িক যুগে পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি জীবের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং হোলিওসিন যুগে চতুষ্পদ ও বানর জাতীয় জীব সকলের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই হোলিওসিন বা শেষ স্তরটীকে পাঁচটী অন্তর স্তরে বিভাগ করা হইয়া থাকে, তন্মধ্যে শেষ তিনটী স্তরকে যথাক্রমে মাইওসিন (Miocene) প্লাইওসিন (Pliocene) এবং প্লাইষ্টোসিন (Pleistocene) স্তর বলা হয়। মাইওসিন স্তরের গঠন হইতে ৬০ লক্ষ বৎসর, প্লাইওসিন স্তরের গঠন হইতে ২০ লক্ষ ৫০ হাজার বৎসর ও প্লাইষ্টোসিন অর্থাৎ আধুনিক স্তরের গঠন হইতে ২০ লক্ষ বৎসর লাগিয়াছিল। মাইওসিন স্তরে ওরাং, সিম্পাঞ্জি, গরিলা প্রভৃতি নরাকৃতি বানরের প্লাইওসিন স্তরে রোডেসিয়ান, পিল্টডাউন প্রভৃতি বানরাকৃতি নরের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং ঐ স্তরের পরবর্ত্তী অবস্থায় প্রকৃত মানবের উৎপত্তি হইয়াছে। এ সকল কথা আমার উক্ত গ্রন্থে বিস্তৃত করিয়াছি।

আপনারা বোধ হয় সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন, বানরগণের মধ্যে সিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাংওটাং ও গিবন জাতীয় বানরের আকার-প্রকার কতকটা মানুষের মত। ইহারা সকলেই উচ্চ শ্রেণীর বানর। বিজ্ঞানের ভাষায় ইহাদের এনথ্রোপইড এপস্ (Anthropoid apes) নর-বানর অর্থাৎ কিয়ৎ পরিমাণে নরাকারবিশিষ্ট বানর বলা হয়। এই সকল নর-বানরের মধ্যে গিবন ও ওরাং সকলকে হোর্ণিও, সুমাত্রা ও যাবা, গরিলা এবং গরিলা ও সিম্পাঞ্জিদিগকে আফ্রিকার জঙ্গলময় প্রদেশ সমূহে অন্যাপি দেখা যায়। মানবের সহিত সিম্পাঞ্জি ও গরিলার অধিক সৌসাদৃশ্য থাকায় ডারউইন অনুমান করিয়াছিলেন যে মানবের প্রথম উৎপত্তি সম্ভবতঃ আফ্রিকা মহাদেশেই হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে রোডেসিয়া ও পিল্টডাউন নামক স্থানে ৪০।৫০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বকার প্লাইওসিন স্তরে যে সকল প্রাণীর প্রস্তরীভূত অস্থিপঞ্জর পাওয়া গিয়াছে, বৈজ্ঞানিকগণ সেই সকল প্রাণীকে রোডেসিয়ান (Rhodesian) ও পিল্টডাউন (Piltdown) মানব বলিয়া নামকরণ করিয়াছেন। জর্ম্মণির অন্তর্গত হিডেলবার্গ নামক প্রদেশে, হিমালয়ের, ক্রান্স, ইতালি, ঘুগাণ্ডা প্রভিন্স, দক্ষিণ ফ্রান্সিয়া, প্যালেষ্টাইন, ও চীনদেশে ৩০।৪০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বকার প্লাইষ্টোসিন স্তরে যে সকল প্রস্তরীভূত অস্থি কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে তাহাদের নিয়ান্ডারথাল মানব আখ্যা দিয়াছেন। বৃত্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সেই সকল অস্থিপঞ্জর পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে উহা পূর্ব্বোক্ত নর-বানর (Anthropoid apes) জাতীয় প্রাণী অপেক্ষা কোন উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীর কঙ্কাল। ঐ সকল প্রাণী মানুষের ন্যায় সোজা হইয়া পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিত এবং হস্ত দ্বারা কোন কোন কার্য্য করিতে পারিত; কিন্তু মানুষের মত কথা কহিতে পারিত না। বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইহাদিগকে পিথেকানথ্রোপস (Pethecanthropus) মানব-নর অর্থাৎ বানরাকৃতি নর বলা হয়। এই সকল অস্থিপঞ্জর যে সকল প্রাণীর, তাহাদের কাহাকেও এক্ষণে জীবিত দেখা যায় না। বহু কাল হইতে তাহাদের বংশ লোপ পাইয়াছে এবং তাহাদের পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান মানবের আবির্ভাব হইয়াছে। মানবের আবির্ভাব সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীর কোন্ স্থানে হইয়াছিল তদ্বিষয়ে বৃত্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিস্তর গবেষণা করিতেছেন; এখনও পাকা রকম কিছুই স্থির হয় নাই।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে হিমালয় উত্তর সিবালিক পর্ব্বত-শ্রেণীর মাইওসিন যুগের (অর্থাৎ প্রায় এক কোটী বৎসর পূর্ব্বেকার) ভূমধ্যস্থ বৃত্তিকা স্তরে যুগান্তরীয় বৃহদাকার বানর জাতীয় প্রাণীর অস্থিপঞ্জর পাওয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় এই সকল প্রাণীকে ড্রাইওপিথেকস্ (Dryopethecus) বলা হয়। এই ড্রাইওপিথেকস্ বানর জাতিই বর্ত্তমান হনুমান,

ডাগবান প্রভৃতি নানাবিধ নানুষ বিশিষ্ট বানর এবং গিবন, ওরাং, গরিলা ও সিম্পাঞ্জি প্রভৃতি নর-বানরদিগেরও অতীত যুগের ধ্বংস প্রাপ্ত পিটেকাউন মানব, রোডেসিয়ান মানব, পিকিং মানব, নিয়াণ্ডারথাল মানব প্রভৃতির এবং বর্ত্তমান মানব জাতির অর্থাৎ আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ। পৃথিবীর প্লাইওসিন যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী অলিগোসিন যুগে অর্থাৎ এক কোটী ৫০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে চলুবান, জাভাবান প্রভৃতি নানা জাতীয় বানর এবং গরিলা, সিম্পাঞ্জি প্রভৃতি নর-বানর দিবালোক প্রবেশ হইতে পূর্ব্ব দিকে সুমাত্রা, বোর্ণিও, ও যাবা পর্য্যন্ত এবং পশ্চিম দিকে পারস্য ও আরবের ভিতর দিয়া স্পেন, ফ্রান্স, ও আফ্রিকা পর্য্যন্ত যাইয়া বসবাস করিয়াছিল। তৎকালে ভূমধ্যসাগরের উৎপত্তি না হওয়ায় ইয়োরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকা এক বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড ছিল ; সুতরাং ঐ সকল প্রাণীগণের পক্ষে তাহাদের আদি বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া সুদূরদেশে ছড়াইয়া পড়া অসম্ভব ছিল না।

ডাক্তার প্রাবো এবং ডাক্তার ডেবিড্‌সন বলেন, মাইওসিন যুগে ভারতবর্ষের উত্তরে সমুদ্র গর্ভ হইতে হিমালয় পর্ব্বত উত্থিত হওয়ায় তৎপ্রদেশের জলবায়ু ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্যক পরিবর্ত্তন বশতঃ কোন এক শ্রেণীর নর-বানর (Anthropoid apes) তৎকালীন নূতন অবস্থার সহিত নিজদের খাপ খাওয়াইতে চেষ্টা করিবার ফলে মানবাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। অধ্যাপক ডি. এলিয়টস্মিথও ঐ মতের পোষকতা করেন। তিনি তাঁহার "Search for man's ancestor" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষের সিবালিক নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে মাইওসিন যুগে যে সকল বৃহদাকার বানর বাস করিত তাহারা তুর্কিস্থান পর্য্যন্ত উত্তেজক-বিহীনভাবে পরিভ্রমণ করিত, ইহার বিশেষ প্রমাণ না পাইলেও ইহা অসম্ভব নয়, কারণ, তৎকালে উত্তর-ভারত ও তাহার উপত্যকার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে প্রাকৃতিক বা জল বায়ুর পার্থক্যজনক কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। তৎকালে হিমালয় পর্ব্বত সমুদ্র-গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া এই দুই দেশকে পৃথক করিয়া দেয় নাই। মাইওসিন যুগে যখন হিমালয় পর্ব্বত উত্থিত হইয়া সিবালিক প্রদেশকে টীবেটের সিকিয়াং প্রদেশ হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছিল, তখন তথায় ড্রাইওপিথেকস্ বানর জাতি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। যাহারা সিবালিক প্রদেশে রহিয়া গেল তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে প্রকার জলবায়ু উপভোগ ও প্রাকৃতিক অবস্থায় বসবাস করিতে অভ্যস্ত ছিল এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশজাত যে সকল ডিম্ব ও ফলমূলাদি আহার করিত, তাহার কোন পরিবর্ত্তন না হওয়ায় তাহাদের অভ্যাস ও শারীরিক গঠন পরিবর্ত্তিত হইবার কোন কারণ হয় নাই, তাহারা যে বানর সেই বানরই রহিয়া গেল। তাহারা ভারতবর্ষের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকস্থ প্রদেশ সমূহে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। তাহাদের মধ্যে ওরাং ও গিবন জাতীয় বানরেরা পূর্ব্ব দিকে বোর্ণিও দ্বীপ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল। সিম্পাঞ্জি ও গরিলার পূর্ব্বপুরুষ বানরগণ পশ্চিমে আফ্রিকা এবং ইয়োরোপ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল। যে সকল ড্রাইওপিথেকস্ বানর জাতি হিমালয় পর্ব্বতের উপরে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সিকিয়াং প্রদেশে রহিয়া গেল, তাহারা শীত-প্রধান প্রদেশে আটকাইয়া যাওয়ায়, তাহাদিগকে জীবন রক্ষার্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার জল বায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের বিপক্ষে কঠিন সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। তাহার ফলে তাহাদের শারীরিক গঠন ও অভ্যাস তদানীন্তন অবস্থায় উপযোগী হইবার মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল।

অনেক বৃহদ্বিৎ পণ্ডিত অনুমান করেন যে, মাইওসিন যুগে হিমালয় পর্ব্বতের হঠাৎ অভ্যুত্থানে ভারতবর্ষের উত্তর খণ্ডের অধিবাসী এক দল আদিবানর এমন অবস্থায় পতিত হইয়াছিল যে, তৎকালীন পরিবর্ত্তিত প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত নিজদের খাপ খাওয়াইতে না পারায়, বৈসর্গিক নিয়মানুসারে হয় তাহাদের ধ্বংস প্রাপ্তি হইয়াছিল, অথবা তাহারা বাধ্য হইয়া তৎকালীন পরিবর্ত্তিত প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য ঘটাইয়া আপনাদিগকে সেই অবস্থায় উপযোগী করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল। তাঁহারা অনুমান করেন যে শেষোক্ত ঘটনাই ঘটিয়াছিল এবং তদ্বারা ড্রাইওপিথেকস্ আদি বানর সকল প্রথমে পিটেকাউন, রোডেসিয়ান, পিকিন বানর প্রভৃতি বানর-নরে পরে রূপান্তরিত উচ্চ শ্রেণীর বানর নর নিয়াণ্ডারথাল মানবে পরিণত হইয়াছিল। তাহারা প্রাচীন মহাদ্বীপের ইওরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি নানা প্রদেশে এক এক দলপতির অধীনে দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিত, পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ করিত, বন্য ফলমূল, কুক্কুর কচি পাতা ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া নদীতীরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য ধরিয়া ও ক্ষুদ্র জন্তু হত্যা করিয়া তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিত ও জঙ্গলময় পার্ব্বত্য বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া সমতলভূমিতে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। যে প্রকার বৈসর্গিক কারণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পড়িয়া কোন এক শ্রেণীর নর-বানর বানর-নরে পরিণত হইয়াছিল, সেই প্রকার কোন কারণে পৃথিবীর কোন এক স্থানে মাইওসিন যুগের শেষ ও প্লাইওসিন যুগের প্রথম এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সুদীর্ঘ কাল মধ্যে কোন এক শ্রেণীর নর-বানর প্রকৃত মানবে (true man) পরিণত হইয়াছিল এবং কথা কহিতে সমর্থ হইয়াছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। পৌরাণিক কাহিনী রামায়ণ গ্রন্থে যে বানর ও রাক্ষসের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে অনুমান করা যায়, দক্ষিণ ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে বানর ও অরণ্যবাসী বন্য মানবের বসবাস ছিল। বানরগণের সহিত তাহাদের সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া তৎসাময়িক লোকেরা রাক্ষসগণ অর্থাৎ বন্য মানবগণ ও বানরগণকে পরস্পরের কুটুম্ব মনে করিত। বোধ হয় মহাকবি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা কালে এইরূপ কিম্বদন্তির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার কল্পনার স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে ২০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বকার পৃথিবীর প্লাইওসিন যুগের স্তরে যে সকল পিটেকাউন ও নিয়াণ্ডারথাল মানব প্রভৃতি যে সকল বানর-নর জীবিত ছিল, তাহাদের বংশধরগণ এখন কোথায়? এখন তাহাদের কুত্রাপি দেখা যায় না কেন? ইহার উত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করিয়া নিজকে গড়িয়া তুলিতে না পারা ইত্যাদি যে সকল বৈসর্গিক কারণে বৃহদাকার ম্যামথ প্রভৃতি যুগান্তরীয় প্রাণী সকলের

অস্তিত্ব লোপ হইয়াছিল, বর্ত্তমান কালে অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি অসভ্যদের বর্ব্বর আদিম অধিবাসিগণের তাহাদের অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর মানব শ্বেতাঙ্গদিগের প্রাদুর্ভাবে যে ভাবে ধ্বংস সাধন হইতেছে, সেই সকল নৈসর্গিক কারণে এবং তাহাদের অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর জীব প্রকৃত মানবের আবির্ভাবে নিয়াণ্ডারথাল প্রভৃতি নর-বানরগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহাদের অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর মানব তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। কেহ কেহ প্রশ্ন করেন মানবের মানবত্ব প্রাপ্ত হইতে কত দিন লাগিয়াছিল। ইহার উত্তর হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে প্রশ্নকর্ত্তার মন হইতে সময় সম্বন্ধে তাঁহার অত্যন্ত ধারণা বদলাইতে হইবে। এই প্রকার ক্রম বিকাশ কত লক্ষ বা কত সহস্র বৎসরে হইয়াছিল মনে করিলে ঐ প্রশ্ন করিবার আর আবশ্যক বোধ হইবে না।

অধ্যাপক এলিয়ট স্মিথ যদিও উপরিউক্ত মীমাংসা সকল মানবতত্ত্ববিৎগণের কল্পনা-প্রসূত হইলেও, মানব জাতির আদি জন্মস্থান সম্বন্ধে যে কতকগুলি নির্দ্দেশ পাওয়া যায়, তাহাতে হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরে সিংকিয়াং প্রদেশে আমাদের পূর্ব্বপুরুষের বানরত্ব হইতে মানবত্ব প্রাপ্তির প্রথম সোপান রচিত হইয়াছিল এরূপ সিদ্ধান্ত কথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

ভাঙা পাথরের বাটি

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

একরাশ এঁটো বাসনের মাঝে একলা পা-দুটি মেলে,
খিড়কির ঘাটে নতুন বৌটি নয়নের জল ফেলে।
বাসনের ভার সাম্‌লানো দায়, নামিতে পিছল ঘাটে,
পাথর বাটিটি প'ড়ে ভেঙে গেছে ঠেকিয়া তালের কাঠে।
দশ পয়সায় পাথর বাটিটি বয়সে জীর্ণ এবে,
তায় কোণ ভাঙা,—তুচ্ছ জিনিস একটু দেখিলে ভেবে।

দুইটি টুকরা জোড়া দিয়ে বধূ অঞ্জলিপুটে ধরি',
বাপ্‌সা চক্ষে চেয়ে আছে আহা মুখখানি নত করি'।
হেরিছে অভাগী জমা-লাঞ্ছনা বাটির মুকুর-পুটে,
অন্ন খাবার বাটিটি ক্রমেই লোণা জলে ভ'রে উঠে।

ভাবে বসে হায়, লাগে না কি জোড়া কোন মন্ত্রের বলে?
কোন' গুণী এসে সহসা যদি বা জুড়ে দেয় কৌশলে।
শ্বশুর বাড়ীতে আসিবার আগে কেন নয়নিক দিথে,
কি দিয়ে জুড়িলে জোড়া যায় ভাঙা পাথরের বাটিটিকে।
দেবতায় ডাকে অভ্যাস্ বশে,—দেবতা বাঁচাবে যেন।
বাটিটা ভাঙিল, পড়িয়া তাহার মাথা ভাঙিল না কেন।
বড় অভিমানে দেবতার পানে চেয়ে অভাগিনী কাঁদে,
'বল ভগবান হাত কেঁপে গেল কোন্ গূঢ় অপরাধে?'

একবার ভাবে, নতুন একটি কিনে এনে এর মত
কোণা ভেঙে যদি চালানো যাইত, তা হলে কেমন হ'ত?
কোথায় পয়সা? কে বা দিবে এনে? কোথায় মিলিবে বাটি?
সময়ই বা কই? সকলি স্বপ্ন ভাঙাটাই শুধু খাঁটি।
পুকুরের জলে ডুবিয়া মরিতে কেমন লাগে যে ভয়,
একবার ভাবে—বাপের বাড়ীতে পালালে কেমন হয়?
কোন্ পথে যাবে? কারে সাথে পাবে? না—না তা' অসম্ভব।
ভাঙা বাটি ঘেরি ভাবনা-জনতা তুলে নানা কলরব।

হাঁসগুলি ঘেঁষে ঘাটপানে আসে ঘনাইয়া মমতায়,
পাখীরা নীরব—বাঁশ-বনে বেজি করুণ নয়নে চায়।
ভুলো লেজ নেড়ে জানায় বেদনা, জিভ ঝুলে পড়ে তার,
থমথম করে দুপুর বেলার খিড়কি পুকুর ধার।
ফুলের গরবে মাথা-উঁচু ক'রে ছিল যে কল্‌মী-লতা,
মুষড়িয়া পড়ি ঝলসিয়া সেও জানায় মমতা ব্যথা।

সবাই ব্যথিত মা বলিয়া বালা ডাকে ঘরে ফিরি ঘুরি'
সেই শুধু তার হৃদয় চিরিতে শানায় রসনা-ছুরি।
পাথরের বাটি ভেঙে যায়, যদি বধূর চরণ টলে,
পাথরের হৃদি ভাঙে না গলে না বধূর নয়ন-জলে।

"—শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে—"

শ্রীরাধারাণী দেবী

নহবত্ বড় করুণ সুরে বাজছে।—

অন্তরের নিতল প্রদেশ আলোড়িত করে' ভাষাতীত এক উদাস-গভীর বেদনা জেগে উঠছে তার কাতর-কোমল তানে।···যেন আজ এখানে কে নেই—যেন কা'কে অনেক চেয়েও পাওয়া যায়নি,—যেন সবার চেয়ে প্রাণ যাকে চায় সে আজ আসেনি।···অভিমানে বুঝি কে চিরদিনের তরে চলে গেছে!·· তারই নিবিড়-বিরহ-ব্যথা আজ সমস্ত আকাশ বাতাসকে অশ্রুভারাতুর করে' সানাইয়ের সুরধারায় কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে পড়ছে!···বাঁশী যেন বলতে চায় তার আকুল কান্নাভরা মিনতির সুরে,—ওগো, সে কোথায়?—তাকে নিয়ে এসো – নিয়ে এসো! যে-বিহনে এই উৎসব-আয়োজন, এই ফুলের গন্ধ, বাঁশীর তান, হাসির প্রবাহ সবই ব্যর্থ—সবই মিথ্যা!

বিয়ে বাড়ী।

চারতলার প্রকাণ্ড ছাদ জুড়ে হোগ্‌লার ম্যারাপ্ বাঁধা হয়েছে। তার নীচে একধারে মিষ্টান্নের ভিয়ান্ বসেছে। ঘৃত ও ছানা-ক্ষীরের সুগন্ধে ম্যারাপের নীচেটা আচ্ছন্ন।

গোলাপী রংয়ের ধুতি ও বাসন্তী রংয়ের উত্তরীয়ধারী ভৃত্যবর্গ নানা কাজের ভীড়ে অত্যন্ত ত্রস্ত-ব্যস্তভাবে হাজারবার উপর-নীচে ওঠানামা ছুটাছুটী করে' হাঁপিয়ে পড়ছে।

ঝিয়েরা গলায় সোণার হেলেহার বাহুতে সোণার তাগা এবং রংকরা কাপড় পরে কেউবা তীক্ষ্ণ কণ্ঠের তীব্রোচ্চ ধ্বনিতে সারা বাড়ী সরগরম করছে, কেউবা বড় বড় শীল পেতে সম্মুখে বাঁটনা বাঁটতে বসে গেছে।

বৈঠকখানায় কর্ত্তাবাবু তাঁর ছোট ভায়েদের এবং উপযুক্ত ছেলে ও জামাইদের নিয়ে ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে ফুলশয্যার তত্ত্বের ফর্দ্দ প্রস্তুত করাচ্ছেন আলবোলায় সুদীর্ঘ নল মুখে দিয়ে।

বা'র বাড়ীর অন্য একখানি ঘরে তরুণ যুবাদের মজলিশ্ বসেছে। ধূমায়মান গরম চায়ের পেয়ালা ও সিগারেট বিড়ির ধোঁয়ায় চলচ্চিত্রের রাজধানী 'হলিউডে'র 'ষ্টার' অভিনেত্রীদের সৌন্দর্য্য ও অভিনয়-নৈপুণ্যের সমালোচনা-প্রসঙ্গ সেখানে বেশ জমাট্ বেঁধে উঠেছে।

উপরে দোতলার এক মহলে বর্ষীয়সী নারীরা স্তূপীকৃত কাঁচা আনাজের পাহাড় নিয়ে কুটনো কুটতে বসে গেছেন। প্রকাণ্ড দালানখানি জুড়ে বঁটী পড়ে গেছে প্রায় খান-কুড়ি-বাইশ! কে কতো বড় বড় কুমড়ো বাগিয়ে ধ'রে বেগুণের মতো অনায়াসে দু'ফালা করে ফেলতে পারে তাই নিয়ে বেধে গেছে বিরাট বিতর্ক!

অন্য মহলে কিশোরী ও তরুণীদের ভীড়। বরপক্ষীয়ের প্রেরিত গায়েহলুদের তত্ত্বের উপহার সম্ভারে বড় বড় দু'খানি ঘর পূর্ণ হ'য়ে গেছে। ঝক্‌ঝকে রূপার বাসন, রূপার প্রসাধন-সামগ্রী, রূপার খেলনা হ'তে সুরু করে'—বেণারসী, কাশ্মিরী, সুরাটী, মারাঠী, গুজরাটী, ম্যাঙ্গালোরী, মুর্শিদাবাদী, ঢাকাই প্রভৃতি নানা দেশের নানা ডিজাইনের বিচিত্র শাড়ী, ব্লাউজ, একাধিক ট্রে ভর্ত্তি সুরভি প্রসাধন-সামগ্রী, নানারকম সৌখীন প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য,—খেলনা-পুতুল, মিষ্টান্ন, ফলমূল ইত্যাদিতে ঘরের মেঝেতে পা রাখবার স্থান নেই।

একটি ষোড়শী তন্বী মরালের মতো শুভ্র সরু ঘাড়ের উপরে কালোচুলের প্রকাণ্ড এলো খোঁপা বেঁধে, ছোট্ট মাথাটি নেড়ে নেড়ে হাতের লম্বা কাগজের লিষ্টের সাথে নম্বর-আঁটা ট্রেগুলির দ্রব্যসামগ্রী মিলিয়ে নিচ্ছে। ঝক্‌ঝকে সোণালী মুগার ডুরে শাড়ীখানি তার সর্ব্বাঙ্গে জড়ানো। আঁচলটা শক্ত করে কোমরে আঁটা।

বছর সাতাশ-আটাশ বয়সের একটি হৃষ্টপুষ্টা যুবতী, গায়ে আঁট্‌সাঁট্ চিকণের সেমিজ, পরনে রেশমীপাড় শান্তিপুরে শাড়ী। প্রকোষ্ঠের ঝক্‌ঝকে পালিশ করা তাটিয়া প্যাটার্ণের সরু সোণার চুড়ীর গোছায় মধুর

ঝণৎকার-ধ্বনি তুলে সমস্ত ট্রের জিনিষগুলি নেড়েচেড়ে একটির পর একটি নাম বলে বলে ফর্দ্দ মেলানোর সাহায্য করছে।

খদ্দরের শাড়ী এবং খদ্দরেরই এমব্রয়ডারীদার খাটো-ব্লাউজ-পরা শ্যামবর্ণা একটি মেয়ে ফর্দ্দের সাথে মেলানো ট্রেগুলি একদিকে সরিয়ে রেখে, না মেলানো ট্রেগুলি অন্যদিক থেকে এনে এগিয়ে ধরছে।—

অওন্তি সধবা ও কুমারী বধূ ও কন্যা মুখে উৎফুল্ল হাসি, সোৎসাহ-কলগুঞ্জন, দু'চোখে উৎসবের আনন্দ কণ্ঠে ভরে নিয়ে সেখানে প্রত্যেকটি জিনিষ নেড়েচেড়ে লক্ষ্য ক'রে দেখছে।

তা'দের বিচিত্র শাড়ীর বাহার, সুগন্ধি এসেন্সের সুরভি ও অলঙ্কারের ঝিকিমিকি, স্থানটিকে উজ্জ্বল মাধুর্য্যময় ও চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। লুব্ধ পুরুষ আত্মীয়েরা অনেকেই কারণে ও অকারণে একএকবার এসে সেখানে উঁকি মেরে যাচ্ছেন।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দেখেশুনে রঙীণ প্রজাপতিরই মতো লঘু চকল পদে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা'দের আনন্দ-প্রদীপ্ত মুখে একটা বিপুল উৎসাহের উত্তেজনা। অকারণ সিঁড়ি ওঠানামায় যেন আর তা'দের বিরাম নেই।

তেতালাটি অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন।

একটি ঘরে অল্প মাসকয়েক মাত্র বিবাহিত এক নবদম্পতী এই গণ্ডগোল ভীড়ের অবকাশে সুযোগমত চুপি চুপি মিলিত হয়েছে।

তরুণীটি তা'র প্রিয়ের বক্তব্য সত্বর-সমাপন ক'রতে তাড়া দিচ্ছিল, কারণ, কেউ জানতে পারলে তাকে নাকি ভয়ঙ্কর লজ্জায় প'ড়তে হবে। ত্রস্তা প্রিয়ার কোমল হাত দু'খানি দৃঢ়মুষ্ঠিতে চেপে তরুণ যুবা কেবলই অভয় দিচ্ছে এবং তার বক্তব্যের বাকীটুকু—যা' হয়তো সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত্রি ধ'রে বললেও তার বলা শেষ হবেনা, সেই চির-অসম্পূর্ণ বাণীর শেষটুকু শুনে যাওয়ার জন্য ঐকান্তিক অনুনয় করছে।

তা'দের অধরপুটে সলজ্জ ও সানন্দ মধুর হাসির রেখা! আঁখিতলে অতলগভীর স্নিগ্ধ আবেশ! রসনার চেয়ে চাহনিই তাদের অধিকতর মুখর। কথার অপেক্ষা হাসির ভাষাই যেন তাদের বেশী সুস্পষ্ট।

তেতালার আর একখানি ঘরে স্কুলের ছাত্রছাত্রী জন চার পাঁচ ছেলেমেয়ে মিলে একজোড়া তাস সংগ্রহ করে নিরিবিলি আসর জমিয়ে বসেছে। তারই অনতিদূরে কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে একখানি মস্ত 'ক্যারমবোর্ড্' পেতে একান্ত মনোযোগে লক্ষ্যভেদে ব্যস্ত।

তেতালার সিঁড়ির ঘরের পাশের দিকে করোগেট্ টীন ছাওয়া রৌদ্রতপ্ত একটি ছোট কুঠুরীর অতি নির্জ্জন একটি কোণে দু'টি বছর চৌদ্দ-পনেরো বয়সের কুমারী মেয়ে কোথা হতে একখানি তাদের পাঠনিষিদ্ধ বই সংগ্রহ করে অতি সন্তোপনে পরস্পর পরস্পরের কাঁধে কাঁধ মাথায় মাথা ঠেকিয়ে পাশাপাশি বসে, একান্ত নিবিষ্টচিত্তে রুদ্ধশ্বাসে পাঠ করছে।

একজনের পিঠে এক ঝালক বৈশাখী রৌদ্র এসে পড়েছে, সে দাহে তার খেয়ালও নেই।

বইখানি তা'রা কোন্ এক বৌদিদির বেয়ারের খোলা-ড্রয়ার হ'তে অভাবিত রূপে হঠাৎ আবিষ্কার করে' কেলে'—পড়বার লোভ সম্বরণ করতে না পারায় চুরি করে' নিয়ে এই নিরিবিলি কোণে দু'জনে পালিয়ে এসেছে। যথাসম্ভব শীঘ্র পড়া শেষ করে আবার যথাস্থানে চুপি চুপি রেখে দিয়ে আসতে হবে।

তা'দের চ'খে মুখে একটা বিপুল কৌতূহল এবং গোপন রহস্য-আবিষ্কারের বিস্ময়মায়া স্পষ্ট ঘনিয়ে উঠেছে।

বয়স্কা গৃহিণীরা একতলা ও দোতলার চারিদিক ঘুরে ঘুরে তদারক করে বেড়াচ্ছেন এবং কাজকর্ম্মের নির্দ্দেশ ক'রছেন।

দোতলার একখানি ঘরে ইলেক্‌ট্রীক্ পাখা ঘুরছে, তার তলায় ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে একটি তরুণী কিশোরী। পরণে লাল জেপের পাতলা বেনারসী শাড়ী, কপালে চন্দনের পত্রলেখা, পায়ের তলা দু'টি আলতায় টুক্‌টুকে রাঙা। গলায় বেলফুলের প্রকাণ্ড গোড়ে মালা হাঁটুর 'পরে লুটিয়ে এসেছে,—সর্ব্বাঙ্গে পালিশ-উজ্জ্বল নতুন সোণার গহনা, হাতের মুঠিতে সোণার ছোট্ট কাঞ্চনলতা!

তাকে ঘিরে তার সমবয়সী অনেকগুলি মেয়ে উচ্ছল হাসি ও রহস্যালাপের আবর্ত্ত রচনা করেছে।

মেয়েটির চ'খে মুখে একটি অতি মধুর আনন্দ স্নিগ্ধ লজ্জার ছায়া লেগে আছে। চাহনির তলে যেন একটি

অপূর্ব্ব স্বপ্নমায়া ঘনিয়ে নেমেছে। তার চলাফেরা নড়া-চড়ায় এমন একটি মধুর লালিত্য ও সুকোমল ভঙ্গী এবং সর্ব্বাঙ্গে এমন একটি সুকুমার শ্রী ফুটে উঠ্‌ছে যে, যা'রা প্রতিদিন তা'কে সদাসর্ব্বদা চ'খের সামনে দেখেও চেয়ে দেখ্‌বার আবশ্যকতা অনুভব করেনি, তা'রাও আজ বারে-বারে আনন্দ-বিস্ময়ভরা দৃষ্টি তুলে তা'র পানে তাকিয়ে দেখ্‌ছে! যেন তা'কে আজই এই প্রথম দেখতে পেল তা'রা।

দেউড়ীর নহবতে ভোর থেকে ভৈরবী রামকেলী আশোয়ারী তোড়ী ভীমপলশ্রী একের পর একে বিচিত্র মূর্চ্ছনায় বেজে চলেছে।

নহবত বড় করুণ সুরে বাজ্‌ছে।

অন্তরের নিভৃতপ্রদেশ আলোড়িত করে' ভাষাতীত এক উদাস-গভীর বেদনা জেগে উঠ্‌ছে তার কাতর-কোমল তানে!···যেন আজ এখানে কে নেই—যেন কা'কে অনেক চেয়েও পাওয়া যায়নি,—যেন সবার চেয়ে প্রাণ যা'কে চায় সে আজ আসেনি!···অভিমানে বুঝি কে চিরদিনের তরে চলে গেছে!···তারই নিবিড় বিরহ-ব্যথা আজ সমস্ত আকাশ-বাতাসকে অশ্রু-ভারাতুর করে' সানাইয়ের সুর-ধারায় কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে পড়্‌ছে!···ওগো সে কোথায়? —তা'কে নিয়ে এসো—নিয়ে এসো! যে-বিহনে এই উৎসব-আয়োজন, এই ফুলের গন্ধ বাঁশীর তান হাসির প্রবাহ সবই ব্যর্থ—সবই মিথ্যা।

উৎসব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখবার জন্য যে তরুণী মেয়েটি উৎসবের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দকে প্রাণপণে এড়িয়ে চলছিল, সে বিধবা।

তার চারিদিক ঘেঁষে করে' উৎসবের এই ঘূর্ণীপাক কিন্তু বারম্বার তার দৃষ্টি ও মনকে সেদিকে আকৃষ্ট করছিল।

অল্প বয়সে বিবাহিতা হ'য়ে বৎসরের মধ্যেই তার সাংসারিক জীবনের দেনা-পাওনার প্রাপ্তির হিসাবটা একেবারেই চুকে গেছে দেনার দিকটাকেই দীর্ঘতর করে দিয়ে।

তার নিজের জীবন সম্বন্ধে এতবড় ব্যাপারটা যখন নিঃশেষে চুকে গিয়েছিল, তখন তার অপরিণত বালিকাচিত্ত কেবলমাত্র একটা নূতনত্বের বিস্ময় ছাড়া অন্য কিছুই উপলব্ধি করতে পারেনি। অবশ্য তা'র নিজ-জীবনধারা গ্রহণ সম্বন্ধে তার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা বা মতামতের মূল্য কোনও দিন কিছু ছিল না এবং আজও তা নেই!

মেয়েটির গায়ের রং উজ্জ্বল-শ্যাম। ঐ রংয়ে মত্ততা নেই বা তীব্রতা নেই, আছে স্নিগ্ধ-শীতল সুষমা।

নববর্ষার চৌয়ায় প্রান্তরের সবুজ দূর্ব্বার যে সিক্ত-সৌন্দর্য্য, প্রথম আষাঢ়ের মেঘচ্ছায়াতলে বনানীর যে স্নিগ্ধ-গম্ভীর-রূপশ্রী, তারই আভাস যেন এই মেয়েটির শান্ত রূপের মাঝে মিশিয়ে রয়েছে।

ঘন কালো তার চুলের রাশি। ক্ষুদ্র ললাটখানি অবারিত করে' চুলগুলি সাধাসিধা ভাবে আঁচড়ানো এবং ঘাড়ের অল্প উঁচুতে নরম করে সহজ-হাত ফেরানো খোঁপা বাধা। খোলা কাণ দু'টির প্রান্তদেশে আঁচড়ানো চুলের প্রান্ত নেমে এসেছে নত হয়ে।

পরনে মেটে কালাপাড় শাড়ী। গায়ে ফিকে বাদামী রংয়ের ব্লাউজ। প্রকোষ্ঠে চারগাছি করে' চুরকাটা সোণার চুড়ী, গলায় সরু সোণার হার, কাণে দু'টি মুক্তার টাপ্‌।

ভাবহীন উদাস-মুখশ্রীতে আনন্দ কিম্বা নিরানন্দ কোনোটাই সুস্পষ্ট নয়। চোখ দু'টি যেন কোন্ বহু-দূর-পথের দিশাহারা তীর্থ-পথিক!

শিথিলপদে ততোধিক শিথিল মন নিয়ে চারতলা থেকে একতলা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অনির্দ্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে। তেতালার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নামছে যখন,—একদল তরুণী এসে তার গতিপথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বলল—

—কোথায় ছিলি ভাই সাবু? সারা বাড়ী তোকে খুঁজে মরছি আমরা।

বিধবা মেয়েটি সপ্রশ্ন চ'খে তাদের পানে তাকিয়ে থাকে।

—শোন্ ভাই সাবিত্রী, তোকে একটা কাজ করতে হবে। তুই ছাড়া আর কারুর দ্বারা এ কাজ হবে না।

সাবিত্রী বিস্মিতস্বরে বলে—কী?—

—আমাদের ভারী খিদে পেয়েছে। গোটাকতক টাট্‌কা গরম গরম লেডীকেনি সন্দেশ ঐ মেজ ঠাকুর্দা-বুড়োর কাছ থেকে আদায় করতে পারবি? সরকার-মশাই একলা যদি ভিয়ানের ভদারকে থাকতেন, তা'হলে ঠিক আদায় করে' আনতে পারতুম ভাই! মুস্কিল হয়েছে, জ্যাঠামশাই তাঁর হুতুমপ্যাঁচা মামাটিকে ওখানে দরোয়ান করে বসিয়ে রেখেছেন যে!—

চারতলার উপরে ভিয়ানের কাছে কারুর ঘেঁষ্‌বার জো' নেই। গৃহকর্ত্তার মেজমামাবাবু বেজায় কড়া ও রাশভারী লোক। রোমবহুল প্রকাণ্ড পর্ব্বতের মত দেহ নিয়ে ভিয়ানের সামনেই মোড়া পেতে বসে গুড়গুড়ি টানছেন। তা' ছাড়া পুরাণো সরকার মশায়ও ভিয়ানের 'চার্জ্জে' আছেন তাঁর সহকারীরূপে।

ভিয়ান্-ম্যানেজার মেজমামার নাত্‌নী সম্পর্কীয়া জনকতক তরুণী মধুর হাসি, মধুর বাক্য, মধুর আবদার প্রভৃতি অনেক কিছু আয়ুধ প্রয়োগ করেও নীরস গম্ভীর মেজমামার কাছ থেকে একটিও টাট্‌কা মিষ্টান্ন আদায় করতে না পেরে ক্ষুণ্ণমনে নেমে আসছিল। তাদেরই এবার সবাই মিলে সাবিত্রীকে সুপারিশ্ ধরলে।

সাবিত্রী কুণ্ঠিতভাবে বল্‌লে—আমাকে দেবেন কেন?

—হ্যাঁ দেবে, নিশ্চয় দেবে। আমাদের তাড়িয়ে দিলে ব'লে তোকে কি কখনও তাড়িয়ে দিতে পারে? তুই পাগল নাকি সাবু?

—যা' না ভাই! একবার গিয়েই দেখ্‌না! তারপর যদি না দেয়,—না-ই দেবে!

—ইস্! সাবুদি চাইলে দেবেনা বৈকি? মেজ ঠাকুর্দার ঘাড় দেবে। জ্যাঠামশাই যদি শোনেন, সাবুদি টাট্‌কা মিষ্টি চেয়ে পায়নি, তা'হলে রক্ষে রাখবেন কিনা!!

সাবিত্রীর দিদি শকুন্তলা এগিয়ে এসে সাবিত্রীর হাত ধরে বলে—যা'না সাবি! আমরা সবলে মিলে এত করে বল্‌ছি—

সাবিত্রী ম্লান হেসে চারতলার দিকে রওনা হয়।

ভিয়ানের কাছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সারাদিনই মৌমাছির মতো ঘুর্‌ঘুর্ করছে।

কোন্ মিষ্টিটা কেমন তৈরী হচ্ছে, আসলসন্দেশ উৎকৃষ্ট না দেলখোস্ সন্দেশ উৎকৃষ্ট, রসগোল্লার চেয়ে লেডীকেনি শ্রেষ্ঠ, বালুসাইয়ের চেয়ে দরবেশ অধিকতর সুস্বাদু কিনা, কে একসঙ্গে ক' গণ্ডা সন্দেশ বা লেডীকেনি অনায়াসেই উদরসাৎ করতে পারে,—এই সকল গবেষণা ও তর্কালোচনায় চারতলার ছাদ সরগরম।

সাবিত্রী এসে কুণ্ঠিতপদে মেজমামার মোড়ার কাছে দাঁড়ায়। গুড়গুড়ির কাঠের নলটা মুখ থেকে নামিয়ে গম্ভীরমুখে হাসির রেখা টেনে মেজমামা বলেন,—

—এই যে—সাবুদিদি যে! কী মনে করে?

সাবিত্রী একটু অপ্রতিভ হেসে সকুণ্ঠস্বরে বলে—কিছু মিষ্টি দরকার হয়েছে মেজঠাকুর্দা! এখন দেবার সুবিধা হবে কি?

—মিষ্টি চাই? তোমার নিজের চাই, না ঐ শুকু, লক্ষী, মেস্তি শালীদের জন্যে চাইতে এসেচ, সত্যি করে বলো তো দিদি?—

সাবিত্রীর উদ্দেশ্য যেন ধরে ফেলেছে এমনিতর অর্থপূর্ণ মৃদুহাস্য মেজঠাকুরদাদার মুখে চ'খে ফুটে ওঠে।

সরকারমশায় জোরে হেসে উঠে বলেন—যার জন্যেই হোক্, ছোট মা যখন নিজে দরবার করতে এসেছেন তার উপরে আর অন্য কোনও কথা চল্‌বে না মেজমামাবাবু! আপনি হুকুম দিয়ে দিন্।

সাবিত্রী কুণ্ঠিত নতমুখে নিরুত্তরে পায়ের আঙুল দিয়ে মেঝেতে দাগ টানতে থাকে।

মেজমামা বলেন—কত মিষ্টি চাই দিদি?—

সাবিত্রী আস্তে আস্তে বলে—সামান্য কিছু দিন্—

সরকারমশায় উচ্চহাস্যে বলে ওঠেন—আমরা যদি তোমার গুণে দু'টি সন্দেশ মাত্র দিই, তা'তে কি তোমার হবে না?

একটু ভেবে নিয়ে সাবিত্রী বলে—সবরকম মিষ্টি গোটা আষ্টেক ক'রে না হ'লে যে কুলুবেনা!—

মেজমামা হাঃ হাঃ শব্দে হেসে উঠে বলেন—এত মিষ্টি তো তুমি একলা খেতে পারবেনা সাবুদি!

সাবিত্রী উত্তর দেয় না, সলজ্জ মৃদু হাসে মাত্র।

বামুনদের প্রতি হুকুম হয়ে যায়। তাদের মধ্যে একজন একখানি থালায় দু'রকম সন্দেশ, লেডীকেনি,

রসগোল্লা দরবেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন সাজিয়ে নিয়ে সাবিত্রীর সঙ্গে নীচের তলায় গিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে আসে।

উপস্থিতা তরুণীর দল সাবিত্রীর জয়ধ্বনি করে'—মিষ্টান্নের থালাখানি ঘিরে চক্রাকারে বসে।

সাবিত্রী নীরবে চলে যায়।

তাঁরা সাবিত্রীকে ডাকে,—চলে যাচ্ছিস্ কেন সাবু? আয়না, আমাদের সঙ্গে একটু খাবি।

সাবিত্রী ম্লানমুখে সংক্ষেপে মাথা নেড়ে বলে—না। তোমরা খাও।

মেয়েরা তবু তাকে সাধাসাধি করে।

সাবিত্রী বলে—মিষ্টি তো আমি খেতে পারিনে জানো।

সে চলে গেলে সবাই বলাবলি করে—সাবু যত বড় হচ্ছে, ততই দিনদিন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে! দেখেছিস্ ভাই? ওর সেই ছেলেবেলাকার ফুর্তি হাসি এখন যেন একেবারে মুছে গেছে।

সাবিত্রীর চেয়ে দু'বছরের বড় তার দিদি শকুন্তলা একটি চন্দনকাঠে কামড় দিতে দিতে বলে—হাজার হোক্, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নিজের অবস্থা তো বুঝতে পারছে দিন-দিন। তাই কেননা ওকে আইবুড়ো মেয়ের মতন গয়না কাপড় পরিয়ে রাখো আর আদর-যত্ন করো! মনটাতে যে ওর সুখ নেই সে তো বোঝাই যায়।

সাবিত্রী তখন একটু নিরিবিলিতে গিয়ে তার ক্লান্ত তনু এলিয়ে দেবার জন্য স্থান খোঁজে। সকাল থেকে সমস্তক্ষণই সে কাজে এবং বিনা কাজে, প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনে লক্ষ্যহীন ভাবে সারা বাড়ীময় ঘুরেঘুরে ও উপরে নীচের ওঠানামা করে বেড়িয়ে এখন হয়তো একটু শ্রান্ত বোধ করছে!

কোনও ভারী কাজ বা কঠিন কাজের ভার তাকে কেউ দেয়নি।

সে যেই প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধাদের সঙ্গে কুটনো কুটতে গেছে,—তাঁরা সকলেই সমস্বরে হাঁ হাঁ করে' উঠেছেন।

—না সাবু! তোকে এখানে বসে কুটনো কুটতে হবেনা। কেন? তোর সমবয়সী খেলুনীরা, তোর বৌদিরা দিদিরা সকলে যেখানে রয়েছে তুইও সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে হাসগে খেলগে। তোকে এখানে বসে কুটনো কুটতে দেখলে তোর জ্যাঠামশাইরা রক্ষে রাখবেননা।

সাবিত্রী একবার মৃদু আপত্তি জানিয়ে হেসে বলে—না পিসিমা, আমি যে কুটনো কুটতে ভালোবাসি!—

কিন্তু বর্ষীয়সীদের মহলে তার সে যুক্তি টেঁকেনা। উপরন্তু—'বাছারে—' 'আহা—' 'কোথায় আর সবাইকার সঙ্গে হেসেখেলে বেড়াবে—তা' যেমন পোড়া কপাল্—' ইত্যাদি হাহুতাশ ও অশ্রুপ্রায় শুষ্ক চক্ষু-মার্জনা পর্য্যন্ত সুরু হয়ে যায় দেখে সাবিত্রী সভয়ে সে-মহল থেকে সরে পালায়।

তাকে নিয়ে এই হাহুত শ, তাকে বড় আদর করার এই যে বিশেষতর সতর্কতা, তার দুর্ভাগ্যের প্রতি এই যে সকলের দয়ার্দ্র করুণা ও সহানুভূতি—এইটাই তার বর্ত্তমান জীবনের যেন অসহ্য-অপমান ও অসহনীয় বেদনার হেতু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তার দিন ও রাত্রিকে যেন অভিশপ্ত ক'রে তুলেছে!

ছোতলায় যেখানে গায়ে হলুদের তত্ত্ব সবাই দেখছে ও বর্দ্ধ মিসিয়ে নিয়ে তুলে রাখা হচ্ছে, সেখানে সে গিয়ে দাঁড়াতেই দম্‌কা বাতাসে দীপ নিবে যাওয়ার মতো একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত আলোচনা হঠাৎ যেন থেমে গেল।

সাবিত্রী স্পষ্ট লক্ষ্য করলে তা'র ন'বৌদিদি তাঁর বেল ফুলের মালা জড়ানো সদ্যেরচিত কবরীটির উপরে ব্রস্তে মাথায় কাপড় টাকা দিতে দিতে ব'লে উঠলেন—যাক্‌গে যাক্, যা' দিয়েছে, বেশই দিয়েছে। এ' নিয়ে এত তর্কাতর্কির কী আর আছে? নে, তোরা চট্‌পট্ সব তুলে ফেল্ দিকি! ঢের কাজ এখনও বাকী পড়ে আছে!—

ন'বৌদির চোখটিপে আলোচনা বন্ধ করার ইসারাটুকুও সাবিত্রীর দৃষ্টি এড়ায়নি। কারণ, তার নির্ব্বোধ জ্যাঠতুতো বোন রমা তখনও পাঁচ এয়োর ডালায় নিখুঁত্ সুন্দর উপহার সামগ্রীগুলির মূল্যাধিক্য ও সূক্ষ্ম সৌষ্ঠবতা সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসায় রসনাবেগ সংযত করতে পারেনি।

পাঁচ এয়োর ডালাতে সধবাদের জন্য বরপক্ষীয়েরা শুধু শাড়ী ব্লাউজ্ সেমিজ-রুমাল, টোয়ালে-গামছা, আয়না চিরুণী সিঁদুর, সুরভি তৈল, তরল আলতা, এসেন্স, পমেটম, ক্রীম্ স্নো ইত্যাদিই পাঠান্‌নি, প্রত্যেক ডালায় এক-একছড়া ক'রে বেল ফুলের বড় গোড়ে মালা, এক-একডিবা সোণালী

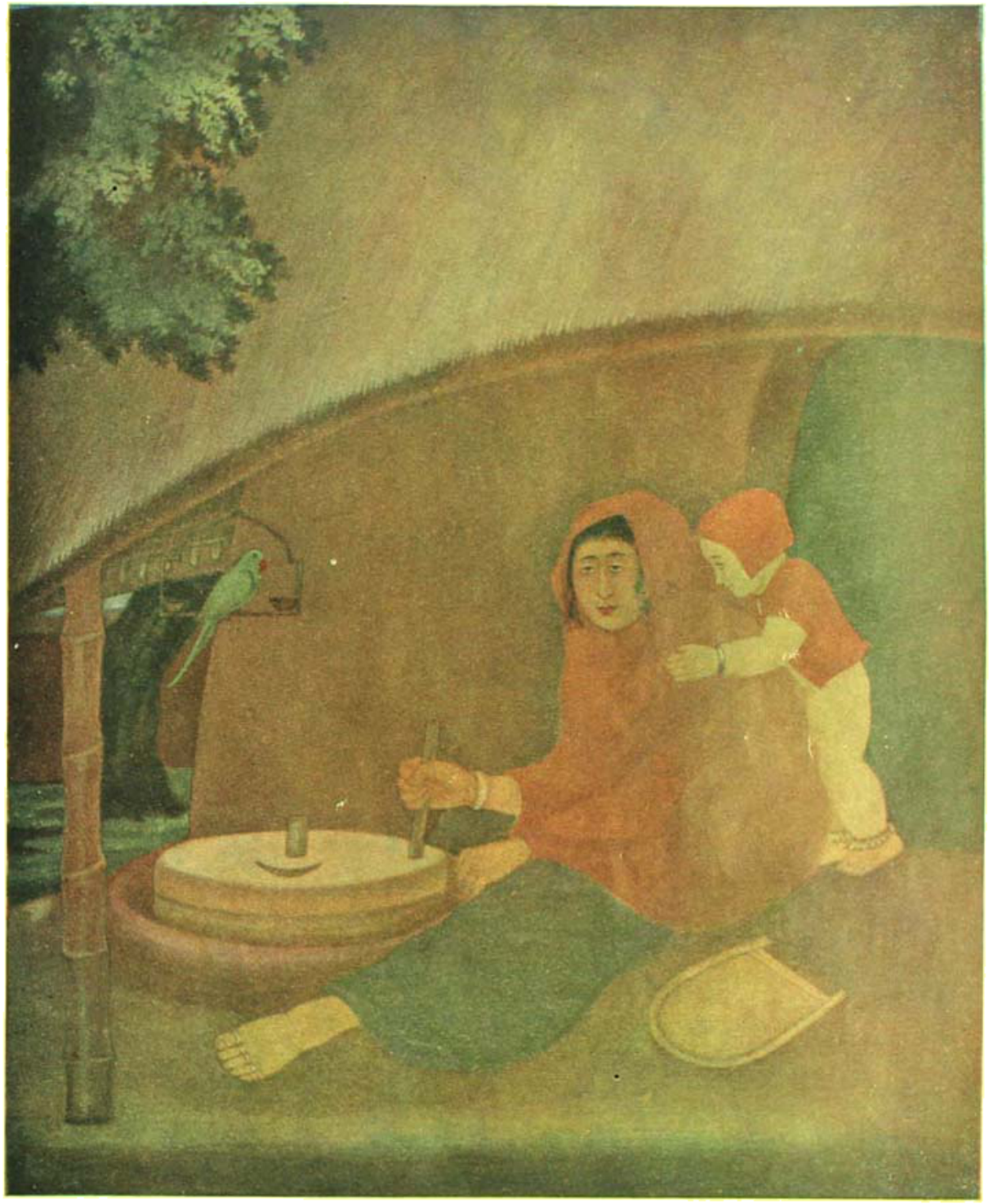

গৃহস্থালী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত নলিনী বসুমদার

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

তবক্ মোড়া সুবাসিত মিঠা পান,—এক রেকাবী ক'রে উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন দিয়ে জলখাবার পর্য্যন্ত সাজিয়ে পাঠিয়েছেন!

সেই পাঁচছড়া বেল ফুলের গোড়ে ছিঁড়ে আকারে ছোট ছোট করে প্রায় পনেরো কুড়িজন সবরা তরুণী তাদের খোঁপায় জড়িয়েছে। জলখাবারের রেকাবীগুলিও সকলে মিলে নিঃশেষিত করে তবক্-মোড়া মিঠা পান চিবাতে চিবাতে পানের রসে টুকটুকে রাঙা ঠোঁটে খুশী ও তৃপ্তির হাসি ফুটিয়ে সকলে তখন তাঁদের স্বামী-সোহাগের গর্ব্ব ও 'এয়োতি-সৌভাগ্যের সুখ-সুবিধার উচ্চ প্রশংসায় মুখর।

এমন সময়ে সাবিত্রী সেখানে এসে পড়ায় সকলেই তার মুখের দিকে তাকিয়ে বাক্যস্রোত রুদ্ধ করে। ছোট্ট একটু ক'রে সকরুণ নিঃশ্বাস ফেলে।

ন'বৌদি ডাকেন—ছোট-ঠাকুরঝি! এতক্ষণ কোথায় ছিলি ভাই? আয় না, রূপোর খেল্না-টেল্না, টয়লেটের রূপোর সামগ্রীগুলো সো-কেসের মধ্যে উঠিয়ে রাখ্। তোর বেয়াই ম'শায়ের কিন্তু ভাই নজর উঁচু আছে। সাবানদানীটি পর্য্যন্ত খাঁটী রূপোর গড়িয়ে দিয়েছে দেখেছিস্?—একটিও কিছু ইলেক্ট্রোপ্লেট্ নয়!—নে, এ'সব তো তোরই দেখেশুনে তুলবার গুছুবার কথা ভাই! তা' নয়, তুই কোথায় কাঁকে কাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্—"

তারপরে যে-মেয়েরা জিনিষপত্রগুলি তুলে কাঁচের আলমারীর মধ্যে সাজিয়ে রাখছিল, তা'দের ন'বৌদি অহেতুক তাড়া দিয়ে বলেন—তোরা সরদিকি বাপু! এই লক্ষ্মি! তুই এ'দিকে উঠে আয়। ও'গুলো সব ছোট্ ঠাকুরঝী তুলবে। ও' ঐ সমস্ত জিনিষ বেশ সুন্দর সাজাতে গোছাতে পারে।

সকলেই একবাক্যে বলে ওঠে—হাঁ, হাঁ, সাবিত্রীকেই ঐ কাজের ভার দেওয়া উচিত! তাদের প্রত্যেকের চ'খে সদয়-করুণা সুস্পষ্ট।

সাবিত্রী ম্লানহেসে বলে—না ভাই ন'বৌদি! আমি ও' পারবো না। আমায় মাপ করো।

তারপর সত্বর সেখান থেকে সরে যায়। তার অবস্থার প্রতি নির্ব্বিশেষ সকল মানুষের এই সাদুগ্রহ-অনুকম্পা তাকে যে কতো নিষ্ঠুর ভাবে পীড়িত করে এ'কথা তারা কেউ বোঝেনা।

গাত্রহরিদ্রার পর আলপনা আঁকা পিঁড়ির 'পরে কণে যে ঘরে বসে আছে সাবিত্রী সেই ঘরে প্রবেশ করে।

তার পরম স্নেহাস্পদা প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ।

সাবিত্রীর অন্তরে আজ সত্যই আনন্দ ও তৃপ্তির সীমা নেই। এই উৎসব তার কাছে কতো আনন্দের, কতো উৎসাহের সে কথা সে বাইরের মানুষকে বোঝাতে অক্ষম। —কিন্তু ঐ উৎসবে সে আনন্দিত হবে কী করে? প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেকেই যে তাকে তাদের অহেতুক সববেদনার ভারে সচেতন করে দিচ্ছে—এই উৎসবের মধ্যে আর সমস্ত মেয়ে হতে তার আসন বহুদূরে—পৃথক্। সে এই উৎসবের কেউ নয়; ঐ উৎসবে যে তার সহজ অধিকার নেই এ'কথা প্রত্যেকের অতি সতর্ক করুণাপূর্ণ ব্যবহারে সে বিশেষ করেই উপলব্ধি করতে পারছে।

সাবিত্রী ক'নে'র কাছে গিয়ে দেখে—সখীবেষ্টিতা শোভারাণীর কবরী-রচনার আয়োজন হচ্ছে! তারই সেজদিদি শকুন্তলা, জরী-কিতে কাঁটা চিরুণী গন্ধতৈল ইত্যাদি সরঞ্জাম নিয়ে কণে'র চুল বেঁধে দিতে বসেছে।

সাবিত্রী সেখানে গিয়ে একধারে বসে' কণে'র দিকে চেয়ে সস্মিত মুখে বলে—কাল এমন সময়ে আমাদের ছেড়ে শ্বশুরবাড়ী চলে যাবি শোভন?—

শোভারাণী লজ্জানত মুখে মৃদু হাসে।

শকুন্তলা শোভার চুলে চিরুণী চালনা করতে করতে বলে ওঠে—তুই সবাইকার চুল বেঁধে দিতে ভালোবাসিস্ সাবি,—দে'না তুই আজ তোর শোভনের চুল বেঁধে!—

সাবিত্রী সচকিত হয়ে উঠে ধীরে বলে—তুমিও তো চুল বেঁধে দিতে কম ভালোবাসোনা সেজ্‌দি—

—হ্যাঁ, আমিও চুল বেঁধে দিতে ভালোবাসি বটে! তা'হলেও, তুই-ই দে'না আজ ভাই! আমি উঠ্‌ছি—

শোভার সখীদের মধ্য হতে কে একটি নবঃবিবাহিতা কিশোরী মেয়ে বলে ওঠে—ও মা! তা' কি হয়? সাবিত্রী পিসিমা আজ আর কি ক'রে চুল বেঁধে দেবেন? গায়ে-হলুদের পর থেকে কণে'কে আর বিধবাদের ছুঁতে নেই যে!!

শকুন্তলা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সমস্ত মেয়েরা এমন কি কণে' শোভারাণী পর্য্যন্ত সকলে একসঙ্গে তর্জ্জন ক'রে—নির্দ্দোষ মেয়েটিকে ধমক্ দিয়ে উঠলো।

—কে বল্লে তোকে? ভারী গিন্নী হয়েছেন!! নে'নে

চুপ্ কর্—ঘরো সব বাজে কথা! ছুঁতে নেই না হাতী!—

এমনিধারা কত কি মন্তব্য একসঙ্গে ঘরের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ল।

কে একজন বলে উঠ্‌ল—পাড়াগাঁয়ে বিয়ে হয়ে মেস্তিটার কথাবার্ত্তা বুদ্ধিশুদ্ধি সবই যেন পাড়াগেঁয়েদের মতন হয়ে গেছে!

মেস্তি বেচারী কথাটা ফস্ করে বলে ফেলে—সকলকার ভাবভঙ্গী দেখে মহা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। ধমকে বকুনিতে উপহাসে বিদ্রূপে সে প্রায় কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে আসে।

সাবিত্রী তাকে সস্নেহ-বাহুপাশে জড়িয়ে ধ'রে বলে—অপ্রিয় হলেও তুমি সত্যি কথাই বলেচো মেস্তু! এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই।

—হ্যাঃ! সত্যি না ছাই!! কেন? ছুঁলে হয় আবার কী?—

সাবিত্রী শকুন্তলার কথার কোনও উত্তর দেয়না।—শোভা জেদ্ করে বলে—আমি আজ ছোটপিসিমার কাছেই চুল বাঁধবো। আর কারুর কাছেই বাঁধবো না। সেজ-পিসিমা, তুমি ওঠো।

শকুন্তলা হাসতে হাসতে শোভার চুলের জট্ ছাড়ানো বন্ধ করে সরে' বসে, বলে—আর সাবি! তুই নইলে শোভা আর কারুর কাছে চুল বাঁধবে না!—

সাবিত্রীর শান্তমুখ হঠাৎ কঠিন হয়ে ওঠে। তার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়।

সে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে কঠিন স্বরেই বলে যায়—আমাকে যা' করতে নেই, আমি তা' করিনা! এ'তো জানো তোমরা—

সাবিত্রীর চলে যাওয়ার পানে শোভা হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে থাকে।

শকুন্তলা সরে এসে চিরুণীখানি হাতে তুলে নিতে নিতে বলে—সরে আয় শোভা! বেলা গড়িয়ে আসছে! সাবি কখন যে কী মেজাজে থাকে বোঝবার জো' নেই বাপু!

একটি বয়স্থা কুমারী মেয়ে টিপ্পনী কেটে বলে—জ্যাঠামশাইরা থেকে দাদারা থেকে বাড়ীশুদ্ধ সকলে সাবি-দি'কে এত ক'রে আদর করছে, যত্ন করছে,—মাথায় তুলে রেখেছে,—সাবিদির বাপু কিছুতেই যেন মন ওঠেনা! দিনরাত্রি মুখ গম্ভীর করেই আছে—

শোভা চুল বাঁধতে বাঁধতে ধমক্ দিয়ে ওঠে—তোমরা থাম' দিকি! ছোটপিসিমাকে নিয়ে তোমাদের অতো আলোচনা করতে হবে না।

আর একটি সধবা ঝিউড়ী মুরুব্বিয়ানার সুরে বলে—কেন? সত্যিকথা বলবেনাই বা কিসের জন্যে?

শোভা বলে—ঠাকুর্দ্দারা, বাবা-কাকারা সকলে ওকে যত্ন করেন সেই হিংসেতেই তোমরা গেলে বাপু!—

ওধার থেকে আর একটি যুবতী ফোঁস্ ক'রে ব'লে ওঠে—বালাই! ও' সধবা-মেয়ে, ও' কোন্ দুঃখে সাবিত্রী ঠাকুরঝির হিংসে করতে যাবে? ব'য়ে গেছে!···তবে সাবিত্রী ঠাকুরঝি যে মানুষটা একটু দেমাকে, এ'কথা সকলেই বলবে,—তা' যা'ই বল!

এ'কথার পর সাহস পেয়ে আর একটি মুখরা মেয়ে বলে ওঠে—তা' আর বলতে?—কথার রকম শুনলে না? 'যা' আমায় করতে নেই তা' আমি করিনি—' তা' যদি না-ই করো তবে শাড়ী-চুড়ী গহনাগুলো গায়ে রেখেছো কেমন করে?—

বাধা দিয়ে শোভা রাগ করে কী যেন উত্তর দিতে যায়, শকুন্তলা তাড়াতাড়ি থামিয়ে দেয়!—চুপ্ চুপ্, আজ রেগে উঠতে নেই শোভা! আজ তোকে কারুর সাথে তর্ক করতে নেই।

সাবিত্রী তেতালার ঘরগুলি একটু নিরিবিলি ব'লে সেইদিক পানে চলেছে।

অন্যমনস্কভাবে চলায় সে লক্ষ্য করেনি যে, তেতালার সিঁড়ির ডান পাশের ঘরেই তার ছোটদাদা শিশির চুপি চুপি তরুণী-বধূর সাথে বিশ্রম্ভালাপে মত্ত।

হঠাৎ সাবিত্রীর কাণে এল, শিশির চাপাস্বরে বলছে—সরো মিনু,—আমি পালাই। সাবু তেতলায় এসেছে। ও' যদি আমাকে এখন তোমার কাছে দেখতে পায়,—ভারী অপ্রস্তুত হবো তা'হলে!

বধূ দুষ্টামীর স্বরে উত্তর দেয়—কেন? তুমি তো বলো তুমি নাকি দুনিয়ার কাউকেই লজ্জা করোনা!··· ইচ্ছা করলে বাড়ীশুদ্ধ লোকের সাম্নেই নাকি তুমি আমায় আদর করতে পার? এতই যদি বীর তুমি,—তবে কেন ছোটবোনের ভয়ে লজ্জায় পালাচ্ছ?—

শিশিরের ঈষৎ গম্ভীর অথচ চাপা স্বর আবার শোনা

যায়। সে বলে—না মিনু, সবার সামনেই পারি, কিন্তু সাবিত্রীর সামনে তোমাকে আদর সোহাগ করতে আমি লজ্জা পাই,—দারুণ লজ্জা পাই,—ব্যথাও পাই। ও' আমার চেয়ে অ—নেক ছোট,—কিন্তু ওর 'পরে আমরা আজীবন ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর ব্যবস্থা ও হাজারো রকম বিধিনিষেধ চাপিয়ে দিয়ে—নিজেরা এই—

বাকী কথাগুলি স্পষ্ট সবটা শোনা গেল না। সাবিত্রীর আর শোনার প্রবৃত্তিও ছিল না।

অপমানে ক্ষোভে তার সমস্ত দেহের মধ্যে একটা নিদারুণ অস্বস্তি অনুভূত হচ্ছিল।

পৃথিবীশুদ্ধ মানুষের এই আহা-উহু বাণী ও করুণাপূর্ণ দয়া আর সে সহ্য করতে পারে না।

যদি ওরা এতই দুঃখিত, এতই কাতর, সাবিত্রীর বর্ত্তমান অবস্থায়,—তা'হলে দিক্‌না কেন অবস্থান্তর ঘটিয়ে!

আজীবন অনবরত সকলকারই দয়া ও করুণার পাত্রী হ'য়ে থাকা—এ যে কী অভিশাপ এবং কতোবড়ো লাঞ্ছনা সে চুপ করে ভাবতে থাকে।

নিজের অবস্থায় সে তো একটুও দুঃখিত কিম্বা অসন্তুষ্ট নয়, সে তো বেশ সহজভাবেই সকলের সাথে মিশতে চায়; কিন্তু ওরা তা' দেয় কৈ?—তার জন্য যে ওদের বিশেষ যত্ন, বিশেষ স্নেহ, বিশেষ করুণা, বিশেষতর সদয়-সহানুভূতি সে-ই-তো ওর অবস্থার দৈন্যকে সবার সম্মুখে অহর্নিশি সুস্পষ্ট করে রেখেছে এবং ওকেও সর্ব্বদা সচেতন করে দিচ্ছে ওর নিজের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে।

মেজ ঠাকুর্দ্দা তাকে যদি আর সকল মেয়েদের মতই মিষ্টার না দিয়ে প্রত্যাখ্যান করতেন, সে যে তা'তে কতো স্বাচ্ছন্দ্যের শান্তি পেতো তা' কে বুঝবে?—সে যে এই উৎসববাড়ীর সমস্ত মেয়ে হ'তে পৃথক, এ'কথা একদণ্ড তাকে কেউই ভুলতে দিতে রাজী নয় যেন!

সাবিত্রী নিজের কুমারী-বেশের পানে তাকিয়ে ঘৃণার হাসে। ভাবে—ছিছি!—কতো বড়ো মিথ্যা এ' সাজ!··· ওরা কি কেউ এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবতে পারছে সে কুমারী!—তার নামমাত্র বিবাহিত জীবন তার কুমারী-জীবনে কিছুমাত্র ছায়াপাত করেনি!!—

ওদের মনের মধ্যে অহর্নিশি জেগে আছে আমার বৈধব্য,—অথচ ওদের সেই একান্ত সত্যকে মিথ্যার আবরণে আবৃত করে রাখার জন্যই ওরা আমাকে পরিয়ে রেখেছে কুমারীর সাজ!···এ'সাজ ওদের কাছে একটুও যদি সত্য হয়ে উঠতে পারতো, তা'হলে আজকের এই উৎসব আনন্দের মাঝখানে এককণাও সহজ অধিকার আমার মিল্‌তো!

তবে এ'সব পরে থাকা কেন? এও আমার ওদেরই করুণার দান বৈ তো নয়?—

না,—ওদের একবিন্দুও করুণা সে আর সইতে পারবে না!···বইতে পারে না।

সাবিত্রী হঠাৎ ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর দীপ্তচখে গিয়ে বড় আয়নার সামনে দাঁড়ায়।

প্রকোষ্ঠের চুড়িগুলি, গলার হারছড়া ও কাণের টাপ্‌ দু'টি খুলে নিরাভরণা হয়ে—সিমলার কালাপাড় শাড়ীর উত্তর প্রান্ত হ'তে কুচকুচে কালো পাড় দু'খানি ছিঁড়ে ফেলে দেয়। একখানা কাঁচি সংগ্রহ করে এলো খোঁপাশুদ্ধ ঘন কালো চুলের রাশি মুঠা করে বাম হাতে চেপে ধরে—ডানহাতে কাঁচি চালিয়ে খোঁপাসমেত চুলের রাশি নির্ম্মূল করে ফেলে।

উৎসব মণ্ডপের তোরণ-শীর্ষে নহবতে তখন পূরবী রাগিণী বেজে উঠেছে। সাবিত্রী বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বৈধব্য-বেশের প্রতি বিদ্বারিত নয়নে তাকিয়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে যেন!

ক্ষণপরে তার ডাগর চোখের কোল বেয়ে দু'ফোঁটা মুক্তার মত বড় বড় অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ে।

নহবত্‌ বড় করুণসুরে বাজছে।—

অন্তরের নিভৃত-প্রদেশ আলোড়িত করে ভাষাতীত এক উদাস গভীর বেদনা জেগে উঠছে তার কাতর-কোমল তানে। ···যেন আজ এখানে কে নেই—যেন কা'কে অনেক চেয়েও পাওয়া যায়নি,—যেন সবার চেয়ে প্রাণ যাকে চায় সে আজ আসেনি!···অভিমানে বুঝি কে চিরদিনের তরে চলে গেছে! —তারই নিবিড় বিরহব্যথা আজ সমস্ত আকাশ বাতাসকে অশ্রুভারাতুর করে' সানাইয়ের সুরধারায় কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে পড়ছে!···বাঁশী যেন বলতে চায় তার আকুল কান্নাভরা মিনতির সুরে,—ওগো সে কোথায়?—তা'কে নিয়ে এসো —নিয়ে এসো। যে-বিহনে এই উৎসব-আয়োজন, এই ফুলের গন্ধ, বাঁশীর তান, হাসির প্রবাহ সবই ব্যর্থ—সবই মিথ্যা।

—শেষ—

পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

হিতবাদীর কর্ণধার রূপে বাঙ্গলা সংবাদপত্র পরিচালনে যিনি অসাধারণ তেজস্বিতা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন, কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক রূপে যিনি কংগ্রেসকে বঙ্গদেশে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন, অপূর্ব্ব কাব্যরসের সঞ্চার করিয়া যিনি বাঙ্গলার লোক সাহিত্যকে শ্রীমণ্ডিত করিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষ" আজ সেই পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের স্মৃতি তর্পণ করিবার সুযোগ পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইল।

পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ পণ্ডিতরাজী মেলের কুলীন—শাণ্ডিল্য গোত্রীয়। ২৪পরগণার অন্তর্গত ইছাপুর গ্রামে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের নিবাসভূমি ছিল। তাঁহার পিতা ৺রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাল্যকালে ইছাপুর হইতে কলিকাতা ভবানীপুরে আসিয়া তদীয় জ্যেষ্ঠাগ্রজ তারিণীচরণের আশ্রয়ে বাস করেন। রাখালচন্দ্র ভবানীপুরের মিশন স্কুলে লেখাপড়া শিখিয়া উত্তর কালে সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়া সমগ্র জীবন যাপন করেন। কালীঘাটের ৺কালীমাতার অন্যতম সেবায়েৎ ৺গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা ক্ষেমমণি দেবীর পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক ভবানীপুরে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া রাখালচন্দ্র স্থায়ী ভাবে তথায় বাস করেন।

সন ১২৬৮ সালের ২৮এ জ্যৈষ্ঠ রবিবার কাব্যবিশারদ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাখালচন্দ্রের অষ্টম পুত্র। ৺কালীমাতার অনুগ্রহে তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া তাঁহার নাম কালীপ্রসন্ন রাখা হয়।

ভবানীপুরের চরকডাঙ্গা বঙ্গ বিদ্যালয়ে কালীপ্রসন্নের শিক্ষারম্ভ হয়। কিছু দিন পরে ইংরেজী শিক্ষার্থ তিনি মিশন স্কুলে প্রবেশ করেন। এই স্কুল হইতে ১৫ বৎসর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দানের জন্য প্রস্তুত হন, এবং টেষ্ট পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিন্তু তৎকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে ১৬ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া চলিত না। সেইজন্য তাঁহাকে আরও এক বৎসর অপেক্ষা করিতে হয়। পর বৎসর পরীক্ষা দিয়া তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

কালীপ্রসন্ন যখন লণ্ডন মিশনারী স্কুলে পড়িতেন, তখন স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "সোমপ্রকাশ" ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত হইত। তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবার সময় হইতে কালীপ্রসন্ন "সোমপ্রকাশে" লিখিতে আরম্ভ করেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও সর্ব্ব-প্রযত্নে তাঁহাকে উৎসাহ দিতেন। এইরূপে কালীপ্রসন্ন পঠদ্দশা হইতেই বাঙ্গলা ভাষার লিপি-কৌশল ও সংবাদপত্র-সম্পাদন-প্রণালী আয়ত্ত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। "সোমপ্রকাশে" তাঁহার সরস ব্যঙ্গাত্মক কবিতাসমূহ প্রকাশিত হইত। গুণগ্রাহী বিদ্যাভূষণ মহাশয় কাব্যবিশারদের কবিত্ব-শক্তি দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, কাব্যবিশারদও তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কাব্যবিশারদ মিশনারী কলেজে ভর্ত্তি হন। কিছুদিন পরে কলেজী শিক্ষা ভাল না লাগায় তিনি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত কাব্য-ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন; এবং কালে এই সকল শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট হইতেই "কাব্যবিশারদ" উপাধি লাভ করেন। এই সময়ে তিনি ভবানীপুরের বিদ্যোৎসাহিনী সভা নামক ছাত্রসভায় বক্তৃতা করিতেন, এবং ভবানীপুর ইউনেটস এসোসিয়েশন নামক সভার মাসিকপত্রে ছাত্রাবস্থা হইতেই প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

মিশনারী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে মিশনারীদিগের শিক্ষাপ্রভাবে কালীপ্রসন্ন খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণে উদ্যত হন। তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া পিতা রাখালচন্দ্র পুত্রকে প্রথমে বাইবেল পড়িতে উপদেশ দেন। বাইবেল পড়িবার পর কাব্যবিশারদের মত পরিবর্ত্তিত হয়—তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের অভিপ্রায় পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁহার

সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে দুই-তিনটি যুবক তৎকালে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ভুবনবিখ্যাত কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস অন্যতম।

১২৭৯ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ কাব্যবিশারদের উপনয়ন-সংস্কার হয়। ১২৮২ সালের মাঘ মাসে ১৪ বৎসর বয়সে ভবানীপুরের ৺ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা যোগেশ-মোহিনী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১২৮৮ সালে শ্রীমতী সুরবালা নাম্নী কন্যা এবং ১২৯১ সালের ১৯এ বৈশাখ শ্রীমান মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ১২৯২ সালের পৌষ মাসে কাব্যবিশারদের পত্নী-বিয়োগ ঘটে। ১২৯৪ সালে পত্নীর স্মরণার্থ তিনি "স্মরণচিহ্ন" ও "প্রেমোপহার" নামে দুইটি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক প্রকাশ করেন। ঐ বৎসর শ্রাবণ মাসে বিশারদ বাঁকুড়া জেলার সোণামুখী গ্রামের ডাক্তার বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা ইন্দুমতী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার কোন সন্তানাদি হয় নাই।

১২৮৬ সালে ১৭ বৎসর মাত্র বয়সে কাব্যবিশারদ "লুক্রেশিয়া" নামক ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। তৎকালীন সংবাদ ও সাময়িক পত্রে ইহার উচ্চ প্রশংসা হইয়াছিল এবং লেখক কাশীমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য ও বি, এল, এসোসিয়েশন হইতে পদক পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভবানীপুর হইতে "পঞ্চানন্দ" প্রকাশ করিতেছিলেন। কাব্যবিশারদ উহাতে "শ্রীকবিরচাঁদ বাবাজী" এই ছদ্ম নামে "বঙ্গীয় সমালোচক" শীর্ষক এক ব্যঙ্গকবিতা প্রকাশ করেন। এই কবিতায় বঙ্কিমবাবু, হেমবাবু, ঈশানবাবু, ডাকহরকরা সম্পাদক ও নবাবভাকর সম্পাদক প্রভৃতির প্রতি তীব্র কটাক্ষ ছিল। কবিতাটি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

কাব্যবিশারদের অসাধারণ প্রতিভা, কবিত্বশক্তি ও লিপিচাতুর্য্য দর্শনে "সোমপ্রকাশ" সম্পাদক বিদ্যাভূষণ মহাশয় এতাদৃশ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন যে, আমোদনের জন্য স্থানান্তরে যাইতে হইলে তিনি দুই এক সপ্তাহ "সোম প্রকাশ" পরিচালনের ভার বালক কাব্যবিশারদের উপর অর্পণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না। সেই অল্প বয়স হইতেই রাজনীতিক বিষয়ে কাব্যবিশারদের জ্ঞান ও বিচারশক্তির স্ফুরণ হইতে আরম্ভ হয়। বলার হাতে কালার প্রীহা কাটা সম্বন্ধে তিনি সেই বয়সেই "সভ্যতা সোপান" নামে একটি প্রহসন রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। এই রচনার জন্য রাজপুরুষরা অত্যন্ত বিরক্ত হন, এবং লেখকের নামে অভিযোগ উপস্থাপনের উদ্যোগ হন। কিন্তু তৎকালীন ছোটলাট যখন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মুখে অবগত হইলেন যে উহার লেখক অপরিণত-বয়স্ক বালক মাত্র তখন অভিযোগ আনয়নের সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয়। এই সময়ে কাব্যবিশারদ মহাশয় "নির্দ্দোষের অপরাধ" শীর্ষক আর একটি কবিতা "সোমপ্রকাশে" প্রকাশ করেন। তাহাতে তাঁহার দুর্জ্জয় সাহস প্রকাশ পায়।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিটনের মুদ্রাযন্ত্র বিধানের কল্যাণে "সোমপ্রকাশ" বন্ধ হইয়া যায়। তদুপলক্ষে কাব্যবিশারদ "বিনাদোষে রাজরোষ" শীর্ষক যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, উহা সোমপ্রকাশের শেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে কাব্যবিশারদ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার-প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-মন্দিরে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন; এবং স্বেচ্ছামুরূপ বিজ্ঞান শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া "প্রকৃতি" নামে এক বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রিকার প্রচার করেন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক কোন সাময়িক পত্র ছিল না; সেইজন্য "প্রকৃতি" প্রকাশ করিয়া কাব্যবিশারদ মহাশয় কাশীমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকট হইতে দুই শত টাকা সাহায্যলাভ করেন। কিন্তু তৎকালে দেশে বিজ্ঞানবিষয়ক পত্র চলিবার সময় আসে নাই—লেখক, পাঠক এবং অর্থ তিনেরই অসদ্ভাব ছিল। কাজেই "প্রকৃতি" চলে নাই। পরিশেষে তিনি উহা ৺তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত "কল্প-লতা"র সহিত সম্মিলিত করিয়া দেন।

বিজ্ঞানচর্চ্চার ফলে বিশারদের চিত্ত আর এক দিকে নিবিষ্ট হয়। কতিপয় বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া তিনি "আর্য্য ঐন্দ্রজালিক সমিতি" সংগঠনপূর্ব্বক বঙ্গের ও ভারতের নানা স্থানে কিছু দিন পাশ্চাত্য প্রণালীর হস্তলাঘব ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মেসমেরিজম

বা সম্মোহন বিদ্যাতেও ঐ সময়ে তাঁহার পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল।

স্বর্গীয় স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কাব্যবিশারদের অচলা শ্রদ্ধা ছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রবাবু যখন আদালতের অবমাননার অপরাধে কারাগারে প্রেরিত হন তখন কাব্যবিশারদ মহাশয় "ধর্ম্মাবতারের কেচ্ছা" নাম দিয়া একখানি ক্ষুদ্র প্রহসন রচনা করেন। ইহাতে জিলাপতি নরিশের প্রতি তীব্র আক্রমণ ছিল বলিয়া উহার প্রচার করা হয় নাই।

এই বৎসরই কাব্যবিশারদের "বিষাদ-প্রতিমা" (দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ বিষয়ক নাট্যগীতি) ও পর বৎসর "চিন্তাকুসুম" (খণ্ড কবিতা সংগ্রহ) প্রকাশিত হয়।

এক সময়ে কাব্যবিশারদ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণে উদ্যত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে উহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তিনি মিশনারীদিগের বিরুদ্ধাচরণপূর্ব্বক বাইবেল ও খৃষ্টধর্ম্মের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হন। মিশনারীরা হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করিতেন, পুস্তিকা ও পত্রাদি মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিতেন। ইহা কাব্যবিশারদ সহ্য করিতে পারেন নাই। তাই তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মের দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক বক্তৃতাদি করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করেন এবং বিডন স্কোয়ার, ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও অন্যান্য স্থানে বক্তৃতা করিতেন এবং খৃষ্টধর্ম্মের নিন্দাবাদপূর্ণ ক্ষুদ্র পুস্তিকা ও পত্র মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিতেন। দুই তিন বৎসর এইরূপ বক্তৃতাদির পর তিনি "এন্টিক্রিশ্চান" নামক এক ইংরেজী মাসিকপত্র বাহির করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে উহা প্রথম প্রকাশিত হয়। দুই বৎসর চলিবার পর উহা বন্ধ হইয়া যায়। এ দেশ অপেক্ষা বিলাতেই উহার প্রচার অধিক ছিল। এই পত্র উপলক্ষে ভারতবন্ধু মহাত্মা ব্রাডলা সাহেবের সহিত কাব্যবিশারদের বন্ধুত্ব হয়। তিনি খৃষ্টধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন। এই উপলক্ষে মিঃ ফুট, বিবি বেশান্ত প্রভৃতি খৃষ্টধর্ম্মদ্বেষীদিগের সহিতও বিশারদের পরিচয় হয়। এন্টিক্রিশ্চান পত্রের প্রচার বন্ধ করিবার জন্য, কাব্যবিশারদকে বিপন্ন করিবার জন্য, ডাকযোগে কাগজ প্রেরণ রহিত করিবার জন্য শক্তিশালী মিশনারীগণ চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু কাব্যবিশারদ তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই।

"এন্টিক্রিশ্চান" বন্ধ হইবার ছয় বৎসর পরে কাব্যবিশারদ "কসমোপলিটান" নামক আর একখানি ইংরেজী মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহাতেও কোমল ভাবে খৃষ্টধর্ম্মের উপর আক্রমণ থাকিত। দুই বৎসর পরে ইহাও বন্ধ হইয়া যায়। খৃষ্টান মিশনারীদিগের সহিত দ্বন্দ্ব উপলক্ষে অর্থ ও ছাপাখানার প্রয়োজন অনুভব করিয়া ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বিশারদ ভবানীপুরে "পার্থিব যন্ত্র" (Secular Press) নামে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। উক্ত দুইখানি ইংরেজী মাসিকপত্র ও খৃষ্টধর্ম্ম সংক্রান্ত বাদানুবাদমূলক পুস্তিকা সকল এই ছাপাখানায় ছাপা হইত। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি Mrs. Annie Besant In India নামে একখানি ইংরেজী পুস্তিকায় প্রচার করিয়া বিবি বেশান্তের তৎকালীন কার্য্যের সমালোচনা করেন।

সঙ্গীতে কাব্যবিশারদের অনুরাগ ছিল। তিনি তাল গাহিতে না পারুন, সুর-তাল-মান-লয়-সঙ্গত ভাবে সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। ভবানীপুরের হাফ আখড়াই দলে তিনি অনেক গান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। বঙ্গব্যবচ্ছেদ আন্দোলনের সময় তাঁহার রচিত অনেক জাতীয় সঙ্গীত সভা-সমিতিতে গীত হইত। লব্ধপ্রতিষ্ঠ হাফ আখড়াই সঙ্গীত রচয়িতা স্বর্গীয় মনোমোহন বসু বিশারদের সঙ্গীত রচনায় অসাধারণ দক্ষতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া এক হাফ আখড়াই গানের সভায় মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ইহার পর কাব্যবিশারদ স্বর্গীয় পণ্ডিত অযোধ্যানাথের "ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন" পত্রের সম্পাদক হইয়া এলাহাবাদে গমন করেন। তদুপলক্ষে বিখ্যাত পাইয়োনীয়ার পত্রের সহিত তাঁহার প্রায়ই মসীযুদ্ধ হইত। "বাবু ইংলিশ" বলিয়া পাইয়োনীয়ার ইংরেজীনবীশ বাঙ্গালীদের ইংরেজী লেখার ভ্রমপ্রদর্শনপূর্ব্বক বিদ্রূপ করিতেন। বিশারদ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন পত্রে পাইয়োনীয়ারের লেখার ভ্রম প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। কয়েকবার ভ্রম প্রদর্শিত হইলে পাইয়োনীয়ারের তৎকালীন সম্পাদক একদিন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে পাইয়োনীয়ারের ভ্রম প্রদর্শনে বিরত হইতে অনুরোধ করেন। ইহার পর হইতে পাইয়োনীয়ারও বাঙ্গালীর ইংরেজী লেখার ভ্রম প্রদর্শনে বিরত হন।

কাব্যবিশারদ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় লোকান্তরে প্রস্থান করিলে বঙ্গের সকল সংবাদপত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণকীর্ত্তন করিয়া শোক প্রকাশ করেন। কিন্তু পরলোকগত ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "রইস এণ্ড রাইয়ত" পত্রে বিদ্যাসাগরকে লঘু প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হয়। কাব্য-বিশারদ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এক ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এলাহাবাদে কাব্যবিশারদ দেড় বৎসর ছিলেন। পণ্ডিত অযোধ্যানাথের মৃত্যু হইলে তিনি ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া কাব্যবিশারদ মহাশয় "হিন্দু পেট্রিয়টে"র সহকারী সম্পাদক হন। কিন্তু হিন্দু পেট্রিয়টের পূর্ব্ব নীতির পরিবর্ত্তন হওয়ায় এবং নূতন নীতির অনুমোদন করিতে না পারায় কাব্যবিশারদ হিন্দু পেট্রিয়টের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া "অমৃতবাজার পত্রিকা"র সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। কিছু দিন পরে "বঙ্গ-নিবাসী" পত্রের পরিচালকরা কাব্যবিশারদকে সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করিয়া আভাস দেন যে সম্পাদক সুদক্ষ হইলে তাঁহারা তাঁহার হস্তে উহার স্বত্ব ও পরিচালন-ভার অর্পণ করিবেন। কিন্তু কার্য্যকালে সেরূপ কোন লক্ষণ না দেখিয়া, এবং তাঁহার অজ্ঞাতসারে বঙ্গ-নিবাসীর স্বত্ব হস্তান্তরিত হওয়ায় বিশারদ বঙ্গ-নিবাসীর সহিত সংস্রব রহিত করেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব্বে কাব্যবিশারদ মহাশয়ের "মিঠেকড়া" নামক ব্যঙ্গ কাব্য প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের "কড়ি ও কোমল" পুস্তকের কয়েকটি কবিতা উপলক্ষে মিঠে কড়া রচিত হইয়াছিল।

১২৯৮ বঙ্গাব্দে সম্মিলিত মূলধনে "হিতবাদী"র প্রচার হয়। কিন্তু উহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ায় ১৩০১ বঙ্গাব্দে কাব্যবিশারদ কয়েকজন বন্ধুর সহায়তায় উহার স্বত্ব গ্রহণ করেন এবং ৮ই বৈশাখ তারিখে তাঁহার সম্পাদকত্বে উহার প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। হিতবাদীর সংস্রবে কাব্যবিশারদের প্রতিভা উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। তাঁহার হাতে হিতবাদীর চরম উন্নতি হয়। এমন কি, তৎকালে বঙ্গের সংবাদপত্র-পাঠক জনসাধারণ হিতবাদী ও কাব্য-বিশারদকে পৃথক চক্ষে দেখিত না—হিতবাদী বলিতে কাব্যবিশারদ এবং কাব্যবিশারদ বলিতে হিতবাদী বুঝিত।

হিতবাদীর ভার গ্রহণের অল্প দিন পরে কাব্যবিশারদ মহাশয়-সঙ্কলিত সটীক "বিদ্যাপতি" প্রকাশিত হয়। বিদ্যাপতির এই নূতন সংস্করণ কাব্যবিশারদের কাব্য-প্রতিভার সম্যক পরিচয়। ইহা হইতেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশারদ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠা বদ্ধমূল হয়।

হিতবাদীর সম্পাদকরূপে কাব্যবিশারদ মহাশয় যে নির্ভীকতা ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, বঙ্গের সর্ব্বসাধারণ তাহা অবগত আছেন।

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে হিতবাদীতে একটি প্রাপ্ত কবিতা প্রকাশের জন্য বিশারদ মহাশয়ের বিরুদ্ধে একটি মানহানির মোকদ্দমা রুজু হয়। ঐ কবিতা প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করায় এবং লেখকের নাম প্রকাশ করিতে অসম্মত হওয়ায় মোকদ্দমার বিচার ফলে বিশারদ মহাশয় ৯ মাস কালের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু তাঁহাকে পূর্ণ নয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয় নাই। কিঞ্চিৎ অধিক পাঁচ মাস গত হইলে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলী উপলক্ষে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

কারাগার হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কাব্যবিশারদ মহাশয় হিতবাদীতে ধারাবাহিক ভাবে যে কারাকাহিনী প্রকাশ করেন, তাহাতে জনসাধারণ কারাজীবন ও কারা-গারের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব অবগত হইতে পারিয়াছিল এবং সেই লেখার ফলে কারাগারের অনেক দোষ-ত্রুটি, বিশৃঙ্খলা-অব্যবস্থার সংস্কারও সাধিত হইয়াছিল।

হিতবাদীর সংস্রবে বিশারদ মহাশয় "হিতবার্ত্তা" নামে একখানি হিন্দী সাপ্তাহিক এবং হিতবাদীর একটি দৈনিক সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাঁহার লোকান্তরে প্রস্থানের পর তদীয় পুত্র শ্রীমান মনোরঞ্জন হিতবার্ত্তার প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। আর দৈনিক হিতবাদীর সম্পাদন-ভার অপরের হস্তে পড়িলে গবর্ণমেণ্ট মুদ্রণ শাসনী ব্যবস্থা অনুসারে জামিন তলব করায় শ্রীমান মনোরঞ্জন

আমিন দেওয়ার পরিবর্ত্তে কাগজের প্রচার বন্ধ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন। তদনুসারে উহাও বন্ধ হইয়া যায়।

হিতবাদীর ছাপাখানা হইতে বিশারদ মহাশয়ের সম্পাদনে স্বর্গীয় রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সঙ্কলিত শব্দকল্পদ্রুম এবং স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় অনূদিত মহাভারতের সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

হিতবাদীর সম্পাদন কালে বিশারদ মহাশয় আর একটি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সে সময় অত্যন্ত অর্থকষ্টে পতিত হইয়াছিলেন। কাব্যবিশারদ মহাশয় সেই সময়ে তাঁহার গ্রন্থাবলী হিতবাদীর গ্রাহক-বর্গকে উপহার স্বরূপ অল্প মূল্যে প্রদান করিয়া হেম বাবুকে কিছু টাকা তুলিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে কবির শেষ জীবনে বিশেষ উপকার হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত, হিতবাদীতে কাব্য বিশারদ মহাশয়ের আন্দোলনের ফলে গবর্ণমেণ্ট হেমবাবুর জন্য মাসিক ২৫ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

হিতবাদী সম্পাদনের গুরু শ্রমের উপর কংগ্রেসের কার্য্যে এবং দেশের নানা স্থানে স্বদেশী প্রচার কার্য্যে তাঁহাকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। সেই অতি-পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। স্বাস্থ্য লাভার্থ তিনি বিদেশ যাত্রা করেন। কিন্তু বিদেশেই ১৩১৪ সালের ১৯এ আষাঢ় (৪ঠা জুলাই, ১৯০৭) তাঁহার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়।

কাব্যবিশারদ মহাশয় সাহিত্য সভার সদস্য এবং সাহিত্য-সংহিতার সম্পাদক ছিলেন, এবং এই কার্য্যও তিনি সুশৃঙ্খলে সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন।

তাঁহার ছাত্রাবস্থা হইতে সমগ্র জীবনে তাঁহার সকল কার্য্যে স্বাদেশিকতা ও স্বজাত্যের ভাবটি সুস্পষ্ট ও সুপরিণত দেখা যাইত। স্বদেশের ও স্বজাতির লাঞ্ছনা, নিগ্রহ, অপমানের প্রতিকারের জন্য তাঁহার আগ্রহের সীমা ছিল না। ভারতবর্ষ আজ এই প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিকের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া ধন্য হইল।

বিদায়-বেলায়

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরী বি-এ

সময় হইবে নিকট যখন, বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।
নিশি-অবসানে সুদূর গগনে, কাঁদিবে আঁধার বিদায়-লগনে,
প্রভাতে ধরণী জাগিবে সঘনে, আলো-হাসি গানে যবে॥
তুমি ত তখন বিবশ-শোভায় ঘুমাবে মোহন বেশে,
ম্লান শুকতারা মুখপানে তব চেয়ে রবে অনিমেষে।
সমীর লুটাবে শিথিল অলকে, নয়ন ভরিবে হাসির ঝলকে,
কাঁপিবে অধর পুলকে পলকে, মধুরিমা-গৌরবে॥
আঁখি দুটি মেলি' বাতায়ন-পথে আন-মনে র'বে চাহি'।
জানিবে কি তুমি, একা কোন জন গেছে সেই পথ বাহি'।
যে গিয়াছে চলি', তারি আঁখিজল, শিশিরে শিশিরে করে টলমল,
তারি বাণী-ব্যথা হবে চঞ্চল, প্রভাতের কলরবে॥
যে আঁধার আজি চলিল ভাসিয়া, প্রভাতের উপকূলে।
তারি কোন মায়া স্মরণে তোমার পড়িবে কি কভু ভুলে?
নাহি যদি পড়ে,—তবু জেনো মনে, নিশীথ-রাতের একেলা-শয়নে,—
সারা তনু ঘিরি আধ-জাগরণে, সেই শুধু কথা ক'বে॥

ছায়ার মায়া

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(চলচ্চিত্রের গল্প-গঠন ও চিত্র-নাট্যের রচনা-রীতি)

কোনো প্রসিদ্ধ গল্প বা উপন্যাসকে চিত্র-নাট্যে রূপান্তরিত করা যে কত কঠিন তা' পূর্ব্বেই বলেছি। রঙ্গালয়ে অভিনীত জনপ্রিয় নাটককে 'চিত্র-নাট্য' ক'রে তোলা আরও শক্ত। কারণ, 'ষ্টেজের' প্রভাব বড্ড বেশী রকম এসে পড়ে সে নাটকের মধ্যে। এই সব নাটক, উপন্যাস বা গল্পকে চিত্র-নাট্যে রূপান্তরিত ক'রতে হ'লে আগে চার পাঁচবার সেইটি পড়ে নিয়ে তারপর স্মৃতি থেকে 'চিত্র-নাট্য' লেখবার চেষ্টা করা উচিত। তাহ'লে লেখকের কল্পনা-শক্তি অনেকখানি বাধা-মুক্ত হয়ে কাজ ক'রতে পারবে। রঙ্গমঞ্চের রঙীন আবহাওয়া এবং উপকথার অলীক মোহের আবেষ্টন থেকে আত্মরক্ষা করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে কেবলমাত্র আখ্যান-বস্তুটুকু বেছে নিয়ে তাকে ঠিক নবরচিত গল্প বা কাহিনী মনে ক'রে তার চিত্র-নাট্য সুরু করা; কারণ প্রত্যেক চিত্র-নাট্যেরই প্রধান উপকরণ হচ্ছে ওই গল্প বা আখ্যান-বস্তু।

চিত্র-নাট্য রচয়িতাদের মনে রাখা উচিত যে তাঁদের কাজ গল্পকে ছবিতে রূপান্তরিত করা, নাটক রচনা করা নয়। ছবির ভিতর দিয়ে গল্পটিকে পরিস্ফুট ক'রে তুলতে পারলেই তাঁরা সাফল্য লাভ করবেন। কিন্তু ছবির একটা অসুবিধা হ'চ্ছে, সে পাত্র পাত্রীদের মনোভাব—তাদের উদ্দেশ্য, আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা বা কল্পনাকে রূপায়িত ক'রে তুলতে পারে না। অথচ গল্পের প্রাণই হ'চ্ছে এই মনো জগতের লীলা-বৈচিত্র্য!

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে—যা ছবিতে এঁকে বোঝানো যায় না, তাকে ছবিতে পরিস্ফুট ক'রে তোলা যাবে কেমন ক'রে? এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন যিনি, চিত্র-নাট্য-রচনায় সিদ্ধিলাভ করা তাঁর পক্ষে সহজ হ'য়ে যাবে। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে কারণ ব্যতীত কোনো কার্য্য হয় না। মানুষ যা কিছু করে তার পিছনে একটা চিন্তা বা যুক্তি থাকেই। ক্যামেরার চোখে তার সে চিন্তা বা যুক্তির ছবি ধরা পড়ে না বটে, কিন্তু তার কাজটা দেখা যায়। তখন তার সেই কাজ দেখে আমরা তার মনের খবর পেতে পারি। অতএব চিত্র নাট্যে পাত্র পাত্রীদের মনোভাবের পরিচয় দিতে হ'লে রচয়িতাকে নানা ঘটনার (situations) সমাবেশ করতে হবে—যার মধ্যে তাদের কার্য্য-কলাপ ও অভিনয়-ভঙ্গী (Actions) তাদের মনোজগতের চিত্রখানিকেও আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরবে! সুতরাং, মনে রাখতে হবে যে গল্পকে

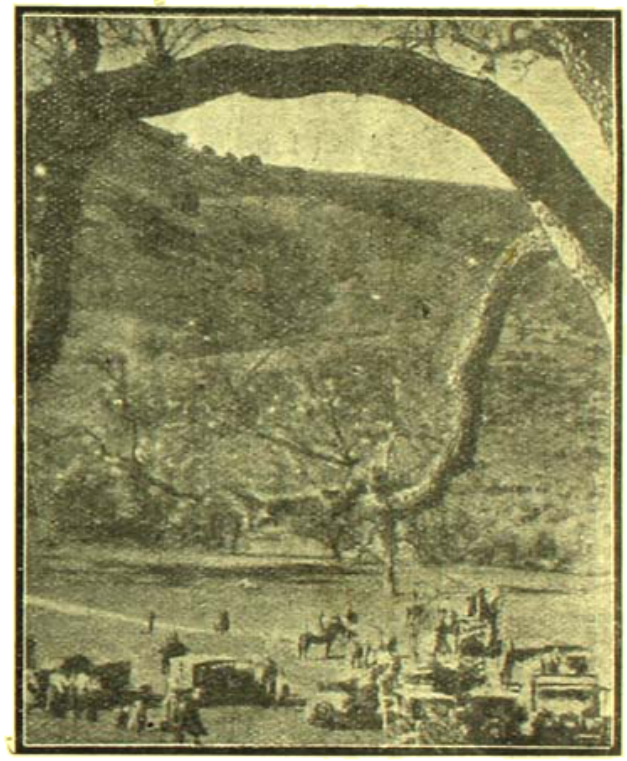

অকুস্থান (Location) (কোনো একখানি ছবির জন্য এই অনুকূল স্থান-নির্ব্বাচন করে নিয়ে চিত্র-সম্প্রদায় সদলবলে এসে কাজ সুরু করেছে)

ছবি করে তুলতে হ'লে চিত্র-নাট্যের প্রধান অবলম্বন হ'চ্ছে ঘটনার পর ঘটনার ভিতর দিয়ে পাত্র পাত্রীদের নানা কার্য্য-কলাপ দেখিয়ে যাওয়া।

অনেকে হয়ত মনে ক'রতে পারেন যে আজকের এই সুন্দর চিত্রের যুগে আমরা যখন ছবির মুখে ভাষা দিতে পেরেছি, তখন ছবিতে পাত্র পাত্রীর কার্য্য কলাপ দেখাবার

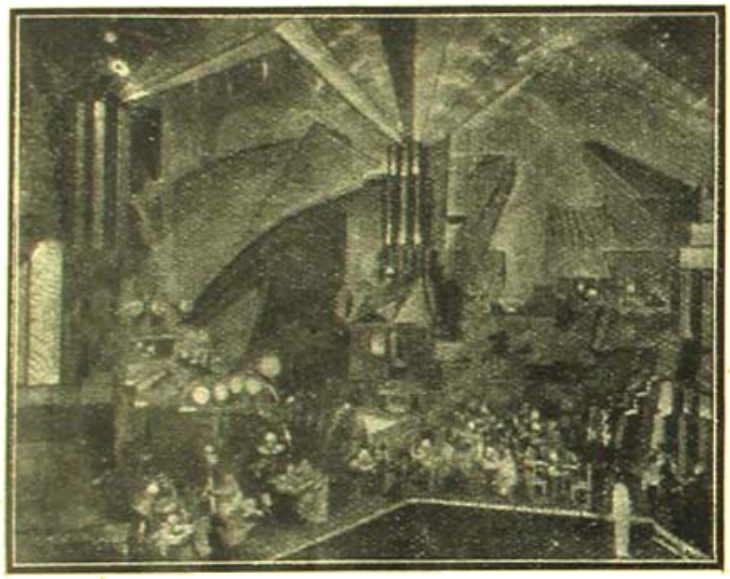

আভ্যন্তরীণ দৃশ্যপট (Interior Set) চিত্রগড়ের ভিতর

জন্য ঘটনার বাহুল্য না রেখে, 'কথা' দিয়েই ত কাজ সারতে পারি! অবশ্য, তা যে তাঁরা পারেন না এমন কথা কেউ

মন্দালোক সন্ধান (Soft Focus)

ব'লবে না; কিন্তু এটা ঠিক, যে তাহলে ছবি কোনো দিনই 'চলচ্চিত্র' হিসাবে শ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য হবে না। কারণ, ছবিকে শুধু কথা কওয়ালেই চলবে না—ছবিকে ঠিক্ ছবি ক'রেও তোলা চাই।

এই দু'টি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য না রাখার ফলেই—কি বাংলার—কি বোম্বাইয়ের কোনো দেশী ছবিই এদেশে অনেক দিন পর্য্যন্ত দেখবার যোগ্য হ'য়ে উঠতে পারেনি। কেবলমাত্র কয়েকজন নর-নারী ছবিতে উঠে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে এবং পর্দ্দার উপর গল্পের বিষয়টি পাতার পর পাতা অক্ষরে লিখে দেখানো হ'চ্ছে—এই ছিল এত-দিন এদেশে পাশি কোম্পানীর তোলা বাংলা ছবি! একটা বিস্ময় ও কৌতূহল নিয়ে এ দেশের চিত্রানভিজ্ঞ হাজার হাজার দর্শক ভীড় করে গিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ সে ছবিও দেখেছে; কিন্তু আজ আর সে ছবি দেখে তারা ভুলবে না, হোলিউডের কৃপায় তারা একাধিক ভালো ছবির স্বাদ পেয়েছে—তার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের মর্ম্ম গ্রহণ করতে শিখেছে; এখন দেশী ছবি অযোগ্য হ'লে সপ্তাহকালের অধিক আর দর্শক আকর্ষণ করতে পারে না। এটা অতি সুলক্ষণ নিশ্চয়।

এই যে সুদূর আমেরিকার চলচ্চিত্র-গড়ে তোলা অসংখ্য ছবি আজ শুধু বাংলার নগরে নগরেই নয়—পৃথিবীর সকল দেশেই এতটা সমাদর পাচ্ছে, এর কারণ কি? একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যে প্রত্যেক ছবিতেই তারা এমন একটি বিশ্ব-মানবের চিত্তাকর্ষক সার্ব্বজনীন গল্প বেছে নিয়ে রূপায়িত ক'রেছে যা সহজেই বিশ্বের নরনারীর অন্তর স্পর্শ ক'রে। ব্যবসায়ের দিক দিয়ে সাফল্যলাভ করার পক্ষে এর প্রয়োজনীয়তা এত বেশী যে প্রত্যেক চিত্র-নাট্য-রচয়িতার প্রথম কর্ত্তব্য হ'চ্ছে এমন একটি গল্প তার চিত্র-নাট্যের জন্য বেছে নেওয়া যার মধ্যে একটা universal appeal—বা বিশ্বজনীন আবেদন আছে।

এমন কতকগুলি চিত্ত-বৃত্তি আছে যা সকল দেশের সকল জাতির মানব-প্রকৃতির মধ্যে স্বভাবতঃই স্ফূর্ত্তিলাভ করে। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে তার প্রভাব ধনী নির্ধন সভ্য অসভ্য সকল মানুষের উপরই সমভাবে বিস্তৃত দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে যৌন-ধর্ম্মের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই যৌন-ধর্ম্মের প্রভাবে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে একটা সহজাত

আকর্ষণ অনুভূত হয়, তাই থেকেই তাদের মধ্যে—হয় জঘন্য লালসা নয়ত প্রগাঢ় প্রেমের উৎপত্তি হ'তে দেখা যায়; এবং তারই ফলে তাদের পরস্পরের প্রাণে একটা মিলনাকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। এই মিলনাকাঙ্ক্ষা তাদের বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করে। তারা সংসার পাতে, সন্তান-সন্ততি লাভ করে; জীবনে সুখী হয়। কিন্তু, যেখানে এই মিলনে বাধা আছে—তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব আছে—হিংসা বিদ্বেষ আছে—সেখানে বেদনার সৃষ্টি, জীবন দুর্বহ ও দুঃখময়। বাধা দূর করবার জন্য

মধ্যম দূরপট (Medium long Shot—দেবী আইসিসের উপাসনা)

মানুষ অসাধ্য সাধনে অগ্রসর হয়, জীবন তুচ্ছ ক'রে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্রেমের জন্য সে ক'রতে পারে না এমন কাজ নেই! আবার প্রেম যখন অন্তর্হিত হয়, তখন সাজানো সংসার শ্মশান হ'য়ে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মানুষের জীবনকে তোলপাড় করে দিতে পারে এই প্রেম! সাধুকে শয়তান করে, দস্যুকে দেবতা, কাপুরুষকে বীর—ভীরুকে দুঃসাহসী, অলসকে উদ্যমশীল ক'রে তোলে। অতএব মানব-জীবনে প্রেমের প্রবল প্রাধান্য আমরা স্বীকার করে নিতে বাধ্য। সুতরাং, যে গল্পের ভিত্তি মানবের চিরন্তন যৌন-আকর্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারই ছন্দানুসরণে পুষ্ট ও পরিণত হ'য়ে ওঠে, তার মধ্যে একটা বিশ্বজনীন আবেদন নিহিত থাকেই। এমনিতর আরও কতকগুলি সাধারণ মানব-মনোবৃত্তির সন্ধান রাখা চাই যার সার্বজনীন ধর্ম্ম অস্বীকার করা যায় না—যেমন জনন-ধর্ম্ম। এর মধ্যে আছে মাতৃত্বের ক্ষুধা, পিতৃত্বের পিপাসা, মাতৃস্নেহ, পিতৃস্নেহ, সন্তানবাৎসল্য, সোদরপ্রীতি, মাতৃ-ভক্তি, পিতৃভক্তি, পুত্র শোক, কুপুত্রের কৃতঘ্নতা, কন্যাদায়,

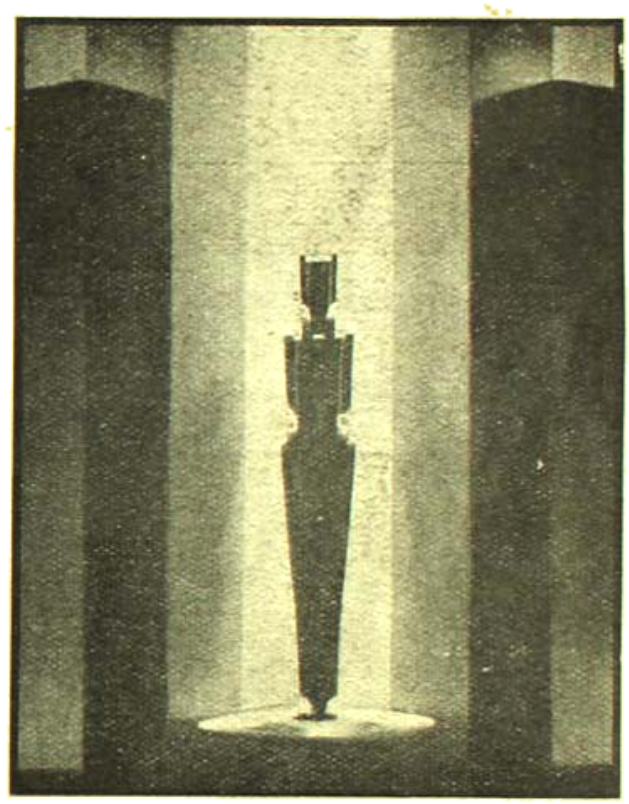

দৃশ্যপটের আধুনিক পরিকল্পনা (modern design)

কন্যার বৈধব্য, পুত্র-কন্যার অবাধ্যতা, বিদ্রোহাচরণ, উচ্ছৃঙ্খলতা, অধঃপতন ইত্যাদি। এ ছাড়া আরও কতকগুলো ব্যাপার আছে যা সকল মানব-সমাজেই বিদ্যমান বলে মানুষকে সে কাহিনী আকৃষ্ট করে, যেমন—বন্ধুত্ব, দাক্ষিণ্য, অহংত্ব, আদর্শবাদ, শক্তি বা বীর্য্য, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, উৎসাহ, উদ্যম, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, মহৎ আকাঙ্ক্ষা, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি সৎগুণ, এবং ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা, শত্রুতা, পরশ্রীকাতরতা, লালসা, লোভ, দারিদ্র্য, পীড়া,

নেশা, মোহ, উন্মত্ততা, অহঙ্কার, নৃশংসতা, চুরি, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা, অধর্ম, অন্যায়, ব্যভিচার ইত্যাদি মানবের সনাতন পাপ ও দৌর্ব্বল্য।

এর মধ্যে যে কোনোও একটা ব্যাপারকে গল্পের ভিত্তি (Theme) ক'রে আখ্যানবস্তু (Plot) গড়ে তুলতে পারলে সে ছবি সকল দেশে সমাদৃত হবে। গল্পের এই গঠন-প্রণালীর (Treatment) উপরই কিন্তু ছবির ভালো মন্দ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। গল্পের গঠন-প্রণালী যেখানে

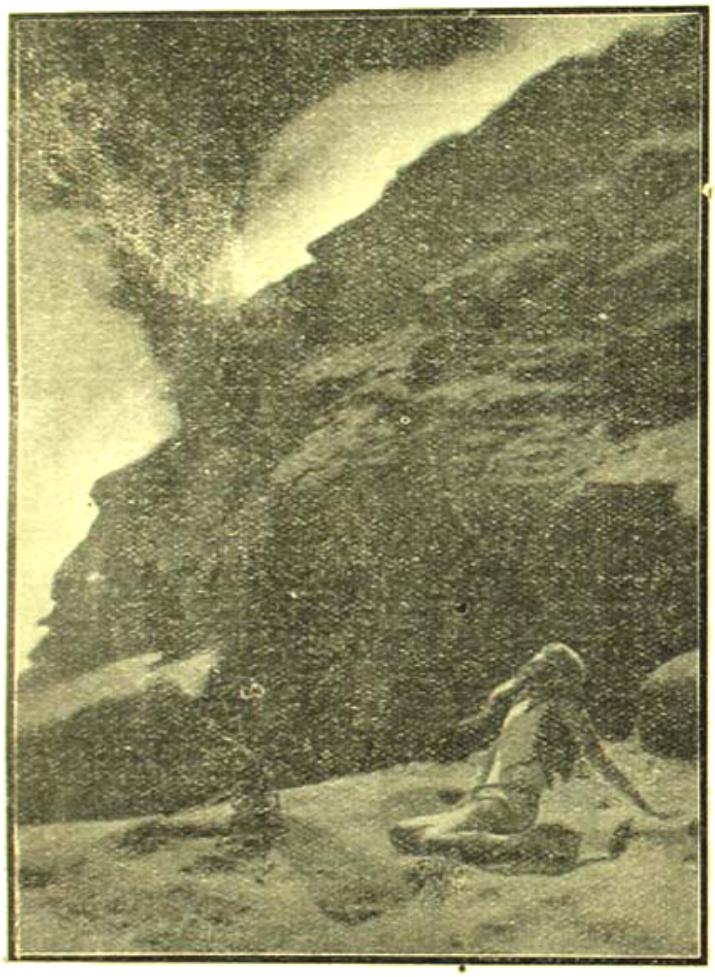

দূরপট (Long Shot) (ধীবর ও দৈত্য)

যত বেশী স্বাভাবিকতার অনুসরণে বাস্তব ভঙ্গীর অনুগামী হয়, সেখানেই তা' তত নির্দ্দোষ ও পরিপাটি হ'য়ে ওঠে। দ্বন্দ্ব ও জটিলতা গল্পকে অধিকতর চিত্তাকর্ষক ক'রে তোলে। বাধা ও বিপদ উত্তীর্ণ হ'য়ে, বন্ধন ও মুক্তির ভিতর দিয়ে চিত্রের নায়ক নায়িকা যখন অগ্রসর হয়, দর্শকের মন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাদের অনুবর্ত্তী হ'য়ে চলে। পর্দ্দার উপর প্রতিফলিত সেই দুটি প্রাণীর সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দ ও বেদনা তখন দর্শকদের আপন অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে ওঠে। সে ছবি তারা তন্ময় হ'য়ে দেখে এবং তৃপ্ত হ'য়ে বাড়ী ফেরে। সুতরাং চিত্র-নাট্য-রচয়িতাকে এ কথা মনে রেখে দক্ষতার সঙ্গে লেখনী পরিচালনা ক'রতে হবে। কথা যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভালো। ঘটনার বাহুল্য ও কার্য্যকলাপের প্রাচুর্য্য ছবির পক্ষে দোষ না হ'য়ে বরং গুণই হ'য়ে ওঠে। আলাপ ও বাক্‌চাতুর্য্য (Conversations&Dialogue) উপন্যাসের পক্ষে হয়ত খুব ভালো ; কিন্তু, ছবির পক্ষে তা যথাসাধ্য বর্জ্জন করাই বাঞ্ছনীয়। মুখর ছবিতে বরং একটু আধটু তার স্থান আছে, কিন্তু নীরব ছবিতে তা একেবারেই অচল। নেহাৎ যেখানে কথা দিয়ে কিছু বোঝাবার প্রয়োজন অপরিহার্য্য হ'য়ে উঠবে সেখানে সামান্য একটু পরিচয়লিপি (Titles) দেওয়া যেতে পারে।

গল্পের ঘটনাগুলির স্থানকাল সম্বন্ধে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যক। দেড়'শো বছর আগের কলিকাতা সহরের কোনো ঘটনা যদি দেখানো দরকার হয়, তাহ'লে মনে রাখতে হবে তখন এ শহরে ইলেক্‌ট্রিক আলো ত' দূরের কথা গ্যাসের আলোও ছিল না। মটোর কার্ তো দূরের কথা ঘোড়ার ট্র্যামও ছিল না। হাবড়ার পুল তখনও হয়নি, হাবড়া ষ্টেশনেরও অস্তিত্ব ছিল না। গঙ্গায় ষ্টীমল্যাঞ্চ্ দেখা দেয়নি। উইল্‌সন্ হোটেল, মনুমেণ্ট্, জেনারেল পোষ্ট অফিস, হাইকোর্ট, মিউজিয়ম্, পরেশনাথের মন্দির এ সব ছিল না। তখনকার দিনের পোষাক পরিচ্ছদ আজকের দিনের সাজসজ্জার সঙ্গে মেলে না। এ ছাড়া, গল্পের মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটছে তারও একটা সময়ের পারম্পর্য্য নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। একই লোককে একই সময়ে যাতে দিল্লী ও বোম্বাই শহরে দেখতে না পাওয়া যায় সে বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। দিল্লী থেকে বোম্বাই যেতে হ'লে যে সময়টুকুর ব্যবধান থাকা দরকার সেটুকু দিতে যেন ভুল না হয়। এমন কি উপর থেকে নীচের আসবার বা এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাবার জন্য যে

সময়টুকু লাগে তারও হিসাব মনে রাখা চাই। 'মিশ্রণ' এবং 'ক্রমবিকাশ' 'ও ক্রমবিনাশের' সাহায্যে চিত্রে এই সময় নির্দ্দেশ করা যায়। তা'ছাড়া এইমাত্র একটা কাজে যাকে বাড়ীর বাইরে যেতে দেখা গেলো, পরক্ষণেই তাকে আবার যেন ড্রয়িংরুমে দেখতে না পাওয়া যায়। এ বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে।

চিত্র-নাট্যে নায়ক নায়িকা ছাড়া আর যে কটি চরিত্র থাকবে তারা যেন কেউ অবান্তর না হয়। গল্পটিকে প'ড়ে

শিস্‌পট (Reflection) (আয়নায় প্রতিবিম্ব)

তোলবার জন্য যে কজন লোক একেবারে না হ'লে নয়, তার চেয়ে আর একটিও অনাবশ্যক চরিত্র বাড়ানো উচিত নয়। পূর্ব্বেই বলেছি গল্পের একটি চুম্বক (Synopsis) এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি চরিত্রলিপি (hart) বা পাত্র-পাত্রীর পরিচয় (List of characters) লিখে তারপর গল্পটিকে গড়ে তুলতে হবে তার প্রত্যেক দৃশ্যের খুঁটিনাটি বর্ণনা (Details) দিয়ে। এই বর্ণনা থেকে পরে চিত্র-নাট্য প্রস্তুত করতে হয়। কিন্তু তার আগে গল্পের প্রত্যেক দৃশ্যের প্রত্যেক ছবির (Shots) এক একটি ধারা (Sequences) বিভাগ ক'রে ফেলা দরকার। ধারা বিভাগ করবার নিয়ম হ'চ্ছে, একই স্থানে একই সময়ের মধ্যে ঠিক পরপর যে-সব ঘটনা ঘটে সেগুলিকে গল্পাংশের এক একটি ধারা হিসাবে একত্র করা; অর্থাৎ তার মধ্যে আর স্থানকালের পরিবর্ত্তন বা ব্যবধান থাকবে না। স্থানকালের পরিবর্ত্তন ঘটলেই তখন আবার সে দৃশ্য-

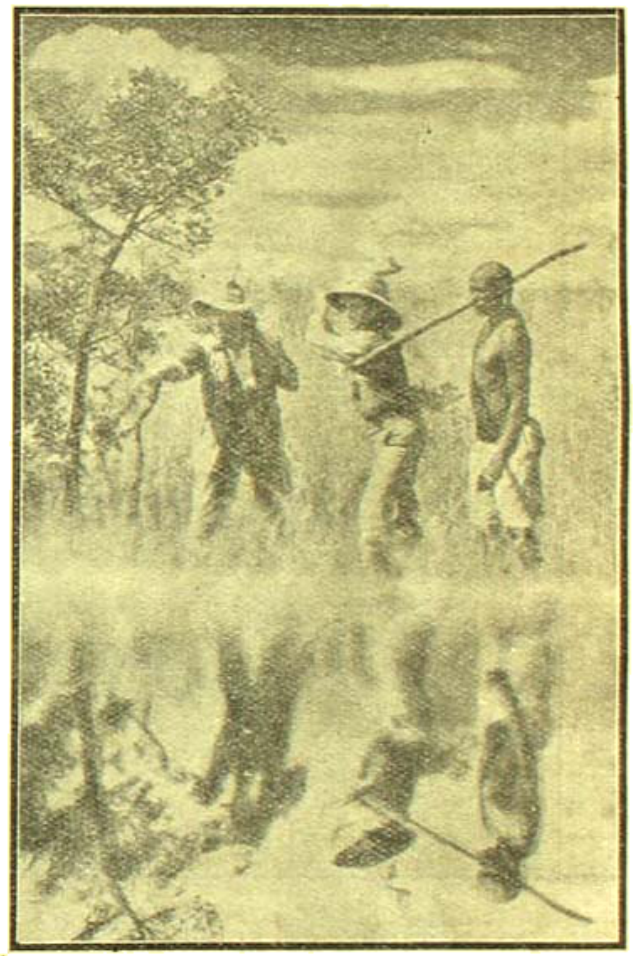

শিস্‌পট (Glnes Shot) (নকল জলের ছায়া)

গুলিকে দ্বিতীয় ধারার ছবি ব'লে ধরতে হবে। "বর্ষকালপরে" কিম্বা "তারপর দেখতে দেখতে পাঁচটি বৎসর কেটে গেছে!" এই ধরণের পরিচয়-লিপি ব্যবহার হ'লেই, তারপর থেকে দ্বিতীয় ধারার ছবি (Shots) একত্র করা হয়। যে ছবিতে সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত কোথাও স্থান-কালের পরিবর্ত্তন ঘটেনা, সেখানে ছবির ধারা-বিভাগ

ক'রতে হয় গল্পের চিত্রাকর্ষক অংশের শেষে ছেদ দিয়ে। অর্থাৎ গল্পের যে যে অংশ ক্ষুদ্র পরাকাষ্ঠায় (minor climax) পৌঁছেচে সেই সেই স্থানে বিরামকাল নির্দ্দেশ করে। আর ছবিতে গল্পের রস যেখানে পূর্ণমাত্রায় জমে উঠেছে তাকে বলে—Climax ! অর্থাৎ চিত্রকথার পরম পরাকাষ্ঠা।

যদিও 'চিত্র নাট্য' অবলম্বনে পরিচালক নিজের ব্যবহারের জন্য একখানি 'ছবির নক্সা' (Shooting

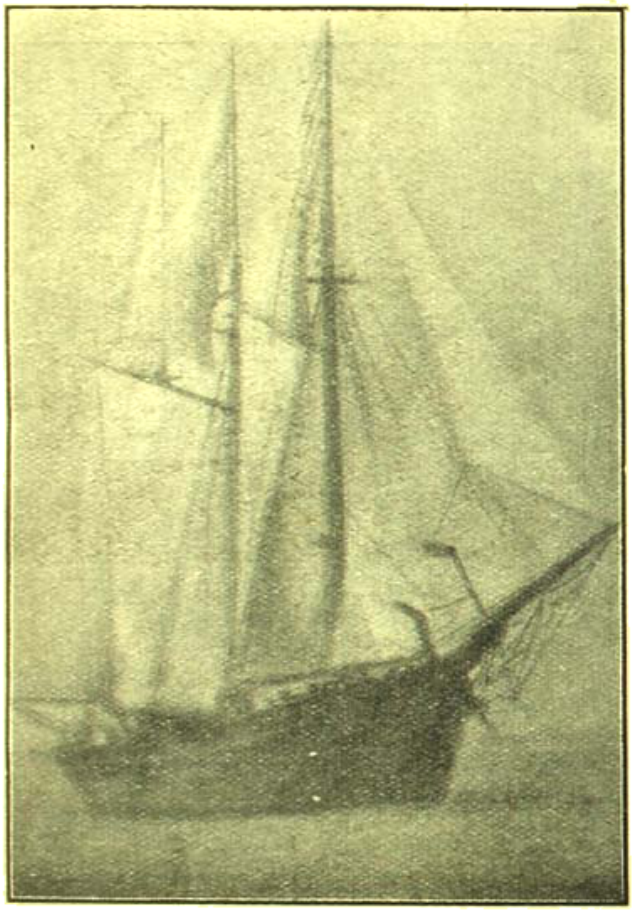

মন্দালোক সন্ধান (Soft Focus)
(কৃত্রিম কুজ্ঝটিকার জন্য)

Script বা Scenario plan) তৈরি ক'রে নেন, তবু, চিত্র নাট্য-রচয়িতাকে এমন ভাবে গল্পটি সাজিয়ে লিখতে হবে যেন পরিচালক একটি নিরেট মূর্খ, এ বিষয়ে তিনি একেবারে কিছুই জানেন না! ছবিখানির কোথায় কি ক'রতে হবে, কখন কোন্‌খানে ক্যামেরা বা ছায়াধর যন্ত্র কি ভাবে কাজ করবে, কোন্ দৃশ্যে কি আলোক থাকা চাই, কি সঙ্গীত (Music) কোন্‌খানে বাজাতে হবে। দৃশ্যপট (Set) কোথায় কেমনতর হবে। অভিনয় (Action) কোনখানে কী ভাবে হওয়া উচিত। পাত্র-পাত্রীরা কোথায় কি বেশে (costume) দেখা দেবে। কোন্ কোন্ দৃশ্যের পটভূমিকায় (back-ground)—পুরোভূমিকায় (Fore-ground) মধ্যাংশে (centre) কি কি সরঞ্জাম (Properties) থাকবে তা' নির্দ্দেশ করে দেবে। ছবিতে প্রত্যেক চরিত্রটির কার্য্যকলাপ (Business) চিত্রনাট্যে উল্লেখ করা চাই। কোন্ দৃশ্যের কি রকম পট (Shots) কতক্ষণ এবং কতখানি নেওয়া হবে, কি ভাবে সে ছবি নেওয়া সুরু হবে—এবং কি ভাবে শেষ হবে, পরের দৃশ্যে কেমন করে গিয়ে পৌঁছতে হবে, এ সমস্তই চিত্র-নাট্যকারকে লিখে দিতে হবে। অর্থাৎ চিত্রনাট্যখানি হওয়া চাই একেবারে ছবির কোষ্ঠি-পত্র !

সুতরাং সুপরিচালককে যেমন চলচ্চিত্র সম্বন্ধে সব কিছু ব্যাপারেই অভিজ্ঞ হ'তে হয়, চিত্রনাট্য-রচয়িতারও সেইরূপ চলচ্চিত্রের সকল বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়া দরকার, বিশেষতঃ ছায়াধর যন্ত্রের ব্যবহার তাঁর ভালোরকমই জানা থাকা চাই। প্রথমতঃ কোন্ দৃশ্যের কতদূর থেকে ছবি নিলে দর্শকদের চোখে দেখতে বেশ ভালো হয় এবং তার নাটকীয় রস নিবিড় হ'য়ে ওঠে, ও গূঢ় অর্থ পরিস্ফুট ক'রে তোলা যায় সেটি জানা ও শিক্ষা করা দরকার। আজ পর্য্যন্ত দৃশ্যপট থেকে ছায়াধর যন্ত্রের দূরত্বের সাতটি বিভিন্ন অবস্থান আবিষ্কৃত হয়েছে ; যথা—

১। **Long-Shot**—দূর পট, অর্থাৎ, অভিনেয় দৃশ্যটির যতটা সম্পূর্ণ ছবি নেওয়া যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ছায়াধর যন্ত্রটি যথাসম্ভব দূরে রেখে ছবি তোলা।

২। **Medium Long-Shot**—মধ্যম দূরপট, অর্থাৎ ছায়াধর যন্ত্রটিকে আরও একটু কাছে এনে অভিনেয় দৃশ্যটির কতক অংশের বা জনকতক অভিনেতৃর সম্পূর্ণ ছবি তোলা।

৩। **Meduim Mid-Shot**—মধ্যম-অর্দ্ধপট, অর্থাৎ

ছায়াধর যন্ত্রটিকে দ্বিতীয় অবস্থানের চেয়ে আরও একটু কাছে সরিয়ে এনে কেবলমাত্র একজন কোনো অভিনেতার বা দৃশ্যপটের

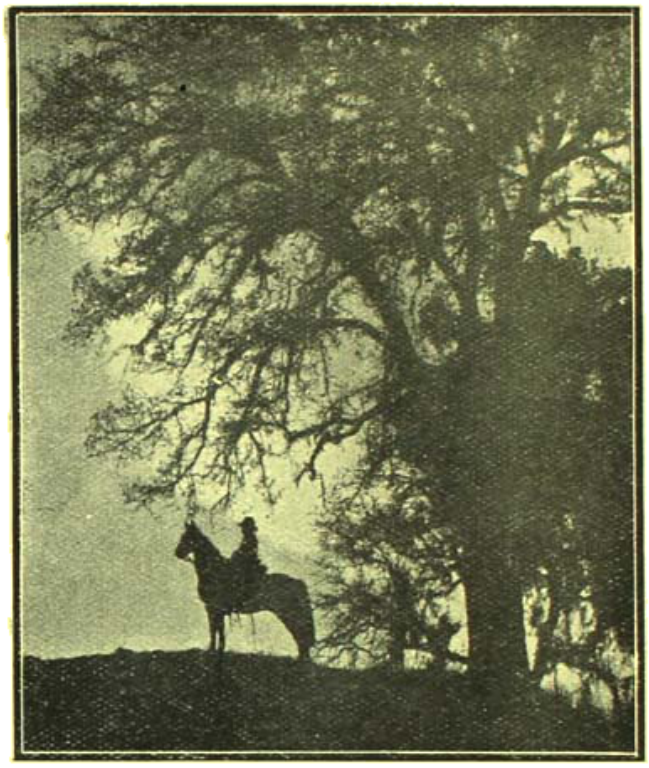

ছায়াপট (Silhouette)

একটা কোনো বিশেষ সরঞ্জামের তিন-চতুর্থাংশ ছবি।

৪। **Mid-Shot**—অর্দ্ধপট, অর্থাৎ ছায়াধরযন্ত্রটিকে তৃতীয় অবস্থানের চেয়ে আরও কাছে সরিয়ে এনে কোনো দৃশ্যের বা অভিনেতার অপেক্ষাকৃত বড়ো বা অর্দ্ধাংশ ছবি তোলা।

৫। **Medium Close-up**—মধ্যম নিকট পট, অর্থাৎ, অভিনেতৃদের মাথা থেকে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত ছবি নেওয়া, কাজেই ছায়াধর যন্ত্রকে আরও কাছে সরিয়ে আনতে হয়।

৬। **Close-up**—নিকট পট, অর্থাৎ ছায়াধর যন্ত্রকে খুব কাছে এগিয়ে এনে কেবলমাত্র মুখখানির ছবি তোলা।

৭। **Big Close-up**—বৃহত্তর পট, অর্থাৎ,—কেবলমাত্র চোখদুটি, বা একটিমাত্র চোখ, অথবা শুধু অধরপুট বা করপদ্ম বা চরণকমলের পদ্মা ছোড়া প্রকাণ্ড ছবি।

কেবলমাত্র মুখখানি বা চোখ দুটির ছবি ব'লছি বলে এমন যেন কেউ না মনে করেন যে নট-নটী ভিন্ন অন্য কোনো

ছায়া-কায়া (Silhoutte)

কিছুর ছবি এ-ভাবে নেওয়া চলবে না। বোঝবার সুবিধা হবে বলেই আমি মানুষের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছি, মানুষ,

চিত্রারূঢ় চিত্র (Superimpose)

মাঝের জাহাজখানির Soft Focusএ ছবি তুলে তার উপর পূর্ণ ফোকাসে সামনের দুখানি জাহাজের ছবি নেওয়া হয়েছে

জীবজন্তু, তৈজসপত্র, আস্‌বাব-সরঞ্জাম সব কিছুরই প্রয়োজন মত 'নিকট পট' (Close-up) ও বৃহত্তরপট—(Big Close-up) নেওয়া যেতে পারে—যেমন একগ্লাস জলে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে দেখাবার জন্য জলপূর্ণ গেলাসের কেবলমাত্র কানার সীমানায় জলের সঙ্গে বিষের ধীর-সংমিশ্রণ দেখানো যেতে পারে। কোনো সংবাদপত্রের একটি বিশেষ সংবাদের প্রতি বা কোনো চিঠির একটি বিশেষ অংশের দিকে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার আবশ্যক হ'লে এই 'নিকট পট' ও 'বৃহত্তর পট' কাজে

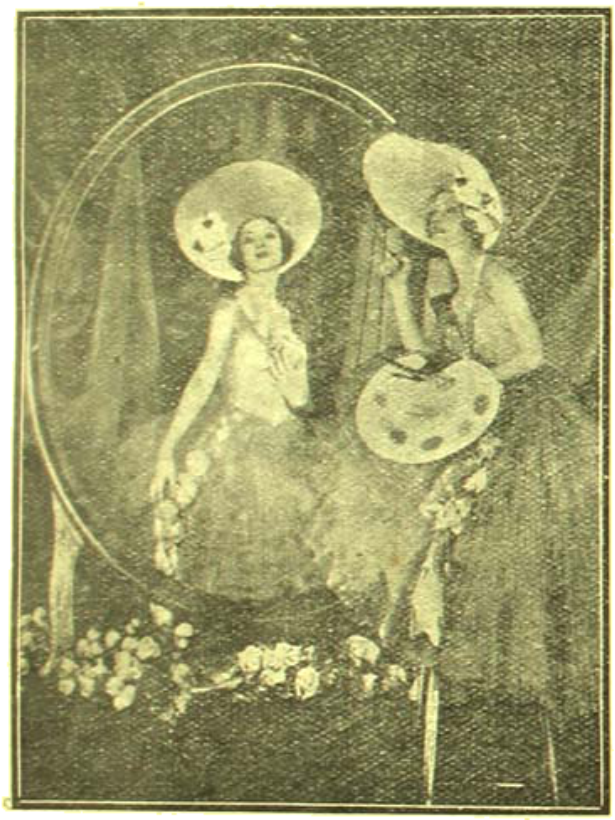

স্থির-চিত্র (Still Photo)

লাগে! কাণের দুলের একটি মুক্তা—হাতের আংটির একটি অক্ষরকেও ছবিতে এইভাবে তোলা চলে।

ছায়াবহ যন্ত্রের এই সব নির্দ্দেশ চিত্রনাট্যে কি ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে সেটা চিত্রনাট্যের গল্পের ও ঘটনাবলীর উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যেমন, ধরুন যদি এমন একটি গল্পের চিত্রনাট্য লিখতে সুরু করে থাকেন যার 'গোড়াতেই আছে' এক দরিদ্র গৃহের বধূ,—তাহ'লে দারিদ্র্যের একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করবার জন্য সে দৃশ্যপট বা রঙ্গস্থল (Set) হওয়া উচিত—রন্ধনশালা, কারণ, এইখানেই মানুষের প্রধান অভাব তাকে পীড়া দেয়! অতএব আরম্ভ করা যেতে পারে :—

Fade-in (ক্রমবিকাশ) প্রথম দৃশ্য—দূরপট—(long-shot) রন্ধনশালা, দ্বার বন্ধ দেখা যাচ্ছে!—এইখানে গল্পের গঠন (Treatment) অনুযায়ী

গ্লাস্ পট (Glass Shot)

রন্ধনশালার বর্ণনা দিতে হবে—যেমন উনুন নিভে গেছে। কাঠ নেই, কয়লা নেই, হাঁড়িতে চাল বাড়ন্ত, তেল নুণও ফুরিয়েছে। তরিতরকারীর একান্ত অভাব! একটা বেরাল কেঁদে বেড়াচ্ছে। এ-পাত্র ও-পাত্র উঁকে খেতে

যাচ্ছে, দেখে সবই শূন্য!—(এখানে একটা শূন্য ভাঁড়ের নিকট পট (close-up) দেওয়া চলে!) এমন সময় দ্বার ঠেলে খুলে সে ঘরে বধূর প্রবেশ। তারপর, মধ্যম দূরপট—(Medium long-shot)—দ্বিতীয় দৃশ্য,—রন্ধনশালার অভ্যন্তরে বধূর আগমন। বধূর কার্য্য-কলাপ (Action) বর্ণনা করবার জন্য এখানে (Business) বা 'অভিনয় নির্দ্দেশ' থাকা চাই! যথা :—বধূ ধীর মন্থরপদে রান্নাঘরে ঢুকে উনান ও ভাঁড়ারের অবস্থা দেখে হতাশ হ'য়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললে। এটা ওটা নেড়ে-চেড়ে দেখে ক্ষুণ্ণমনে ও অবসন্ন পদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। যাবার সময় একটা ছোট চুপড়ি ঘরের মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিলে,—বধূর ছিন্নমলিন বেশ, হাতে দু'গাছি পালার কলি এবং কপালে মস্ত সিঁদূরের টিপ না থাকলে—বিধবা ব'লেই মনে হ'ত!

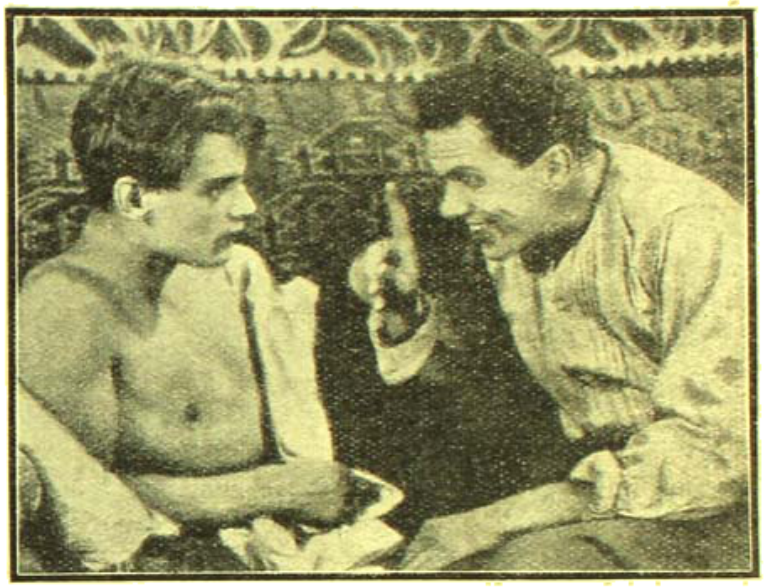

অর্দ্ধ-পট (Mid-Shot)

প্রথম দৃশ্যের শেষ ও দ্বিতীয় দৃশ্যের সুরু কি ভাবে হবে কিছু লেখা নেই। কাজেই পরিচালক এখানে ছায়াধর-যন্ত্রীকে (Camera-man) নির্দ্দেশ কর'বেন—'Cut' অর্থাৎ 'ছেদ'। কোনো কোনো চিত্রনাট্য-রচয়িতা—যে যে দৃশ্যের যেখানে 'ছেদ' হবে তা উল্লেখ ক'রে দেন, উল্লেখ করাটাই ভালো, কারণ, পূর্ব্বেই বলেছি—পরিচালকের উপর নির্ভর করা চিত্রনাট্য-রচয়িতার পক্ষে নিষেধ!

তারপর ধরুন গল্পে আছে, বধূ রন্ধন-শালা থেকে চুপড়ি হাতে বেরিয়ে খিড়কীর পুকুরে গেল কলমীশাক তুলতে; চিত্রনাট্যে লিখতে হবে—Third scene—বাগানের পথ— Medium long-shot Trucking forward to—খিড়কীর পুকুর। তৃতীয় দৃশ্য—রন্ধনশালা থেকে বেরিয়ে বধূ চলেছে বাগানের পথ দিয়ে—খিড়কীর পুকুরের দিকে (মধ্যম দূরপট) আমবাগান পার হয়ে পেয়ারাতলা ঘুরে বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে সুপুরী গাছের সারির ভিতর দিয়ে বধূ চলেছে (Truck-shot—অনুধাবন পট) খিড়কীর পুকুরে।

চতুর্থ দৃশ্য—খিড়কীর পুকুরঘাটে বধূ এসে পৌঁচেছে—সমস্ত পুকুরটার দিকে চেয়ে দেখ্‌ছে কলমীশাক আছে কিনা;—চিত্রনাট্যে লিখতে হবে Truck-shot leads বধূ to scene IV—খিড়কীর পুকুর, বধূ ঘাটে দাঁড়িয়ে—

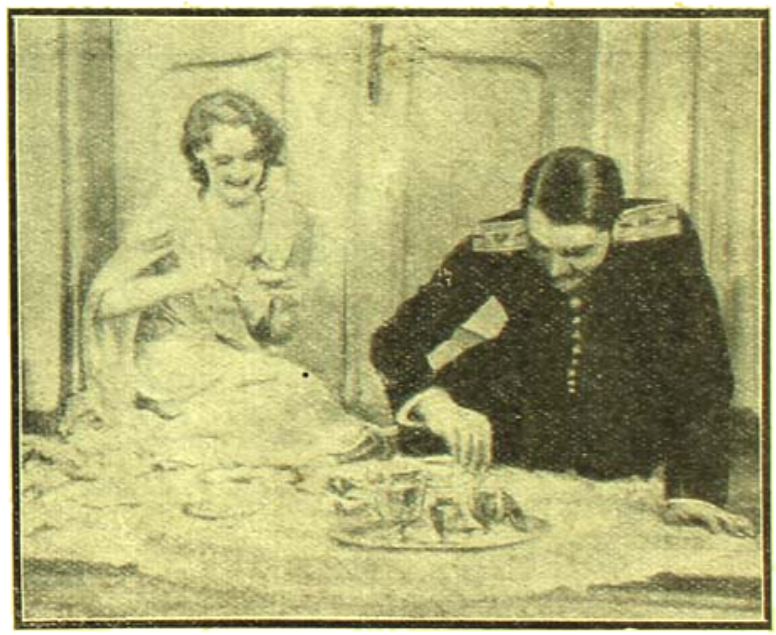

মধ্যম-অর্দ্ধ পট (Medium Mid-Shot)

medium long-shot (মধ্যম দূরপট) mix to (মিশ্রণ) পঞ্চম দৃশ্য—খিড়কীর পুকুর, দূরপট (long-shot) বধূ.

দেখছে আশে পাশে চেয়ে কর্ম্মীশাক আছে কিনা—(পর্য্যবেক্ষণ পট) (Panoram) পুকুরের এক কোণে চারটি কলমীশাক দেখা গেলে—(মধ্যম নিকট-পট)—(medium close-up) বধূ সন্তর্পণে জলে নামছে সেই

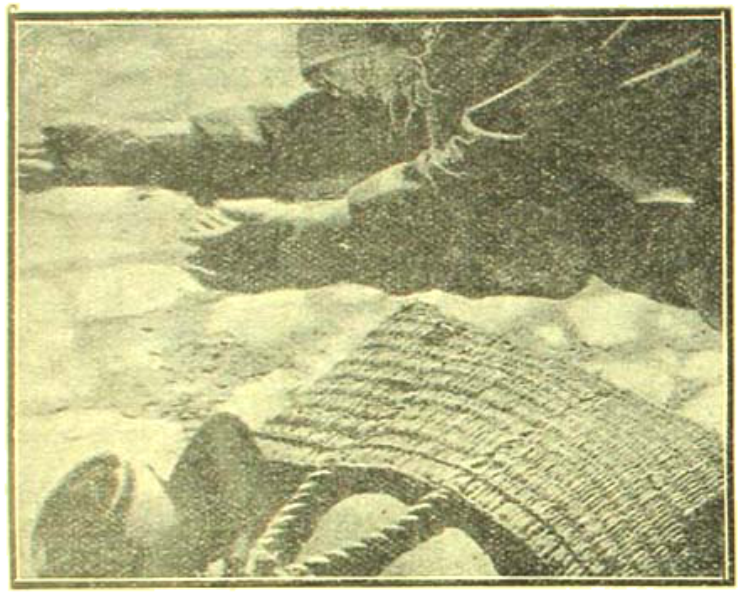

মধ্যম নিকট পট (Medium Close-up)

শাক তুলতে ; পাওলাতে পিছলে তার পা হড়কে যাচ্ছে—(নিকট পট) (close-up) বধূ পুকুর নেমে শাক তুলতে হেট হ'য়ে হাত বাড়ালো—দূরপট (long-shot)

পর্য্যবেক্ষণ-পট (Panoram)

পা' পিছলে জলে পড়ে গেলো—দূরপট (long-shot) বধূ জলে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে—(Iris in—বৃত্তি মুক্তি) বাঁচবার জন্য বধূর প্রাণান্ত চেষ্টা (নিকট পট) বধূ ডুবে গেলো ! (বৃত্তিরোধ—Iris out)—এই যে দৃশ্যগুলি পরের পর তোলা হ'লো—একে বিভাগ করবার সময় একই ঘটনার একই দৃশ্যের বিভিন্ন চিত্রগুলিকে এক একটি ধারায় (Sequence) বিভক্ত করতে হবে। এর মধ্যে আরও দুটি বিভাগ আছে—আভ্যন্তরীণ দৃশ্য (Interior scene) যেমন রান্নাঘর এবং বহির্দৃশ্য (Exterior scene) যেমন বাগান ও খিড়কীর পুকুর। চিত্রনাট্যের প্রত্যেক দৃশ্যে ঘটনাস্থল সম্বন্ধে এ বিভাগেরও উল্লেখ থাকা চাই। ছায়াধর-যন্ত্রের দূরত্বের পরিমাপ বা অবস্থা নির্দ্দেশপূর্ব্বক চিত্রনাট্য রচনা ক'রতে গেলে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য সম্পর্কে আরও যে সব মন্তব্য যে যে অবস্থায় লেখা প্রয়োজন হয় এখানে সেগুলির বিশেষ সংজ্ঞা (Technical Terms) একত্র করে দিলুম—

বাঁকা পট (Angle-shot)—অর্থাৎ যে ছবি সামনে দিক থেকে না তুলে একটু ট্যারচা ভাবে বাঁকা দিক থেকে বা কোণাকোণি তোলা হয়।

অস্থির পট Akeley shot)—অর্থাৎ যে ছবিতে দ্রুত-গতিশীল বা বেগবান কোনো কিছুর—যেমন চলন্ত ট্রেন, মটোর গাড়ী বা যে ছুটন্ত তার ছায়া-ছবিকে দর্শকের দৃষ্টির বাইরে যেতে না দিয়ে ক্রমাগত শুধু সে ছবির পট-ভূমিকা দূরে সরে সরে যাচ্ছে দেখানো হয়। Akeley নামে একজন শিল্পী এই ধরণের ছবি তোলার এই কৌশল প্রথম উদ্ভাবন করেছিলেন ব'লে তাঁর নামেই এর নামকরণ হ'য়েছে। এঁর নামের 'একলী ক্যামেরা'ও প্রসিদ্ধ।

ছেদক (Cut)—একই দৃশ্যের ভিন্ন ভিন্ন ছবি নেবার সময় প্রত্যেক ছবির পর যে ছেদ্ পড়ে তাকে বলে Cut! ছবির রকম যেখানে বদলে যায় সেইখানে ছায়াবাহন (Film) কেটে দ্বিতীয় ছবির সুরু হচ্ছে যে অংশে সেইখানে লাগিয়ে দেওয়া হয়। আবার রঙ্গস্থলে পরিচালকরাও অনেকেই ছবি তোলা বন্ধ রাখবার নির্দ্দেশ দেবার সময় এই 'cut' শব্দ ব্যবহার করেন। এবং ছবি তোলবার ইঙ্গিত করেন তাঁরা 'Camera' এই শব্দ উচ্চারণ করে!

সন্নিবেশ (Insert)—চিঠি, টেলিগ্রাম, সংবাদপত্রের খবর, বিজ্ঞাপন, উইল, দলিল, ইত্যাদির আলোক-চিত্র পৃথক তুলে নিয়ে পরে চলচ্চিত্রের মধ্যে যথাস্থানে সন্নিবেশ করা।

বৃত্তিমুক্তি (Iris in)—অর্থাৎ একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত ক্রমশ চক্রাকারে প্রসারিত ও বিবর্দ্ধিত হ'য়ে প্রদর্শনীয় চিত্রখানিকে পর্দ্দার উপর মুক্ত ক'রে ধরে।

বৃত্তিরোধ (Iris-out)—অর্থাৎ উক্ত চক্রাকারে প্রসারিত ও বিবর্দ্ধিত বৃত্ত ক্রমশ সংহত ও সঙ্কুচিত হ'য়ে এসে প্রদর্শনীয় চিত্রখানিকে দর্শকদের দৃষ্টিপথ থেকে রোধ করে।

বৃত্তি-বিকাশ (Iris-View)—চক্রাকার বৃত্তি- বন্ধনীর মধ্যে প্রদর্শনীয় চিত্রের পূর্ণ-বিকাশ। ঠিক্ গোল ফ্রেমে আঁটা ছবির মত!

সংযুক্ত শট (Composite shot)—অর্থাৎ একই ছায়া বাহনের উপর একাধিক চিত্র তোলা অথবা কোনো বিশেষ দৃশ্যের এক সঙ্গে তিনদিকের ছবি নেওয়া)

বিলয়ন (Dissolve)—একখানি ছবি পর্দ্দার বুকে ধীরে

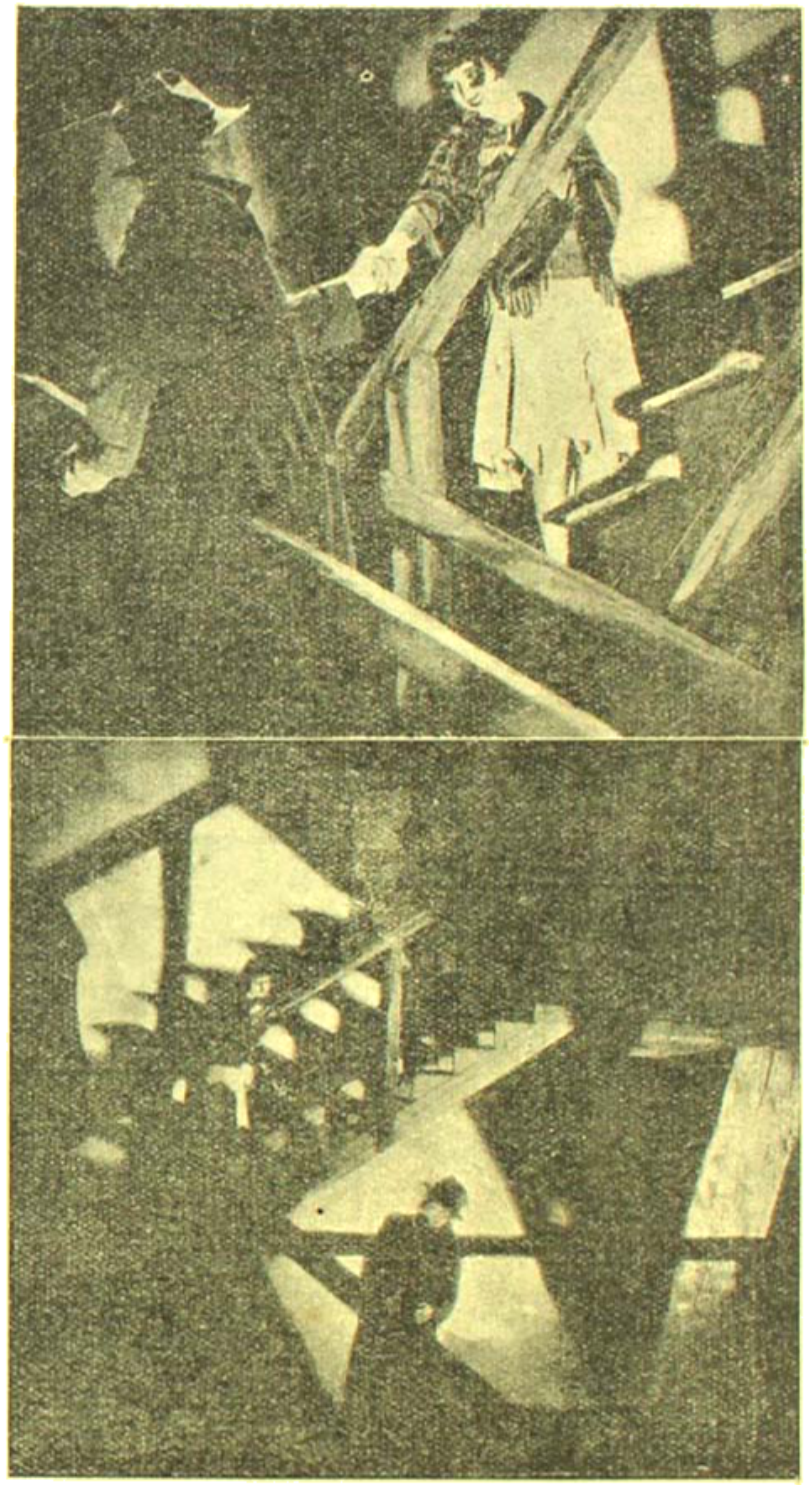

অনুধাবন-শট (Truck Shot)

ধীরে মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতর থেকে আর একখানি ছবি ফুটে ওঠা।

মিশ্রণ (Mix)—দু'খানি ছবির পরস্পরের মধ্যে মিশিয়ে এক হওয়া। এটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ঘটে, কিন্তু 'বিলয়' ছায়াধর-যন্ত্রেই হয়।

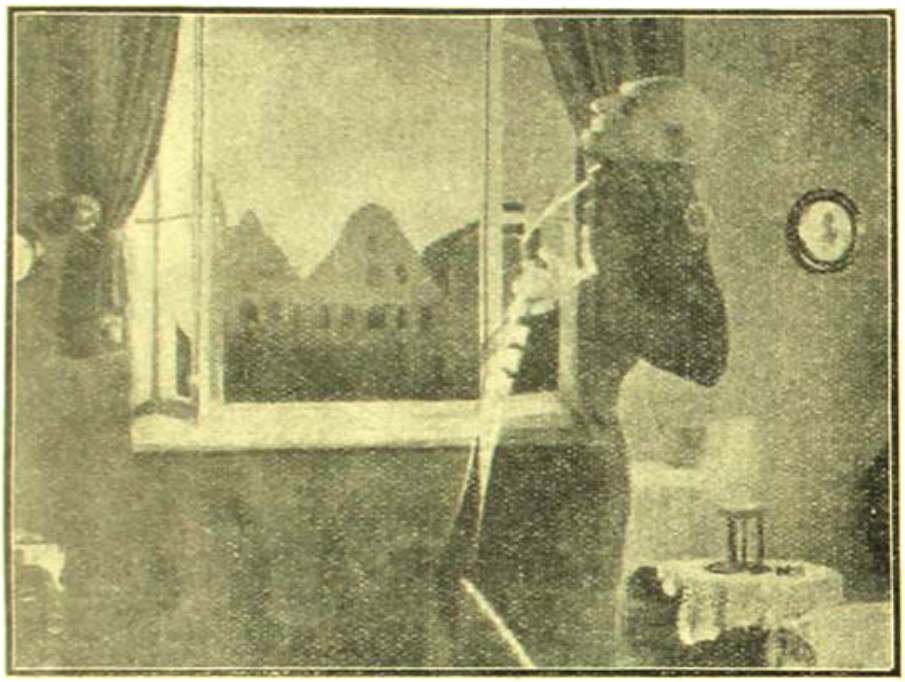

ছিট্‌পট (Mark Shot)
(জানালার কাঁক দিয়ে বাহিরের দৃশ্য তোলা হয়েছে)

কারু-চিত্র (Art Film) এই ছবির পটভূমিকা আগাগোড়াই শিল্পীর কল্পনালোকের, স্বাভাবিক নয়

অন্তর্লোপ (Lap-dissolve)—অর্থাৎ দ্বিতীয় ছবিখানি পর্দ্দার উপর সম্পূর্ণ ফুটে ওঠবার পর প্রথম ছবিখানি ক্রমশঃ ছোট হ'য়ে তার কোলে মিলিয়ে যাওয়া।

ক্রম-বিকাশ (Fade-in)—শূন্য পর্দ্দার উপর ক্রমশ একখানি ছবি ফুটে ওঠা। এটা প্রায়ই ছবির ধারা (Sequence) পরিবর্ত্তনের মুখে সময় জ্ঞাপনের জন্য ব্যবহার হয়। ক্রমবিকাশের গতি তিন রকম—সহজ ক্রমবিকাশ, দ্রুত-ক্রমবিকাশ, মন্থর ক্রমবিকাশ।

ক্রমবিনাশ (Fade-out)—ঠিক ক্রমবিকাশের বিপরীত। ক্রমশঃ ছবিখানি পর্দ্দার উপর থেকে সরে গিয়ে পর্দ্দা শূন্য হয়ে যায়। এরও তিন রকম গতি—সহজ, দ্রুত ও মন্থর।

আলোক-সন্ধান (Focus)—একটা কিছু লক্ষ্য ক'রে সমস্ত আলো তারই উপর একত্রে নিক্ষেপ করা। ছায়াধর-যন্ত্রের আলো ছায়ার সন্ধানকেও 'ফোকাস্' করা বলে।

চমক পট (Flash shot)—দীর্ঘ চলচ্চিত্রের মধ্যে একআধবার এক টুক্‌রো ছায়া-বাহন কয়েকটা মাত্র ছবি নিয়ে

হঠাৎ পর্দ্দার উপর চমক্ দিয়ে যায়, নায়ক নায়িকার মনে কোনো অতীত সুখ বা দুঃখের স্মৃতিটুকু অকস্মাৎ জাগাতে! আলোক-সম্পাতের ব্যাপারেও এই 'ফ্ল্যাশ্' ব্যবহার হয়; সেখানে এর অর্থ হ'চ্ছে অন্ধকারের মধ্যে কোন কিছুকে হঠাৎ আলো ফেলে দীপ্ত ক'রে তোলা!

শিস্-পট (Reflection or Glass-shot)—অর্থাৎ যেখানে দৃশ্যপটের (Set) অর্দ্ধেকটা তৈরি ক'রে নিয়ে বাকীটা আয়নার সাহায্যে সম্পূর্ণ করে তুলে ছবি নেওয়া হয়। অথবা ছবির সঙ্গে অভিনেতৃদের মুকুরে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বও তোলা হয়।

অকু-স্থান (Location)—চিত্রের বহির্দৃশ্য তোলবার উপযোগী যে অনুকূল স্থান নির্ব্বাচন করে নেওয়া হয় তা কে বলে—'লোকেশান্'।

ছিদ্র-পট (Mask-shot)—অর্থাৎ বিশেষ কোনো একটা ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ছবিখানি দেখতে পাওয়া। যেমন ধরুণ দরজার চাবীকলের ফুটো দিয়ে, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ঘুণনলের ভিতর দিয়ে, ঘরের নর্দ্দমার ফাঁক দিয়ে, জানালার ভাঙা সার্শীর ভিতর দিয়ে, দেওয়ালের ঘুলঘুলির ফুটো দিয়ে ইত্যাদি। ক্যামেরা মুখে প্রয়োজনীয় ছিদ্রের আকারে একটি মুখোস কেটে লাগিয়ে দিয়ে এই রকম ছবি তোলা হয় ব'লে এর নাম—'মাস্ক্ শট্'।

পর্য্যবেক্ষণ-পট (Panoram)—অর্থাৎ যখন কোনো স্থিতমূলের উপর কেবলমাত্র ছায়াধর যন্ত্রটিই উপর নীচের বা ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে ঘুরে কোনো ছবি তোলে—যেমন ধরুণ যদি একটি মেয়ের দুটি আলতাপরা পা থেকে ক্রমে ক্রমে তার মাথার খোঁপাটি পর্য্যন্ত ছবিতে দেখাবার দরকার হয়—তাহ'লে স্থিতমূলের (Fixed base) উপর মাত্র ছায়াধর-যন্ত্রটি নড়বে ধীরে ধীরে নীচ থেকে উপরের দিকে। একে ব'লে 'ঊর্দ্ধ-পর্য্যবেক্ষণ' (Panoram up !) এই-রকম নিম্ন-পর্য্যবেক্ষণ (Panoram down) এবং বামে ও দক্ষিণে পার্শ্ব-পর্য্যবেক্ষণ (Panoram Right or Panoram left) পট তোলা হয়। এর আবার ত্রিবিধ গতির পার্থক্য আছে—দ্রুত, মধ্যম ও মন্থর। ছায়াধর যন্ত্রীকে ডেকে চিত্র নাট্যের প্রয়োজনমত পরিচালক হাঁকেন—"Quick Panoram down !"—দ্রুত-নিম্ন পর্য্যবেক্ষণ ! ইত্যাদি।

প্রতীক (Symbol)

(কৃষ্ণ দেশে বসন্তকালে শ্বেত ভাল্লুক দেখা যায় খুব বেশী তাই বসন্তের আবির্ভাব বোঝাবার জন্য এখানে শ্বেত ভল্লুকের প্রতীক্ ব্যবহার করা হয়েছে)

দোলন পট (Rocking shot)—আগে ছায়াধর যন্ত্রটিকে তুলিয়ে এই দোলনপট নেওয়া হ'তো, আজকাল আর তা হয়না ; এখন ছায়াধর যন্ত্রকে স্থির রেখে সমস্ত দৃশ্যপটটি তুলিয়ে এই দোলনপট তোলা হয়। সমুদ্রের ঢেউয়ে ঝড়ের দোলা লাগা জাহাজের কামরার ভিতরের ছবি ইত্যাদি নেবার সময় এই দোলোন-পট নিতে হয়—এতে ঝড় তুফানের রূপটা চিত্রে সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে !

চিত্র-ধারা (Sequence)—একই সময়ে সংঘটিত একই দৃশ্যাভিনয়ের যে সকল ভিন্ন ভিন্ন চিত্র নেওয়া হয়—সেগুলিকে এক একটি পৃথক ধারা হিসাবে গণ্য করা হয়।

চিত্রনাট্য (Scenario)—চলচ্চিত্রের গল্পটি ছায়াধর যন্ত্রের সম্মুখে যে ভাবে অভিনীত হবে তারই একটি সম্পূর্ণ বিবরণীকে বলে চিত্রনাট্য।

সংক্ষিপ্তসার (Synopsis)—গল্পের চুম্বককে বলে সিনপ্‌সিস্।

গল্পের কাঠামো (Treatment)—গল্পের চুম্বক থেকে গল্পটির চিত্রনাট্য হিসাবে কতটা সম্ভাবনা আছে দেখাবার জন্য তার একটি রস-বিশ্লেষণমূলক আদ্‌রা গড়ে তোলা।

ছবির নক্সা (Shooting Script or Scenario-Plan)—চিত্রনাট্য থেকে পরিচালক তাঁর কাজের সুবিধার জন্য যে খস্‌ড়ায় দৃশ্যপট ও দৃশ্যাভিনয়ের শ্রেণী-

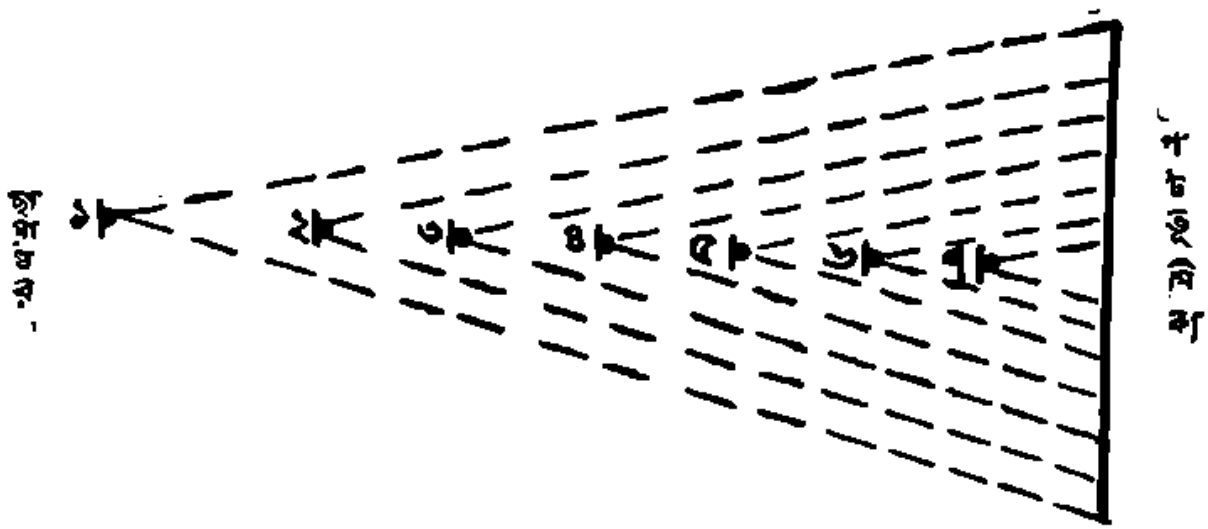

দূরত্ব সঙ্কেত (Distance Denomination) (দৃশ্যাভিনয়ে ছায়াধর-যন্ত্র পটভূমিকার কতটা দূর হ'তে ছবি নেবে তারই সঙ্কেত)

১ দূর-পট ২ মধ্যম দূর-পট ৩ মধ্যম অর্দ্ধপট ৪ অর্দ্ধপট ৫ মধ্যম নিকট পট ৬ নিকট পট ৭ বৃহত্তর পট

দৃশ্যাভিনয় (Scene)—চলচ্চিত্রে 'সীন' ব'লতে দৃশ্যপট বোঝায় না, 'দৃশ্যাভিনয়' বোঝায়। কিন্তু অনেকেই ভুল করে দৃশ্যপটকে (Set) 'সীন' বলে উল্লেখ করেন। চলচ্চিত্রে গল্পের যে যে অংশ ছায়াধর যন্ত্রের সম্মুখে অভিনীত হয় তাকেই বলে 'সীন্' অর্থাৎ দৃশ্যাভিনয়। এবং 'দৃশ্যপট'কে বলে 'সেট্'।

বিভাগ, ধারা নিরূপণ, বর্ণনা, সংখ্যা, ও সময় নির্দ্দেশ, পট-নির্ঘণ্ট, আলোক-বিধি ও ছায়াধর যন্ত্র ব্যবহার সম্বন্ধে সব কিছু সঙ্কেত লিপিবদ্ধ করে নেন।

পট গ্রহণ (Taking or Shooting)—ছবি তোলাকে বলে।

পট (Shot)—দৃশ্যাভিনয়ের অংশ বিশেষের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড চিত্র।

অনুধাবন পট (Truck Shot)—চলমান বা গতিশীল কোনো ব্যাপারের অনুধাবন করতে করতে ছায়াধর-যন্ত্র যে সচল ছবি তোলে। এরও গতি তিন রকম—দ্রুত, মধ্যম, মন্থর! ধরণও একাধিক, যেমন সম্মুখ বা পশ্চাৎ অনুধাবন—Forward or backward Trucking.

চিত্রারূঢ় পট (Superimpose)—অর্থাৎ এক-খানি ছবির উপর আর একখানি ছবি নেওয়া। যেমন—চিত্রের উপরই চিত্র-পরিচয় ছাপা (double exposure)

চিত্র পরিচয় (Titles)—ছবির পরিচয় ও ব্যাখ্যা। চিত্র পরিচয় দুরকম—'শ্রেষ্ঠ পরিচয় (Grand Title) ক্ষুদ্র পরিচয় (Sub-Title) 'শ্রেষ্ঠ পরিচয়' হচ্ছে ছবির ভাবোদ্দীপক রসের সংজ্ঞা, 'ক্ষুদ্র পরিচয়' হ'চ্ছে তিনরকম—কথোপকথন, বিষয়-বর্ণনা, সময়-নির্দ্দেশ।

সঙ্কর পট (Vignette Shot)—একই ছবির এক অংশ স্পষ্ট, অন্য অংশ অস্পষ্ট!—ছায়াধর-যন্ত্রের ব্যবহার-কৌশলে আলো-ছায়ার তারতম্য সৃষ্টি করে এই সঙ্কর পট নেওয়া হয়।

পটচ্ছেদ (Vignetting)—দৃশ্যপট বা চিত্রা-ভিনেতাদের ছবির খানিকটা বাদ দিয়ে খানিকটা রাখা। যেমন ধরুণ একটি মেয়ে ঝোপের মধ্যে একটা গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছবিতে ঝোপ উড়িয়ে দিয়ে, গাছের মাথাটাও খানিকটা বাদ দিয়ে শুধু দেখানো হ'ল গুঁড়িতে হেলান দিয়ে মেয়েটি দাঁড়িয়ে।

মন্দালোক সন্ধান (Soft Focus)—যে চিত্র ছায়াধর যন্ত্রের রকমারি টুলির (Focus disc or Gauze Cover) ভিতর দিয়ে তোলা হয়—একটা মৃদুল পেলব রহস্যময় আপ্লুতা ধরণের ছবি নেবার জন্য।

মন্থর পট (Slow Shot)—এ ছবি নেওয়া হয় ছায়াধর-যন্ত্রের হাতল প্রচণ্ড বেগে ঘুরিয়ে, অর্থাৎ যেখানে মিনিটে ২৪খানি ছবি নেবার কথা সেখানে হয়ত মিনিটে ১৪৪ খানি ছবি নেওয়া হ'লো কিন্তু পর্দ্দায় ফেলে দেখাবার সময় প্রদর্শক-যন্ত্রে মিনিটে ২৪ খানির বেশী ছবি না দেখালেই ছবির দৃশ্যাভিনয়ের গতি মন্থর হ'য়ে যাবে।

স্থির-চিত্র (Still Photograph)—চলচ্চিত্রের কোনো দৃশ্যের সাধারণ আলোক-চিত্র।

প্রতীক (Symbol)—চিত্রনাট্যের নায়ক নায়িকার মনের অবস্থা বা তাদের আসন্ন ভবিষ্যৎ বা বিপদের সূচনার ইঙ্গিত দেবার জন্য প্রকৃতি বা পশু-পক্ষীর দৃষ্টান্ত দিয়ে জীবনের প্রতিকূল বা অনুকূল অবস্থার আভাস দেওয়া।

ছায়া-পট বা ছায়া-কায়া (Silhouette)—অর্থাৎ মৃদু আলোকোজ্জ্বল দৃশ্যে নরনারী বা পশু-পক্ষীর কেবলমাত্র ছায়া-মূর্ত্তিটী দেখা'নো।

চিত্রনাট্যের রচয়িতাকে এই সাঙ্কেতিক নির্দ্দেশগুলির প্রত্যেকটি কথা মনে রেখে ছবিতে কোথায় কোন্‌টি কি ভাবে ব্যবহার হ'লে ছবিখানি অধিকতর সুন্দর ও মনোজ্ঞ হবে তা সবিশেষ বিবেচনা ক'রে তবে ব্যবহার করতে হয়। পূর্ব্বেই বলেছি ছবিতে 'চিত্র পরিচয়' যত কম ব্যবহার করা হয় ততই ভালো। যেখানে ব্যাপারটা ছবিতেই বোঝানো চলবে—সেখানে 'কথা দিয়ে' কখনই তা বোঝাবার চেষ্টা করা উচিত নয়। যেখানে 'কথা' ব্যবহার করতেই হবে সেখানে 'চিত্রপরিচয়' যত ছোট হয় ততই ভালো। ছোট হলেও কিন্তু, লক্ষ্য রাখতে হবে যে তার রচনাভঙ্গী সাহিত্য রসের ও ভাব-ব্যঞ্জনার দিক দিয়ে যেন একটুও নিকৃষ্ট না হয়! ধরুন, গল্পে আছে কোনো নায়ক মনের দুঃখে সংসার ত্যাগ করে কাশীবাস করতে গেলেন,—এখানে চিত্র-পরিচয়ে যদি শুধু দেওয়া হয়—তখন তিনি কাশী গেলেন—তারপর ছবিতে যদি কাশীর 'পর্য্যবেক্ষণপট' দেওয়া হয় তাহ'লে মিনিমটা অতি তুচ্ছ হ'য়ে যায়! কিন্তু সেখানে চিত্র-পরিচয়ে যদি দেওয়া হয়—"তখন তিনি কাশী গেলেন—ভারতের প্রাচীনতম পুণ্যতীর্থ বারাণসী—কত দেবর্ষি, রাজর্ষি, সাধুসজ্জনের সাধনভূমি, পতিতপাবনী গঙ্গার পূত-তরঙ্গ-বিধৌত শ্রীভগবান বিশ্বনাথের অনন্ত শান্তি-নিকেতন বারাণসী—তাপিত প্রাণ যাঁর কোলে আশ্রয় পেয়ে জুড়িয়ে যায়—তারপর যদি কাশীর 'পর্য্যবেক্ষণ পট' দেখানো হয় ছবিখানির মর্য্যাদা অনেক বেড়ে যাবে। এমনি করে সবদিক ভেবে বিবেচনা ক'রে তবে চিত্র-পরিচয় লিখতে হয়। 'সব চিত্রপরিচয়' পড়ে যাতে ছবির ঘটনার দিকে দর্শকের আগ্রহ আরও বেড়ে ওঠে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত।

গ্রাম-দেবতা

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গ্রামের ঠিক মাঝখানে বাবা রুদ্রেশ্বর মহাদেবের মন্দির। মন্দিরটি বহুকালের পুরাতন এবং সম্প্রতি সংস্কার অভাবে জরাজীর্ণ। চৈত্র সংক্রান্তির গাজনের সময় আগে না কি খুব ঘটা করিয়া পূজা হইত; পূজা এখনও হয় কিন্তু আগেকার মত সে জাঁকজমক আর নাই।

নাই বলিয়া যে কাহারও বিশেষ ক্ষোভ আছে তাহা নয়, তবে মন্দিরটির সংস্কারের জন্য গ্রামের লোক প্রায় প্রতি বৎসরই একবার করিয়া চেষ্টা করে। গাজনের আগে দোলো আনার একটি মজলিস ডাকা হয়। মন্দিরের সুমুখে প্রকাণ্ড বটগাছটির তলায় জনকতক লোক আসিয়া বসে। কেহ হয় ত এই বলিয়া কথাটা প্রথমে উত্থাপন করে যে, মন্দিরের উপরে অশ্বত্থের গাছটি দিনে-দিনে যেরূপভাবে বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে মনে হয়, যেন আর বছর কয়েকের মধ্যেই মন্দিরটিকে সে ফাটাইয়া চৌচির করিয়া দিবে, সুতরাং অচিরে ইহার একটা প্রতিবিধান আবশ্যক।

সকলেই একবাক্যে তাহার সমর্থন করে।

শম্ভু বলে, 'তা ঠিক। এই শালা অশ্বত্থগাছ এমন পাজি যে, দালানের ওপর হ'লে আর তার রক্ষে নেই। সালানপুরের বাবুদের বাড়ীটা দেখেছ ত?'

রতন বলে, 'ও শালাদের নাম আর মুখে এনো না। শালারা নিজেদের অমন সুন্দর বাড়ীঘর ছেড়ে দিয়ে কি না বাস করলো গিয়ে কলকাতায়। দালান ফাটবে না ত' কি হবে? আজকাল দিনের বেলা ওখানে শেয়াল ডাকে, তা জানো?'

'আর ওই জামুড়ি যেতে বাঁহাতি সেই গাঁটা ঢুকতে—'

কথাটা আর-একজন লুফিয়া লয়। বলে, 'হাঁ, সেই পাথরের মন্দিরটা! গেছে একেবারে ফেটে চৌচির হ'য়ে।'

এমনি করিয়া একথা সে-কথা হইতে হইতে কথার ধারাটা চলিয়া যায় অন্য দিকে। কে একজন বলিয়া ওঠে,

'গাছে তাহ'লে পাথরও ফাটিয়া দেয়। কি বল, এ্যাঁ?'

শম্ভু বলিল, 'পাথর পুড়ে, তা জানো?'

অবিনাশ বিশ্বাস করিল না। বলিল,—'হ্যাঁ গো! তাই আবার পুড়ে!'

শম্ভু বলিয়া উঠিল, 'এ শালা কোথাকার মুখ্খু হে! চল্ তোকে দেখিয়ে নিয়ে আসি। রাণীগঞ্জের একটা কয়লা-খাদে আগুন লেগেছে। আমি সেদিন স্বচক্ষে দেখে এলাম—পাথর পুড়ছে—একেবারে রাঙা টক্‌টকে হয়ে।'

'সর্ব্বনাশ! পাথরেও আগুন লাগছে। তবে আর বক্কাস্থি-দেবকে এত ভয় করি কেনে। যে ঝড়ঝড়ে' বাতাস! গাঁয়ের ও-মুড়োয় লাগলে একেবারে এ-মুড়োয় এসে থামবে।'

বছর-দুই আগে গ্রামে একবার আগুন লাগিয়া অনেকের অনেক কিছু ক্ষতি হইয়া গেছে, সেই অবধি আগুনের নামে সকলেই অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া ওঠে।

রামাই বলিল, 'ওরে থাম্। আগুনের নাম করিস না। বলি হাঁ হে রাখহরি, বক্কার পুজো হয়েছে এ-বছর?'

রাখহরি বলিল, 'কই আর হ'লো? বিনোদের বাড়ী একসের চাল চাইতে গেলাম, তা সে কিছুতেই দিলে না, বললে, 'তুমিই এখন চালিয়ে নাওগে ঠাকুর, তারপর দোবো।' আমিও রেগে বললাম, তবে রইলো তোমাদের পুজো।'

এই লইয়া বচসা সুরু হইল এবং শেষ পর্য্যন্ত মন্দির সংস্কারের ব্যবস্থা আর কিছুই হইল না।

এম্‌নি করিয়া বছরের পর বছর কাটিয়াছে।

মন্দিরের উপরে অশ্বত্থগাছ প্রথমে ছিল একটি। এখন হইয়াছে তিনটি। চার বৎসর আগে একটুখানি চিড় খাইয়াছিল, এখন দেখা যায়, মন্দিরের পূর্ব্বদিকের ফাটলের মুখে একটা মানুষ অনায়াসে পার হইয়া যাইতে পারে।

মন্দিরটি সারাইতে হইলে এখন যে অর্থের প্রয়োজন সে অর্থ গ্রামের লোকের কাছে চাঁদা করিয়া পাইবার উপায় নাই, কাজেই বর্ত্তমানে সকলেই একরকম হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছে। কেহ কোনোদিন সে সম্বন্ধে কোনও কথা

উত্থাপন করিলে বলে, 'বাবার ব্যবস্থা বাবা নিজেই ক'রে নেবেন দেখো।'

কিছুদিন পরে দৈবাৎ একটা উপায় মিলিয়া গেল।

রাখহরির বৃদ্ধ পিতাকে বাবা রুদ্রেশ্বর না কি এক দিন স্বপ্নে বলিয়াছেন, 'মন্দিরে বাস করিতে তাঁহার আর ইচ্ছা নাই। সর্ব্বত্যাগী ভিখারী দেবতার মনে না কি গাছের নীচে বাস করিবার সাধ জাগিয়াছে।'

কথাটা মনে ধরিয়াছে সকলেরই। কারণ এত বড় জাগ্রত দেবতা, যাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার বহু দৃষ্টান্ত তাহারা বহুবার পাইয়াছে, ইচ্ছা করিলে মন্দিরের উপরের সামান্য তিনটি অশ্বত্থের গাছ তিনি বহুপূর্ব্বেই সমূলে বিনাশ করিয়া দিতে পারিতেন। তাহা যখন তিনি দেন নাই, তখন তাঁহার গাছতলায় বাসের ইচ্ছা সম্বন্ধে আর কাহারও কোনোরূপ সন্দেহ প্রকাশ করা অনুচিত।

কাজেই মন্দির সংস্কারের কোনও কথাই আজকাল আর ওঠে না। ভিন্ন গ্রামের আত্মীয় কুটুম্ব কেহ কাহারও গ্রামে আসিয়া মন্দিরের কথা যদি উত্থাপন করে ত' তাহাকে ওই স্বপ্নের কথাটা বলিয়া দেওয়া হয়।

বলে, 'বাবার আচ্ছা আশুতোষ খেয়াল যা-হোক্! ব্যাটা ভিখিরী কি না!'

কিন্তু গ্রামের লোক বিশ্বাস করিলেও, বাহিরের যাহারা, স্বপ্নের কথাটা সব সময় তাহারা বিশ্বাস করিতে পারে না।

তখন বাবা রুদ্রেশ্বরের নামে বহুকালের প্রচলিত বহু অলৌকিক কীর্ত্তিকাহিনীর কথা একে-একে উঠিতে থাকে।

এমন জাগ্রত দেবতা না কি এ-জেলায় আর কোথাও কেহ কখনও দেখে নাই।

যথা—

কদমের ফুল বাবা বড় ভালবাসেন। গাজনের দিন অন্ততঃ একটি কদমের ফুল তাঁহার চাই-ই। অথচ বর্ষা না নামিলে কদমগাছে ফুল কখনও ফোটে না।

কিন্তু বাগ্‌দি-পাড়ার সেই বড় খেদ্-কদমের গাছটায় একটি ফুল সেদিন অন্ততঃ ফুটিবেই।

চৈত্র-সংক্রান্তির আগের দিন উপবাসী ভক্তের দল স্নান করিয়া ঢাক-ঢোল বাজাইয়া কদমগাছটিকে জাগাইয়া আসে এবং তাহার পরের দিন প্রভাতে ঠিক তেমনি ঘটা করিয়া তাহারা গাছের তলায় গিয়া দেখে, অত বড় গাছটার কোথাও না কোথাও একটি কদমের ফুল ঠিক ফুটিয়া আছে!

বাবার মাহাত্ম্য নয় ত' কী!

গাজনের দিনে ভক্তের দল আগুনের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়, কাঁটাকারি গাছের কাঁটার উপর গড়াগড়ি দেয়, ধারালো লোহার শিক্ দিয়া হাত ফোঁড়ে পা ফোঁড়ে, কেহ-বা হাঁ করিয়া জিবের মাঝখান দিয়া শিকটা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করিয়া ফেলে, আর ফুল দেয়ানীর ত' কথাই নাই! সে নিজে যে-সব অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসে, দেখিলে চোখ বুজিতে হয়, সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া ওঠে, মনে হয় বুঝি-বা ব্যাটা মরিল বলিয়া!

কিন্তু কাহারও কিছুই হয় না। পরের দিন দেখা যায়—দিব্য সুস্থ শরীরে গ্রামের মধ্যে তাহারা সকলেই ঘোরা-ফেরা করিতেছে।

কেহ বলে, 'আমাদের বাপ ঠাকুর্দ্দার আমলে যে-সব ব্যাপার হ'তো এখন ত' তার কিছুই নেই।'

'আগে ত' আর লোকে এত পাপ করতো না। এখন যার যা খুশী সে তাই করছে। এখন আর মত সইবে কেন?'

'আর সেই বাণেশ্বর!'

হাঁ, বাণেশ্বরের গল্প! সে এক অদ্ভুত ব্যাপার।

লম্বা একটা কাঠের পাটাতনের উপর সারি সারি অসংখ্য ধারালো লোহার গজাল বসানো।—ইহাই বাণেশ্বর। অতটা আর উচ্চারণ করিতে হয় না; লোকে তাহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়াছে—বাণ্!

আগে ওই বাণের উপর মূল ভক্ত নিজে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িত, আর তাহাকেই সকলে ধরাধরি করিয়া কাঁধে তুলিয়া পুকুরে লইয়া যাইত স্নান করাইতে। সে বৎসর চণ্ডে বাউরি বাণে শুইয়া স্নান করিতে যায়। কিন্তু ব্যাটা বজ্জাত-বাটপাড়ের একশেষ। বাণে শোওয়া তাহার সহিবে কেন? পিঠের ঘা তাহার আর শুকাইল না। বছর ঘুরিতে না ঘুরিতেই সে মরিয়া গেল। এখন আর সে বাণে কেহ শোয় না। মানুষের বদলে ধারালো গজালের মাথায় গোটাকতক কাঁচা আম ফুঁড়িয়া দিয়া বাণটিকে তাহারা ঢাক-ঢোল বাজাইয়া স্নান করাইয়া লইয়া আসে।

এই বাণ্ লইয়া সে-বছর একটা ভারি মজার ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

বাণের গায়ে সিঁদুর মাখাইয়া আম দুঁড়িয়া ভক্তের দল নূতন পুকুরে লইয়া গিয়াছে স্নান করাইতে। ঘাটের কাছে পাড়ের উপর তখন ঢাক-ঢোল কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার—বাণটিকে ধরাধরি করিয়া এক বুক জলে লইয়া গিয়া যেই তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া, আর তৎক্ষণাৎ ভীষণ গর্জ্জনে পুকুরের জলটাকে একেবারে তোলপাড় করিয়া দিয়া পাক্ খাইতে খাইতে সকলের চোখের সুমুখে সোঁ করিয়া সশব্দে গভীর জলে বাণ্ যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, কেহ আর তাহাকে ধরিতে পারিল না। তৎক্ষণাৎ সকলে ব্যাকুল হইয়া বাবার নাম করিতে করিতে সাঁতার কাটিয়া ডুবিয়া ডুবিয়া পুকুরের এদিক ওদিক তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজাখুঁজি করিল, কিন্তু তাহাকে আর পাওয়া গেল না। অবশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে সকলে আসিয়া বাবার কাছে গড়াগড়ি দিয়া পড়িল। নূতন বাণ্ সেইদিনই তৈরি হইল বটে, কিন্তু সে চমকটি আর হইল না। ভীষণ কোনও অমঙ্গল আশঙ্কায় গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা জোড়হস্তে বাবার মন্দিরচত্বরে আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মূল দেয়ানী সেইদিনই গভীর রাত্রে স্বপ্নে দেখিল, দীর্ঘ জটাজুটধারী নরকঙ্কালবিভূষিত শূলপাণি রুদ্রেশ্বর আসিয়া তাহার শিয়রে দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'বাণের মাথায় চুরি-করা আম দিয়াছিলি, সেইজন্যই বাণ্ তোদের হাত হইতে চলিয়া গেছে।'

পরদিন অনুসন্ধান করিয়া জানিল, সত্যই তাই। রসিক ভাকুয়ার গাছের আমগুলা বেশ বড় বড় হইয়াছিল বলিয়া বাণে দিবার জন্য চুপ্ বাউরি গোটাকতক চুরি করিয়া আনিয়াছিল।

সে জীবন্ত জাগ্রত বাণেশ্বরকে গ্রামের লোক এখনও মাঝে মাঝে দেখিতে পায়। পাড়ার মেয়েরা আগে যখন-তখন কলসী কাঁখে লইয়া নূতন-পুকুরে জল আনিতে যাইত। এখন আর একা সে পুকুরের ত্রিসীমানায় কাহারও যাইবার উপায় নাই। সে বছর গ্রামে একবার মারীভয় হয়। ওই নূতন পুকুরের পাশ দিয়াই শ্মশানে যাইবার পথ। শ্মশানযাত্রীর দল শবদেহ কাঁধে লইয়া যতবার ওই পুকুরের পাশ দিয়া পার হইয়াছে, বাণেশ্বরের ভীষণ গর্জ্জন ততবারই তাহারা স্বকর্ণে শুনিয়াছে এবং ওই পুকুরের পাড়ে সমবেত হইয়া গ্রামের লোক বাণেশ্বরের পূজা যতদিন করে নাই, 'ওলাউঠা' এবং 'মায়ের কৃপা' ততদিন পর্য্যন্ত গ্রামের উপর দিয়া সমানে চলিয়াছে।

অমাবস্যা রবিবারের গভীর রাত্রে এখনও যদি কেহ সাহস করিয়া নূতন পুকুরের পাড়ে গিয়া দাঁড়াইতে পারে ত' কালো একটা মহিষের পিঠের মত বাণেশ্বরকে সে জলের উপর দেখিতে পায়।

'আরে, আমাদের স্বচক্ষে দেখা বটগাছটার কথা বল না হে।'

স্বচক্ষে-দেখা বটগাছের গল্প সুরু হয়।

বাবা রুদ্রেশ্বরের ওই মন্দিরের সুমুখে পুরাকালে কে কবে না জানি একটি বটগাছ পুঁতিয়াছিল। শাখাপ্রশাখ বিস্তার করিয়া নাবাল্ নামাইয়া সেই গাছ দিনে-দিনে বড় হইয়া ওঠে। শেষে এত বড় হয় যে, বাবার কাছে ছাগবলির জন্য ছাড়িকাঠ পুতিবার জায়গা আর হয় না! অতি কষ্টে ডালপালাগুলা সরাইয়া ঘড়ি দিয়া টানিয়া ধরিয়া জায়গা যদি-বা হয়, ত' বলি করিতে গিয়া হন্তারকের হাতের খাঁড়া বটের ডালে গিয়া লাগে। এবং এই অসুবিধার জন্য বলির একটি ছাগল সে-বৎসর দু' চোট্ হইতে হইতে রহিয়া গেছে। হন্তারকের কব্জির জোর ছিল বলিয়াই রক্ষা, তাহা না হইলে সর্ব্বনাশের আর বাকি কিছু থাকিত না।

এখন উপায়?

বটগাছের মোটা-দুই-তিন ডাল কাটিয়া ফেলিবার যুক্তি-পরামর্শ চলিতে লাগিল।

কিন্তু কাটে কে?

ভুজুল চালানো দূরে থাক্, বাবার গাছের কেহ একটি পাতা ছিঁড়িতে চায় না।

নিরুপায় হইয়া গ্রামের লোক তখন বাবার কাছে ধর্ণা দিয়া পড়িল।—'যাহোক্ একটা উপায় তুমি নিজেই করো বাবা!'

অবাক্ কাণ্ড! বেশি দিন নয়; মাত্র দশটি দিন পরের কথা। পূজা গিয়াছে চৈত্রের সংক্রান্তির দিন, আর ঘটনাটা ঘটিয়াছে বৈশাখের দশোই। অন্ধকার নিস্তব্ধ রাত্রি তখন গ্রামের উপর থম্ থম্ করিতেছে। মেয়েগুলা

যে ক'বার ডাকিয়া গেছে কে জানে। হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর শব্দে সকলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। শব্দটা যে কিসের, তাহাই জানিবার জন্য দু'একজন বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু ওই পর্য্যন্তই! কেহ আর বাড়ীর বাহির হইতে পারিল না। মনে হইল যেন শান্ত সমাহিত সুপ্তসুপ্ত বৈশাখ-নিশীথিনী অকস্মাৎ কিসের যেন একটা অব্যক্ত বেদনায় তীব্রতম আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে। বাড়ীর বাহিরে ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগ। ঝড়ের উন্মত্ত গর্জ্জন গ্রামের উপর দিয়া তখনও হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। একে চারিদিকে নিরন্ধ্র গভীর অন্ধকার, কোন্ দিক দিয়া যে কি হইতেছে কিছুই বুঝিবার উপায় নাই, তাহার উপর নাকে মুখে ক্রমাগত ধূলা ঢুকিয়া নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম! যাহারা বাহির হইয়াছিল, ভয়ে-ভয়ে তাহারা আবার ঘরে ঢুকিয়া খিল বন্ধ করিয়া দিল। মাটির ঘরের খোড়ো চালা ঝড়ের দাপটে মচ্ মচ্ করিতে লাগিল। বৈশাখ মাস, ঘরে নূতন খড় তখনও সকলের চাপানো হয় নাই, ঘরের চাল উড়িয়া যাইবার ভয়ে বাবা রুদ্রেশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া জোড়হস্তে বসিয়া বসিয়াই সকলে রাত্রি কাটাইল।

প্রভাতে দেখা গেল, প্রতিদিনের মত শান্ত স্নিগ্ধ গ্রামপ্রান্তে নীলাঞ্জনবর্ণ তরুশ্রেণীর মাথার উপরে পূর্ব্বদিক-চক্রবাল উদ্ভাসিত করিয়া সূর্য্যোদয় হইতেছে। বিগত রাত্রির উন্মত্ত ঝঞ্ঝার উপদ্রব দুঃস্বপ্নের মতই অতীত হইয়া গেছে। সমস্ত গ্রামের মধ্যে কোথাও তাহার এতটুকু চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, কোথাও এতটুকু খড়কুটা পর্য্যন্ত দেখা যায় না, অক্ষ ভৌতিক কাণ্ডের মত বাবা রুদ্রেশ্বরের মন্দিরের সুমুখে যে বটগাছটিকে লইয়া গ্রামবাসীর দুর্ভাবনার আর অন্ত ছিল না—শুধু সেই বিরাট বটবৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত হইয়া অতিকায় একটা দৈত্যের মত গ্রামের পথ জুড়িয়া পড়িয়া আছে।

এতগুলি প্রত্যক্ষ সত্য ঘটনার পরেও বাবা রুদ্রেশ্বরকে অবিশ্বাস করিবার মত মন কাহারও নাই।

বয়স্ক নরনারীর কথা না-হয় ছাড়িয়াই দিলাম, গ্রামের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলা পর্য্যন্ত বাবা রুদ্রেশ্বরের নামে ভয়ে একেবারে কাঠ হইয়া যায়।

মুরলী চক্কোত্তির ছোট ছেলেটা তাহার মামার বাড়ীতে সেদিন যষ্ঠী অপেরা পার্টির যাত্রা শুনিয়া আসিয়া ছেলেদের মজলিসে তাহারই গল্প করিতেছিল। বলিল, 'মাইরি বলছি, এমন সুন্দর যাত্রা তোরা কখনও শুনিস্‌নি। সন্ধ্যেবেলায় আরম্ভ করে' একেবারে সকাল করে' দিলে।'

হেটো বলিয়া আর-একটা ছেলে তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিল! উহাদের যাত্রা সে তাহার দিদির শ্বশুরবাড়ীতে একবার শুনিয়া আসিয়াছে সুতরাং সন্ধ্যায় আরম্ভ করিয়া সকাল করিয়া দেওয়ার কথাটা মিথ্যা। সন্ধ্যায় জুড়িয়াছিল বটে, কিন্তু ভাঙিয়া গিয়াছিল রাত্রি একটা বাজিতে না বাজিতে। উহাদের চেয়ে বগুরদা'র যাত্রার দল ঢের ভালো। তাহারা বরং সন্ধ্যায় জুড়িয়া সকাল করিয়া দিতে পারে।

মুরলী চক্কোত্তির ছেলে নাত্রা বলিল, 'তুই শুনিস্‌নি, কেন মিছে কথা বলছিস হেটো, তুই চুপ কর্।'

হেটো বলিল, 'শুনিনি? মাইরি! বাঃ! অম্‌নি বলে' দিলেই হলো কি না! আচ্ছা, দিদি আসুক শ্বশুর-বাড়ী থেকে, তারপর শুধিয়ে দেবো, দেখিস্।'

নাত্রার বিশ্বাস, সে মিথ্যা বলিতেছে। বলিল, 'চল্ তুই বাবার মন্দিরে হাত দিয়ে বলবি—চল্।'

হেটো উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'হাঁ—চল্।'

কে একটা ছেলে সাবধান করিয়া দিল। বলিল, 'খবরদার হেটো, মিছে কথা হয় যদি ত' কেটে যাবি।'

'মিছে কথা নয় যে!' বলিয়া হেটো মন্দিরে হাত দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। এবং শেষ পর্য্যন্ত দিলও।

কিন্তু পাঁচ সাত দিন ধরিয়া হেটোর সঙ্গে দেখা হয় আর ছেলেরা বলে, 'কই দেখি হেটো, তোর হাতটা দেখি।' বলিয়া তাহার হাতের আঙুল, পায়ের আঙুল, মুখ, কান, নাক, বেশ ভাল করিয়া সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখে, সে কাটিয়াছে কি না।

কিছুতেই যখন সে কাটিল না তখন সকলে নিশ্চিন্ত হইল।—ষষ্ঠী অপেরা পার্টির যাত্রা শোনার কথা সে মিথ্যা বলে নাই, বলিলে এতদিন সে নিশ্চয়ই কাটিয়া কাঁকুড়-কাটা হইয়া যাইত।

বাল্যকাল হইতেই বাবার উপর এমনি তাহাদের অখণ্ড বিশ্বাস!

দেশে সে-বৎসর অনাবৃষ্টি হইল। মাঠ-ঘাট সব শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। পোঁতা ধান বুঝিবা মাঠেই মরিয়া যায়!

গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা উপবাস করিয়া বাবার কাছে গিয়া ধর্ণা দিয়া পড়িল। ঢাক-ঢোল বাজাইয়া সকাল হইতে বাবার পূজা চলিতে লাগিল। কল্‌সি কল্‌সি জল আনিয়া বাবার মাথায় ঢালা হইল।

অশিক্ষিত অসহায় দীন দরিদ্র গ্রামবাসী জোড়হস্তে গলবস্ত্র হইয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল—'বাবা, জল দাও! জল দাও!'

বৈকালের দিকে পশ্চিমের আকাশ অন্ধকার করিয়া কালো মেঘ দেখা দিল, গুড়্ গুড়্ করিয়া মেঘ ডাকিতে লাগিল, বিদ্যুৎ চমকাইল এবং দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি নামিল।

এমনি করিয়া দিনের পর দিন কত প্রার্থনা যে বাবাকে শুনিতে হয় তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

* * *

মন্দিরের পশ্চিম দিকের খান-দুই ঘর বাদ দিয়া একটি কুল ও একটি বাতাপী লেবুর গাছওয়ালা অনেক দিনের পুরাতন একখানি বাড়ী। বাড়ীটির অবস্থা ঠিক ওই মন্দিরের মতই জরাজীর্ণ। একতলা ইঁটের দালান। পূর্ব্ব-পুরুষ কেহ বোধ হয় আরম্ভ করিয়া আর শেষ করিতে পারেন নাই। বাহিরের দিকে ইঁদুরে গর্ত্ত করিয়া বিস্তর মাটি ফেলিয়াছে, ভিতরের দিকের মাটিগুলা বোধ হয় রোজই পরিষ্কার করিয়া বাতাপী লেবুর গাছের গোড়ায় দেওয়া হয়। রোয়াকের সুমুখে ছোট্ট একটুখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উঠান, তাহার পরেই আগাছার জঙ্গল। উঠানের ওদিকে বাতাপী, এদিকে কুল,—দুদিকের দুটি গাছের দুইটি ডালে ভিজা কাপড় টাঙাইবার জন্যই বোধ করি লম্বালম্বি লোহার একটি সরু তার আটকানো।

নিতান্ত ছোট্ট সংসার। লোকজন একরকম নাই বলিলেই হয়। বিধবা মা আর একটি চার-পাঁচ বছরের ছোট ছেলে।

ছেলেটি দেখিতে চমৎকার! সাদা ধপ্‌ধপে গায়ের রং, গোল-গাল নিটোল শরীর, মাথায় কোঁকড়ানো কালো কালো চুল। বিধবা মায়ের ওই একটিমাত্র সন্তান। আদরে সোহাগে মানুষ।

মা তাহার বিধবা হইলে কি হয়, অমন সুন্দরী মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না—এত রূপ! দাঁড়াইয়া দু'দণ্ড দেখিবার মত চেহারা।

পাড়ার সমবয়েসী মেয়েরা এ-বাড়ী বেড়াইতে আসে। কথায় কথায় হাসি-তামাসা করিয়া বলে, 'বিধবাই যদি হবি ত' ভগবান তোর এত রূপ দিয়েছিল কেন লা নলিনী?'

নলিনী মৃদু হাসিয়া তাহার মুখের পানে বড় করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে। খানিক্ পরে বলে, 'তা কি আর জানে কেউ?'

কিন্তু জানা অন্ততঃ উচিত।

নলিনীর স্বামী কেদার মুখুজ্যের গর্ব্ব করিবার মত ছিল শুধু তিনখানি নারকেল জমি আর নিকষ কৌলিন্য। চেহারা ছিল ঠিক যেন কঙ্কাল; মাথায় বড় বড় চুল, গায়ের রংটা পরিষ্কার, আর গাঁজা না কি তাহার মত এ তল্লাটে কেহই খাইতে পারিত না। কেহ কিছু বলিলে কেদার হাসিত। বলিত, 'কারও কাছে মেগে ভিক্ষে করে' ত' খাই না বাবা, খাই নিজের পয়দায়।'

বিবাহ যে তাহার কোনোদিন হইবে, কেহই তাহা ভাবে নাই। বাবা রুদ্রেশ্বরের মন্দির তাহার বাড়ীর কাছেই। ওইখানেই ছিল তাহার আড্ডা। আরও অনেককে জুটাইয়া লইয়া প্রায় চব্বিশঘণ্টাই সেইখানে পড়িয়া পড়িয়া গাঁজা টানিত আর ব্যোম্ ব্যোম্ করিত।

হঠাৎ একদিন শোনা গেল, তাহার এক দূর সম্পর্কের মামা আসিয়া কেদারকে কোথায় লইয়া গেছে। কি জন্য লইয়া গেছে কেহ কিছুই জানিল না।

দিন দশেক পরে কেদার ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিল—একেবারে পাল্‌কী চড়িয়া,—সঙ্গে নলিনীর মত পরমাসুন্দরী এক বৌ লইয়া।

বৌ দেখিয়া সকলেই অবাক্। সবাই কানাকানি

করিতে লাগিল,—'মেয়েটার আচ্ছা কপাল যা হোক্। বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার।'

কিন্তু বলিহারি মেয়ে ওই নলিনী!—যেমন একাগ্র পাতিব্রত্য তাহার, তেম্‌নি অক্লান্ত সেবা!

বছর ঘুরিতে না ঘুরিতে কেদারের কপালে মাংস লাগিল, মাথার তেল-চিটে চুলগুলা কাটিয়া যেন মানুষের মত হইল। গাঁজা ছাড়িতে পারিল না, কিন্তু মন্দিরের মজলিস ছাড়িয়া দিল।

নলিনী হাসিয়া বলিত, 'ও সব তোমাদের তিন-পুরুষের অভ্যেস্ না কি বলছিলে সেদিন, ও ত' আর তাহ'লে সহজে ছাড়তে পারবে না! তা যাই হোক্, ঘরের মধ্যে লুকিয়ে খেয়ো। তোমায় লোকে গাঁজাখোর বললে আমার বড় কষ্ট হয়।'

সেইদিন হইতে কেদার ঘরের মধ্যে লুকাইয়াই গাঁজা খায়। মুখে বলে, 'ছেড়ে দিয়েছি ভাই।'

লোকে তাহা বিশ্বাস করে না। বলে, 'পয়সা না হয় এক আধটা করে' আমরাও দেবো এবার থেকে। না কি বল হে রঞ্জন!'

রঞ্জন হাত নাড়িয়া বলে, 'থাম্ থাম্! তুই শালা আর কথা বলিস্ না।'

এই লোকটির উপর রঞ্জনের রাগ বহুদিনের। তাহার ধারণা এই নিকুঞ্জর দায়েই কেদার গাঁজা ছাড়িয়াছে। কারণ—নিকুঞ্জ এত কৃপণ যে, গাঁজার জন্য একটি পয়সাও সে কোনোদিন খরচ করে না, অথচ, কলিকাটি একবার হাতে পাইলে হয়, কোঁৎ কোঁৎ করিয়া ধোঁয়া গিলিয়া দম চুরি করিয়া একবারের জায়গায় পাঁচবার টানিয়া লইয়া নিমেষের মধ্যে যত বড় কলিকাই হোক্, পুড়াইয়া ছাই করিয়া দেয়। এবং ক্রমাগত এ-রকম করিলে বিনা পয়সায় মানুষ আর তাহাকে কত গাঁজা খাওয়াইবে! সুতরাং গাঁজা খাওয়া ছাড়িয়া দেওয়া কেদারের মিথ্যাই হোক্ সত্যই হোক্,—তাহাদের সঙ্গে মজলিস করিয়া গাঁজা খাইয়া রোজ রোজ এত পয়সা খরচ সে যে আর করিবে না, ইহা জানা কথা।

দেখিতে দেখিতে এমন হইল যে, ওই এক রঞ্জনের মত দু'একজন ছাড়া কেদারের কাছে কেহই আর আসে না। স্বার্থের সম্বন্ধও তাহাদের চুকিয়া গেছে।

নলিনী বলে, 'এবার একটি গাই কিনতে হবে।'

কেদার বলে, 'কেন? দুধ খাওয়া কি তোমার অভ্যেস ছিল নাকি?'

নলিনী ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'হ্যাগো, দুধ একটুখানি না খেলে আমার আর চল্‌ছে না। তোমার ওই গাঁজা আমাকেও একটান্ করে' দিতে পার?'

কেদার বুঝিল, কথাটা নেহাৎ হাসি রহস্যের কথা। বলিল, 'আমার দুধ খাওয়ার কথা বলছ? দুধ খেয়ে আমার আর কিছু হবে না। শরীরটে একেবারে থেকে ঝুনোট্ হয়ে গেছে।'

'তাহ'লেও খেতে হবে। গাই একটি তুমি দেখ সন্ধান করে।'

কেদার বলিল, 'টাকা! টাকা ত' এখন নেই আমার হাতে।'

নলিনী আর কোনও কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল এবং দিন দুই তিন পরেই দেখা গেল, ঘরে একটি গাই ও তাহার একটি সদ্যপ্রসূত বাছুর আসিয়াছে।

কেদার কিছুই জানিত না। গাই বাছুর দেখিয়া অবাক্ হইয়া নলিনীর মুখের পানে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন করে' এলো?'

নলিনী বলিল, 'অত সব তোমার জেনে দরকার কি বাপু, যেমন করেই হোক্ আনিয়েছি।'

'সেবা কর্‌বে কে?'

'কেন আমি কি রাজার মেয়ে না কি যে, একটা গাইয়ের সেবা করতে পারব না!'

কেদার মনের আনন্দে হাত নাড়িয়া গান ধরিল—

'ও গোকুলের গয়লা দিদি, শোনো গো শুনবে যদি,
রাধা সতী কলঙ্কিনী, এ-কথা হায় কে বলিল।'

কেদারের গলা বড় চমৎকার। গান সে বেশ ভালই গায়। হাসিয়া নলিনী তাহার কাছে গিয়া বসিল। বলিল, 'গাইলে ত' সবটুকুই গাও, শুনি।'

গান শেষ হইলে কেদার বলিল, 'কীর্তনের একটা দল করব ভেবেছিলাম, তা আর হ'লো না।'

নলিনী বলিল, 'থাক্, আর কেত্তোনের দল করতে

হবে না। গান গেয়ে মাঝে-মাঝে আমাকে শুনিও, আমি তোমার বন্ধুটিকে দেখো।'

বলিয়া হাসিয়া সে সেখান হইতে পলায়ন করিল।

এমনি করিয়া নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় দিন তাহাদের বেশ আনন্দেই কাটিতেছিল। বছর দুই তিন চমৎকার কাটিল।

নলিনীর বয়স তখন আঠারো। ভাদ্রের ভরা নদীর মত রূপ যেন তাহার দুকূল ছাপাইয়া উপ্‌চাইয়া পড়িতেছে!

নলিনী তাহার ছোটখাটো গৃহস্থালীর সমস্ত কাজকর্ম নিজের হাতেই করে, একদণ্ডের জন্যও বসিয়া থাকে না। আর দূরে বসিয়া কেদার তাহার এই অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী বধূর দিকে একাগ্র মুগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গুন্‌গুন্ করিয়া আপন মনেই গান গায়!

সেদিন অমনি চোখোচোখি হইতেই কেদার হাসিয়া ফেলিল।

নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'হাসলে কেন বল!'

কেদার বলিল, 'এম্‌নিই।'

'না, কি ভাবছিলে তোমায় বলতে হবে।'

কেদার বড় বিপদে পড়িল। বলিল, 'কি আর ভাবব? ভাবছিলাম, ভগবান তোমায় আমার জন্যে এমন নিখুঁৎ করে' গড়েননি। তুমি রাজরাণী হ'তে পারতে, ভুল করে' আমার কাছে চলে এসেছ।'

নলিনী হাসিয়া বলিল, 'বেশ করেছি।—ছাখো, সকালবেলা ঝগড়া কোরো না বলছি, ভাল কাজ হবে না।'

হাসি যেন মুখে তাহার চব্বিশঘণ্টা লাগিয়াই আছে। বলিল, 'টেনেছ ত?'

ঘাড় নাড়িয়া কেদার বলিল, 'হাঁ।'

নলিনী বলিল, 'তাহ'লে ওঠো। বসে থাকলে এখন কত কি ভাববে তার ঠিক নেই, তার চেয়ে—যাও, জেলেদের বাড়ী গিয়ে মাছ নিয়ে এসো।'

কেদার উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'এইবার আমাদের একটি ছেলে হ'লেই—'

'যাঃও!' বলিয়া মুখের কথাটা তাহাকে আর শেষ করিতে না দিয়া সলজ্জ একটুখানি হাসিয়া নলিনী ঘরে ঢুকিল।

কি কুক্ষণে কথাটা যে কেদার তাহার মুখ দিয়া বাহির করিল কে জানে, সেইদিন হইতে খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে দিবারাত্রি নলিনীর মনে শুধু সেই এক চিন্তা!—এইবার একটি সন্তান হইলে তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

ছেলে হইবার বয়স তাহার হইয়াছে। শ্বশুর শাশুড়ী আত্মীয়স্বজন থাকিলে হয় ত এতদিন ছেলে ছেলে করিয়া তাহারা পাগল হইয়া উঠিত, ঠাকুরের কাছে মানৎ করিত, পূজা দিত, কবচ আনিত, মাদুলি আনিত, আরও কত-কি করিত তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু সে-সব তাহার করিবে কে? সুতরাং যাহা কিছু করিবার এখন তাহাকে নিজেকেই করিতে হইবে।

কি আর করিবে, হাতের কাছে বাবা রুদ্রেশ্বরের মন্দির, সন্ধ্যার সেদিন সে তাহার আঁচলের তলায় সন্ধ্যা-প্রদীপটি ঢাকিয়া লইয়া প্রতিদিনের মত বাবার মন্দিরে সন্ধ্যা দেখাইতে গিয়া গলায় কাপড় দিয়া হাঁটু পাড়িয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিবার সময় অন্যদিন সে তাহার স্বামীর মঙ্গল কামনা করে, কিন্তু সেদিন তাহার সুপ্তোত্থিত সদ্য-জাগ্রত মাতৃহৃদয় একমাত্র সন্তান কামনা ছাড়া আর কোনও কামনাই করিতে পারিল না। মনে-মনে বলিল, 'সম্বৎসরের মধ্যে আমার কোলে একটি ছেলে দাও ঠাকুর, পূজোর সময় ষোড়শোপচারে পূজা দেবো, তিন দিন ধ'রে মন্দিরে তোমার বিয়ের প্রদীপ জ্বেলে আরতি করব।'

মনে-মনে নলিনীর খুবই ভরসা ছিল, রুদ্রেশ্বর জাগ্রত দেবতা, প্রতিদিনের ব্যাকুল প্রার্থনা তাঁহার কানে গিয়া পৌঁছিয়াছে, ঘর-আলো-করা রাজপুত্রের মত একটি শিশুসন্তান এইবার তাহার কোল আলো করিয়া দেখা দিবে। কিন্তু নলিনীর দুর্ভাগ্য, মাসের পর মাস পার হইয়া শেষে বৎসর পার হইল, তবু তাহার ছেলে হইবার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না।

নলিনীর ইচ্ছা করে, কোনও ঠাকুর-দেবতার কবচ যদি

কেহ তাহাকে আনিয়া দেয় ত' সেটি সে সযত্নে ধারণ করিতে পারে; কোথাও কোনও ঔষধ পাইলেও খায়। কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কথা কাহাকেও সে বলিতে পারে না।

এমনি করিয়া দিন চলিতে চলিতে প্রতিবেশিনী সুশীলা একদিন তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়া একটি ভারি মজার খবর দিয়া গেল। বলিয়া গেল, বাবা রুদ্রেশ্বরের পূজার দিন বাগদি-পাড়ার জাগানো কদমের গাছটিতে কদমের যে ফুলটি ধরে, পূজার পর মূল-দেয়াসী সেই ফুলটি লইয়া গ্রামের জমিদারের বাড়ীতে দিয়া আসে; সেই ফুল যদি কেহ মূল-দেয়াসীর কাছ হইতে টাকা দিয়া হোক্ চুরি করিয়া হোক্ লইয়া প্রতিদিন প্রভাতে সেই ফুল-ধোওয়া জল খাইতে পারে ত' বাঁজা মেয়েরও ছেলে হয়।

সেইদিন হইতে নলিনীর মন সেইখানেই পড়িয়া রহিল। মূল-দেয়াসীকে টাকা দিয়া সে ফুল তাহাকে লইতেই হইবে। স্বামীকে বলিবার উপায় নাই। লজ্জা করে। নিজে সে গ্রামের বৌ,—মূল-দেয়াসীকে ফুলের কথা বলিবেই বা কেমন করিয়া? অবশেষে ওই সুশীলাকে দিয়াই বলাইল। দেয়াসীর টাকার দরকার ছিল, বলিবামাত্র রাজিও হইল।

পর বৎসর শ্রাবণের পরে নগদ পাঁচটি টাকা দিয়া বাবা রুদ্রেশ্বরের সেই কদমের ফুলটি লইয়াই নলিনীর ছেলে হইয়াছে।

ছেলে হইয়াছে সত্যই ঠিক রাজপুত্রের মত।—ঘর-আলো-করা, কোল-আলো-করা ছেলে!

ছেলের নাম রাখিল—বিশ্বনাথ। ডাক-নাম—বিশু।

বাবা রুদ্রেশ্বরের পূজার ঘটা দেখিয়া সবাই জানিল, ছেলেটি বাবার দেওয়া। দেবতার দেওয়া ছেলে না হইলে এমন ছেলে কখনও হয় না।

কেদারের যত আনন্দ, নলিনীর তত!

ছেলে কোলে লইয়া কেদার রুদ্রেশ্বরের মন্দির-চত্বরে ছাড়িয়া দেয়। হামাগুড়ি দিয়া বিশু খেলা করিয়া বেড়ায়। পাড়ার লোক আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ছেলে দেখে আর তারিফ্ করে। আনন্দে গর্ব্বে কেদারের বুক যেন দশ হাত ফুলিয়া ওঠে। বলে, 'বাবার মন্দিরে যে চব্বিশঘণ্টা পড়ে' থাকি, পড়ে' পড়ে' যে চাপ্‌রাশির মত পাহারা দিই, তার ত' একটা পুরস্কার আছে!'

সবাই সে-কথা স্বীকার করে। বলে, 'হাঁ তা বটে।'

কিন্তু মানুষের যে কখন কি হয় কিছুই বলিবার জো নাই। এত আদরের ছেলে বিশ্বনাথকে লইয়া আনন্দ করা কেদারের আর বেশি দিন চলিল না। বিশ্বনাথের বয়স তখন মাত্র দু'বৎসর। এমন দিনে কেদার অসুখে পড়িল এবং প্রায় মাসাবধিকাল অসুখে ভুগিয়া হঠাৎ একদিন সে মরিয়া গেল।

মরা বাঁচা মানুষের হাত নয়, কেদার তাহা জানিত এবং জানিত বলিয়াই মরিবার আগে নলিনীকে কাছে ডাকিয়া কেদার তাহার গায়ে হাত দিয়া একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিবার মত সান্ত্বনার কোনও বাক্য খুঁজিয়া না পাইয়াই বোধ করি ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে লাগিল। নলিনীও কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল, 'কেঁদো না।'

অতি কষ্টে কেদার বলিল, 'দুঃখ কোরো না নলিনী, আমার আর সময় বোধ হয় নেই। বিশ্বনাথ রইলো।'

তাহার পর স্বল্পালোকিত সেই গৃহপ্রান্তে বাক্যহারা এই দুই বিচ্ছেদকাতর দম্পতির শোকাচ্ছন্ন স্তব্ধতার মধ্যেই ধীরে-ধীরে কেদারের দুইচক্ষে চিররাত্রি ঘনাইয়া আসিল,—অজানা সে কোন্ অনির্দ্দিষ্ট পরপার হইতে মৃত্যু-দেবতার নির্ম্মম হস্ত প্রসারিত হইয়া একজনকে ছিনাইয়া লইয়া গেল।

একাকিনী পড়িয়া রহিল নলিনী আর তাহার শিশুপুত্র বিশ্বনাথ। নলিনীর কাতরতা দেখিয়া সকলেই ভাবিয়াছিল, মেয়েটাও বুঝি আর বাঁচিবে না, কিন্তু দুঃখ যত বড়ই হোক, একমাত্র মানুষেই তাহা সহ্য করিতে পারে। শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল, বিশ্বনাথের মুখ চাহিয়া নলিনী বাঁচিয়া আছে।

নিদাঘতপ্ত বৈশাখী মধ্যাহ্নের ঊষ্মোট্ গরমে তৃষ্ণার্ত্ত ধরিত্রী যখন হাহাকার করিতে থাকে, নলিনী তখন তাহার বিশ্বনাথকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া স্বামীর দুঃখ ভুলিবার চেষ্টা করে।

বিশ্বনাথ শুধায়, 'মা, বাবা কোথায়?'

নলিনী কোনও জবাব খুঁজিয়া পায় না। নীরবে শুধু সে সজলচক্ষে সুমুখের পানে তাকায়। বাতাপী লেবুর

গাছের ডালে কা কা করিয়া কাক ডাকে, বাবা রুদ্রেশ্বরের বিদীর্ণ মন্দিরের উপর অশ্বত্থের ছোট ছোট ডালপালাগুলির মাঝে বাঁকা ত্রিশূলটি দেখা যায়। নলিনী সেই দিক পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে, আর নিপীড়িত অন্তরের ব্যাকুল প্রার্থনা তাহার প্রকাশের ভাষার অভাবে অন্তরের মধ্যেই গুমরিয়া গুমরিয়া মরে।—হে বাবা রুদ্রেশ্বর, দুঃখ আমার যত বড়ই হোক্, তোমারই দেওয়া বলিয়া তাহা আমি নীরবে সহ্য করিব, কিন্তু তোমার কাছে এ দুঃখিনীর শুধু একটি প্রার্থনা—আমার বিশ্বনাথকে দয়া করিয়া যখন আমার কোলে দিয়াছ তখন তাহাকে তুমি বাঁচাইয়া রাখিও।

বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে বড় হয়। বাবা রুদ্রেশ্বরের দয়ায় রোগব্যাধি তাহার একেবারেই নাই। চাষের চাল বেচিয়া টাকা করিয়া ছেলের জন্য শহর হইতে নলিনী জামা আনায়, কাপড় আনায়, মাথায় টুপি কিনিয়া দেয়, জুতা কিনিয়া দেয়, লাট্টু লাটিম্ লাটাই ঘুড়ি—ছেলে যখন যাহা চায়, তাহাই কিনিয়া দিতে নলিনী কসুর করে না। বিশ্বনাথ ছুটিয়া ছুটিয়া প্রাঙ্গণের উপর খেলা করিয়া বেড়ায়, দূর হইতে সোৎসুকদৃষ্টিতে নলিনী সেইদিক পানে তাকাইয়া থাকে। এত আদরের ছেলে তাহার বিশ্বনাথ, কোনও আকাঙ্ক্ষাই তাহার সে অপূর্ণ রাখিবে না। বাবার কৃপায় ছেলে তাহার রাজা হইবে।

তা রাজা হইবার মত ছেলে বটে!

সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর পরে সেই ছেলের হইল অসুখ।

বৈকালে সেদিন খেলা করিয়া আসিয়া বিশ্বনাথ জ্বরে পড়িল।

নলিনীর চোখে আর ঘুম নাই। সারা দিন রাত সে উপবাস করিয়া ছেলের শিয়রে বসিয়া ক্ষণে ক্ষণে গায়ের উত্তাপ অনুভব করিতে লাগিল।

দু'দিন যায়, তিন দিন যায়, জ্বর কিছুতেই আর ছাড়ে না!

দুপুরে রুদ্রেশ্বরের পূজার সময় ছেলের কাছ হইতে চট্ করিয়া একবার উঠিয়া নলিনী তাহার দুটি হাত পাতিয়া মন্দিরের দুয়ারে গিয়া দাঁড়ায়। লজ্জা-সরমের মাথা খাইয়া ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া নলিনী বলে, 'পূজোর ফুল দুটি আপনি যদি দয়া করে'—

পূজারী বৃদ্ধ মানুষ। বলে, 'আমায় তোমার লজ্জা কি মা, চল আমি নিজেই দিয়ে আসি।'

বলিয়া বৃদ্ধ পূজারী তাহার ঘরে গিয়া বিশ্বনাথের অরক্তাভ রক্তাভ দুটি ঠোঁটের ফাঁকে বাবা রুদ্রেশ্বরের স্নানের জল একটুখানি ঢালিয়া পুষ্পচন্দন মাথায় ঠেকাইয়া দিয়া বলিল, 'কিছু ভয় নেই মা, তোমার রুদ্রেশ্বরের দেওয়া ছেলে, এতেই ও সেরে' উঠবে দেখো।'

প্রতিবেশিনী বর্ষিয়সী মহিলারা ছেলে দেখিতে আসিয়া গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, 'বাবার চান জল আর ফুল বিল্বপত্তর···এই ওর ওষুধ মা, ওকে আর ডাক্তারী-কোব্‌রেজি করিয়ো না।'

নলিনীরও তাহাই বিশ্বাস। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না মা, বাবার দেওয়া ছেলে—বাবাই ভাল করবে।'

বাবার স্নানের জল, ফুল-বিল্বপত্র নিত্য নিয়মিতই চলিতে লাগিল, শুধু সে সারে না দেখিয়া মায়ের মন একটুখানি বিচলিত হইবারই কথা।

নলিনী বারে-বারে বিশ্বনাথের গায়ে হাত দিয়া দেখে, —গা যেন আগুনের মত গরম। শেষে আর গায়ে হাত না দিয়া নলিনী তাহাকে তাহার বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া শুইয়া রহিল।

গা তাহার ঠাণ্ডা আর কিছুতেই হয় না!

ডাক্তার কবিরাজ দেখাইবার কথা নলিনী যে ভাবে নাই তাহা নয়, কিন্তু ভাবিয়াই আবার পরক্ষণে এই কথা তাহার মনে হইয়াছে যে, ডাক্তার কবিরাজের কথা ভাবিয়াছে বলিয়াই হয় ত' বাবা রুদ্রেশ্বর রাগ করিয়াছেন, —হয় ত বা সেইজন্যই বিশ্বনাথ সারিতেছে না।

পরদিন বাবা রুদ্রেশ্বরের বৃদ্ধ পূজারী ছেলেকে স্নানের জল ও ফুল-বিল্বপত্র দিতে আসিয়া দেখিল, নলিনী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। বলিল, 'অত কাতর হ'লে ত' চলবে না মা!'

নলিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। কাঁদিয়া বলিল, 'ছেলে আমার সারবে ত' বাবা?'

বৃদ্ধ পূজারী বলিল, 'বিশ্বাস থাকলেই সারবে মা।

যে-বিশ্বাসে ওকে তুমি পেয়েছ সেই বিশ্বাসেই ও আবার দেরে যাবে দেখো।'

নলিনী বলিল, 'বিশ্বাস ত' আমার আছে বাবা!'

পূজারী বলিল, 'তাহ'লে ওতেই সারবে!

নলিনী আবার সেদিন তাহার রান্নাবান্না ঘরের কাজকর্ম্ম সবই পরিত্যাগ করিল। রোগীর সঙ্গে নিজেও রোগী সাজিয়া উপবাস দিয়া পড়িয়া রহিল। আর সারা দিবারাত্রি শুধু ওই বাবা রুদ্রেশ্বরকে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতে লাগিল, বিধবার ওই প্রথম ও শেষ পুত্র বিশ্বনাথ, তোমারই দেওয়া—তুমিই রক্ষা করিও। আর যদি অমঙ্গল কিছু ঘটে ত' সে-দৃশ্য যেন তাহাকে আর চোখে দেখিতে না হয়।

এম্‌নি করিয়া সারা দিনমান কাটিল, রাত্রি কাটিল, পরদিন পূজারী আসিয়া দেখিয়া গেলেন, ছেলে কিছু ভাল আছে। বলিলেন, 'এইবার সারবে মা, আর কোনও চিন্তা নেই।'

নলিনীর মনে আশা হইল। তাহার ব্যাকুল প্রার্থনা এইবার বুঝি বাবা রুদ্রেশ্বর শ্রবণে শুনিয়াছেন। সেদিন সে উঠিয়া বসিল। যেমন পারিল, চারটি রান্না করিয়া খাইল। খাইয়া আবার বিশ্বনাথের কাছে গিয়া ডাকিল, 'বিশু!'

বিশু বলিল, 'উঁ!'

নলিনী তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুমা খাইল, তাহার পর আবার তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া শুইয়া রহিল।

সারাদিনের পর সন্ধ্যা হইল। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। বাহিরে অজস্র জ্যোৎস্না। এ কয়দিন বাহিরের এই জ্যোৎস্নালোকিত পুলকিত ধরিত্রীর দিকে তাকাইবার অবসর নলিনীর ছিল না। আজ তাহার ছেলে ভাল আছে, বাবা রুদ্রেশ্বর তাহার প্রার্থনা শুনিয়াছেন—সেই আনন্দে নলিনী চুপ করিয়া বাহিরের প্রাঙ্গণে নবপত্রপল্লব-সমাচ্ছন্ন বাতাপী লেবুর গাছটির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া তাকাইয়া ভাবিতেছিল,—বিশু তাহার বড় হইবে, বড় হইলে তাহার বৌ আসিবে, ছেলে বৌ নাতি নাৎনী লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিবে···এমনি করিয়া নলিনী যখন তাহার ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্নে বিভোর, এমন সময় বিশু তাহার মাথাটা একবার এপাশ-ওপাশ করিয়া মুখে তাহার কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর শব্দ করিয়া উঠিল। নলিনী চমকিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইল, গায়ে-মাথায় হাত দিয়া উত্তাপ অনুভব করিল, কিন্তু তাহার সে ছট্‌ফটানি কিছুতেই থামিল না। নলিনী ডাকিল, 'বিশু! বিশ্বনাথ!'

বিশু সাড়া দিল না, গোঁ গোঁ করিয়া মাথাটা তাহার এপাশ-ওপাশ করিয়া অস্থিরভাবে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। গায়ের উত্তাপ যেন কিছু কম বলিয়া মনে হইতেছে। তাহা হইলে জ্বরটা হয় ত' তাহার এইবার ছাড়িবে। নলিনী একমনে রুদ্রেশ্বরকে ডাকিতে ডাকিতে তাহারই অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অবশেষে রাত্রি তখন প্রায় দ্বিপ্রহর! বিশ্বনাথ অনেক-ক্ষণ হইতেই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া আছে। হঠাৎ একবার সে চোখ মেলিয়া তাকাইল এবং বারকতক পাপ্‌চি খাইয়া চোখ দুইটি উল্‌টাইয়া দিল।

বিশ্বনাথ যে এমন করিয়া মরিয়া গেল নলিনী তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। নাকের নিশ্বাস বন্ধ, বুকের স্পন্দন নাই, নিঃসাড় নিস্পন্দ, নিস্তেজ, হিমশীতল আড়ষ্ট মৃতদেহ!

নলিনী ভাবিল, বাবা রুদ্রেশ্বর হয় ত' তাহাকে ছলনা করিতেছেন, ছেলে তাহার এমন করিয়া মরিতে কিছুতেই পারে না, মরিতে তাহাকে সে দিবে না, বাবা রুদ্রেশ্বরের দেওয়া ছেলে বাবাকেই সে ফিরাইয়া দিয়া আসিবে।

এই ভাবিয়া নলিনী তাহার পুত্রের মৃতদেহ অতি কষ্টে কোলে তুলিয়া লইয়া বাবা রুদ্রেশ্বরের মন্দিরে গিয়া দাঁড়াইল। জ্যোৎস্না তখন ডুবিয়া গিয়াছে। বিপুল অন্ধ-কারে বিশ্রাম-নিরত গ্রাম তখন নিস্তব্ধ। উন্মাদিনীর মত নলিনী তাহার মৃত পুত্রটিকে কোল হইতে দরজার কাছে নামাইয়া মন্দির খুলিয়া ভিতরে ঢুকিল। এবং কোনোদিকে আর ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অন্ধকারেই বাবা রুদ্রেশ্বরকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া সেইখানেই উপুড় হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রাণান্তকর বেদনায় যে নিরুদ্ধ অশ্রুরাশি এতক্ষণ তাহার বুকের তলায় গুমরিয়া মরিতেছিল, ছাড়া পাইয়া এইবার যেন তাহা বন্যাবেগে বাহির হইয়া আসিল।—অনাথা এ-বিধবাকে আর বিড়ম্বনা করিও না ঠাকুর, বিশুকে আমার বাঁচাও, তুমি বাঁচাও!

এই বলিয়া সেই পাষাণ দেবতার গায়ে নলিনী বারম্বার তাহার মাথা ঠুকিতে আরম্ভ করিল।

বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া গড়াগড়ি দিয়া সে উঠিয়া বসিল। চৌকাঠের বাহিরে সে তাহার বিশ্বনাথকে শোয়াইয়া রাখিয়াছে। দেখিবার জন্ত বাহিরে আসিতেই দেখিল, বিশ্বনাথ সেখানে নাই। অন্ধকারে হাতড়াইয়া কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না। ভাবিল, বাবা রুদ্রেশ্বর এখনও হয় ত' এম্‌নি করিয়াই তাহাকে পরীক্ষা করিতেছেন। এখনই হয় ত বিশুকে বাঁচাইয়া তিনি আবার তাহার কাছে রাখিয়া যাইবেন। এই ভাবিয়া আবার সে রুদ্রেশ্বরের মন্দিরে ঢুকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মন্দিরের উত্তর দিকটা ফাঁকা। বহুদূর বিস্তৃত ধানের মাঠ ছাড়া আর কোথাও কিছুই নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে নলিনীর মনে হইল, সেই মাঠের উপর কিসের যেন শব্দ হইতেছে। শব্দটা কিসের তাহাই জানিবার জন্ত, উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিতেই চট্ করিয়া নলিনীর ধারণা জন্মিল—আচ্ছা, এমনও ত' হইতে পারে যে, বিশুর মৃতদেহ শেয়ালে-কুকুরে এখান হইতে টানিয়া লইয়া গিয়া টানাটানি ছেঁড়াছেঁড়ি করিতেছে!

নলিনী তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল এবং মন্দিরের পশ্চাতে মাঠের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল সত্যই তাই। মানুষ দেখিয়া মসীবর্ণ সেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে কয়েকটা শৃগাল খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করিয়া উঠিল এবং কি যেন একটা বস্তু মনে হইল যেন তাহারা মাটির উপর দিয়া সর্‌সর্ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

নলিনী আর স্থির থাকিতে পারিল না, অশ্রুসজল দুইটি চক্ষুর ম্লান দৃষ্টি যথাসম্ভব প্রসারিত করিয়া অন্ধকার মাঠের উপর ত্রস্তপদে অগ্রসর হইতে গিয়া একবার আছাড় খাইয়া পড়িল। মনে হইল, শোকসন্তপ্ত উপবাসক্লিষ্ট দেহে যেন আর শক্তি নাই, তবু সে আবার একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া অগ্রসর হইতে গিয়া দেখে, মৃতদেহ লইয়া শৃগালগুলা বহুদূরে চলিয়া গেছে। গ্রাম্য কয়েকটা কুকুরমাত্র তাহারই কাছে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে।

উন্মাদিনীর মত নলিনী কতক্ষণ ধরিয়া যে মাঠে মাঠে ছুটাছুটি করিল কে জানে!

পরদিন প্রভাতে দেখা গেল, গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা দলে দলে যাবা রুদ্রেশ্বরের মন্দিরের দিকে ছুটিতেছে। মন্দিরের সুমুখে খড়ের চাল-দেওয়া ছোট নাট-শালাটি ঘিরিয়া এত লোক জড়ো হইয়াছে যে, সেখানে আর তিল-ধারণের স্থান নাই।

কাণ্ড দেখিয়া সকলেই অবাক্!

আট-চালার ঠিক মাঝখানে মাথার উপরের একটি কাঠে ফাঁসি লট্‌কাইয়া নলিনী আত্মহত্যা করিয়াছে। পরনের কাপড়খানি ছিল নূতন, তাহারই প্রায় আধখানা ছিঁড়িয়া সে দড়ির মত করিয়া পাকাইয়া গলায় দিয়াছে আর বাকি আধখানা এখনও সে কোনোরকমে পরিয়া আছে। সুদীর্ঘ একপিঠ ভ্রমরের মত কালো চুল, গায়ের রং যেন দুধে-আলতায় গোলা,—বিধবা বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। যে অন্তঃপুরচারিণীকে সহজে কেহ দেখিতে পাইত না, আজ সে তাহার দুঃসহ দুঃখভার হইতে চির-নিষ্কৃতি লাভ করিবার দুর্বার আগ্রহে মৃত্যুর হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়া আপামর সাধারণের কাছে নিজের প্রাণহীন দেহটিকে নির্লজ্জভাবে উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছে।

সুমুখে উৎকট মৃত্যুর এই ভয়াবহ দৃশ্য, চারিদিকে কেমন যেন একটি অবাধিত নীরবতা, কাহারও মুখে কোনও কথা নাই, কেহ কোনও কথা বলিতে সাহস করিতেছে না।

সংবাদ পাইয়া হায় হায় করিয়া বৃদ্ধ পূজারী ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া দাঁড়াইল। মৃতদেহের দিকে একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিতেই চোখ দুইটি তাহার জলে ভরিয়া আসিল।—বলিল, 'ছি ছি, এ কি করলি হতভাগী! —ছেলেটা কোথায়? বিশু? যার জ্বর হয়েছিল?'

কে একজন বলিয়া উঠিল, 'বিশুর মাথাটা দেখলাম পড়ে রয়েছে মাঠে। হাত-পাগুলো শেয়াল-কুকুরে খেয়ে ফেলেছে।'

এ রকম ঘটনা যে কেন ঘটিল কেহই ভাল বুঝিতে না পারিয়া যাহার যা খুশী তাহাই বলিতে আরম্ভ করিল।

বৃদ্ধ পূজারী চোখের জল মুছিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন।—এখন উপায়?

নিবারণ বলিল, 'চৌকিদার পাঠানো হয়েছে থানায়।'

পূজারী বলিল, 'চৌকিদার? কেন?'

'বা-রে! অপমৃত্যুর মড়া, ওর জন্তে কে দায়ী হবে বাপু?'

ইহার উপর আর কথা চলে না। সুতরাং সকলেই চুপ করিয়া রহিল।

পূজারী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'তাহ'লে হাঁরে অবিনাশ, বামুনের মেয়ে···অমনি ঝুলবে? কেটে ওকে নামাতে হবে না?'

অবিনাশ বলিল, 'তোমার সাহস থাকে ত' নামাও।'

'তা নামাচ্ছি বাবা, আমি আর দেখতে পাচ্ছি না, আমার যা হয় তাই হবে।' বলিয়া একটা ছেলেকে সে তাহাদের বাড়ী হইতে একটা বঁটি আনিতে বলিল।

বঁটি আনিলে পূজারী কাপড় কাটিয়া অতি কষ্টে ধরাধরি করিয়া নলিনীকে সে নিজেই নামাইল। নামাইয়া আলুলায়িত কুন্তলা লক্ষ্মীপ্রতিমার মত নলিনীকে সেইখানেই শোয়াইয়া আপাদমস্তক ঢাকিয়া দিয়া বলিল, 'আমায় যখন বাবা বলে' ডেকেছিস্ মা, তখন তোর জন্যে আমায় জেলে যেতে হয় যাব।'

নলিনীর মৃতদেহ সারাদিন সেইখানেই পড়িয়া রহিল। থানা হইতে ইন্সপেক্টর আসিলেন বৈকালে। আসিয়াই মৃতদেহ দেখিয়া রিপোর্ট লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মরবার কারণ আপনারা কেউ কিছু বলতে পারেন?'

হাত জোড় করিয়া সকলেই একবাক্যে কহিল, 'আজ্ঞে না হুজুর।'

'নিজের বাড়ী ছেড়ে এখানেই বা মরতে এলো কেন?'

'তাও কেউ বলতে পারে না।'

'আত্মীয় স্বজন কেউ আছে?'

'আজ্ঞে না।'

'তাহ'লে সন্দেহজনক ব্যাপার। কি বলেন?'

'তা আজ্ঞে যখন বলছেন আপনি তখন তা···'

ইন্সপেক্টরবাবু কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া মৃতদেহের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর কি যেন ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মৃতদেহের সৎকার আপনারা যদি করতে চান ত' লাশ আমি আর চালান্ দিই না। রিপোর্টে আপনাদের সহি করে' দিতে হবে কিন্তু।'

রিপোর্টে সহি করিতে কেহই রাজি হইল না। বলিল, 'আজ্ঞে না হুজুর, আমাদের গা বড় খারাপ। কে কখন খুঁচে-টুচে দেবে, বিশ্বাস নেই।'

ইন্সপেক্টরবাবু বলিলেন, 'তাহ'লে আমার আর দোষ নেই। ওরে ও চৌকিদার, একজোড়া গাড়ী ডাক!'

মৃতদেহ লইয়া যাইবার জন্য গ্রামে কাহারও গাড়ী পাওয়া মুস্কিল। শেষে অতি কষ্টে অনেক বলিয়া কহিয়া অনেকক্ষণ পরে চৌকিদার একজোড়া গরুর গাড়ী ডাকিয়া আনিল এবং চৌকিদার-কনেষ্টবলে ধরাধরি করিয়া মৃতদেহ গাড়ীতে তুলিল।

বৃদ্ধ পূজারী কি যেন বলিবার জন্য ইন্সপেক্টরবাবুর কাছে একবার আগাইয়া গেল, সমবেত লোকগুলার মুখের পানে বিহ্বলের মত বার-কতক তাকাইল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই তাহার বলা হইল না, বার-দুই ঢোঁক্ গিলিয়া বোকার মত সে সেইখানেই হাঁ করিয়া সজলচক্ষে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গরুর গাড়ীর বাঁশের শক্ত বাঁকারির উপর নলিনীর মৃতদেহ দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। গায়ের এবং মুখের ঢাকা তখন সরিয়া গিয়াছে।—সেই দুটি খোলা পা, সেই অলসবিস্তস্ত নিস্পন্দ বাহুবল্লরী, সেই মনোহারিণী মুখশ্রী, অর্দ্ধনিমীলিত দুটি দৃষ্টিহীন নিষ্কম্প চক্ষু, আধীলিত রক্তিম ওষ্ঠাধর, মুক্তার মত শুভ্রসুন্দর, দন্তপঙ্‌ক্তি, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কুঞ্চকুঞ্চিত সুদীর্ঘ আলুলায়িত কেশপাশ,—সেই অপরূপরূপ! মৃত্যুদেবতা তখনও পর্য্যন্ত তাহার সে সুকুমার কপোলের রক্তিম লাবণ্যবিভা অপহরণ করে নাই—তখনও পর্য্যন্ত সহসা দেখিলে মনে হয় যেন সে নিদ্রা যাইতেছে!

নলিনীর উমুক্তদ্বার গৃহপ্রাঙ্গণে বাতাপী লেবুর সুচিক্কণ পত্রপল্লবগুলি রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া দিবসের সূর্য্য তখন অস্ত গিয়াছে। মন্দিরের মাথার উপর ধূসরবর্ণ আকাশের গায়ে শুক্লপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্রলেখা!

প্রতাপাদিত্য গ্রামদেবতা রুদ্রেশ্বরের মন্দির পার হইয়া বাঁ-ডাকা নূতন-পুকুরের পাশ দিয়া গ্রামপ্রান্তের বটবৃক্ষটি অতিক্রম করিয়া, মাঠের পথে হট্ হট্ করিতে করিতে গরুর গাড়ী ক্রমশ বৃক্ষান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, গ্রামে সে বৎসর মারীভয়ের সময় শবযাত্রীর দল নূতন পুকুরে যে-বাণেশ্বরের ভীষণ গর্জ্জনে চমকিয়া উঠিয়াছিল, আজ বোধ করি হতভাগী নলিনীর এই শোচনীয় আত্মহত্যার রাগ করিয়াই তিনি নীরব রহিলেন। গর্জ্জন দূরে থাক্, নূতন পুকুরের নিস্তরঙ্গ কালো জলের উপর এতটুকু আলোড়নও কেহ দেখিতে পাইল না।

আষাঢ়ে

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

আজিকে আসিছে মেঘ কালো ও ধূসর,
শাদা, নীল, ছেঁড়া-ছেঁড়া, কোনটি সুন্দর,
গগন-প্রান্তরে আজ যেন দলে দলে
ছোট বড় পথিকেরা ধীরে ধীরে চলে
কোন্ দেশ হ'তে কোথা !

নিদাঘ-দহ্নির
দগ্ধ নভে যেই দৃষ্টি নিয়ত কাতর,
সে আজি জুড়ায়ে যেন বারংবার চাহে
মেঘের উপরে মেঘে, মেঘে অবগাহে।—
আঁখিতে যে সুখ লাগে সে-সুখ নামিয়া
পরতে পরতে যেন জুড়াইছে হিয়া।
মেঘে মেঘে মিশে যায় কালোয়-শাদায়,
শত মেঘে এক মেঘ রচিয়া দাঁড়ায়—
বিরাট্ অসীম মূর্ত্তি ! অসীম পুলকে
শুষ্ক মুখে ম্লান হেসে ধরা তা' নিরখে।
দিষ্টা ধরণীর এই সুখ-অনুভূতি
আমারো অন্তরে রচে আনন্দের শ্রুতি
অবিরাম।

চেয়ে থাকি, চেয়ে থাকি খালি—
মেঘে মেঘে এ কি আজ করিল মিতালি !
এ কি স্নিগ্ধ আবরণ নয়ন মোহন !
এ কি ছত্র সুবিশাল করিতে রক্ষণ
কোমলাঙ্গী ধরণীরে সূর্য্য-তাপ হ'তে !
এ কার বিরাট্ দেহ এল বায়ু স্রোতে
জুড়াতে ধরার আশা ? ওরে দেখে দেখে
সাধ যায় এরি' পরে—তপ্ত দেহ রেখে
জুড়াই দাহন যত।—এ তো মেঘ নয়,
এ যেন রে সুশীতল সুখস্পর্শময়
কোমল বিছানা !

বিরাট্ সে মেঘ-গা'য়
আসিল চেতনা যেন, চপল লীলায়
বিজলী উঠিল জ্বলি', গুরু গুরু ডাক
মেঘেরে করিল যেন সজীব সবাক্।

চাহে নর, চাহে জীব, চাহে তরু লতা,
উর্দ্ধপানে মুগ্ধ নেত্রে ; নীরদের কথা
গুরু-গুরু বজ্রভাষে শুনিছে সবাই—
এল তৃপ্তি, এল সুখ, আর দেরী নাই !

ঝরে ঝরে ঝরে ওই ঝরিল বাদল
তৃণে পত্রে নর-শিরে গৃহে অবিরল—
গলিত আনন্দ যেন, তৃপ্তি ধারা সম
দরদী কাহার দয়াবিন্দু অনুপম।

যে-বায়ু ছুটিল অগ্নি দিকে দিগন্তরে
সে আজি উল্লাসে আসি' উন্মুক্ত প্রান্তরে
বরষার ধারা সাথে নৃত্যে মেতে ওঠে।
বায়ু নাচে, নাচে জল,—ঘোরে আর ছোটে
দোঁহায় যে-দিকে খুসী শিশুর সমান ;
মাতামাতি দাপাদাপি এ কি বেগবান্ !

এ মাতনে এ উল্লাসে এ হিয়া উদাস
ছেয়ে যায়, মিশে যায়, নাচে অবিরাম
বাহিরে উন্মুক্ত বিশ্বে। সর্ব্ব কামনার
আজি এল পরিতৃপ্তি। তৃপ্তি-পারাবার
বাহিরে অন্তরে আজ সমান বিরাজে
উত্তাল-তরঙ্গ সাথে,—আজি তারি মাঝে
পড়ুক ঝাঁপায়ে প্রাণ, মাতুক্ উল্লাসে
বনে বনে, নদী-জলে, রঙ্গের উচ্ছ্বাসে,

বিজলী নাগিনী সাথে সর্ব্বদিক্ ভরি',
শূন্যে আর মরুভূমে তরু-শিরোপরি,
গহন-আঁধার ভেদি', করি' সচকিত
জড় যাহা, স্তব্ধ যাহা, যা রহে বিস্মিত।

দুর্দ্দান্ত বরষা সাথে ছেড়ে দিয়ে প্রাণ,
ব'সে আছি অচঞ্চল নিস্তব্ধ পাষাণ
বাক্যহীন, কম্পহীন। দেহেরে ঘেরিয়া
নাচিছে উন্মত্তবায়ু, আসে আস্ফালিয়া

তারি সাথে জলবেগ, সহস্র ধারায়
মুখে চোখে সর্ব্ব-অঙ্গে হেসে ঝাপটায়।
যাক্ দেহ ভেসে চ'লে, ক্রীড়নক আমি
সপবন বরষার, তারি অভিগামী।

চিত্ত মোর নিশে গেছে মেদুর-অম্বরে;
প্রাণ নাচে বহুযোজে দিকে দিগন্তরে;
দেহ যায় ভেসে ভেসে বিপুল প্লাবনে;—
স্বর্গ হ'তে কেবা প্রিয় আজি এ ভুবনে?

শেষের দান

কুমার শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

(১)

"ডাক্তারবাবু, হবে কি বাঁচবে না?"—

উত্তর দিবার কিছু ছিল না। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্যে, বিদ্যা যতদূর ছিল প্রয়োগ করিয়াছিলাম; কিন্তু মানুষ ভগবান নহে। মাথা নত করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

চট্টগ্রামের মুসলমান। দরিদ্র, সহায়হীন যুবক স্বামী আমার পশ্চাতে বাহিরে আসিল। তাহাকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া বলিলাম, "আমার সাধ্যে যা ছিল করেছি। এখন শুধু ভগবানের হাত, ভাই।"

যুবকের নয়ন বাহিয়া ধারা-স্রোত নামিতে লাগিল। স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া সে জীবন-সংগ্রামে নামিয়া পড়িয়াছিল—রেঙ্গুনে আসিয়া কুলির কাজ করিতেছিল। কিছু লেখাপড়া জানিত, কিন্তু বিদ্যা তাহাকে জীবনোপায় আনিয়া দিতে পারে নাই। তাই বিদেশে আত্মগোপন করিয়া সামান্য কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া কষ্টে সংসার চালাইতেছিল।

সংসারচক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া আমিও রেঙ্গুনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম;—অর্থোপার্জ্জনের প্রেরণায় নহে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কারণে। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলাম। অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্য ছিল না। পিতা যথেষ্ট সম্পত্তি এবং নগদ অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন। দরিদ্র ব্যাধি-পীড়িত গ্রামবাসিগণের পীড়ার সাহায্য করিতে পারিব, ইহাই ছিল জীবনের সংকল্প।

কিন্তু নিজের কর্ম্মদোষে জন্মভূমি হইতে আপনাকে নির্ব্বাসিত করিতে হইয়াছে। জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইতে আপনাকে বঞ্চিত রাখিয়া আমিও পাপের বোঝা মাথায় করিয়া ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন আবহাওয়ায় আপনাকে গোপন করিয়া রাখিয়াছি।

নিজের জীবনের অপকার্য্য—থাক্। প্রতিদিন যে অনুশোচনার অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতেছি, পীড়িতের কুটীর-দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহাকে চিন্তা করিবার শক্তি নাই।

রেঙ্গুনে আসিয়া কর্ম্মহীন জীবনকে কর্ম্মরত করিবার নিমিত্ত, অনুতাপের জ্বালা বিস্মৃত হইবার জন্য, চিকিৎসা-ব্যবসায়ে আপনাকে আবার লিপ্ত করিয়াছিলাম। দরিদ্রের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতাম না। ধনীরা উপঢৌকন হইয়া যাহা দিতেন, তাহা গ্রহণ করিতে হইত। যথেষ্ট অর্থ দেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম। শীঘ্র অর্থাভাব ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না।

নিজের বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু আজ

পীড়িতা মুমূর্ষমান তরুণীর চিন্তা আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। তরুণ যৌবনে জীবনের সাধ না মিটিতেই এই যুবতী মৃত্যুর পথে মহাপ্রয়াণ করিতেছে কেন?

বিবিলিপি?

সহসা সমস্ত অন্তরে একটা প্রদাহ-জ্বালা অনুভব করিলাম। আজ এক বৎসর দেশত্যাগী—কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিয়াছি। কিন্তু—কিন্তু—

চিন্তার বৃশ্চিক-জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিলাম। সত্যই ত, আমি এত দিন শুধু নিজের কথাই ভাবিয়াছি। নিতান্ত স্বার্থপরের ন্যায়, লোকাপবাদের, কলঙ্কের কর্দ্দম-প্রলেপ হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিবার জন্যই চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। অন্য আর একটা দিক আছে; অন্যের দুঃখ, লাঞ্ছনা, অপমান কিরূপ নিদারুণ হইতে পারে, সেদিকে একবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি কি?

সহায়হীনা, আশ্রয়হীনা নারীর কি হইল তাহা ত এত কালের মধ্যে একবারও চিন্তা করিয়া দেখি নাই। সেও যদি এমনই ভাবে—

যন্ত্রণায় আর্ত্তিস্বরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। না, আর একদিনও বিলম্ব করা চলিবে না। আজই ফিরিতে হইবে। এতদিন এ-দিকটা ভাবিয়া দেখিবার মত পৌরুষ কোথায় ছিল?

অপরাহ্নে রোগিণীকে দেখিতে গিয়া শুনিলাম, তাহার সকল দুঃখের অবসান হইয়া গিয়াছে। শোক-সন্তপ্ত স্বামী তাহার অন্তিম কার্য্য করিবার অর্থের অভাবে নিষ্প্রাণ হইয়া বসিয়া আছে।

তাহার পৃষ্ঠদেশে হাত রাখিয়া ডাকিলাম, "বন্ধু!"

ক্রন্দনস্ফীত আরক্ত নয়নযুগল তুলিয়া সে আমার দিকে সবিস্ময়ে চাহিল।

বলিলাম "হাঁ, আমিও তোমার অপেক্ষা দুঃখী। মহাপাপী আমি। তোমাকে বন্ধু বলে ডাকবার অধিকারও বুঝি আমার নেই।"

সে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনি আমার যে উপকার করেছেন, তার জন্য আমরণ কৃতজ্ঞ ও ঋণী থাকব। আপনার মত মহৎ লোক আমাকে বন্ধু বলছেন এর চেয়ে—"

বাধা দিয়া বলিলাম, "না, বন্ধু, তোমার কাছে দাঁড়াবারও যোগ্য নই। তোমার স্ত্রীর সৎকারের জন্য, মাটি দেবার জন্য যৎকিঞ্চিৎ দিচ্ছি। বন্ধুত্বের নিদর্শন অগ্রাহ্য করো না, ভাই!"

দুইখানা দশ টাকার নোট হাতে গুঁজিয়া দিয়া দ্রুতপদে পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিবার সাহস হইল না।

প্রায়শ্চিত্ত জীবনব্যাপী হইয়া আছে। ভগবান্! ভগবান্!

(২)

সীমারেখাহীন জলরাশির বক্ষ চিরিয়া বাষ্পীয় পোত চলিয়াছে। ওরঙ্গরাশি মথিত করিয়া এই অভিযান দুই দিন পরে সমাপ্ত হইবে। অনন্ত, বিশাল, তরঙ্গদীর্ঘ সমুদ্রের বিরাট্, মৌন ভাষা পরস্পরের কাণে কাণে কহিয়া নিজেরই বক্ষে আঘাতের পর আঘাত করিয়া অবিরাম মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে। তাহার অতলস্পর্শ হৃদয় আলোড়িত করিয়া কোন্ বাণী, কোন্ বিশেষের প্রতি মুহূর্ত্তে নীল অম্বরতলে অনুরণিত হইয়া উঠিতেছে?

কাণ পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। মনে হইতেছে, ফেন-পুঞ্জিত প্রতি তরঙ্গে শুধু একটা বিকার-ধ্বনি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জলধি-গম্ভীর স্বরে নিনাদিত হইতেছে—কাপুরুষ! স্বার্থপর!

সত্যসত্যই আমি কাপুরুষ, ঘোর স্বার্থপর, হৃদয়হীন পিশাচ! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। মূঢ়তা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অসংযম আমাকে পৌরুষের মর্য্যাদাচ্যুত করিয়াছে। সারা-জীবনের তপস্যা কি এমনই ভাবে মোহের চরণে লুটাইয়া দিতে হয়?

পরিপূর্ণ যৌবনে, আঠাশ বৎসর বয়সে এ কি নিদারুণ অভিশাপের মর্ম্মন্তুদ জ্বালা!

কিন্তু উপায় নাই—উপায় নাই! হঠকারিতার, মোহের শাস্তি ভোগ না করিলে চলিবে কেন?

ডেক অথবা কেবিন—কোথাও মুহূর্ত্ত মাত্র স্থির থাকিতে পারিলাম না। অতীত যেন নির্ম্মমভাবে আমার মানসদৃষ্টির সম্মুখে উজ্জ্বল দৃশ্যগুলি চলচ্চিত্রের ছবির মত ফুটাইয়া তুলিতেছিল। মুহূর্ত্ত মাত্র তাহার বিরাম ছিল না।

দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন চলিয়া গেল।

আউটরাম্ ঘাটে ষ্টীমার ভিড়িল। বহু-চালিতের মত ষ্টীমার হইতে নামিয়া ষ্টেশনে চলিয়া গেলাম। দেশ—পল্লী, —জন্মভূমি ব্যগ্র বাহু মেলিয়া আমাকে আকর্ষণ করিতেছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্রামের ষ্টেশনে নামিলাম। ট্রাঙ্ক ও বিছানা একখানা গরুর গাড়ীতে তুলিয়া দিলাম। গাড়োয়ান আমার বাড়ী জানিত। সে আমারই প্রজা। মনিবকে বহু দিন পরে দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়াছিল। তাহাকে আসিতে বলিয়া আমি পদব্রজে চলিলাম। তিন মাইল পথ গরুর গাড়ীর মধ্যে বসিয়া যাইবার মত মনের অবস্থা তখন ছিল না।

চিরপরিচিত পথে চলিতে লাগিলাম। ত্রয়োদশীর চাঁদ ঘনবিরল পথে জ্যোৎস্না-প্লাবন ঢালিয়া দিয়াছিল। চৈত্র-সন্ধ্যার বাতাবি লেবুর পুষ্প-সৌরভ, বাতাসকে মাতাল করিয়া তুলিয়াছিল। পশ্চাতে গরুর গাড়ী মন্থর গতিতে আসিতেছিল। গাড়োয়ান চন্দ্রালোকে গলা খুলিয়া নিধুবাবুর চিরপ্রসিদ্ধ অমর গান গাহিতেছিল—

"ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে!"—

সত্য! প্রকৃত প্রেমিক অথবা প্রেমিকার ইহাই শুধু প্রাণের ভাষা নহে, প্রকৃত প্রেম। কিন্তু প্রতীচ্য শিক্ষার মোহে পড়িয়া আমরা বাঙ্গালার প্রাণের ভাষা ভুলিয়া গিয়াছি। যেখানে কামগন্ধহীন ভালবাসা প্রেমিকের আদর্শ ছিল, এখন সেখানে কামনা, প্রতিদান-স্পৃহা তাহার ষোল-আনা দাবী লইয়া উপস্থিত।

বহু দূরে গরুর গাড়ীকে ফেলিয়া দ্রুত পাদক্ষেপে নিজের গৃহদ্বারে আসিয়া পৌঁছিলাম। তিন পুরুষের বৃহৎ অট্টালিকা যেন সমাধিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। বাহিরের কাছারীঘরের আলোক তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। আমলা গোমস্তারা তখনও কাজ সারিয়া কেন যে চলিয়া যায় নাই তাহা বুঝিলাম না। মনিব দেশান্তরে—কর্ম্মচারী কর্ত্তব্য আঁকড়িয়া থাকিবে, বিংশ শতাব্দীতে এমন প্রত্যাশা অসম্ভব নহে কি?

নায়েব মহাশয় আমাকে দেখিয়া যেন ভূতগ্রস্তের মত কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পিতার আমলের কর্ম্মচারী! সম্ভবতঃ তিনি নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না।

পর মুহূর্ত্তে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "কিরে এসেছ, দাদা?"

আমি তাঁহাকে নায়েব দাদা বলিয়া ডাকিতাম। তাঁহার কর্ম্মতৎপরতা ও বিশ্বস্ততার গুণে পিতার মৃত্যুর পর, কেহ আমাদিগকে ঠকাইয়া লওয়া দূরে থাকুক, আমাদের সম্পত্তি দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। মাকে তিনি মা বলিয়াই ডাকিতেন।

গোমস্তারা সচকিত ও শশব্যস্ত হইয়া উঠিল।

নায়েব দাদা সঙ্গে করিয়া ভিতরে চলিলেন, আমার শয়নকক্ষের দ্বার মুক্ত হইল। দেখিলাম নায়েব দাদার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ফলে এক বৎসরের অব্যবহৃত গৃহ ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করিতেছে। যেন এইমাত্র আমি ঘর ছাড়িয়া গিয়াছি।

চিত্তের অশান্ত অবস্থাতেও অন্তর যেন কৃতজ্ঞতা-ভারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নায়েব দাদা আবার পরিচর্য্যার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, চারিদিক সরগরম্ করিয়া তুলিলেন।

আমি সংক্ষেপে বলিলাম, "দাদা, আমি একটু নিরালায় থাকতে চাই।"

"তাই হবে ভাই," বলিয়া তিনি নীচে নামিয়া গেলেন।

(৩)

নাই?—কোথায় গেল?

মাতা ও স্বসা উভয়েই আমার দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই বিরাট জনারণ্য মধ্যে কোথায় আত্মগোপন করিয়াছে, কেহ জানে না। নায়েব মহাশয় দীর্ঘকাল ধরিয়া যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও তাহাদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। গভীর রজনীতে ঘনান্ধকারের ছায়ায় কোন্ পথ দিয়া কোথায় তাহারা চলিয়া গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার বিন্দুমাত্র আভাস তিনি পান নাই। কেন যে তাহারা এমন ভাবে আত্মগোপন করিয়াছে, গ্রামের কোন লোকেরই সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ জ্ঞান নাই।

আমার দেশত্যাগের এক সপ্তাহ পরে একদিন সকালে নায়েব মহাশয় জানিতে পারিলেন, একবস্ত্রে, বিনা সম্বলে তাহারা গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। জনরব অনেক রকমেরই কাহিনী প্রচার করিয়াছে সত্য, কিন্তু প্রকৃত রহস্য আজ পর্য্যন্ত যবনিকার অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে।

কোথায় গেল? অর্থ ত তাহাদের ছিল না! কোথায় গিয়া তাহারা এই দীর্ঘকাল রহিয়াছে? কেমন করিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে?

মণি-পিসিমা তাঁহার শ্বশুরের ভিটায় যান নাই। সেখানে যে তৃণ-কুটীর ছিল, আমাদের এখানে আসিবার কিছু কাল পরেই তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছিল।

জননীর নিঃসংখ্যাতিশয্যেই বিধবা তাঁহার ভাগ্যহীনা তরুণী কন্যাকে লইয়া আমাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংসারে তাঁহাদের আপনার জন কেহই ছিল না।

মণি-পিসিমার মাতা এবং আমার ঠাকুর-মা গঙ্গাজল পাতাইয়াছিলেন। সেই সম্বন্ধে বাবা মণি-পিসিমাকে নিজের সহোদরার মত স্নেহ করিতেন। দরিদ্র স্বামীর হাতে পড়িলেও বাবা মণি-পিসিমাকে নিজের সহোদরার মত স্নেহ করিতেন। বিধবা হইবার পর মণি-পিসিমা তাঁহার মাতার কাছে মাঝে মাঝে আসিয়া থাকিতেন। মার সঙ্গে তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। মণি-পিসিমার একমাত্র সন্তান মাধুরী আমাদের বাড়ী দিনের অধিকাংশ সময় মার কাছেই থাকিত। তাহার শ্যাম রূপে এমন একটা চমৎকার মাধুর্য্য-শ্রী ছিল যে, সকলেই তাহাকে ভালবাসিত।

প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া কলিকাতায় যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মাধুরী আমার কাছেই তাহার পড়া জানিয়া লইত। তাহার সহিত আমার বয়সের ব্যবধান ছয় বৎসর। আমি তাহার হরেণ-দা ছিলাম। এখন গোপন করিয়া কোন লাভ নাই, তাহার প্রতি আমার যে স্নেহ জন্মিয়াছিল, যৌবনের উন্মেষে তাহা এমনই গাঢ় হইয়াছিল যে, তাহাকে না পাইলে আমার জীবন ব্যর্থতায় পূর্ণ হইয়া যাইবে মনে করিতাম। তখন তাহার বয়স পনরো। আমি মেডিক্যাল কলেজে তখন চতুর্থ বৎসর পার করিয়াছি। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিবার মত সরলতা ও সাহস আমার মনে ছিল না। কারণ, জানিতাম, মা মণি-পিসিমাকে যতই ভালবাসুন, দরিদ্রের এই কন্যার অপেক্ষা সুন্দরী পাত্রী আমার জন্য সন্ধান করিতেছিলেন। বাবা তখন লোকান্তরে। মাকে ভালবাসিতাম, আবার অত্যন্ত ভয়ও করিতাম। সুতরাং বিবাহে এখন স্পৃহা নাই এই কথাটাই প্রকারান্তরে অন্যের দ্বারা মাকে জানাইয়া দিয়াছিলাম।

এম্‌ বি পাশ করিবার পূর্ব্বে মাও বিবাহ দিবেন না বলিয়া আমার কাছে সত্যবদ্ধ হইয়াছিলেন। পল্লীগ্রামের ষোড়শী কন্যা অবিবাহিত রাখা দায়। মণি-পিসিমা পাঁচজনের সাহায্যে—মাও সে বিবাহে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন—মাধুরীকে এক রুগ্ন এবং দরিদ্র পাত্রে সমর্পণ করিয়াছিলেন। সে সংবাদ আমি কলিকাতায় পাইয়াছিলাম।

হৃদয়ে যে গভীর বেদনা পাইয়াছিলাম, সে কথা ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। সেইদিনই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, ইহজীবনে বিবাহ আমি করিব না। প্রেম মানুষের একবারই হয়। জানিতাম, এ ব্যাপারে মাধুরী ও আমার উভয়ের জীবন অন্ধকার হইয়া গেল। অবশ্য তাহার নারীসুলভ লজ্জা ত্যাগ করিয়া আমার কাছে সে তাহার হৃদয়ের কথার আভাস দেয় নাই; কিন্তু তথাপি—তথাপি আমি তাহার মনের, অন্তরের গোপনতম অংশ দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছভাবে দেখিতে পাইয়াছিলাম।

আমাদের মিলন সম্ভবপর নহে জানিয়াই আমরা দূরে দূরে সরিয়া থাকিতাম। বাল্য ও কৈশোরের মধুর স্মৃতি আমার জীবনকে একনিষ্ঠ ভাবে রাখিবার সহায় হইয়াছিল। কিন্তু মাধুরীর স্বামী বিবাহের ছয় মাসের মধ্যেই তরুণীর সীমন্তের শোভা মুছিয়া দিয়া ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেল। দুর্ভাগিনী নারী ষোড়শ বর্ষেই যোগিনী সাজিল।

এই ঘটনার পর মণি-পিসিমা শ্বশুরের ভিটায় কন্যাকে লইয়া পড়িয়া থাকিতেন।

ডাক্তার হইয়া গ্রামে আসিলাম। মা বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে এবার দৃঢ়তার সহিত জানাইয়া দিলাম, আজীবন কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়াই থাকিব। মা যদি বেশী পীড়াপীড়ি করেন, দেশে আর আসিব না।

মা আমার হৃদয়ের কোথায় ক্ষত হইয়াছে তাহা জানিতেন কি না বলিতে পারি না! কিন্তু আমার দৃঢ় সঙ্কল্পের পরিচয় পাইয়া অবশেষে সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করিলেন।

৪

নিস্তব্ধ রজনীতে শয়ন-কক্ষে অতীতের চিত্রগুলি যেন মূর্ত্তি ধরিয়া আমার নয়ন সমক্ষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। খোলা জানালা দিয়া জ্যোৎস্না-চিত্রিত প্রকৃতির রহস্যপূর্ণ রূপ-জ্যোতিঃ আমার অন্তরকে ধিক্কার দিতেছিল।

আকাশের অগণিত নক্ষত্ররাজি কানাকানি করিয়া আমারই প্রতি যেন বিদ্রূপ কটাক্ষপাত করিতেছিল।

মনে পড়িল—মার পীড়া যখন সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল, তখন তিনি কাহারও নিষেধ না মানিয়া দেখাশুনা করিবার জন্য মণি-পিসিমাকে আনাইলেন। পিসিমার স্নেহদৃষ্টির ছায়াতলে আমার কোন কষ্ট হইবে না—মা লোকান্তরে গেলে, আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তত্ত্বাবধান করিবার লোকাভাব হইবে না—ইহা তাঁহার বিশ্বাস ছিল। আমার আপত্তি মা গ্রাহ্য করিলেন না, আসন্ন মৃত্যুকালেও সন্তানের জন্য এ কি ব্যাকুলতা!

মণি-পিসিমা মাধুরীকে লইয়া আসিলেন। মার মুখে একটা সন্তোষের আলোক-দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। নিশ্চিন্ত-ভাবে আমার সংসার-মরুভূমির একমাত্র স্নেহচ্ছায়া-সুশীতল উদ্যান শুকাইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

মণি-পিসিমার স্নেহ-যত্ন কখনও ভুলিব না। মাধুরীও সংযত ভাষা ও গাম্ভীর্য্যের আশ্রয়ে আপনাকে রক্ষা করিয়া আমার সেবা-যত্নের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। জীবন হয়ত এইভাবেই চলিয়া যাইত।

কিন্তু মানুষের যৌবনকে বিশ্বাস নাই! উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তিকে শাসনে রাখিতে গেলে যে সাধনার প্রয়োজন, তাহা কয়জনের আয়ত্ত? মাধুরীর পুষ্পিত, যৌবনোচ্ছ্বসিত দেহতটে শ্যাম-শ্রীর সমগ্র গরিমা যেন আমাকে উপহাস করিতে থাকিত।

মনের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া অবশেষে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, তখন মাধুরীকে বিদ্যাসাগরের মতে বিবাহ করিব সংকল্প করিলাম। সমাজে যদি স্থান না হয়, অন্যত্র গিয়া থাকিব। কিন্তু যাহাকে সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া আসিয়াছি, তাহাকে আমার প্রয়োজন।

মাধুরীও অবশেষে আমার প্রস্তাবে অস্বীকার করিতে পারিল না।

কিন্তু সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে নানা প্রকার বাধা পড়িতে লাগিল।

পরস্পর পরস্পরকে চাহে—বিবাহের বন্ধন উভয়কে পবিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া দিবে, সুতরাং মনও আনন্দে দুর্ব্বার হইয়া উঠিল।

এই গৃহ, এমনই জ্যোৎস্না-প্লাবিত মাধবী রজনী। কূল-প্লাবী যৌবন-স্রোত, উদ্দাম মোহ, প্রলোভনের অসম্বরণীয় মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করিল!

কিন্তু সত্য সূর্য্যের ন্যায় চিরদিনই স্বপ্রকাশ। তাহার অমোঘ নির্ম্মম আলো এবং দহন-জ্বালা একদিন সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িল।

মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মান সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি মুহূর্ত্তে ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে। জনরব সহস্র মুখ হইয়া চারি দিকে গ্লানির কর্দ্দম-বৃষ্টি করিতে থাকিবে! অসহ্য, অসহ্য!

কাপুরুষতা বোধ হয় আমার অস্থিমজ্জাগত অপরাধ। কোন দিকে চিন্তা করিয়া না দেখিয়া কয়েক সহস্র মুদ্রা লইয়া আপনাকে পরিচিত জন-সমাজ হইতে বহু দূরে লইয়া চলিলাম।

পরম বিশ্বাস-ভরে যে আমাকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়াছিল, তাহার কি ঘটিল তাহা দেখিবার মত সাহস আমার ছিল না।

কক্ষের বাতাস যেন আজ ভারী হইয়া উঠিয়াছিল। বাহিরের প্রকৃতি, আমার পৌরুষকে ধিক্কার দিয়া বলিতে-ছিল—অধম নির্ম্মম মানুষ! কাপুরুষ—স্বার্থপর!

মিথ্যা নহে! মিথ্যা নহে। সমগ্র মানব সমাজের কাছে আমি কঠোর দণ্ডের সম্পূর্ণ উপযুক্ত!

অশান্তভাবে কক্ষ-মধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলাম।

(৪)

কোথায় তাহাকে পাইব? বাঁচিয়া আছে কি না তাহাই বা কে জানে?

মন্ত্রবলে মা ও মেয়ে কোথায় অন্তর্হিত হইল?

ভগবান!—তোমার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবার অধিকারী আমি নহি, তাহা জানি। তথাপি, তথাপি হে অনাথশরণ, আমাকে পথ দেখাইয়া দাও, প্রায়শ্চিত্ত করিবার অবকাশ দাও, প্রভু!

নানা স্থান ঘুরিয়া আজ এক সপ্তাহ কাশীধামে আসিয়াছি। শান্তি নাই, শ্রান্তি নাই, অবিশ্রান্ত কেবলই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, যদি তাহার সন্ধান পাই, দেখা পাই।

এমন নিশ্চিহ্ন ভাবে কেহ আপনাকে লোকারণ্য মধ্যে নির্ব্বাসিত করিয়া দিতে পারে? অনুসন্ধানে যাহা জানিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, মাধুরী ও তাহার জননী ঘৃণাক্ষরেও

কোন কথা প্রকাশ করে নাই। যে অবস্থা লোক-লোচনের অগোচর রাখা কঠিন, তাহা প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই মাতা ও পুত্রী লোকাপবাদ এড়াইবার জন্য এমনই ভাবে আত্ম-গোপন করিয়াছে। অবশ্য আমার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের হঠাৎ চলিয়া যাইবার হেতু, সমালোচনার সৃষ্টি করিয়াছিল সত্য, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কেহ অনুমান করিতে পারে নাই।

বুঝিয়াছিলাম, মাধুরী সমগ্র মন প্রাণ দিয়া আমাকে ভাল না বাসিলে, আমার কলঙ্ককে গোপন রাখিবার জন্য তাহার এমন প্রবল আগ্রহ হইত না। আমার অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতা তাহার নারী-জীবনের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে—তাহার ভবিষ্যৎ জীবনকে শুধু অন্ধকারাচ্ছন্ন নহে, মহাকলঙ্কে মলিন করিয়া দিয়াছে, তথাপি চির-স্নেহশীলা নারী কোন অভিযোগ না জানাইয়াই আপনাকে আমার পথ হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাহা না হইলে এমন ভাবে মাধুরী কখনই নিজেকে লুকাইয়া রাখিত না।

দেহে যতক্ষণ শক্তি থাকিবে, চরণ যতক্ষণ চলিবার ক্ষমতা ধারণ করিবে, তাহার সন্ধানে বিরত হইবে না। যদি সে জীবিত থাকে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। একটি বৎসর নষ্ট করিয়াছি। নিষ্ঠুর স্বার্থপরের মত, নিজের কথা মনে করিয়াই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছি। ভগবান কি মহাপাপীকে প্রায়শ্চিত্তের অবকাশও দান করিবেন না?

বাবা বিশ্বনাথের আশ্রয় লইয়াছি। তিনি আশুতোষ, করুণাময়।

শত শত পূজার্থী তাঁহার শিরে বিল্বপত্র, গঙ্গোদক ঢালিয়া দিয়া তৃপ্তি পাইতেছে। হে অনাথনাথ, এই হতভাগ্যের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ কর।

কিন্তু আমার এই অসংযম,—নির্ভরপরায়ণা, একান্ত আশ্রিতা তরুণীর আত্মবিসর্জ্জনের অবকাশ গ্রহণ করিয়া, ভোগায়তন দেহের ক্ষুন্নিবৃত্তির মহাপাপ,—কি ক্ষমার যোগ্য? বিশ্বনাথ সকলের প্রতিই সমান দয়া, সমান অনুগ্রহ—পাপের সমান দণ্ড প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আমি তাঁহার কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেই আমার অপরাধের সমাপ্তি হইবে?

বুঝি নাই—পূর্ব্বে ধারণা করিতে পারি নাই, তাই আপাতমনোরম ভোগসুখের মায়ায় পথভ্রষ্ট হইয়াছি। কিন্তু তাহার জন্য লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে কে? আমি ত জনসমাজে উন্নত শিরে চলা-ফেরা করিয়া বেড়াইতেছি। কিন্তু যে আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পরম নির্ভরে, একান্ত নির্ভরতার পরিচয় দিয়া আমার প্রলোভনের অগ্নিতে ইন্ধন স্বরূপ আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তাহাকে আশ্রয় দিয়া, সম্মান দিয়া, আনন্দ দিয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিয়াছি কি?

না, না—আমার এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই! নরকের দহন-জ্বালা আমার প্রাপ্য।

গঙ্গার তীরে তীরে ঘুরিয়া, অসংখ্য দেবতার মন্দির-তলে দেহ লুটাইয়া ফিরিলাম। মনের মধ্যে যে তীব্র অনল জ্বলিতেছে, তাহা আমাকে দগ্ধ করিয়া ভস্মে পরিণত করুক!

সারা দিন ক্ষুধা ও তৃষ্ণা আমাকে বর্জ্জন করিয়াছিল। মাথায় নরকাগ্নি জ্বলিতেছিল, বুকের মধ্যে প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছিল। আবার বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে আসিলাম। তখন সন্ধ্যা-বন্দনা আরম্ভ হইয়াছিল। বহু কণ্ঠোচ্চারিত দেবাদিদেবের মহিম-গাথা ঘণ্টা-নিনাদের সহিত মন্দির-তল মুখরিত করিয়া গগন-পথে উত্থিত হইতে লাগিল। সে অপূর্ব্ব বন্দনা-সঙ্গীতে সমগ্র অন্তর-রাজ্য যেন পরিপূর্ণ—পরিপ্লুত হইয়া গেল।

শত শত ভক্তের কণ্ঠোচ্চারিত স্তব মহাপাপীর অন্তরকেও পবিত্র করিয়া দেয়। আশার বাণী মূর্ত্ত হইয়া শ্রোতৃবৃন্দকে পুলক-বিহ্বল করিয়া তুলিতেছিল। দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

প্রেমময়! দয়াময়!

বাহিরে আসিলাম। কোথায় চলিয়াছি?

সহসা পৃষ্ঠদেশে কাহার করস্পর্শ অনুভব করিলাম।

ফিরিয়া চাহিতেই দেখিলাম আমার কলেজ-জীবনের সতীর্থ উমাপদ।

সে বলিল, "রমেশ, তুমি এখানে?"

হাসিবার চেষ্টা করিয়া সঙ্কুচিতে বলিলাম, "হাঁ, এখানে সকলকেই আসতে হয়।"

উমাপদ বলিল, "শুনছিলুম ডাক্তারী পাশ করে দেশে বসেই চিকিৎসা করছিলে—হাঁসপাতালের চাকরী নেও নি। ডাক্তারী চলছে কেমন?"

উত্তর দিলেই হইবে। বলিলাম "এক-রকম মন্দ নয়। তুমি এখানে কি কর?"

উমাপদ প্রসন্ন হাস্যে বলিল, "মাষ্টারী করি। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েই আছি। আমাদের আর অন্য উপায় ত নেই। তুমি কোথায় উঠেছ?"

—"কাশী হোটেলে" বলিয়া পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিলাম।

একটু ইতস্তত: করিয়া উমাপদ বলিল, "তুমি ত ডাক্তার। পাশও করেছ ভাল ভাবে। একজন অনাথাকে দেখ্‌তে যাবার অবকাশ হবে? তারা বড় গরীব, আমার সাধ্যে যা ছিল করেছি। মেয়েটি বোধ হয় বাঁচবে না, চরম অবস্থা বলেই মনে হয়। তবু শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা—"

বাধা দিয়া বলিলাম "ডাক্তারী করে পয়সা উপার্জ্জন করা আমার লক্ষ্য নয়, তা ত জান। চল, আমি এখুনি যেতে রাজি।"

(৫)

জীর্ণ, ভগ্নপ্রায় অট্টালিকা। অন্ধকারাচ্ছন্ন বাঙ্গালী-টোলার দরিদ্রতম অংশে উমাপদ আমায় পথ দেখাইয়া চলিল। সে বলিল, "আমিও গরীব, তাই এর চেয়ে ভাল জায়গায় বাসা করবার উপায় নেই। আমার বাসার একটি ঘরে তাদের স্থান দিয়েছি। তাদের এ সংসারে কেউ নেই।"

চিরন্তন দুঃখ সংসারের কোটি কোটি নরনারীকে প্রতিদিন চূর্ণ করিতেছে। ইহাই সংসার-রাজ্যের প্রকৃত ইতিহাস। প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিলেও এ অবস্থার অপরোক্ষ পরিচয় বাঙ্গালা দেশের বুকে নিয়ত আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

আলোকবিহীন পথে চলিতে চলিতে কয়েকবার পদস্খলনের উপক্রম হইল। উমাপদ আমার হাত ধরিয়া সন্তর্পণে অগ্রসর হইল। তার পর একটি ক্ষুদ্রায়তন একতল কক্ষের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "এই ঘর।"

ঘরের মধ্যে প্রদীপের ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছিল। ঘরের অন্ধকার এই স্বল্পালোকে যেন আরও ভীষণ দেখাইতেছিল। একটি মলিন শয্যায় কে যেন শায়িত। তাহার শিরোদেশে আর একটী রমণীমূর্ত্তি ছায়ার মত বসিয়া আছে।

উমাপদ বলিল, "একটু দাঁড়াও। আমি একটা লণ্ঠন নিয়ে আসি।"

সে লঘু ও ত্বরিত গতিতে চলিয়া গেল।

আমি নীরবে চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

অত্যল্প কালের মধ্যেই একটা লণ্ঠন হস্তে উমাপদ ফিরিয়া আসিল। তাহার নীরব আহ্বানে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোকে কক্ষতল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা বৃদ্ধা আমাদিগকে দেখিয়া মস্তকের অবগুণ্ঠন ঈষৎ টানিয়া দিয়া ব্যাকুল, ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, মেয়ে কেমন করছে।"

সে কণ্ঠস্বরে আমি চমকিয়া উঠিলাম। আমার সমস্ত দেহ টলিয়া উঠিল।

এ কাহার কণ্ঠ? মণি-পিসিমার চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর সহস্র জনের মধ্য হইতেও আমি চিনিয়া লইতে পারি।

ভগবান! ভগবান!—

প্রভূত বলে আপনাকে সংযত করিয়া লইলাম। কোথায় কাহার কাছে আসিয়াছি, বিধাতার অমোঘ বিধানে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু এই দৃশ্য দেখিবার জন্য, তাহা কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলাম!

লণ্ঠনটা এক পাশে রাখিয়া উমাপদ বলিল, "দাঁড়াও, আমি একটু দুধ নিয়ে আসি।"

সে চলিয়া গেল। রুদ্ধ-নিশ্বাসে কম্পিতপদে শয্যার দিকে অগ্রসর হইলাম।

পিসিমা আমার দিকে চাহিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, "কে বাবা, রমেশ?"

কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র অভিযোগের তিরস্কার নাই। ক্ষমাশীলা নারীর স্নেহাপ্লুত কণ্ঠস্বরে আমার অন্তর মথিত, চূর্ণ হইবার উপক্রম হইল।

কম্পিত বক্ষে চাহিয়া দেখিলাম। আমারই পৈশাচিকতায়, আমারই কাপুরুষতায়, তরুণ জীবন কেমন করিয়া পলে পলে চূর্ণ হইয়া অনন্ত পথের অভিমুখে মহাপ্রয়াণ করিতেছে।

আমার দৃষ্টির সম্মুখে পৃথিবী যেন ঘনান্ধকার যবনিকা

টানিয়া দিল। আমারই উচ্ছ্বসিত অশ্রুবন্যায় আমার দেহ প্রচণ্ডভাবে দুলিয়া উঠিতে লাগিল। পৃথিবীর সপ্ত সমুদ্র সে তপ্ত অশ্রু-প্রবাহকে ধারণ করিতে পারিবে?

যে তন্বী, তরুণী মাধুরীর দেহে—যৌবন-নিকুঞ্জে পুষ্প-প্রাচুর্য্যের মাধুর্য্যে একদিন অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এখন দীন-হীন, ছিন্ন, মলিন শয্যায়,—তাহার বিগত-যৌবন কঙ্কালসার দেহ মাটির সঙ্গে মিশাইতে চলিয়াছে।

রুগ্ন আলোক-প্রবাহ তাহার নয়নে পড়িবামাত্র সে একবার তাহার কোটর-প্রবিষ্ট দীর্ঘায়ত নয়নযুগল উন্মীলিত করিল।

তাহার অস্বাভাবিক দীপ্তি বিশিষ্ট আঁখি-তারকায় ও কি ফুটিয়া উঠিল? বিস্ময়, আনন্দ, না পরিতৃপ্তির তড়িৎ-শিখা?

চীৎকার করিয়া ডাকিলাম "মাধুরী! রাণী!—"

অকস্মাৎ প্রচণ্ড কাশির উন্মাদনায় রোগিনীর সর্ব্বদেহ আকুঞ্চিত, উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। দুই ঝলক্ তাজা শোণিতধারা মুখের পাশ দিয়া গড়াইয়া পড়িল। তাহার পার্শ্বে একটি ছয় মাসের শিশু ঘুমাইতেছিল। মাধুরীর বাম হস্ত কাঁপিতে কাঁপিতে উর্দ্ধে উঠিয়া নিদ্রিত শিশুর বক্ষের উপর নিক্ষিপ্ত হইল—তাহার শীর্ণ দক্ষিণ হস্ত আমার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। প্রাণপণ বলে আমার দিকে চাহিবার চেষ্টার সঙ্গেসঙ্গেই তাহার দীপ্ত তারকাদ্বয় ঊর্দ্ধে উঠিয়া সহসা স্থির হইয়া গেল।

দুগ্ধপূর্ণ কাংসপাত্রটি উন্মাদন হস্ত হইতে মধ্যপথে ঝন্ ঝন্ করিয়া মাটিতে পড়িতেই শিশুটি চম্‌কিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভূলুণ্ঠিতা সন্তানহীনা শোকাতুরা বৃদ্ধার মর্ম্মভেদী হাহাকার তীব্র ছুরিকাঘাতের মত যেন আমার বক্ষে চাপিয়া বসিল। তাহার বুকফাটা আর্ত্তনাদ আকাশ বাতাস কম্পিত করিয়া কোন্ এক অদৃশ্য মহাশক্তির চরণতলে আছড়াইয়া কাটিয়া পড়িল।

জর্জ্জর দেহে টলিতে টলিতে শয্যাপ্রান্ত হইতে উঠিয়া দৃঢ় কম্পিত হস্তে ক্রন্দনরত শিশুকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলাম। তাহাকে মাথায় ঠেকাইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলাম, "তোমার এ শেষ দানের মর্য্যাদা আমি অক্ষুণ্ণ রাখব—এর জন্য আমার সমগ্র জীবন দান করব।"

বন্ধুর প্রতি চাহিয়া ভগ্নস্বরে বলিলাম, "উমাপদ! আমার পানে চেয়ে দেখ্‌ছ কি? পাপিষ্ঠ স্বহস্তে এই চির-বিশ্বস্তা নারীকে বধ করেছে! কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্ত—ওঃ—ভগবান!—"

অনুরোধ

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

জ্যোৎস্না-রৌদ্র-গোধূলি-মেশানো রঙ্ কি কখনো দেখেছ?
একাধারে যেই রমা বীণাপাণি তারে কি চিনিয়া রেখেছ?
পড়িয়াছে চোখে এমন কি কেহ সুধা ধরে আঁখি-নীলে যে,
কোকিল ভ্রমর-বীণা-গান যার ললিত বাণীতে মিশেছে?
দেখ নাই? তাকি মানিনেকো
পাঙ্গলকে দেখো।

•

নির্ঝর-নদী-সাগর যাহার চঞ্চলতার উপমা,
কুসুমহারের ছন্দে যাহার হিল্লোলি উঠে সুষমা,
দেখেছ কি তারে? দেখেছ কি কভু কদম্বকুসুম মরুতে,
বসন্তে যেবা মাধবী-মুকুল, বিকচ কমল শরতে?
এমন হয়না? মানিনেকো
পাঙ্গলকে দেখো।

•

তনু দেহ যার পরাগ-পেলব, নিশীথিনী-কালো অলকে,
দক্ষিণে বামে যুগল বেণীর শোভা মন্ হরে পলকে
অলি বার বার ফুল্ ভ্রমে যার চুমিবারে আসে শ্রীমুখে,
তাহারে না দেখি মানব-জীবন না জানি যাপিছ কি সুখে!
ধন্য হইবে, কথা রেখো
পাঙ্গলকে দেখো।

তরুণ জাপান

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

তরুণ জাপানকে যদি প্রাচ্যের ইতালী বলি, তা'তে আর যাই হোক না কেন, অতিশয়োক্তির অপরাধ হয় না। ছোট্ট—এতটুকু একটী দ্বীপের অধিবাসীরা পৃথিবীর বড় বড় শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা অগ্রাহ্য করে, ভূমিকম্পের ভীষণ অত্যাচার অবহেলা করে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে কি করে একটী আত্ম-প্রতিষ্ঠ এবং আত্ম-সম্পূর্ণ জাতি-হিসাবে পৃথিবীর ইতিহাসে নিজের আসনটীকে কায়েমী করে নিল, তা ভাবতে গেলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। অতীত জাপানের কথা পরে বলব; কিন্তু জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আজকের জাপানের উন্নতির যে পরিচয় পাই, তা' জাপানের কার মেয়েরা বেতের ঝুড়ি কি করে তৈরী করে, বর্ত্তমান পূর্ব্ব ইতিহাসের চেয়ে কোন অংশে কম হৃদয়গ্রাহী জাপানের সীমা-রেখা কতদূর পর্য্যন্ত গেছে—এ সব বিষয়ের বলে মনে হয় না। আজকের জাপান বলতে আমি তার বড় বড় অট্টালিকা, তার প্রশস্ত রাজ-পথ এবং সেখান-

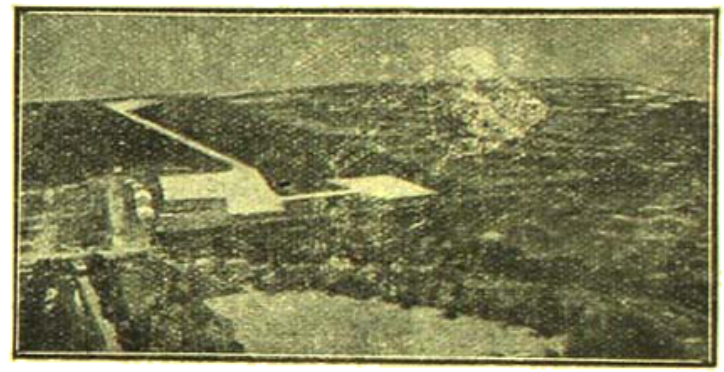

বিমান-পোত থেকে টোকিয়োর দৃশ্য

ফুজি পাহাড়—বিমান-পোত থেকে

আলোচনা করব না; কারণ সে আলোচনা তার ভৌগোলিক ইতিবৃত্তের পুনরাবৃত্তি ছাড়া অন্য কিছু হ'বে না। আমি

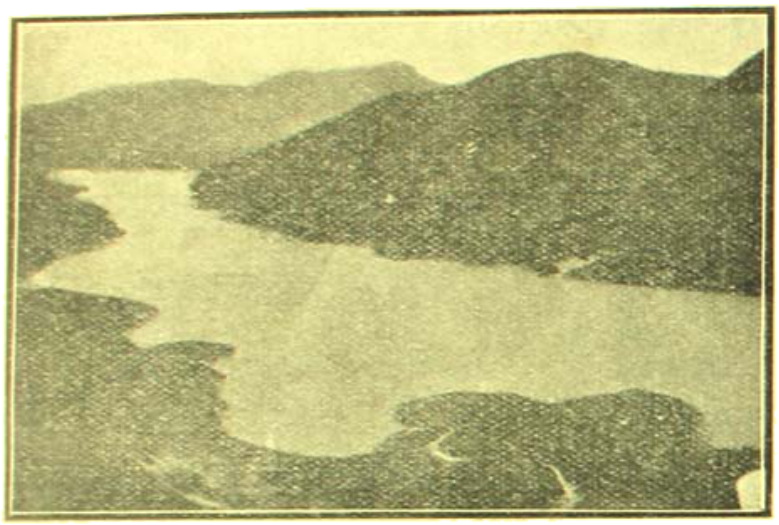

আশিনোকো হ্রদ

ক্রমে ক্রমে তার বর্ত্তমান রাজনৈতিক প্রচেষ্টা, তার ব্যবসা-বাণিজ্য, তার শিল্প-সাধনা, তার সৌন্দর্য্য-রুচির পরিচয়

পরিচয় নয়। সে দেশের লোকে কি দিয়ে রুটী খায়, তাদের মধ্যে কি কি কুসংস্কার চলে আসচে, তাদের বন-জঙ্গলে কত রকম অদ্ভুত জানোয়ার মেলে —এ সবের কোনটাই কোন জাতির পরিচয় নয়। জাতির পরিচয় তার চিন্তা-ধারায়, তার শিক্ষায়, তার সামরিক শক্তিতে, তার সাহিত্যে, তার শিল্পে।

জাপানকে প্রাচ্যের ইতালী বলেচি, তার একটা কারণ ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে এই দুটী নব-প্রবুদ্ধ জাতির মধ্যে সাদৃশ্য আছে। ইতালীর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য দেখবার জন্যে দেশ-বিদেশের টুরিষ্টরা সেখানে গিয়ে হাজির হয়; এবং সেখানকার রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে এক একজন এক একরকম বিবরণ দাখিল করে। ফলে, সে সম্বন্ধে কোন্‌টা সত্যি, আর কোন্‌টা নয়, তাই নির্ণয় করা হয়ে

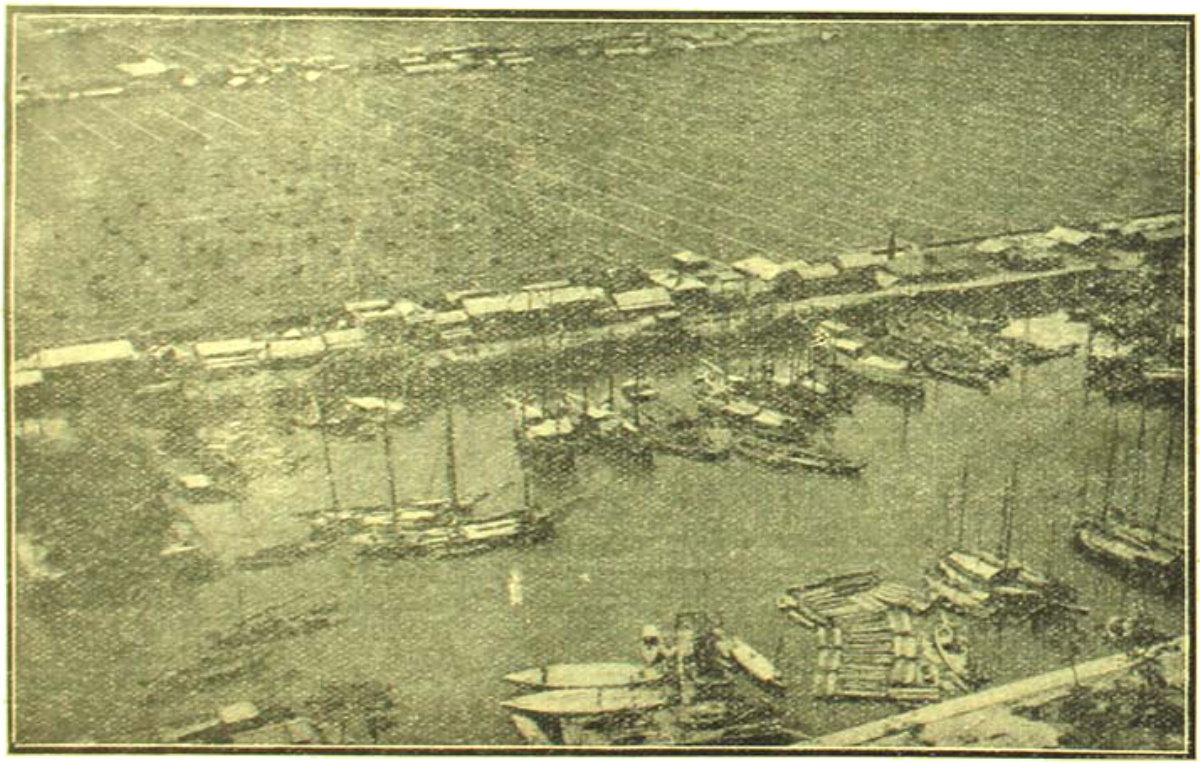

সাকাইদের লবণ উৎপাদন কেন্দ্র

দেবার চেষ্টা করব। কারণ ভৌগোলিক এবং দৈনিক সংবাদপত্রের বিবরণই একটা সুপ্রতিষ্ঠিত জাতির সম্পূর্ণ

দাঁড়ায় কঠিন। জাপান সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। প্রাচ্যের এই মনোহর দ্বীপটীকে দেখবার জন্য উভয় ভূ-খণ্ডের লোকই

সেখানে ছোটে ; আর এই সেদিন চীন-জাপানের একচোট যে লড়াই হয়ে গেল, প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ-দর্শীরা তার কত রকম বিবরণই যে দাখিল করেছেন, তার হিসেব রাখাই কঠিন।

কিন্তু সাদৃশ্য কেবল এইটুকুই নয়।

ইতালী যেমন হঠাৎ নতুন করে গড়ে উঠেছে এবং নিজের মধ্যে সুসম্পূর্ণ হ'বার চেষ্টা করছে, জাপানের বর্ত্তমান ইতিহাসের মধ্যে আমরা সেই প্রচেষ্টার পরিচয়ই পাই। সেদিন পর্য্যন্ত যে জাপান পৃথিবীর উপহাস কুড়িয়েছে, নৌ-বলের দিক দিয়ে আজ তার স্থান জগতের দু'একটী প্রকাণ্ড শক্তির পরেই। জাপানের কবি নেণ্ডচির খ্যাতি আজ দ্বীপের সীমানা অতিক্রম করে গেছে ; জাপানের বস্ত্র-শিল্পের প্রতিপত্তি অনেক দেশের পক্ষে অসহ্য এবং ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পোর্ট-আর্থারে প্রাচ্যের নব জন্ম হয়েছে,—এমনি একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় ; কিন্তু এর মধ্যে অতিশয়োক্তি নেই। পোর্ট-আর্থারে জাপান যেদিন যুদ্ধে রুশবাহিনীকে হটিয়ে দিল, সেদিন সমস্ত প্রাচ্যের চোখের উপর থেকে যেন মোহের একটা আবরণ ঘুচে গেল। এত কাল তারা মনে করে আসছিল যে, প্রতীচ্যের কোন শক্তির বিরুদ্ধেই লড়াই করে জয়ী হ'বার ক্ষমতা তা'দের নেই। পোর্ট-আর্থারে তা'দের সেই ধারণা অমূলক বলে প্রমাণ হয়ে গেল। তার পর থেকে জাপানের নব-জন্ম,—সেই সঙ্গে প্রাচ্যেরও।

ওসাকার নূতন প্রাসাদ

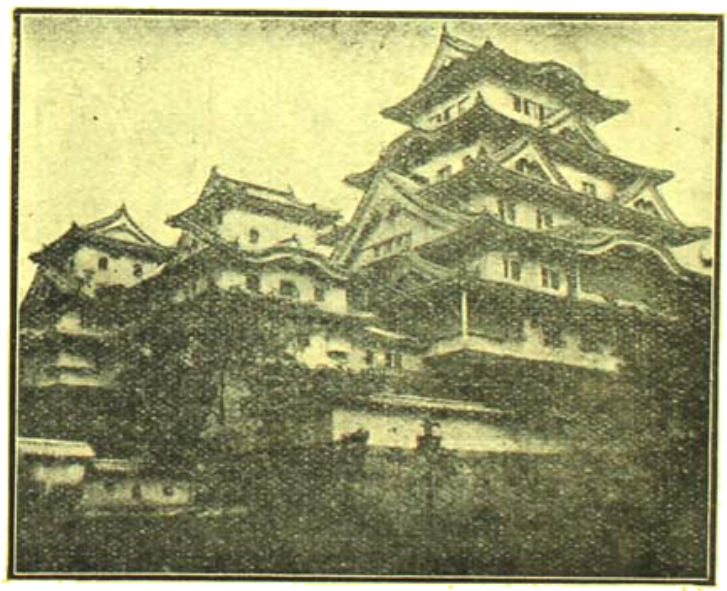

হিমেজীর হাকুরো প্রাসাদ

কবরী-শোভা—প্রজাপতি ধরণের

আজকের জাপানকে দুই-রূপী বলে পরিচিত করলে কোন দোষ হয় না। তার একটী রূপ—তার সামরিক

শক্তি বাড়াবার অক্লান্ত চেষ্টা, ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা পৃথিবীর বাজার অধিকার করা। এ হ'ল তা'র আধুনিক এবং বণিক রূপ। জাপানের আর একটী রূপ—ওদের দেশের 'হকু'—কবিতার মত কোমল, রমণীয়। সেখানে জাপান ধ্বংসপ্রিয় নয়, ধনলোভী নয়; জাপান সেখানে সৃষ্টির নেশায় মাতাল এবং শিল্পী। বর্ত্তমান জাপানে এই দুই মনোবৃত্তির দ্বন্দ্ব।

প্রথমে জাপানের রাজনৈতিক দিকটা সম্বন্ধে দু' একটী কথা বলে রাখি।

জাপানের পার্লামেণ্টের অধিবেশনকে ইংরাজীতে 'ইম্পীরিয়াল ডায়েট' বলা হয়। বিলাতের মত জাপানের ব্যবস্থাপক-সভা দু'রকমের; একটী উচ্চ সভা, অপরটী নিম্ন সভা। বিলাতের মত একটী মন্ত্রীসভা শাসনকার্য্য পরিচালনা করে থাকে। কিন্তু আর একটী প্রতিষ্ঠান আছে, যা ইংলণ্ডে বা অন্য কোন দেশে নেই বললেই হয়। এই প্রতিষ্ঠানটীর ইংরিজী নাম—প্রিভি-কাউন্সিল। কিন্তু ইংরাজের শাসন-ব্যবস্থায় প্রিভি-কাউন্সিল বলতে যা বোঝায়, এটির সঙ্গে তার কোনরকম সাদৃশ্য নেই। এই প্রিভি-কাউন্সিলের সদস্যরা এক একজন প্রবীণ বুরোক্র্যাটিক রাজনীতিক। এককালে তাঁদের শক্তি ছিল—শুধু এই কারণেই আজও তাঁরা রাজনৈতিক জাপানের উপর খানিকটা প্রভাব বিস্তার করে বসে আছেন। মন্ত্রীসভার বা শাসনকার্য্যের কোথাও এতটুকু ত্রুটি হলেই এঁরা চীৎকারে সবাইকে অস্থির করে তোলেন্। এক কথায় বলা যায় যে, এঁরা হচ্ছেন জাপানের রাজনীতিক কার্য্যের নিষ্ক্রিয় সমালোচক।

১৯৩১ সালে জাপানে যে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়, তাতে প্রধান মন্ত্রীর আসন পেয়েছিলেন ব্যারণ ওয়াকৎসুকী।

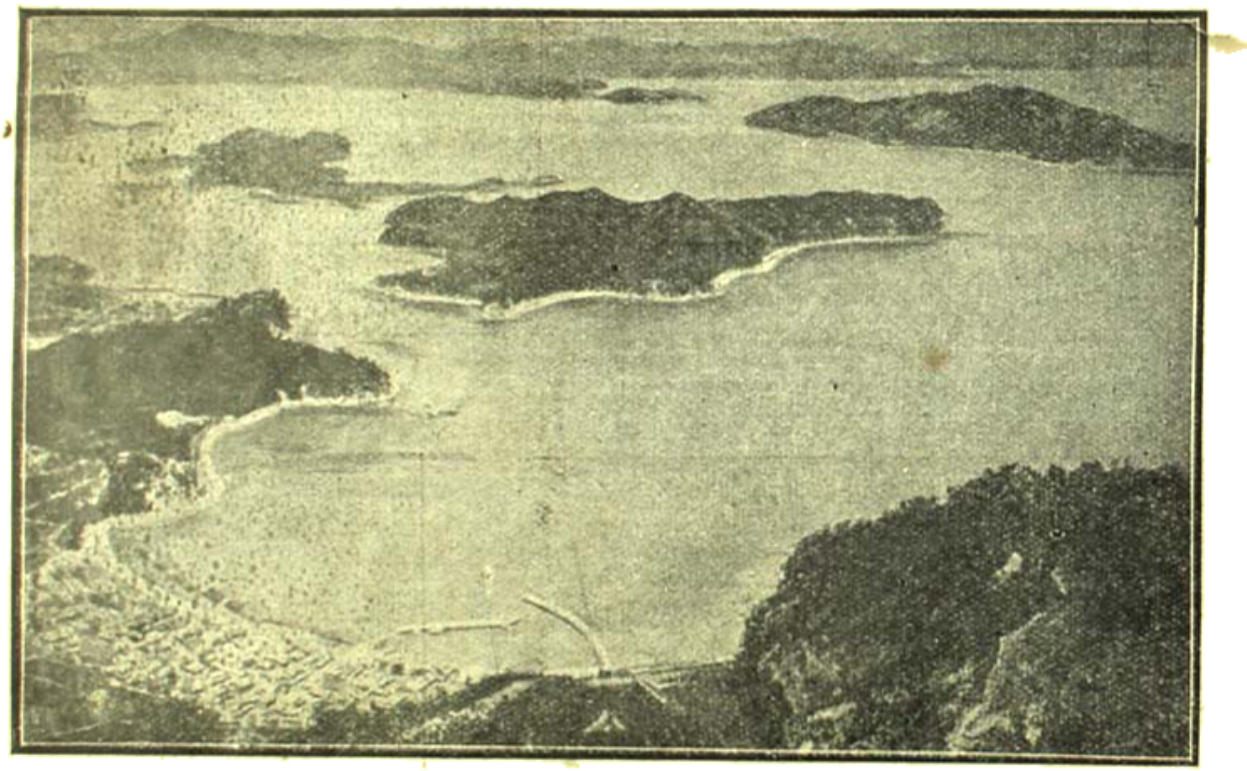

সমুদ্র-বেষ্টিত জাপান

ওয়াকৎসুকীর আগে হেমাগুচি জাপানের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৩০ সালের ১৪ই নভেম্বর প্রধান মন্ত্রী হেমাগুচি এক সামরিক কুচকাওয়াজে উপস্থিত থাকবার জন্যে টোকিয়ো রেলষ্টেশনে উপস্থিত হন; কিন্তু ট্রেণ ছাড়বার আগেই এক ব্যক্তি তাঁকে গুলী করে এবং সেই গুলী তাঁর তলপেটে লাগে। এই আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে হেমাগুচি কার্য্যভার ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং তাঁর স্থানে পররাষ্ট্র-সচিব ব্যারণ শিদেহারাকে অস্থায়ীভাবে

প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করতে বলা হয়। কিন্তু ব্যারণ শিদেহারার কার্য্যে সকল সম্প্রদায়ের লোক সুখী হ'তে না পারায়, ১৯৩১ সালের ১৪ই এপ্রিল পরবর্ত্তী মন্ত্রীসভা গঠন করবার জন্য ব্যারণ ওয়াকাৎসুকীকে আদেশ দেওয়া হয়; এবং তিনি যে মন্ত্রীসভা গঠন করেন তা' হেমাগুচির সময়কার মন্ত্রীসভার নামান্তর মাত্র। ফলে নীতি বা কার্য্য-পন্থার দিক দিয়ে এই মন্ত্রীসভা বিশেষ কোন নূতনত্বের পরিচয় দিতে পারেনি। সেইজন্যে তাঁর শাসনকালের আয়ুও অত্যন্ত স্বল্প নিঃশেষ হয়ে গেল। জাপানের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রীর নাম—ইনুকাই। এই প্রবন্ধ রচনার সময়,

কবরী-শোভা—বালিকাদের

টোকিয়ো থেকে রুটার যে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন, তা'তে জানা গেল যে, কতকগুলি লোক তাঁর বাসভবনে প্রবেশ করে প্রধান মন্ত্রী ইনুকাইকে গুলী করেছে। এই গুলী করাটাকে জাপানের আধুনিক ইতিহাসে কেবলমাত্র পুরাতনের পুনরাবৃত্তি বলে মনে করলে বোধ হয় ভুল হ'বে। এর আড়ালে হয় ত কোন রাজনীতিক বিক্ষোভ ঢাকা আছে, কে জানে!

জাপানের আধুনিকতম রাজনীতিক ঘটনা হচ্ছে—চীনের সঙ্গে জাপানের লড়াই। এই যুদ্ধে জাপানী সৈন্যরা চীনের যে ক্ষতি করেছে তাতে কেবল তার উপরেই একখানি স্বতন্ত্র বই লেখা যেতে পারবে এবং এই ঘটনা এত সম্প্রতি ঘটেছে

কবরী-শোভা—প্রাচীন-পদ্ধতি

যে তার পুনরাবৃত্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন। তার চেয়ে বোধ করি, চীন-জাপানের সম্পর্কটা কেন এমন বিষময়

পুতুল-নাচে পৌরাণিক দৃশ্য

হয়ে উঠল, সে সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৯৩১ সালের ২২শে জানুয়ারী তারিখে জাপানের পার্লামেণ্টের সভায় পররাষ্ট্র-সচিব ব্যারণ শিদেহারা বলেছিলেন যে, চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্পর্ক বজায় রাখাই তাঁদের উদ্দেশ্য এবং এই জন্যেই ইয়েন-সিং-চিয়াং এবং ফেং-উ-সিয়াংএর বিদ্রোহ দমিত হতে দেখে তাঁরা আনন্দ-বোধ করেছেন। এই সময় অনেকে না কি জাপানকে বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে বলেছিল; কিন্তু নানকিং গভর্ণমেণ্টের প্রতি জাপানের সদাশয়তা না কি অসীম, তাই জাপান এই প্রস্তাবে কান দেয় নি। তা ছাড়া, কিছুদিন পূর্ব্বেও জাপানের বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারীরা মুক্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করে বেড়িয়েছেন যে, প্রতিবেশী চীনের সঙ্গে বন্ধুভাবে পাশাপাশি বাস করাই তাঁদের উদ্দেশ্য এবং এই সেদিন

পুতুল-নাচের আর একটী দৃশ্য

চীন থেকে এক দল ইঞ্জিনিয়ার এসেছিল জাপানের রেল-পথ-পরিচালন ব্যবস্থা দেখে যেতে; জাপানী পুলিশের কার্য্য-কলাপ দেখে শিক্ষা করবার জন্য চীন একদল পুলিশ কর্ম্মচারীও জাপানে পাঠিয়েছিল এবং চীন জাপানকে না কি দুটী বড় বড় জুইজার তৈরী করে দেবার ভারও দিয়েছিল বলে শোনা যায়।

কিন্তু এই মধুর সম্পর্ক হঠাৎ এমন তিক্ত হয়ে উঠল কি করে? ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা এবং অসুবিধাই যে এর একটা মস্ত কারণ তা বললে বোধ করি ভুল হয় না। এই দুই দেশের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের যে সন্ধি ছিল, সেইটেই সকলের চেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল এবং সে কাজে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করল মাঞ্চুরিয়া। রুশ আর জাপানীদের লড়াইয়ের পর মাঞ্চুরিয়ায় এই দুই দেশের একটা ঐতিহাসিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কিন্তু জাপানের মতে চীনের গভর্ণমেণ্ট না কি এই সম্বন্ধবিরোধী কতকগুলি কাজ করছিল। মাঞ্চুরিয়ার স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট রেল-পথ সম্বন্ধে এমন এক ব্যবস্থা করেন,—জাপানের মতে যা দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়ার রেলপথের স্বার্থের বিরোধী। সেখানে বিদেশীরা বহিষ্কৃত হয়, এবং জাপানীদের ট্যাক্সের শুল্ক ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়। জাপানী ব্যবসায়ীরা যা'তে নিরুপদ্রবে ব্যবসা চালাতে না পারে সেজন্য সকল প্রকারে চেষ্টা করা হয়। চীনা ব্যবসায়ীদের সাহায্যে যাতে জাপানী পণ্য রপ্তানী করা সম্ভব না হয়, সে জন্যও চেষ্টার ত্রুটী থাকে না। এ সমস্তই জাপানের নিজের কথা। এর কতটা সত্যি, আর কতটা নয়, তা নিয়ে পরে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। এখন কেবল জাপানের মনোভাবটা খুলে দেখাবার চেষ্টা করছি।

মুকদেন প্রাসাদ থেকে এক মাইল উত্তরে—কারোলিয়াং প্রান্তরের মাঝখানে পী-তা-ইং নামে একখানি প্রকাণ্ড বাড়ী। চীনের উত্তর-পশ্চিম বাহিনীর সপ্তম ব্রিগেড এই বাড়ীখানিতে আস্তানা পেতে বাস করছিল। ওয়াং-ই-চে ছিলেন এই ব্রিগেডের জেনারেল। জাপানীরা বলে যে চীনের এই তরুণ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেনা-নায়কটী না কি জাপানীদের কাল্পনিক শত্রুরূপে খাড়া করে নিজের অধীনস্থ সৈন্যদের শিক্ষা দিতেন। এই সৈন্যদলের আড্ডা থেকে কিছু দূরেই দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া রেল-পথের সুরু। জাপানী সৈন্যরা এই রেলপথ পাহারা দিত এবং ওয়াং-এর দল না কি তাদের প্রতি আদৌ প্রসন্ন ছিল না।

১৯০৫ সালে পোর্টসমাউথ সন্ধি অনুসারে জাপান এই দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া রেলপথে কিছু দূর অন্তর ১৫ জন করে লোক রাখবার অধিকার অর্জ্জন করেছিল। কিন্তু—জাপানের মতে—চীন না কি ক্রমে এই সন্ধির সর্ত্ত অবহেলা করে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হতে থাকে। জাপানের অধিকার

নষ্ট করবার জন্য একটা আন্দোলনও চীনে আত্মপ্রকাশ করে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এই রেলপথের পাহারায় নিযুক্ত জাপানী সৈনিকরা চীনা সৈনিকদের দ্বারা ক্রমাগত অপমানিত হতে থাকে। জাপানের মতে এই দুই দলের সৈন্যরা যে তখনই পরস্পরকে আক্রমণ করে নি, এইটেই বিস্ময়ের বিষয়।

১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর; বেলা দশটা ২০ মিনিট। লিউতিয়াও কেউর ছোট্ট একটী সেতুর নিকট এক বিস্ফোরণের শব্দে জাপানী সৈন্যরা চকিত হয়ে উঠ্‌ল। এই সেতুটী চীন-সেনানিবাসের পশ্চিমে এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলওয়ে ব্যারাকের অত্যন্ত নিকটে। শব্দ শুনে তারা ছুটল সেই দিকে এবং কোয়ালিয়াং প্রান্তরে তাদের উপর গুলী বর্ষিত হ'ল। ফলে একটা সংঘর্ষ বেধে গেল। মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী সৈন্যদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত অল্প। জাপানের মাত্র তিনটী ব্যাটেলিয়ান, কিন্তু চীনের ৬টীর উপর কুগেড। তবু জাপানী সৈন্যদল চীনের সেনানিবাস আক্রমণ করল এবং ১৯শের তারিখে মধ্যাহ্নের মধ্যে প্রাচীর-ঘেরা মুকদেন সহর দখল করে নিল। এর পর আরও দুএকটী ছোটখাট সংঘর্ষের পর চীনের সৈন্যদের নিরস্ত্র হতে বাধ্য করা হল এবং চার হাজার জাপানী সৈন্য তাদের এবং রেলপথের নিরাপত্তার জন্যে অগ্রসর হ'তে হ'তে চিলিন, তুন্‌হুয়া, চেংচিয়াতুন্, তুংলিয়াও এবং তাওনান্ দখল করে ফেলল। ২৪শে তারিখ থেকে জাপান উপরিউক্ত অধিকৃত স্থানগুলি থেকে সৈন্যদল প্রত্যাহার করে নিয়ে বললে যে, কেবল রেলপথ ও সেই অঞ্চলের জাপানীদের জীবন নিরাপদ করবার জন্যেই তারা এতদূর অগ্রসর হয়েছে। ২৫শে তারিখে জাপান এ কথা বিশ্বের অন্যান্য শক্তিকে জানিয়ে দিয়ে বলল যে, এখন দুই দেশের সোজাসুজি আপোষের কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন এবং চীন যদি সোজাসুজি আলোচনায় যোগদান করতে সম্মত না হয়, তা হ'লে দুই জাতির মধ্যে আরও অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হ'বে এবং তখন জাতি-সঙ্ঘ হস্তক্ষেপ করলেও সহজে কোন ফল হ'বার সম্ভাবনা থাকবে না।

ভিতরের কথা বিশেষ কিছু প্রকাশ না পেলেও এটুকু অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না যে, কথাবার্ত্তা বেশী দূর অগ্রসর হয় নি এবং অগ্রসর হলেও তা বিশেষ সুবিধাজনক হয় নি। মাঞ্চুরিয়া নিয়ে এই বিরোধ প্রশমিত হ'বার কোন পথ না পেয়ে এই দীর্ঘ দিন ধরে ভিতরে ভিতরে ধোঁয়াচ্ছিল;

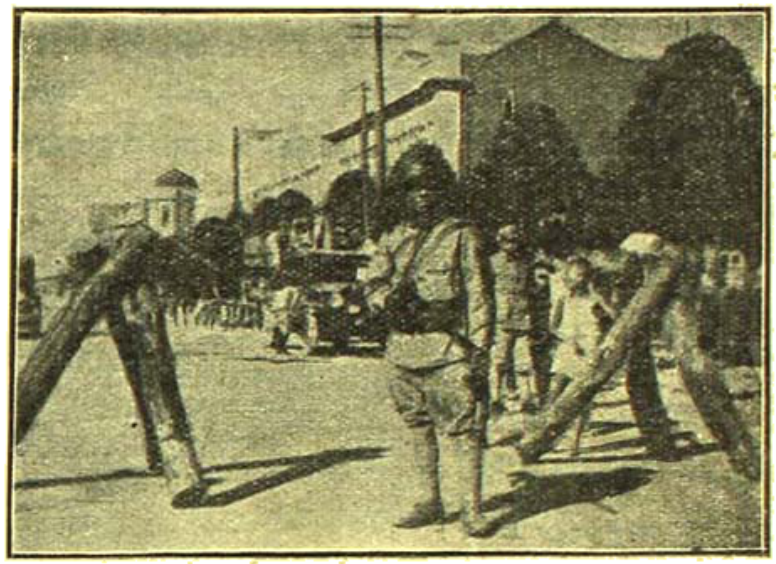

৬ — দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া রেল-পথে জাপানী সৈন্যদের পাহারা

তার পর সে দিন হঠাৎ তার নগ্ন মূর্ত্তি সংগ্রামের বীভৎসতা নিয়ে নিজেকে সমস্ত পৃথিবীর সামনে প্রকট করে তুলল। কিন্তু চীনের সঙ্গে জাপানের বিরোধের কারণ বোধ করি

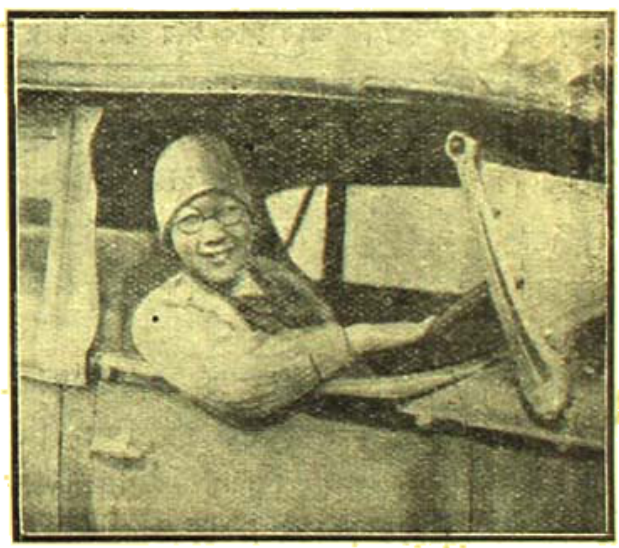

জাপানের মহিলা মোটর-চালক

কেবল এইটুকুই নয়। এই সংগ্রামে যত কথা ব্যক্ত হয়েছে তার তুলনায় অনেক কিছু অনুক্ত থেকে গেছে বলে মনে

হয়। কেউ কেউ বলেছেন যে, এই সংগ্রামের পিছনে তৃতীয় কোন পক্ষের প্ররোচনা আছে; নইলে সামান্য একটা রেলপথ সংক্রান্ত এই বিরোধের ঘরোয়া মীমাংসা হওয়া হয় ত একেবারে অসম্ভব ছিল না। বিদেশের অনেক সংবাদপত্র এই সম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়ার নাম করেছে এবং অনেক সংবাদপত্র এমন কথা বলতেও ইতস্ততঃ বোধ করে নি যে চীন-জাপান ছাড়া একাধিক শক্তির একটা গূঢ় মনোভাব না কি এই দুই দেশের অপ্রীতিকর মনোমালিন্যের আড়ালে আত্মগোপন করে আছে এবং সেই শক্তিগুলি শক্তি, সামর্থ্য এবং রাজ্যলোভে না কি পৃথিবীর কয়েকটী সেরা জাতি বলে পরিচিত। কিন্তু এ সম্বন্ধে স্পষ্ট করে, কৃতনিশ্চয় হয়ে কোন কথা বলবার সময় এখনও আসে নি; সুতরাং এই বিষয় নিয়ে বেশী কথা বলতে যাওয়ার মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

আগামী সংখ্যায় জাপানের ব্যবসায় বাণিজ্য এবং গণ-আন্দোলনের কথা আলোচনা করব।

চিত্র-লেখা

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ-রায়

(এক)

ছবি আঁকত সে। দিন নাই, রাত নাই, শুধু আঁকতই। তন্ময় হ'য়ে আঁকত। চিত্র-লেখা হঠাৎ কখন বন্ধ হ'য়ে যেত। আকাশ-পানে সে তুলিকা-হাতে চে'য়ে থাকত। কি যে চায়, কেউ বোঝে না—বুঝত শুধু সে-ই। তার স্নিগ্ধ আঁখির অনিমেষ দৃষ্টি যখন আকাশেই লীন, আকাশ তখন হয় ত বৈচিত্র্য-বিহীন। তার দৃষ্টিরই মতন আকাশও যেন একটা অর্থ-হীন সৃষ্টি। আকাশের গায় মেঘেরা তখন সুপ্তি-মগন, নাই রেখা আষাঢ়ের বাদল-বরিষণ—শ্রাবণের ঘেরা-গরজন; নাই রেখা রক্ত-উষার সুষমা—গোধূলির লালিমা। নির্ব্বাত নিষ্কম্প আকাশ—নাই রেখা ইন্দ্রধনুর বর্ণ-বিলাস; নাই অমানিশার সন্ধ্যা-তারার দীপালি, নাই জ্যোছনা-রাতে চন্দ্রালোকের স্বপ্ন-ধারা—পাপিয়ার পীতালি।

খেয়ালী চিত্রকর। তবু সে চে'য়েই থাকত। তার সে চে'য়ে-থাকা মূরতি, যেন পটুয়ার পটে-আঁকা ছবিটি। হাতের তুলিকাটি খ'সে পড়ত শিথিল করাঙ্গুলির ফাঁকে। কখন, তা' সে টের পেত না। তুলিকার ডগার রঙের অমূলেপটুকু শুকিয়ে যেত। চিত্র-লেখন শেষ হ'তে পারত হয় ত আর কয়টি রেখাঙ্কনে, না-হয় খানিকটা বর্ণ-সম্পাতে। চিত্রখানি অসমাপ্ত, তুলিকাটি কর-চ্যুত। তারা পরিত্যক্ত, অবহেলিত হ'য়ে প'ড়ে' থাকত এখানে-সেখানে।

চিত্রকরের এই যে চাওয়া, সে কি চাওয়ার জন্যেই চাওয়া, না কোন্ না-পাওয়াকে পাওয়ার জন্যে চাওয়া, তা কে জানে?

তার লেখন শেষ হ'ত যে-চিত্রে, সেখানি হ'ত একটা অপূর্ব্ব বস্তু। একটা পরিপূর্ণ সৃষ্টির রস-ধারা উৎসারিত হ'ত তারই মধ্যে দিয়ে। পরিকল্পনায়, অঙ্কন-নৈপুণ্যে, বর্ণ-সম্পাতে সে কি মনোরম, অতুলনীয়!

(দুই)

বন বন। বনান্তে গিরি। গিরি-গাত্রে নির্ঝরিণী। ঝর-ঝর সে নির্ঝর-ধারা। সে স্বচ্ছ নির্ম্মল জল-ধারা নিয়ে বহমান। কিন্তু দূরে অস্বচ্ছ উপল স্তূপে প্রতিহত হ'য়ে তারই মন্থীকৃত গতি দু'ধারে রেখাকারে প্রবাহিত। উপল-স্তূপের সাম্নে খানিকটা সমতল স্থানে ছায়া-শীতল তরুতলে একখানি কুটীর।

কুটীরের তিন দিকেই পত্র-পল্লবে-শোভিত কয়েকটি বৃক্ষ। দক্ষিণে, বামে, পশ্চাতে অর্দ্ধ-চক্রাকারে তারা দাঁড়িয়ে। পুষ্পিত লতার আবেষ্টনে সুশোভন সে তরু। তরুর আশ্রয় ছে'ড়ে লতাগুলি স্বচ্ছন্দ গতিতে চল্‌তে গিয়েই এলিয়ে পড়েছে কুটীরের বিচিত্র ছাউনির 'পরে। লাজ নম্রিতা লতিকার আচ্ছাদনে, মনে হয় যেন, কুটীরখানি রচিত লতা-বিতানেরই ছায়ায়।

বিচিত্র সে কুটীর। একখানি সুলিখিত আলেখ্যেরই মতন। কুটীরের ভিতরে-বাইরে সুনিপুণ শিল্পীর কারু-কৌশলের অভিনব স্ফূর্তি। রস-পিপাসু শিল্পীর সরল চিত্তটির খোঁজ মিল্‌তে পারে সে কুটীরখানিতে, কুটীরে থাকে এই চিত্র-শিল্পী। তারই নিজ হাতে রচিত এ কুটীরখানি।

(তিন)

সে রাজ্যের রাজা এলেন শীকারে। পথ হারিয়ে উঠ্‌লেন সে পাহাড়ে। কুটীরে গিয়ে দেখ্‌লেন ওই শিল্পীরে। সে তখন চিত্রাঙ্কনে নিরত। যেন যোগাসনে তাপস সমাহিত-চিত্ত। সম্মোহিতের মত রাজা চে'য়ে রইলেন। রাজা দেখ্‌তে পেলেন, চিত্র-লেখক তার রসাল চিত্তটি উজাড়ি করে' দিয়েছে সে চিত্রে। তারই মোহন তুলিকায় উজ্জ্বল রস-ধারা শত ধারায় ব'য়ে যায়।

রাজা ভাব্‌লেন—এ ধ্যানীর ধ্যান ভঙ্গ হ'লে রস-সৃষ্টির ব্যাঘাত হবে। বেরিয়ে এলেন রাজা। যেম্‌নি নিঃশব্দে কুটীরে গেলেন, তেম্‌নি নিঃশব্দে বেরুলেন। শিল্পী এর কিছুই টের পায়নি।

একদিন রাজান্তঃপুরে রাজা শীকার-কাহিনী বল্‌ছিলেন। রাজ-মহিষী, রাজ-কুমারী, রাজ-পরিবারের আরো সব মহিলারা সেখানে বসে'। সেদিনের শীকার-কাহিনীতে কোনো বৈচিত্র্য ছিল না। শুধু সে চিত্রকরের কথা রাজা যখন বল্‌তে লাগ্‌লেন, সবাই নিবিষ্ট-চিত্তে তা' শুন্‌লেন।

চিত্রকরের কাহিনীতে সব চে'য়ে বেশী আকৃষ্ট হ'ল রাজকুমারী। ষোড়শী রূপসী সে রাজকুমারী। ললিত-কলা-বিদ্যার অনুরাগিনী। নিজে চিত্র-বিদ্যার অনুশীলন করে। চিত্রকর আর তার চিত্র দেখ্‌তে চাইলে রাজকুমারী। রাজ-সভায় ডাক পড়্‌ল সে চিত্রকরের।

(চার)

চিত্রকরের খোঁজ হ'ল। সে রাজ-সকাশে। রাজাদেশে রাজ-শিল্পীর পদে তার নিয়োগ হ'ল। তার ডাক পড়্‌ল রাজান্তঃপুরে।

তরুণ সে শিল্পী। সুস্থ, সুশ্রী। রাজকুমারী দেখ্‌তে পেল—তার সুন্দর দু'টি আঁখির দৃষ্টিতে যেন একটা মায়াপুরীর সৃষ্টি। বিশ্ব শিল্পী অমিয়-সাগর মন্থন করে' দু'টি চোখে অমিয়-রাশি ঢেলে' দিয়েছেন।

রাজকুমারী চিত্রাঙ্কন শেখে তার-ই কাছে। রাজকুমারীর একাগ্র সাধনায়ও সে চিত্রখানি পরিপূর্ণ রূপ পেল না, রাজ-শিল্পীর তুলিকার খানিকটা বর্ণ-সম্পাতে সে চিত্র সম্পূর্ণ হ'ল। চিত্রাঙ্কনে রাজকুমারীর নিপুণতা স্বভাব-জাত। রাজকুমারী আশৈশব চিত্র-বিদ্যার অনুশীলন করে' আস্‌ছে। রাজ্যের কত বিশিষ্ট কলাবিদের প্রশংসা সে পেয়েছে।

একদিন একখানি চিত্রে রাজকুমারী কত করে'ও তার পরিকল্পিত ভাবটি ফুটিয়ে তুল্‌তে পার্‌ল না। শিল্পীর তুলিকায় কয়েকটি রেখাঙ্কনে ভাবটি মূর্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। রাজকুমারী ভাব্‌ত—এ চিত্রকর, না যাদুকর!

শিল্পী যখন চিত্র-লেখায় নিরত, রাজকুমারীর মুগ্ধ দৃষ্টি তখন তার-ই পানে। তার কম-করের চম্পকাঙ্গুলির ফাঁকে মোহন তুলিকাটির লীলায়িত গতি ও মৃদু কম্পন—জাগিয়ে তুল্‌ত রাজকুমারীর স্নিগ্ধ বুকের মাঝে কি একটা স্পন্দন। সে খেয়ালী শিল্পী উদাস নয়নে যখন আকাশে চে'য়ে থাক্‌ত, করুণার ভরে' উঠ্‌ত তখন তার নারী-চিত্তটি।

(পাঁচ)

শ্রাবণ-শেষে। শুক্লা-ত্রয়োদশীর রাত্রি। বর্ষণ-ক্লান্ত আকাশ নীল-নির্ম্মল। নিঃশেষ বরিষণে মেঘ দান-রিক্ত—জল-ভার-শূন্য। নীল আকাশে চাঁদের আলো ছড়িয়ে গেছে। ধরণী হাস্যোজ্জ্বলা। রাজান্তঃপুরের স্বচ্ছতোয়া সরসীর দূর্ব্বাদল-শ্যামল তীরে নীপ-বনে চিত্রকর উপবিষ্ট। প্রস্ফুট কদম্ব-কুসুমের স্নিগ্ধ গন্ধে বিভোর বাতাস। নীপ-কুঞ্জে নিরালা বসে' আকাশের পানে চে'য়ে সে চিত্রকর। প্রকৃতির রসাল বক্ষ হ'তে সৌন্দর্য্য-সুধা-ধারা উৎসারিত। আর তার পিপাসিত দু'টি আঁখি সে সুধা-ধারা পানে নিরত।

রাজকুমারী তার পাশে দাঁড়িয়ে। ডাক্‌ল—"শিল্পী! শিল্পী!" রাজকুমারীর কণ্ঠ-স্বর করুণ—কোমল। শিল্পী তন্ময়। সে কণ্ঠ-স্বর তার কানে পৌঁছয় নি। রাজকুমারী তাকে আরো কতদিন এমনটি পে'য়ে এম্‌নি করে'ই ডেকেছে। সাড়া পায় নি বলে' ব্যথাহত হ'য়ে নিঃশব্দে চলে' গেছে; বলেছে—এ পাষাণ-দেবতা। রাজকুমারী ভাব্‌ল, আজ আর সে এম্‌নি ফিরে' যাবে না।

কার পুষ্প-পেলব পরশে শিল্পী অকস্মাৎ কল্পলোক

থেকে নেমে এল। এ পরশখানি কি তার মানসীর? আঁখি ফিরিয়ে দেখ্‌তে পেল, পাশে বসে' রাজকুমারী। তারই দু'খানি হাতের মধ্যে শিল্পীর হাতখানি—যেন, কনক চাঁপায় অঞ্জলি ভরে' পূজারিণী প্রতীক্ষমানা। শিল্পী ভাব্‌ল—এ কি স্বপ্ন! অপলক দৃষ্টিতে স্বপ্ন-বিহ্বলের মতন সে রাজকুমারীর পানে চে'য়ে। "শিল্পী! শিল্পী! ভয় পেয়েছ?"—সকরুণ কণ্ঠে রাজকুমারী জিজ্ঞাসে। অস্ফুট স্বরে শিল্পী কহে—"না।" "শিল্পী! আমার বল না, তোমার আঁখি দু'টি কার খোঁজে এমনি পাগল!" রাজকুমারীর কণ্ঠ-স্বরে কত মিনতি। শিল্পী মৃদুকণ্ঠে কহে—"আমার মানসীর।" "কে তোমার মানসী?"—সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসে রাজকুমারী। শিল্পী নিরুত্তর। রাজকুমারীও নীরব। ক্ষণেক পরে শিল্পী কহে—"রাজকুমারী! আর কত দিন আমাকে এমনি বন্দী থাক্‌তে হবে?" শিল্পীর কণ্ঠ-স্বরে কি গভীর বেদনা! রাজকুমারীর মরমে গিয়ে পৌঁছ্‌ল তা'। "তুমি ত বন্দী নও শিল্পী!"—সমবেদনা-ভরা কণ্ঠে রাজকুমারী কহে। বিস্মিত হ'য়ে শিল্পী জিজ্ঞাসে—"বন্দী নই রাজকুমারী?" তেম্‌নি সমবেদনা-ভরা কণ্ঠে আবার রাজকুমারী কহে—"বন্দী নহ তুমি, শিল্পী!"

নীপ-বন ছে'ড়ে বাপী-তটের দূর্ব্বা-কোমল সরু পথটি বে'য়ে চল্‌ল সে খেয়ালী শিল্পী। রাজকুমারীর সাশ্রু নয়নের অনিমেষ দৃষ্টি তারই পানে। ভাব্‌ল, ডাকি তারে। মুখে কথা ফুট্‌ল না। আবার ভাব্‌ল, যাই তার পেছনে ছু'টে। চরণ চল্‌ল না। ভূমি-পথে সে তার পদ-চিহ্ন রে'খে যায় নি, রে'খে গেছে শুধু রাজকুমারীর চিত্ত-পথে তার অস্পষ্ট চরণ-রেখাটি।

(ছয়)

চিত্রকর কুটীর-দুয়ারে। উষার অরুণ-রাঙা হাসি তখন পূব-আকাশের ভালে ফু'টে উঠেছে। তার ডাক শু'নে বনের পাখীরা সব কল-কাকলীতে কুটীর-আঙিনা মুখরিত করে' তুল্‌ল। কেউ তার হাতে, কেউ তার মাথায়, কেউ কাঁধের 'পরে এসে বস্‌ল। তার পায়ের কাছে ছুটোছুটি কর্‌তে লাগ্‌ল কতগুলো। একটিকে ধরে' সে চুমো খে'য়ে ছে'ড়ে দেয়, আর-একটিকে বুকের পরশটি দিয়ে উড়িয়ে দেয়। হরিণ-শিশুরা ছু'টে এল সেখানে। একটি তার পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ল, তার পদ-লেহনে তৃপ্ত আর-একটি—সব চে'য়ে ছোট্টটির কচি কচি চোখের মিনতি-ভরা দৃষ্টি তারই মুখ-পানে।

কুটীরে এসে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌ল কতদিন পরে। রাজপুরীর আবহাওয়া তার ভালো লাগে নি।

উপল-স্তূপ বে'য়ে দাঁড়াল গিয়ে সে নির্ঝরের ধারে। তখন ঠিক্‌রে পড়েছে প্রভাত-রবির কিরণ—স্বচ্ছ শুভ্র ঝর্ণা-ধারায়। হীরার ছোট্ট টুক্‌রোগুলো যেন জ্বল্‌ছে তার-ই মাঝে মাঝে।

(সাত)

একদিন অপরাহ্ণে রাজকুমারীর প্রেরিত দূত এল সে কুটীরে। চিত্রকরের হাতে দিল রাজকুমারীর প্রেরিত লিপিকা। খুলে' দেখে সে—রাজকুমারীর নিজ হাতে আঁকা ছোট একখানি চিত্র। মুগ্ধ নয়নে চে'য়ে রইল সে চিত্র-পানে।

চিত্রের পরিস্ফুট ভাবটি—স্নান-মানীর প্রান্তে তমাল-ডালে পত্র-পল্লবের আড়ালে বিহগী কত যত্নে নীড় রচনা করেছে। বেলা-শেষে ফিরে এল সে। এল না তার সাথীটি। বিহগী আর কুলায় যায় না। সন্ধ্যার ম্লান ছায়া নে'মে আস্‌ছে। সে বসে' আছে তমালেরই ডালে তার সাথীটির প্রতীক্ষায়। তার কালো ছোট্ট দু'টি চোখ ছলছল। মৃদু-কম্পিত চঞ্চু-পুটে কি গভীর মরম ব্যথা উঠ্‌ছে ফুটে'। শিল্পী অনুভব কর্‌ল, রাজকুমারী সারা চিত্তটি উজাড় করে' রস-ধারা নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছে সে চিত্রে। শিল্পীর আঁখি দু'টি ঘিরে ঝরে' পড়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু।

রাজকুমারীর চিত্র-লিপির উত্তরে লিখিত হ'ল আর একখানি চিত্র-লিপি। নিশি ভোর করেছে সে চিত্র-লেখায়। প্রভাতে রাজ-দূতের হাতে দিল সে লিপিখানি।

(আট)

রাজান্তঃপুরে ফিরে' এসে রাজ-দূত সে লিপি দিল রাজকুমারীর হাতে। আদি-অন্ত সমস্ত সে বলে' গেল। চিত্রকরের অশ্রু-জলের অভিনন্দন, লিপি-লেখায় বিনিদ্র রজনী যাপন—কিছুই সে বল্‌তে ভোলে নি।

রাজ-দূত চলে' গেল। তখন সন্ধ্যা। রাজ-প্রাসাদ সহস্র স্বর্ণ-প্রদীপের আলোতে উজ্জ্বল। রাজকুমারী একাকিনী লিপি খুলে' প্রদীপালোকে বসে'। বুকের ভিতর ঘন স্পন্দন। শিল্পীর লিখিত চিত্রে পাঠ কর্‌ল সে—নীল আকাশের ছায়া-তলে জ্যোছ্‌না-সায়র। অচ্ছোদ-সরসী-নীরে ভাসমান প্রস্ফুট কমলের মত সে জ্যোছ্‌না-সায়রে কত শত চন্দ্রমা ফুটে' রয়েছে আলোর বিচিত্র পাপ্‌ড়িগুলো মেলে'। তার-ই মাঝে শিল্পী-মানসী অপরূপ রূপে প্রতিভাত। মানসীর ললিত অঙ্গের লাবণি আকাশ-ভুবন উজল করে' তুলেছে। সে জ্যোছ্‌না-সায়রের লহরে লহরে তার দেহ-লতিকা দুল্‌ছে। তার স্নিগ্ধ দু'টি আঁখির মৌন আহ্বান নে'মে আস্‌ছে জ্যোছ্‌নালোকের ঝর্ণা-ধারায়।

রাজকুমারীর সুন্দর দু'টি চোখের কূল ছাপিয়ে অশ্রু-ধারা প্রবাহিত। চিত্র-লেখা মুছে' গেল সে অশ্রু-জলে।

শোক-সংবাদ

যোগাচার্য্য স্বর্গীয় আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী

সাংখ্য-যোগাচার্য্য হংসস্বামী ব্রহ্মর্ষি শ্রীমৎ কেবলানন্দ ভারতীতীর্থ মহারাজ যিনি পূর্ব্বাশ্রমে আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী বেদান্ত-সরস্বতী নামে পরিচিত ছিলেন, ১৩৩৮, ২৪এ চৈত্র রাত্রি ৯—৩৭ ঘটিকার সময় ৺কাশীধামে সজ্ঞানে বিদেহ হইয়াছেন। ইনি কাশীধামস্থ ৺যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট যোগক্রিয়ার দীক্ষা গ্রহণ করেন। খুলনা জেলার ঘরসন্ধ গ্রামে ১২৭৪ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী দিবসে শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্ম হয়। শৈশব কাল হইতেই তিনি ধর্ম্মপিপাসু ও মেধাবী ছিলেন। অল্প বয়সে পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায় তিনি নিজের চেষ্টায় কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্নেহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার যত্নে সংস্কৃত কলেজ হইতে কাব্য, ন্যায় প্রভৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লাহোরের প্রাজ্ঞ বিশারদ ও শাস্ত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালনের পর তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের সঙ্কল্প করেন, কিন্তু মাতাঠাকুরাণীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হইয়া দার-পরিগ্রহ করিয়া সংসারী হন। কয়েক বৎসর পরে তিনি কাশীধামে গিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া মানব-সমাজের কল্যাণার্থ বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দুইটি টোল স্থাপন করিয়া যুবকগণকে সংস্কৃত ও ধর্ম্ম-শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। পরে তিনি দামোদর নদের তীরে ডিহিকা গ্রামে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আশ্রমে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় উহা প্রথমে ডিহিকা হইতে মুর্শিদাবাদ ও পরে তথা হইতে রাঁচিতে স্থানান্তরিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় গোড়া হইতে বরাবরই ঐ আশ্রমের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য ও কর্ণধার থাকিয়া ছাত্রগণকে ব্রহ্মচর্য্য ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শিক্ষা দান করিতেন। পরে তিনি উপযুক্ত শিষ্যগণের হস্তে আশ্রম পরিচালনের ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং কাশীধামে গিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। সেইখানে লাহিড়ী মহাশয়ের যোগিরাজ আশ্রমে অবস্থান কালে তাঁহার দেহান্ত হয়।

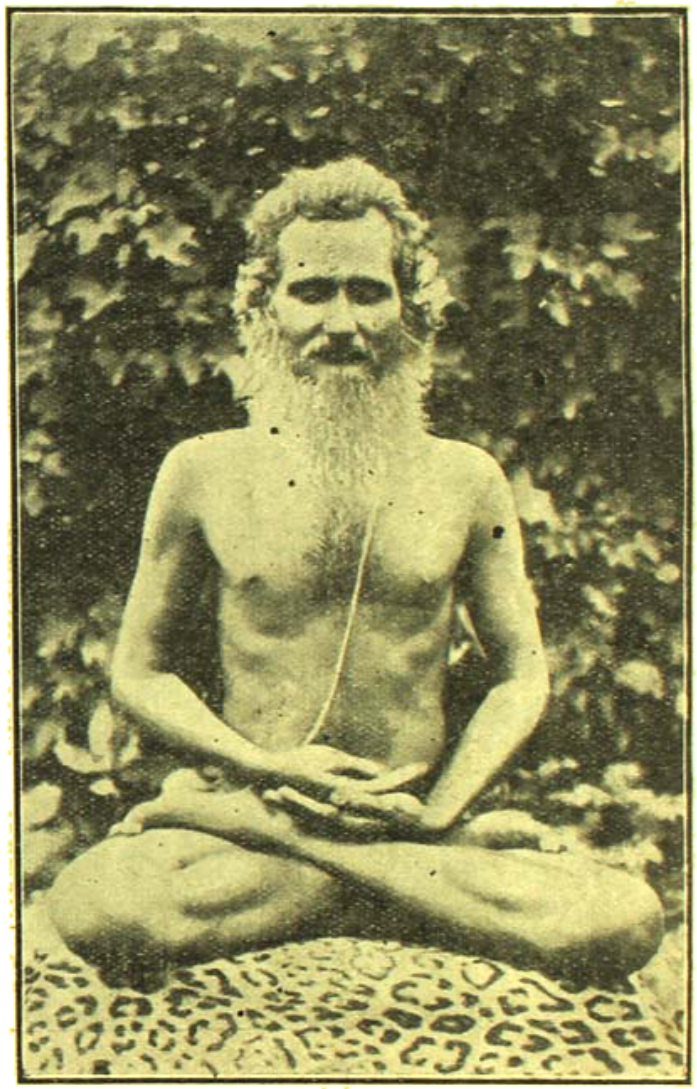

স্বর্গীয় আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী

৺সুদর্শন চক্রবর্ত্তী

বিগত ২০এ বৈশাখ (১৩৩৯) মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণ ৬টা ৪২ মিনিটের সময় রাজসাহীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন, আমাদের পরম বন্ধু সুদর্শন চক্রবর্ত্তী মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন।

১২৭৪ বঙ্গাব্দের ৩২এ আষাঢ় সুদর্শন বাবুর জন্ম হয়। তাঁহার পৈতৃক নিবাস ঢাকা—বিক্রমপুরের অন্তর্গত নৌলপরাণ গ্রামে হইলেও ইঁহার বিদ্যাশিক্ষা ও কর্ম্মস্থল সাধারণতঃ রাজসাহীতেই ছিল। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজসাহী কলিজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা

স্বর্গীয় সুদর্শন চক্রবর্ত্তী

দিয়া সকল বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বি-এল পাশ করিয়া সুদর্শনবাবু রাজসাহীতে ওকালতী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ১৩০১ বঙ্গাব্দ হইতে তিনি রাজসাহীর মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়া উহার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজসাহীর অ-মুসলমান নির্ব্বাচন-ক্ষেত্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য নির্ব্বাচিত হন। বিগত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের রাজসাহী অধিবেশনে তিনি রাজসাহীর পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা সভার সভাপতিরূপে সমিতির ঐ অধিবেশন সাফল্যমণ্ডিত করেন। তিনি বহুকাল রাজসাহী কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে দেশের ও দশের সেবা করিয়াছিলেন। রাজসাহীর দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকল্পে তিনি রাজসাহী সহরে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ভোলানাথ একাডেমী নামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি বহুকাল রাজসাহীর উকীলসভার সভাপতিত্ব করেন, এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের নির্দ্দেশক্রমে সাময়িকভাবে ওকালতী ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছিলেন।

আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা জানাইতেছি।

পরলোকে বিপিনচন্দ্র পাল

নবযুগের বাঙ্গলার অদ্বিতীয় বাগ্মী, স্বদেশী যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা, অনন্যসাধারণ রাজনীতি-পণ্ডিত, সুসাহিত্যিক, সুধিজ্ঞ সমালোচক ও বহুদর্শী সাংবাদিক বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বেলা সওয়া একটার সময়, পি, ৫০৯নং রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, বালিগঞ্জস্থিত ভবনে সন্ন্যাস রোগে লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই নবেম্বর শ্রীহট্ট জেলার পৈল গ্রামে বিপিনচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রামচন্দ্র পাল মুন্সেফ ছিলেন। বিপিনচন্দ্র ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্ট হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতে আসেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে, পরীক্ষার পূর্ব্বে পীড়িত হইয়া পড়ায় তিনি এফ-এ পরীক্ষা দিতে পারেন নাই।

দিগকে বিপন্ন ও সন্ত্রস্ত করিয়াছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ পাঠকপাঠিকাগণ দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রেই পড়িয়াছেন। ময়মনসিংহের অন্যান্য স্থানের কথা থাকুক, ঐ স্থানের কারাগারের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত; কয়েকজন বন্দী নিহত ও অনেকে আহত হইয়াছিলেন। আমাদের ময়মনসিংহ-প্রবাসী সহৃদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার সেন মহাশয় ময়মনসিংহ কারাগারের ও নিকটবর্ত্তী স্থানের যে সকল আলোক-চিত্র নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারই কয়েকখানি আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। নিম্নে সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ সেই চিত্রগুলি প্রকাশিত হইল।

২নং। জেলখানার ভিতরের আরেকটি একতালা দালানের কোন্ চিহ্নই নাই। পশ্চাৎভাগের প্রাচীর একেবারেই পড়িয়া গিয়াছে। এইখানে কয়েক জন বিশেষ ভাবে আহত হইয়াছিল।

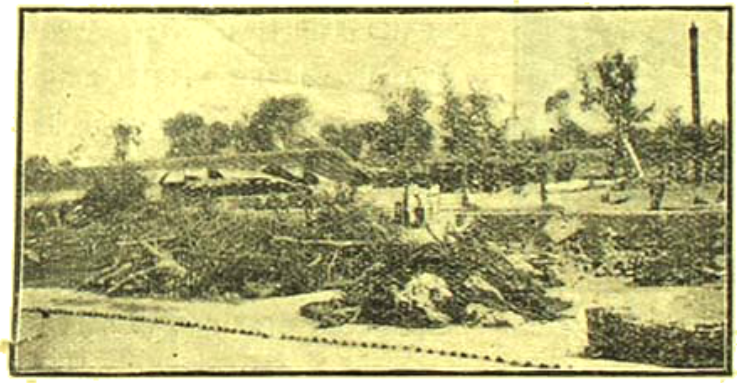

৩নং। উক্ত ২নং দৃশ্যের অপরাংশ।

৪নং। জেল ওয়ার্ডারদিগের ব্যারাক একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। দালানটি কত বড় ছিল তাহা 'ক্রশ' চিহ্ন দ্বারা দেখান হইয়াছে।

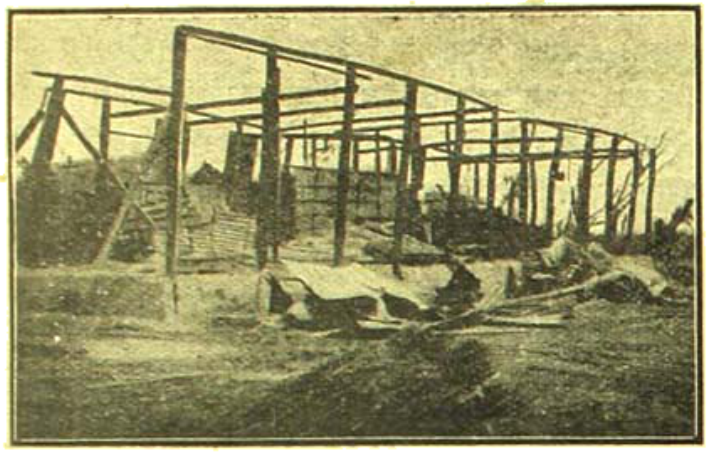

৭। 'কিসমৎ' গ্রামের একটি মুসলমান গৃহস্থের বাড়ীর শেষ অবস্থা। এই গৃহের কয়েকটি বাসীন্দা মারা গিয়াছে এবং কয়েকটি আহত হইয়াছে।

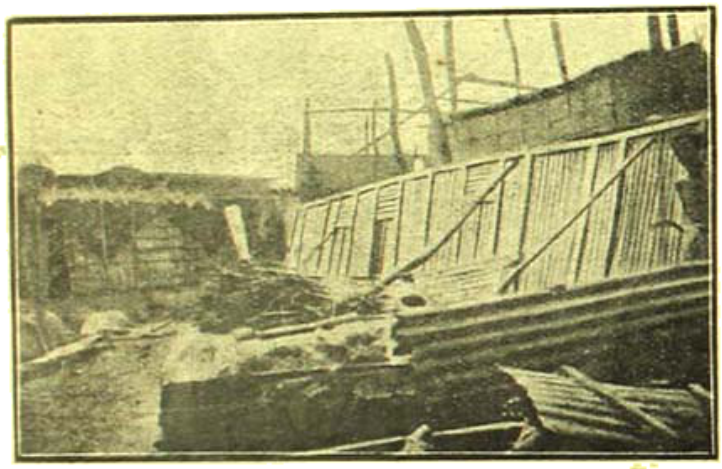

৮নং। ঐ গ্রামের আরেকটি গৃহস্থের বাড়ীর অবস্থা। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের বাড়ী।

৯নং। একটি অতি বৃহৎ ও বহু পুরাতন বট গাছের অবস্থা;—শিকড় উপড়াইয়া রাস্তার আড়িয়া পড়িয়াছে।

বাঙ্গালায় নূতন অর্ডিন্যান্স—

বৈপ্লবিক আন্দোলন দমন করিবার উদ্দেশ্যে বিগত ২৮শে মে তারিখে ১৯৩২ সালের বেঙ্গল জরুরী ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স জারী করা হইয়াছে।

১৯৩১ সালের বেঙ্গল জরুরী ক্ষমতা অর্ডিন্যান্সের ৪১টি ধারা ছিল; নূতন অর্ডিন্যান্সে তৎপরিবর্ত্তে ৭টি ধারা আছে। ১৯৩১ সালের বেঙ্গল জরুরী ক্ষমতা অর্ডিন্যান্সের মেয়াদ ১৯৩২ সে শেষ হয়। নূতন অর্ডিন্যান্সে মাত্র ৭টী ধারা থাকার কারণ এই যে, উক্ত অর্ডিন্যান্সে প্রদত্ত বিশিষ্ট ক্ষমতা পরে জেনারেল এমার্জেন্সী পাওয়ার্স অর্ডিন্যান্সে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই অর্ডিন্যান্স এখনও বলবৎ আছে। পূর্ব্বেকার অর্ডিন্যান্সে তিনজন হাইকোর্টের জজ লইয়া স্পেশাল ট্রাইবিউন্যাল গঠন করিবার বিধান ছিল; নূতন অর্ডিন্যান্সে ঐ ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্যরূপ কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। পূর্ব্বেকার অর্ডিন্যান্স অনুসারে বিধান করিবার প্রবর্ত্তন এবং সামরিক কর্ম্মচারীদিগের হাতে অধিকার প্রদান করিবার যে সব ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করা হইয়াছিল, নূতন অর্ডিন্যান্সে তাহা পুনরায় নূতন করিয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ঐ দুইটি ধারা কেবলমাত্র চট্টগ্রাম জেলাতেই প্রযুক্ত হইবে, ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে ঐগুলি অন্য কোন জেলায় প্রবর্ত্তন করা যাইবে না। ২নং অর্ডিন্যান্স অনুসারে যে সব মামলার বিচার করিতে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, অথবা বিচার আরম্ভ হইয়াছে, সেগুলি সমাধা করিবার বিধান ৪ ধারাতে করা হইয়াছে। আসামীরা যে সব আপীল করিয়াছে ঐ ধারা অনুসারে সেগুলির শুনানী সম্ভব হইবে এবং পূর্ব্ব অর্ডিন্যান্সে দণ্ডিত আসামীরা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবে। তিনজন হাইকোর্টের জজকে লইয়া স্পেশাল ট্রাইবিউনাল গঠনের ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু বৈপ্লবিক অপরাধ-সম্পর্কে প্রাণনাশের চেষ্টার অপরাধে বঙ্গীয় ফৌজদারী বিধি সংশোধন আইন অনুসারে কমিশনারদের দ্বারা বিচারের ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা বলবৎ রাখা হইয়াছে। পূর্ব্বকার অর্ডিন্যান্স অনুসারে তিনজন হাইকোর্টের জজদের বিচারে প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিবার অধিকার ছিল না। কিন্তু এখন তিনজন কমিশনারের দ্বারা বিচারে দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিবার অধিকার থাকিবে। ঐ তিনজন কমিশনার হাইকোর্টের জজ হইবেন না, তাঁহারা দায়রা জজের পদমর্য্যাদাসম্পন্ন হইবেন। ৮ম ধারায় পর্দ্দার আড়ালে বিচারের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। কোন্ অপরাধ বৈপ্লবিক বলিয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিলে সেই মামলার বিচার বঙ্গীয় ফৌজদারী বিধি সংশোধন আইন অনুসারে কমিশনারদের দ্বারাই হউক, কিংবা জেনারেল এমার্জ্জেন্সী পাওয়ার্স অর্ডিন্যান্স অনুসারে স্পেশাল জজ এবং স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটদের দ্বারাই হউক, উভয় ক্ষেত্রেই পর্দ্দার আড়ালে হইতে পারিবে। সপ্তম ধারায় ঘেরাড়া আসামীদিগের সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বঙ্গীয় ফৌজদারী বিধি সংশোধন আইন অনুসারে নিযুক্ত কমিশনারদিগকে কতকগুলি ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে।

——

ভারতে বিদেশী বস্ত্র আমদানী—

গত ২১শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে এবং ১৯৩১ সালের অনুরূপ সপ্তাহে কত হাজার গজ বিদেশী বস্ত্র ভারতে আমদানী হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কোরা কাপড়

বন্দর	২১শে মে	গত বৎসর
কলিকাতা	১০৫৩	৪২০
বোম্বাই	১৫৫০	৯২২
করাচী	২৭৬	×
মাদ্রাজ	৩৬০	১১৬
রেঙ্গুণ	২০৯	৯৮

ধোয়া কাপড়

কলিকাতা	৭৩৭	
বোম্বাই	৯২২	
করাচী	৬২১৮	১২৭৭
মাদ্রাজ	১৪	২১
রেঙ্গুণ	১৬৭৫	২৫৩

রঙ্গমারি কাপড়

কলিকাতা	৯৭১	৫৮৩
বোম্বাই	১৮১৫	৭৮৩
করাচী	৩০৫৬	৬৯৫
মাদ্রাজ	১৯	৬৩
রেঙ্গুণ	২৬০৯	৬৮০

গত তিন মাসের হিসাব

গত তিন মাসে কোন দেশ হইতে কত লক্ষ বর্গগজ কাপড় আসিয়াছে, তাহার হিসাব যথা—

ধোয়া কাপড়

বিলাত	১৬২	১৪৪	২৫৯	৫৬৫
অন্যান্য দেশ	৮৩	৫৭	৫৫	১৯৫
মোট ১৯৩২—	২৪৫	২০১	৩১৪	৭৬০
” ১৯৩১—	১৬৮	১৬৪	২৬০	৫৯২
” ১৯৩০—	৪৩১	৩৫৫	৬০৭	১৩৭৩

রঙ্গীন ও ছাপা

বিলাত	১০৪	৯০		৩০৯
ইউরোপ	১৫	৬		৩১
জাপান	১০৭	৭০		২৬২
অন্যান্য দেশ	১	৩		৪
মোট ১৯৩২—	২২৭	১৬৯	২৪০	৬০৬
” ১৯৩১—	১৬২	১৪৪	১৭৩	৪৭৯
” ১৯৩০—	৪৩৮	৪০৫	৬৬৭	১৩১০

——

ভূতপূর্ব্ব গবর্ণরের বক্তৃতা।—

বিগত ৩০শে মে লণ্ডনের কক্সটন সভায় রক্ষণশীলদের ভারতীয় কমিটির এক ঘরোয়া বৈঠকে স্যার ষ্ট্যানলি জ্যাকসন এই মর্ম্মে এক বক্তৃতা দেন যে, ভারতবর্ষে বিপ্লববাদ দমনের একমাত্র উপায় হইতেছে জনমতকে উহার বিরুদ্ধে গঠন করা। কিন্তু বাঙ্গলাদেশে এখন পর্য্যন্ত এমন কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না, যাহাতে মনে করা যাইতে

পারে যে, যাঁহাদের হাতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চালাইবার দায়িত্ব দেওয়া হইবে, তাঁহারা বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিবেন। প্রকৃতপক্ষে বিপ্লববাদকে জনমত হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা যায় না। তবে বিপ্লববাদের ফলাফল সত্ত্বেও প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তন করা উচিত। যদি নূতন শাসনতন্ত্র যুক্ত রাষ্ট্রীয় আকারের হয়, তবে সকলেই তাহাতে আনন্দিত হইবে।

স্যার ষ্ট্যানলি জ্যাকসন আরও আশা করেন যে, ভারতবর্ষকে যেন সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য ধরণের গণতান্ত্রিক শাসন দেওয়া না হয়, কারণ ভারতের পক্ষে উহা উপযোগী নহে। ভারতবাসীরা উহার জন্য প্রস্তুত নহে এবং তাহারা ইহা চাহেও না। ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে রাখিতে হইলে, উহাকে যথেষ্ট পরিমাণ অধিকার দিতে হইবে। ইহা ভারত ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য করা উচিত। কিন্তু এই দায়িত্ব ধীরে ধীরে গ্রহণ করিতে হইবে।

——

উড়িষ্যায় নূতন প্রদেশ—

উড়িষ্যা কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটীর সদস্যগণ সকলেই একমত হইয়া রিপোর্ট দিয়াছেন। রিপোর্টের মর্ম্ম এই যে, প্রায় ৩৩ হাজার বর্গ মাইল পরিমিত স্থান লইয়া নূতন উড়িষ্যা প্রদেশ গঠিত হইতে পারে। উহার লোক-সংখ্যা প্রায় ৮২ লক্ষ ৭৭ হাজার হইবে। উড়িষ্যা বিভাগের আঙ্গুল, রায়পুর জিলার খারিয়ার জমিদারী, গঞ্জাম জেলার অধিকাংশ স্থান ও ভিজাগাপট্টম এজেন্সী অঞ্চল নূতন উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই প্রদেশের আয় ১ কোটী ৩৬ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা এবং ব্যয় ১ কোটী ৫২ লক্ষ ৫০ টাকা হইবে; ইহার সহিত পৃথক করার ব্যয় ১৮ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা হইবে; সুতরাং প্রথম বৎসরে ঘাটতি হয় ৩৪ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। ইহার সহিত প্রথম বৎসরে আনুষঙ্গিক ব্যয় কিছু বাড়িতে পারে। ইহা ধরিয়া প্রথম বৎসরে ঘাটতি হইবে প্রায় ৩৫ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। ভাষা, জাতি, জনসাধারণের মনোভাব, ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থ নৈতিক স্বার্থ ও শাসন সৌকর্য্য—এই সকল বিষয় কমিটি বিবেচনা করিয়াছেন। নূতন প্রদেশের আয় ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুতকালে উহার সীমার উভয়পার্শ্বের লোকদের অভিমত উপেক্ষিত হয় নাই। বর্ত্তমানে যে সকল আয়ের পন্থা রহিয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া এবং মিতব্যয়িতা-মূলক ব্যবস্থা ধরিয়া কমিটী আয় ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব তৈয়ারী করিয়াছেন। নূতন প্রদেশের নিজস্ব কোন হাইকোর্ট বা বিশ্ববিদ্যালয় থাকিবে না এবং দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ডিত বন্দী, কনষ্টেবলদের শিক্ষা প্রভৃতি ইহাকে বিহারের জেল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করিতে হইবে ও তাহার ব্যয়ের অংশ প্রদান করিতে হইবে। বর্ত্তমানে যে সকল আইন ও নিয়মাবলী প্রচলিত আছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া কমিটী হিসাব করিয়াছেন এবং উহার পরিবর্ত্তন ভার নূতন গবর্ণমেণ্ট ও তাহার ব্যবস্থাপক সভার উপর দিয়াছেন।

——

ভারতে ভোটাধিকার—

ভারতবর্ষে যে নূতন শাসন-প্রণালী ব্যবস্থিত হইবে, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই, সে বিবরণ বাহির হইবার এখনও বিলম্ব হইবে। এদিকে কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থায় এ দেশের কাহারা ভোটাধিকার প্রাপ্ত হইবেন, তাহার নির্দ্ধারণের জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে একটী কমিটি গঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত লোথিয়ান সাহেব সেই কমিটীর সভাপতি ছিলেন, বলিয়া এই কমিটির 'লোথিয়ান কমিটি' নামকরণ হইয়াছে। এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, ব্রিটীশ ভারতের নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর সংখ্যা ১ ০০০০০ হইতে ৩৬০০ ০০০ করা হইয়াছে, অর্থাৎ মোট প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার শতকরা ৫·৫ হইতে ২৭·৬ করা হইয়াছে। সমস্ত ব্রিটীশ ভারত সম্বন্ধে এই কমিটির যে বিস্তৃত রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদানেরও আমাদের স্থানাভাব, এইজন্য বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে কমিটির রিপোর্টের সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল এবং স্ত্রীলোকদিগের ভোটাধিকার সম্বন্ধে কমিটি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

বাঙ্গলাদেশ সম্বন্ধে কমিটী বলেন যে, তাঁহারা স্থানীয়

LIBRARY

শ্রাবণ—১৩৩৯

প্রথম খণ্ড | বিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

হিন্দুর পূজাপদ্ধতি

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

বৈশাখের প্রবাসীর "পত্রধারা" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একটী পত্র ছাপা হইয়াছে। হিন্দুর পূজাপদ্ধতি এবং সাধনা সম্বন্ধে ইহাতে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হিন্দুরা ঠাকুরকে কাপড় পরায়, স্নান করায়,—এসব ব্যর্থ, শুধু ব্যর্থ নহে অনিষ্টকর; দেবপ্রতিমার নিকট পাঁঠা বলি দিলে অজ্ঞানের প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র; এইসব পাপের ফলে আমরা বিদেশীদের কাছে মার খাচ্ছি। হিন্দুরা যে ভাবে পূজা করে সে ভাবে পূজা করা অপেক্ষা নাস্তিক হইয়া বিশ্বমানবের সেবা করা ভাল, এইরূপ নাস্তিকরা যথার্থ ভক্ত।

কোনও কার্য্য ব্যর্থ কি না, তাহা স্থির করিতে হইলে দেখিতে হইবে, কি উদ্দেশ্যে সে কার্য্য করা হইতেছে। কার্য্যটি যদি সে উদ্দেশ্যের সহায়ক হয় তাহা হইলে উহা ব্যর্থ নহে, যদি সহায়ক না হয় তাহা হইলে উহা ব্যর্থ। যে উদ্দেশ্যের জন্য ঐ কার্য্য সাধিত হয় নাই, কার্য্যটি সে উদ্দেশ্যের সহায়ক হয় নাই বলিয়া তাহাকে ব্যর্থ বলা যুক্তিযুক্ত নহে,—এই অপর উদ্দেশ্যটি যতই মহৎ হউক না কেন।

ভগবানকে লাভ করা, এবং দুঃখীর দুঃখ মোচন করা দুইটি বিভিন্ন উদ্দেশ্য। দুঃখীর দুঃখ মোচনার্থ যে কর্ম করা যায়, সে কর্ম ঈশ্বরলাভের সহায়ক হইতে পারে। কিন্তু সেই কারণে উভয় উদ্দেশ্যের পার্থক্য বিস্মৃত হইলে চলিবে না। রবীন্দ্রনাথ এখানে এই দুই বিভিন্ন উদ্দেশ্যের পার্থক্য রক্ষা করেন নাই, এবং "ঠাকুরকে কাপড় পরান, স্নান করান" প্রভৃতি কার্য্য দুঃখীর দুঃখমোচন রূপ উদ্দেশ্যের সহায়ক নহে বলিয়া তিনি ইহা ব্যর্থ বলিয়াছেন।

"ঠাকুরকে কাপড় পরান, স্নান করান" এই সকল কার্য্য কি ঈশ্বর লাভের সহায়ক হইতে পারে? নিশ্চয় পারে। ঈশ্বর লাভ করিবার উপায়—ঈশ্বরে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া রাখা, ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া যাওয়া। এই হইল সাধারণ উপায়। এই সাধারণ উপায়ের উপযোগী নানাবিধ বিশেষ

উপায় আছে। লোকের প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা বিভিন্ন; এজন্য এক উপায় সকলের পক্ষে উপযোগী হয় না। কেহ নির্জন স্থানে স্থিরভাবে বসিয়া দীর্ঘকাল ভগবানে চিত্ত একাগ্র করিয়া রাখিতে পারেন; কেহ বা তাহা পারেন না; সর্বদা ভগবানের নাম জপ করিতে ভালবাসেন; কেহ বা তাঁহার স্তব করিতে বা নাম সঙ্কীর্তন করিতে ভালবাসেন; কেহ বা তাঁহার বিগ্রহের সম্মুখে বসিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে এবং পুষ্পনৈবেদ্যাদি নিবেদন করিতে ভালবাসেন। এ সকল উপায়ই ভগবানকে পাইবার পক্ষে এবং মনকে ভগবদভিমুখী করিবার পক্ষে উপযোগী। একটি নির্দিষ্ট প্রথায় উপাসনাই শ্রেষ্ঠ, অপর প্রথায় উপাসনা করিলে কোনও ফল লাভ হয় না, ইহা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা। হিন্দুধর্মে এরূপ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই। ভগবানের শ্রীমুখের বাণী হিন্দু শুনিয়াছে,

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ গীতা ৪।১১

"যে যে প্রকারেই আমার পূজা করুক, সেই প্রকারেই আমি তাহাকে অনুগ্রহ করি। সকল মানব সকল প্রকার উপায়ে আমার মার্গই অনুসরণ করে।"

"ঠাকুরকে কাপড় পরালুম, সে কাপড় কি পৌঁছবে বস্ত্রহীনের কাছে, ঠাকুরকে স্নান করালুম সেই স্নানের জল কি পাবে যে মানুষ জলের অভাবে তৃষিত-তাপিত? তা যদি না হ'ল এ সেবা কোন্ কাজে লাগল? কেবল নিজেকে ভোলাবার কাজে?"

ঈশ্বরের পূজা যাহার জীবিকা এমন দরিদ্র পুরোহিতের সাধ্বী পত্নীর নিকট সে কাপড় হয় ত পৌঁছিতে পারে,—কিন্তু নাও পারে। জল যে জলহীনের নিকট পৌঁছিবে না তাহা নিশ্চয়। কিন্তু তাই বলিয়া এ সেবা কোনও কাজে লাগিবে না ইহা বলিতে পারিবেন না। হৃদয়কে ভগবদভিমুখী করা, কিছুকালের জন্য ভগবৎ-সান্নিধ্য উপলব্ধি করা, বুঝি তাঁহার স্পর্শ পাইয়া আমার এই অপবিত্র দেহ পবিত্র ও সার্থক হইল, এইরূপ অনুভূতি হৃদয় মধ্যে সঞ্চারিত করা,—এই সকল উদ্দেশ্যে বস্ত্র এবং জল অর্পিত হইয়াছিল। এই সকল উদ্দেশ্য যদি সার্থক হয়, তাহা হইলেও কি ইহা ব্যর্থ?

রবীন্দ্রনাথ এখানে একটা খাঁটি কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এই ভাবে উপাসনা "কেবল নিজেকে ভোলবার কাজে" লাগিবে। কিন্তু নিজেকে ভোলানও যে একটা বড় প্রয়োজনীয় কাজ। আমার ঘরবাড়ী, ধনখ্যাতি, আমার স্ত্রীপুত্রকন্যা, আমার সুখ, আমার দুঃখ, আমার বন্ধু, আমার শত্রু,—এই সব চিন্তায় যে আমাদের হৃদয় অধিকাংশ সময়ই পরিপূর্ণ থাকে। এ-সব চিন্তা মধ্যে মধ্যে আমাদের হৃদয় হইতে সরাইয়া দেওয়া প্রয়োজন,—আমাদের "নিজেকে ভোলান" দরকার। মনকে বলা দরকার, "ওরে তোর এই সব সুখদুঃখ কয় দিনের জন্য? যদি এই সবেই মগ্ন হইয়া থাকিস, তাহা হইলে প্রায়ই নানাবিধ সাংসারিক দুঃখে কষ্ট পাইতে হইবে,—আর যেদিন ওপর হইতে ডাক আসিবে, সেদিন বড় অসহ্য কষ্ট হইবে। দিন থাকিতে তাঁহার কথা স্মরণ কর, যাহা সংগ্রহ করিতে পারিস তাহা লইয়া তাঁহার কাছে ছুটিয়া যা। তিনি অল্পেই সন্তুষ্ট, তোর অন্তরের ভক্তি মাখাইয়া তুই যাহা দিবি তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন,—অন্ন, বস্ত্র, নৈবেদ্য, পুষ্প, এমন কি শুধু জল দিলেও তিনি সন্তুষ্ট হইবেন।" হিন্দু পূজা করিয়া এইভাবে মনকে ভোলায়। রবীন্দ্রনাথ কি ইহা ব্যর্থ বলেন?

হিন্দুর পূজাপদ্ধতিকে যে ভাবে পরীক্ষা করিয়া রবীন্দ্রনাথ ব্যর্থ বলিয়াছেন, সেই ভাবে পরীক্ষা করিলে অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের পূজাপদ্ধতিকেও ব্যর্থ বলা যাইতে পারে। ব্রাহ্ম-সমাজে উপাসনার জন্য ভজনালয় নির্মাণ করা হয়। যে অর্থ ব্যয় করিয়া ভজনালয় নির্মাণ করা হয় সেই অর্থ ব্যয় দ্বারা হাঁসপাতাল নির্মাণ করিলে কিছু পরিমাণে দুঃখীর দুঃখমোচন হইত। তাহা হইল না বলিয়া ব্রাহ্মদের ভজনালয় নির্মাণ কি ব্যর্থ হইবে? ধ্যান ও উপাসনাতে তাঁহারা যে সময় অতিবাহিত করেন, সেই সময় রোগীর পরিচর্যা করিলে কিছু পরিমাণে দুঃখীর দুঃখমোচন হইতে পারিত। তাহা হইল না বলিয়া ধ্যান এবং উপাসনাকে কি ব্যর্থ বলিতে হইবে? মুসলমান ও খৃষ্টানের মস্‌জিদ ও গির্জা নির্মাণ এবং ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধেও সেই এক কথাই বলা যায়। বস্তুতঃ, হিন্দুর পূজাপদ্ধতিকে যে ভাবে বিচার করিয়া তিনি ব্যর্থ ও অনিষ্টকর বলিয়াছেন, সেই ভাবে বিচার করিলে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের উপাসনা করিবার পদ্ধতিকেও ব্যর্থ বলা

যায়। তিনি অপর কোনও ধর্ম সম্প্রদায়ের উপাসনাপদ্ধতিকে এ ভাবে বিচার না করিয়া কেবল হিন্দুধর্ম সম্প্রদায়ের পূজাপদ্ধতিকে এই ভাবে বিচার করিয়া ইহাকে ব্যর্থ এবং অনিষ্টকর বলিলেন। অবশ্য তিনি বলিতে পারেন, যে, মুসলমান, খৃষ্টান ও ব্রাহ্মরা যে ভাবে উপাসনা করে তাহাতে তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, কিন্তু হিন্দু যে ঠাকুরকে কাপড় পরায় এবং স্নান করায় তাহাতে হিন্দুর আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। হিন্দুর যে উপাসনা-পদ্ধতিকে তিনি ব্যর্থ ও অনিষ্টকর বলিয়াছেন, সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অনেকে যে আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা বিভিন্ন দেশবাসী ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

বাস্তবিক পক্ষে জীবের দুঃখমোচনকে জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া ভগবদুপাসনার উপরে স্থান দিলে অবশেষে নাস্তিকতাবাদে আসিয়া পৌঁছিবার আশঙ্কা আছে। সোভিয়েট রাশিয়াতে ইহাই হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা মানবের দুঃখ নিবারণই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা কিছু কালের মধ্যে বুঝিতে পারেন—জগতে দুঃখের পরিমাণ কত বেশী। এই দুঃখের পরিমাণের তুলনায় তাঁহাদের নিজের ক্ষমতার অল্পতা তাঁহাদের হৃদয়ে নৈরাশ্যের সঞ্চার করে। ঈশ্বর যদি দয়াময় এবং সর্ব্বশক্তিমান হন, তাহা হইলে কেন জগতে এত দুঃখ, এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া প্রথমতঃ তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন—ঈশ্বর কখনও দয়াময় এবং সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারেন না। তাহার পর তাঁহাদের মনে হয় ঈশ্বর যদি দয়ালু এবং সর্ব্বশক্তিমান না হন, তাহা হইলে ঈদৃশ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন কি? এই ভাবে পরিণামে তাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন হইয়া পড়েন। য়ুরোপে কোনও কোনও জ্ঞানী, পণ্ডিত ও পরোপকারী ব্যক্তি এই ভাবে নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছেন।

এই ধরণের যুক্তি রবীন্দ্রনাথও এই পত্রে কিছু পরিমাণে অনুসরণ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা এই ভাবে নাস্তিক হইয়াও পরোপকার-রত আছেন, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "য়ুরোপে এমন অনেক নাস্তিক আছেন যাঁরা বিশ্বমানবের উপলব্ধি দ্বারা তাঁদের ধর্ম্মকে মহৎ ক'রে তোলেন,—তাঁরা দূর কালের জন্য প্রাণপণ করেন, সর্ব্বদেশের জন্যে। তাঁরা যথার্থ ভক্ত।" কিন্তু এই সমস্যার কি সমাধান হইবে রবীন্দ্রনাথ তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। উদ্ধৃত অংশের পরেই তিনি বলিয়া দিয়াছেন, "যাঁরা আচারে অনুষ্ঠানে সারা-জীবন অত্যন্ত শুচি হ'য়ে কাটালেন, ভাবরসে মগ্ন হ'য়ে রইলেন, তাঁরা ত নিজেরই পূজা করলেন,—তাঁদের শুচিতা তাঁদেরই আপনার, তাঁদের রস-সম্ভোগ নিজের মধ্যেই আবর্ত্তিত, আর মুক্তি বলে যদি কিছু তাঁরা পান তবে সেটা তো তাঁদেরই পারলৌকিক কোম্পানীর কাগজ।" এখানে রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য যে আচারপরায়ণ হিন্দু সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। না হয় স্বীকার করা গেল যে, আচারপরায়ণতা হিন্দুদের কুসংস্কার মাত্র, ইহাতে তাহাদের কোনও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না। কিন্তু যাঁহারা আচার মানেন না,—তাঁদের ধ্যান উপাসনাও কি ব্যর্থ? ভগবানকে লাভ করিবার জন্যই ত তাঁহারা ধ্যান উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের নিজেদেরই লাভ, জগতের দুঃখী লোকের তাহাতে কি লাভ? মুক্তি কথাটা অবশ্য হিন্দুদের মধ্যেই বেশী ব্যবহার হয়। অন্য ধর্ম্মে তাহার পরিবর্ত্তে স্বর্গলাভের কথা আছে, তাহাও ত তাহাদের নিজেদেরই লাভ। তাহা হইলে কি স্বীকার করিতে হয় যে, যাহারা ঈশ্বরলাভই জীবনের লক্ষ্য করে এবং তাহার জন্য নিজ ধর্ম্মানুমোদিত সাধনা করে, তাহারা সকলে স্বার্থপর, এবং যে সকল নিরীশ্বর ব্যক্তি পরোপকারই জীবনের ব্রত করেন তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ? রবীন্দ্রনাথ এত বড় সমস্যা তুলিলেন, অথচ তাহার কোন সমাধান করিলেন না, ইহা বড়ই বিচিত্র।

অথচ এই সমস্যার সমাধান হিন্দুধর্ম্মে যেমন আছে অন্য কোনও ধর্ম্মে তেমন নাই। হিন্দুধর্ম বলিয়াছে, তুমি জীবের দুঃখ ঘুচাইবার চেষ্টা কর, ইহা ভাল কাজ। কিন্তু ভাল কাজও করিবার নিয়ম আছে। সেই নিয়ম না মানিয়া কাজ করিলে, ভাল কাজেরও খারাপ ফল হয়। দুঃখীর দুঃখমোচন করিবার চেষ্টা কর্ত্তব্য—কারণ এইরূপ চেষ্টা করিলে ভগবান প্রীত হন,—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া উচিত। কিন্তু এই কর্ম্মে নিরত হইয়া ইহা কিছুতেই ভোলা উচিত নহে যে, "একজন সর্ব্বশক্তিমান ভগবান আছেন, তাঁহার ইচ্ছাতেই জগৎ চলিতেছে, তাঁহার ইচ্ছাতেই দুঃখী দুঃখ পাইতেছে, তাঁহার ইচ্ছা হইলে অত্যন্ত

দুঃখীর দুঃখও অনায়াসে ঘুচিয়া যায়। তাঁহার ইচ্ছা না হইলে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কাহারও দুঃখ একবিন্দু কমাইতে পারা যায় না। যেখানে দুঃখ প্রয়োজন সেখানে দুঃখ কমাইলে কল্যাণ হয় না। এই সকল কথা শুনিয়া দুঃখমোচন ব্রত গ্রহণ করিলে অহঙ্কার এবং নাস্তিকতার আবির্ভাবের আশঙ্কা আছে।

গীতায় কর্ত্তব্য কর্ম করিবার যে কৌশল বা প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিলে অনিষ্টের আশঙ্কা কম। সে প্রণালী হইতেছে (১) কর্ম-ফলের জন্য আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা। দুঃখমোচনের জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, এজন্য চেষ্টা করিব। ফল ভগবানের হাতে, আমার হাতে নহে। (২) কর্মে আসক্তি ত্যাগ করা। দুঃখমোচন করিতে আমার ভাল লাগে এই জন্যে দুঃখমোচনের চেষ্টা করা উচিত নহে। দুঃখমোচনের চেষ্টা করিলে ভগবান প্রীত হইবেন এই ভাবিয়া পরোপকার-ব্রত গ্রহণ করা উচিত। (৩) আমি যে কাজ করি তাহাতেও আমার কর্তৃত্ব-বুদ্ধি যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করা। ভগবান সকলের হৃদয় মধ্যে অবস্থান করেন,—তিনি যাহাকে যে ভাবে প্রেরণা দেন, সে সেই ভাবে কার্য্য করে, এই ধারণা হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে পোষণ করা।

হিন্দুর বিশ্বাস, জীব পূর্বকৃত কর্মফল অনুসারে দুঃখভোগ করে। যদি কেহ বলেন যে এইরূপ বিশ্বাস থাকিলে দুঃখীর প্রতি সমবেদনা কমিয়া যায় এবং দুঃখমোচনের আগ্রহ শিথিল হইয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে বলিতে হইবে, পাপীর প্রতি ঘৃণা একটা হৃদয়ের দুর্বলতা, তাহা ত্যাগ করা উচিত। অন্যায় করিয়া দুঃখ পাইতেছে সত্য, তথাপি তাহার দুঃখমোচনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, ঈশ্বরলাভ এবং পরোপকার এই দুইটি বিভিন্ন উদ্দেশ্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ গোলযোগ করিয়াছেন। কিন্তু এই দুইটি উদ্দেশ্য বিভিন্ন হইলেও ইহাদের মধ্যে যে কোনও সম্পর্ক নাই এমত নহে। পরোপকার ব্রত ঠিকমত অনুষ্ঠিত হইলে ইহা ঈশ্বরলাভের পক্ষে সহায়ক। কারণ ইহা দ্বারা স্বার্থপরতা কমিয়া যায়, চিত্ত শুদ্ধ হয়, শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষেই ভগবানকে লাভ করা সম্ভব হয়। পরোপকার-ব্রতের উদ্দেশ্য হইবে নিজ চিত্ত শুদ্ধ করা। দুঃখীর দুঃখমোচন ইহার চরম উদ্দেশ্য হইতে পারে না, কারণ সর্বশক্তিমান ভগবান ইচ্ছামাত্র সকলের দুঃখমোচন করিতে পারেন,—যেখানে দুঃখদান করা তিনি প্রয়োজন মনে করেন সেখানে তিনি দুঃখদান করেন, যখন যেখানে দুঃখ-মোচন করা প্রয়োজন মনে করেন তখন সেখানে দুঃখ-মোচনের ব্যবস্থা করেন। হয় ত আমাদের দ্বারাই এই দুঃখমোচন কার্য্য করান। পরোপকার ব্রতের ঠিকমত অনুষ্ঠান না করিলে ইহা হইতেই চিত্তে অহঙ্কারের আবির্ভাব হইতে পারে, তাহাতে চিত্ত মলিন হয়। পরোপকার কার্য্যে অতিরিক্ত আসক্তি হইলে এবং কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি না হইলে, হৃদয়ে নাস্তিকতার সঞ্চার হইতে পারে। য়ুরোপের এইরূপ বিশ্বহিতৈষী নাস্তিকের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "তাঁরা যথার্থ ভক্ত"। কিন্তু যাঁহারা নাস্তিক তাঁহাদিগকে কিরূপে ঈশ্বর-ভক্ত বলা যায়? তাঁহাদিগকে বিশ্বপ্রেমিক বলাও কঠিন, কারণ সাধারণতঃ তাঁহাদের মঙ্গল চেষ্টা মানবজাতির মধ্যেই আবদ্ধ, মানবেতর প্রাণীর মঙ্গলচিন্তা তাঁহারা বিশেষ করেন না।

রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিতেন, "ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা হ'লে কি বলবি, হে ঈশ্বর, অনেক ইস্কুল আর হাঁসপাতাল করে দাও?···একজন কালীঘাটে মা-কালীকে দর্শন করিতে গেল, কিন্তু সেখানে ভিখারীর ভীড় দেখে তা'দিকে পয়সা দিতে এত ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল যে মা কালীর দর্শনই পেল না।" আমরা যে সকল কথা বলিয়াছি সে সকল কথা স্মরণ রাখিলে পরমহংসদেবের উক্তির তাৎপর্য্য বোঝা যাইবে। পরোপকার জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য। পরোপকার-ব্রত যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরলাভের সহায়ক, সে পর্য্যন্তই ইহা অনুশীলন করা উচিত। ঈশ্বরলাভের অন্তরায় হইলে পরোপকার-ব্রতের কোন মূল্য নাই। ঈশ্বরলাভের জন্য সাধনার উদ্দেশ্য পরোপকার না হইলেও এই সাধনার ফলে অনেক জনহিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত পরমহংসদেবের সাধনা! তিনি নিজে জীবের শারীরিক দুঃখমোচন ব্রত গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার সাধনার ফলে ভারতবর্ষে পরোপকারব্রত যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিয়াছে দেখা যাইতেছে।

রবীন্দ্রনাথ নাস্তিক বিশ্বহিতৈষীর সহিত তুলনা করিয়া আচারনিষ্ঠ হিন্দুর নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু আচারনিষ্ঠা যারা

পরোপকার সাধিত হয় না, অতএব ইহা নিন্দনীয়, রবীন্দ্রনাথের এ যুক্তি বিচারসহ নহে। কারণ আচারনিষ্ঠার উদ্দেশ্য পরোপকার নহে, ইহার উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। যদি ঈশ্বরলাভের জন্য সহায়ক না হয়, তাহা হইলে সে আচার নিন্দনীয়। কিন্তু যদি ইহা ঈশ্বরলাভের সহায়ক হয়, তাহা হইলে ইহার দ্বারা পরোপকার সাধিত না হইলেও ইহা সার্থক। শুদ্ধ আচার অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের পূজা করিলে ঈশ্বরের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া যায়, হিন্দুশাস্ত্র ইহা প্রচার করিয়াছে, সাধক হিন্দুর জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। এ ক্ষেত্রে আচার মাত্রই ব্যর্থ—রবীন্দ্রনাথের এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করা যায় না।

হিন্দুর পূজাপদ্ধতির নিন্দা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ এমন কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার সহিত বাস্তব জগতের মিল নাই। তিনি বলিয়াছেন "মানুষের প্রতি কর্ত্তব্য যদি বা শাস্ত্রের শ্লোকে থাকে, আচারে নেই।" ইহা কি সত্য? দরিদ্রকে দান হিন্দুরা যাহা করে তাহা কি নগণ্য? যদি তাহাই হয় তাহা হইলে ভারতে এত অসংখ্য ভিক্ষুক ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিতেছে কিরূপে? ইংলণ্ডে Poor Law এবং Work House আছে সত্য, কিন্তু Ruskin, Wordsworth প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন যে, আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া দরিদ্র ব্যক্তির সেখানে বাস করা সম্ভব নহে। দরিদ্র হইলেই যে আত্মসম্মান বিসর্জ্জন করিতে হইবে তাহার কোনও মানে নাই। টলষ্টয় বলিয়াছেন, যে দেশের পুলিসে ভিক্ষা করিবার অপরাধে নিঃস্ব লোককে ধরিয়া লইয়া যায়, সে দেশের লোক কি করিয়া বলিতে পারে যে তাহারা বিশুখৃষ্টের অনুবর্ত্তী? Poor Law না থাকিলেও আমাদের দেশে এত ভিক্ষুক খাইতে পাইতেছে, এবং তাহাদিগকে যাহারা ভিক্ষা দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মধ্যবিত্ত। ধর্ম্মলাভেচ্ছু হিন্দু যদি দুঃখীর অভাবের প্রতি একান্ত উদাসীন হন, তাহা হইলে হিন্দুর তীর্থস্থানে এবং দেবালয়ের নিকটে ভিক্ষার্থীর এত ভীড় হয় কেন? আজকালই পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে মুষ্টিভিক্ষার নিন্দাসূচক বাক্য শোনা যায়,—Indiscriminate charity, এবং drones of society; পূর্ব্বে এরূপ কথা শোনা যাইত না। পূর্ব্বে বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত,

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥

"যাহার গৃহ হইতে অতিথি ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া চলিয়া যায়, অতিথি তাহাকে নিজ পাপ প্রদান করিয়া গৃহস্থের পুণ্য গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়।"

বিদেশী ভ্রমণকারিগণও হিন্দুর অতিথিপরায়ণতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর অন্যত্র এরূপ দেখা যায় না। মানুষের প্রতি কর্ত্তব্য লোকের আচারে যদি বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে কি ইহা সম্ভবপর হইত? বিনা ব্যয়ে অতিথির থাকিবার জন্য এত অধিক সংখ্যক ধর্ম্মশালা আর কোনও দেশে আছে কি? ধর্ম্মার্থে বৃক্ষ ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা আজকাল ইংরাজি শিখিয়া না হয় আমরা ছাড়িয়া দিয়াছি, কিন্তু সেটা কি হিন্দুধর্ম্মের দোষ? পাশ্চাত্যদেশে পরোপকার সাধারণতঃ নিজ জাতির মধ্যে, বড় জোর মানব জাতির মধ্যে আবদ্ধ। হিন্দুর পরোপকার সর্ব্ব জীবে প্রসারিত, কারণ হিন্দুর বিশ্বাস এক ব্রহ্ম আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে বিদ্যমান। অক্ষম গরু কাটিয়া তাহার মাংস ভোজন করাই পাশ্চাত্য প্রথা। হিন্দু অক্ষম গরুর জন্য আশ্রয় এবং আহারের বন্দোবস্ত করা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করে। এজন্য গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য পঞ্চ যজ্ঞের মধ্যে প্রাণিগণকে আহার প্রদান এবং অতিথি পূজা উভয়ই বিহিত হইয়াছে।

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞো তিথিপূজাং॥

"অধ্যাপনা করার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণ হইতে পিতৃযজ্ঞ, হোম করা দেবযজ্ঞ, প্রাণিদিগকে আহার প্রদান করা ভূতযজ্ঞ (সর্ব্বপ্রাণির পূজা) এবং অতিথিপূজা নরযজ্ঞ (মানবের পূজা)।"

শুণাং চ পতিতানাং চ শ্বপচাং পাপরোগিণাং।
বায়সানাং কৃমীণাং চ শনকৈর্নিবপেদ্ভুবি॥

"কুকুর, নীচজাতীয় ব্যক্তি, চণ্ডাল, কুষ্ঠ বা ক্ষয়রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, কাক ও কৃমি সকলকে যত্নপূর্ব্বক আহার প্রদান করিবে।"

শাস্ত্রে আছে, কিন্তু হিন্দুর আচারে এসব কিছু নাই এ কথা বলিলে চলিবে না। হিন্দু বড় বেশী শাস্ত্র মানিয়া

চলে এ কথা রবীন্দ্রনাথই অনেকবার বলিয়াছেন। আর আজকাল যদি শিক্ষিত হিন্দুর আচার হইতে এ সকল অদৃশ্য হইয়া থাকে, তাহার জন্য কি পাশ্চাত্য শিক্ষাই বেশী দায়ী নহে?

রবীন্দ্রনাথ এই পত্রে লিখিয়াছেন, "জাতকুল দেখে ব্রাহ্মণকে ভক্তি করা সহজ; ... যথার্থ ব্রহ্মণ্যগুণে যিনি ব্রাহ্মণ তিনি যে জাতেরই হ'ন্, তাঁকে ভক্তির দ্বারা সত্যফল পাওয়া যায়, কিন্তু যেহেতু সেটা সহজ নয়, এই জন্যই অন্যানে ভক্তির দ্বারা কর্ত্তব্যপালনের তৃপ্তিভোগ করা প্রচলিত হয়েছে।" যে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণোচিত আচার এবং গুণকর্ম নাই তিনি নিন্দনীয়, শাস্ত্রে ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। কোন্ ব্রাহ্মণ গুণবান, এবং কে গুণহীন ইহা স্থির করা যতদূর দুরূহ বলিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বাস্তবিক ইহা ততদূর দুরূহ নহে। কে ভাল, কে মন্দ, কে সাধু, কে ভণ্ড সমাজে সকলেই ইহা চেনে এবং তদনুরূপ সমাদরও করিয়া থাকে। বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে ভাল লোক থাকিলে তখনই তাহাকে ব্রাহ্মণ করিয়া দিতে হইবে ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। বৈশ্য বাল্যকাল হইতে কৃষি, গো-পালন, বাণিজ্য এই সবই দেখিয়াছে এবং এই সবই শিখিয়াছে। সে খুব আদর্শচরিত্রের ব্যক্তি হইলেও তাহাকে ব্রাহ্মণ করিয়া টোলে অধ্যাপনা করিতে বসাইয়া দিলে অধ্যাপনার কার্য্য কি ভালরূপে চলিবে? কৃষি বাণিজ্যে কি আদর্শ চরিত্রের ব্যক্তির কোনও প্রয়োজন নাই? বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা জন্মগত ভিন্ন অন্যরূপ করা সম্ভবপর নহে। অল্পবয়স্ক বালকের ভবিষ্যতে ব্রাহ্মণোচিত গুণ হইবে অথবা বৈশ্যোচিত গুণ হইবে তাহা কি করিয়া জানা যাইবে? তাহা না জানিতে পারিলে তাহার ব্রাহ্মণোচিত শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইবে, না বৈশ্যোচিত? হিন্দুর বিশ্বাস, জন্ম একটা আকস্মিক ঘটনা নহে, পূর্ব কর্মের ফল। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণোচিত সাধনার উপযুক্ত, ভগবান তাহাকেই ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম গ্রহণ করান। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াও কুকর্ম-নিরত হয়, সে ইহজন্মে নিন্দনীয় হয় এবং পর জন্মে নীচ যোনি প্রাপ্ত হয়। ইহজন্মেই পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলে সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। কোনও কালেই ইহজন্মে এরূপ বর্ণ পরিবর্ত্তনের নিয়ম প্রচলিত ছিল না। বিশ্বামিত্র প্রভৃতি যে কয়েকটি ইহজন্মে বর্ণ পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত পুরাণে পাওয়া যায় সে সকল স্থানে বুঝিতে হইবে যে অসাধারণ অবস্থায় নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল মাত্র (exceptions to the general rule in extraordinary circumstances)। নচেৎ সকল যুগেই জন্মগত বর্ণ ব্যবস্থাই সাধারণ নিয়ম ছিল। এইরূপ ব্যবস্থাতেই প্রত্যেক বর্ণের কর্ম উত্তমরূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা অধিক।

রবীন্দ্রনাথ এই পত্রে হিন্দুরা দেবতার নিকট পাঁঠা বলি দেয় বলিয়া খুব নিন্দা করিয়াছেন। পাঁঠা বলি এবং আমিষ আহার এই দুইটি প্রথা পরস্পর সম্বন্ধ। আমিষাহার সম্বন্ধে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, ইহা তত বেশী দোষাবহ নহে, তবে ত্যাগ করিতে পারিলে খুব ভাল। মনু বলিয়াছেন—

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥

"মাংস, মদ্য ও মৈথুনে দোষ নাই। কারণ, প্রাণীদের এইরূপই প্রবৃত্তি। কিন্তু এই সকল ত্যাগ করিতে পারিলে খুব উন্নতি হয়।"

মাংস ভক্ষণ যাহাতে সমাজে কমিয়া যায় এ জন্য শাস্ত্রকারগণ ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, যজ্ঞে পাঁঠা বলি দিয়া মাংসভোজন করিতে পার, নচেৎ বৃথা মাংস ভক্ষণ করা মহাপাপ। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে মাংসভক্ষণ একেবারে বর্জ্জন করিতে বলিলে কেহ কেহ শুনিতে পারে, কিন্তু সকলে শুনিবে না। যাহারা মাংস ভক্ষণ একেবারে ছাড়িতে পারিবে না, তাহাদেরও মাংস ভক্ষণকমান প্রয়োজন। এজন্য তাঁহারা এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন। হিন্দুধর্মের একটি নিয়ম এই যে তুমি যাহা কিছু আহার করিবে পূর্বে ভগবানকে নিবেদন করিয়া তাঁহার প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত।

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণং॥

"যাহা কিছু করিবে, আহার, হোম, দান, তপস্যা,—সকলই আমাকে অর্পণ করিবে।"

মাংস ভোজন করিবার সময়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে না। বৈষ্ণবগণ আমিষাহার করেন না, তাঁহারা পশু বলিও দেন না। শাক্তগণ আমিষাহার করেন, তাঁহারা পশু বলি দেন। প্রবৃত্তিভেদে অধিকারভেদের ব্যবস্থা আছে। পশুবলি প্রথা সত্ত্বেও হিন্দুদের মধ্যে আমিষ

ভোজন অন্য জাতি অপেক্ষা কম, ইহা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করিবেন না। যদি পশুবলি অনিষ্টকর হইত তাহা হইলে হিন্দুদের মধ্যে আমিষ ভোজন প্রথা অন্য জাতি অপেক্ষা বেশী প্রচলিত হইত। পশুবলি হেয়, অতএব হিন্দুরা অতি পাষণ্ড, মুখে এ কথা বলিব, অথচ আমিষ আহার করিব, ইহাতে পশুর প্রতি যতটা করুণা দেখান হয়, তাহা অপেক্ষা পরধর্ম নিন্দার প্রবৃত্তি বেশী পরিমাণে প্রকাশ করা হয় না কি?

আমাদের দেশ অনেক দুঃখ পাইতেছে তাহা স্বীকার করি, তাহার কারণও আছে তাহা মানি। কিন্তু হিন্দু-ধর্মের প্রকৃতি এবং হিন্দুর শাস্ত্র মানিবার প্রবৃত্তিকে যদি রবীন্দ্রনাথ ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে তাঁহার এ নির্দ্দেশ বিচারসহ নহে। যখন ধরিয়া হিন্দু যখন ঐহিক এবং আধ্যাত্মিক জগতে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তখনও হিন্দু এই সকল শাস্ত্রই মানিত, এই ধর্মই পালন করিত। কালিদাসের যুগ হিন্দুর সর্বদিক দিয়া গৌরবের যুগ, সে সময় কোন আদর্শ উচ্চ করিয়া ধরা হইয়াছিল তাহা কালিদাস নিজে এ ভাবে বলিয়াছেন,—

"রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাৎ আমনোঃ বর্ত্মনঃপরং
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ।"

মনুর সময় হইতে যে পথ কাটা হইয়াছিল তাহা হইতে এক বিন্দুও বিচলিত না হওয়াই রাজা ও প্রজা উভয়েরই গৌরব-সূচক ইহাই কালিদাসের মত। উচ্চ নীতি সম্পন্ন হিন্দুধর্ম কোন ধর্ম অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে রবীন্দ্রনাথ দেখিতে পাইবেন হিন্দুধর্ম হিন্দুর অধঃ-পতনের কারণ নহে, ইহার অন্য কারণ আছে।

তারা :

আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল্

তারায় তারায় আকাশ ভরা, ধরার পারে ধরা,
কোন্ আগুণের ফুল্‌কি বুনে শূন্য পূরণ করা?
নিশীথ রাতের নীরবতায় তাকাই ওদের পানে,
মর্ম্ম কথা কইতে যেন চাহে কাণে কাণে।
ঢুলে আসে চোখের পাতা, বুঝি না তার মানে
দুঃখ-ব্যথার জন্ম-কথা ওরা কিগো জানে।

তারার বাণী আমার কাণে ঘুমপাড়ানির চুমায়
যেই হারিয়ে মধুর নেশায় নিখুন ঘুমে ঘুমায়।
গোপন কথা কইতে তারা যদি আছে চেয়ে,
কেন হেন অবশ-করা সৃষ্টি আসে ছেয়ে!
চুমের ধারায় চিত্ত হারায় প্রশ্ন যেমন-লাগা;
ওগো মধুর, জাগিয়ে সুদূর জাগা, আমায় জাগা!

প্রেমে যাহার ক্ষেমে যাহার চুমায় মধু ভরা—
তাঁহার মাঝে আছে কিগো গুপ্ত-ব্যথার ভরা?
নন্দনে আনন্দ কিগো দুখের বোঁটায় গাঁথা?
পরশ কেন সরস তবে? এ কি বিষম ধাঁধা!
আকাশ-ভরা তারা কহে, স্বপ্ন নহে সাঁচা;
আঁধার বলে আমার কোলে ঘুমিয়ে পড় বাছা!

কাটিয়ে নেশা ঘুমের বাসার ঘুরাই চেতন চাকা,
আকাশ জুড়ে শূন্যে উড়ে সাপটে চলি পাখা।
বায়ুর সাঁ-সাঁয় তারার ভাষা জড়িয়ে যে যায় আসা;
ঊর্দ্ধ হ'তে ঊর্দ্ধ পথে এড়িয়ে চলি বাধা।
ভেসে আসে তবুও স্বপন, গোপন রহে বাণী—
বাসার পানে আমায় টানে নিশীথ রাতের রাণী।

আঁধার বাসার তারার পরশ! পিউরে ডাকে পাখী,
ঘুমন্ত অন্তরে জাগে অন্তহীনের ফাঁকি!
তারার গোপন বাণীর বেদন পাখীর গানে করে,
নিশার মদির স্বপ্ন-নদী বহে তরতরে।
এড়িয়ে স্বপন জাগো গোপন! জাগাও চেতন-সাড়া;
জেগে থাক, প্রাণে জাগো আকাশ-ভরা তারা!

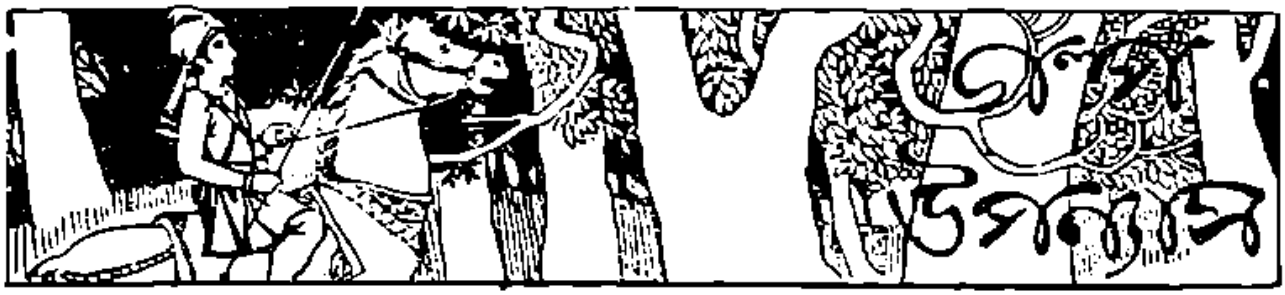

শেষের পরিচয়

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(২)

রাখাল জামা গুলিয়া ফেলিল।

তারক প্রশ্ন করিল, বেরুবে না?

না। কিন্তু তুমি? যাচ্ছো আজই বর্দ্ধমানে?

না। তুমি কি করো দেখ্‌বো,—যেচ্ছায় না করো জোর করে করাবো।

চায়ের কেৎলিটা আর একবার চড়িয়ে দিই,—কি বলো?

দাও।

কিছু জলখাবার কিনে আনিগে,—কি বলো?

রাজি।

তাহলে তুমি চড়াও জলটা, আমি যাই দোকানে। এই বলিয়া সে কোচার খুঁট গায়ে দিয়া চটি পায়ে বাহির হইয়া গেল। গলির মোড়েই খাবারের দোকান, নগদ পয়সার প্রয়োজন হয়না, ধার মেলে।

খাবার খাওয়া শেষ হইল। সন্ধ্যার পরে আলো জ্বালিয়া চায়ের পেয়ালা লইয়া দুই বন্ধু টেবিলে বসিল।

তারক প্রশ্ন করিল, তার পরে?

রাখাল বলিল, আমার বয়েস তখন দশ কি এগারো। বাবা চার-পাঁচ দিন আগে একবেলার কলেরায় মারা গেছেন, সবাই বল্‌লে বাবুদের মেজ মেয়ে সবিতা বাপের বাড়ীতে পুজো দেখ্‌তে এসেছে, তুই তাকে গিয়ে ধর্। বাবুদের বুড়ো সরকার আমাকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে অন্দরে গিয়ে উপস্থিত হোলো। তিনি পৈঁইটের একধারে বসে কুলোয় কোরে তিল বাছ্‌ছিলেন, সরকার বল্‌লে, মেজ-মা, ইটি বাবুদের ছেলে, তোমার নাম শুনে ভিক্ষে চাইতে এসেছে। হঠাৎ বাপ মারা গেছে,—ত্রিসংসারে এমন কেউ নেই যে এ দায় থেকে ওকে উদ্ধার করে দেয়। শুনে তাঁর চোখ ছল্ ছল্ করো এলো, বল্‌লেন, তোমার কি আপনার কেউ নেই? বল্‌লুম, মাসী আছে কিন্তু কখনো দেখিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রাদ্ধ করতে কত টাকা লাগ্‌বে? এটা শুনেছিলুম, বল্‌লুম পুরুত মশাই বলেন পঞ্চাশ টাকা লাগ্‌বে। তিনি কুলোটা রেখে উঠে গেলেন, আর একটা কথাও জিজ্ঞেসা করলেন না। একটু পরে ফিরে এসে আমার উত্তরীয়ের আঁচলে দশ টাকার পাঁচখানি নোট বেঁধে দিয়ে বল্‌লেন, তোমার নাম কি বাবা? বল্‌লুম রাজু, ভালো নাম রাখালরাজ। বল্‌লেন, তুমি যাবে বাবা আমার সঙ্গে আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশে? সেখানে ভালো ইস্কুল আছে, কলেজ আছে, তোমার কোন কষ্ট হবেনা। যাবে? আমাকে জবাব দিতে হোলোনা, সরকার মশাই যেন কাঁপিয়ে পড়লো, বল্‌লে, যাবে মা, যাবে, এক্ষুনি যাবে। এত বড় ভাগ্য ও কোথায় কার কাছে পাবে? ওর চেয়ে অসহায় এ গাঁয়ে আর কেউ নেই মা,—মা দুর্গা তোমাকে ধনে-পুত্রে চির-সুখী করবেন। এই বলে বুড়ো সরকার হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগ্‌লো।

শুনিয়া তারকের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল।

রাখাল বলিতে লাগিল, পিতৃ শ্রাদ্ধ ও মহামায়ার পুজো দুই-ই শেষ হলো। ত্রয়োদশীর দিন যাত্রা ক'রে চিরদিনের

মত দেশ ছেড়ে তাঁর স্বামী-গৃহে এসে আশ্রয় নিলুম। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী; তাই সবাই বলে নতুন-মা, আমিও বললুম নতুন-মা। শ্বশুর শাশুড়ী নেই, কিন্তু বহু পরিজন। অবস্থা সচ্ছল, ধনী বললেও চলে। এ বাড়ীর শুধু তো তিনি গৃহিণীই নয়, তিনিই গৃহকর্ত্রী। স্বামীর বয়স হয়েছে, চুলে পাক ধরতে সুরু করেছে, কিন্তু যেন ছেলে-মানুষের মত সরল। এমন মিষ্টি মানুষ আমি আর কখনো দেখিনি,—দেখা মাত্রই যেন ছেলের আঁধারে আমাকে তুলে নিলেন। দেশে জমি-জমা চাষ-বাসও ছিল, দু-একখানি ছোট-খাটো তালুকও ছিল, আবার কলকাতায় কি-যেন একটা কারবারও চলছিল। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তিনি থাকতেন বাড়ীতে, তখন দিনের অর্দ্ধেকটা কাটতো তাঁর পূজোর ঘরে,—দেব-সেবায়, পূজো-আহ্নিকে, ধ্যান জপে।

আমি ইস্কুলে ভর্ত্তি হোলাম। বই, খাতা-পেন্সিল-কাগজ-কলম এলো, জামা-কাপড়-জুতো-মোজা অনেক জুটলো, ঘরে মাষ্টার নিযুক্ত হলো, যেন আমি এ-বাড়ীরই ছেলে,—নিরাশ্রয় বলে মা যে সঙ্গে করে এনেছিলেন এ কথা সবাই গেল ভুলে। তারক, এ জীবনে সে-সুখের দিন আর ফিরবেনা। আজও কতদিন আমি চুপ করে শুয়ে সেই সব কথাই ভাবি। এই বলিয়া সে চুপ করিল, এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কেমন যেন একপ্রকার বিমনা হইয়া রহিল।

তারক কহিল, রাখাল, কি জানি কেন আমার বুকের ভেতরটা যেন ঢিপ্ ঢিপ্ করচে। তার পরে?

রাখাল বলিল, তারপরে এমন অনেকদিন কেটে গেল। ইস্কুলে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে আই-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হয়েছি, এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন সমস্ত উল্টে-পাল্টে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যেন লণ্ড-ভণ্ড হয়ে গেল। তাও তুচ্ছ কোথাও কিছু আর বাকি রইলনা। এই বলিয়া সে নীরব হইল।

কিন্তু চুপ করিয়াও থাকিতে পারিলনা, কহিল, এতদিন কাউকে কোন কথা বলিনি। আর, বলবই বা কাকে? আজও বলা উচিত কিনা জানিনে, কিন্তু বুকের ভেতরটায় যেন ঝড় বয়ে যাচ্চে—

চাহিয়া দেখিল তারকের মুখে অপরিসীম কৌতূহল, কিন্তু সে প্রশ্ন করিলনা। রাখাল নিজের সঙ্গে ক্ষণকাল লড়াই করিয়া অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তারক, নিজের মাকে দেখিনি, মা বলতে আমার নতুন-মাকেই মনে পড়ে। এই আমার সেই নতুন-মা। এতক্ষণে সত্যই তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। প্রথমে দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, তারপরে বড় বড় কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

মিনিট দুই-তিন পরে চোখ মুছিয়া নিজেই শান্ত হইল, কহিল, উনি তোমাকে দিন দুই থাকতে বলে গেলেন, হয়ত তোমাকে তাঁর কাজ আছে। বারো-তেরো বছর পূর্ব্বের কথা,—সেদিন ব্যাপারটা কি ঘটেছিল তোমাকে বলি। তারপরে থাকা না-থাকা তোমার বিবেচনা।

তারক চুপ করিয়া ছিল, চুপ করিয়াই রহিল।

রাখাল বলিতে লাগিল, তখন কে-একজন ওঁদের কলকাতার আত্মীয় প্রায়ই বাড়ীতে আসতেন। কখনো দু-একদিন, কখনো বা তাঁর সপ্তাহ কেটে যেতো। সঙ্গে আসতো তেল-মাখাবার খানসামা, তামাক সাজবার ভৃত্য, ট্রেনে খবরদারি করবার দরওয়ান,—আর, নানা রকমের কতকগুলা ফল-মূল-মিষ্টান্ন তার ঠিকানা নেই। পাল-পার্ব্বণ উপলক্ষে উপহারের তো পরিমাণ থাকতোনা। তাঁর সঙ্গে ছিল এঁদের ঠাট্টার সুবাদ। শুধু কোন সম্পর্কের হিসেবেই নয়, বোধকরি বা ধনের হিসেব থেকেও এ বাড়ীতে তাঁর আদর-আপ্যায়ন ছিল প্রভূত। কিন্তু বাড়ীর মেয়েরা যেন ক্রমশঃ কি একপ্রকার সন্দেহ করতে লাগলো। কথাটা ব্রজবাবুর কানে গেল, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করা তো দূরের কথা, উল্টে করলেন রাগ। দূর-সম্পর্কের এক পিসতুতো বোনকে যেতে হোলো তার শ্বশুরবাড়ী। শুনেচি, এমনিই নাকি হয়ে থাকে,—এই হোলো দুনিয়ার সাধারণ নিয়ম। তাছাড়া, এইমাত্র তো ওঁর নিজের মুখেই শুনতে পেলে কর্ত্তার মতো সরল-চিত্ত ভালোমানুষ লোক সংসারে বিরল। সত্যিই তাই। কারও কোন কলঙ্ক মনের মধ্যে স্থান দেওয়াই তাঁর কঠিন। আর, সন্দেহ কাকে, না নতুন-মাকে। ছি!

দিন কাটে, কথাটা গেল বাহুতঃ চাপ পড়ে, কিন্তু বিদ্বেষ ও বিষের বীজাণু আশ্রয় নিলে পরিজনদের নিভৃত গৃহকোণে। যাদের সবচেয়ে বড় জোরে আশ্রয় দিয়েছিলেন একদিন নতুন-মাই নিজে,—তাদেরই মধ্যে। কেবল আমাকেই যে একদিন 'যাবে বাবা আমার কাছে?' বলে ঘরে ডেকে এনেছিলেন তাই নয়, এনেছিলেন আরও

অনেকেরই। এ ছিল তাঁর স্বভাব। তাই পিসতুতো বোন গেল চলে, কিন্তু পিসি রইলেন তার শোধ নিতে।

তারক শুধু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। রাখাল কহিল, ইতিমধ্যে চক্রান্ত যে কত নিবিড় ও হিংস্র হয়ে উঠ্‌ছিলো তারই খবর পেলাম অকস্মাৎ একদিন গভীর রাত্রে। কি-একপ্রকার চাপা-গলার কর্কশ কোলাহলে ঘুম ভেঙে ঘরের বাইরে এসে দেখি সুমুখের ঘরের কবাটে বাইরে থেকে শেকল দেওয়া। উঠোনের মাঝখানে গোটা পাঁচ ছয় লণ্ঠন, বারান্দায় একধারে বসে স্তব্ধ-অধোমুখে ব্রজবাবু এবং সেই ঘরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে নবীনবাবু,—কর্ত্তার খুড়তুতো ছোট ভাই—রুদ্ধদ্বারে অবিরত ধাক্কা দিয়ে কঠিন কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ হাঁক্‌চেন,—রমণী বাবু, দোর খুলুন। ঘরটা আমরা দেখবো। বেরিয়ে আসুন বলচি!

ইনি কলকাতার আড়ত থেকে হাজার কুড়ি-পঁচিশ টাকা উড়িয়ে কিছুকাল হোলো বাড়ীতে এসে বসেছেন।

বাড়ীর মেয়েরা বারান্দার আশে পাশে দাঁড়িয়ে, মনে হলো চাকররা কাছাকাছি কোথায় যেন আড়ালে অপেক্ষা করে আছে;—ব্যাপারটা ঘুম-চোখে প্রথমটা ঠাওর পেলামনা কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত বুঝলাম। এখনি ভীষণ কি-একটা ঘটবে ভেবে ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভেসে গেল, চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো; হয়ত মাথা ঘুরে সেইখানে পড়ে যেতাম, কিন্তু তা' আর হলোনা। দোর খুলে রমণীবাবুর হাত ধরে নতুন-মা বেরিয়ে এলেন, বল্‌লেন, তোমরা কেউ এঁর গায়ে হাত দিয়োনা আমি বারণ করে দিচ্চি। আমরা এখুনি বাড়ী থেকে বার হয়ে যাচ্চি।

হঠাৎ যেন একটা বজ্রপাত হয়ে গেল। এ কি সত্য-সত্যই এ বাড়ীর নতুন-মা! কিন্তু তাঁদের অপমান করবে কি বাড়ীশুদ্ধ সকলে যেন লজ্জায় মরে গেল। যে-যেখানে ছিল সেইখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে,—তাঁরা সদর দরজা যখন পার হয়ে যান, কর্ত্তা তখন অকস্মাৎ হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠে বল্‌লেন, নতুন-বৌ, তোমার রেণু রইলো যে! কাল তাকে আমি কি দিয়ে বোঝাবো!

নতুন-মা একটা কথাও বল্‌লেননা নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বার হয়ে গেলেন। সেদিন সেই রেণু ছিল তিন বছরের, আজ বয়স হ'য়েছে তার ষোল। এই তেরো বচ্ছর পরে আজ হঠাৎ দেখা দিলেন মা, মেয়েকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যে।

এইবার এতক্ষণ পরে কথা কহিল তারক,—নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আর এই তেরোটা বচ্ছর মেয়েকে মা চোখের আড়াল করেননি। এবং শুধু মেয়েই নয় খুব সম্ভব, তোমাদের কাউকেই না।

রাখাল কহিল, তাইতো মনে হচ্চে ভাই। কিন্তু কখনো শুনেছো এমন ব্যাপার?

না, শুনিনি, কিন্তু বইয়ে পড়েচি। একখানা ইংরিজি উপন্যাসের আভাস পাচ্চি। কেবল আশা করি উপসংহারটা যেননা আর তার মতো হয়ে দাঁড়ায়।

রাখাল কহিল, নতুন-মার ওপর বোধ করি এখন তোমার ঘৃণা জন্মালো তারক?

তারক কহিল, জন্মানোই তো স্বাভাবিক রাখাল।

রাখাল চুপ করিয়া রহিল। অভাবটা তাহার মনঃপূত হইলনা, বরঞ্চ মনের মধ্যে গিয়া কোথায় যেন আঘাত করিল। খানিক পরে বলিল, এরপরে দেশে থাকা আর চল্‌লোনা। ব্রজবাবু কলকাতায় এসে আবার বিবাহ করলেন,—সেই অবধি এখানেই আছেন।

আর তুমি?

রাখাল বলিল, আমিও সঙ্গে এলাম। পিসিমা তাড়াবার সুপারিশ করে বল্‌লেন, ব্রজ, সেই হত-ভাগীই এই বালাইটাকে জুটিয়ে এনেছিল,—ওটাকে দূর করে দে।

নতুন-মার স্নেহের পাত্র ব'লে আমার 'পরে পিসিমা সদয় ছিলেননা।

ব্রজবাবু শান্ত মানুষ, কিন্তু কথা শুনে তাঁর চোখের কোণটা একটু রুক্ষ হয়ে উঠ্‌লো, তবু শান্তভাবেই বল্‌লেন, ওই তো তার রোগ ছিল পিসিমা। আপদ-বালাই তো আর একটি জুটোয়নি,—কেবল ও-বেচারাকে তাড়ালেই কি আমাদের সুবিধে হবে?

পিসিমার নিজেদের কথাটা হয়ে গেছে তখন অনেক-দিনের পুরণো,—সে বোধহয় আর মনে নেই। বল্‌লেন, তবে কি ওকে ভাত-কাপড় দিয়ে বরাবর পুষতেই হবে না কি? না না, ও যেখানের মানুষ সেখানে যাক, ওর মুখ থেকে বাপ-মা মেয়ের কীর্ত্তি-কাহিনী শুনুক। নিজেদের বলে-পরিচয়টা একটুখানি পাক্।

ব্রজবাবু এবার একটুখানি হাস্‌লেন, বল্‌লেন, ও ছেলে-

মানুষ, গুছিয়ে তেমন বলতে পারবেনা পিসিমা, তার বরঞ্চ তুমি অন্য ব্যবস্থা করো।

জবাব শুনে পিসিমা রাগ করে চলে গেলেন, বলে গেলেন, যা' ভালো বোঝো বাছা করো, আমি আর কিছুর মধ্যেই নেই।

নতুন-মা যাবার পরে এ বাড়ীতে পিসিমার প্রভাবটা কিছু বেড়ে উঠেছিল। সবাই জানতো তাঁর বুদ্ধিতেই এতবড় অনাচারটা ধরা পড়েচে। এতকালের দাসী-স্ত্রী তো যেতেই বসেছিল। নবীনবাবুর দরুণ যে কারবারের লোক-সান তার মূলেও দাঁড়ালো এই গোপন পাপ। নইলে কই এমন মতি বুদ্ধি তো নবীনের আগে হয়নি! পিসিমা বলতেও আরম্ভ করেছিলেন তাই। বলতেন, ঘরের লক্ষ্মীর সঙ্গে যে এসব বাঁধা। তিনি চঞ্চল হলে যে এমন হতেই হবে। হ'য়েছেও তাই।

তারক অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কলকাতায় এসে ওঁদের বাড়ীতেই কি তুমি থাকতে?

হাঁ, প্রায় বছর দশেক।

চলে এলে কেন?

রাখাল ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিল, আর সুবিধে হলনা।

তার বেশি আর বলতে চাওনা?

রাখাল আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, বলে লাভও নেই, লজ্জাও করে।

তারক আর জানিতে চাহিলনা, চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, শেষে বলিল, তোমার নতুন-মা যে তোমাকে এতবড় একটা ভার দিয়ে গেলেন তার কি? যাবেনা একবার ব্রজবাবুর ওখানে?

সেই কথাই ভাব্‌চি। না হয় কাল—

কাল? কিন্তু, তিনি যে বলে গেলেন আজ রাত্রেই আবার আসবেন, তখন কি তাঁকে বলবে?

রাখাল হাসিয়া মাথা নাড়িল।

তারক প্রশ্ন করিল, মাথা নাড়ার মানে? বলতে চাও তিনি আস্‌বেননা?

তাই তো মনে হয়। অন্ততঃ, অত রাত্রে আসতে পারা সম্ভবপর মনে করিনে।

এবার তারক অধিকতর গম্ভীর হইয়া বলিল, আমি করি। সম্ভব না হলে তিনি কিছুতে বলতেননা। আমার বিশ্বাস তিনি আস্‌বেন, এবং ঠিক এগারোটাতেই আসবেন। কিন্তু তখন তোমার আর কোন জবাব পাবেনা।

কেন?

কেন কি? তাঁর এতবড় দুশ্চিন্তাকে অগ্রাহ্য কোরে তুমি একটা পা-ও বাড়াওনি এ কথা তুমি উচ্চারণ করবে কোন্ মুখে? না, সে হবেনা রাখাল, তোমাকে যেতে হবে।

রাখাল কয়েক মুহূর্ত তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে ধীরে ধীরে বলিল, আমি গেলেও কিছু হবেনা তারক। আমার কথা ও-বাড়ীর কেউ কানেও তুল্‌বেনা।

তার কারণ?

কারণ, পাগল-বরের পক্ষেও যেমন এক মামা কর্তা আছেন, কনের দিকেও তেম্‌নি আর এক মামা বিদ্যমান। ব্রজবাবুর এ পক্ষের বড়-কুটুম। অতি শক্তিমান পুরুষ। বস্তুতঃ সে-মামার কর্তৃত্বের বহর জানিনে, কিন্তু এ-মামার পরাক্রম বিলক্ষণ জানি। বাল্যকালে পিসিমার অতবড় সুপারিশেও আমাকে নড়াতে পারেনি, কিন্তু এঁর চোখের একটা ইসারায় বাক্স সাম্‌লানো গেলনা, পুঁটুলি হাতে বিদায় নিতে হোলো। এই বলিয়া সে একটু হাসিয়া কহিল, ভগবান জুটিয়েছেন ভালো। না ভাই বন্ধু, আমি অতি নিরীহ মানুষ,—ছেলে পড়াই, রাঁধি-বাড়ি, খাই, বাসায় এসে শুয়ে পড়ি। দুরদৃষ্ট পেলে অবলা সবলা নির্ব্বিচারে বড়লোকের ফাই-ফরমাস খাটি,—বক্‌শিসের আশা করিনে—সে সব ভাগ্যবানদের জন্যে। নিজের কপালের দৌড় ভাল কোরেই জেনে রেখেচি,—তাতে দুঃখও নেই, একরকম সয়ে গেছে। দিন মন্দ কাটেনা, কিন্তু তাই ব'লে মাঝভূমি ঘেঁসে দাঁড়িয়ে মামায়-মামায় কুস্তি লড়িয়ে তার বেগ সম্বরণ করতে পারবোনা।

শুনিয়া তারক হাসিয়া ফেলিল। রাখালকে সে যতটা হাবা-বোকা ভাবিত, দেখিল তাহা নয়। জিজ্ঞাসা করিল, দু-পক্ষেই মামা রয়েছে বলে মধ্যে যুদ্ধ বাধ্‌বে কেন?

রাখাল কহিল, তাহলে একটু খুলে বলতে হয়। মামা মশায় আমাকে বাড়ীটা ছাড়িয়েছেন, কিন্তু তার মায়াটা আজও ঘোচাতে পারেননি, কাজেই অল্প-স্বল্প খবর এসে কানে পৌঁছয়। শোনা গেল ভগিনীপতির কন্যাদায়ে শালকের আরামেই বেশি বিঘ্ন ঘটাচ্ছে,—এ ঘটকালিও

তাঁর কীর্ত্তি। সুতরাং, এ ক্ষেত্রে আমাকে দিয়ে বিশেষ কিছু হবেনা, এবং সম্ভবতঃ, কাউকে দিয়েই না। পাকা-দেখা, আশীর্ব্বাদ, গায়ে হলুদ পর্য্যন্ত হয়ে গেছে, অতএব এ বিবাহ ঘটবেই।

তারক কহিল, অর্থাৎ, ও-পক্ষের মামাকে কন্যার মায়ের কাহিনী শোনাতেই হবে; এবং তারপরে ঘটনাটা মুখে-মুখে বিস্তারিত হতেও বিলম্ব ঘটবেনা। এবং, তার অবশ্যম্ভাবী ফল ও মেয়ের ভালো-ঘরে আর বিয়েই হবেনা।

রাখাল বলিল, আশঙ্কা হয় শেষ পর্য্যন্ত এমনিই কিছু-একটা দাঁড়াবে।

কিন্তু মেয়ের বাপ তো আজও বেঁচে আছেন?

না, বাপ বেঁচে নেই, শুধু ব্রজবাবু বেঁচে আছেন।

তারক ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, রাখাল, চলোনা একবার যাই। বাপটা একেবারেই মরেছে, না লোকটার মধ্যে এখনো কিছু বাকি আছে দেখে আসিগে।

তুমি যাবে?

ক্ষতি কি? বলবে ইনি পাত্রের প্রতিবেশী,—অনেক কিছুই জানেন।

রাখাল হাসিয়া বলিল, ভালো বুদ্ধি। প্রথমতঃ, সে সত্যি নয়, দ্বিতীয়তঃ, জেরার ধাপটে তোমার গোলমেলে উত্তরে তাঁদের ঘোর সন্দেহ হবে তুমি পাড়ার লোক, ব্যক্তিগত শত্রুতা বশে ভাঙচি দিতে এসেচো। তাতে কার্য্যসিদ্ধি তো হবেইনা, বরঞ্চ, উল্টো ফল দাঁড়াবে।

তাই তো। তারক মনে মনে আর একবার রাখালের সাংসারিক বুদ্ধির প্রশংসা করিল, বলিল, সে ঠিক। আমাদের জেরায় ঠকতে হবে। নতুন-মার কাছে আরও বেশি খবর জেনে নেওয়া উচিত ছিল। বেশ, আমাকে তোমার একজন বন্ধু বলেই পরিচয় দিও।

হাঁ, দিতে হলে তাই দেবো।

তারক বলিল, এ-বিয়ে বন্ধ করার চেষ্টায় তোমার সাহায্য করি এই আমার ইচ্ছে। আর কিছু না পারি, এই মামাটিকে একবার চোখে দেখেও আসতে পারবো। আর অদৃষ্ট প্রসন্ন হলে শুধু ব্রজবাবুই নয়, তাঁর তৃতীয় পক্ষেরও হয়ত দেখা মিলে যেতে পারে।

রাখাল বলিল, অন্ততঃ, অসম্ভব নয়।

তারক প্রশ্ন করিল, এই মহিলাটি কেমন রাখাল?

রাখাল কহিল, বেশ ফর্সা মোটা-সোটা পরিপুষ্ট গড়ন, অবস্থাপন্ন বাঙালী-ঘরে একটু বয়স হলেই ওঁরা যেমনটি হয়ে ওঠেন তেম্‌নি।

কিন্তু মানুষটি?

মানুষটি তো বাঙালী-ঘরের মেয়ে। সুতরাং, তাঁদেরই আরও দশজনের মতো। কাপড়-গহনার প্রগাঢ় অনুরাগ, উৎকট ও অন্ধ সন্তান-বাৎসল্য, পরদুঃখে সকাতর অশ্রুবর্ষণ, দু-আনা চার-আনা দান, এবং পরক্ষণেই সমস্ত বিস্মরণ। স্বভাব মন্দ নয়,—ভালো বললেও অপরাধ হয়না। অল্প-স্বল্প ক্ষুদ্রতা, ছোট খাটো উদারতা, একটু আধটু—

তারক বাধা দিল,—থামো থামো। এসব কি তুমি ব্রজবাবুর স্ত্রীর উদ্দেশেই শুধু বোলচো, না সমস্ত বাঙালী-মেয়েদের লক্ষ্য করে যা মুখে আসচে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্চো,—কোন্‌টা?

রাখাল বলিল, দুটোই রে ভাই দুটোই। শুধু তাৎপর্য্য গ্রহণ শ্রোতার অভিজ্ঞতা ও অভিরুচি সাপেক্ষ।

শুনিয়া তারক সত্যই বিস্মিত হইল, কহিল, মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার মনে-মনে যে এতটা উপেক্ষা আমি জানতামনা। বরঞ্চ ভাবতাম যে—

রাখাল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ঠিকই ভাবতে ভাই, ঠিকই ভাবতে। এতটুকু উপেক্ষা করিনে। ওঁরা ডাকলেই ছুটে যাই, না ডাকলেও অভিমান করিনে, শুধু দয়া করে খাটালেই নিজেকে ধন্য মানি। মহিলারা অনুগ্রহও করেন যথেষ্ট, তাঁদের নিন্দে করতে পারবোনা।

তারক বলিল, অনুগ্রহ যাঁরা করেন তাঁদের একটু পরিচয় দাওতো শুনি।

রাখাল বলিল, এইবারেই ফেললে মুস্কিলে। জেরা করলেই আমি ঘাবড়ে উঠি। এ বয়সে দেখলাম শুনলাম অনেক, সাক্ষাৎ পরিচয়ও বড় কম নেই, কিন্তু এম্‌নি বিশ্রী স্মরণ-শক্তি যে কিছুই মনে থাকেনা। না তাঁদের বাইরের চেহারা না তাঁদের অন্তরের। সাম্‌নে বেশ কাজ চলে, কিন্তু একটু আড়ালে এলেই সব চেহারা লেপে মুছে একাকার হয়ে যায়। একের সঙ্গে অন্যের প্রভেদ ঠাউরে পাইনে।

তারক কহিল, আমরা পল্লীগ্রামের লোক, পাড়ার আত্মীয় প্রতিবেশীর ঘরের দু'চারটি মহিলা ছাড়া বাইরের কাউকে চিনিওনে, জানিওনে। মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের

এই তো জানি। কিন্তু এই প্রকাণ্ড সহরের কত নতুন, কত বিচিত্র—

রাখাল হাত তুলিয়া থামাইয়া দিয়া বলিল, কিছু চিন্তা কোরোনা তারক, আমি হদিশ বাৎলে দেব। পাড়াগাঁয়ের বলে যাঁদের অবজ্ঞা কোরচ কিম্বা মনে মনে যাঁদের সম্বন্ধে ভয় পাচ্চো তাঁদেরকেই সহরে এনে পাউডার কৃষ্ণ প্রভৃতি একটু চেপে মাখিয়ে মাস দুই খানকয়েক বাছা বাছা নাটক-নভেল এবং সেই সঙ্গে গোটা-পাঁচেক চল্‌তি চালের গান শিখিয়ে নিও—ব্যস্! ইংরিজি জানে না? না জানুক, আগাগোড়া বল্‌তে হয়না, গোটাকুড়ি ভব্য কথা মুখস্থ করতে পারবে ত? তা' হলেই হবে। তার পরে—

তারক বিরক্ত হইয়া বাধা দিল,—তারপরেতে আর কাজ নেই রাখাল, থাক্। এখন বুঝ্‌তে পারছি কেন তোমার গা নেই। ঐ মেয়েটীর যেখানে যার সঙ্গেই বিয়ে হোক্ তোমার কিছুই যায় আসেনা। আসলে ওদের প্রতি তোমার দরদ নেই।

রাখাল সকৌতুকে প্রশ্ন করিল, দরদ হবে কি করে বলে দিতে পারো?

পারি। নির্বিচারে মেলা-মেশাটা একটু কম করো,—যা' হারিয়েছো তা' হয়ত একদিন ফিরে পেতেও পারো। আর কেবল এই জন্যেই নতুন-মার অনুরোধ তুমি স্বচ্ছন্দে অবহেলা করতে পারলে।

রাখাল মিনিট খানেক নিঃশব্দে তারকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পরিহাসের ভঙ্গীটা ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিল, বলিল, এইবার ভুল হোলো। কিন্তু তোমার আগের কথাটায় হয়ত কিছু সত্যি আছে,—ওদের অনেকের অনেক কিছু জান্‌তে পারার লাভের চেয়ে বোধ হয় ক্ষতিই হয় বেশি। এখন থেকে তোমার কথা শুন্‌বো। কিন্তু যাঁদের সম্বন্ধে তোমাকে বল্‌ছিলাম তাঁরা সাধারণ মেয়ে,—হাজারের মধ্যে ন'শ নিরানব্বুই। তার মধ্যে নতুন-মা নেই। কারণ, ঐ যে একটি বাকি রইলেন তিনিই উনি। ওঁকে অবহেলা করা যায়না, ইচ্ছে করলেও না। কিসের জন্যে আজ তুমি বর্দ্ধমানে যেতে পারচোনা সে তুমি জানোনা কিন্তু আমি জানি। কিসের তাগাদায় ঠেলে-ঠুলে আমাকে এখুনি পাঠাতে চাও মামাবাবুর শ্বশুরে তার হেতু তোমার কাছে পরিষ্কার নয়, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্চি। ওঁর বিগত ইতিহাস শুনে ঐ যে কি না বল্‌ছিলে তারক অমন স্ত্রীলোককে ঘৃণা করাই স্বাভাবিক,—তোমার ঐ মতটি আর একদিন বদ্‌লাতে হবে। ওতে চলবে না।

তারক মুখে হাসি আনিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল, না চললে জানাবো। কিন্তু ততক্ষণ নিজের কথা অপরের চেয়ে যে বেশি জানি এটুকু দাবী করলে রাগ কোরোনা রাখাল। কিন্তু এ তর্কে লাভ নেই ভাই,—এ থাক্। কিন্তু, তোমার কাছে যে আজ পর্য্যন্ত একটি নারীও শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে টিকে আছেন এ বড় আশার কথা। কিন্তু আমরা ওর নাগাল পাবোনা রাখাল, আমরা তোমার ঐ একটিকে বাদ দিয়ে বাকি নশ-নিরানব্বুইয়ের ওপরেই শ্রদ্ধা বাঁচিয়ে যদি চলে যেতে পারি তাতেই আমাদের মত সামান্য মানুষে ধন্য হয়ে যাবে।

রাখাল তর্ক করিলনা,—জবাব দিলনা। কেবল মনে হইল সহসা সে যেন একটুখানি বিমনা হইয়া গেছে।

কি হে যাবে?

চলো।

গিয়ে কি বল্‌বে?

মোটের ওপর যা সত্যি তাই। বল্‌বো বিশ্বম্ভরের খবর পাওয়া গেছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই ভালো।

দুই বন্ধু উঠিয়া পড়িল। রাখাল দরজার তালা বন্ধ করিয়া যুক্তপাণি কপালে ঠেকাইয়া বলিল, দুর্গা! দুর্গা! অতঃপর উভয়ে ব্রজবাবুর বাটীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

তারক হাসিয়া কহিল, আজ কোন কাজই হবেনা। নামের মাহাত্ম্য টের পাবে।　　(ক্রমশঃ)

প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়

শ্রীহরিহর শেঠ

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

১৬৮৬ হইতে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ

এই পরিচ্ছেদে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আগমন হইতে শত বৎসর পূর্ণে পর্য্যন্ত বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইল।

১৬৮৬—এই বৎসরের ২০শে ডিসেম্বর জব্‌চার্ণক্ প্রথম হুগলী হইতে সুতানুটীতে আইসেন।

১৬৮৭—চার্ণক্ ফেব্রুয়ারি মাসে এই স্থান হইতে হিজ্‌লী যান। পরে পুনরায় এই বৎসরেই আগমন করেন।

১৬৮৮—নবাবের সহিত গোলযোগ ঘটায় ৮ই নভেম্বর পুনরায় চার্ণক্ এই স্থান ত্যাগ করেন।

১৬৯০—২৬শে আগষ্ট চার্ণক্ তৃতীয় এবং শেষবার ত্রিশজন সৈন্য এবং লোকজন লহ সুতানুটীতে আগমন করেন।

১৬৯১—চার্ণক্ বাঙ্গলার নবাব ইব্রাহিম্ খাঁর নিকট হইতে বাঙ্গলায় বাণিজ্য করিবার সর্ত্ত সকল সম্বলিত পরোয়ানা প্রাপ্ত হন।

১৬৯২—চার্ণকের মৃত্যু হয় ১০ই জানুয়ারি।

১৬৯৬—গোল্ডস্‌বারো (Sir John Goldsborough) কমিশারি জেনারেল রূপে আগমন করেন।

মিঃ এলিস্ (Mr. Ellis) চার্ণকের স্থানে নিয়োজিত হন। তিনি উপরিতন কর্ম্মচারী ও তত্ত্বাবধারক গোল্ডস্‌বারোকে সন্তুষ্ট করিতে না পারায় ঢাকার প্রধান কর্ম্মচারী আয়ার (Mr. Eyre) তৎপদে নিযুক্ত হন।

১৬৯৭—সুতানুটীতে বাঙ্গালার প্রধান এজেন্টের বাস-ভবন স্থির হয়। এই স্থান হইতেই টাউন্ ডিউটী আদায় হইত। এ বৎসর দুই হাজার টাকা ডিউটী আদায় হইয়াছিল।

১৬৯৬—হিজ্‌লীর জমিদার শোভা সিং এবং আফগান সর্দ্দার রহিম খাঁর বিদ্রোহ হয়। কোম্পানী নবাবের নিকট প্রার্থনা করায় স্থানটিকে সুরক্ষিত করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। ইহাতেই পুরাতন দুর্গ নির্ম্মাণের সূত্রপাত হয়।

১৬৯৮—কুমার আজিম্ উশ্বানের নিকট হইতে মিঃ ওয়ালস্ (Mr. Walsh) গোবিন্দপুর কলিকাতা ও সুতানুটী নামক গ্রাম তিনটী ক্রয় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন।

১৬৯৯—জন্ বেয়ার্ড্ (John Beard) মাসিক দুই শত টাকা বেতনে বাঙ্গলার কাউন্সিলের সভাপতি নিযুক্ত হন এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য চারিজন সদস্য নিযুক্ত হন।

১৭০৩—জন্ বেয়ার্ড্ United Company of Merchants Trading to the East Indies-এর কাউন্সিলের সভাপতির পদে পাকা হন এবং তাঁহার অধীনে আটজন কমিশনার কার্য্য-তত্ত্বাবধারণের জন্য নিযুক্ত হন।

১৭০৬—সভাপতি বেয়ার্ডের মৃত্যুর পর মেসার্স্ হেজেস্ (Hedges) এবং শেলডন্ (Sheldon) তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হন। এই সময় কামানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া এবং ১৩০ জন গোরা সৈনিক দ্বারা ফোর্ট্ উইলিয়মের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সময়ই স্থানটি সুরক্ষিত বিবেচনা করিয়া অন্যত্র হইতে বহু লোক ব্যবসায়ার্থ এখানে আসিয়া কলিকাতার পত্তন করে।

১৭১০—বাৎসরিক ৩০০০৲ টাকা লইয়া সমস্ত কাষ্টম্ ডিউটী ছাড়ের জন্য বাদসাহ আরঙ্গজেবের ফার্মাণ্ পাওয়া সত্ত্বেও নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর শতকরা ২॥ টাকা ডিউটী যাওয়ার জন্য তৎকালীন গভর্ণর মিঃ হেজেস্ দিল্লীতে বাদসাহের নিকট অসুবিধা জ্ঞাপনের জন্য দূত পাঠাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হন।

১৭১৫—জন্ সারম্যান্ (John Surman) এডোয়ার্ড ষ্টিফেন্‌সন্ (Edward Stephenson) দূত মনোনীত হইয়া দিল্লী যাত্রা করেন এবং সেই বৎসর ৮ই জুলাই তথায় পৌঁছান। তাঁহাদের সহিত খোজা সেরহাও (Khoja

Sorhand) নামক একজন ইহুদি ব্যবসায়ী দোভাষী রূপে এবং উইলিয়ম্ হ্যামিল্টন্ (William Hamilton) চিকিৎসক রূপে গমন করেন।

১৭১৬—কলিকাতার প্রথম গির্জ্জা বর্ত্তমান রাইটার্স্ বিল্ডিংয়ের পশ্চিমে এবং পুরাতন দুর্গের দক্ষিণে নির্ম্মিত হয়। ইহার নাম হয় সেণ্ট জনস্ চার্চ্চ। ইহার প্রথম পাদ্রী নিযুক্ত হন স্যামুয়েল্ ব্রেরেটন্ (Rev. Samuel Brereton) অথবা ব্রায়েন্‌ক্লিফ্ (Revd. S. Briencliffe)

১৭১৭—কলিকাতার জমিদারের পদ সৃষ্টি হয় এবং গোবিন্দরাম মিত্র দেওয়ান নিযুক্ত হন। তিনি কালো জমিদার (Black Zamindar) নামে খ্যাত ছিলেন। জমিদার অর্থে সাধারণত যাহা বুঝায় এ তাহা নহে। তাঁহার মিউনিসিপাল, রাজস্ব বিষয়ক সিভিল্ ও ফৌজদারী সকল বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব ছিল; এমন কি জরিমানা করার ও কয়েদ দেওয়ার পর্য্যন্ত তাঁহার ক্ষমতা ছিল।

১৭২৪—মেয়র কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রাণ্টএর (Grant) মতে ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাতে একজন মেয়র ও নয়জন অল্‌ডারম্যান্ থাকিত। অল্‌ডারম্যানেরাই প্রতি বৎসর মেয়র নির্ব্বাচন করিত। তাহাদের বেতন ছিল মাসিক কুড়ি টাকা।

এই বৎসরই অষ্টেণ্ড কোম্পানী বাঁকিবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই বৎসর আরমেনিয়ান্ গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়, এবং সেণ্ট নাজেরেথের (St. Nazareth) নামে উৎসর্গীকৃত হয়। ইহাই বর্ত্তমানে প্রাচীনতম খৃষ্টান উপাসনা-মন্দির।

হুগলীর ফৌজদার একখানি রেশমপূর্ণ নৌকা আটক করায় উহাকে মুক্ত করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরিত হয় এবং তাহারা উহার উদ্ধারে কৃতকার্য্য হয়। ইহাতে তদানীন্তন বাঙ্গালার নবাব সুজাউদ্দীন খাঁ ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিশেষ উত্তেজিত হন। তাঁহারা পরিশেষে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং অনেক জরিমানা দিতে বাধ্য হন।

১৭২৬—এই বৎসর আগষ্ট মাসে বাঙ্গালা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই তিনটী পৃথক এবং বিভিন্ন প্রদেশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হয়। বিলাতের লিডেনহল্ ষ্ট্রীটে "ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউস্" নামক কোম্পানীর বাটীটি এই সময় নির্ম্মিত হয়।

১৭২৭—বহু ইংলণ্ডীয় ব্যবসায়ী এবং ইহুদী, পোর্ত্তুগীজ, হিন্দু ও মোগল ব্যবসাদারদের দ্বারা স্থানটী পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং এ বৎসর ১০০০০ টনেরও অধিক পরিমাণে মাল রপ্তানি হয়।

মিঃ বুশিয়ে দ্বারা প্রথম দাতব্য-স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়, উহাই পরে ফ্রী স্কুল নাম প্রাপ্ত হয়। এই বুশিয়ে সাহেব পরবর্ত্তী কালে বোম্বাইয়ের গভর্ণর হন।

১৭২৩—মিঃ ফ্রেক্ (Mr. Freke) কাউন্সিলের সভাপতি নিযুক্ত হন।

ডাচ্ এবং ইংরাজদের প্ররোচনায় হুগলীর ফৌজদার ভাগীরথীর পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত বাঁকিবাজারস্থিত জার্ম্মাণ কোম্পানীকে আক্রমণ করেন। তাঁহারা বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সহিত বাধা দান করিয়াও শেষে স্থানটী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। ফৌজদার সৈন্যের অধিনায়ক মিরজাফর পরিত্যক্ত দুর্গ অধিকার করিয়া উহার ধ্বংস সাধন করেন। এই হইতেই অষ্টেণ্ড কোম্পানীর অস্তিত্ব লোপ ঘটে।

১৭৩৪—মিঃ বুশিয়ে দাতব্য স্কুলটী কোম্পানীর হস্তে বাৎসরিক চারিসহস্র টাকা ব্যয়ে উহার পরিচালন করিবে এই সর্ত্তে দান করেন।

১৭৩৭—ভীষণ ঝটিকা ও ভূমিকম্পে কলিকাতার সমূহ ক্ষতি সাধিত হয়। ১৭৩৮-৩৯ সালের Gentleman's Magazine পত্রিকায় ইহার যে বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে জানা যায় কলিকাতায় তখন দুইশতখানি বাটী ভূমিসাৎ হয়। প্রথম চূড়া ওয়ালা গির্জ্জা সেণ্ট্ জনের চূড়াটি ভূপতিত হয়। নয় খানি ইংরাজ কোম্পানীর জাহাজের মধ্যে আটখানি এবং চারিখানির মধ্যে তিনখানি ডাচ্ জাহাজ লোকজন ও মালপত্রসহ জলমগ্ন হয়। ঝটিকা এত প্রবল হইয়াছিল যে, অনেক বড় বড় নৌকাও গাছের উপর উঠিয়া গিয়াছিল। কথিত আছে, এই দৈব দুর্ব্বিপাকে সর্ব্ব সমেত গঙ্গাতে ২০০০০ জাহাজ, নৌকা, মুণ্ড্ প্রভৃতি জলমগ্ন হয় এবং তিনলক্ষ প্রাণী বিনষ্ট হয়।

১৭৩৮—মিঃ ক্রটেন্‌ডেন্ (Mr. Cruttenden) মিঃ ফ্রেকের স্থানে কাউন্সিলের সভাপতি নিযুক্ত হন।

১৭৩৯—মিঃ ব্রাডেল্ (Mr. Braddyll) মিঃ ক্রটেন্‌ডেনের স্থানে কাউন্সিলের সভাপতি নিযুক্ত হন।

১৭৪২—মহারাষ্ট্রীয়েরা ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে বাঙ্গালা

আক্রমণ করিলে নদীর পশ্চিম দিকস্থ গ্রাম সকলের অধিবাসী দিগের মধ্যে অনেকে নিরাপদ বিবেচনা করায় কলিকাতায় আসিয়া বাস স্থাপন করেন। তদানীন্তন নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজরা সহরের সকল দিকে গভীর পরিখা কাটিতে প্রবৃত্ত হন। ইহাতেই মহারাষ্ট্র খাতের উৎপত্তি।

১৭৪৪—কলিকাতায় ফ্রী মাসন্ লজের নাম প্রথম উল্লিখিত হয়।

১৭৪৬—মিঃ ফ্রষ্টার (Mr. Froster) ব্রাডেলের স্থানে কাউন্সিলের সভাপতি নিযুক্ত হন।

১৭৪৭—মিঃ ডসন্ (Mr. Dawson) ফ্রষ্টারের স্থানে কাউন্সিলের সভাপতি নিযুক্ত হন।

১৭৪৮—মিঃ ফ্রষ্টার পুনরায় কাউন্সিলের সভাপতি নিযুক্ত হন।

বর্গীর ভয় হেতু ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় একটী সাধারণ পরামর্শ সভা হয়। মাননীয় জন্ ফস্টর্ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

উমিচাঁদের নাম এই বৎসরে প্রথম কলিকাতার ইতিহাসে স্থান পায়। তিনি ইংরাজ ও মহারাষ্ট্রদের মধ্যস্থ স্বরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে ইংরাজরা হুগলীর ফৌজদারকে বাৎসরিক ২১০০৲ টাকা দিতেন।

বেঙ্গল আর্টিলারি প্রথম গঠিত হয়। মেজর জেমস্ মস্‌ম্যান্ (Major James Mosman) উহা গঠন করেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ক্রনলজিষ্টের মতে মিঃ ডসন্ পুনরায় এই বৎসর গভর্ণর হন এবং এই বৎসরই পদত্যাগ করেন। তৎপরে মিঃ ফিচ্ (Mr. W Fytche) তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত হন।

১৭৪৯—আরমেনিয়ন্ এবং ইংরাজের মধ্যে বিবাদ হয় এবং আরমেনীয়রাই তাহা নবাবের গোচরে আনয়ন করেন।

উপনিবেশটিকে শ্রীসম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে সহরের জল নিকাশের জন্য নর্দ্দামাগুলির জরীপ ও মেরামত করিবার জন্য জমিদারের প্রতি উহার মাপযোগের আদেশ হয়।

হল্‌ওয়েল্ (Mr. John Zephaniah Holwell) তিনি ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে কেরাণীরূপে এ দেশে আইসেন, ডাক্তার লিণ্ডসের (Dr. William Lindsay) মৃত্যুর পর উপনিবেশের সার্জ্জন্ নিযুক্ত হন।

১৭৫০—মিঃ ফিচের পর মিঃ বারওয়েল্ (Mr. Barwell) গভর্ণর নিযুক্ত হন।

১৭৫১—মাননীয় মিঃ ডসন্ পুনরায় কাউন্সিলের সভাপতি হন।

১৭৫২—মাননীয় ড্রেক্ (Hon'ble Roger Drake) গভর্ণর নিযুক্ত হন।

সভাপতি, ক্রুটেণ্ডেন্ ও বীচারের সহিত মূল্যবান উপঢৌকন সহ নবাব সিরাজদ্দৌলার জন্য অপেক্ষা করেন। নবাব তাহা গ্রহণ করেন।

এপ্রেল মাসের মোট রাজস্ব আদায় হয় ৯১২৯৲ টাকা, উহা আদায়ের ব্যয় হয় ২৪৮১৲ টাকা। উপনিবেশের সমগ্র মাসিক ব্যয় হইত প্রায় ২০০০০৲ টাকা। সভাপতির বেতন ছিল পারিতোষিক সহ মাসিক ২৫৪৲ টাকা। পাদ্রী পাইত মাসিক ৮৪৲ এবং ডাক্তার ৩০৲ টাকা। ইহা ভিন্ন তাহারা মালের উপর কমিশন পাইত।

কালো জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র হলওয়েল্ কর্ত্তৃক প্রতারণার অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হন; কিন্তু কাউন্সিলের অধিকাংশের মতানুসারে তাঁহাকে পুনঃ নিযুক্ত করা হয়, যদিও ৩৩৯৲ টাকা তাঁহাকে ফেরৎ দিতে হইয়াছিল।

১৭৫৩—কোর্ট অব্ রিকোয়েষ্ট নামক আদালতের জন্য নূতন রাজাজ্ঞাপত্র পাওয়া যায় এবং বার জন কমিশনর নিযুক্ত হন। কর্পোরেসন্ এলডারম্যান্ মিঃ অরিয়্যাল্ (Mr. Auryall) কে মেয়র নির্ব্বাচিত করেন। তিনি এই কার্য্য করিতে অসম্মত হওয়ায় ৫০ পাউণ্ড জরিমানা দিতে বাধ্য হন। তৎপরে মিঃ প্লেসটেড্ (Mr. Plaisted) ঐ পদে নির্ব্বাচিত হন।

গভর্ণর ড্রেক্ কর্ত্তৃক একটী টাঁকশাল স্থাপনের প্রস্তাব হয়।

১৭৫৪—পূর্ব্বে চাউলের দর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় উহার রপ্তানি বন্ধ ছিল। এক্ষণে চাউল ব্যবসায়ীদের রপ্তানি করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। এখন সরু চাল টাকায় ৮২৷ সের হয়।

গ্রীষ্ম ও বর্ষার সময় ব্যতীত কোম্পানীর কেরাণীদের পাল্কি চড়িয়া আফিসে আসা নিষিদ্ধ হয়।

১৭৫৫—কলিকাতাকে সুরক্ষিত করিবার জন্য এখন পর্য্যন্ত ব্যয় অতি অল্পই করা হইত। বাগবাজারের দিকটা

দৃঢ়রূপে রক্ষণের জন্য ৩৫৮৶১৫ ব্যয় করা হয়। ইঞ্জিনীয়ার কর্ণেল সিম্‌সন্ (Colonel Simson) দুর্গকে সুরক্ষিত করিবার জন্য দুর্গ-মধ্যস্থ কতিপয় বাটী বিনষ্ট করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু কাউন্সিল্ তাহা মঞ্জুর করেন নাই। কর্ণেল্ স্কট্ (Colonel Scott) সহরকে পরিখা-বেষ্টিত করিবার জন্য একটি প্রস্তাব করেন। কাউন্সিল এজন্য ৫৫০০৲ টাকা মঞ্জুর করেন।

সার্জেণ্ট জেনারেল অফিস্

খৃষ্টান ফৌজদারী অপরাধীদের বিচার জন্য একটি স্বতন্ত্র আদালত স্থাপিত হয়।

হোয়াইট্ টাউনে সাহেবদের বাটী বিক্রীতে শতকরা ২৲ টাকা ডিউটি ধার্য্য হয়।

১৭৫৬—ঢাকার দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ কলিকাতায় আশ্রয় লইলে নবাব গভর্ণর ড্রেকের নিকট তাঁহাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য আদেশ করেন; কিন্তু ইহা মৌনভাবে অস্বীকৃত হয়। ইহাতে নবাব সিরাজ-দ্দৌলা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং প্রথম কাশীমবাজারের ইংরাজ কুঠি আক্রমণ করেন। তৎপরে তাঁহার সৈন্যবাহিনীর সহিত কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হন এবং প্রথম নগরের উত্তরাংশ বাগবাজারে আক্রমণ করেন ও তাহাতে বাধা প্রাপ্ত হন। তিন দিন পরে সমস্ত ফাঁড়ীগুলি নবাব সৈন্যের হস্তগত হয়। জাহাজের অনেক কর্ম্মচারীর সাহসিকা স্ত্রী মিসেস্ কেরি (Mrs. Carey) স্বামীকে ত্যাগ করিতে অস্বীকৃতা হওয়ায় তাঁহাকে ভিন্ন অপর সমস্ত মহিলাকে গঙ্গাবক্ষে জাহাজে স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের অছিলায় প্রথম মেসার্স মানিংহাম্ (Manningham) ও ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড্ (Frankland) এবং পরে গভর্ণর মিঃ রোজার ড্রেক্ (Mr. Roger Drake) কাউন্সিলের অনেক সদস্য মিঃ ম্যাকেট্ (Mr. Macket) কাপ্তেন্ মিন্‌চিন্ (Minchin) ও কাপ্তেন্ গ্রাণ্ট্ (Grant) ঐ পথ অবলম্বন করেন। এই ব্যাপারের পর কাউন্সিলের নির্দ্দেশ মত মিঃ হলওয়েল্ তাঁহাদের অধ্যক্ষ মনোনীত হন এবং যাহাতে অপর কেহ দুর্গ হইতে পলায়ন করিতে না পারে সেজন্য নদীর দিকের দ্বার বন্ধ করিয়া দেন। এই সময় ১৭০ বা ১৯০ জন ইংরাজ যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা সাহসিকতার সহিত বাধা দিবার যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্ত্বেও নবাবের সৈন্য সকল দিক দিয়া দুর্গ আক্রমণ করে এবং ইংরাজদের পরাস্ত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। ২০শে জুন বৈকালে নবাব দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং কোষাগারে মাত্র অর্দ্ধলক্ষ টাকা পাওয়ায় হলওয়েল্‌কে নিকটে উপস্থিত করান ও বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

কথিত আছে নবাবের আদেশে হলওয়েল্ ও অন্যান্য মোট ১৪৬ জনকে একটি কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়।

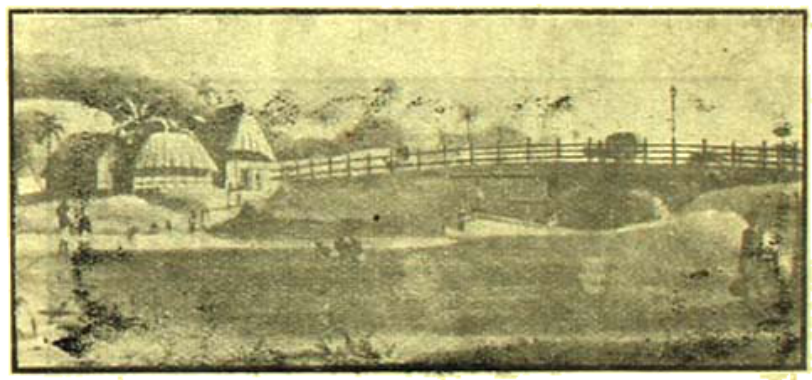

আলিপুরের পুল

পর দিবস প্রাতে দরজা খুলিলে মাত্র ২৩ জনকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায়। ইংরাজ ঐতিহাসিক ইহাকে অন্ধকূপ হত্যা নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অতঃপর নবাব কলিকাতার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া

আলিনগর রাখেন এবং তিন সহস্র সৈন্যসহ হুগলীর ফৌজদার মাণিকচাঁদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া ২রা জুলাই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মুর্শীদাবাদ যাত্রা করেন।

১৭৫৭—এড্‌মিরাল্ ওয়াটসনের (Admiral Watson) ও কর্ণেল্ ক্লাইভের (Colonel Clive) অধিনায়কত্বে মাদ্রাজ হইতে ৯০০ ইংরাজ সৈন্য, ১৫০০ সিপাহি ও যুদ্ধ জাহাজ আসিয়া দুর্গ ও কলিকাতা নগরী পুনরধিকার করে।

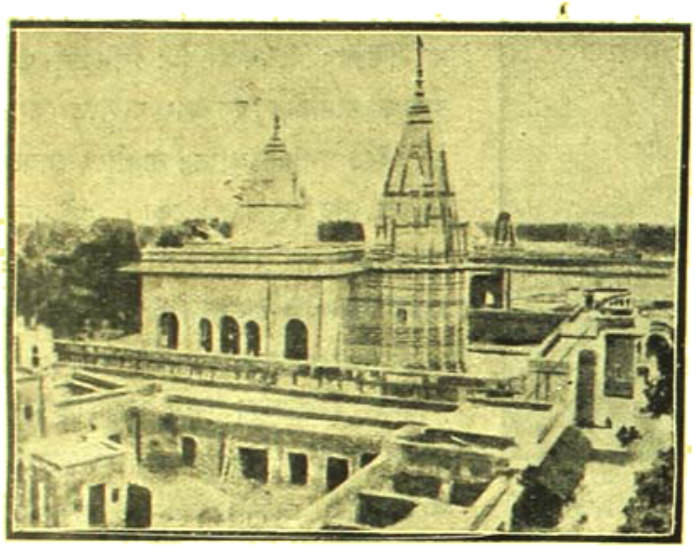

লালাবাবুর মন্দির—বৃন্দাবন

তৎপরে ২২শে মার্চ ক্লাইভ্ ও ওয়াট্‌সন্ টাইগার, বেন্ট্ ও স্যালিসবারি নামক তিনখানি রণতরি লইয়া চন্দননগর আক্রমণ করেন এবং নয় দিনের পর টেরানু (Terreneau) নামক একজন ফরাসী কর্ম্মচারীর

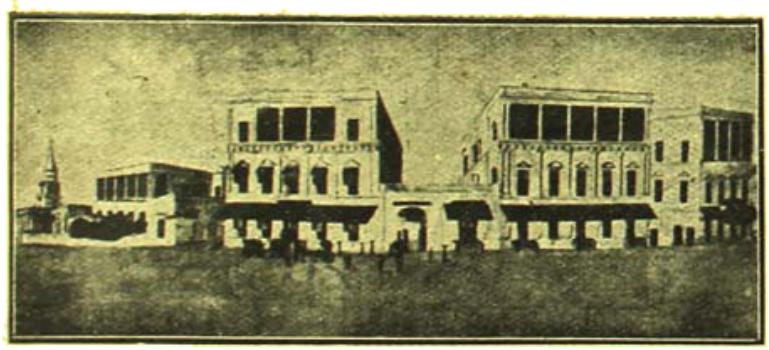

গভর্ণমেণ্ট প্রেস—১৮৪০

বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে উহা জয় করেন। তৎপরে এই স্থান হইতেই তাঁহারা মুর্শীদাবাদ যাত্রা করেন এবং ২৩শে জুন পলাশি প্রাঙ্গণে নবাবের সেনাপতি মিরজাফর ও অন্য কয়েকজনের ষড়যন্ত্রে সিরাজদ্দৌলাকে পরাস্ত করেন।

২৯শে জুন্ ক্লাইভ্ এক দরবারে মিরজাফরকে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া ঘোষণা করেন। নবাব ইংরাজদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বহু অর্থ প্রদান করেন ও বহু সুযোগ করিয়া দেন।

১৬ই আগষ্ট ওয়াট্‌সনের মৃত্যু হয় এবং সেণ্ট্ জর্জ্জ গির্জ্জার সমাধিক্ষেত্রে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

২৯শে আগষ্ট কলিকাতার টাঁকশালে প্রথম আলিনগর নামাঙ্কিত টাকা প্রস্তুত হয়।

১৭৫৮—অতঃপর নূতন মুদ্রায় আলিনগর নাম মুদ্রিত হইবে না স্থির হয়।

নূতন দুর্গ নির্ম্মাণের জন্য গোবিন্দপুর হইতে পল্লী, বাজার ও অধিবাসীগণকে স্থানান্তরিত হইতে হয় এবং বাসগৃহ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। দেশীয় অধিবাসীবৃন্দ শোভাবাজারের দিকে চলিয়া যান।

জ্বর ও কলেরায় বহু লোক বিশেষ ইংরাজদের মৃত্যু হয়।

কলিকাতা হইতে মুর্শীদাবাদ পর্য্যন্ত প্রথম ডাক স্থাপনা হয়।

১৭৫৯—শেঠেরা মুদ্রার মূল্য কমাইবার চেষ্টা করায় জন্য কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষগণ টাঁকশালে সিক্কা মুদ্রা প্রস্তুতে লোকশান হইতেছে বলিয়া অনুযোগ করেন।

জগৎশেঠ এবং নবাবকে উপঢৌকনাদি দিতে ৯৬৯৭৬৷৵ ব্যয় হয়।

১৭৬০—কলিকাতার অধিবাসীদের আবশ্যকরী অনুরূপ শস্য মজুৎ না থাকায় রপ্তানি নিষিদ্ধ হয়।

দুর্গনির্ম্মাণ কার্য্য সত্বর শেষ করিবার উদ্দেশ্যে অন্যত্র হইতে ৮০০০ কুলি ধরিয়া আনিবার জন্য কলেক্টরের প্রতি আদেশ হয়।

লোকজনের নিম্নলিখিতরূপ মাসিক বেতন ধার্য্য করিয়া দেওয়া হয়,—

দাসী—৩৲ নাপিত—১৲ জমাদার—৪৲ এবং কোচম্যান—৪৲

প্রাণদণ্ডের আসামিদের চাবুক মারার পরিবর্ত্তে তোপের মুখে উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা হয়।

ক্লাইভ্ ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমে পদত্যাগ করেন এবং ভ্যানসিটার্টের আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হলওয়েল্ তাঁহার স্থানে কাজ করেন।

ইংরাজ বালিকা ও যুবতীদের জন্য মিসেস্ হেজেস্ (Mrs. Hedges) দ্বারা প্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বৎসর ১০০৲ টাকা করিয়া চাঁদা করিয়া একটি থিয়েটার নির্ম্মিত হয়।

১৭৬১—দুর্গ নির্ম্মাণের ভার যাহাদের উপর অর্পিত ছিল তাঁহারা বহু অর্থ আত্মসাৎ করেন। কাপ্তেন্ ব্রোয়ের (Captain Brohier) এবং মিঃ লুইস (Mr. Louis) এই সম্পর্কে পলাতক হন।

মিঃ ওয়ারেণ হেষ্টিংস নবাবের দিভাষী নিযুক্ত হন।

১৭৬২—সেণ্টপল্স্ ক্যাথিড্রাল্ যে স্থানে আছে এবং ময়দান, যাহা ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাসভূমি ছিল, বোর্ডের আদেশে তথাকার জঙ্গল পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হয়।

খাস সহরের মধ্যে জমির খাজনা দ্বিগুণ করা হয়। এতাবৎ ৬০৫৬ বিঘা ১৩ কাঠা জমিতে বাৎসরিক ১৭৭৪৪৬১ পাই খাজনা পাওয়া যাইত।

১৭৬৩—রাইটার্স্ বিল্ডিংয়ের উত্তরে যে টাউন্হল ছিল তাহার বাৎসরিক ভাড়া ছিল ২০০০৲ টাকা।

কালীঘাটে টলিনালার উপর হেষ্টিংসের বেল্ভেডিয়ার নামক বাগানবাটীতে যাইবার পথে পুল নির্ম্মাণের আদেশ হয়।

কিয়ারনাণ্ডার্ (Kiernander) কে প্রোটেষ্টাণ্ট গির্জ্জার জন্য একটী বাটী দেওয়া হয়।

কাউন্সিলের সদস্য মিঃ বাট্সন্ (Mr. Batson) কাউন্সিলের সভাধিবেশন কালে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্কে অপমান করেন এবং মিথ্যাবাদী বলেন। এজন্য তিনি সভা হইতে অপসারিত হন এবং পরে ক্ষমা প্রার্থনা করায় পুনরায় তথায় স্থান প্রাপ্ত হন।

১৭৬৪—বাঙ্গালার মধ্যে দুইজন করিয়া যাজক থাকিবেন স্থির হয়। ফার্নিভ্যাল্ বোয়েন্ (Reverend Furnival Bowen) এবং উইলিয়ম্ হার্ষ্ট (Reverend William Hurst) এজন্য নিযুক্ত হন।

প্রেসিডেন্সীর মধ্যে ইয়োরোপীয়দের বৎসরে একবার করিয়া গণনা করার কথা হয়।

বর্ত্তমান লাটভবন যে স্থানে আছে তথায় নূতন

কোর্টউইলিয়ম—১৮৫৪

কাউন্সিল্ হাউস্ নির্ম্মিত হয়। মিঃ ফোর্টনম (Mr. J. Fortnom) এ কার্য্যে স্থপতি নিযুক্ত হন।

নবাব ৩য় নজেম্বর কলিকাতায় আগমন করেন এবং তাঁহাকে বিশেষ উৎসব ও সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করা হয়। ৫ই তারিখে বোর্ডের সমস্ত সদস্য

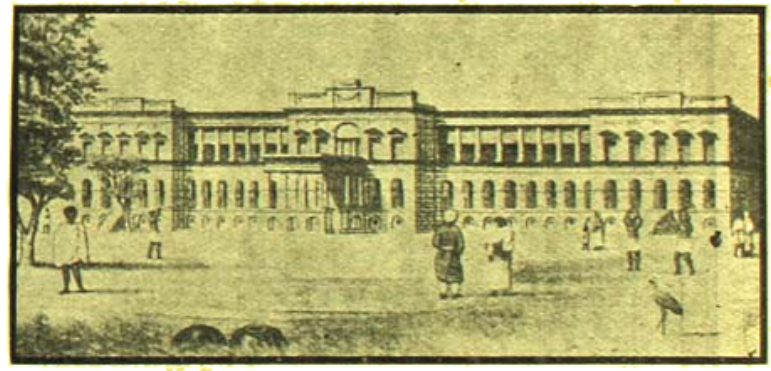

সেকালের কলিকাতার একটি অট্টালিকা

তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের দাবী জ্ঞাপন করেন।

১৭৬৫—হাঁসপাতালে প্রত্যেক রোগীর জন্য ১৭৬০ সালে ডাক্তার মাসিক ৮৲ টাকা করিয়া পাইত, তৎপূর্ব্বে ছিল ৬৲ টাকা। এক্ষণে বর্দ্ধিত হইয়া হয় মাসিক ১৮৲ টাকা।

ভ্যান্সিটার্ট্ অবসর গ্রহণ করিলে লর্ড ক্লাইবের না আসা পর্য্যন্ত মিঃ স্পেন্সর (Mr. Spencer) তাঁহার স্থানে কার্য্য করেন। ক্লাইব্ ৩রা মে কলিকাতায় পৌঁছেন।

১২ই আগষ্ট দিল্লির বাদশা শাহ আলামের নিকট হইতে বাৎসরিক দুই লক্ষ টাকা বার্ষিক রাজস্ব দিতে স্বীকৃত

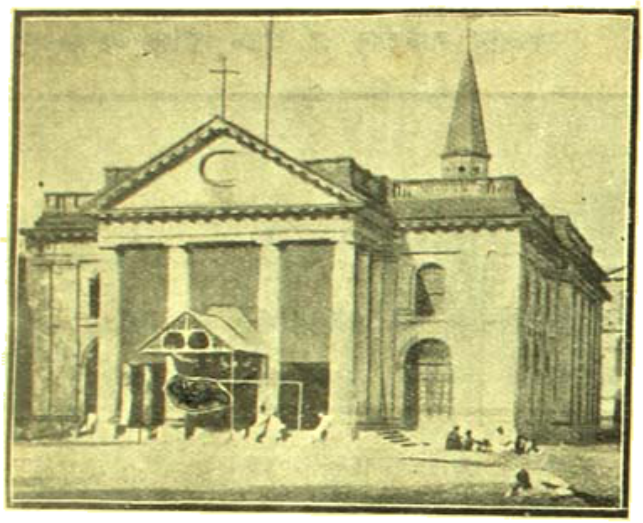

রোম্যান্ ক্যাথলিক গির্জ্জা-বুরুজহাটা

হইয়া ক্লাইব্ বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রাপ্ত হন। ইহা হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজ বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা হন এবং রাজ্যশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

লইয়া একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশন বিশেষ বিদ্বেষ রিপোর্ট দাখিল করেন।

১৭৬৬—রাধাচরণ মিত্র নামে এক ব্যক্তির জাল করা অপরাধে ফাঁসির হুকুম হয়। ইহার বিরুদ্ধে বহু দেশীয় লোকের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন পত্র প্রদত্ত হয়। তাহার ফলে এই দণ্ড স্থগিত হয়।

পুরাতন কেল্লাকে কাষ্টম্ হাউসে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হয়।

১৭৬৭ সালে যে নূতন দুর্গ আরম্ভ হইয়াছিল উহা সমাপ্ত হয়। এই কার্য্যে মোট ব্যয় হয় বিশ লক্ষ টাকা।

এই বৎসর বাৎসরিক অতিরিক্ত দুই সহস্র টাকা দাতব্যের জন্য ব্যয় মঞ্জুর হয়।

কলিকাতার অধিবাসী ও সরকারি কর্ম্মচারীদের গভর্ণরের আদেশ ব্যতিরেকে সহর হইতে দশ মাইলের অধিকদূরে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়।

সহরের মধ্যে এ্যারাক্ মদ্যের দোকান সকল ভাড়া বিলি করিয়া দিবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হয়।

একটী নূতন হাঁসপাতাল ও একটী গোরস্থান নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হয়।

নবাবের নিকট হইতে যে ডবল বাটা পাওয়া যাইত

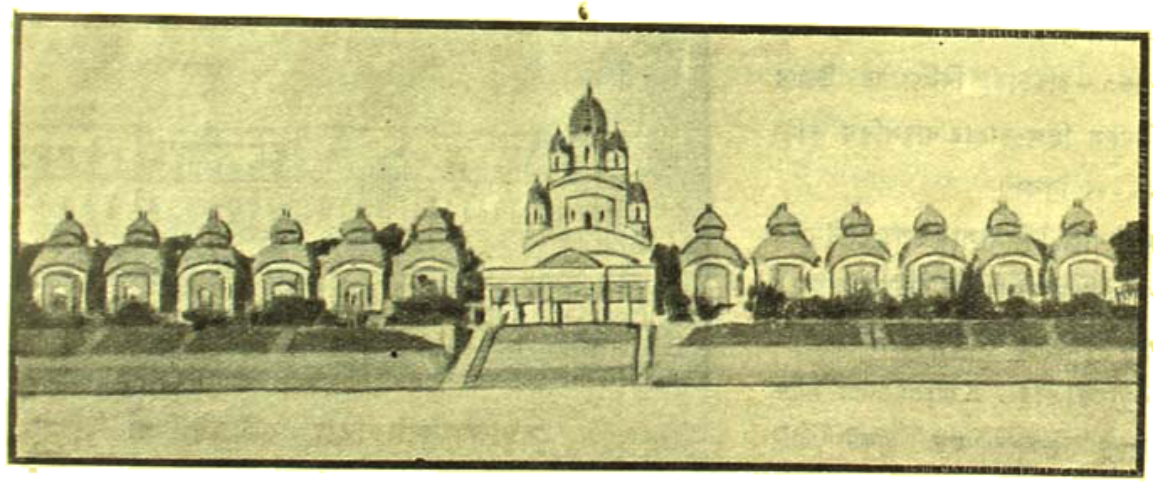

রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের মন্দির

কলিকাতার চ্যারিটি স্কুলটির বিশেষ উন্নতি সাধন হয় এবং গভর্ণমেণ্ট মাসিক ৮০০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন।

সিভিলিয়নদের চরিত্র বিষয় অনুসন্ধানের জন্য ক্লাইব, সাম্নার (Sumner) এবং ভেরালেষ্ট্ (Verelst) কে

তাহা ১লা জানুয়ারি হইতে বন্ধ হওয়ায় বেঙ্গল্ আর্ম্মির কর্ম্মচারীদের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ক্লাইব্ ইহা দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৭৬৭—লর্ড ক্লাইব্ জানুয়ারি মাসে পদত্যাগ করেন

এবং ভেরলেষ্ট্ (Mr. Harry Verelst) তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হন।

সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন প্রোটেষ্টাণ্ট গির্জ্জা—মিশন্‌চার্চের ভিত্তি-প্রস্তর যে মাসে স্থাপিত হয়। উহার প্রতিষ্ঠাতা কিয়ারনান্ডার (Kiernander) এবং স্থপতি দে মেড্‌ল (Mr. M. B. de Meudl)। কুলিংগার স্থিত সারমন সাহেবের উদ্যান দশ হাজার টাকা মূল্যে খরিদ করার সময় হয়।

জেমস্ রেণেল্ (Captain James Rennell) মাসিক তিনশত টাকা বেতনে সার্ভেয়ার জেনারেল পদে নিযুক্ত হন।

নন্দকুমার এবং বোলষ্টের (William Bolat) প্ররোচনায় রামনাথ দাস ও কতিপয় ব্যক্তি শোভাবাজার রাজবাটীর প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণের বিরুদ্ধে কয়েকটী গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করেন। তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় রামনাথ, নন্দকুমার, বোলষ্ট প্রভৃতি সাজা প্রাপ্ত হন।

দক্ষিণ পার্ক ষ্ট্রীটের গোরস্থান সাধারণতঃ যাহাকে পুরাতন গোরস্থান বলে তাহা ২৫শে আগষ্ট খোলা হয়।

১৭৬৮—জেনারেল হাসপাতাল নির্ম্মিত হয়।

এ সময় লালবাজার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট রাস্তা ছিল।

সিম্, মটরশুঁটী, কপি প্রভৃতি বিলাতি শাকসব্জি এ সময় কলিকাতায় প্রচলিত হইয়াছিল।

১৭৬৯—মিঃ ভেরলেষ্ট্ (Mr. Verelst) পদত্যাগ করেন এবং সাত লক্ষ টাকা লইয়া দেশে যান্। জন্ কার্টিয়ার (John Cartier) তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হন।

১৭৭০—এই বৎসর ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হয়। এরূপ লোকক্ষয় কখন হয় নাই। ইহাকেই "ছিয়াত্তরে মন্বন্তর" বলিয়া থাকে।

এই সময় পুরাতন দুর্গে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল।

মিশন চার্চ্চ গির্জ্জা প্রস্তুত শেষ হয়।

ওল্ড কোর্ট হাউসে এই সময় এসেম্‌ব্লি রুম ছিল।

১৭৭২—মিঃ ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ মিঃ কার্টিয়ারের স্থানে গভর্ণর নিযুক্ত হন। তিনি এই পদ গ্রহণ করিয়াই বহু বিষয়ে সংস্কার করেন। যথা—

কোষাগার ও রাজস্ব আদায়ের কেন্দ্র মুর্শীদাবাদ হইতে কলিকাতায় আনয়ন করেন।

রাজস্ব আদায়ের ভার সিভিলিয়ানদের হস্তে অর্পণ করেন এবং তাঁহারা কলেক্টর নামে অভিহিত হন।

পলাশীর যুদ্ধ

সদর দেওয়ানি আদালত ও সদর নিজামত আদালত নামে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

দ্বারকানাথ মিত্র

মহম্মদ রেজা খাঁ যাঁহার উপর ফৌজদারি ও রাজস্ব বিষয়ে প্রায় সমস্ত ভারার্পিত ছিল,—বহু অর্থ তছরূপের

সন্দেহে তাঁহাকে সপরিবারে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া চিৎপুরে নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। দুই বৎসরের পর বিচারে তিনি মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু পূর্ব্বের কার্য্যে আর তাঁহাকে রাখা হয় নাই।

১৭৭৩—রেগুলেটিং এক্ট্ অনুসারে ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস্ ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল্ পদ প্রাপ্ত হন এবং বার্ষিক ২৫০ লক্ষ টাকা বেতন নির্দ্ধারিত হয়। তাঁহার সভার চারিজন সদস্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। তাঁহারা—মিঃ বারওয়েল্ (সিনিয়র মেম্বর) ক্লেভারিং (Lieutenat General Clavering) কর্ণেল্ মনসন্ এবং ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্।

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী

মেয়র কোর্টের পরিবর্ত্তে সুপ্রীম্ কোর্ট স্থাপিত হয়। বার্ষিক ৮০০০০৲ টাকা বেতনে স্যার এলিজা ইম্পে প্রধান বিচারপতি এবং বার্ষিক ৬০০০০৲ টাকা বেতনে মেসার্স চেম্বার্স, হাইড্ ও লে-মেষ্টার তিনজন পিউনি জজ নিযুক্ত হন।

এ সময় বাঙ্গালার রাজস্বাদি মোট আদায় ছিল ১৪৮৮৪৩৯ পাউণ্ড।

১৭৭৪—ক্লেভারিং, মনসন্ এবং ফ্রান্সিস্ ১৯শে অক্টোবর চাঁদপাল ঘাটে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলে দুর্গ হইতে ১৭টি তোপধ্বনি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। এ সম্মান পূর্ব্বে লর্ড ক্লাইবও পান নাই; কিন্তু ১৭ তোপে তাঁহারা অসম্মান বোধ করেন এবং সেই দিন হইতেই তাঁহারা শত্রুভাব ধারণ করেন। বারওয়েল্ বরাবর হেষ্টিংসের পক্ষে থাকিলেও তাঁহাদের সংখ্যাধিক্য বশতঃ তাঁহারাই প্রকৃত-প্রস্তাবে দেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া রহিলেন।

১৭৭৫—মহারাজা নন্দকুমার জাল করা অপরাধে চরম দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং কুলিবাজারে তাঁহার ফাঁসি হয়। এই ব্রহ্মহত্যার জন্য দেশে হুলস্থুল পড়িয়া যায়।

মিঃ লে গ্রাণ্ডের (Mr. Le Grand) এর স্ত্রী মাদাম্ গ্রাণ্ডের শয়ন কক্ষ হইতে দড়ির সিঁড়ি দিয়া ফ্রান্সিসের

গোপীমোহন ঠাকুর

নিষ্ক্রামণ কালে ধরা পড়ায় বিচারে তাঁহার ৪০০০০ সিক্কা টাকা জরিমানা হয়।

১৭৭৬—কর্ণেল্ মন্সনের মৃত্যু হয়। হেষ্টিংসের বিলাতের এজেণ্ট্ কর্ণেল্ ম্যাক্লীন (Colonel Macleane) হেষ্টিংসের পদত্যাগ-পত্র দাখিল করেন। তাহা মঞ্জুর হয় এবং মিঃ হুইলার (Mr. Whooler) গভর্ণর জেনারেল পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার না আসা পর্য্যন্ত ক্লেভারিং তাঁহার কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৭৭৭—ক্লেভারিং এই সংবাদ পাইয়া দুর্গের চাবি এবং

খাতাপত্র হস্তগত করেন, কিন্তু হেষ্টিংস ঘোষণা করেন তাঁহার পদত্যাগপত্র দিবার ম্যাকলীনের অধিকার ছিল না। এ বিষয় লইয়া প্রথম কিছু গোলযোগ হইলেও পরে তিনিই গভর্ণর জেনারেল থাকেন এবং হুইলার গভর্ণরের পরিবর্ত্তে একজন কাউন্সিলের সদস্য হন।

ব্যারণ্ ইমহফের (Baron Imhoff) স্ত্রীর সহিত বিবাহ-বিচ্ছেদের পর হেষ্টিংসের সহিত মহা ধুমধামের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

ক্লেভারিংয়ের মৃত্যু হয়।

অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১৭৭৮—হালহেড্ (Mr. N. B. Halhead C. S.) সাহেবের লিখিত বাঙ্গালা পুস্তক (ব্যাকরণ) হুগলিতে ছাপা হয়। চার্লস্ উইলকিন্স্ (Charles Wilkins) এই ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পঞ্চানন কর্ম্মকার কাঠের অক্ষরগুলি খোদাই করিয়া দিয়াছিলেন।

১৭৮০—আলিপুরের পুলের নিকট হেষ্টিংস্ ও ফিলিপ্ ফ্রান্সিসের দ্বৈরথ-যুদ্ধ হয়, তাহাতে উভয়ের মধ্যে গুলি চলিয়াছিল এবং ফ্রান্সিস্ অধিকতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ঘোড়দৌড় খেলা এ সময়ে বিশেষ প্রিয় হইয়াছিল। গার্ডেন রিচের নিকট আকরাতে যে ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছিল, সম্ভবতঃ তাহাই প্রথম। কেল্লার সম্মুখে ময়দানে আর একটী ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছিল।

কলিকাতার প্রথম সাপ্তাহিক হিকিস্ বেঙ্গল্ গেজেট্ প্রকাশিত হয়।

বড়দিনের সময় লাটভবনে প্রায় সারাদিনব্যাপী পান-ভোজন ও নৃত্যাদির দ্বারা উৎসব হইত।

১৭৮১—প্রাদেশিক সভা (Provincial Council) উঠাইয়া দিয়া তৎস্থানে কমিটি অব্ রেভিনিউ প্রতিষ্ঠিত হয়।

উইলিয়ম হিকি

হেষ্টিংস দ্বারা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭৮৩—দমদমায় কর্ণেল্ ডফের (Colonel Duff) দ্বারা ক্যাণ্টন্মেণ্ট্ প্রতিষ্ঠিত হয়।

মেজর কির্কপাট্রিক্ (Major Kirkpatrick) দ্বারা হাওড়ায় মিলিটারি অর্ফ্যান্ স্কুল্ স্থাপিত হয়।

১৭৮৪—স্যর উইলিয়ম্ জোন্স দ্বারা এসিয়াটিক্ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

Calcutta Gazette and Oriental Advertiser এর প্রথম সংখ্যা ফ্রান্সিস্ গ্লাডউইন্ (Francis Gladwin) দ্বারা ৪ঠা মার্চ প্রকাশিত হয়।

কাউন্সিলের সদস্য মিঃ হুইলার দ্বারা সেণ্ট্ জন্ গির্জ্জার ভিত্তি স্থাপনা হয়।

১৭৮৫—হায়দর্ নিক্ টাকার্ড্ এ ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস্‌কে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত অধিবাসীরা ১লা ফেব্রুয়ারি এক বিদায় অভিনন্দন প্রদান করেন। এই সভায় মাননীয় চার্ল্‌স্ ষ্টুয়ার্ট্ (Hon'ble Charles Stuart) সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মিঃ দালাস্ (Mr. Dallas) অভিনন্দন পাঠ করিয়াছিলেন।

হেষ্টিংস্ ৮ই ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ করেন এবং তাঁহার স্থানে মিঃ ম্যাক্ফার্সন্ (Mr. Macpherson) নিযুক্ত হন।

দেখা যায় এই সময় গভর্ণমেণ্ট অবিবাহিত অপেক্ষা

বিশপ হিবর

বিবাহিত কর্ম্মচারীদের অধিক পছন্দ করিতেন এবং বিবাহিত সিভিলিয়নদের মাসিক ২০০৲ টাকা অধিক বেতন দিতেন।

কাউন্সিলের শেষ হইলে প্রতি বৎসর ১লা মার্চ্চ ক্যান্সিলর্ হইত।

১৭৮৬—৮ই জুন জেনারেল্ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া খোলা হয়।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ১২ই সেপ্টেম্বর আসিয়া পৌঁছেন এবং গভর্ণর জেনারেল্ ও প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন।

১৭৮৭—সেণ্ট্ জন্ গির্জ্জা ২৩শে জুন উৎসর্গীকৃত হয়।

১৭৮৯—লর্ড কর্ণওয়ালিসের রাজস্ব-বিষয়ক সংস্কার এই বৎসর হইতে আরম্ভ হয়।

১৭৯০—মিঃ কর্ণেল্ লেনক্স (Molonel Lennox) ও মিঃ সুইফ্‌ট (Mr. Swift) উভয়ের সহিত উভয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। ইহাতে শেষোক্ত ব্যক্তি নিহত হন। মিঃ ওয়েব্ (Mr. Webb) নামক এক ব্যক্তি দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত হন বলিয়া জানা যায়।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌কে ৩০০ জন ভদ্রলোক স্বাক্ষরিত একখানি অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়।

১৭৯১—ষ্ট্রাণ্ডরোড্ হইতে চার্চ্চ লেনে টাঁকশাল্

ফ্রান্সিস মিড্‌লটন

উঠিয়া যায়। স্যার রবার্ট্ চেম্বার্স্ প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন।

ফরাসীরা তাঁহাদের জাতীয় পতাকার বর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া লাল, শ্বেত ও নীল হইয়াছে ইহা বৃটিশ্ কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আনেন।

১৭৯২—কলিকাতা প্রেস্ হইতে প্রথম সংস্কৃত গ্রন্থ কালিদাসের 'ঋতুসংহার' প্রকাশিত হয়। উহার মূল্য নির্দ্ধারিত হয় দশ টাকা।

১৭৯৩—লর্ড্ কর্ণওয়ালিস্ ২৮শে অক্টোবর পদত্যাগ করেন এবং তাঁহার স্থানে স্যর্ জন্ শোর নিযুক্ত হন।

বহুবল্ দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।

ব্যাপ্টিষ্ট মিশন্ সোসাইটীর কার্য্য এই বৎসর আরম্ভ হয়।

প্রসিদ্ধ মিশনারি ডাক্তার কেরি ১২ই নভেম্বর কলিকাতায় আসিয়া পৌছেন।

১৭৯৪—দেশীয় অধিবাসীদের জন্ত চিৎপুরে হাঁসপাতাল খোলা হয়।

কলিকাতায় পাথরের রাস্তার প্রথম প্রচলন হয়।

স্যর উইলিয়ম্ জোন্সের মৃত্যু হয়। দক্ষিণ পার্ক্ ষ্ট্রীট্ গোরস্থানে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

কর্ণেল জি, বি, ম্যালিসন

১৭৯৫—খিদিরপুরে কলিকাতার প্রথম ডক্ ওয়াডেল্ (Waddel) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

আলিপুরের সেতুটী ভগ্ন হয়।

১৭৯৬—স্যর জেমস্ ওয়াট্সনের এবং বিচারপতি হাইডের মৃত্যু হয়।

১৭৯৭—পোর্ত্তুগীজ চার্চ্চ ষ্ট্রীটে রোম্যান্ ক্যাথলিক্ গির্জ্জা প্রস্তুত হয়।

১৭৯৮—স্যর জন্ শোর ১২ই মার্চ্চ গভর্ণর জেনারেলের পদ ত্যাগ করেন।

ওয়েলেস্‌লি (Richard Wellesley) লর্ড মর্ণিংটন্ ১৮ই মে কলিকাতায় পৌছেন।

নেটিভ্ হাঁসপাতাল্ কমিটি হাঁসপাতালের জন্ত ধর্ম্মতলা রাস্তার পার্শ্বে একখণ্ড জমি ক্রয় করেন।

রিচার্ড বার ওয়েলেস্‌লি খিদিরপুর হাউস্ বেঙ্গল্ মিলিটারি অর্ফেন সোসাইটী ৭৫০০০৲ টাকায় খরিদ করেন।

১৭৯৯—বর্ত্তমান লাটপ্রাসাদ মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি দ্বারা নির্ম্মিত হয়। জমি খরিদে ব্যয় হয় ৮০০০০৲, বাটী নির্ম্মাণে ১৩ লক্ষ টাকা এবং আসবাব-পত্রে ২০০০০৲ ব্যয় হয়।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঃ

১৮০০—লর্ড ওয়েলেসলির দ্বারা ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং ডাক্তার কেরি বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৮০২—সাগরে সন্তান বিসর্জ্জন আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হয়।

বসন্তের জন্ত টিকা দেওয়া প্রথম আরম্ভ হয়। মিঃ রাসেল্ (William Russell) টিকা দিবার জন্ত প্রথম নিযুক্ত হন।

যুদ্ধশান্তির জন্ত ২৬শে জানুয়ারি কলিকাতায় একটি

বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে নূতন লাট-প্রাসাদে প্রথম মহা ধুমধামের সহিত ভোজ ও নৃত্যগীত হয়।

লর্ড ভ্যালেন্‌সিয়া (Lord Valentia) কলিকাতায় আগমন করেন।

১৮০৬—লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হয়। কলিকাতার অধিবাসীগণ লর্ড লেককে একখানি ১৫০০০৲ টাকা মূল্যের এবং জেনারেল্ ওয়েলেসলি (পরে ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন)কে একখানি ১০০০০৲ টাকা মূল্যের তরবারি উপহার দেন।

১৮০৬—বহুবাজারের ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ্চ নির্ম্মিত হয়। চার্লস্ রায়েন্ (Lieutenant Charles Ryan) লেফ্‌টেন্যাণ্ট কবিকে (Lieutenant Corry) হত্যা করা অপরাধে সুপ্রীম্ কোর্টের বিচারে ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন ও ১০০৲ জরিমানা দেন।

টাউন হল্ নির্ম্মাণার্থ ১২ই ফেব্রুয়ারি গভর্ণমেণ্টের লটারি খেলা হয়।

১৮০৭—লর্ড মিণ্টো ৩১শে জুলাই কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং গভর্ণর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হন।

স্যর চার্লস্ নেপিয়ার

স্যর জন্ লরেন্স্

সাধারণের প্রদত্ত চাঁদায় গভর্ণমেণ্ট-ভবনে লর্ড ওয়েলেসলির প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত হয়।

টলি নালার টোল আদায় গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে আইসে।

১৮০৮—লর্ড ওয়েলেস্‌লি পদত্যাগ করেন এবং লর্ড কর্ণওয়ালিস্ তাঁহার স্থানে আইসেন।

৫ই অক্টোবর লর্ড কর্ণওয়ালিসের গাজিপুরে মৃত্যু হয়। কাউন্সিলের সিনিয়র মেম্বর স্যর জর্জ্জ বার্লো (Sir Geo. Barlow) তাঁহার স্থান গ্রহণ করেন।

জেনারেল্ পোষ্ট অফিস চৌরঙ্গী হইতে ২নং বাকশাল ষ্ট্রীটে উঠিয়া আইসে। তৎপূর্ব্বে উহা ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটে ছিল।

এডোয়ার্ড হল্ (Edward Hall) নামক এক ব্যক্তি ভদ্রমহিলা ও ভদ্র লোকেদের ইংরাজি শিক্ষার জন্য ৩৬ নং বহুবাজারে একটি স্কুল খোলেন।

সুরস্ ব্রম নামক ভবনটীতে এই সময় টাউন্ হলের কাজ হইত।

১৮০৮—সাগর দ্বীপে আলোক স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়।

১৮০৯—মিড্‌লটন্ রোডে সেণ্ট টমাস্ গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়।

দরিদ্র-বন্ধু চার্লস্ ওয়েষ্টনের (Charles Weston) মৃত্যু হয়।

১৮১০—বহুবাজারে রোম্যান্ ক্যাথলিক্ গির্জ্জা প্রতিষ্ঠিত হয়।

সহরতলিতে প্রথম হাউস্ ট্যাক্স স্থাপিত হয়।

১৮১১—যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষার্থী রবিন্‌সন্ (Cadet John Robinson) কেনেডির (Cadet Kennedy) সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধ করেন। এজন্য প্রথমোক্ত যুবককে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

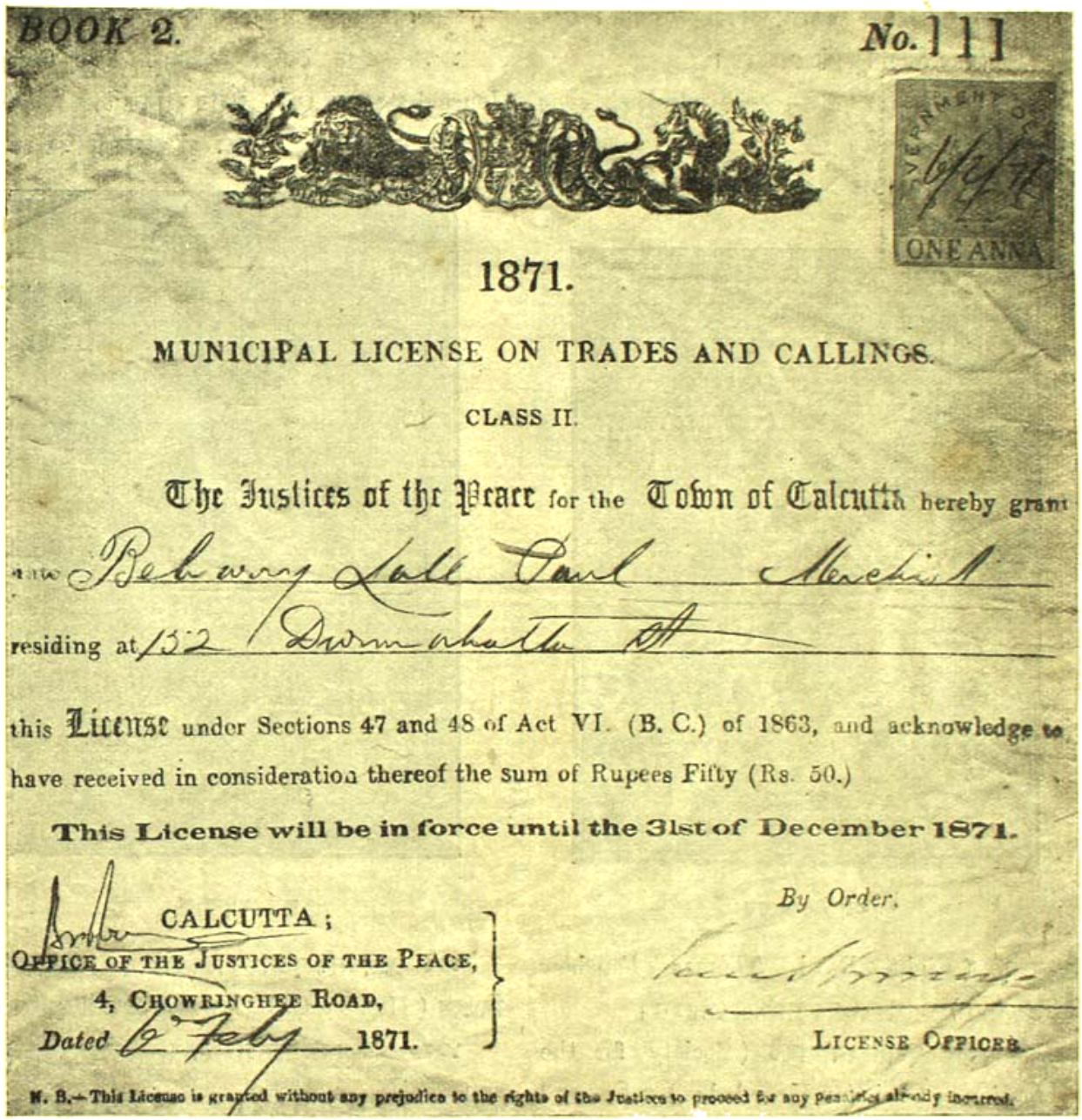

BOOK 2. No. 111

GOVERNMENT OF 1/6/71 ONE ANNA

1871.

MUNICIPAL LICENSE ON TRADES AND CALLINGS.

CLASS II.

The Justices of the Peace for the Town of Calcutta hereby grant unto Behary Lall Paul Merchant residing at 132 Dhurmahatta St this License under Sections 47 and 48 of Act VI. (B. C.) of 1863, and acknowledge to have received in consideration thereof the sum of Rupees Fifty (Rs. 50.)

This License will be in force until the 31st of December 1871.

By Order,

CALCUTTA;
OFFICE OF THE JUSTICES OF THE PEACE,
4, CHOWRINGHEE ROAD,
Dated 6 Feby 1871.

LICENSE OFFICER.

N. B.—This License is granted without any prejudice to the rights of the Justices to proceed for any penalties already incurred.

লাইসেন্সের রসিদ্—১৮৭১ সাল

১লা জানুয়ারি ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গল্ স্থাপিত হয়।

ইংরাজ-সমাজে বিবাহের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া এ সময় ব্যবস্থা ছিল।

বাইবেল্ সোসাইটির (The Calcutta Auxiliary Bible Society) কার্য্য এই বৎসর আরম্ভ হয়।

১৮১২—এথেনিয়াম্ (Athenæum) নামে নূতন থিয়েটার মিঃ মরিশ (Mr. Morris) কর্ত্তৃক সার্কুলার রোডে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮১৩—লর্ড মিণ্টো পদত্যাগ করিয়া দেশে যান।

টাউন্‌হলের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়।

বেঙ্গল্ আর্টিলারির প্রধান কেন্দ্র কলিকাতা হইতে দমদমায় স্থানান্তরিত হয়।

১৮১৪—কলিকাতার প্রথম প্রোটেষ্ট্যাণ্ট্ বিশপ্

রিচার্ড বুশিয়ের

মিড্‌লটন্ (Right Revd. Thomas Fanshaw Middleton) ২৮শে নভেম্বর আসিয়া পৌঁছেন।

এই বৎসর খৃষ্টান সোসাইটি (Society for the Promotion of Christian Knowledge) স্থাপিত হয়।

ওয়াটার্লু বিজয়ের জন্য ১৬ই ডিসেম্বর কলিকাতা আলোকমালার দ্বারা সজ্জিত হয়।

সরকারি আদেশে ৬ই এপ্রেল হইতে কলিকাতা ও ব্যারাকপুরের মধ্যে রাজকীয় ডাকগাড়ির চলাচল আরম্ভ হয়।

১৮১৬—হিন্দুকলেজ্, যাহাকে দেশীয় লোকেরা মহাবিদ্যালয় বলিত, তাহা এই বৎসর প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮১৭—এই বৎসর সেণ্ট্ এণ্ড্রু গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়।

১৮১৮—বাঙ্গালা-সংবাদপত্র "সমাচার দর্পণ" এই বৎসর প্রকাশিত হয়।

কলিকাতার পথে প্রথম জল দেওয়া আরম্ভ হয়।

১৮১৯—প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র The Calcutta Journal প্রকাশিত হয়। উহার মাসিক চাঁদা ছিল ৮৲।

বর্ত্তমান রেস্‌কোর্স্ সম্ভবতঃ এই বৎসর নির্ম্মিত হয়।

লর্ড মেট্‌কাফ্

১২ই ফেব্রুয়ারি নূতন কাষ্টম্ হাউসের ভিত্তিপ্রস্তর মিঃ লিণ্ডসে (Hon'ble C. R. Lindsey) দ্বারা স্থাপিত হয়।

১৮২০—এগ্রিহর্টিকালচার সোসাইটি এই বৎসর স্থাপিত হয়।

সাধারণ ভাবে শোকচিহ্ন ধারণের জন্য এ বৎসর দুইবার আদেশ প্রচার হয়। রাজা তৃতীয় জর্জ্জের মৃত্যুর জন্য ৭ই জুন এবং ডিউক্ অব্ কেণ্টের মৃত্যুর জন্য ৬ই জুন। শেষোক্ত দিনে ৪র্থ জর্জ্জের সিংহাসনারোহণের জন্য তোপ হয়।

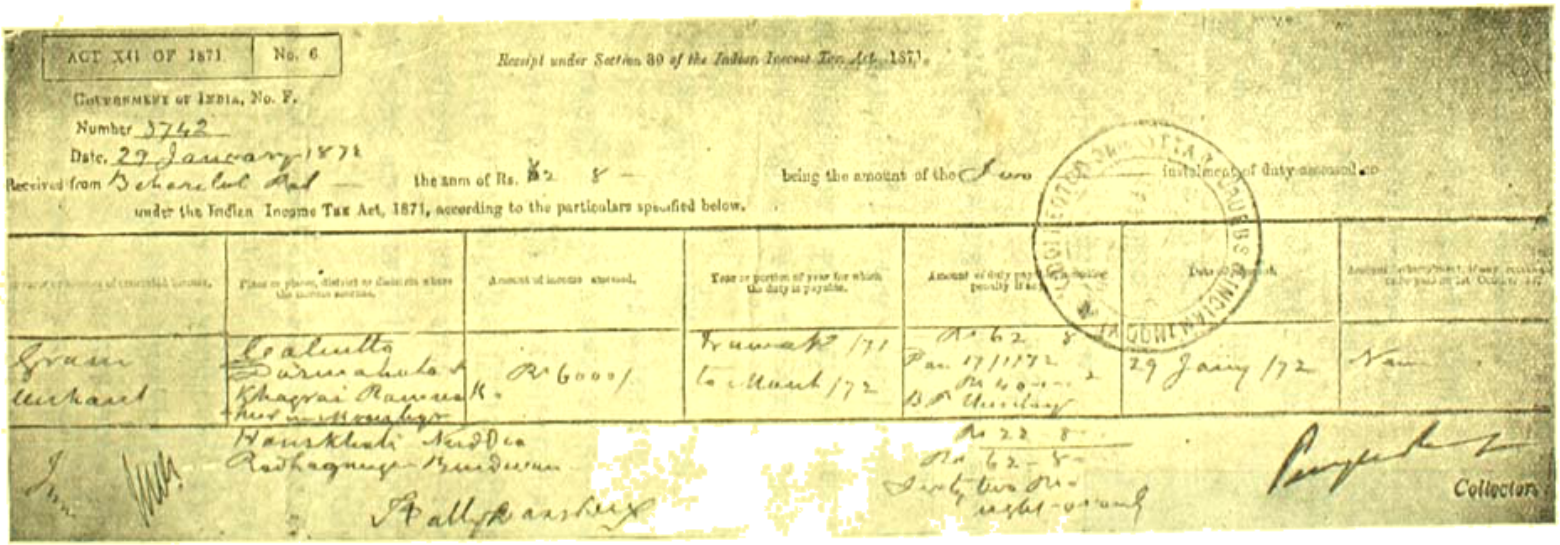

ACT XI OF 1871 | No. 6

Receipt under Section 30 of the Indian Income Tax Act, 1871.

GOVERNMENT OF INDIA, No. F.

Number 3742

Date. 29 January 1872

Received from Beharilal Das the sum of Rs. 62 8 — being the amount of the Two instalment of duty assessed

under the Indian Income Tax Act, 1871, according to the particulars specified below.

	Place or places, district or districts where the income accrues.	Amount of income assessed.	Year or portion of year for which the duty is payable.	Amount of duty payable, exclusive of penalty if any.	Date of Receipt.	
Grain Merchant	Calcutta Burrabazar Khagrai Ramna Hurrimohun	Rs 6000/-	Financial 1871 to March 1872	Rs 62 8 Jan 17/1872 Rs 62-8 By Cheque Rs 62-8 Sicca Rupees	29 January 1872	Nam

Hauskhali Nuddea
Rathagung Burdwan
Ballykanbey

Collector.

ইনকম্ ট্যাক্সের রসিদ—১৮৭১ সাল

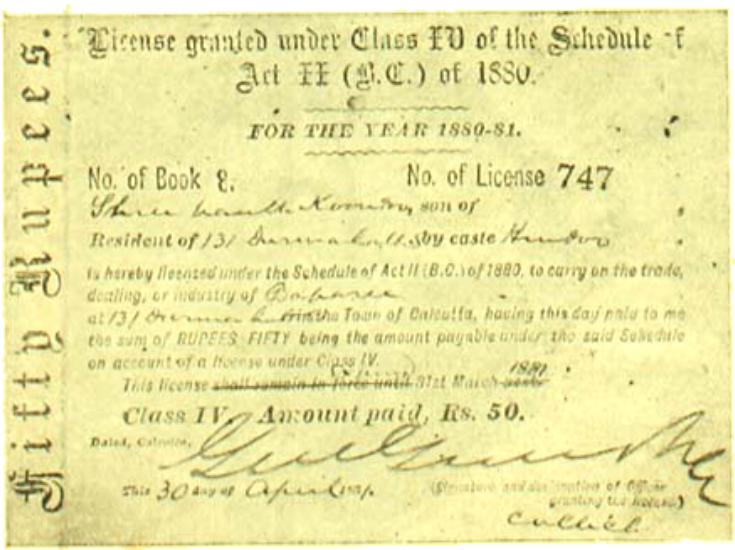

License granted under Class IV of the Schedule of Act II (B.C.) of 1880.

FOR THE YEAR 1880-81.

No. of Book 8. No. of License 747

Shree [illegible] Koondu, son of

Resident of 13/ Durrumhatta by caste Hindoo

is hereby licensed under the Schedule of Act II (B.C.) of 1880, to carry on the trade, dealing, or industry of Bakaree

at 13/ Durrumhatta in the Town of Calcutta, having this day paid to me the sum of RUPEES FIFTY being the amount payable under the said Schedule on account of a license under Class IV. 1880.

This license shall remain in force until 31st March ~~1881~~

Class IV. Amount paid, Rs. 50.

Dated, Calcutta,

This 30 day of April 1880.

(Signature and description of Officer granting the license)

Collector.

লাইসেন্সের রসিদ। ১৮৮০-৮১

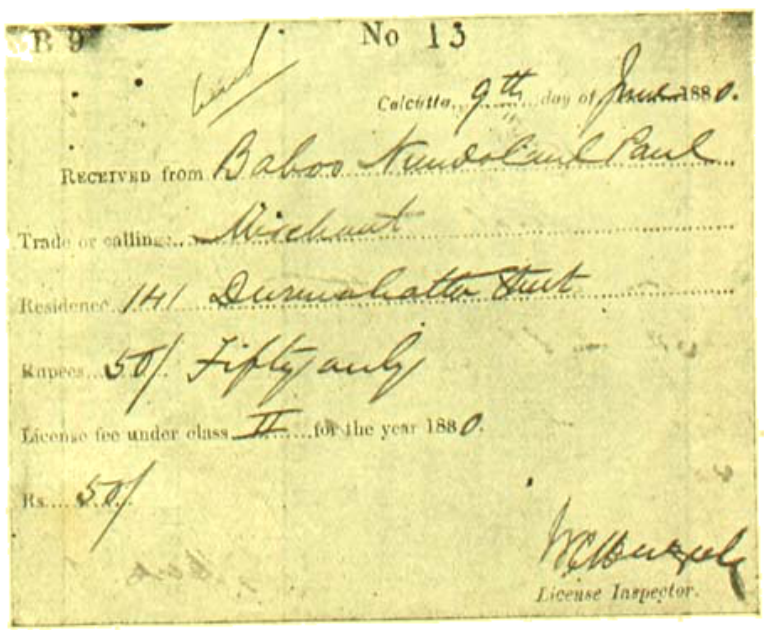

B 9 No 13

Calcutta 9th day of June 1880.

Received from Baboo Nundolal Paul

Trade or calling Merchant

Residence 141 Durrumhatta Street

Rupees 50/ Fifty only

License fee under class IV for the year 1880.

Rs. 50/

License Inspector.

লাইসেন্স ইনস্পেক্টরের রসিদ

১৫ই ডিসেম্বর হাওড়ায় বিশপ্ মিড্‌লটনের দ্বারা বিশপ্ কলেজের বাটীর ভিত্তি-স্থাপন হয়। মিঃ জোন্স (Mr Jones) এই বাটী নির্ম্মাণ করেন।

খিদিরপুরের পুল

কলিকাতায় ভয়ানক কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়।

১৮২১—ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে ইউনিয়ন্ চ্যাপেল্ নির্ম্মিত হয়।

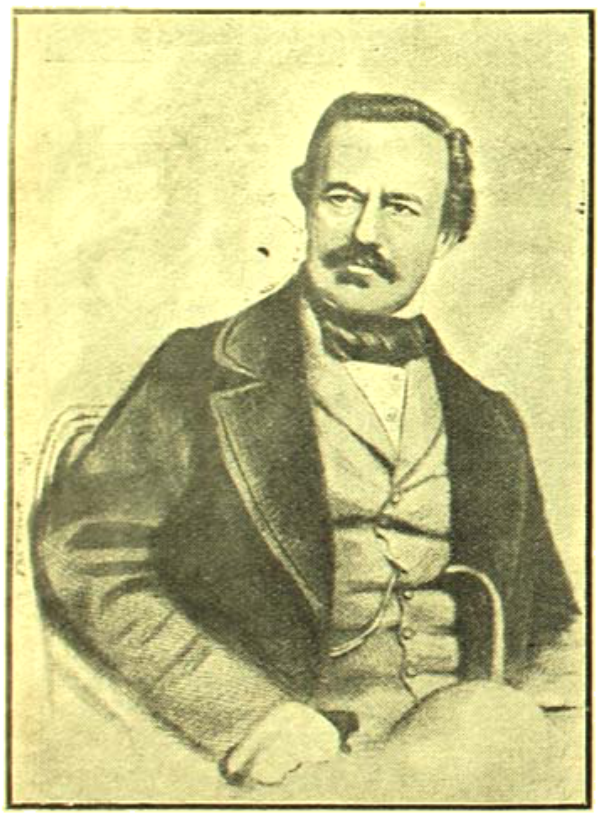

স্যর জেমস্ উট্‌রাম্

এই বৎসর কলিকাতার পথঘাটের বহুল উন্নতি সাধন করা হয়।

১৮২২—বিশপ্ মিড্‌লটনের ৮ই জুলাই মৃত্যু হয়। প্রথম আচ ডিকন্ লয়েড্ লরিং (Revd. Henry Lloyd Loring) ৪ঠা সেপ্টেম্বর মারা যান।

কলিকাতার অধিবাসীবৃন্দ লর্ড ও লেডি হেষ্টিংস্‌কে একটি সাধারণ ভোজ দ্বারা ও অভিনন্দন দিয়া সম্বর্দ্ধিত করেন।

১৮২৩—লর্ড হেষ্টিংস্ জানুয়ারি মাসে এদেশ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করেন। জন এ্যাডাম্‌স্ (John Adams, Esq) লর্ড আমহার্ষ্টের না আসা পর্য্যন্ত তাঁহার স্থানে কার্য্য করেন।

লর্ড আমহার্ষ্ট ১লা আগষ্ট আসিয়া পৌছেন।

সেপ্টেম্বর মাসে ভীষণ বন্যা ও মে মাসে ভীষণ বাত্যাবর্ত্তে সহরের অনেক ক্ষতি হয়।

জন্ উইলিয়ম্ রিকেট্ (John William Ricketts) দ্বারা পেরেণ্টাল্ একেডেমি নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

"ডায়না" নামক কলের জাহাজখানি প্রথম নদীতে ব্যবহৃত হয়।

বিশপ্ হিবার ১০ই অক্টোবর আইসেন এবং পরদিন তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

১৮২৪—সংস্কৃত কলেজ এই বৎসর প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রধান বিচারপতি স্যর ফ্রষ্টোফার হুলারের মৃত্যু হয়।

পোর্ত্তুগিজ ব্যবসায়ী জোসেপ্ বোরেটোর মৃত্যু হয়।

১৮২৫—প্রথম কলের জাহাজ, এণ্টারপ্রাইজ্ প্রায় চারি মাসের পর ৮ই ডিসেম্বর ইংলণ্ড হইতে সাগরে আসিয়া পৌছে।

স্যর ডেভিড্ অক্টার্লনীর (Sir David Ochterlony) মৃত্যু হয় এবং তাঁহার সম্মানার্থ চার্লস্ মেট্‌কাফের সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভা হয় এবং সাধারণের চাঁদায় ময়দানে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ একটি মনুমেণ্ট্ নির্ম্মিত হয়।

বিশপ্ হিবারের মৃত্যু হয়।

১৮২৬—রাজা বৈদ্যনাথ রায় দেশীয় মহিলাদের শিক্ষার জন্য ২০০০০৲ টাকা দান করেন। কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ারে তাঁহাদের শিক্ষামন্দির নির্ম্মাণের জন্য ১৮ই মে ভিত্তি-স্থাপন হয়।

১৮২৭—ভারতীয়েরা প্রথম জুরীরূপে বসিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়।

১৮ই জানুয়ারি কলিকাতায় তৃতীয় বিশপ্ টমাস্ জেমস্ (Right Revd. John Thomas James) আগমন করেন।

১৮২৮—লর্ড আমহার্ষ্ট অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন এবং লর্ড ইউলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ ৪ঠা জুলাই আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

বিশপ্ জেমস্ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যান।

১৮২৯—সে উ লি য়া দে র সুবিধার্থ আইন প্রণীত হয়।

ইয়োরোপীয়রা এ-দেশে নিজ নামে যাইট বৎসরের জন্য জমি রাখিবার অধিকার প্রাপ্ত হন।

কলিকাতার চতুর্থ বিশপ মাথিয়া টার্ণার (Right Revd. John Mathias Turner D. D.) বৎসরের শেষভাগে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন।

সহমরণ-প্রথা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হয়।

১৮৩০—বিশপ্ টার্ণারের উদ্যোগে ডিরীষ্ট্ চ্যারিটেবল্ সোসায়িটি স্থাপিত হয়। প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী পামার কোম্পানী দেউলিয়া হন।

রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৩১—রাজা রামমোহন রায় বিলাত যাত্রা করেন।

এলেকজেণ্ডার কোম্পানী নামে এক বড় ব্যবসায়ী ফার্ম্ম দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত হন।

১৮৩২—২৯শে জুলাই কোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গের মধ্যে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়।

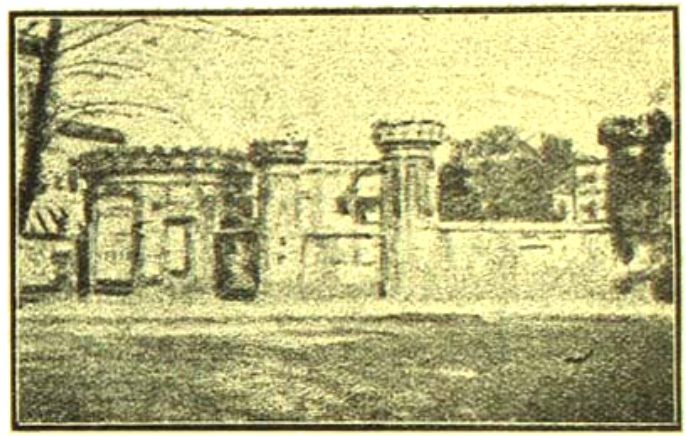

ডভটন্ কলেজ

দেওয়ানি মোকদ্দমায় জুরির দ্বারা বিচার বিধিবদ্ধ করাইবার জন্য বিলাতের সভায় আবেদনার্থ ডেভিড্ হেয়ারের সভাপতিত্বে ১৪ই এপ্রেল্ টাউনহলে এক বিরাট সভা হয়।*

* এই প্রবন্ধে একখানি গ্রন্থ হইতেই বিশেষ ঘটনাগুলির কথা লিখিত হইয়াছে।

বন্যা

শ্রীসীতাদেবী বি-এ

(৩)

শ্রাবণের সন্ধ্যা নিবিড় হইয়া গ্রামটিকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। বিজয় নদের ভৈরব গর্জ্জন ভিন্ন, আর কোনো শব্দ কাণে আসে না। গ্রামের মানুষ ভীত, সন্ত্রস্ত,—কখন না জানি নদের করাল ক্ষুধা জাগিয়া উঠিয়া, ছোট গ্রামখানিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। কাজকর্ম্ম সারিয়া, যে যাহার ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে,—বাহিরের প্রকৃতির বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তিকে তাহারা দেখিতে ভরসা পাইতেছে না। এই সামান্য মাটির এবং বেড়ার দেওয়াল যেন কত বড় আশ্রয়,—ইহারই পরপারে জগতের সব দুঃখ-ভয় যেন তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

কিন্তু এমন দুর্য্যোগের দিনেও একটি মানুষ ঘরের বাহিরে ছিলেন। তাহাও আবার অন্য কোথাও নয়, বিজয় নদের ধারেই দাঁড়াইয়া। সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মুখশ্রী পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল না; কিন্তু মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের তীব্র আলোক তাঁহার মুখের উপর খেলিয়া যাইতেছিল; তাহাতে বুঝা যাইতেছিল, সে মুখ কি দারুণ উদ্বেগ-পীড়িত, কি চিন্তাকুল! নদের জলরাশি এখন অনেকখানি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে;—পূর্ব্বে যেখানে জেলে ও মাঝিদের ঘর ছিল, এখন সেগুলির চিহ্নও নাই। খেয়া নৌকার ঘাটটিও অদৃশ্য হইয়াছে। প্রচণ্ড জলস্রোত যেখান দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার দুই তীরের তটভূমি যেন ভয়ে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া মহাশব্দে বড় বড় মাটির চাপ ভাঙিয়া পড়িয়া নদের গর্ভে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে।

প্রৌঢ় প্রতুলচন্দ্র। সুবর্ণর বিবাহের পর পাঁচ বৎসর প্রায় কাটিয়া গিয়াছে,—তাহার ভিতর তিনি আর গ্রামে আসেন নাই। তিনি রাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার পর, তাঁহার জননী আর সংসারে বাস করিতে না চাহিয়া, কাশী চলিয়া যান। সেইখানে বৎসর দুই আগে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। নারায়ণী মধ্যে মধ্যে শাশুড়ীর কাছে থাকিতেন, মধ্যে মধ্যে নিজের বাপের বাড়ীতেও থাকিতেন। তবে বৎসরের ভিতর কয়েকটা মাস অন্ততঃ জামাইয়ের বাড়ীতে কাটাইয়া যাইতেন; কারণ, এখানে না থাকিলে মেয়ের কোনোই খোঁজ খবর পাওয়া যাইত না। একলা এক বাড়ীতে মেয়েমানুষের বাস করা কঠিন,—তাই এখানে থাকায় তাঁহার অসুবিধা ছিল। তবু মেয়ের মায়া কাটাইতে পারিতেন না। কখনও নিজের বিধবা ভগ্নীকে লইয়া আসিতেন, কখনও একলাই থাকিতেন।

শরীর তাঁহার ক্রমেই ভাঙিয়া পড়িতেছিল। স্বামীর দারুণ ঘৃণা এবং বিরাগ তাঁহার হৃদয়ে শেলের মত ফুটিয়া ছিল। যে সংসার ভাল করিয়া বাঁধিবার জন্য তিনি স্বামীর অতখানি বিপক্ষতা করিয়াছিলেন, সেই সংসারেও যেন সুবর্ণর বিবাহের পর হইতেই ভাঙন্ ধরিল। স্বামী গৃহত্যাগ করিলেন, শাশুড়ী কাশীবাসিনী হইলেন। মেয়েও চিরদিনের মত কোলছাড়া হইয়া গেল। নারায়ণীর আশা ছিল মেয়ের বিবাহ দিয়া, জামাতাটিকেও পুত্ররূপে পাইবেন, কিন্তু সে আশায় একেবারে ছাই পড়িল। বিবাহের পর বছর দুই মাত্র সুবর্ণ মায়ের কাছে ছিল, তাহার পর শাশুড়ী তাহাকে আর রাখিতে রাজী হইলেননা। নারায়ণী মেয়ে বড় ছোট বলিয়া অস্ফুট আপত্তি করাতে, নিস্তারিণী ঠাকুরাণী বলিলেন, "তা একেবারে ধিঙ্গী করে মেয়ে দিতে চায় নাকি? তখন আর বাগ মানবে? অত-সব আমার কাছে চল্‌বেনা বাপু। আমরাও ত ন বছর বয়সে শ্বশুরঘর করতে এসেছি, কই মারা ত পড়িনি?"

তাহার পর এই আড়াই বৎসর, হাজার সাধ্য-সাধনা, অনুনয়-বিনয় করিয়াও সুবর্ণকে তিনি কাছে আনাইতে পারেন নাই। চিঠি লিখিলে কোনও উত্তর পাইতেননা। লোক পাঠাইলে, দুদণ্ড পরেই তাহারা ফিরিয়া আসিত; বলিত মেয়েকে দেখিয়া আসিয়াছে বটে, তেহারা বিশেষ

ভাল নাই। কথাবার্ত্তা বলিবার কোনো সুযোগ পাওয়া যায়না; শাশুড়ী, ননদ পাহারা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। নারায়ণী কাঁদিয়া বুক ভাসাইতেন; সহায়হীনা হিন্দুকুলবধূ তাঁহার আর কোন উপায় ছিলনা। প্রতুলচন্দ্র স্ত্রীর কোনও খবরই লইতেন না, মধ্যে মধ্যে শুধু খরচের টাকা পাঠাইয়া দিতেন। তিনি যে অশুভ ভবিষ্যৎ-বাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিতে বসিয়াছিল। নারায়ণীর সকল দর্প চূর্ণ হইয়াছিল,—মেয়ের দারুণ অকল্যাণ নিজের বুদ্ধির দোষে ঘটাইয়াছেন, এই চিন্তা বৃশ্চিক দংশনের মত নিয়ত তাঁহাকে যন্ত্রণা দিত। স্বামীর কাছে দুঃখের কাহিনী জানাইবার তাঁহার মুখ ছিলনা।

ধীরে ধীরে নিজে যে মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হইতেছেন, তাহা বুঝিতেই পারিয়াছিলেন। নিজের বোনকে অনেক লেখালিখি করিয়া আনাইয়াছিলেন। নিরানন্দ গৃহে দুইটি স্ত্রীলোকের দিন নিতান্তই বৈচিত্র্যহীনভাবে কাটিয়া যাইত। সুবর্ণকে আনাইবার জন্য চিঠির উপর চিঠি লিখিতেন, কোনো সাড়াশব্দ পাইতেননা। নিজে যে বেশী দিন বাঁচিবেননা, কন্যার মুখ না দেখিয়াই তাঁহাকে মরিতে হইবে, এই ব্যথা এখন তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অসহনীয় হইয়াছিল। কিন্তু কাহার কাছে আর তিনি দুঃখ জানাইবেন?

শেষে একেবারে তিনি শয্যাগ্রহণ করিলেন। বর্ষার হাওয়ায় তাঁহার রোগ যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। তাঁহার ভগিনীর আর একলা তাঁহাকে লইয়া থাকিতে ভরসা হইলনা। কোথা দিয়া একটা কি ভালমন্দ হইয়া যাইবে, পরে তিনি নিমিত্তের ভাগী হইবেন। তাহার চেয়ে, যাহার জিনিষ, সে আসিয়া বুঝিয়া লউক। প্রতুলচন্দ্রকে নারায়ণীর অসুখের খবর দিয়া, অনেক করিয়া বুঝাইয়া তিনি আসিবার জন্য চিঠি লিখিয়া দিলেন।

কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। তাহার পর একদিন বিনা খবরেই প্রতুল হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারায়ণীর দিদি রান্নাঘরে বসিয়া দুধ জাল দিতেছিলেন; ভগ্নীপতিকে দেখিয়া, আর সাম্‌লাইতে না পারিয়া, উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

প্রতুলচন্দ্র ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার কি বড় বেশী দেরি হয়ে গেছে?"

বিগলা স্খলিকা কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিলেন "শুধু তোমার দেখবার আশায় প্রাণটা এখনও বেরোয়নি ভাই, নইলে আর কিছু নেই।"

প্রতুলচন্দ্র চৌকাঠের উপর বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুকি আসেনি?"

নারায়ণীর দিদি বলিলেন "না, তাকে পাঠায়নি। তোমায় ত আমাদের বলবার মুখ নেই ভাই, কিন্তু তুমি বিদ্বান মানুষ ঠিক বুঝেছিলে। মানুষের হাতে ত তাকে দেয়নি, কশাইয়ের হাতে দিয়েছে।"

প্রতুলচন্দ্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর নিজের স্যুটকেস্‌টা হাতে করিয়া শয়নকক্ষে গিয়া ঢুকিলেন। নারায়ণী কথাবার্ত্তার শব্দে বুঝিয়াছিলেন, স্বামী আসিয়াছেন। সমস্ত হৃদয়ের আগ্রহ দুই চক্ষে ভরিয়া তিনি দরজার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া তাঁহার পাংশুবর্ণ মুখে একঝলক রক্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাহার পরই আবার তিনি বিছানার উপর এলাইয়া পড়িলেন।

প্রতুলচন্দ্র বিছানার উপর বসিয়া স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন "এখন কেমন আছ?"

নারায়ণী দুই হাতে স্বামীর একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "তুমি একবার মুখ ফুটে বল আমায় ক্ষমা করেছ, তাহলে আমি নিশ্চিন্ত মন নিয়ে যেতে পারব। আর আমার কিছু চাইনা।"

প্রতুলচন্দ্র সজলচক্ষে বলিলেন "যাবে কেন? তোমার কি যাবার বয়স হয়েছে? তোমাকে আমরা সারিয়ে তুলব।"

নারায়ণী বলিলেন, "আর পারবেনা। বুকের ভিতর ছেঁদা হয়ে গেছে। যে পাপ নিজে করেছি, তাতে নিজে পুড়ে মরলাম বলে দুঃখ নেই, কিন্তু মেয়েটাকেও বলি দিলাম। তাকে তুমি দেখো,—মায়ের দোষে মেয়েটাকে অকূলে ভাসাইওনা।"

প্রতুলচন্দ্র দেখিলেন, পত্নী নারায়ণী উত্তেজনায় হাঁফাইতেছেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে ভাল করিয়া শোয়াইয়া দিয়া বলিলেন, "থাক এখন ও-সব কথা। তুমি ভাল হও, তারপর সব ব্যবস্থা হবে। মেয়ের জন্যে ভেবোনা, আমি এখনি তাকে আন্‌বার জন্যে চিঠি লিখে লোক পাঠাচ্ছি।" নারায়ণী কি যেন বলিতে গেলেন, কিন্তু

প্রতুলচন্দ্র তাঁহাকে হাতের ইঙ্গিতে কথা বলিতে বারণ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

স্ত্রীর অসুখের খবর দিয়া, অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তিনি বেয়ান ঠাকুরাণীকে পত্র লিখিলেন। পত্রবাহকের সঙ্গে সুবর্ণকে যেন অবিলম্বে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহার মা তাহাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া আছেন। জামাতাও আসিতে পারিলে অত্যন্ত খুসি হইবেন, তাহাও লিখিলেন।

বিশ্বস্ত একজন লোকের হাতে পত্র দিয়া নৌকাযোগে তিনি তখনই রওয়ানা করিয়া দিলেন। তাহার পর নারায়ণীর পাশে আবার গিয়া বসিলেন। শালিকার অনুরোধে নাওয়া খাওয়া একরকম করিয়া সারিয়া লইলেন, কিন্তু কোনো কিছুতে আর তাঁহার রুচি ছিলনা! নারায়ণীর অস্থিরতা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছিল, ক্রমাগত মেয়ের নাম করিয়া তিনি কাতরোক্তি করিতেছিলেন। প্রতুলচন্দ্র আর সান্ত্বনা দিবার কোনো কথা খুঁজিয়া পাইতেছিলেননা,—স্ত্রীর হাত ধরিয়া নীরবে বসিয়া ছিলেন।

বিকাল হইয়া আসিল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে আলোর চিহ্ন প্রায় সম্পূর্ণ মুছিয়া আসিল! বাতাসের শব্দ আরো ভীষণতর হইল, বিজয় নদের গর্জ্জন আরো বাড়িয়া উঠিল। নারায়ণী আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিলেন, "মেয়েটাকে দিলে না গো তারা, ওকে একবার চোখের দেখাও দেখতে পেলাম না?"

প্রতুলচন্দ্র অস্থির হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। শালিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দিদি, একবার বসুন, এই ঘরে। একবার ঘুরে দেখে আসি, হারাণ ফিরল কিনা।"

নারায়ণীর দিদি ঘরে আসিয়া বসিলেন, প্রতুলচন্দ্র বাহির হইয়া গেলেন। বহুক্ষণ অন্ধকার নদের তীরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কোথাও নৌকার চিহ্ন নাই, খালি জলরাশি ভৈরব কল্লোল করিয়া ছুটিয়া চলিতেছে। চারিদিকে কেবল ধ্বংসের লীলা, রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্যে ধরণী যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। মৃত্যুশয্যাশায়িনী স্ত্রীর নিকট ফিরিবার জন্য তাঁহার মন ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, কিন্তু কোনো সংবাদ না লইয়া তিনি ফিরিবেন কি প্রকারে? সেই চোখ দুটির আকুল আগ্রহের তিনি কি প্রত্যুত্তর দিবেন? দুইবার চলিয়া যাইবার জন্য কয়েক পা অগ্রসর হইয়াও তিনি আবার ফিরিয়া আসিলেন।

অবশেষে কালো জলের উপর শাদা কি যেন একটা দেখা দিল, ক্রমেই জামরালের তটভূমির দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। প্রতুলচন্দ্র তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন, নৌকাই বটে। তাঁহার বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল, হয়ত এতদিন পরে একমাত্র সন্তানকে দেখিতে পাইবেন।

কিন্তু নৌকা কাছে আসিতেই, তাঁহার সকল আশা যেন কাহার নিষ্ঠুর ফুৎকারে নিভিয়া গেল। নৌকার ভিতর হারান একলা বসিয়া,—হাতে তাহার একখানা চিঠি,—মুখ গম্ভীর, বিষণ্ণ।

হারান নামিতেই প্রতুলচন্দ্র হতাশাপূর্ণ সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাঠালে না হারান?"

হারান চিঠিখানা তাঁহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল "এই নেন্ চিঠি কত্তা। ভ্যালা কুটুমবাড়ী আমার পাঠিয়েছিলেন। ওরা আবার ভদ্দর লোক। না বল্‌লে একবার বস্‌তে, না দিলে এক গেলাশ জল খেতে। দিদির সঙ্গে কথা শুদ্ধ কইতে দিলনা। দেখলাম খালি দূরে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। আপনার বেয়ান, মাপ করবেন কত্তা, ঠিক যেন রায়বাঘিনী! ভদ্দর লোকের ঘরে এমন গলা কখনও শুনিনি। ছোট লোকের ঘরে শোনা যায় বটে। মা ঠাকরুণের অসুখের কথা বল্‌লাম, তা বল্‌লে, 'অমন অসুখ সকলের করে। ও সব মেয়ে নিয়ে যাবার ছল।'"

প্রতুলচন্দ্র হারানের কথায় বড় একটা কান দিতেছিলেননা। মহামান্যা বেয়ান ঠাকুরাণীর চিঠি পড়িতেই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। হাতের লেখা বেশ পাকা, বুঝিলেন জামাতা বাবাজীই মায়ের জবানীতে এই সুমধুর পত্রখানি লিখিয়া দিয়াছেন। চিঠিখানি এইরূপ।—

মহেকসমরেষু,

ভাটগ্রামের গুহদের বৌদের সেই বংশের সপ্তম রাখিয়া চলিতে হয়। তাহারা জামরালের প্রতুলচন্দ্র মিত্রের প্রজা নয় যে লোক পাঠাইয়া তলব করিবামাত্র সদরে গিয়া হাজির হইবে। কন্যাকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা হয়, স্বয়ং আসিবেন। তখন বিবেচনা করিয়া দেখিব। কথা দিতে অবশ্য পারিনা। ছেলে কলেজের পরীক্ষার পর, ছুটিতে কয়েক দিনের জন্য মাত্র বাড়ীতে আসিয়াছে। বিবাহের পর বধূর সঙ্গে এই তাহার প্রথম সাক্ষাৎ।

আশা করি বেহানের অসুস্থতাটা মেয়েকে লইয়া যাইবার ওজর মাত্র।

ইতি

শ্রীবিলাসের মাতা।

প্রতুলচন্দ্র চিঠি হাতে করিয়া কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিলেন। তাঁহার পা যেন চলিতে চাহিতেছিলনা, নিতান্ত মনের বলে তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন। মৃত্যু-শয্যাশায়িনী পত্নীকে তিনি বলিবেন কি? নিতান্ত মেয়ের দেখা পাইবার জন্যই সে এখন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে। একমাত্র সন্তান, তাহার অদৃষ্টলিপি এই! প্রতুলচন্দ্রের যত আশা আকাঙ্ক্ষা এই মেয়েটিকে ঘিরিয়া ছিল; আর আজ তাহার দশা কি? সমাজের নিষ্ঠুরতার যজ্ঞে সে বলির পশু মাত্র। স্ত্রীর বিরুদ্ধে তাঁহার সমস্ত অন্তর একবার বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। কিন্তু সে ত মরিতে বসিয়াছে, কি লাভ তাহার উপর রাগ করিয়া? পার্থিব দুঃখ-শোক, রাগ-অভিমান, সকলই এখন তাহার কাছে মিথ্যা।

প্রতুলচন্দ্র বাড়ীতে ঢুকিলেন। নারায়ণীর দিদি ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিলেন, "মেয়ের কোনো খোঁজ পেলে?"

প্রতুলচন্দ্র সংক্ষেপে বলিলেন, "তারা পাঠাবেনা।" ঘরের ভিতর অস্ফুট আর্ত্তনাদ শোনা গেল। প্রতুলচন্দ্র তাড়াতাড়ি ছুটিয়া নারায়ণীর বিছানার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। নারায়ণী বালিশে ভর দিয়া উঁচু হইয়া বসিয়া হাঁফাইতেছেন, বক্ষের অস্থিগুলি পর্য্যন্ত যেন নিঃশ্বাসের বেগে দুলিয়া উঠিতেছে, চক্ষু একেবারে ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া আসিতে চায়।

স্বামীকে দেখিয়া তিনি বলিলেন "ওগো, তুমি নিয়ে যাও। তাহলে ওরা পাঠাবে, 'না' করতে পারবেনা।"

প্রতুলচন্দ্র দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন "আমি যাবনা।"

নারায়ণী কাঁদিয়া বলিলেন, "এই শেষ ভিক্ষা, আর ত কখনও কিছু চাইবনা।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "তোমাকে এই অবস্থায় রেখে যাওয়া কখনও সম্ভব? ফিরে এসে আর তোমাকে দেখতে পাব?"

নারায়ণী ভাঙ্গা গলায় বলিলেন, "পাবে গো পাবে। বাছার মুখখানি একবার না দেখে আমি মরতে পারবনা।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "বেশ, তবে তাই যাচ্ছি। কিন্তু কি রকম রাত্রি দেখছ ত? আর বিষয়ের ডাক এখান থেকে শোনা যাচ্ছে। মোচার খোলায় মত নৌকায় নদ পার হওয়া এখন সম্ভব হবে?"

নারায়ণী অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন "কাল ভোর-বেলা।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "দেখা যাক।" ঘরের ভিতর তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

রাত্রি গভীরতর হইয়া আসিতে লাগিল। রোগিণীর ঘরে একটি আলো জ্বলিতেছে, রন্ধনশালায় আর একটি। আর চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার, আলোর লেশ মাত্র নাই। বিজয় নদের ক্রুদ্ধ গর্জ্জন দানবের হুঙ্কারের মত শুনাইতেছে। প্রতুলচন্দ্র প্রস্তরের মূর্ত্তির মত বসিয়া আছেন। নারায়ণীর দিদি অস্থিরভাবে কেবল ঘর আর বাহির করিতেছেন, ভগিনীর নিকট বসিতে প্রাণে ভরসা পাইতেছেননা। তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলেই ভয়ে তাঁহার অর্দ্ধেক প্রাণ উড়িয়া যাইতেছে।

হঠাৎ বাহিরের দরজায় সজোরে কে ধাক্কা দিল। প্রতুলচন্দ্র চমকিয়া উঠিয়া পড়িলেন, ভালিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আলোটা ধরুন ত দেখি কে এল এমন দুর্য্যোগে।"

বিধবা আলো লইয়া ব্যস্ত হইয়া আগাইয়া আসিলেন। প্রতুলচন্দ্র দরজা খুলিতেই একটি ক্ষীণকায়া বালিকামূর্ত্তি তাঁহার পায়ের কাছে আছড়াইয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "মা আছে ত?"

প্রতুলচন্দ্র মেয়ের দিকে তীক্ষ্ণ, তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন। এই নাকি সুবর্ণ? এই তাঁর সেই আদরিণী মেয়ে? কিন্তু মেয়ে তখনও শঙ্কাকুল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। প্রতুলচন্দ্র গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ, আছেন। চল, ঘরে চল।"

দরজার বাহিরে মাঝি একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন উঁচু করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; সে মিনতির সুরে বলিল "কত্তা আমার ভাড়াটা?"

প্রতুলচন্দ্র পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া মাঝির সম্মুখে ছুড়িয়া দিলেন। সে চলিয়া গেল।

সুবর্ণ পিতার পিছন পিছন মায়ের ঘরে গিয়া ঢুকিল। নারায়ণী উত্তেজনার বশে একেবারে খাড়া হইয়া বসিলেন, হাত বাড়াইয়া ডাকিলেন "আয় মা আয়!"

মেয়ে ছুটিয়া গিয়া মায়ের বুকের উপর পড়িল। নারায়ণীর সমস্ত শরীর একবার কাঁপিয়া উঠিল, তাহার পর তাঁহার সংজ্ঞাহীন দেহ আবার শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। প্রতুলচন্দ্র তাড়াতাড়ি সুবর্ণকে টানিয়া সরাইয়া দিলেন। সুবর্ণর মাসীমা আলোটা লইয়া দৌড়াইয়া আসিলেন, ব্যগ্রভাবে বলিলেন "কি হল ভাই, দেখ ত ভাল করে, মূর্চ্ছা গেল নাকি?"

প্রতুলচন্দ্র স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইলেন, একবার নাড়ী দেখিলেন এবং বক্ষস্থলে হাত দিয়া পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর বিছানা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন।

সুবর্ণ হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নারায়ণীর মূর্চ্ছা আর ভাঙিলনা!

(৪)

প্রতুলচন্দ্রের সংসার ভাঙিয়া গেল, কিন্তু কালের স্রোত এক মুহূর্ত্তের জন্যও সংহত হইলনা। মানুষের জন্মমৃত্যু এই স্রোতে ঢেউয়ের মত উঠে পড়ে রাত্রিদিন, কেই বা তাহার খবর লইতে যায়।

তিনটা দিন কাটিয়া গেল। বাড়ীর ভিতর তিনটি যে মানুষ, তাহারা নিজে নিজেকে লইয়া বিব্রত, অন্যের খবর বড় একটা লয়না। সুবর্ণ দিনরাত কাঁদে, চীৎকার করে, মায়ের ঘরের চৌকাঠের উপর গিয়া মাথা কোটে। পাড়ার মেয়েরা মাঝেমধ্যে আসে; তাহারাই উহাকে ধরিয়া তোলে, স্নানাহার করায়, সান্ত্বনা দেয়। নারায়ণীর দিদি কেঁদার ভাগসময় মুড়ি-মুড়কি দিয়া এক কোণে বসিয়া থাকেন। স্নানাহারের প্রবৃত্তিও তাঁহার নাই। মালা লইয়া জপ করেন, প্রতিবেশিনীদের কাছে গলা ছাড়িয়া কাঁদেন, আবার কত শীঘ্র এই শোকাচ্ছন্ন গৃহ ছাড়িয়া নিজের বাড়ী ফিরিতে পারিবেন, তাহার জল্পনা কল্পনাও করেন। প্রতুলচন্দ্র কি যে ভাবেন, কেহ তাহার খবর পায়না। তাঁহার কেহ বন্ধু নাই, সাথী নাই। শূন্য গৃহে নিরানন্দ দিন কোনোমতে কাটিয়া যায়। পড়াশুনা লইয়া থাকিবার চেষ্টা করেন, মাঝে মাঝে তীব্র দৃষ্টিতে কন্যার দিকে তাকান, আবার তখনই চোখ ফিরাইয়া লন। সুবর্ণকে দেখিলে তাঁহার বুকের ভিতর পর্য্যন্ত জ্বালা করে। কি ছিল কি হইয়াছে। তাহার সে রূপ কোথায়, যাহা দেখিয়া পিতামহী আদর করিয়া সুবর্ণ নাম দিয়াছিলেন? এই মেয়েকে জ্ঞানে গুণে কত মহিয়সী করিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল। আর সে কি হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তাহার না আছে স্বাস্থ্য, না আছে শিক্ষা, না আছে মানসিক বল। নিতান্ত উৎপীড়িত হইলে আর্ত্তনাদ করে, না হইলে মুখ বুজিয়া নির্য্যাতন সহ্য করে, এই তাহার জীবনযাত্রা। দৈব বলিতে কি বুঝায়, তাহা সে খানিক খানিক জানে; পুরুষকার বলিতে কি বোঝায়, তাহা বোধ হয় কর্ণে কখনও শোনে নাই। প্রতুলচন্দ্রের কন্যা এই হইয়াছে, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই-ই থাকিবে বোধ হয়। ভিত্তির অবস্থা এমন যখন, তখন তাহার উপর কোথা হইতে আকাশস্পর্শী সৌধ গঠিত হইবে?

চতুর্থ দিনের দিন সুবর্ণ চোখ মেলিয়া চাহিবামাত্র তাহার মাসীমা বলিলেন, "আর ত এ রকম করে পড়ে থাকলে চলেনা বাছা। সবই ত করতে হবে? আজই ত চতুর্থী, তুই একমাত্র সন্তান, মায়ের কাজটাও ত তোকে করতে হয়।"

সুবর্ণ হতাশভাবে তাকাইয়া বলিল "কোথা দিয়ে, কি হবে মাসিমা, আমি ত কুল খুঁজে পাইনা। আমার হাতে ত একটা পয়সা পর্য্যন্ত নেই।"

মাসিমা বলিলেন, "শোনো কথা। তোমায় কেউ কি দানসাগর করতে বলছে, বৃষোৎসর্গ করতে বলছে? যা না করলে নয়, বামুন ডেকে সেইটুকু করে নাও, আমি মিত্তিরের কাছে টাকা চেয়ে দিচ্ছি।"

সুবর্ণ উঠিয়া বসিয়া বলিল, "আচ্ছা।" প্রতুলচন্দ্রের কাছে চাহিবামাত্র তিনি টাকা দিলেন, কিন্তু শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে আর কোনো প্রকার অভিমত প্রকাশ করিলেননা। ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডাকিয়া, অতি সংক্ষেপে নারায়ণীর শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় প্রতুলচন্দ্র নিজের ঘরে বসিয়া, এমন সময় সুবর্ণর মাসী আসিয়া চৌকাঠের উপর বসিলেন। প্রতুল-চন্দ্র ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন "ওখানে কেন? উঠে চৌকীতে বসুন।"

শালিকা বলিলেন, "থাক ভাই থাক, ও সব চৌকী-মৌকিতে বসা অভ্যেস্ নেই, এই বেশ বসেছি। তা যা হবার তা ত হয়ে গেল, এখন আর দুঃখু করে কি করবে? এর পর আবার সংসারের ভাবনা ত ভাবতে হবে? সে ত আর কোনোমতে আট্‌কা থাকবে না?"

প্রতুলচন্দ্র ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন "আমার আর সংসার কি? আপনার বোন বেঁচে থাকতেই ত ও-সব আমার চুকে গেছে। সুবর্ণকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে, আমি আবার কলকাতাই ফিরে যাব। আপনি কবে যেতে চান বলুন, তার ব্যবস্থা করা যাবে।"

সুবর্ণর মাসীমা বলিলেন "মেয়েকে আগে রেখে এস, তার পর আমি যাব। নইলে বাড়ী খালি পড়ে থাকবে যে? আর এ-সবেরও ত একটা বিলি ব্যবস্থা করতে হবে?"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "তা হবে বটে, তবে তার জন্যে কোনো তাড়া নেই।"

সুবর্ণ কখন আসিয়া মাসীমার পাশে জড়সড় হইয়া বসিয়া ছিল, প্রতুলচন্দ্র তাহা লক্ষ্য করেন নাই। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল "বাবা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমায় পাঠিও না।" তাহার কথাটা শুনাইল ঠিক কান্নার মত।

প্রতুলচন্দ্র অবাক্ হইয়া গেলেন। সুবর্ণর মাসিমা বলিয়া উঠিলেন, "ওমা, ও কি অলুক্ষুণে কথা গা? শ্বশুর-ঘর যাবি না ত, যাবি কোথা? মেয়েমানুষের ওর বাড়া জায়গা আছে?"

সুবর্ণ ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিতে লাগিল "ওরা তাহলে আমার জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে, আর কি রাখবে?"

প্রতুলচন্দ্রের বুকের ভিতরটা রাগে ক্ষোভে জ্বলিতে লাগিল। তাঁহার একমাত্র কন্যা, এই দশা তাহার? ভয়ে বিমূঢ়, শক্তিহীন, আত্মরক্ষায়ও অসমর্থ, ক্রন্দন ভিন্ন ইহার কোনো অস্ত্র নাই। ইহার নাম হিন্দু সমাজের মেয়ে মানুষ করা। ইহার ভিতর মনুষ্যত্বের আছে কি?

কিন্তু মেয়ের কান্না তাঁহার চিন্তাকে বেশীদূর যাইতে দিল না, আবার মেয়ের দিকেই তাঁহার মন ফিরিয়া আসিল। সুবর্ণ তাঁহার সহিত বিশেষ কথা বলে না, তবু এখন তাহাকে বলাইতেই হইবে। কি ব্যাপার তিনি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিলেননা। সুবর্ণর মাসি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "এত কাঁদছিস্ কেন? শাশুড়ী ননদের হাতে খোয়ার আর কোন্ মেয়ের না হয় বল? ও সব পোড়ার সইতেই হয়। তার পর ত নিজেই গিন্নিবান্নি হবি।"

সুবর্ণ বলিল "আমি পালিয়ে এসেছি, এখন গেলে আমায় নিশ্চয় মেরে ফেল্‌বে।"

প্রতুলচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "পালিয়ে এলি কেন?" সুবর্ণ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "মা মারা যায়, তবু ওরা আস্‌তে দিচ্ছিল না। শাশুড়ী বলে 'ওসব ছল আমরা ঢের জানি।' কি করব তখন? তিনি জপে বসতেই আমি পালালাম। মাঝিটা চেনা মানুষ, তুমি ভাড়া নিশ্চয় দেবে বলাতে পৌঁছে দিয়ে গেল।"

মাসিমা বলিলেন, "তা মেয়েটা না এসেই বা কি করে ভাই? মা হেন জিনিষ, তাকেও শেষ দেখা দেখবে না? শাশুড়ী মাগী পিচেশ্ কম না। তা কি আর করবি বাছা? গয়নাগুলি কিছু অদেষ্টে আছে, তা শুনতেই হবে। তাই বলে কিরে যাবি না, তাও কি কখনও হয়? তোর বাপ নিজে গিয়ে রেখে আসুক, তাহলে একটু শান্ত হবে। বড়-মানুষ কুটুমের মন রাখতে সবাই চায়।"

প্রতুলচন্দ্রের বুকের ভিতর যেন জ্বলিয়া যাইতেছিল, তিনি কোনো কথা বলিলেননা। এই দলে শেষে তাঁহাকেও ভিড়িতেহইল? সুবর্ণ শুধু আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল, যাইবে, কি যাইবে না, তাহা কিছু বলিলনা।

মাসিমা বলিলেন "এখন ত দেবার দিন না, না হলে ভাল করে তত্ত্ব তালাশ করলে বেয়ানের মনটা একটু ভিজত।"

প্রতুলচন্দ্র তিক্তকণ্ঠে বলিলেন "থাক, ও সবে আর কাজ নেই। কাল আমি ওকে নিয়ে যাব। নেয় ভাল, না নেয়, অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।"

বিধবা শালিকা বলিলেন "অন্য ব্যবস্থা আর কি করবে ভাই? ওদের হাতে যখন পড়েছে, তখন ঐ ঘরেই মানিয়ে চল্‌তে হবে যেমন করে হোক।"

সুবর্ণ কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া গেল। তাহার মাসীমাও অল্প পরে তাহার অনুসরণ করিলেন। অন্ধকার ঘরে একলা বসিয়া প্রতুলচন্দ্র কি যে ভাবিতে লাগিলেন, তাহা তিনি ভিন্ন কেহ আর জানিলনা।

পরদিন সকাল হইতেই সুবর্ণকে লইয়া যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। সুবর্ণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ

মুখ লুকাইয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু তাহার আপত্তির ভিতর জোর ছিল না। তাহার কান্নাতে যখন কেহ কান দিল না, তখন সে ধরিয়াই লইল যে তাহাকে যাইতে হইবে। মাসীমা তাড়াতাড়ি রান্না করিতেছিলেন, তাহাদের খাওয়াইয়া দিতে হইবে; সে রান্নাঘরে বসিয়া এটা ওটা আগাইয়া দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিল।

সুবর্ণ একবস্ত্রে পলাইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং জিনিষ গুছাইবার হাঙ্গাম খুব বেশী তাহার ছিল না। তবু জিনিষ কিছু হইলই। প্রতুলচন্দ্র শালিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দিদি, ওর মায়ের ট্রাঙ্ক দুটো ওর সঙ্গে দিয়ে দিন্। গহনা কাপড় গুলো শুধু শুধু এখানে ফেলে রেখে কি হবে? বারোভূতে লুটে নেবে। ওর মায়ের জিনিষ, ওরই কাছে থাক।"

মাসীমা হিসাবী মানুষ। বলিলেন "সব একসঙ্গে দিয়ে দেবে ভাই? ওতে ত কম নেই? গহনাই কোন্ দু তিন হাজার টাকার না হবে? আমি বলি খানিক এখন দিই, খানিক তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যাও। পরে সময় বুঝে, আস্তে আস্তে দিলেই হবে। ও সব লোককে তুমি চেন না, আমরা ওদের সঙ্গে কারবার করে করে পেকে গেছি।"

প্রতুলচন্দ্রের মুখে একটু হাসির রেখা দেখা দিল, তিনি বলিলেন, "আচ্ছা তাই করুন। তবে বাকিগুলো আমি আর কলকাতা নিয়ে যাবনা, সেখানেও বারো ভূতের কারবার। আপনি ওগুলো সঙ্গে নিয়ে যান, যখন দেওয়া দরকার মনে করবেন, তখন দেবেন।"

সুবর্ণর মাসীমা বলিলেন, "তা বেশ, আমিই রাখব না হয়। আমাদেরও কোঠা-ঘর, চোর ডাকাতের ভয় বেশী নেই। তা ছাড়া, আমার ভাসুরপোর নামে এখনও বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। এই যে রাস্তাটা হয়ে যাক না, তখন সব গুছিয়ে গাছিয়ে দিচ্ছি।"

রান্না খাওয়া, তাড়াতাড়ি করিয়া একরকম হইয়া গেল। সুবর্ণর মাসীমা নারায়ণীর বাক্স খুলিয়া গহনা কাপড় সব দুই ভাগ করিতে লাগিলেন। ভালো ভাগটা তুলিয়া রাখিলেন, মন্দের ভাগটা সাজাইয়া মেয়ের সঙ্গে দিলেন। মায়েরই কাপড় জামা পরিয়া, সুবর্ণ আবার শ্বশুরবাড়ী যাইবার জন্য সাজিয়া বসিল। তাহার বুক তখনও দুঃখে ভয়ে ভাসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু পিতার মুখের দিকে চাহিয়া সে মনে সাহস সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিতেছে।

প্রতুলচন্দ্র আজই সন্ধ্যার মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন। ততক্ষণ সুবর্ণর মাসীমা বাড়ী আগ্‌লাইয়া থাকিবেন; পরদিন সকালে তিনিও বাড়ী চলিয়া যাইবেন। প্রতুলচন্দ্র স্থির করিয়াছিলেন, কোনো আত্মীয়স্বজনের হাতে বাড়ীঘর জিম্মা করিয়া দিয়া, তিনি কলিকাতা ফিরিবেন, গ্রামে আর এক মুহূর্তও তাঁহার থাকিতে ইচ্ছা করিতেছিল না।

সরুর গাড়ীতে জিনিষপত্র উঠান হইল। সুবর্ণও মাসীমাকে প্রণাম করিয়া গাড়ীতে উঠিল। সকালবেলা, কিন্তু রাত্রির অন্ধকার তখনও যেন পৃথিবীর মায়া কাটাইতে পারে নাই। সূর্য্যালোকের সামান্য একটু আভাষমাত্র পাওয়া যাইতেছে। প্রতুলচন্দ্র গাড়ী চড়িলেননা, ছাতা হাতে করিয়া গাড়ীর পাশে পাশে হাঁটিয়া চলিলেন।

ঘাটে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। নৌকা আগে হইতেই বলা ছিল। এক-হাঁটু কাদা ভাঙ্গিয়া গিয়া নৌকায় উঠিতে হইল। নদের ধারে আজকাল লোকজন বড় একটা ঘেঁষে না; দুই চারিজন লোক কার্য্যগতিকে যাহারা আসিয়া জুটিয়াছিল, তাহারাই সুবর্ণর বিদায়গ্রহণ দেখিল।

নদের তীরেই শ্মশানভূমি! সেখানেও পাড় ধ্বসিয়া পড়িতেছে। সুবর্ণ কাঁদিয়া উঠিল, "মাগো, আমায় ফেলে, কোথায় গেলে মা?"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "চুপ কর, চুপ কর। যা হয়ে গেছে তার জন্যে দুঃখ করে আর কি হবে? যা এখনও বাকি আছে, তার জন্যে মনকে প্রস্তুত কর।"

নৌকা চলিতে লাগিল। চারিদিকে শুধু প্রচণ্ড জলস্রোতের হুঙ্কার। সুবর্ণর কানে উহা যেন প্রেতলোকের তাণ্ডবের ধ্বনির মত বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু কাহার কাছে সে দুঃখ জানাইবে? জগতে আপন বলিতে তাহার কেহই নাই। মা চলিয়া গিয়াছেন, পিতা তাহার অপরিচিত। সমাজের বন্ধনে যে সকল নূতন আত্মীয় সে লাভ করিয়াছে, তাহাদের সে যমের মত ভয় করে। বিজয় নদের বক্ষে সে যেমন আশ্রয়হীন, সংসারের বক্ষেও তেমনি। তাহার কোনো অবলম্বন নাই, নিয়তির স্রোতে সে কোথায় যে ভাসিয়া যাইবে, তাহা ভাবিয়াই কূল পায় না।

ভাটগ্রাম পৌঁছিতে দুপুর হইয়া গেল। এখন দিনের আলো একটু প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। এখানেও ঘাটের কাছে লোকজন বিশেষ নাই, তবে নৌকা ভিড়িতে দেখিয়া

একটা জেলের ছেলে অগ্রসর হইয়া আসিল। প্রতুলচন্দ্র নামিয়া পড়িয়া, তাহাকে বলিলেন, "একখানা পাল্‌কী জোগাড় করা যায় বাপু?" ছেলেটা বলিল "পাল্‌কী ত ধারে কাছে কোথাও নেই কত্তা, তবে বলেন ত ছিদামের গরুর গাড়ীটা ডেকে আনি। কোথায় যাবেন?" প্রতুলচন্দ্র গন্তব্য স্থানের উল্লেখ করিলেন। ছেলেটা হাসিতে মুখ ভরিয়া তুলিয়া তাড়াতাড়ি গরুর গাড়ী আনিবার জন্য দৌড়িয়া চলিল। সুবর্ণ নামিল, লম্বা করিয়া বোমটা টানিয়া দিয়া পিছিল পথে দাঁড়াইয়া রহিল। মাঝির সাহায্যে প্রতুলচন্দ্র জিনিষপত্র যাহা কিছু ছিল, বাহির করিয়া লইলেন। মাঝিকে বলিলেন, "তুমি ঘণ্টাখানেক সবুর কর বাপু, আমি আবার ফিরে যাব।" গরুর গাড়ী আসিয়া জুটিল। সুবর্ণ উঠিল, প্রতুলচন্দ্র এবারেও হাঁটিয়া চলিলেন।

(ক্রমশঃ)

জুয়ারী

শ্রীসুকুমার সরকার

নিজের জীবন ল'য়ে খেলিয়াছি জুয়া এতকাল!
শ্রান্তি নাই ক্লান্তি নাই; সর্ব্বনাশী নেশার মাতাল
টলিয়াছি রূপ-মুগ্ধ; কত লাভ কত ক্ষতি ক্ষয়
ছোটো সুখ ছোটো দুঃখ বেদনার ক্ষণিক সঞ্চয়
লভিয়াছি ক্ষণে ক্ষণে; আশা দিয়া ধরিয়াছি বাজি,
চাহিয়াছি কল্প-লোক; নিত্য নব রূপে সাজি সাজি
চলিয়াছি অভিসারে; আশার অধিক কভু পাওয়া
স্বপ্নে ভোলা যৌবনের অন্তহারা বসন্তিয়া হাওয়া!
কখনো হারায়ে গেছে মৃত্তিকার ধরণীতে মোর
সঙ্গীতের সুরগুলি; নন্দনের পারিজাত-ডোর
হয়ে গেছে ধূলিম্লান; প্রেম দিয়া লভিয়াছি ঘৃণা!
মানসী হয়েছে মোর কামনার কলুষ-মলিনা!
প্রতিটি মুহূর্ত্তে মোর হয় যেন জন্মলাভ নব
পাপে পুণ্যে চালায়েছি নিত্য নব জুয়ার উৎসব
দিকে দিকে; হারি-জিতি নাই কোনো ক্ষোভ!
সর্ব্ব দেহ মন দিয়া বিজয়ী হইতে তবু লোভ!
নারী দেয় নাই তৃপ্তি, উপভোগে ক্লান্তি নেমে আসে।
বাস্তবের কারাগারে বন্দী মন অশ্রুর উচ্ছ্বাসে
কাঁদে একা অসহায়; আপনারে ল'য়ে কত আর
চলিবে এ ছল জুয়া; কত হাসি ক্রন্দন আমার
ব্যর্থ দেবতার পায়ে; প্রাণহীন এ দেহ-বেউলে
আর কি সুন্দর মোর প্রেম হ'য়ে উঠিবে গো দুলে!
সুদূরে ঘনায়ে এলো, সন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার
মূক মূঢ় কান্না ল'য়ে বন্দিত এ পৃথিবী আমার
গুমরি গুমরি ওঠে; কত যুগ হ'তে যুগান্তরে
পৃথ্বীও খেলিছে জুয়া; না পাওয়ারে লভিবার তরে
ধরেছি অনন্ত বাজি; রূপে রসে ঘ্রাণে গন্ধে গানে
আলোকে ও অন্ধকারে জন্ম হ'তে মৃত্যুর আহ্বানে
হারায়ে আবার পায়; পে'য়ে পুনঃ আবার হারায়;
অতৃপ্ত অদ্ভুত সৃষ্টি হাসে কাঁদে জুয়ার কারায়!

সেকালের বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র

অধ্যাপক শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত, এম-এ

ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে "সমাচার চন্দ্রিকার" ১২৩৭ সালের ফাইল আছে। উহার ১লা বৈশাখের সংখ্যার ক্রমিক নম্বর ৪৭৬। "সমাচার চন্দ্রিকা" কলিকাতার কলুটোলা ২৬নং বাটীতে চন্দ্রিকাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া সোমবার প্রাতে ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে প্রকাশিত হইত। * এই পত্রিকা কলিকাতার ধর্মসভার মুখপত্র ছিল এবং ধর্মসভা সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ছিলেন। ধর্মসভার বিবরণী সমূহ ইহাতে প্রকাশিত হইত। ভবানীচরণ ও তাঁহার রচনাবলীর বিস্তৃত পরিচয় শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। (১) ধর্মসভা সম্বন্ধে ভবানীচরণ বিজ্ঞাপন দিতেছেন যে ১৭৪১ শকের ৫ই মাঘএই সমাজ স্থাপন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবদাস মল্লিক প্রথমে ইহার ধনরক্ষক ছিলেন। তাঁহার পদত্যাগের পর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দেব ধনরক্ষক নিযুক্ত হন। ১লা বৈশাখ (ইং ১২ এপ্রিল, ১৮৩০) সমাচার চন্দ্রিকায় বিজ্ঞাপনে যে-সকল পুস্তকের নাম আছে তাহার মধ্যে "দূতী বিলাস" ও "কলিকাতা কমলালয়" ভবানীচরণের নিজের রচনা। "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" নাটকের পদ্যময় ভাষায় যে রচনার নাম আছে তাহা কাহার কৃত বোঝা যায় না। ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গঙ্গাধর রায়রত্ন এবং রামকিঙ্কর শিরোমণি প্রণীত "আত্মতত্ত্ব-কৌমুদী" নামে ১৮২২ খৃঃ প্রকাশিত যে "সাধুভাষারচিত তত্ত্বার্থ সংগ্রহ" আছে তাহার ভাষা গদ্য। সমাচার চন্দ্রিকায় বিজ্ঞাপিত গ্রন্থের রচয়িতা কে ছিলেন আজিও নির্দ্দেশ হয় নাই।

ধর্মসভা সহমরণ প্রথার সমর্থক ছিলেন। ৪ঠা বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল, ১৮৩০) সমাচার চন্দ্রিকার বিবরণে প্রকাশ যে ৩রা বৈশাখের ধর্মসভায় সহমরণানুসরণ শাস্ত্রসঙ্গত ও তৎপ্রসঙ্গে বিলাতে এক আরজি প্রেরণ করা উচিত কিনা এই আলোচনা হইয়াছিল। পরবর্ত্তী অনেক সংখ্যাতেই সতীদাহ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ১৮ই বৈশাখ (২৯ এপ্রিল, ১৮৩০) কোন পত্রপ্রেরক 'বঙ্গদূত' পত্রের উল্লেখ করিতেছেন। ঐ দিন কোন পত্রপ্রেরকের চিঠিতে জানা যায় যে তিনি "নবশিক্ষিত বাবুগণের উপাখ্যান" লিখির প্রকাশ-ব্যয় জানিতে ইচ্ছুক। সমাচার দর্পণ ও সমাচার চন্দ্রিকার মধ্যে বিশেষ হৃদ্যতা ছিল না। ২২শে বৈশাখ (৫ মে ১৮৩০) সমাচার চন্দ্রিকা সমাচার দর্পণের কোন মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন।

১লা জ্যৈষ্ঠ (১৩ মে ১৮৩০) সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশ যে ৬ই মে বৈকালে গবর্ণর জেনরল বাহাদুর ও লেডী বেণ্টিঙ্ক প্রভৃতি হিন্দু কালেজ পরিদর্শন করেন। ১৯শে জ্যৈষ্ঠ (৩১ মে ১৮৩০) নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়:—

অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে উক্ত গ্রন্থ সংস্কৃত নাগরাক্ষরে এবং তাহার বাক্যার্থ গৌড়ীয় ভাষায় বাঙ্গালা অক্ষরে আর সর উং জুন সাহেবের কৃত ইংরাজী তরজমা সহিত শ্রীরামপুরের কাগজে বিলাতি কালী দ্বারা শোভাবাজারে শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের ছাপাখানায় ছাপা হইতেছে গ্রন্থ পরিমাণ অনুমান ৪০০ পৃষ্ঠা হইবেক মূল্য ১০ টাকা মাত্র স্থির করিয়াছেন ইতি তারিখ ১৭ জ্যৈষ্ঠ।—(১)

ঐদিন আর লিখিত হয়—"আমরা পরম্পরা শ্রুত হইলাম এতন্নগরের বহুবাজারের কএক জন বিজ্ঞ একত্র হইয়া পরামর্শ স্থির করিয়াছেন যে সংবাদ রত্নাকর নামক এক সমাচারপত্র স্থজন করিবেন তজ্জন্য গবরনমেণ্টের অনুমতি প্রাপ্ত নিমিত্ত

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (৩য় সংখ্যা ১৩০৮ সাল) প্রকাশিত শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাঙ্গলার সাময়িক পত্রের ইতিহাস" প্রবন্ধে 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

১ 'সমিতিরের চিঠি'—ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৩৮।

১ ৮ই আষাঢ় (২১ জুন ১৮৩০) পর্য্যন্ত এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল।

কালাপাহাড়

শিল্পী—শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

প্রার্থনা পত্র প্রদান করিয়াছেন ইহাতে বোধ হয় ত্বরায় প্রকাশ পাইবেক কিন্তু কি রীতিক্রমে কোন্ দিবসে প্রকাশ হইবেক তদ্বিশেষ আমরা জ্ঞাত হইতে পারি নাই অনুমান করি সাপ্তাহিক কাগজ হইতে পারে এবং বুধবারে কোন বাঙ্গালা কাগজে প্রকাশ হয়না ঐ বার তাহারা ধার্য্য করিতে পারেন যাহা হউক বিশেষ অবগত মাত্রই পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করাইব এই বিষয় শ্রবণ মাত্র প্রকাশ করিলাম ইহার কারণ এ সংবাদ আমরা সুসম্বাদ জ্ঞান করি যেহেতু সমাচার পত্রের যত বাহুল্য হইবেক ততই দেশের উপকারের সম্ভাবনা তদ্বিশেষ অনেকেই জ্ঞাত আছেন বিশেষতঃ এই নূতন সমাচারের অধ্যক্ষ হিন্দু ইহাতে বোধ হয় তাঁহারা হিন্দুর ধর্ম্মের বিপক্ষে লিখিবেন না অতএব সংবাদ রত্নাকর স্বজন সুতরাং সুসম্বাদ বলা যায়।"

"বঙ্গদূত" পত্রিকার সহিত সমাচার চন্দ্রিকার সদ্ভাব ছিল না। ২২ জ্যৈষ্ঠ (৩ জুন ১৮৩০) সম্পাদকীয় মন্তব্য ও প্রেরিত পত্র প্রভৃতি হইতে ইহা বেশ দেখা যায়। ১লা আষাঢ় (১৪ জুন ১৮৩০) "শ্রীরামপুরের কালেজ" সম্পর্কে লিখিত হয়, "আমরা সমাচার পত্র দ্বারা জ্ঞাত হইলাম যে শ্রীরামপুর কালেজের প্রতি শ্রীশ্রীযুত ডেনমার্কের অধিপতি এক চারটর অর্থাৎ সনন্দ প্রদান করিয়াছেন ইহাতে বোধ হইতেছে যে উক্ত বিদ্যালয়ের এক্ষণে উন্নতি হইতে পারিবেক।" ২২শে জ্যৈষ্ঠ (৩ জুন ১৮৩০) ও ৮ আষাঢ় (২১ জুন ১৮৩০) "তিমিরনাশক" নামক সংবাদ-পত্রের উল্লেখ আছে। ১১ই আষাঢ় (২৪ জুন ১৮৩০) সমাচার চন্দ্রিকা লিখিতেছেন :—

শাস্ত্রপ্রকাশ।

আমরা পরম প্রীত হইয়া লিখিতেছি এতন্মহানগরে শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকৃত শাস্ত্রপ্রকাশ নামক পত্র প্রকাশ হইয়াছে সেই শাস্ত্রপ্রকাশে সর্ব্বশাস্ত্র প্রতিপাদ্য প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে সর্ব্বদেশীয় সকল হিন্দু জাতীয় ভদ্র মহাশয়দিগের মহোপকার হইতে পারে যেহেতুক সংগ্রাহক ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহামহোপাধ্যায়ের নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে পরন্তু পত্রেও বেদ পুরাণ স্মৃতি সংহিতাদি নানা শাস্ত্রোক্ত বিধি নিষেধোপাখ্যান করিয়াছেন এ পত্র আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হওয়াতে সুপ্রশংসনীয় বোধ হইয়াছে ইহার মূল্য প্রতি মাসে ১ এক টাকা প্রতি বুধবারে মুদ্রিত হইয়া এক পত্র দিবেন।"

১২ই জ্যৈষ্ঠ (২৪শে ১৮৩০) হইতে সমাচার চন্দ্রিকায় শ্রীধর স্বামীর টীকাসহ শ্রীমদ্ভাগবত গীতার এক সংস্করণের বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছিল। ১৭৪৯ শকের বৈশাখ মাসে মুদ্রাঙ্কন কার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৭৭২ শকের ৩১ বৈশাখ ৩ বৎসরে উহা সমাপ্ত হয়। এই সম্বন্ধে চন্দ্রিকা ১১ই আষাঢ় লেখেন :—

"গত ৯ আষাঢ় তারিখে দর্পণে তৎ প্রকাশক মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবদ্বিষয়ক সম্বাদ প্রকাশ করাতে আমরা উপকৃত হইলাম পরন্তু এই পুস্তক দৃষ্টি গোচর না হওয়াতে যে সন্দিগ্ধ আছেন তাহা কোর্ট উলিয়ম কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাক্তর উলিয়ম কেরি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলে সন্দেহ ভঞ্জন হইবে যেহেতুক মুদ্রাঙ্কিতের উপক্রমে কালেজ কমিটি গ্রাহক হওনের প্রার্থনা পত্রের সহিত মুদ্রিত কএক তুলাত পত্র তাঁহার নিকট পাঠাইয়া ছিলাম ঐ বিজ্ঞ মহাশয় তাহা দৃষ্টিমাত্র সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

১৮ই আষাঢ় (১ জুলাই ১৮৩০) সমাচার চন্দ্রিকা লিখিতেছেন :—

চৌরঙ্গীর নৃত্যশালা।

আমরা জ্ঞাত হইলাম যে চৌরঙ্গীর নৃত্যশালার তামসিক ব্যাপার আগামি ৯ জুলাই তারিখে আরম্ভ হইবেক।"

২৫ আষাঢ় (৮ জুলাই) সমাচার চন্দ্রিকায় কলিকাতা হাই স্কুল নামে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের নিকট এক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞাপন বাহির হয়। ইহার পূর্ব্ব নাম ছিল কলিকাতা গ্রামার স্কুল। ইহার সম্পাদক হইলেন রেভারেণ্ড এ. মেকফরসন ও কমিটীর সভ্য দিগের মধ্যে কলিকাতার লর্ড বিশপ, ভেনারেবল আর্চিডিকন করি সাহেব, মিঃ জে কিড, মিঃ লেসলি, মিঃ পি. সদরল্যাণ্ড, মিঃ টিট্লি, মিঃ এল. বেট্স প্রভৃতি ছিলেন। প্রধান শিক্ষক হইলেন রেভারেণ্ড জে. মেকুইন। ঐদিন "আসাম বুরঞ্জি" প্রসঙ্গে লিখিত হয় :—

"শ্রীযুত হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন মুহুক আসাম বুরঞ্জি নামক গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া ঐ গ্রন্থের প্রথমি

খণ্ড গ্রাহক দিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাহার অপর তিন খণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে অতএব পূর্ব্ব গ্রাহকেরা চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে লোক প্রেরণ করিলে ঐ গ্রাহক দিগের নিকটে উক্ত গ্রন্থের তিন খণ্ড প্রেরিত হইবেক।" (১)

১ শ্রাবণ (১৪ জুলাই ১৮৩০) সমাচার চন্দ্রিকা বলেন, "গত ৮ জুলাই বৃহস্পতিবার টৌন হলে চৌরঙ্গীর নৃত্যশালার অধ্যক্ষদিগের সাংবৎসরিক সাধারণ সভা হইয়াছিল তাহাতে অনেক কথোপকথন হইয়া যাহার প্রয়োজনীয় ছিল তাহা স্থির হইয়াছে।" ৫ই শ্রাবণ (১৯ জুলাই) প্রকাশ যে কাঁচরাপাড়া নিবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ রায় পদ্যে পদ্যে বৈদ্যোৎপত্তি নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ৮ই শ্রাবণ (২২ জুলাই) শ্রীগৌরমোহন আঢ্য স্থাপিত ওরিয়েন্টাল সেমিনারী বিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞাপন বাহির হয়। ঐ বিদ্যালয় দুই বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল। গৌরমোহনের বিজ্ঞাপনে শিক্ষকদিগের মধ্যে মিঃ টরনবুল ও মিঃ মালিসের নাম আছে ও ইহারা রামমোহন রায়ের বিদ্যালয়ে ও হেয়ার সাহেবের বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ঐ দিন প্রকাশিত ধর্ম্মসভার বিবরণীতে প্রকাশ যে মিঃ ক্রেন্‌সিস বেথি সাহেব সতীর পক্ষ ও কলনিবেদন বিষয়ক আরজী লইয়া ২৭শে জুলাই বিলাত যাত্রা করিবেন। উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত দেব, শ্রীযুক্ত রামকমল সেন, শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উমানন্দন ঠাকুর, মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। "দমদমার নৃত্যশালা" সম্বন্ধে চন্দ্রিকা লেখেন, "আমরা জ্ঞাত হইলাম যে আগামি ২৬ জুলাই তারিখে দমদমার নৃত্যশালার তামাসা হইয়াছিল শ্রীযুক্ত সকলে আসিতে পারেন নাই বোধ হইতেছে যে এবার অনায়াসে আসিতে পারিবেন।"

১৫ই শ্রাবণ (২৯ জুলাই ১৮৩০) সমাচার চন্দ্রিকা লিখিতেছেন : "অদ্যকার চন্দ্রিকায় শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর কর্ত্তৃক পুরুষ পরীক্ষা গ্রন্থের তরজমা বিষয়ক লিপি প্রকাশ করিলাম পাঠকবর্গ ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন যেহেতু মহারাজ অত্যল্প বয়স্ক ইহাতেই এই ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন অনুমান হয় দেশের উপকারার্থ বহুবিধ বিষয় ইহাঁর দ্বারা হইতে পারিবেক এমত ভরসা হইতেছে প্রধান লোকের সন্তানদিগের ইহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম কেননা পিতৃপিতামহাদির ধন প্রাপ্ত হইয়া কেবল গাড়ী ঘোড়াদির দ্বারা সে ধন ক্ষয় না করিয়া আপন কীর্ত্তি ও লোকোপকার করত জগতে খ্যাত হএন।" (২) "পুরুষ পরীক্ষা" সম্বন্ধে নিম্নলিখিত লিপি প্রকাশিত হয়:

"সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে প্রাচীন পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংগৃহীত পুরুষ পরীক্ষা নামক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে তাহা প্রায় সকল পণ্ডিতেই জ্ঞাত আছেন এবং তাহা রচিত ও তদ্‌গ্রন্থ আছে তাহাও অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অবগত আছেন পরন্তু ইদানী শ্রীযুত মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ঐ উক্ত গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় অবিকল রচিত অর্থাৎ তরজমা করিয়া পাত্রবিশেষে বিতরণ করিতেছেন তদ্বিষয় মহারাজ বাহাদুরের ইংরাজী বিদ্যায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ ও তদ্বিতরণ দ্বারা মাতৃত্ব ব্যক্ত হইতেছে অপিচ অস্মদাদির এতাদৃশ বিবেচিত হইল যে ঐ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য যে বীর ও সুধী ও বিদ্বান ও পুরুষার্থযুক্ত এই চতুষ্টয় পুরুষ লক্ষণ লিখিত আছে মহারাজ বাহাদুরের উক্তানুষ্ঠান দ্বারা চতুষ্টয় পুরুষ লক্ষণ প্রকাশিত হইতেছে তদ্বিবরণ প্রথমতঃ সেনানী লেখনীদ্বারা সংস্কৃত শব্দ বৃন্দ সহিত বিপুল বৃহৎ পূর্ব্বক ঐ গ্রন্থের বাক্যাগার হইতে ভাবার্থ চিত্তহরণ পূর্ব্বক ইংরাজী ভাষাগারে রক্ষিত করণ দ্বারা মহাবীরত্ব ব্যক্ত হইয়াছে এবং ঈদৃশ ব্যাপারে সুধীত্ব বিদ্বত্ব সুতরাং বিদ্যমান। অপর স্বীয় বুদ্ধি বিদ্যাধীন ভাষান্তর রচনা ও স্বকীয় ধনব্যয়ে বহু সংখ্যক ঐ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া দান দ্বারা যথার্থ পুরুষার্থ বিকাশের সম্ভাবনা বুঝা যায় অতএব মহারাজ উক্ত বিষয়ে শত ধন্যবাদের যোগ্য ইহা যোগ্য ব্যক্তির বিবেচনা সিদ্ধ হইতে পারে পরন্তু ঐ গ্রন্থের প্রস্তাবান্তর বহুতর বৃত্তান্ত লিখিত আছে সে সমুদয় প্রকাশ অতি বাহুল্য হয় অতএব তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত থাকিলাম।"

২৯শে শ্রাবণ (১২ আগষ্ট, ১৮৩০) প্রকাশ যে উকীল বেথি সাহেব যিনি সতীধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ প্রার্থনা পত্র লইয়া

(১) India Office Library Catalogue Vol. II, pt. IV (1905), p. 3454 'Assam-buranji" History of Assam, published from an ancient manuscript. Sivesagar 1844 এই উল্লেখ আছে।

(২) ১৮১৫ খৃ: শ্রীরামপুর হইতে হরপ্রসাদ রায় কৃত পুরুষপরীক্ষার বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

বিলাতগামী জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন তিনি জাহাজ কোনক্রমে ভগ্ন হওয়ায় কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়াছেন। (৩)

১১ই ভাদ্র (২৬ আগষ্ট, ১৮৩০) সমাচার চন্দ্রিকা বলেন যে গুরুপ্রসাদ রায়ের আদেশে শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন যে বৈদ্যোৎপত্তি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক চন্দ্রিকা যন্ত্রে "অবোধ বৈদ্যোদয়" নামক গ্রন্থ শ্রীরাজনারায়ণ মুন্সী দ্বারা প্রস্তুত হইয়া মুদ্রিত হইতেছে। ১৮ই ভাদ্র (২ সেপ্টেম্বর, ১৮৩০) প্রকাশ যে শ্রীযুক্ত উমানন্দন ঠাকুরের বাটীতে জ্ঞান সন্দীপন নামক সমাজ স্থাপন হইয়াছে, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর সভাপতি হইয়াছেন, প্রতি শনিবার রাত্রিতে ঐ সভা হইয়া বিদ্যাদি বিষয়ক প্রশ্নোত্তর মীমাংসা হইয়া থাকে। জ্ঞান সন্দীপন সভার সম্পাদকের পত্র ঐ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ২৫শে ভাদ্র (৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৩০) সমাচার চন্দ্রিকায় জ্ঞানসন্দীপন সভার এক সংস্কৃত এবং বাংলা বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। চন্দ্রিকায় অধিকন্তু প্রকাশ যে ধর্ম্মসভা ও জ্ঞান সন্দীপন সভা ব্যতীত বঙ্গবাগ্‌বিচার সভা ও বঙ্গহিত সভা স্থাপিত হইয়াছে। ৪ই আশ্বিন (২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৩০) হিন্দু কালেজের কোন ছাত্র সমাচার চন্দ্রিকায় লেখেন যে হিন্দু কালেজের বালকদিগকে বিধর্ম্মী ও নাস্তিক করার চেষ্টা চলিতেছে বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত তাহা সত্য নহে। (৪) জ্ঞান সন্দীপন সভার সম্পাদকের আর এক বিজ্ঞাপন ২৬ আশ্বিন (১১ই অক্টোবর ১৮৩০) সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশিত হয় :—

"বিশিষ্ট শিষ্ট সমূহ মান্য গুণিগণাগ্রগণ্য মহাশয়েরদের প্রতি পত্রিকা দ্বারা বিজ্ঞাপন করিতেছি। এতন্মহানগরান্তঃপাতি পাতর ঘাটায় শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুরের বৈঠকখানা বাটীতে উপরি লিখিতা সভা সংস্থাপিতা হইয়াছে। ঐ সভা প্রতিমাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ রবিবারে রাত্রি ইং ৭ ঘণ্টার পর ১০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত হইবেক ঐ সভাতে বহু সুপণ্ডিত মহাশয়েরা আগমন করিয়া কেবল বিদ্যাবিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তরাদি করেন কিন্তু ঐ সভাতে কোন জাতীয় পক্ষপাতি ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তরাদি হয় না অপর যদ্যপি কোন মহাশয় কেবল বিদ্যাবিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তরাদি প্রেরণ করেন তবে তাহা গ্রহণ করা যাইবেক কিন্তু অন্যবিষয়ক হইলে গ্রহণ করা যাইবেক না। সভার নিয়ম যদ্যপি সভাস্থ সভ্যগণ মধ্যে কোন সভ্য মহাশয় স্বীয় কার্য্যানুরোধে ঐ উক্ত নিরূপিত দিবসে না আসিতে পারেন তবে সম্পাদক সমীপে স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরণ করিবেন যদ্যপি পত্র প্রেরণ না করিয়া পুনঃ পুনঃ অনাগমন করেন তবে নিয়ম পত্র হইতে তাঁহার নাম বহিষ্কৃত করা যাইবেক এতদ্বিষয়াবগত হইয়া যাঁহার এই সভার সভ্য হইতে বাঞ্ছা হইবেক তিনি সম্পাদক সমীপে স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরণ করিলেই নিয়ম পত্রে তাঁহার নাম লেখা যাইবেক।"

১৩ কার্ত্তিক (২৮ অক্টোবর ১৮৩০) সমাচার চন্দ্রিকা লিখিতেছেন, "শ্রীযুত রামমোহন রায় মহাশয়ের বিলাতগমন উদ্‌যোগ সংবাদ আমরা চন্দ্রিকায় এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করি নাই এজন্য তিন চারি জন চন্দ্রিকা পাঠক পত্র লিখিয়াছেন যে কি কারণ প্রকাশ কর না উত্তর, এ সংবাদ প্রায় তাবৎ লোকের শ্রুতিগোচর হইয়াছে অতএব লিখনের আবশ্যক বুঝা যায় নাই।.....রায় বাবুর বিলাত গমনে কাহার শঙ্কাদেশও হয় নাই যেহেতুক সুবিচারক রাজার নিকট পক্ষপাত হইতে পারিবেক না অতএব সতী ও কলনিজেসিয়ান বিষয়ে শঙ্কা নাই শাস্ত্র ও সুবিচার বলে ডঙ্কা বাজাইয়া উকীল জয়ী হইয়া আসিবেক।"

২০শে ও ২৪শে কার্ত্তিক (৪ও৮ই নবেম্বর ১৮৩০) সমাচার চন্দ্রিকায় "দ্বিজরাজের খেদোক্তি" নামে এক ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটি রাজা রামমোহন রায়কে উদ্দেশ করিয়া লিখিত। ইহাতে তাঁহার পুত্র রাজারামের উল্লেখ আছে। কবিতার কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত হইল :—

"যবনী প্রয়সী গর্ভে সুপুত্র জন্মিল।
রাজা নাম দিয়ু তার নিকটে রহিল।

বাতিক হইল জোর স্বপ্ন দেখি কত।
পাতসাই পাজা পাই এই অভিমত॥
এদেশের রাজা হয়ে প্রজারে পালিব।
আপন মতের মধ্যে তাবতে আনিব॥

(৩) ৪ আশ্বিন (২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৩০) চন্দ্রিকায় প্রকাশ যে ৩১শে ভাদ্র বেথি সাহেব পুনর্ব্বার বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

(৪) হিন্দু কলেজের বিরুদ্ধে সমাচার চন্দ্রিকায় অনেক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

কাহার সাক্ষাতে এই মনের বাসনা।
কহিবাতে সে আমারে করিল মন্ত্রণা॥
যদ্যপি বিলাতে তুমি যেতে পার ভাই।
পূরিবে বাসনা তার সন্দেহ ত নাই॥ *

২৪শে কার্ত্তিকের (৮ই নবেম্বর) সমাচার চন্দ্রিকায় প্রেরিত পত্রে স্পষ্ট লেখা আছে যে রাজা রামমোহন রায় অতি শীঘ্র বিলাত গমন করিবেন এবং ৮ই কার্ত্তিকের সমাচার দর্পণে প্রকাশ যে তিনি এলবিয়ান নামক জাহাজে গমন করিবেন। ৪ অগ্রহায়ণ (১৮ নবেম্বর) সমাচার চন্দ্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বুঝা যায় যে ২৪ ও ২৭ কার্ত্তিকের 'সমাচারকৌমুদী' পত্রে "চন্দ্রিকাকারের প্রতি নানা প্রকার কটূকাটব্য উক্ত হইয়াছে।" উহাতে আরও জ্ঞাত হওয়া যায় যে কয়েক মাস পূর্ব্বে বড় আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত ওয়াইট সাহেবকে গালি দেওয়ার অপরাধে রামমোহন রায়ের এক টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছিল। ৮ই অগ্রহায়ণ (সোমবার ২২ নবেম্বর) রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রা সম্বন্ধে লিখিত হয়, "গত শুক্রবার শ্রীযুত রামমোহন রায় স্বীয় পুত্র ও চারিজন পরিচারক সমভিব্যাহৃত হইয়া আল্‌বিয়ন নামক জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক বিলাতে গমন করিয়াছেন।" ১১ই অগ্রহায়ণের (২৫ নবেম্বর) সমাচার চন্দ্রিকায় হেদো পুষ্করিণীর থানার নিকটে ওরিএনটেল একাডিমি নামক ইংরাজী বিদ্যালয় সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন ছিল। ২৯শে অগ্রহায়ণ (১৩ ডিসেম্বর) 'সমাচার চন্দ্রিকা' কোন পাঠকের অভিপ্রায় যে এই পত্র দৈনিক হউক এই সম্বন্ধে বলেন যে ইহা ব্যয়সাধ্য, সমাচার চন্দ্রিকা পূর্ব্বে কেবল সোমবার প্রকাশিত হইত কিন্তু প্রায় দুই বৎসর গত হইল পাঠক গণের তুষ্টির নিমিত্ত সপ্তাহে দুইবার অর্থাৎ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতি বার প্রকাশ করা যাইতেছে।

৯ই পৌষ (২৩ ডিসেম্বর ১৮৩০) চন্দ্রিকায় ড্রামণ্ড ও উইলসন সাহেবদিগের ধর্ম্মতলা একাডিমি নামক বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ও কলিকাতা হাই স্কুলের বালকদিগের পরীক্ষার সংবাদ বাহির হয়। ১৩ পৌষ (২৭ ডিসেম্বর) প্রকাশ শ্রীরামপুরের মিশনারী সাহেবদিগের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্‌সটিটিউসনের ছাত্রদিগের পরীক্ষা ডাক্তার মার্সমেন সাহেব লইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে ফিরিঙ্গী, দেশীয় খ্রীষ্টিয়ান ও বাঙ্গালী ছাত্র আছে। ১৬ই পৌষ (৩০ ডিসেম্বর) সমাচার চন্দ্রিকা বলেন যে এক্ষণে চারি পাঁচটা বাংলা সমাচার পত্র হইয়াছে। এই দিনের চন্দ্রিকায় "জামজাহানমা" নামক পারস্য সংবাদপত্রের নাম এবং "আখবারে শ্রীরামপুর" নামক এক পারস্য সংবাদপত্র যে কয়েক মাস প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ আছে। পারসী ও বাংলা ভাষায় কলিকা নিবাসী মিরা আলি মোল্লা মৌলভি এক সংবাদপত্র ও গৌড়ীয় ভাষার সম্বাদরত্নাকর নামে এক পত্র শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ রায় প্রভৃতি প্রকাশ করিবেন ইহাও উক্ত সংখ্যায় পাওয়া যায়। ২০ পৌষ (৩ জানুয়ারী ১৮৩১) সমাচার চন্দ্রিকা বলিতেছেন যে বাংলা ভাষায় পাঁচটা সংবাদপত্র হইয়াছে, পারসী ভাষায় চারিটা কাগজ হইয়া ছিল ধনাভাবে তাহার তিনটার নিধন হইয়াছে, "উমদ্ত মার্ত্তণ্ড" নামক একটা হিন্দী ভাষার নাগর অক্ষরে প্রকাশিত সংবাদপত্র অর্থাভাবে রহিত হইয়াছে।*

৮ই মাঘ (২০ জানুয়ারী ১৮৩১) সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশ: "রামমোহন রায়ের বিলাত গমন যদ্যপি আশ্চর্য্য বিবেচনা হইতেছে তথাপি এ ঘটনা প্রথম নহে কেননা এদেশের বার্ত্তা দ্বারা সুস্পষ্ট জানা যাইতেছে যে প্রায় চব্বিশ বৎসর গত হইল বাজেরাও পেশোয়ার পিতা রাঘবা বা রঘুনাথ রাও পুনা হইতে নিরাকৃত হইয়া বোম্বেতে বাস করিয়া দুইজন ব্রাহ্মণকে উকীল করিয়া জাহাজ দ্বারা ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন তাহার দিগের প্রত্যাগমন হইলে ম্লেচ্ছান্ত করিয়া জাত্যন্তর করিয়াছিল পরে অনেক পণ্ডিত দ্বারা নানাপ্রকার তথ্যানুসন্ধানপূর্ব্বক স্থির হইল যে ইহারা স্বেচ্ছায় একর্ম্ম করে নাহি এবং দেশের উপকারের নিমিত্ত রাজার দ্বারা প্রেরিত পুনঃ সংস্কার করাইলে নির্দ্দোষী হইতে পারে এই প্রকার ব্যবস্থা হওয়াতে রঘুনাথ রাও অনেক ব্যয় করিয়া সমারোহ পূর্ব্বক বিধিবৎ পুনঃ সংস্কার করাইলেন তবে ব্রাহ্মণেরা হিন্দু দিগের গ্রাহ্য হইল।

* রাজারাম সম্বন্ধে 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় (১৩০৯, অগ্রহায়ণ ও চৈত্র) শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু জ্ঞাতব্য তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

* এই প্রবন্ধে যে-সকল সাময়িক পত্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সে গুলির বিস্তৃত পরিচয় 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'র (৩য়, ৪র্থ সংখ্যা ১৩০৮) প্রকাশিত শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাসে" পাওয়া যাইবে।

আমরা কহিতে পারি না যে রামমোহন রায় প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার দেশে কি প্রকারে চলিত হইবেন কিন্তু তাঁহার ভ্রমণেতে হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি যে কোন অপরাধ হইয়া থাকে তাহা হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্তে এই এক পূর্ব্বে দৃষ্টান্ত আছে ইহা তিনি স্মরণ রাখিবেন।"

২২ মাঘ (৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৩১) সমাচার চন্দ্রিকা লিখিতেছেন : "পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবেক সম্বাদ প্রভাকর নামক সমাচার পত্র এতন্নগরে প্রকাশ পাইবার কল্পনা জল্পনা হইয়াছিল সংপ্রতি গত ১৬ মাঘ শুক্রবার তাহার প্রথম সংখ্যা প্রচার হইয়াছে তদবলোকনে বোধ হইতেছে যে তৎপ্রকাশক হিন্দুধর্ম্ম নাশেচ্ছুক দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন যেহেতু প্রভাকর প্রকাশকের যুক্তি উক্তি দ্বারা শক্তি ভক্তি ব্যক্ত হইয়াছে সাধু সদাশয়রা এ সম্বাদ পত্রের সম্বাদ শুনিলে ঔদাস্য না করিয়া অবশ্য সন্তুষ্ট হইবেন।" ২৬শে মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৩১) সংবাদ প্রভাকর সম্বন্ধে 'সমাচার চন্দ্রিকা' দ্বিতীয় বার লেখেন, "আমরা গত শুক্রবারের সম্বাদ প্রভাকর পত্র দৃষ্টি করিয়া আপাদিগের তুষ্টি ব্যক্ত করিতেছি যদ্যপিও প্রভাকরের নবানুরাগ বটে কিন্তু অরুণ কিরণ সর্ব্বসাধারণ প্রয়োজনক পরন্তু তৎপত্রের প্রকাশকের উক্তিতে সাধু সকলের পবিত্র চরিত্র অবশ্য আর্দ্র হইবেক যেহেতুক তাহাতে তাহাতে পক্ষ উপাসকের মতের পরস্পর বিবাদ বিরহ কিন্তু শুনিতে পাই সেই সকল কবিতায় শ্রীশ্রী আদি পুরুষাদির গুণ কীর্ত্তন বর্ণন আছে তদ্দৃষ্টে কোন মহাশয় কহিয়াছেন এ সম্বাদ প্রভাকর কি সংকীর্ত্তন একথায় আমরা সন্তুষ্ট হইলাম কেননা কথিত আছে কানু ছাড়া কীর্ত্তন নাই অতএব প্রভাকর প্রকাশক যে কীর্ত্তন উপস্থিত করিয়াছেন তাহা হরি ছাড়া নহে সুতরাং প্রভাকরের প্রভাক্রমে প্রভাকরের ন্যায় প্রকাশ পাইবেক।"

১৪ ফাল্গুন (২৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৩১) সমাচার চন্দ্রিকার প্রকাশ যে আঁদুল গ্রামে তর্ক সভা নামে এক সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, ঐ সভাতে প্রতি রবিবার বৈকালে প্রশ্নের বিচার হয় (১)। ১৮ই ফাল্গুন (২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৮৩১) সমাচার চন্দ্রিকা সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন :—

"আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠক বর্গকে জ্ঞাত করাইতেছি গত ১৩ ফাল্গুণ বুধবার প্রাতে সম্বাদ সুধাকর নামক এক সমাচার পত্র এতন্নগরের বোড়াবাগান ষ্ট্রীটে শ্রীযুত দেবীচরণ প্রামাণিকের আলয়ে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে গত বৃহস্পতিবার চন্দ্রিকা পত্র মুদ্রিত হইলে ঐ পত্র প্রাপ্ত হইলাম সুতরাং তদ্দিবসে ঐ সম্বাদ পত্রের সমাচার পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করাইতে পারি নাই সুধাকরের অনুষ্ঠান পত্র চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল ..

এক্ষণে পাঠকবর্গ নিকটে প্রার্থনা করিতেছি সুধাকর সম্বাদ সুধাস্বাদনে সকলেই মনোযোগী হউন।"

২৮ ফাল্গুন (১০ মার্চ্চ ১৮৩১) সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশ :—

"সমাচার সভা রাজেন্দ্র নামক বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষায় এক সমাচার পত্র সৃজন হইবার কল্প ছিল তাহা গত ২৪ ফাল্গুন সোমবার প্রকাশ হইয়াছে প্রথম সংখ্যা দৃষ্টি করিয়াছি তাহাতে তৎ প্রকাশকের প্রতিজ্ঞা বা অভিপ্রায় কিছুই ব্যক্ত হয় নাই কেবল কএকটী সংবাদ ও তাহারি অবিকল অনুবাদ পারস্য ভাষায় হইয়া চারিতা কাগজ মুদ্রিত হইয়াছে বোধ হয় আগামিতে তৎপ্রকাশক আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন যাহা হউক সকল প্রকার কাগজ প্রকাশ হইল পূর্ব্বে কেবল ইংরাজী সমাচার পত্র ছিল ইহাতে লোকের দিগের বাঙ্গা হইত বাঙ্গালা হইলে ভাল হয় তাহা হইলে পারস্য ভাষায় কাগজে প্রয়াস হইল সে অভিলাষ পূর্ণ হওনান্তে ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষার একত্রে দেখিবার সাধ ছিল তাহাও হইয়াছে পারস্য বাঙ্গালা উভয় ভাষার কোন গ্রন্থাদি দেখা যায় নাই ৺ঈশ্বরেচ্ছায় সে খেদও রহিল না এক্ষণে শুনিতেছি পারস্য বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা ভাষার কটক অঞ্চলে হইবেক ইহা হইলে অধিকতর মঙ্গল জ্ঞান করিব।"

২ চৈত্র (১৪ মার্চ্চ, ১৮৩১) সমাচার চন্দ্রিকার বিজ্ঞাপনে প্রকাশ যে মিঃ সেরবোন সাহেবের ঘোড়াসাঁকোর ইংরাজী বিদ্যালয় তথা হইতে বহুবাজারে উঠিয়া গিয়াছে। ৯ই চৈত্রের (২১ মার্চ্চ ১৮৩১) সমাচার চন্দ্রিকায় কলিকাতার কয়েকটী সংবাদপত্রের প্রকাশকের নাম আছে। জাম-

(১) ২৮ ফাল্গুন (১০ মার্চ্চ ১৮৩১) সমাচার চন্দ্রিকায় উক্ত সভার সম্পাদকের পত্রে প্রকাশ যে উহার প্রকৃত নাম "ধর্ম্মসভা"। ১২ চৈত্র (২৪ মার্চ্চ ১৮৩১) সমাচার চন্দ্রিকা স্পষ্ট বলিতেছেন যে ইহা কলিকাতা ধর্ম্মসভার শাখা সভা।

জাঁহাদের সংবাদপত্রের প্রকাশক কলুটোলা নিবাসী শ্রীহরিহর দত্ত, সুধাকর পত্রের প্রকাশক কাঁচড়াপাড়া নিবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব শ্রীপ্রেমচাঁদ রায়, সভ্যতাসেতু কাগজের প্রকাশক মুসলমান। সংবাদ প্রভাকর সম্বন্ধে এই সংখ্যা চন্দ্রিকা বলেন, "প্রকাশের অত্যল্প দিবস প্রকাশ হইয়াছে বটে কিন্তু ইহাতেই এতন্নগরের প্রায় সাবধীয় ভদ্রলোক তৎপত্রের আদর করিয়াছেন এবং নানা বিদেশ হইতে ঐ পত্রের গ্রাহক হইয়া অনেক লোক পত্র লিখিতেছেন।" ২৩ চৈত্র (৪ এপ্রিল ১৮৩১) কোর্ট উইলিয়ম কলেজ সম্বন্ধে সমাচার চন্দ্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয় :—

"বিলাত হইতে জাহাজ আসিয়াছে তদ্দ্বারা এমত ব্যক্ত করে যে কালেজ আফ ফোর্ট উইলিয়ম অর্থাৎ কোম্পানির কেরানিদিগের বিদ্যালয় একবারে উঠিয়া যাইবেক এমত আজ্ঞা হইয়াছে। সেক্রেটরি, শিক্ষক, পণ্ডিত, মুন্সী ইহারদিগের প্রভেদ থাকিবেক না।" ২৬ মার্চ ৬৭১ সংখ্যা সমাচার দর্পণে "প্রাচীন বিপ্র" নামক কোন লেখক এতদ্দেশীয় সংবাদপত্র দ্বারা লোকের কোন উপকার হইতেছে না এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। ২৩ চৈত্রের সমাচার চন্দ্রিকা এই পত্রলেখকের মত খণ্ডন করেন এবং বলেন যে ইংরাজী সমাচার পত্রের তুল্য বাংলা পত্র হইবে ইহার কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই কারণ ইংরাজী পত্রিকার দামের তুলনায় বাংলা পত্রিকার দাম সামান্য এবং লেখকের অন্যান্য যুক্তির কোনই তাৎপর্য্য নাই।

পরিশিষ্ট

সমাচার চন্দ্রিকা

(১৮৩৭ সালের ১ বৈশাখের বিজ্ঞাপন)

সমাচার চন্দ্রিকা পত্র এ প্রদেশে প্রায় সচিত্র বিখ্যাত হইয়াছে এতন্নগরের প্রায় যাবদীয় শিষ্ট বর্দ্ধিষ্ণু লোক গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং কাশী কটক ঢাকা রংপুর মুরশিদাবাদ, যশোহর নদীয়া বর্দ্ধমান হুগলী প্রভৃতি জেলায় গিয়া থাকে এপত্রের গ্রাহক এক্ষণে প্রায় পাঁচশত জন হইয়াছেন যদ্যপি কোন মহাজনাদির কোন বস্তুর ক্রয় বিক্রয়াদির সংবাদ প্রকাশাবশ্যক হয় চন্দ্রিকা পত্রে সংবাদ দিলে অনায়াসে এদেশের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইতে পারে এতৎ পত্রে কোন বিষয় বিজ্ঞাপন অর্থাৎ ইস্তেহার করিবার ব্যয় প্রথম বার পঙক্তি ।০ আনা পরে ঐ বিষয় ক্রমিক যতবার প্রকাশ হইবেক ঐ চারি আনা লাগিবেক কিন্তু শতকরা দশ টাকা বাদ দেওয়া যাইবেক। ইতি—

দামোদরের বিপত্তি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ

একাদশ পরিচ্ছেদ

"রবিবাবুর আধ্যাত্মিক আকাশ"

পরদিন প্রভাতে শচীনের আহ্বানে দামোদরের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে চোখ চাহিয়া দেখিল, শচীন, রমেশ ও নগেন সজ্জা করিয়া প্রস্তুত। শচীন বলিল, "উঠুন মশাই, আটটা বাজে!"

দামোদর তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া দেখিল সত্যই বেলা হইয়াছে। কাল রাত্রে নানা বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তাহার ঘুম আসিতে দেরী হইয়াছিল; তাই এত বেলা হইয়া গিয়াছে। সে বথাসম্ভব শীঘ্র মুখ ধুইয়া কাপড়টা ঝাড়িয়া কুড়িয়া পরিয়া, জামাটা মাথায় গলাইয়া লইয়া বলিল, "চলুন।"

নগেন জিজ্ঞাসা করিল, "ধরখাত নিয়েছেন?"

দামোদর ধরখাত নিতে ভুলিয়াছিল। ধরখাতখানি উঠাইয়া পকেটে পুরিতে গেল। নগেন বলিল, "করেন কি? অমন পাট কর্ত্তে আছে? গোল ক'রে পাকিয়ে হাতে নিন্। হাঁ, ঐ রকম। এইবার চলুন।"

চারজনে বাহির হইয়া পড়িল। চারুবাবু দ্বিতল হইতে দেখিতে পাইয়া ডাকিলেন, "কোথায় সব, নগেন?"

নগেন উত্তর দিল, "প্রাতর্ভ্রমণে। এক্ষুনি আস্‌ছি।"

চারজনে আসিয়া শিয়ালদহে জমা হইল, ট্রামের

অপেক্ষায়। দাঁড়াইয়া প্রায় পনেরো মিনিট কাটিয়া গেল। নগেন একটি সিগারেট ধরাইয়া বলিল, "এ ছাই ট্রাম কি ঠিক দরকারের সময়ই দেরী করে আস্‌বে। এমনি হ'লে এতক্ষণ পঞ্চাশখানা ট্রাম সামনে দিয়ে যেত। আর এখন দেখ না; দাঁড়িয়ে রৌদ্রে মাথা ধরে গেল, ট্রামের দেখা নেই।"

শচীন একটু আগাইয়া দেখিয়া বলিল, "কোনও চিহ্ন নেই, হেঁটেই চল্‌বো নাকি?"

নগেন উত্তর দিল, "তো'র বুদ্ধি ভগবান্ ঠিক তো'র বাপের পয়সার মাপে দিয়েছেন। অত পয়সা না হ'লে তো'র উপায় কি হোত?"

রমেশ কহিল, "ঝগড়া করিস্ নি। ঐ ট্রাম আস্‌ছে।" ট্রাম আসিলে ট্রামে চারজন উঠিয়া বসিল। নগেন একবার দামোদরের হাতের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিল দরখাস্ত-খানা ঠিক আছে কি না। তা'র পর বলিল, "সাবধান, দামোদরবাবু, ওখানা যেন ভুলে বেঞ্চের উপর ফেলে যাবেন না।

দামোদর কুণ্ঠিত ভাবে উত্তর দিল, "না।"

নগেন বলিল, "কি জানি, মশাই। আমার ত' মাসে একখানা ক'রে খাতা হারায়। শচীর কোন মাসে তিনখানা কোন মাসে চারখানা; রমেশের ও বালাই নেই। ও শুধু হাতে ঘায় আসে; কাজেই ওর হারায় কি না জানি না। তবে ও পড়ে, অথচ ওর বই নেই, খাতা নেই; তা'তে সন্দেহ হয় যে ও সমস্তই এই রকম করে হারিয়েছে। এখন বুদ্ধিমান হয়েছে।"

ট্রামের কন্‌ডাক্টর টিকিট দিতে আসিল। দামোদর, পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া দিল। চারখানি পার্ক ষ্ট্রীটের টিকিট লইল।

রমেশ বলিল, "দামোদরবাবু, এ কাজটা ভাল কর্লেন না। আপনি টিকিট কর্লে, আমাদের বাধ্য হ'য়ে আপনাকে ঘুড়ি ও জামা কিনে দিতে হবে।"

দামোদর হাসিয়া জবাব দিল, "তা' দেবেন।"

এস্‌প্লানাডে বদল করিয়া, পার্ক ষ্ট্রীটের সাম্‌নে চারজনে নামিল। তা'রপর দুইজন এক ফুট পথে, অন্য দুইজন অন্য ফুট পথে বাড়ীর নম্বর দেখিতে দেখিতে চলিল। শচীন ও নগেন বলিল, "আমরা ১০৫ পেলেই ডাক্‌বো। তোমরা পেলেই আমাদের ডাক্‌বে। বল্‌বে, পেয়েছি।"

চারজনে চলিল। ক্রমে শচীন ও নগেনের ভাগ্যেই ১০৫ মিলিল। নগেন ডাক দিল, "হৈ! রমেশ! পেয়েছি।"

রমেশ ও দামোদর দু'জনে রাস্তা পার হইয়া অপর ফুটপথে উঠিল। শচীন বলিল, "দোকানের ঠেলায় বাড়ী কি চিন্‌বার উপায় আছে। কোন্‌টা বাড়ী আর কোন্‌টা দোকান চিন্‌তে পারি না।"

১০৫ নম্বর বাড়ীর ফটকে দাঁড়াইয়া চারজনে পরামর্শ করিল। ভিতরে উঁকি মারিয়া রমেশ বলিল, "দু'তিনখানা বাড়ীত কম্পাউণ্ড দেখছি। কোন্‌টাতে রাঙ্গা মশাই আছে কে জানে?"

নগেন ফটকে সমস্ত নামের প্লেট দেখিয়া বলিল, "উহুঁ। এ যে সব সাহেব মেমের নাম, বাবা। শেষে কি ধাপ্পায় পড়া গেল না কি?"

শচীন রায় দিল, "একটা দরওয়ান কি বেহারাকে জিজ্ঞাসা করেই দেখা যাক্ না। কাগজখানা যদি বুদ্ধি ক'রে আন্‌তিস্।"

দামোদর এত বড় বাড়ী ও ফটক্ দেখিয়াই পিছাইয়া পড়িয়াছিল। বলিল, "ও বাজে বিজ্ঞাপন! চলুন, ফিরে যাই।"

নগেন উত্তর দিল, "তা' কি হয়?" সে ভিতরে অগ্রসর হইয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। আরও একটু অগ্রসর হইতেই একটা প্রকাণ্ড বিলাতী কুকুর তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে দেখিতে পাইল। তাহার মুখ শুষ্ক হইল; বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল; যদি কামড়ায়, তা' হলেই 'ত সে গেছে। পিছনে তাকাইয়া দেখিল, পলায়নের পথ নাই; ফটক অনেক পিছনে। সে যথাসম্ভব সাহস সঞ্চয় করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কুকুরটি আসিয়া তাহার জুতা জামার গন্ধ লইল; সে সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিল, "হপ্; চপ্; হস্। স্কট্।" কুকুরটা একটু সরিয়া গিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইল। নগেনের ভয় বাড়িল; সে অগ্রসরও হইতে পারিল না, পিছাইতেও সাহস করিল না। দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, "স্কট্; হস্! কোয়েট্! গো!" কিন্তু কুকুর হটিল না, সেও অগ্রসর হইতে পারিল না।

সৌভাগ্যক্রমে একজন মালী আসিয়া উপস্থিত হইল। নগেন বলিল, "মালী, এখানে কে কে থাকে?"

মালী জানাইল, আগে তিনজন সাহেব থাকিত ; এখন দু'জন সাহেব আছে, ও একজন বাঙালীবাবু আছে—ব্যারিষ্টার ! সেষের বাড়িটা সব পিছনে—সেইটা ব্যারিষ্টারের।"

নগেনের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। সে আর সেই কুকুরের দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করিয়া চক্ষু মুদিয়া ফটকের ধারে আসিয়া সংবাদ দিল।

রমেশ বলিল, "দামোদর বাবু, আপনি যান। খোঁজ করুন ; দেখা করুন। ঐ হবে। সাড়ে৩টা প্রায় হয়েছে।"

নগেন সাবধান করিয়া দিল, "একটা প্রকাণ্ড কুকুর আছে, সাহস করে যাবেন ; যেন ভয় খাবেন না। ভয় খেলেই কুকুর কামড়ায়। যদি তাড়া করে, তবে দাঁড়িয়ে পড়বেন। ছুটবেন না।"

দামোদর ফিকা হাসি হাসিয়া একটু জোর বুঠাতে দরখাস্তখানি ধরিয়া ভিতরে অগ্রসর হইল। দূর হইতে সে কুকুরটাকে দেখিল ; কিন্তু তাহার নগেনের মত ভয় হইল না। সে সোজা অগ্রসর হইয়া পিছনের বাড়ীখানির সম্মুখে আসিয়া, একজন বেহারাকে প্রশ্ন করিল, "বাবু আছে ?"

বেহারা সংশোধন করিয়া দিয়া বলিল, "সাহেব আছেন।"

দামোদর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সাহেব ? বাঙালী নয় ?"

বেহারা হাসিল। জানাইল, "হাঁ, বাঙালী 'ত বটে, তবে সাহেব।"

তা'র পর জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই ?"

দামোদর কুণ্ঠিতভাবে কহিল, "দেখা কর্ত্তে চাই একবার। একটু যদি বলে দেখ তুমি।"

বেহারা তাহার ব্যবহারে খুসী হইয়া একখণ্ড কাগজ ও একটা পেন্সিল লইয়া আসিয়া বলিল, "এইতে নাম, আর কি দরকার লিখে দিন।"

দামোদর লিখিয়া দিল। বেহারা কাগজখণ্ড লইয়া চলিয়া গেল ও মিনিট পাঁচ ছয় বাদে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আসুন।"

দামোদর বেহারার পিছনে পিছনে চলিল। বাড়ীর আসবাবপত্র দেখিয়া সে ভীত হইল। এত ব্যাপার ! না জানি কত অর্থবান্ ! উপরে উঠিবার সিঁড়ির পাশ দিয়া যাইতে যাইতে সে উপরে ছেলেমেয়ের হাসির আওয়াজ শুনিতে চেষ্টা করিল। বেহারা তাহাকে লইয়া গিয়া একটা ঘরের পর্দ্দা সরাইয়া বলিল, "ভিতরে যান্, সাহেব আছেন।"

দামোদর ভিতরে প্রবেশ করিয়া, প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। চারি দিকে নানা রঙ্-বেরঙের চেয়ার, সোফা, টেব্‌লই দেখিল। অনেকক্ষণ পরে এক দিকে একটা আওয়াজ শুনিল, "আসুন"। তখন সেই দিকে তাকাইয়া একজনকে দেখিতে পাইল। প্রায় ৬০ বৎসর বয়স। মাথায় দু'চার গাছি মাত্র পাকা চুল আছে। ঢিলে পায়জামা ও তাহার উপরে একটা বিলাতী ড্রেসিঙ গাউন। পায়ে পশমের ফুল স্লিপার। বেশ স্নেহপূর্ণ, উদার মুখভাব। চোখ দুটি উজ্জ্বল। লম্বা ও গৌর দেহ।

দামোদর অগ্রসর হইয়া তাঁহার সমীপস্থ হইতেই, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বসিতে বলিলেন। দামোদর অত্যন্ত বিনীত ভাবে বসিল। তখন ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বিজ্ঞাপন পড়ে এসেছেন বুঝি ?"

দামোদর নম্রভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল "আজ্ঞে, হাঁ।"

"আপনার নাম ? বাড়ী ?"

দামোদর হস্তস্থিত দরখাস্তখানা দিয়া বলিল, "এইতে সব আছে ; দয়া করে পড়ুন।"

ভদ্রলোক টেব্‌লের উপরিস্থিত একখানি কেস্ হইতে সোণার চসমা বাহির করিয়া তাহা পরিয়া দরখাস্তখানি পড়িলেন। তা'র পর একবার দামোদরের আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া বলিলেন, "আপনি সাহিত্যিক ? ইংরাজি সাহিত্যে বেশ দখল আছে ?"

দামোদর উত্তর দিল, "বেশ দখল আছে, বল্‌তে পারি না। তবে একটু আধটু চর্চ্চা করি।"

ভদ্রলোক টেব্‌লের উপরস্থিত বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজাইলেন। একজন বেহারা আসিয়া হাজির হইল। তাহাকে তিনি আদেশ দিলেন, "দিদিমণিকে ডাক !"

বেহারা যাইবার প্রায় ২০।২৫ মিনিট বাদে একজন স্ত্রীলোক—যুবতীই—বয়স অনুমানে বছর ২২।২৩ হইবে—ঘরে প্রবেশ করিয়া সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিল, "কি, বাবা ?"

ভদ্রলোক দামোদরকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই ইনি

এসেছেন বিজ্ঞাপনের উত্তরে। ইনি সাহিত্যিক। তোমার এঁকে কিছু পরীক্ষা কর্‌বার আছে?"

যুবতীটি দামোদরের দিকে একবার চাহিয়া ভদ্রলোককে বলিল, "একটু দেখ্‌বে না পরীক্ষা করে? ওঁর কি বইটই আছে?"

দামোদর মাথা নীচু করিয়াই ছিল। একবার মাত্র চাহিয়া জবাব দিল "না।"

যুবতীটি ভদ্রলোককে প্রশ্ন করিল, "তবে? আপনি ওঁকে বরং ঐ বিষয়ে—যেটা আপনাকে সেদিন দিয়েছি—সেই বিষয়ে একটু লিখ্‌তে দেন। লাইব্রেরিতে বসে লিখ্‌বেন; সেখানে বই যা' দরকার পাবেন।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "ঠিক কথা।" তা'র পর দামোদরকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "দেখুন; আপনাকে একটা রচনা এইখানে লিখে দেখাতে হবে। আপনার আপত্তি নাই ত?"

দামোদর জানাইল তাহার আপত্তি নাই। যুবতীটি ইতিমধ্যে একখণ্ড কাগজে কি লিখিয়া দিলেন। ভদ্রলোক কাগজখণ্ডটি হাতে করিয়া উঠিয়া দামোদরকে সঙ্গে আসিতে বলিলেন। সেই ঘরের ভিতর দিয়া ভিতরে এক লাইব্রেরি-ঘরে উপস্থিত হইয়া তিনি সেই কাগজখণ্ড দামোদরের হাতে দিয়া কহিলেন, "এইখানে কাগজ কলম সব আছে। বইও যা' প্রয়োজনীয় তা' আছে। এইখানে বসে ধীরে সুস্থে এই প্রবন্ধটা লিখুন। এখন ১০টা; ১১টার ভিতর শেষ হবে বোধ হয়?"

দামোদর কাগজখণ্ড পড়িয়া দেখিল, প্রবন্ধের বিষয়, "রবিবাবুর আধ্যাত্মিক আকাশ ও তাহার মানচিত্র!" সে সবিনয়ে জানাইল যে সে চেষ্টা করিবে। ভদ্রলোক তাহাকে একাকী রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

দামোদর গালে হাত দিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। "রবিবাবুর আধ্যাত্মিক আকাশ"-প্রবন্ধের বিষয়ীভূত ব্যাপারের কথা নহে; এই প্রবন্ধ যাহারা লিখিতে দিয়াছে তাহাদের কথা। সেই তরুণীটিকে সে ভাল করিয়া দেখে নাই; তা'র আসা ও উপস্থিতিই তাহার চৈতন্যে একটা মৃদুমন্দ আঘাত করিয়াছে মাত্র; কিন্তু তাহাতেই সে বুঝিয়াছে ইহাদের ভিতর বৈচিত্র্য আছে। তাহার আফশোষ হইল, একবার কেন সে সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া দেখিল না। আবার তাহার সে কাগজের পণ্ডে দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। "রবিবাবুর আধ্যাত্মিক আকাশ ও তাহার মানচিত্র!" তাই ত! বেশ শুনিতে ও পড়িতে বটে; কিন্তু কি লিখিবে সে? আকাশের মানচিত্র জ্যোতিষ ত? রবিবাবুর আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ? সে কি রকম? দামোদর বৈদ্যুতিক পাখা সত্ত্বেও ঘামিয়া উঠিল। যদি রমেশ কি নগেন কি শচীন এরা কেউ থাকিত, হয় ত ইহার কিছু নিশানা দিতে পারিত। রবিবাবুর কবিতাই সে পড়িয়াছে; গল্পগুচ্ছ, নৌকাডুবি, চোখের বালি পড়িয়াছে; সেই গুলিই সে বুঝিতে পারিত, তাহার সর্ব্বদাই ভাল লাগিত। শেষের দিকের কবিতাও সে বুঝিতে পারিত না, গল্পও বুঝিতে পারিত না। সেইজন্য সে সেগুলি পড়িতে পারে নাই। এখন সে কি করিবে? কোথায় সুরু করিবে? এদিকে ঘরের ঘড়িতে ১০৷৷০টা বাজিয়া প্রায় পৌনে এগার হইল। আর মাত্র ১৫ মিনিট বাকী। সে উঠিয়া চারি দিকের আলমারির ভিতরের বইগুলির নাম পড়িতে লাগিল। নানা দেশের নানা সাহিত্যের ও দর্শনের পুস্তক। হাঁ, সখ বটে; শুধু সখ্ নয়—বিদ্যাও বটে! কিন্তু যাহারা এত পড়ে, তাহারা এমন প্রশ্ন কি করিয়া ক'রে? হয় ত' ইহা কূট প্রশ্ন; খুব জ্ঞানের, বিজ্ঞানের, চিন্তার বিষয়। সত্যই ত, যাহারা পড়িয়াছে, বিদ্যা অর্জন করিয়াছে, তাহারা একটু কঠিন প্রশ্নের সমাধানেই আনন্দ পায়। ঐ তরুণীটি নিশ্চয়ই প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে পূর্ণ; তাহা না হইলে এমন প্রশ্ন করা যায়? সে ঘড়ি দেখিল; ১০টা বাজিতে ৫ মিনিট, সে হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। না, সে পারিবে না। চেষ্টা করিয়াও আর সে পারিবে না। ১১টা বাজিল; সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হয়েছে?"

দামোদর ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া, তাঁহার লিখিত কাগজখণ্ড তাঁহার হাতেই দিয়া বলিল, "কিছুই হয় নাই। আমি পার্‌ব না; মাফ কর্ব্বেন। শুধু শুধু সময় নষ্ট ও আপনাদের বিরক্ত কর্‌লুম।" ভদ্রলোক কাগজখণ্ড না পড়িয়া ভাঁজ করিয়া বলিলেন, "না, না।" তা'রপর তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাহিরের বর্ষাতি পর্য্যন্ত আগাইয়া দিলেন। দামোদর নমস্কার করিয়া দ্রুতপদে ফটকের দিকে চলিল,—এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! ফটকের বাহিরে

আসিয়া দেখিল, শচীন ও নগেন এক দিকে দাঁড়াইয়া; রমেশ আর এক দিকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সকলেরই মুখে উদ্বেগ; কপাল কুঞ্চিত। তাহাকে দেখিয়া নগেন বলিল, "এসেছেন? পুলিসে খবর দেব কি না ভাব্‌ছিলুম। রমেশ শুধু রাজী নয় বলেই দিইনি। কি ব্যাপার? কি হয়েছিল?"

দামোদর বলিল, "চলুন। বল্‌ছি সব।"

রমেশ আসিয়া পৌঁছিলে, চা'র জনে আবার গৃহাভিমুখে ফিরিল। পথে ট্রামে দামোদর সমস্ত বৃত্তান্ত শুনাইল। রমেশ বলিল, "ওরা পাগল। ভদ্রলোকের নাম কি?"

নগেন কহিল, "এ আশ্চর্য্য বটে? অদ্ভুত!"

শচীন বলিল, "অদ্ভুত কি? রবিবাবুর আধ্যাত্মিক জগৎ যদি থাকতে পারে, তা'র আকাশ থাকতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে। আকাশ ছাড়া জগৎ কি করে হবে? আর আকাশ থাকলেই তা'র মানচিত্র থাকবে। খুব কূট প্রশ্ন; কিন্তু ইহাতে অদ্ভুতত্ব কিছু নেই।"

রমেশ উত্তর দিল, "যেমন তুই গাধা—এটাতে কোন অদ্ভুতত্ব নেই।"

শচীন বলিল, "কিন্তু, দামোদর বাবু, আপনি সেই অদ্ভুত মেয়েটিকে দেখ্‌লেন না? ছিঃ! আপনি কি? দাঁড়ান, কাল আমি যাবো দরখাস্ত নিয়ে; দেখে আস্‌বো।"

দামোদর তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "তা হবে না, তৈরি হয়েও যেতে পার্ব্বেন। আধ্যাত্মিক আকাশের ম্যাপ্ চাই।"

চৌরঙ্গী পার হইয়া তাহারা কলেজ ষ্ট্রীটের ট্রাম ধরিল। নগেন বলিল, "একবার গোলদীঘির ধারে নাম্‌বো।" কেহই আপত্তি করিল না! শুধু শচীন একবার বলিল, "বড় ক্ষুধার উদ্রেক হচ্ছে।"

নগেন ধমক্ দিল, "বাড়ী গিয়ে খাবি।"

গোলদীঘির মোড়ে নামিতেই, দামোদর দেখিল, গোলদীঘির ধারে হিন্দু স্কুলের গায়ে এক জ্যোতিষী বসিয়া। সে তাড়াতাড়ি রমেশকে বলিল, "রমেশবাবু, আপনার যা' দরকার সোকানে সেরে আসুন, আমি ঐ জ্যোতিষীর কাছে যাই হাতটা দেখাতে।"

রমেশ উত্তর দিল, "ও'র কাছে? ও বেটা জ্যোতিষ বানান কর্ত্তে পারে?"

শচীন বলিল, "চল সবাই যাই। কাপড় পরে কেনা হবে। বেলা যখন হয়েছে, তখন ভাল করেই হোক্।"

নগেন কহিল, "আর দরকার নেই অত পাকামোতে। হাতে তোর কি আছে গুণাতে যাবি। তোর কপালে বিধাতাপুরুষ যা' লিখে গেছে, তাই ভাগ আর খা'। একপুরুষে শেষ হবে না।"

শচীন শুনিল না। সে ও দামোদর অগ্রসর হইল; বাধ্য হইয়া নগেন ও রমেশও তাহাদের অনুসরণ করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"কপালে রাজতিলক রহিয়াছে"

চারজনে জ্যোতিষীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। জ্যোতিষী কপালে দীর্ঘ তিলক দিয়া, সম্মুখে এক পুরাতন, ছিন্ন, চিত্রিত জ্যোতিষের পুঁথি লইয়া আসন পাতিয়া বসিয়াছিল। তাহাদের চারজনকে নিমন্ত্রণ করিল, "আইয়ে, বাবু, আইয়ে।"

শচীন বলিল, "আইয়েছি, পণ্ডিতজী, কোথায় জ্যোতিষ পড়েছিলে? পাঠশালে না বড়বাজারে?"

পণ্ডিতজী যেন কিছু বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, "কাশীতে বাবু, বারাণসীতে জ্যোতিষ পড়িয়েছিলুম। ভৃগু-সংহিতা কার্য্যালয়ে।"

নগেন কহিল, "কার্য্যালয়ে? কম্‌পোজিটর ছিলে না কি? সংস্কৃত অক্ষর চেন?"

দামোদরের আগ্রহ ধৈর্য্য মানিতে ছিল না। সে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আচ্ছা, পণ্ডিতজী, আমার হাতটা দেখুন ত?"

শচীন তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া সরাইয়া বলিল, "উহুঁ; আগে আমার! পণ্ডিতজী দেখ। হাত দেখ আর কপালও দেখ।"

পণ্ডিতজী মৃদু হাসিয়া তাহার হাত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "আপনার ভাগ্য খুব ভাল আছে, বাবু। আপনার বিস্তর রুপৈয়া। আপনার কোনও দুখ্ নেই। খুব ভাল সাদী হবে। জমিদারকি লেড়কীর সাথে সাদি হবে। শীঘ্রই হবে। ১ সালের অন্দরে।"

শচীন বলিল, "বল 'ত, পণ্ডিতজী, আমার কি-এ শেষ হবে কি না। কোর্থ ইয়ার ঘুচবে কি না জীবনে?"

পণ্ডিতজী ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, "না। বাবুজি, তোমার পরীক্ষা শেষ হবে না। তা'তে দুখ্ নেই। তোমার অক্করত্ নেই।"

শচীন বলিল, "তাই ত! সবই প্রায় ঠিক বলেছ। দুঃখের বিষয় মিল্‌ছে না কিছু।"

নগেন তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিল, "হয়েছে তো'র; এইবার আমি। পণ্ডিতজী, আমার হাত দেখ। ওর ত' চেহারা দেখে সব বলা যায়। আমার হাত দেখ।"

পণ্ডিতজী অবিচলিত ভাবে তাহার হস্তরেখা দেখিয়া বলিল, "না বাবুজি, কিছু বলা গেল না। এ রকম লেখা থেকে নিশ্চয় কিছু বলা যায় না। তবে আপনার জীবনে বহুত্ কষ্ট আছে। আপনার টাকা যা' আছে, তা' থাকবে না। তখন আপনার বড় বিপদ, দুরবস্থা হবে।"

নগেন জিজ্ঞাসা করিল, "বল কি? টাকা আমার কবে ছিল? কোনদিনই ছিল না পণ্ডিতজি। সাদি হবে? না, তা'ও হবে না?"

পণ্ডিতজী আর একবার তাহার হস্তরেখা নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "হ'বে। সাদী হবে। সন্তান ভি হবে।"

নগেন বলিল, "ও সব ছাড়, পণ্ডিতজি। এখন ঠিক ঠিক কিছু শুনাও। কি হবে না হবে তুমিও যত জান আমিও তত জানি। আপাতত দু'টা এমন কিছু শুনাও যাতে বুঝি তোমার জ্যোতিষের জ্ঞান টন্‌টনে।"

পণ্ডিতজি হাত ছাড়িয়া দিল বলিল, "না, বাবু। আমি পার্‌ব্‌ম না। আপনার অতীতও বুঝা যায় না। তবে আপনার শনি প্রবল।"

নগেন হতাশ হইল। রমেশ বলিল, "ওর শনি নেই, পণ্ডিতজি; ওই শনি।" তা'র পর নগেনকে সরাইয়া দিয়া নিজে বসিল, বলিল, "বল ত পণ্ডিতজি, আমার ভাগ্যের কি খবর?"

পণ্ডিতজি রমেশের হাত ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "আপনি ভাল ভাগ্য পাবেন। এখনই আপনার উপর ভাল দৃষ্টি আছে। পরে তাই থেকেই আপনার বহুত ফয়দা হবে। তবে একটু বিপদ আছে। নিজেকে যেমন সাম্‌লে চলেছেন চল্‌বেন। অনেকে এই রকম অপ্রত্যাশিত দৈবের দান পায়।"

রমেশ বেশ একটু যেন চঞ্চল হইল; জিজ্ঞাসা করিল, "সাদি?"

পণ্ডিতজি ঈষৎ হাসিয়া তাহার পুঁথির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "সাদি? আপনার সাদি 'ত হয়ে গেছে, বাবুজি। আমাকে ছলনা করে লাভ কি আপনার?"

রমেশ উঠিয়া পড়িল। শচীন ও নগেন তখন তাহাদের নিজেদের ভাগ্যনির্ণয় নিয়ে তর্ক করিতেছিল। কেবল দামোদরই বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিল। রমেশ জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, "দামোদর বাবু, আপনার হাতটা দেখান। আশ্চর্য্য জ্যোতিষের মজা একবার শুনুন।"

দামোদরের হাত দেখিয়া পণ্ডিতজি একটু যেন বিস্মিত হইল; তার পর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দামোদরের বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি পণ্ডিতজি, বল!"

পণ্ডিতজি মাথা নাড়িয়া সন্দিগ্ধভাবে বলিল, "বাবুজি, তোমার কপালে রাজতিলক আছে।"

দামোদরের সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ দেখা দিল। সে সাগ্রহে বলিল, "ভাল করে দেখ পণ্ডিতজি! আমার কি অবস্থা তা' বল, আর কি হবে তা বল।"

পণ্ডিতজি বহুক্ষণ ধরিয়া তাহার হাত দেখিল। শেষে বলিল, "বাবুজি, তুমি বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে এসেছ। না? তোমার ঘরে তোমার স্ত্রী, মা, বাপ সব আছে। কেন? তা', যাই হোক্, তোমার কপালে রাজতিলক আছে।"

দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কি আবার সাদি হবে পণ্ডিতজি?"

পণ্ডিতজি উত্তর দিল, "হোতে পারে। ঠিক বল্‌তে পার্‌ব্‌ম না। কিন্তু তোমার পিছনে ভয় আছে।"

দামোদর উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি?

পণ্ডিতজি বলিল, "তা' ঠিক দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তোমার আগেকার স্ত্রীর সম্বন্ধে ভয় আছে।"

দামোদরের নিতাই ঘোষের কথা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। অসম্ভব নহে। নিতাই ঘোষ কি সহজে ছাড়িবে? সে জিজ্ঞাসা করিল, "সেটা কি সত্যি, পণ্ডিতজি?"

পণ্ডিতজি তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "বল্‌তে পারি না। তবে সন্দেহ হয়। না হলে পরে সবই আপনার ভাল।"

দামোদর উঠিয়া দাঁড়াইল। পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া পণ্ডিতজিকে দিল। তার পর চারজনে আবার দোকানের দিকে চলিল। নগেন ও শচীনের তর্ক থামিল না। কিন্তু রমেশ ও দামোদর দু'জনেই চিন্তাকুল চিত্তে চলিল। দামোদরের মনে হইল তবে তাহার আর সময় নষ্ট করা উচিত কার্য্য হইবে না। আজই সন্ধ্যার সময় সে আবার নারাণবাবুর বাড়ী যাইবে। অবশ্য বিবাহের বিষয় এখন কিছু বলা বা স্বীকার করা উচিত হইবে না। আগে দু'চারদিন নারাণবাবুর সহিত ঘুরিয়া সমস্ত বিষয়ে একটু পরিচিত হওয়া চাই। নারাণবাবুর সম্বন্ধে বাজারে ও সাধারণে কি ধারণা তাহার সন্ধান করা উচিত। তা'র পর বিবাহ করিলেই হইবে। একটু দেরী করাই ভাল; কেন না নিতাই ঘোষের কথা বলা যায় না। সেও কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া একটা গোলযোগ বাধাইতে পারে। রমেশ কি ভাবিতেছিল, তাহা সেই জানে। তাহার মনের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য যেন জ্যোতিষী নষ্ট করিয়া দিয়াছিল, শুধু এইটুকুই দামোদর বুঝিল, কিন্তু কোনও প্রশ্ন করা কর্ত্তব্য মনে করিল না। বিশেষতঃ তাহার নিজের ভাবনাতেই সে পূর্ণ ছিল।

(ক্রমশঃ)

বার্লিনে

ডাক্তার শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, ডি-এস্‌সি, এম্‌-বি, এম্‌-আর সি-পি

২রা মার্চ্চ ভোরে আটটায় জার্ম্মেণীর রাজধানী বার্লিনে এসে পৌঁছুনো গেল। প্ল্যাটফর্ম্মের উপর মালগুলি আমার জিম্মায় রেখে বন্ধুবর সুধাংশু ছুটলেন ট্যাক্সির তাদের

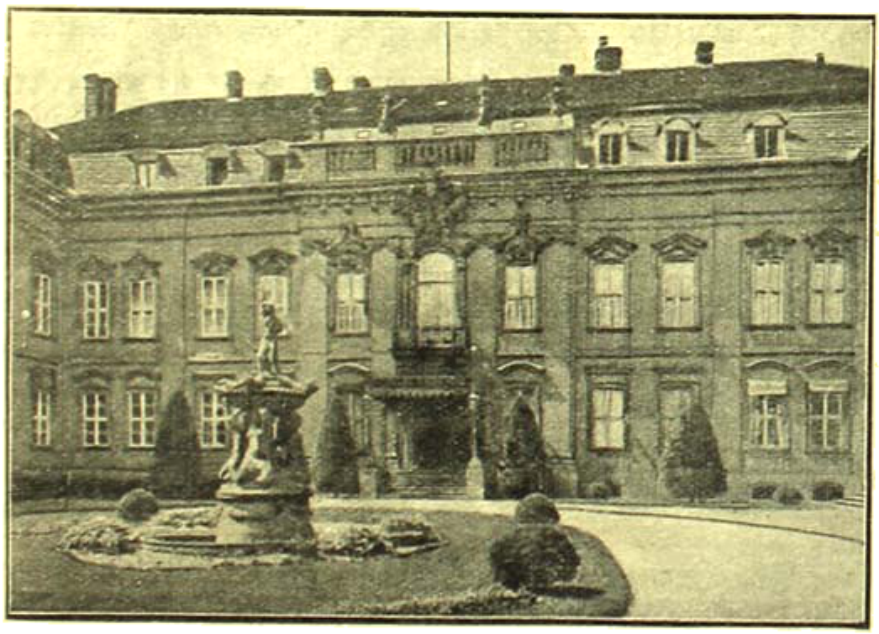

রিশ্‌ প্রেসিডেণ্টের প্রাসাদ

একটা বিহিত ব্যবস্থা করতে। সুবিশাল প্ল্যাটফর্ম্মের এক প্রান্তে লটবহরগুলির মাঝখানে, আমি বোধ হয় তৎক্ষণ পণ্ডিত চাণক্যের মত শোভা পাচ্ছিলুম; কারণ, ভাষানভিজ্ঞতার জন্য কারো সঙ্গে একটিও বাক্যালাপ করবার উপায় ছিল না। বন্ধুবর একটু দেরী করছিলেন, আর তার জন্য মনে মনে চটে উঠ্‌ছিলুম তাঁর উপর; এমন সময় বন্ধু গম্ভীরমুখে বিড়্‌বিড়্‌ করতে করতে ফিরে এলেন। তাঁর মুখের ভাবখানা খুব আশাব্যঞ্জক নয় দেখে জিজ্ঞেস্‌ করলুম "কি হলো?"

বন্ধুবর উত্তর করলেন "অনেক কষ্টে "গ্যাপেক রোমে" (ক্লোক-রুম) এর সন্ধান পাওয়া গেছে।"

আমি বল্লুম "তবেই তো হলো!"

বন্ধুবর মুখ বিকৃত করে বল্লেন "হ্যাঁ হয়েছে বটে, কিন্তু ব্যাটাছেলেগুলি মালিয়ে খেলে!"

অনেক কষ্টে বার কয় প্রশ্ন করার পর বন্ধুবর যা'

বল্লেন, তার সার মর্ম্ম এই—ষ্টেশনের কেরাণী—টিকেট্ কালেক্টর, পোর্টার—অনেককেই বিশুদ্ধ বইএর লেখা জার্ম্মেণ ভাষায় জিজ্ঞেস করে ক্লোক রুমের সন্ধান ও আমাদের গন্তব্য স্থল উলাণ্ড ষ্ট্রাসে যাবার পথের সংবাদ তিনি বের কর্ত্তে পারেন নি কারো মুখে! তখন অগত্যা ভাঙা ফ্রেঞ্চ ও পরে বিশুদ্ধ কথা ইংরেজীতে কথা বলেও তাদের বোঝাতে পারেন নি! দু' একজন তাঁর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছিল, দু একজন একটু মুখ টিপে হেসে মাথা নেড়েছিল! এতেও তিনি কিছু মনে করেন নি। শেষে কি না এক বেটা পোর্টার স্কন্ধদেশ সঙ্কুচিত করে, বিস্ফারিত নেত্রে, অস্বাভাবিক হস্ত ভঙ্গিমার দ্বারা তাঁর প্রশ্নের নির্ব্বাক জবাব দিলে! এতে কার না রাগ হয়!

সত্যি কথা! রাগ হয় বটে, কিন্তু রাগ করে লাভ নেই কিছু; বরং আমার একটু হাসিই পাচ্ছিল! ঠোঁট চেপে কোন রকমে তার বাইরের অভিব্যক্তিকে সংযত করে বল্লুম "চল তবে, ক্লোক্-রুমে এগুলিকে রেখে, ষ্টেশন থেকে বেরোনো যাক্, তখন যা' হয় হবে।" চারখানা হাতই লটবহরের গুরুভারে, আজানু পর্য্যন্ত বিস্তৃত করে আমরা ক্লোকরুমের উদ্দেশে রওয়ানা হলুম। বন্ধুবর তখনো রাগে গজ্ গজ্ কর্ত্তে কর্ত্তে বলছিলেন

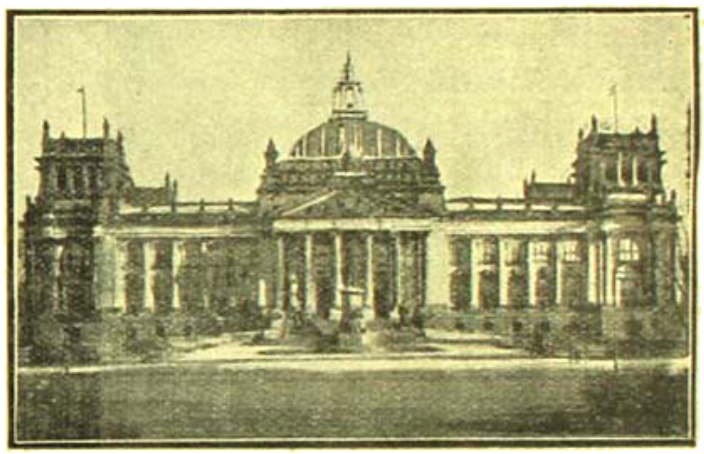

রিক্‌স্ট্যাগ্

বেরিয়ে এসে একটা প্রকাণ্ড চৌমাথায় পড়লুম! চৌমাথায় দাঁড়িয়ে, পৌনে সাত ফিট লম্বা ও তেম্নি চওড়া, পুলিশম্যান যেখানে রাস্তার চলাচল নিয়মিত ক'রে দিচ্ছে তাই দেখতে পাওয়া গেল। চিরাচরিত রীতি অনুসারে, তার মাথার হেল্‌মেটের উপর উঁচু শৃঙ্গটিই এ স্থলে হল আমাদের লক্ষ্য-স্থল! দুই বন্ধুতে তার কাছে পৌঁছে, হাত পা নেড়ে, দু একবার উলাণ্ড ষ্ট্রাসে, ও দু একবার প্যারিসের বন্ধু সেনগুপ্তের নির্দ্দেশমত "বান্‌হফ্ দু," এবং মাঝে মাঝে বন্ধুবর তাদের পূর্ব্বে "নাখ্" লাগিয়ে, আরো দু একটা জার্ম্মেণ শব্দ সংযোজনের প্রয়াসের পর, পুলিশম্যান্—

ব্রেনডেন্‌বার্গ আর্ক

"ব্যাটাছেলেরা না বুঝে ইংরেজী, না বুঝে ফ্রেঞ্চ, না বুঝে বিশুদ্ধ জার্ম্মেণ—একেবারে হস্তীমূর্খ নয় কি?"

মুখে হাসি চেপে গম্ভীর ভাবে বল্লুম "তা, আর বলতে!" মালপত্রগুলি ক্লোকরুমে রেখে, আমরা ষ্টেশন হতে আমাদের অদূরস্থিত বাস্ ষ্টাণ্ড দেখিয়ে, তর্জ্জনী নির্দ্দেশে এবং মুখে "আইন" উচ্চারণ করে বুঝিয়ে দিলে আমাদের এক নম্বর বাস ধর্ত্তে হবে! যাক্ বাঁচা গেল, তাকে "ডাংকে" জানিয়ে দুই বন্ধুতে গিয়ে বাসে চড়লুম! পয়সা

দেবার সময় বন্ধুবর বল্লেন "নাখ্ উলাও ট্রাসে।" ঠোঁট দুটি কুঞ্চিত করে মাথা নেড়ে বাস-চালক জানালে, না। তখন বন্ধুবর বল্লেন "বানহফ্ ছু।" চালক সম্মতিসূচক শিরঃ সঞ্চালন করে, দুখানা টিকেট দিয়ে চেঞ্জ ফিরিয়ে দিলে।

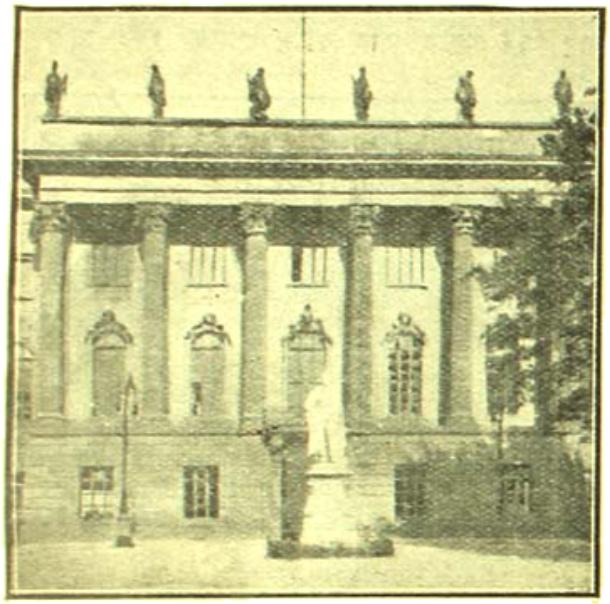

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়

বাস্-চালক আমাদের ছু ষ্টেশনের কাছে নামিয়ে দিলে, আমরা আবার অগতির গতি পুলিশম্যানের শরণাপন্ন হলুম। তখন প্রায় সাড়ে আটটা, কিন্তু বার্লিনের পথগুলি জনবিরল! তার উপর অল্প অল্প বরফ পড়ছিল। ফ্রান্স ও বেলজিয়মে শীত মোটেই ছিল না; কিন্তু জার্ম্মেণীতে প্রবেশের পর হতেই শীত বেশ লাগছিল! তাই ওভার কোটগুলির খোলা বুক, কাণ পর্য্যন্ত উঁচুতে তুলে, পকেটের মধ্যে হাত পুরে পুলিশম্যানের নির্দ্দেশমত আমরা বার্লিনের সুপ্রশস্ত রাজপথ দিয়ে চলছিলুম। পথগুলি যদিও প্যারিসের পথের মত সুন্দর নয়, তবু লণ্ডনের পথের চেয়ে অনেকটা খোলা, ও চওড়াও অনেক বেশী! আমরা খানিকক্ষণ এগিয়ে গিয়ে পুলিশম্যানের নির্দ্দেশ-মত বাঁয়ে ফিরে, উলাও ট্রাসে পেলুম, কিন্তু দু তিন মিনিট পরেই, বাড়ীর নম্বরগুলি দেখে বুঝতে পার্লুম আমরা উল্টো দিকে এসেছি! সুতরাং "এবাউট্ টার্ণ" করে আমরা উলাও ট্রাসের ডান দিকের ফুটপাথ ধরে চল্‌তে চল্‌তে প্রায় মিনিট দশ পরেই আমাদের গন্তব্য স্থল "হিন্দুস্থান এসোসিয়েশন" গৃহের দরজায় পৌঁছলুম। গন্তব্য স্থল পাওয়া গেল, কিন্তু দ্বার বন্ধ; বেলা তখন প্রায় ন'টা বাজে। সারারাত্রির ভ্রমণজনিত বেশ ক্ষিদেও পেয়েছিল, তাই বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়েই, কি করা যায় তাই দুই বন্ধুতে জল্পনা কল্পনা চলছিল! প্যারিসের বন্ধু মিঃ সেনগুপ্তের মুখে শুনেছিলুম, হিন্দুস্থান রেস্তোরাঁর মালিক মিঃ শোভানের সঙ্গে দেখা হলেই আমাদের সব বন্দোবস্ত ঠিক হবে! কিন্তু মিঃ শোভানের খোঁজ পাওয়া দূরে থাকুক, একজন লোকেরও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না যাকে জিজ্ঞেস্ করা যায় কখন হিন্দুস্থান এসোসিয়েশনের দোর খুলবে, আর কখনই বা মিঃ শোভানের সঙ্গে দেখা হতে পারে! প্রায় আধ ঘণ্টা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে কাটিয়ে, অধীর ভাবে, আমি কড়া নাড়তে আরম্ভ কর্লুম, যদি বা তাতে কেউ সাড়া দেয়। যেদিকে চেয়ে কড়া নাড়ছিলুম সেদিক থেকে কেউ সাড়া দিলে না; প্রায় পাঁচ মিনিট পরে, উল্টো দিকের ফ্ল্যাট হতে একটি মহিলা বের হয়ে এলেন। কিন্তু তাতেও সুবিধা বিশেষ কিছু হলো না, কারণ, বন্ধু অনেক কষ্টেও তাঁর কথা বুঝতে পার্লেন না! শেষে আকারে ইঙ্গিতে, ঘড়ির দিকে দেখিয়ে মহিলাটি বুঝিয়ে দিলেন যে এগারোটার আগে হিন্দুস্থান এসোসিয়েশনের দোর খুলবে না। অগত্যা তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা পথে বেরিয়ে পড়লুম।

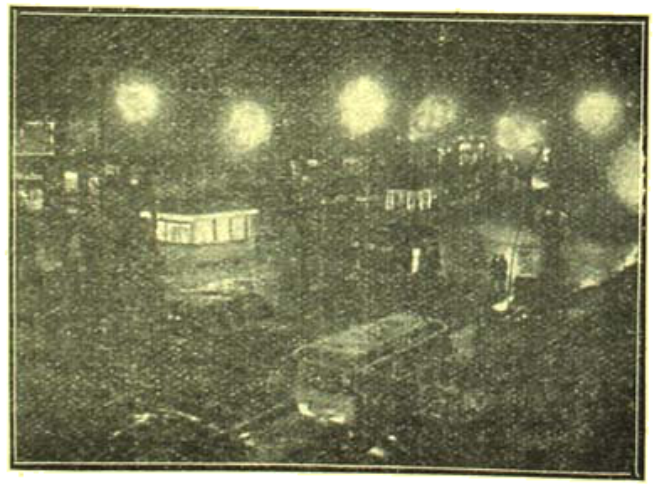

বার্লিনের নৈশ দৃশ্য (ক্রিড্রিকষ্ট্রাসে ইউণ্টার ডেন্ লিন্ডেন

তখন আমাদের গন্তব্য স্থল হল, যে কোন রেস্তোরাঁ; কারণ, না খেলে আর চলছে না! খানিক দূর এগিয়ে যেতেই একটার সন্ধান পাওয়া গেল ও দুই বন্ধুতে ঢুকে

পড়ে, চিমনির কাছটা ঘেঁসে বসলুম, কারণ বাইরের শীতে হাত পা অসাড় হয়ে আসছিল, তার উপর বন্ধুবরের হাতে দস্তানা ছিল না। আমাদের কি চাই জানবার জন্য ছুটে এলো একটি অল্পবয়স্কা মেয়ে। তার পর আরম্ভ হল, বন্ধুতে ও তাতে অবাক্ চিত্রাভিনয়, ও মাঝে মাঝে সবাক্‌ও (গ্রীক্. আমার কাছে অন্ততঃ) বটে! মেয়েটি ত হেসেই খুন! বন্ধুবর যতই তাকে বোঝাতে চান্ ততই সে হাসে! স্পষ্টই বুঝতে পারলুম, বন্ধুবর তাতে একটু রেগে উঠছেন। অবশেষে বন্ধু আগুনের কাছ ছেড়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও

বার্লিনস্থ রাজপ্রাসাদ সম্মুখে প্রথম উইলহেলম স্ট্যাচ্যুর মনুমেণ্ট

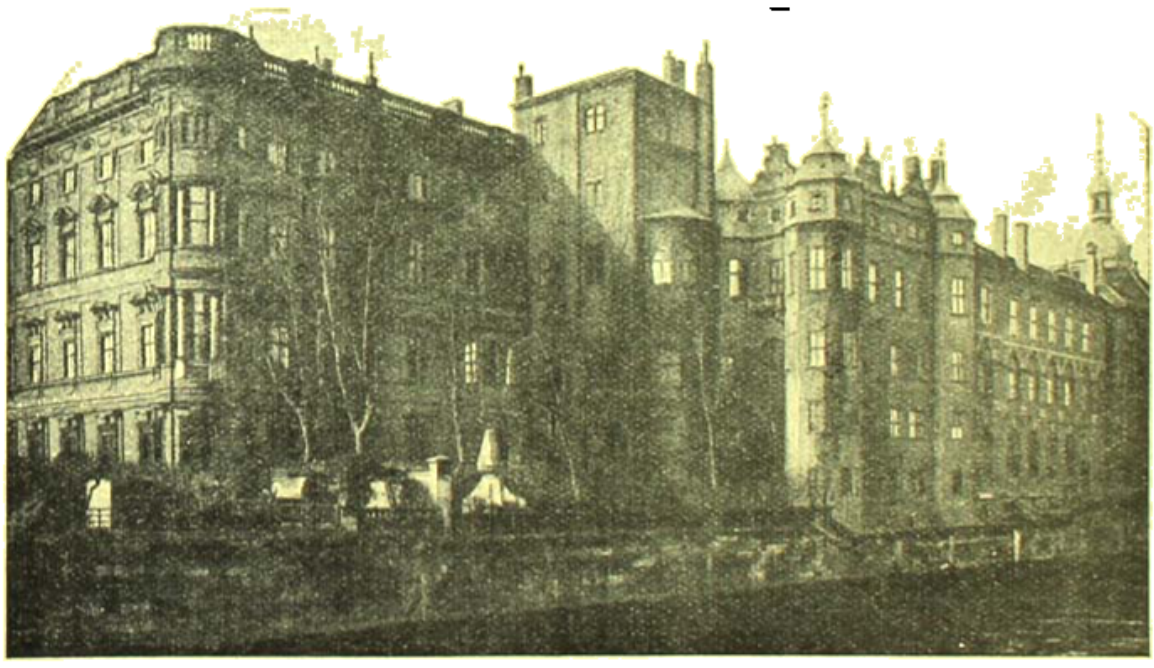

রাজপ্রাসাদ ও খ্রী নদী—বার্লিন

উঠে দোকানে গেলেন মেয়েটির সঙ্গে ও অঙ্গুলী-নির্দ্দেশে কতকগুলি খাবার নিয়ে ফিরে এলেন! আড় থাক্, কোন রকমে ঝুড়িবৃত্তি করে ও প্রায় আধ ঘণ্টা আগুনের কাছে বসে, দোকানওয়ালী মেয়েটিকে তার

পাচ্ছে!

জিনিষের দাম বুঝিয়ে দিয়ে, আমরা আবার পথে বেরিয়ে পড়লুম! মেয়েটিও আমাদের যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণ দোরে দাঁড়িয়ে আমাদের পানে তাকিয়ে রইল,—কিন্তু তখন আর তার মুখে সে হাসি ছিল না! আমরা আবার ফিরে এলুম শোভান্ ভাইরের খোঁজে! কিন্তু যার যেই রুদ্ধ সেই রুদ্ধ! এগারোটার পর সাড়ে এগারোটা বাজলো, তবু কোন পরিবর্ত্তন হ'ল না। তখন আমরা কি করা যায় তাই ভেবে বেরিয়ে এলুম, এবং পুলিশম্যানকে জিজ্ঞেস করে গিয়ে পৌঁছলুম, অগতির গতি বিদেশের বন্ধু কুক্ কোম্পানীর আড্ডায়। তাদের কাছে বার্লিনের দ্রষ্টব্য অনেক বিষয় জানতে পারা গেল, ও আড়াইটা হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, বার্লিন নগরীর সাধারণ দৃশ্য দেখার বন্দোবস্ত করে আবার ফিরে এলুম হিন্দুস্থান এসোসিয়েশনের বন্ধ দ্বারে! এবার ভাগ্যক্রমে সেখানেই একজন মহিলার সঙ্গে দেখা হলো, তাঁর নাম "বোজেন বোম্"। তিনি ভাঙ্গা ইংরেজীতে জিজ্ঞেস কর্লেন আমরা নূতন এসেছি বলে মনে হচ্ছে। থাকবার স্থান চাই কি না; হিন্দুস্থান এসোসিয়েশনে কেউ নূতন এলে তাঁর বাড়ীতেই তাঁরা স্থান ঠিক করে দেন ইত্যাদি! বাড়ীও দূরে নয়, একটি বাড়ী পরেই!

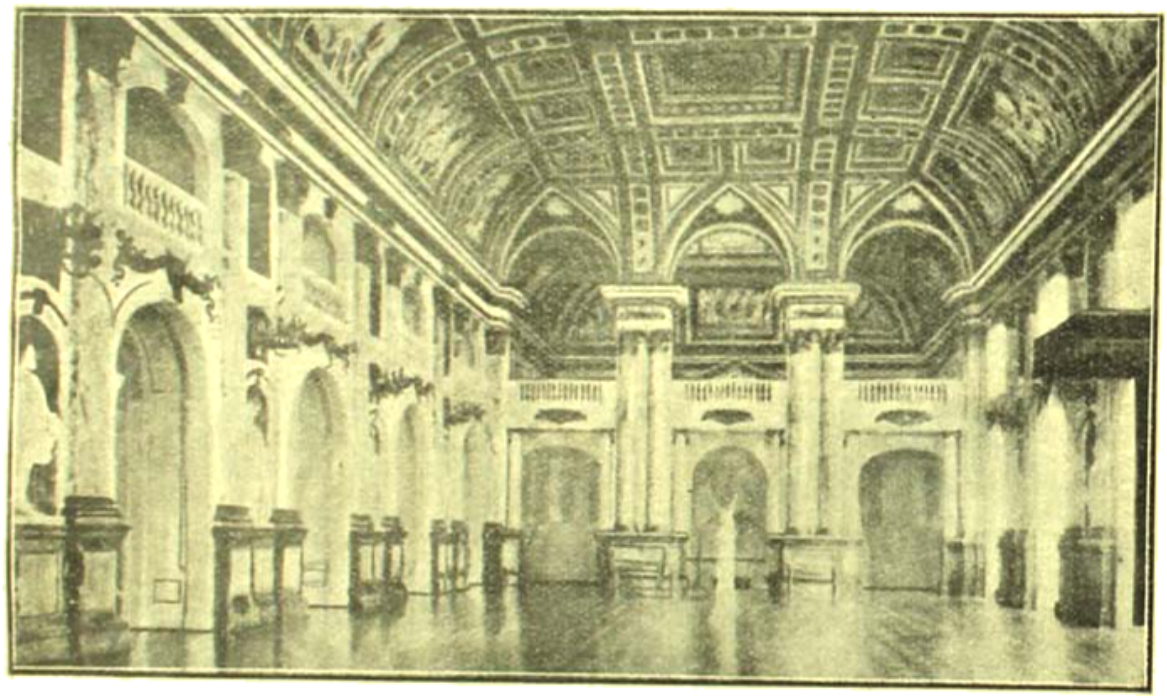

বার্লিন—রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষ

সেই সময় তাঁকে ভগবান্ প্রেরিত বলেই মনে হয়েছিল আমাদের। দুই বন্ধুতে, তাঁর বাড়ীতে গেলুম ও ঘর দেখে ভাড়া ঠিক করে, যতদূর সম্ভব সত্বর, প্রাতঃকৃত্য (যদিও তখন বেলা বারোটা) শেষ করে, তাঁকে জিজ্ঞেস কর্লুম ষ্টেশনে শীগ্‌গির যাওয়া যায় কোন্ পথে, কারণ, মালপত্রগুলি আনতে হবে! তাঁর কথামত আমরা "টিউবে" চড়েই রওয়ানা হলুম, 'ফ্রেডিরিক্ বানহফের' উদ্দেশে! গন্তব্য স্থলে নামলুম বটে যথাসময়ে, কিন্তু তার পরেই হল বিপদ্। রেলওয়ে ষ্টেশনে যাবার পথ জানি না, যাকে জিজ্ঞেস করি, হয় আমাদের কথা বুঝে না, না হয় আমরা তাদের কথা বুঝি না, অথবা কেউ জিজ্ঞেস করে "কোন ষ্টেশন," আমরা বলি "রেলওয়ে ষ্টেশন"। তার উত্তরে মাথা নেড়ে চলে যায়! এদিক, সেদিক, এপথে, ওপথে, একে জিজ্ঞেস্ করে, তাকে জিজ্ঞেস করে, এমন কি পুলিশম্যান্‌কে পর্য্যন্ত জিজ্ঞেস করে বিফল-মনোরথ হয়ে বোকার মত প্রায় এক ঘণ্টা নষ্ট করে আমরা শেষে বুদ্ধিমানের মত ফ্রেডরিক বানহফে গিয়ে আবার 'বানহফ্‌স্থর' উদ্দেশে টিউবে চড়লুম; উদ্দেশ আবার ওখানে গিয়ে তবে 'আইন' নম্বর' বাস চড়লে যদি ষ্টেশনের উদ্দেশ পাওয়া যায়। যথা চিন্তিতম্ তথা কৃতম্; তবে গিয়ে পৌঁছলুম, রেলওয়ে

ষ্টেশনে ; দেখলুম বড় বড় করে লেখা আছে "Potsdam।" অথচ এই নামটুকু বলতে না পারায় দরুণই, বেশী দূরে নয়, কাছেই প্রায় এক ঘণ্টা ঘুরতে হয়েছিল আমাদের! এরি নাম দুর্দ্দৈব!

যাক্ লোকক্ষয়ের হেপাজত হতে লটবহরগুলি উদ্ধার করে, আবার ফিরলুম "পেন্‌শন্ বোজেন বর্গে"র গৃহে! আমাদের সেদিনের এ্যাড্‌ভেঞ্চারের কথা কারো কাছে বলিনি, লোকের কাছে বোকা হবার ভয়ে। কিন্তু নিজেকে ত ফাঁকি দেওয়া যায় না, বোকা যে হয়েছিলাম, সেটা ঠিক! এর পর যখন হিন্দুস্থান এসোসিয়েশনে পৌঁছলুম, তখন চিরবন্ধ দ্বারের অর্গল খুলে গেছে! সেখানে কজন পূর্ব্ব-পরিচিত, ও অপরিচিত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা ও পরিচয় হ'ল। কথাবার্ত্তার মধ্যে সেখানেই মধ্যাহ্নভোজন রূপ অত্যাবশ্যকীয় কাজটি শেষ করে আমরা বের হলুম বার্লিন সহরের সাধারণ দৃশ্য দেখতে!

প্রায় আড়াইটার সময় উন্‌টার্ ডেন লিনডেন, ফ্রিডরিক্ ষ্ট্রাসের মোড় হতে আমাদের বাস ছাড়লে, এবং উইলহেলম্ ষ্ট্রাসের মাঝে দিয়ে চলতে আরম্ভ কল্লে। এ অঞ্চলেই বার্লিনের সরকারী দপ্তরখানাগুলি এবং রিশ্‌এর প্রেসিডেণ্ট ও চ্যান্সেলারের প্রাসাদ অবস্থিত। অতঃপর আমরা প্রিন্স্ এলবার্ট ষ্ট্রাসে হয়ে এথ্‌নোলোজিকেল মিউজিয়মের পাশ দিয়ে পট্‌স্‌ডামের ষ্ল্যাপ্, লিপ্‌জিগ্ ষ্ট্রাসে, ফ্রিড্‌রিক এবং মারগ্রাটেন্ ষ্ট্রাসে প্রভৃতি, বার্লিনের জগদ্বিখ্যাত ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলগুলি অতিক্রম করে গেলুম। সেখান হতে ষ্টেট্ অপেরার কাছ দিয়ে, রাজপ্রাসাদ ও প্রথম উইলহেলমের স্ট্যাশনেল মনুমেণ্ট ছাড়িয়ে, লষ্ প্ল্যাজে নেপচুন্ ফোয়ারা দেখে, ষ্ট্রিট্‌ষ্ট্রাসের মধ্য দিয়ে, বার্লিনের পুরাতন অংশের মধ্যে প্রবেশ কল্লুম। এখানে অনেকগুলি পুরাতন রাস্তা একে একে পার হয়ে, আমরা সহরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছলুম! এখানেই বার্লিনের দুটি সুপ্রসিদ্ধ টাউন-হল অবস্থিত। তার পর কোনিগ্‌ষ্ট্রাসের মধ্য দিয়ে, নূতন বাজার ও বিখ্যাত লুথার মনুমেণ্ট দেখে আমরা লুষ্ট্‌গার্টেনে পৌঁছলুম। এ স্থানে কেথিড্রেল, পুরাতন মিউজিয়ম ও তৃতীয় ফ্রেড্‌রিক

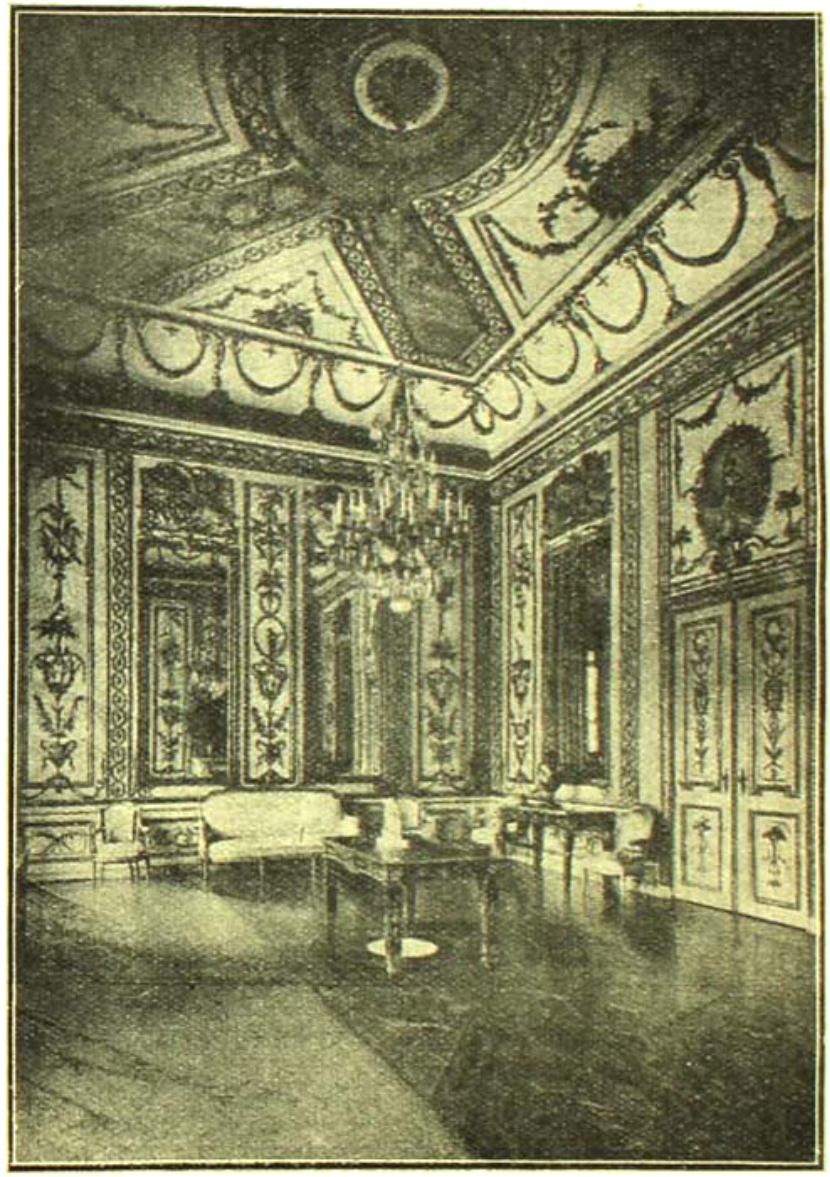

বার্লিন প্রাসাদের সঙ্গীত-গৃহ

উইলহেলমের মূর্ত্তি প্রভৃতি কয়টি দ্রষ্টব্য স্থান আছে। তার পর আমরা মিউজিয়ম ষ্ট্রাসে দিয়ে চলতে আরম্ভ কর্লে, হাতের ডান দিকে ন্যাশনেল গ্যালারি, নূতন মিউজিয়ম, ডিউট্‌স্ ও কাইজার ফ্রেড্‌রিক মিউজিয়ম দেখতে পেলুম। শেষোক্ত মিউজিয়মটির প্রকাণ্ড গম্বুজটি

অনেক দূর হতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেখান হতে আমরা আবার উন্টার ডেন্ লিন্ডেনে পড়ে এক মোড় হতে অন্য মোড় পর্য্যন্ত আগাগোড়া দেখে গেলুম; এবং কনসার্ট একাডেমি, বিশ্ববিদ্যালয়, ফ্রেড্রিক দি গ্রেটের মূর্ত্তি, ষ্টেট লাইব্রেরী ও হোম অফিস্ প্রভৃতি দেখতে পেলুম। উন্টার ডেন লিন্ডেনের এক প্রান্তে, ফরাসী হুগোনট ও আর্ট মুসি অবস্থিত। এর পর আমরা ব্রেন্ডেন্-বার্গ আর্কের নীচে দিয়ে টায়ারগার্টেনএ পৌছলুম। আর্কের উপরে বিজয় রথের জয়যাত্রার মূর্ত্তিটি অতীব জীবন্ত বলে মনে হয়। টায়ার গার্টেন পুরাকালে মৃগয়ার স্থান ছিল, এবং বর্ত্তমানে প্রকৃতির বিজন বিপিন বলে পরিচিত। এখানে প্রত্যহ অসংখ্য কর্ম্মক্লান্ত লোক, ভ্রমোপনোদনের জন্য ছুটে আসে। ব্রেন্ডেনবার্গ আর্ক পার হয়েই সিগাসেলি অথবা এভিনিউ অব্ ভিক্টরি অবস্থিত! ভূতপূর্ব্ব কাইজার ইহা নির্ম্মাণ করেন। বার্লিন নগরীতে, এটা যুগযুগান্তর ধরে তাঁর একটা শ্রেষ্ঠ দানরূপে পরিগণিত হবে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। রাস্তার দু' পাশে শ্রেষ্ঠ শিল্পী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বত্রিশটি মর্ম্মরমূর্ত্তি আছে। তার মধ্যে সম্রাটের নিজের মূর্ত্তি ও তৎপশ্চাতে সমসাময়িক দুইজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রতিকৃতিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক কথায় বলতে গেলে, এই মূর্ত্তিগুলির মাঝেই যেন সমস্ত ব্রেন্ডেন্বার্গ-প্রুশিয়ার ইতিহাস মর্ম্মর-অক্ষরে লিখিত আছে।

অতঃপর আমরা গিয়ে পৌছলুম রিপাব্লিক প্লাজে! এখানের জয়স্তম্ভটি উল্লেখযোগ্য! ইহা প্রায় দুহাজার ফিট্ উঁচু, এবং ১৮৬৪, ১৮৬৬ ও ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে প্রুশিয়ার বিজয় যাত্রার স্মৃতিস্তম্ভরূপে নির্ম্মিত হয় ও ১৮৭৩ ইংরেজীতে এর আবরণ উন্মোচিত হয়। এরই ডান দিকে

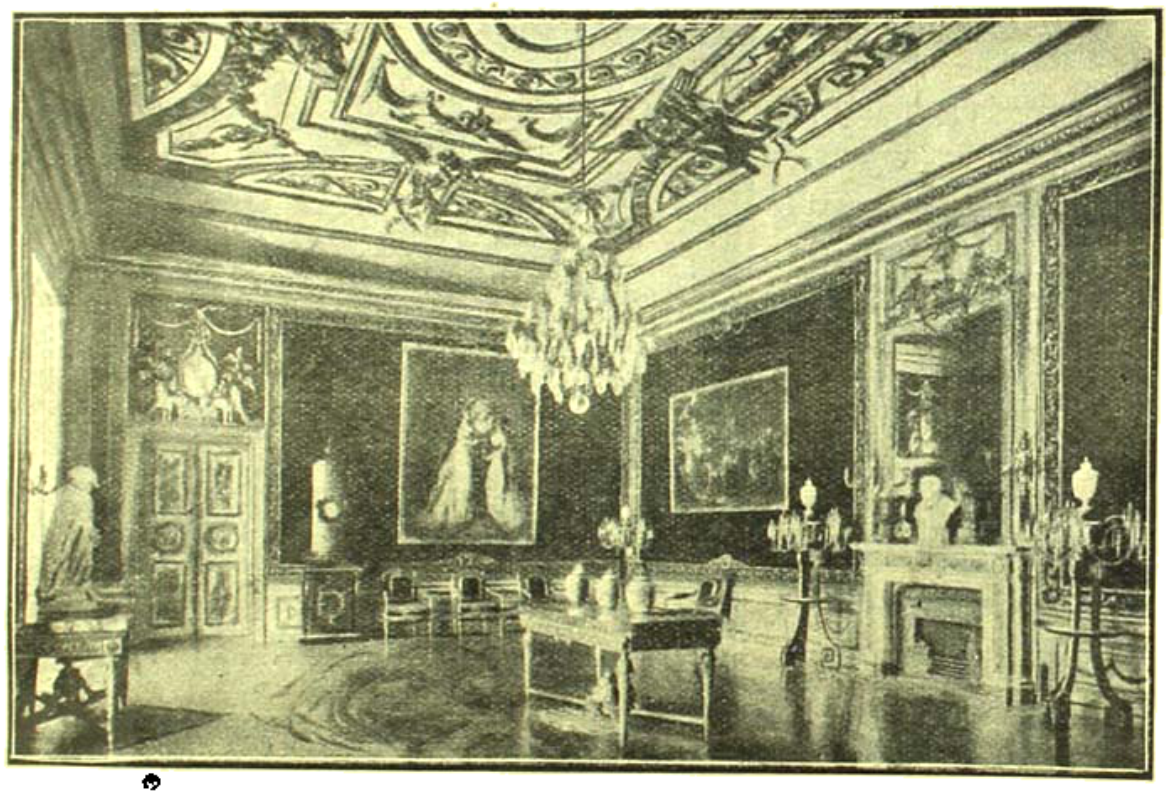

বার্লিন প্রাসাদের সিংহাসন-গৃহ

জার্ম্মেণীর হাউস্ অব পার্লামেণ্ট অথবা রিশ্ট্যাগ্ অবস্থিত। ইহার নির্ম্মাণ ১৮৮৪ ইংরেজীতে আরম্ভ হয়ে, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। রিশ্ট্যাগের সম্মুখেই, বিখ্যাত রাজনীতিক প্রিন্স্ বিসমার্কের মূর্ত্তি! ব্রোয়ারের উত্তরে রুন্ ও পশ্চিমে মুল্ট্‌কি মনুমেণ্ট ও তৎপশ্চাৎ ক্রোল্ নামক অপেরা অবস্থিত! সেখান হতে ইন্ডেন্ জেল্টেন্ রাস্তা হয়ে আমরা স্প্রী নদীর তীরে তীরে চারটি স্মৃতিস্তম্ভ সম্বলিত গ্রোসার ষ্টার্ণে পৌছলুম। এখানে

একটি সুদৃশ্য ফোয়ারা আছে। এগুলির সব কটিই ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মেণ সম্রাট দ্বিতীয় উইলহেলম্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়েছিল। অতঃপর আমরা আবার টায়ার গার্টেনের

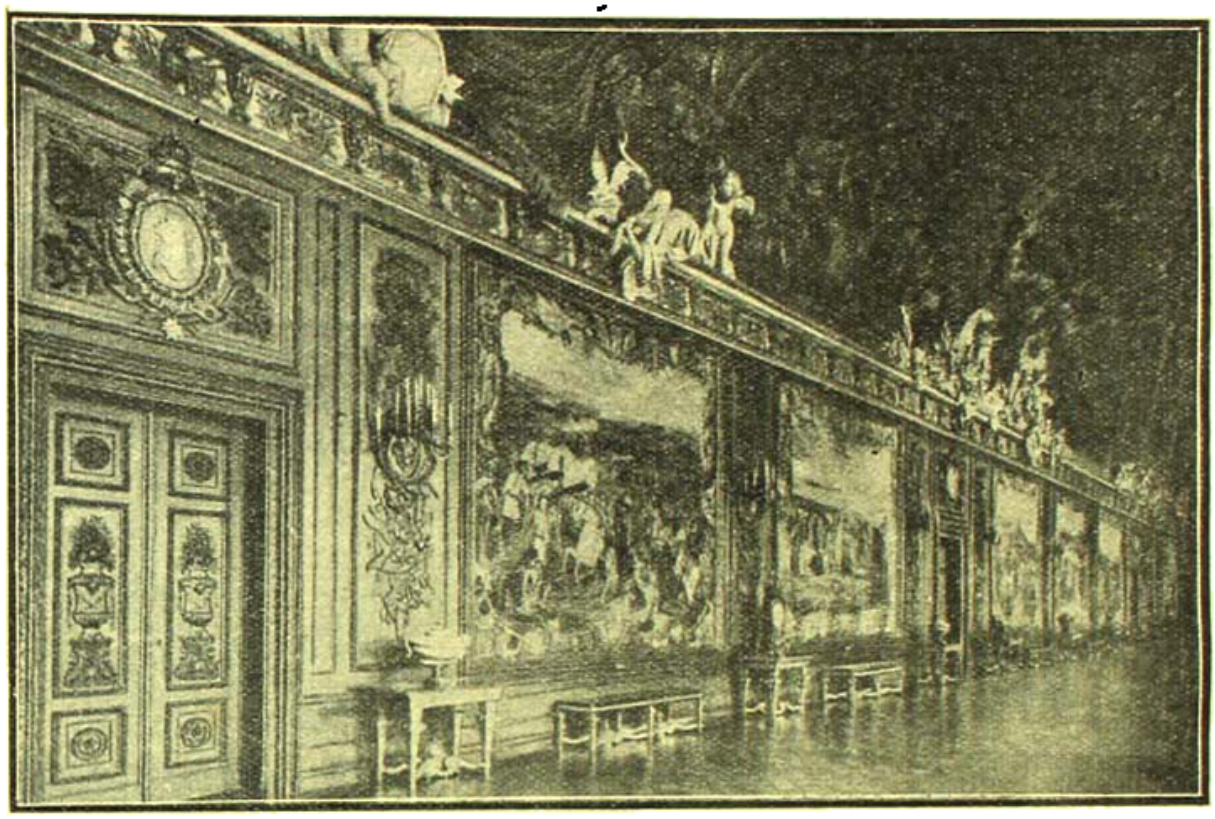

বার্লিন প্রাসাদে চিত্রপূর্ণ দেয়াল

মধ্য দিয়ে শার্লোটেনবার্গ পুলের উপর দিয়ে, শার্লোটেনবার্গে পৌঁছলুম। এই পুলের উভয় পার্শ্বে, প্রথম ফ্রেডেরিক ও তাঁহার রাণী সোফি শার্লটের দুইটি ব্রোন্জ্ মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। সেখানে বার্লিনার ষ্ট্রাসে দিয়ে যেতে যেতে, আমরা ডান দিকে শার্লোটেনবার্গ টাউনহল দেখতে পেলুম ও সম্রাট তৃতীয় ফ্রেডেরিকের মনুমেণ্ট সংযুক্ত লুইসেন প্ল্যাজ্ নাম স্কোয়ারে পৌঁছলুম। স্কোয়ারের পশ্চাতেই শার্লোটেনবার্গ প্রাসাদ। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে রাণী সোফি শার্লট এখানে থাকতেন এবং পরে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট তৃতীয় ফ্রেডেরিকের একোনশত দিনের স্বল্পায়ু রাজত্বকালে, ইহা সম্রাটের আবাসস্থল ছিল। পরে এখানেই রাজমাতা ভিক্টোরিয়া থাকতেন! প্রাসাদের সংলগ্ন পার্কে মুসোলিয়ম্ অবস্থিত! ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হয় এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে একে অনেকটা বাড়ানো হয়। এখানে রাজা তৃতীয় ফ্রেডেরিক ও তাঁর রাণী লুইস্, এবং সম্রাট প্রথম উইলহেলম ও সম্রাজ্ঞী আগাষ্টার সমাধি আছে! এখান-

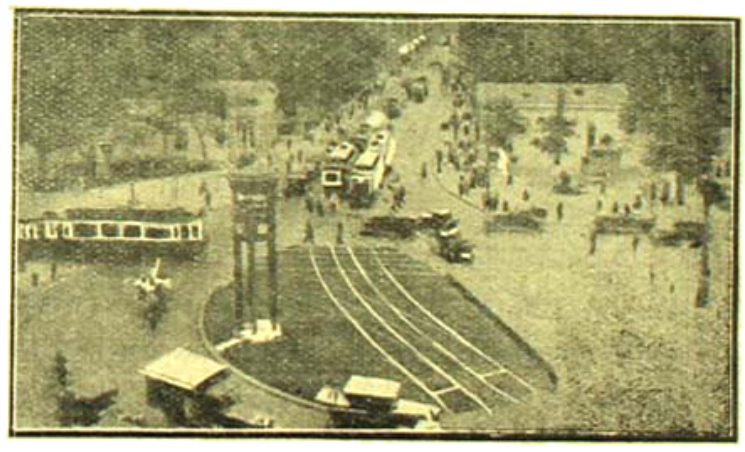

পট্সডাম প্লাজ

কার মর্ম্মর-নির্ম্মিত সমাধিস্থানগুলি বাস্তবিকই অতি চমৎকার!

এর পরে ষ্টাসে, কাইজারডাম্ ও হির ষ্ট্রাসে হয়ে আমরা বার্লিনের প্রদর্শনী কেন্দ্রে (Exhibition centre)

পৌঁছলুম। এ স্থানটি অতি আধুনিক এবং সম্প্রতি নির্ম্মিত হয়েছে! এখানে আটটি সুবিশাল কক্ষ আছে এবং বেতারবার্ত্তা প্রচারের টাওয়ার অবস্থিত। ইহা প্রায় সাড়ে চারশো ফিট্ উঁচু এবং গাইডের মুখে শুনলুম এর উপর হতে না কি সমস্ত বার্লিন সহরটিকে চমৎকার দেখায়! অতঃপর আমরা লিট্‌জেন্‌সি নামক একটি হ্রদের পাশ দিয়ে কোনিগস্‌উয়েস্‌ পার হয়ে বিসমার্ক ষ্ট্রাসেতে পৌঁছলুম ও অল্পক্ষণের মধ্যেই বার্লিনের সুপ্রসিদ্ধ উন্‌টার ডেন্ লিনডেন্ হয়ে আমাদের রওয়ানা হওয়ার স্থানে আবার ফিরে এলুম! যা' মনে হল, তাতে ধারণা করতে পার্লুম, বার্লিন যদিও প্যারিসের মত জাঁকজমক ও সৌন্দর্য্যের দাবী রাখে না, তবু তার একটা নিজস্ব স্বতন্ত্র সৌন্দর্য্য আছে! যদিও দ্বাদশ শতাব্দীতেই বার্লিনের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, তবু নব প্রুশিয়ার রাজধানীরূপে ছ'শো বছর পরে, ফ্রেডেরিক প্রথম উইলিয়াম ও ফ্রেডেরিক দি গ্রেটের রাজত্ব সময়েই বার্লিন প্রথম খ্যাতিলাভ করে! অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বার্লিনের লোকসংখ্যা ছিল, দেড় লক্ষ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে একশো বছরেও আট লক্ষ ছিল তার সংখ্যা!

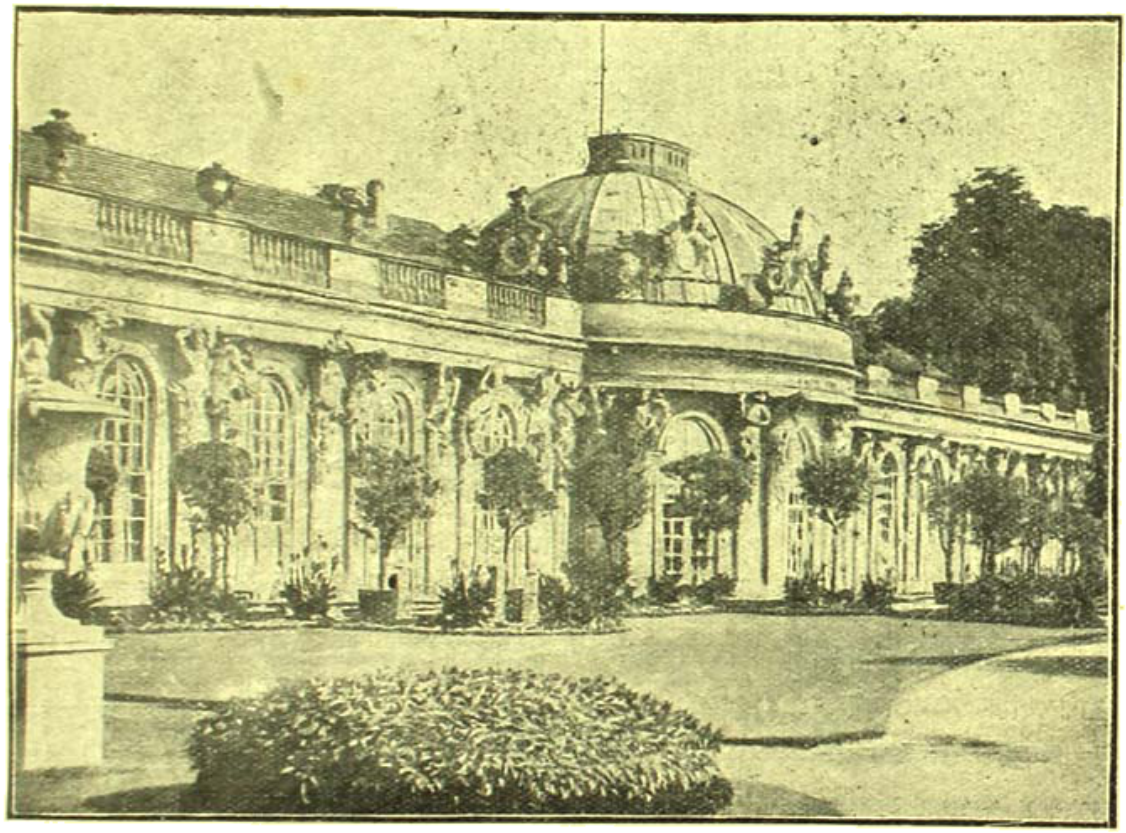

সেনসাউসি প্রাসাদ—পটস্‌ডাম

একে ত আগের রাত্রির, ভ্রমণজনিত ক্লান্তি, তৎপর অকারণে ষ্টেশন হতে ষ্টেশনান্তরে গুরু প্রাতর্ভ্রমণ; তার উপর একদিনে সমস্ত বার্লিন ভ্রমণ! সুতরাং যখন বাস্ হতে নামলুম তখন আমাদের অবস্থা ঠিক, জনসমাকীর্ণ সিনেমা হলে, সারাদিন সিরিয়েল, সমগ্র একখানা ছবি দেখে বাইরে এলে, অবস্থা যেমন হয় ঠিক তেম্নি! বায়োস্কোপের ছবির মত একটির পর একটি, কত ছবি ভোঁ ভোঁ করে চলে গেছে, "পিবন্নইব চক্ষুভিঃ" দেখেছি, কিন্তু তাতে কিন্তু মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই বার্লিন এত খ্যাতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে যে—তার লোক সংখ্যা আট লক্ষ হতে তেতাল্লিশ লক্ষে দাঁড়ায় ও বার্লিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগরীদের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করে! যদিও আমাদের অভিজ্ঞতা অতি অল্প সময়ের, তবু আমাদের মনে হ'ল, এমন দিনও আসতে পারে, যেদিন ধনে, জনে ও সমৃদ্ধিতে বার্লিন হয় ত—তার চেয়ে শ্রেয়ঃ অপর তিনটি নগরীকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে!

সে রাত্রিতে আমাদের বেড়াবার মত মনের অথবা শরীরের অবস্থা ছিল না। হিন্দুস্থান এসোসিয়েশনে, দিব্যি ডাল, ভাত, মাছের ঝোল প্রভৃতি, বিদেশ বিভূঁয়ে আয়াস-লভ্য দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যযোগে আহার শেষ করা গেল! তার পর পূর্ব্ব ও সদ্যঃ-পরিচিত বার্লিনবাসী বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গল্প-গুজব করা গেল অনেকক্ষণ! তাদের মধ্যে দু'চারজন ভাগ্য বিড়ম্বনায় স্বদেশের ক্রোড় হতে নির্ব্বাসিত হয়ে বার্লিনে নির্ব্বাসিতের জীবন যাপন কচ্ছেন! তাঁদের মুখে, সে দেশ, লোকজন, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক সংবাদ

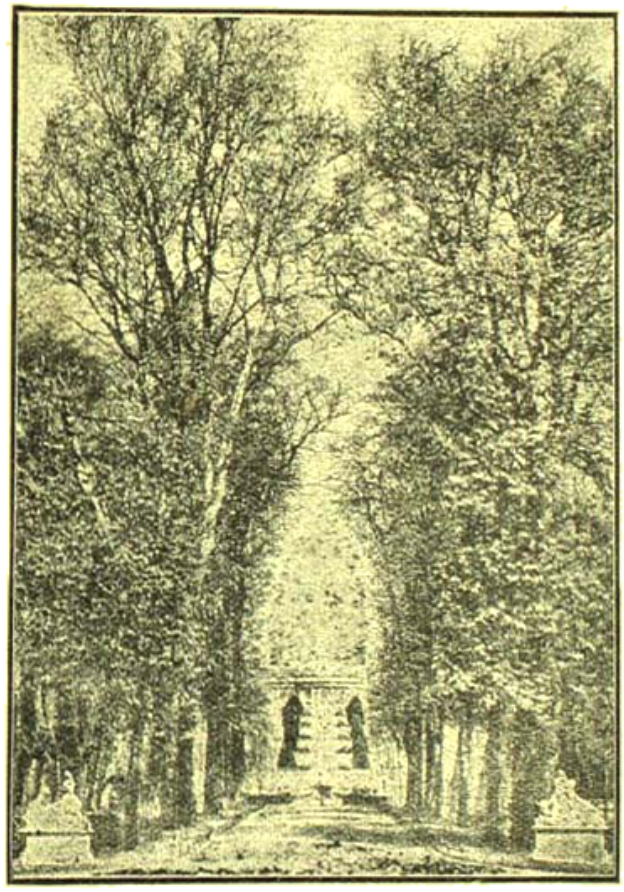

সেনসাউসি পার্ক, দূরে প্রাসাদ

পাওয়া গেল! বন্ধুবর জার্ম্মেণ জাতির সাধাসিধে ও বিলাসবিহীন অথচ শ্রমসহিষ্ণু জীবনের কথা জিজ্ঞাসা কর্লে, তত্রত্য অনেক বন্ধু বল্লেন, জার্ম্মেণীর সম্বন্ধে বাস্তবিকই ও কথাগুলি খাটে! তবে বেচারারা যুদ্ধের গুরু ঋণের ভারে একেবারে মুষড়ে পড়েছে। তবু এত অল্প সময়ের মধ্যে যা' উন্নতি এদের হয়েছে তা' বাস্তবিকই বিস্ময়কর! ব্যবসা-বাণিজ্য, কি শিল্প-বিজ্ঞানে এরা এতদূর এগিয়েছে যে, অন্য যে কোন জাতির সে স্থানে পৌঁছাতে আরো পঞ্চাশ বছর লাগবে। কথাটা যে খুবই সত্যি, সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না; কারণ, এডিনবরায়, একটা প্রকাণ্ড বেল্-জার (Bell-Jar) হঠাৎ ভেঙ্গে গেলে, লেবরেটরী বন্ধকে তা' কিনে এনে রাখতে বল্লুম। সে হেসে বল্লে তার জন্য এক মাস সময় দরকার; কারণ, জার্ম্মেণী হতে না এলে, ওর স্থান শূন্যই থাকবে! তা' ছাড়া বিলাতে দেখেছি নিত্য-

প্রিয় কুকুরসহ সম্রাট—ফ্রেডেরিক দি গ্রেট

ব্যবহার্য্য অনেক দ্রব্য যেমন, সুঁচ, কাঁটা প্রভৃতি, সবই জার্ম্মেণীতে প্রস্তুত! আর ঔষধপত্রের ত' কথাই নেই। বন্ধু আরো বলছিলেন, কিন্তু দুঃখের কথা—আধুনিক সভ্যতা ও বিলাসের ঢেউও এ দেশে এসে লেগেছে! তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাই

ভেরাইটি, ফুন প্রভৃতি সঙ্গীতগৃহ, ও সিনেমা ও নৃত্য-গৃহগুলিতে! এদের কোন কোন নৃত্যগৃহে না কি দর্শকদের মধ্যে টেলিফোন ও অটোমেটিক চিঠি পাঠাবার বন্দোবস্ত আছে! পরিচিত কি অপরিচিত যে কেউ, পরিচিতা কি অপরিচিতা যে কোন কিশোরী অথবা যুবতীকে, নৃত্যসঙ্গিনী-রূপে প্রার্থনা করেন, অথবা তাদের কাছে প্রেম নিবেদন করেন, তাদের মারফতে বার্তা ও পত্র পাঠিয়ে! ইত্যাদি ইত্যাদি! আধুনিকতার লীলানিকেতন, প্রেক্ষা অথবা নৃত্যগৃহে হয় ত এটি হতে পারে, কিন্তু ফরাসী দেশের হাটে, ঘাটে, মাঠে, অথবা ইংলণ্ডের নানা স্থানে যেমন বিলাস ও ব্যসনের অবাধ স্রোত বইতে দেখেছি, আমাদের স্বল্প অভিজ্ঞতায় জার্ম্মেণীতে তেমনটি দেখতে পাই নি, এই অন্ততঃ আমার মনের দৃঢ় ধারণা!

ভলটেয়ার কক্ষ—সেনসাউসী প্রাসাদ

রাত্রিতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বিশেষ কিছু নেই, শুধু রাত সাড়ে এগারোটায়, চাবী খুলে প্রথমতঃ বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে ও দ্বিতীয়তঃ ফ্ল্যাটে ঢুকবার সময় যা নাকালের শেষ হতে হয়েছিল, সেটা ছাড়া! অন্ধকারের মধ্যে কিছুতেই চাবী দিয়ে দরজা খোলে না; পকেটের দেশলাইয়ের সব কটি কাঠি পুড়ে গিয়ে হাতে ধরো, তবু রুদ্ধ দ্বার খোলে না! বন্ধুবর ত মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন! শেষে শেষবারের মত চেষ্টা করতে গিয়ে—একবার নয় দু'দুবারই—কোন রকমে দোর খুললো! দুপুর রাতে চোর বলে যে পুলিশের হাতে পড়তে হয় নি সেই ভাগ্যি! যাক্, তার পর সারা দিনের পরিশ্রান্ত দেহটাকে "শয়নে পদ্মনাভকে"র হাতে ছেড়ে দিয়ে কখন যে নিদ্রাদেবীর কোলে ঢলে পড়েছিলুম তা' নিজেই জানি না।

পরদিন ভোরে প্রায় নটায়, বাড়ীতেই প্রাতরাশ শেষ করে, বের হওয়া গেল বাজারে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দেখবার জন্য! তখন দোকানপাটগুলি সব খুলে নাই; তাই কতক কতক দেখে ট্রামে চড়ে গেলুম হুশ্ মিউজিয়ম দেখতে! এটি হুশ্ প্রাজে অবস্থিত এবং যুদ্ধের পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব কাইজারের বার্লিনস্থ প্রাসাদ ছিল! তখন বোধ হয় কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি, যে অত অল্প সময়ের মধ্যেই তা' মিউজিয়মরূপে, সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য হয়ে উঠ্‌বে! উয়োরোপের সব দেশেই রাজপ্রাসাদগুলির পরিণতি হয়েছে যাদুঘরে। যে যে দেশ হতে, রাজতন্ত্র নির্ব্বাসিত হয়ে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সব স্থানেই প্রাসাদগুলির মধ্যে মিউজিয়ম স্থাপিত হয়েছে। প্যারিসের পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মিউজিয়ম, লুভ্‌ও এক কালে রাজপ্রাসাদ ছিল। চতুর্দ্দশ লুইর লীলা-নিকেতন ভার্সেল প্রাসাদও এখন সাধারণের দ্রষ্টব্য স্থান! ভিয়েনারও সম্রাট ফ্রান্সিস্ জোসেফের প্রাসাদের ভাগ্যে একই পরিণতি ঘটেছে। শুনেছি সেণ্ট পিটার্সবার্গে (বর্ত্তমান লেনিনগ্রেড) জারের প্রাসাদও সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি বলে পরিগণিত! এমন কি স্কট্‌ল্যাণ্ডের মেরী কুইন অব স্কটের বাসস্থান হলিরুড্ প্রাসাদ পর্য্যন্ত এ ভাগ্য এড়াতে পারে নি! সুতরাং ভূতপূর্ব্ব কাইজারের বার্লিনস্থ রাজপ্রাসাদ, এবং শার্লোটেনবার্গ প্রাসাদ প্রভৃতিও বর্ত্তমানে মিউজিয়মরূপেই পরিবর্ত্তিত হয়েছে! এই সুবিশাল প্রাসাদটির বাইরের

চেহারা দেখে মনে হয় না, এক কালে, বেশী দিন আগে নয়, পোনর বছর আগেই ইহা প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট কাইজারের আবাসগৃহ ছিল! সমস্ত প্রাসাদটিই যেন কেমনতর একটা বিষণ্ণভাব মাখানো; দেখে মনে হয়, যেন যুদ্ধের পর, কেউ একদিনের জন্যও ওর সংস্কারে হাত দেয় নি, অথবা পুরাতন ঐশ্বর্য্য ও জাঁকজমকের দিন হারিয়ে, দেশদেশান্তর হতে আগত অসংখ্য দর্শকের কাছে বিমর্ষভাবে যেন বলছে "দেখ কি ছিলুম, আর কি হয়েছি!"

প্রাসাদের সম্মুখে সম্রাট প্রথম উইলহেল্মের জাতীয় মনুমেণ্ট! সু-উচ্চ বেদীর উপরে সম্রাটের যোদ্ধবেশে অশ্বারোহণের প্রতিমূর্ত্তি! বেদীর চারি দিকে অনেকগুলি দেবদূত ও দেবকন্যার মূর্ত্তি! তারা যেন সমস্বরে—জার্ম্মেণীর নব অভ্যুদয়ের গাথা প্রচার কর্চ্ছে! চারি দিকে চারিটি সিংহের প্রতিমূর্ত্তি—জার্ম্মেণ জাতির সিংহ-বিক্রমের প্রতীক-রূপেই যেন নির্ম্মিত হয়েছে! রাজপ্রাসাদটির নীচে দিয়েই, ক্ষীণকায়া স্প্রী নদী ধীরে ধীরে বয়ে যাচ্ছে! স্প্রী নদী হলেও আমাদের দেশের তুলনায় নদী নামের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত; আমার মনে হল মারাঠা খাতের মতনই! অথচ এই নদী বার্লিনে অবস্থিত বলেই তার এত নাম! শুনেছি প্রাসাদের নীচে প্রবহমানা ক্ষীণকায়া স্প্রী নদী ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মেণ সম্রাটের অতীব প্রিয় ছিল! প্রাসাদের দ্বিতল ও ত্রিতলের কক্ষগুলি হতে, স্প্রী নদীকে বাস্তবিকই খুব সুন্দর দেখায়!

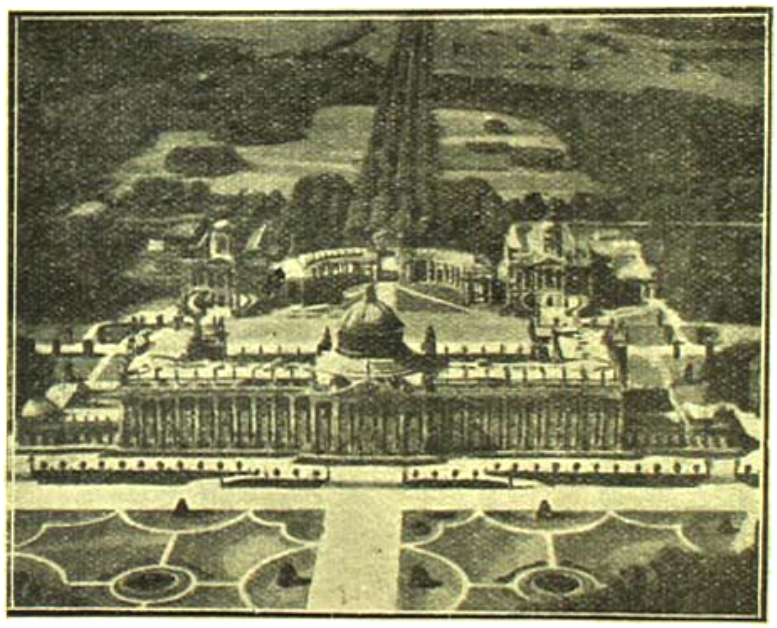

এরোপ্লেন হইতে নূতন প্রাসাদের দৃশ্য

ভূতপূর্ব্ব কাইজারের খাস কক্ষগুলি, আগে যেমন সজ্জিত ছিল, এখনও তেমি সজ্জিত রাখা হয়েছে। কক্ষগুলির সজ্জা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব! কোন কোন কক্ষে, জার্ম্মেণ জাতির নানা যুদ্ধে বিজয় লাভের সুবৃহৎ চিত্রগুলি দেওয়ালের গায়ে অঙ্কিত আছে; আবার কোন কোন হলে প্রুশিয়ার রাজাদের এবং পরবর্ত্তী জার্ম্মেণ সম্রাটগণের প্রকাণ্ড তৈলচিত্রগুলি সযত্নে রক্ষিত আছে! ভূতপূর্ব্ব কাইজারের যোদ্ধবেশে চিত্রই অনেকগুলি আছে! তা' দেখে মনে হয়, সম্রাট একজন তীক্ষ্ণধী, আত্ম-নির্ভর, যুদ্ধকুশল ব্যক্তি ছিলেন! জার্ম্মেণ বাহিনীর নায়করূপে, অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহার যে প্রতিকৃতি আছে, তাহা বাস্তবিকই অতি চমৎকার! কী উন্নতবক্ষ, কী বীরত্বব্যঞ্জক মুখশ্রী, এবং কী অদ্ভুত শক্তি-সম্পন্ন তাঁর তীক্ষ্ণ নয়ন-জ্যোতিঃ! জন্মাবধি তাঁর একখানি হাত অকর্ম্মণ্য ছিল; তা সত্ত্বেও যুদ্ধবিদ্যায় ও সেনা-পরিচালনায় তিনি এতটা পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। তা' ছাড়া সম্রাট ফ্রেডেরিক্ দি গ্রেট, প্রথম উইলহেল্ম, ফ্রেডেরিক্ উইলহেল্ম প্রভৃতি সম্রাটগণের প্রতিকৃতিগুলি সযত্নে দেওয়ালের গায়ে রক্ষিত আছে। পাঠকপাঠিকা

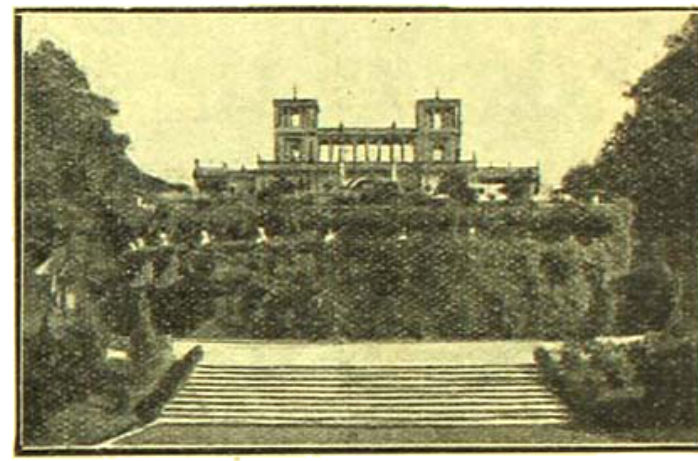

ওয়েন্‌জেরি

গণের জন্য এতৎসঙ্গে ঐন্ মিউজিয়মের কয়টি কক্ষের ছবি সন্নিবেশিত কচ্ছি।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর আবার বাজারে যাওয়া গেল! সন্তোষের বন্ধু অজিতবাবুর জন্য বাইনোকুলার, বন্ধুবরের

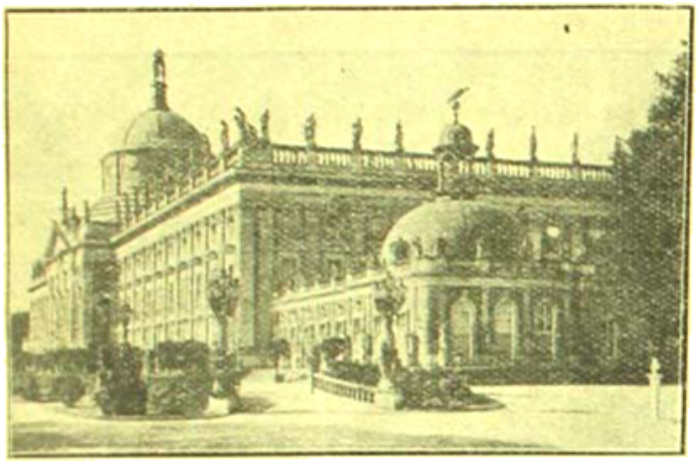

নূতন প্রাসাদ—পটস্‌ডাম

নিজের জন্য ক্যামেরা ইত্যাদি কেনা গেল! তার পর লণ্ডনের সেলফ্রিজের মত প্রকাণ্ড একটা বাড়ীতে ভেরাইটী ষ্টোরে গেলুম! ইচ্ছা ছিল কম্বল প্রভৃতি শীতবস্ত্র কেনবার, কিন্তু কি কারণে মনে নেই —শেষ পর্য্যন্ত তা' কেনা হয়ে ওঠে নি।

বন্ধুবান্ধবদের মুখে পট্‌স্‌ডামের কথা অনেক দিন থেকে শুনে এসেছি! তাই বার্লিনের অনেক কিছু দেখবার বাকী রেখেই গেলুম পরদিন পট্‌স্‌ডামে। প্রায় সাড়ে দশটার সময় 'বানহফ্ জু'তে টিউবে চড়ে, গিয়ে প্রায় এগারোটার সময় পট্‌স্‌ডাম বান্‌হফ টিউব ষ্টেশনে নামলুম। এই স্থান পূর্ব্বে ব্রেনডেনবার্গএর ইলেক্টরদের আবাসস্থল ছিল, এবং পরে প্রুশিয়ার রাজা এখানে বাস কর্ত্তে আরম্ভ করেন। পরবর্ত্তী সময়ে প্রুশিয়ার রাজগণ কর্ত্তৃক পটস্‌ডাম একটি সুদৃশ্য উদ্যান-নগরীতে পরিণত হয়। মনে হয় প্রকৃতি-রাণী, চারিদিকের বনানী, শৈলমালা ও নির্ঝরের অপূর্ব্ব সম্ভার লয়ে যেন শুধু প্রুশিয়ার রাজগণের অঙ্গুলী-সঙ্কেতেরই প্রতীক্ষা কচ্ছিল! হিংস্রশ্বাপদসঙ্কুল বন-প্রকৃতির মূর্ত্তি যেন কার যাদুদণ্ড স্পর্শে এক-মুহূর্ত্তে মানুষের রম্য উপবনে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল! বাস্তবিকই না দেখলে, তা' যে কত সুন্দর, তা' ধারণা করা অসম্ভব।

পটস্‌ডামে উদ্যানের ভিতর প্রবেশের পূর্ব্বেই আমরা অত্যাবশ্যক মধ্যাহ্ন ভোজনটি একটু গুরুতর রূপেই সমাধা করে নিলুম। তার পরেই আমরা গিয়ে 'পার্ক অন্ সেনসাউসি'তে প্রবেশ কর্লুম! বার্লিনের উপকণ্ঠে এর মতন মনোহর উদ্যান আর নাই! এর বিস্তৃতিও বড় কম নয়,—নূতন প্রাসাদ হতে, প্রায় ব্রেনডেনবার্গ আর্ক পর্য্যন্ত;

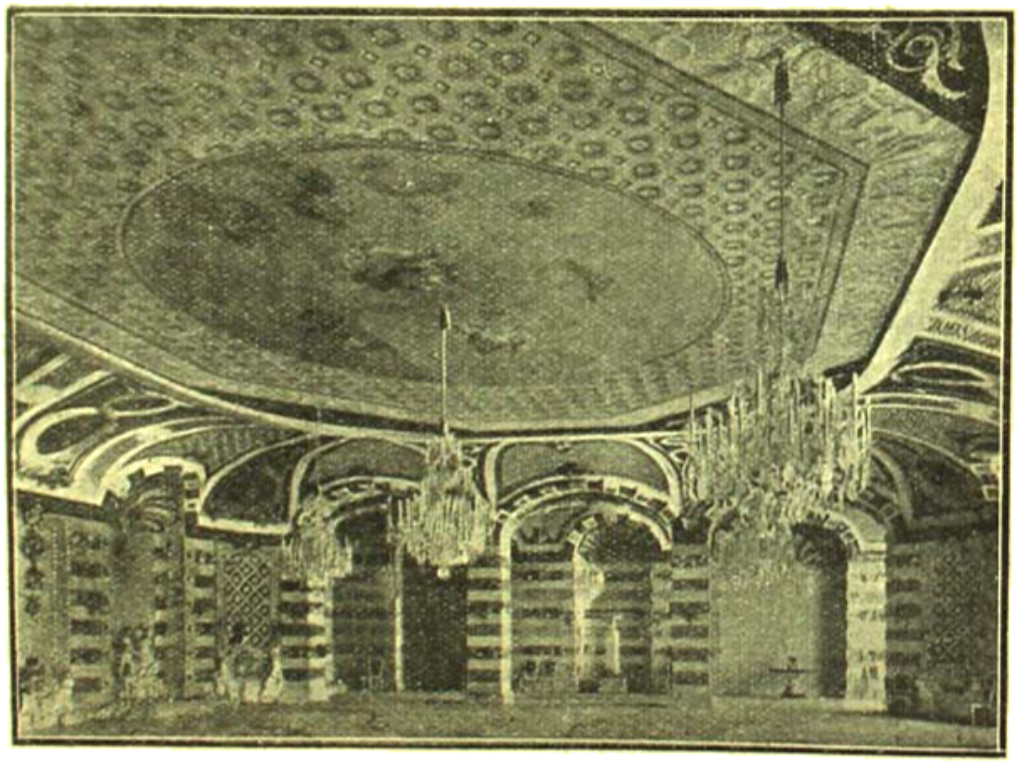

সঙ্গীত-কক্ষ—নূতন প্রাসাদ

এবং এর ভিতরে কয়টি প্রাসাদ, গ্যালারি, মন্দির ও অনেকগুলি মর্ম্মরমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। উদ্যানের ভিতর

একটু এগিয়ে গেলেই হাতের ডান দিকে, 'সেনসাউসি' প্রাসাদ দেখা যায়। প্রাসাদের সম্মুখেই বাগান। তাতে অতি চমৎকার ভাবে সারি সারি নানা জাতীয় সুদৃশ্য তরুলতা লাগানো হয়েছে ;—তারি মাঝে দিয়ে ধাপে ধাপে প্রাসাদে যাবার সিঁড়ী! সম্মুখের পথটির দুপাশে ছোটবড় গাছের সারি। তার মাঝে দিয়ে দেখলে দূরে প্রাসাদটি ও তৎসম্মুখস্থ বাগানটি অতি চমৎকার দেখায়,—ঠিক যেন একখানা দৃশ্যপট! ফ্রেডেরিক্ দি গ্রেটের ইচ্ছানুসারে ও আদেশক্রমে প্রাসাদটি ১৭৪৭—১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে নোবেলস্‌ডর্ফ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় এবং প্রায় চল্লিশ বৎসর প্রুশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি এখানে বাস করেন! এখানেই তিনি ১৭৮৬ ইংরেজীতে মারা যান্, এবং তৎপরে চতুর্থ ফ্রেডেরিক্ উইলহেলম্ এখানেই বাস কর্ত্তেন। তিনিও ১৮৬১ ইংরেজীতে এখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

প্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি কক্ষে যেখানে বিখ্যাত সুলেখক ভলটেয়ার ফ্রেডেরিক্ দি গ্রেটের অতিথি হয়ে ছিলেন, এখনও তা' ভল্‌টেয়ার-কক্ষ নামে পরিচিত। কক্ষে বানর, সারস, তোতাপাখী, প্রভৃতি ভলটেয়ারের প্রিয় জন্তুগুলির প্রতিকৃতি কাঠের উপর অঙ্কিত আছে। প্রাসাদের যে কক্ষে ফ্রেডেরিক্ দি গ্রেট লেখাপড়া করতেন, এবং যেখানে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে মারা যান, সে কক্ষে ঠিক আগেরই মতন আসবাবপত্রগুলি স্থাপিত আছে! তা ছাড়া একটি ছোটখাটো গ্যালারি ও লাইব্রেরী আছে, তাহাতে সম্রাট ফ্রেডেরিকের হস্তাক্ষর, ভল্‌টেয়ারের নিকট লেখা পত্র, ও ভল্‌টেয়ারের নানা পুস্তকাবলী সযত্নে রক্ষিত আছে। শুধু তাই নয়, প্রাসাদটির ভিত্তি স্থাপনের সময়কার অঙ্কিত ম্যাপটিও আছে। এগুলি ছাড়া, চতুর্থ ফ্রেডেরিক উইলিয়ামের কক্ষগুলি, ডিথাকার ভোজনগৃহ যেখানে সুপ্রসিদ্ধ 'পোলটেবিল পার্টি' বসিত, অভ্যর্থনা-গৃহ ও সঙ্গীতগৃহ প্রভৃতিগুলিও উল্লেখযোগ্য!

প্রাসাদ হতে নামবার সিঁড়ীগুলি ছয় ধাপে অবস্থিত ও প্রায় ৬৭ ফিট্ উঁচু! তার দু'পাশে, আঙ্গুর, পিচ্ ও অন্যান্য নানা জাতীয় ফলের গাছ অতি চমৎকারভাবে রোপিত! নীচেই প্রকাণ্ড ফোয়ারা! এর জল প্রায় ৬০ ফিট পর্য্যন্ত উঁচুতে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাসাদের উল্টা দিকেই "ধ্বংস পাহাড়" নামক কৃত্রিম পাহাড় এবং তার উপরেই ফোয়ারাগুলির জল-সরবরাহের জন্য ট্যাঙ্ক্ অবস্থিত!

প্রাসাদের ডান দিকে এগারোটি সমাধি-প্রস্তর স্থাপিত আছে। এগুলি ফ্রেডেরিক্ দি গ্রেটের প্রিয় 'গ্রে হাউণ্ড' গুলির সমাধিস্থান চিহ্নিত কর্চ্ছে। সম্রাটের নিজেরও ইচ্ছা ছিল যে মৃত্যুর পর তাঁহাকে যেন তাঁর প্রিয় কুকুর-গুলির সমাধিস্থানের পাশেই সমাহিত করা হয়। ফ্রেডেরিক্ দ্বিতীয় উইলিয়াম, এ আদেশ পরিবর্ত্তন করে, গ্যারিসন্ গির্জ্জার সম্রাটের সমাধিগর্ভ নির্ম্মাণ করেন। প্রশস্ত পথটি অতিক্রম কর্ব্বার বেলা হাতের বাঁ দিকে, শিক্ষার গ্যালারিটি পড়ে; গ্যালারিটি ছোট, প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই তা' দেখে আমরা 'অবেলিস্ক' দ্বার-পথে বেরিয়ে এলুম। বেরিয়ে আসতে আসতে হাতের ডান দিকে ক্রিডেনা চার্চ্চ অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ গির্জ্জাটি দেখতে পেলুম। চতুর্থ ফ্রেডেরিক উইলিয়ামের রাজত্ব কালে, সম্রাট তৃতীয় ফ্রেডেরিক ও সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সমাধিস্থানের নিকটবর্ত্তী পুরাতন খৃষ্টান বেসিলিকার অনুকরণে পার্শিয়াস কর্ত্তৃক এই গির্জ্জাটি নির্ম্মিত হয়।

'সেনসাউসি' প্রাসাদ ত্যাগ করে, আমরা নূতন প্রাসাদের অভিমুখে রওয়ানা হলুম। একটু এগিয়ে যেতেই হাতের ডান দিকে 'অরেঞ্জেরি' নামক ফ্লোরেনটাইন শিল্পকলানুসারে নির্ম্মিত একটি লম্বা অট্টালিকা দেখতে পেয়ে তার অভ্যন্তরে প্রবেশ কর্লুম! এই অট্টালিকাটি ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট চতুর্থ ফ্রেডেরিক উইলিয়াম নির্ম্মাণ করেন। এর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সম্রাটের মর্ম্মর-মূর্ত্তি স্থাপিত আছে! এই প্রাসাদটি রাজ-অতিথিদের বাসগৃহ রূপেই ব্যবহৃত হতো। মধ্যস্থিত প্রকাণ্ড হলটিতে ৪৮খানি রাফেলের অঙ্কিত চিত্র আছে। এর সম্মুখেও চমৎকার বাগান আছে। বাগানগুলি চতুর্থ ফ্রেডেরিক উইলিয়াম ও দ্বিতীয় উইলিয়ামের আদেশক্রমে রচিত হয়। তারি একটিতে বার্লিনে উন্টার্ ডেন্ লিন্ডেনে স্থিত অশ্বপৃষ্ঠে ফ্রেডেরিক্ দি গ্রেটের প্রতিকৃতির অনুকরণে আর একটি মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

অতঃপর মালবেরি এভিনিউ দিয়ে অগ্রসর হতে হতে, ডান দিকে ড্রেগন্ হাউস্ ও গার্ডেন অব প্যারেডাইজ্ দেখতে পাওয়া গেল। এখান হতেই দূরে একটি ছোট

পাহাড়ের উপর সেনসাউসির ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মিল্ দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের সঙ্গী অন্ন ও পরে গেলে হয় ত নূতন প্রাসাদের দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে, এজন্য আমরা আর আশে পাশে তাকিয়ে সময় নষ্ট না করে দ্রুত-পদে এগিয়ে চল্লুম নূতন প্রাসাদের অভিমুখে ও প্রায় পোনর মিনিটের মধ্যেই গিয়ে পৌঁছলুম সেখানে। সৌভাগ্যক্রমে তখনো প্রাসাদের দ্বার খোলা ছিল এবং জিজ্ঞেস করে জানতে পার্লুম যে আরো প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরেই বন্ধ হয়ে যাবে। নূতন প্রাসাদটি বাস্তবিকই স্থাপত্যকলার ঔৎকর্ষের একটি চরম নিদর্শন। দূর হতে অতি চমৎকার দেখায়। শুনলুম, আকাশ হতে এর দৃশ্য না কি অতীব মনোহর! ১৭৬৩—১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রেডরিক্ দি গ্রেট, এই প্রাসাদটি নির্ম্মাণ করান। দীর্ঘ সাত বৎসরব্যাপী যুদ্ধের পর সম্রাটের ঐশ্বর্য্য ও বিত্তের পরিচায়ক রূপে প্রাসাদটি অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। মূল প্রাসাদটি ছাড়া, সভাসদদের বাসের জন্যও প্রায় দুশোটি কক্ষ আছে। তা ছাড়া, অনেকগুলি সুপ্রশস্ত হল আছে এবং প্রায় পাঁচশো লোকের বসবার উপযুক্ত একটি রঙ্গগৃহও আছে! রঙ্গগৃহটিতে শুধু রাজপরিবারের ব্যক্তিরা ও পারিষদবর্গ ছাড়া আর কারো প্রবেশাধিকার ছিল না।

ফ্রেডেরিক্ দি গ্রেটের রাজত্বের শেষ সময়ে নূতন প্রাসাদটি রাজাবাস ছিল! পরে ভূতপূর্ব্ব কাইজারের পিতা তৃতীয় ফ্রেডেরিক এখানে থাকতেন এবং এখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ভূতপূর্ব্ব কাইজারও এখানে গ্রীষ্মকালে থাকতে খুবই ভালবাসতেন এবং মহাযুদ্ধের পর বিপ্লবের সময়, তিনি এখানেই ছিলেন। প্রাসাদের মধ্যে তাঁর প্রাইভেট্ কক্ষগুলি এখনো আগের মতনই সজ্জিত আছে! প্রাসাদের কক্ষগুলি নানা ভাবে, নানা উপাদানে নির্ম্মিত হয়েছিল এবং প্রত্যেকটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে! দেখেই মনে হয়, ফার্ম্মেণ সম্রাটদের কত সুরুচি ও কলাজ্ঞান ছিল! সঙ্গীত-গৃহ, নৃত্য-গৃহ প্রভৃতি বাস্তবিকই চোখে থাকবার মত কারুকার্য্যে শোভিত! কি ছাদ, কি দেয়াল, কি মেঝে, সবগুলিই অতি মনোমুগ্ধকর ভাবে সজ্জিত! নৃত্যগৃহটিতে প্রায় হাজার লোকের এক সঙ্গে নৃত্যের স্থান আছে! কক্ষগুলির সব কটিতেই উৎসব প্রভৃতির সময় সম্রাট, ক্রাউন প্রিন্স প্রভৃতিরা যে সব নির্দ্দিষ্ট আসনে বসতেন, এখনো সেগুলি যথাস্থানে স্থাপিত আছে! রাজ-পরিবারস্থ প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কক্ষ নির্দ্দিষ্ট ছিল! তার মধ্যে, ভূতপূর্ব্ব ক্রাউন প্রিন্সের কক্ষগুলিই, দেখে মনে হ'ল, একটু বেশী সৌখীন বিলাসিতার পরিচয় দিচ্ছে! তা ছাড়া, মার্ব্বেল-কক্ষটিও চমৎকার। শুভ্র মর্ম্মরময় প্রকাণ্ড হলটি বাস্তবিকই আমাদের চোখে খুব নয়ন-তৃপ্তিকর বলে মনে হয়েছিল! রাজকীয় ভোজনের হলটিও সৌখীনতায় ভরপুর! কিন্তু সব চেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য ঝিনুক-ঘর অথবা রত্নকক্ষ! ছাদ হতে আরম্ভ করে দেয়ালগুলি সবই, দেশ-দেশান্তর সাত সমুদ্রের বুক হতে, সযত্নে আহরিত নানা বর্ণের, নানা আকারের শঙ্খ ও ঝিনুক দিয়ে তৈরী! ঝিনুকের আর এক নাম রত্নগর্ভা, তার পরিচয় রত্নগৃহে অনেকগুলি আছে! রত্ন বুকে নিয়ে অসংখ্য রত্নগর্ভা সে কক্ষের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে! তাদের বুক হতে যে ঝল্‌মল্ আলো সমস্ত কক্ষময় ছড়িয়ে পড়েছে, সেটা না দেখলে ধারণা করা অসম্ভব! দাঁড়িয়ে দেখে দেখেও আমাদের তৃপ্তি হচ্ছিল না এবং আরো দেখতে ইচ্ছা হচ্ছিল। এমন সময় প্রাসাদের পরিচারকেরা এসে তাড়া দিল যে সময় হয়ে গেছে, আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। দেখে দেখে, আরো দেখার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে, বন্ধু দুটি বেরিয়ে এলুম প্রাসাদ হতে! যুগপৎ একই সময়ে, দুই বন্ধুর মুখ হতে বেরিয়ে পড়লো একটি ছোট্ট কথা—"চমৎকার"! রামের অযোধ্যা তেমি আছে, কিন্তু সে রাম আজ নেই! এ কথা মনে হওয়াতেই আমার নাসিকাপ্রান্ত হতে, একটা সুদীর্ঘ সহানুভূতির দীর্ঘনিশ্বাস নিজেরই অজ্ঞাতসারে বেরিয়ে পড়লো!

প্রাসাদ হতে বাইরে এসে আমরা খানিকক্ষণ অপলক-নেত্রে ভূতপূর্ব্ব সম্রাটদের আবাস-ভবনটির পানে চেয়ে রইলুম। সারা দিনই কেমন একটা মেঘলা ভাব ছিল। এমি সময় হঠাৎ পশ্চিমের আকাশে দিনকর উঁকি মেরে দেখা দেওয়াতে—মেঘের কোল থেকে একটুখানি রোদ সমস্ত উদ্যানটিতে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে পড়লো। আর যায় কোথা, বন্ধুবর নূতন কেনা ক্যামেরা খুলে, আমাকে নূতন প্রাসাদের সম্মুখস্থ একটা মর্ম্মরমূর্ত্তির নীচে দাঁড় করিয়ে, নিলেন তুলে ফটো একখানা! নূতন ক্যামেরার নেওয়া প্রথম ছবি, আর নূতন বিয়ের পর প্রেয়সীর প্রথম

স্পর্শ, সে সময় মনের যে ভাবখানা হয়, তা' দেখবার মত সৌভাগ্য আমার সেদিন হয়েছিল! কিন্তু সেদিন রাত্রিতেই ডেভেলপ করার বেলা যখন দেখা গেল যে সেই প্রথম প্রচেষ্টাই, আণ্ডার এক্‌স্‌পোসারের জন্য একান্ত বিফল হয়ে গেছে, তখন আর বন্ধুবরের আক্ষেপের অন্ত ছিল না! ছবি নেওয়ার দু'মিনিটের মধ্যেই, সূর্য্যদেব আবার মুখ ঢাকলেন! আর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও এদিক ওদিক প্রায় আধঘণ্টা বেড়িয়ে আবার প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌লুম পটস্‌ডাম্ হতে ট্রামে চড়ে, বানহফ পটস্‌ডামে; আর সেখান হতে টিউবে করে ফ্রেডরিক্ ষ্ট্রাসে বানহফে; সেখান হতে ট্রামে করে "জাইস্"এর দোকানে; ও অতঃপর বাসে করে বানহফ্ ছুটে, এবং তৎপর পদব্রজে হিন্দুস্থান এসোসিয়েশনের দ্বারে!

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই দু'বন্ধু গেলুম, বার্লিনের সুবিখ্যাত প্লেনেটোরিয়ম্ দেখতে! সেদিন সেখানে বক্তৃতা ছিল! ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে ফিল্‌মের সাহায্যে নকল আকাশ তৈরী করে, গ্রহ নক্ষত্রাদির সংস্থান ও গতি দেখান হচ্ছিল। প্লেনেটোরিয়ান্‌টির গঠনই এ-রকম যে তার অভ্যন্তরস্থ নকল আকাশ ও প্রকৃত আকাশের মধ্যে তফাৎ করা যায় না। বক্তৃতাটি ভালই হচ্ছিল বলতে হবে, কিন্তু অত্যন্ত টেক্‌নিক্যাল হওয়াতে আমাদের আর ভাল লাগছিল না। আর ওদিকে সময়ও কম, সুতরাং অসমাপ্ত বক্তৃতার মাঝামাঝি পথেই বাধ্য হয়ে উঠে পড়তে হয়েছিল আমাদের!

হিন্দুস্থান এসোসিয়েশনেই সান্ধ্য-ভোজন শেষ করে বার্লিনস্থিত বন্ধুবান্ধবদের কাছে বিদায় নিলুম। একজন বন্ধু, অযাচিত ভাবে ছুটে গিয়ে, একখানা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এসে আমাদের তুলে দিলেন তাতে। অন্যান্য সহৃদয় বন্ধুরা দোর পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে, করমর্দ্দন করে ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলেন! আমাদের গাড়ীখানা নৈশ পথ মুখরিত করে বার্লিনের ষ্টাত্তার ষ্টেসনের উদ্দেশ্যে ছুটলো! বার্লিন ছাড়বার বেলা, মনে একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়েই ছাড়তে হলো! সময়ের অল্পতার জন্য আমাদের আর দেরী করবার উপায় ছিল না, কারণ বন্ধুবরের জাহাজে চড়ার দিন অতি সন্নিকটবর্ত্তী হয়ে এসেছিল! তাই বার্লিনের দ্রষ্টব্য অনেক কিছু অদৃষ্ট রেখেই বার্লিন ছাড়তে হয়েছিল আমাদের! আমার একান্তই ইচ্ছা ছিল যে বার্লিনের সুবিখ্যাত অপেরা হাউস্ ও নৃত্যগৃহগুলি দেখে আসি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সময়ের অল্পতার জন্য তা' হয়ে উঠে নি! ভবিষ্যতে আবার কখন সে আশা পূর্ণ হবে, জানি না!

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের অভিষেক-সংবৎসর

শ্রীমলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ

ক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কি বলেন?

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের মোটা মোটা ঘটনার তারিখগুলি এই বৎসরাঙ্কটির উপর নির্ভর করিয়া গণিত; কাজেই ইতিহাস যাঁহারা ভালবাসেন, ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বুঝিবেন যে ঠিক কোন্ বছরে এই ব্যাপারটি ঘটিয়াছিল তাহা নির্ভুলরূপে নির্দ্ধারণ করা কতখানি দরকারী। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এমন দরকারী নির্দ্ধারণেও গলদ রহিয়া গিয়াছে। ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে এই রকম অদ্ভুত ব্যাপার প্রায়ই হাতে পড়িয়া যায়। আমরা ছেলেবেলা হইতে এই তারিখটি মুখস্থ করিয়া আসিতেছি। খ্রীষ্টজন্মের ৩২৩ বছর পূর্ব্বে আলেকজাণ্ডার মারা গেলেন। তাহারই বছর দুই পরে অর্থাৎ ৩২২-২১ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে চাণক্যের সহায়তায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য নন্দবংশকে সরাইয়া নিজে ভারত-সম্রাট হইয়া বসিলেন। এই তারিখটি এতকাল ধরিয়া চলিতেছে যে ইহা ঠিক কি না, কোন্ কোন্ প্রমাণের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার কথাও কাহারও মনে উদিত হয় না!

আজকাল কলেজে যে সকল ইতিহাস পড়ান হইয়া

থাকে, তাহাতে এই তারিখটি কি ভাবে গৃহীত হইয়াছে, একবার পরখ করিয়া দেখা যাউক।

১। ডাঃ ভি. এ. স্মিথের আর্লি হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়া, তৃতীয় সংস্করণ, ১১৬ পৃষ্ঠা। মূলের অনুবাদ উদ্ধৃত হইল।

"৩২৩ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দের জুন মাসে এলেকজেণ্ডারের মৃত্যু হওয়াতে, 'হয়ত আবার তিনি ভারতে ফিরিয়া আসিতে পারেন' এই ভয় সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল এবং ভারতীয় রাজাগণ যে প্রথম সুযোগেই স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া গ্রীক প্রভুত্বের পোষক অপ্রবল বৈদেশিক সৈন্যদলগুলিকে নিঃশেষে সংহার করিয়া ফেলিয়াছিল সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ··আমরা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে পারি যে বিজেতা এলেকজেণ্ডারের মৃত্যুর খবর যখন প্রকৃতই সত্য বলিয়া জানা গেল এবং অবাধে সৈন্যচলাচলের উপযোগী ঋতু উপস্থিত হইল, তখন (গ্রীকশাসনের বিরুদ্ধে) সর্ব্বত্র বিদ্রোহ উপস্থিত হইল এবং ৩২২ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দের প্রথম ভাগেই ভারতে মেসিডোনীয় প্রভুত্ব শেষ হইয়া গেল।"

পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, এ সমস্তই আগাগোড়া ডাঃ স্মিথের অনুমান মাত্র। অনুমানের উপর ইতিহাস রচনা করিতে বসিয়া—"সন্দেহ মাত্র নাই"—"নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে পারি"—ইত্যাদি জোরের কথা না বলাই সতর্ক ঐতিহাসিকের লক্ষণ। ঐতিহাসিকের কার্য্যই সন্দেহ করা এবং অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সেই সন্দেহ দূরীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত কিছু বিশ্বাস না করা।

২। কেম্ব্রিজ হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়া। ডাঃ এচ্. ডব্লিউ. টমাস কৃত প্রবন্ধ—৪৭১, ৪৭৩ পৃষ্ঠা—বঙ্গানুবাদ।

"আমাদের হাতে বর্ত্তমানে যে সমস্ত প্রমাণ আছে তাহাদের সাহায্যে নন্দরাজের পরাজয়ের ঠিক তারিখ নির্ণয় করা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।···৩২১ খ্রীঃপূঃ হইলেও হইতে পারে। পুরাণ ও বৌদ্ধ গ্রন্থগুলির মতে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ২৪ বৎসর ব্যাপী ছিল।·· আরম্ভ বৎসরটি কিন্তু অনির্দ্দিষ্ট।·····এই অনিশ্চিততাপূর্ণ বিষয় লইয়া আর অধিক আলোচনা নিরর্থক। (চন্দ্রগুপ্তের আমলের) দেশ এবং দেশশাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য ঐ আমলের সন তারিখের অসম্পূর্ণ জ্ঞানের তুলনায় আশ্চর্য্য রকমে প্রচুর।"

ডাঃ ভি-এ-স্মিথের অসংযত কল্পনার তুলনায় ডাঃ টমাসের উক্তিগুলির সতর্কতা সর্ব্বতোভাবে উপভোগ্য।

৩। ইন্‌স্ক্রিপশন্‌স্ অব অশোক। ডাঃ হুলজ্ সম্পাদিত। ভূমিকা, ৩১ পৃষ্ঠা। বঙ্গানুবাদ।

"এইরূপে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ বৎসর খ্রীঃপূঃ ৩২৩ (এলেকজেণ্ডারের মৃত্যু) এবং খ্রী পূঃ ৩০৪ (সেলিউকাসের সহিত সন্ধি) এই দুই বৎসরের মধ্যে পড়ে। মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা গ্রন্থে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য পাটনা হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই বিপুল সাম্রাজ্যের গঠনে নিশ্চয়ই অনেক বৎসর লাগিয়াছিল। কাজেই চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ বৎসরটি ৩২৩ খ্রীঃ পূঃ এর দিকে সরাইয়া লইতেই আমার অভিলাষ হয় এবং ডাঃ ফ্লিট্ কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত খ্রীঃ পূঃ ৩২০কেই এই ঘটনার তারিখ বলিয়া আপাততঃ গ্রহণ করিয়া কাজ চালাইতে চাই।"

পাঠকগণ বুঝিতে পারেন, ইহাও অনুমানই মাত্র।

তবেই দেখা যাইতেছে, যে তারিখ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই বলিয়া আমরা ছেলেবেলা হইতে মনে করিয়া আসিতেছি, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া প্রাচীন আমলের সমস্তগুলি বড় বড় ঘটনার সন তারিখ গণিত হয়, সেই গোড়ায়ই কত গলদ রহিয়া গিয়াছে!

একটি একটি করিয়া সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা করা যাক।

ক। চন্দ্রগুপ্ত কি প্রথমে নন্দ সিংহাসন ও সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন এবং পরে গ্রীকদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়াছিলেন, অথবা প্রথমে গ্রীকদিগকে তাড়াইয়া পরে নন্দ সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন?

এই বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতামতগুলি সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইল।

১। ভি-এ-স্মিথের আর্লি হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়া, তৃতীয় সংস্করণ ১১৭-১১৮ পৃষ্ঠা। বঙ্গানুবাদ।

"ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় যে বিদেশী আক্রমণকারী অধিকৃত দেশ দখলে রাখিবার জন্য যে সৈন্যদল এই দেশে রাখিয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে দূর করিয়া দিবার চেষ্টা আরম্ভের পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার জনপ্রিয় আত্মীয় নন্দরাজকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন।"

২। উক্ত গ্রন্থকারেরই লিখিত 'অশোক' দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩-১৪ পৃঃ "চন্দ্রগুপ্ত কি প্রথমে মগধের রাজা হইয়া পরে উত্তরাভিমুখে সেলিউকীয় সৈন্যগণের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন, অথবা প্রথমে পঞ্জাবে জন-বিদ্রোহের নায়কত্ব করিয়া (সেলিউকীয়দিগকে দূরীভূত করিয়া) শক্তি সঞ্চয়পূর্ব্বক কুসুমধ্বজ মগধরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহা পরিষ্কার বুঝা যায় না।" ইহার পাদটীকায় আছে—" 'Deinde' শব্দটি হইতে বোধ হয় যে চন্দ্রগুপ্ত মগধের রাজা হইয়া পরে এলেকজেণ্ডারের সেনাপতিগণের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

৩। কেম্ব্রিজ হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়া, ডাঃ এক-ভিন্সিই-টমাস্ কৃত প্রবন্ধ, ৪৭০-৭১ পৃষ্ঠা।

"চন্দ্রগুপ্ত নন্দরাজের প্রধান সেনাপতিরূপে কার্য্য করিতেছিলেন। (এই সময়) তিনি নন্দরাজের বিরাগ-ভাজন হ'ন। কথিত আছে যে তিনি ব্রাহ্মণ বিষ্ণুগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া নিজ প্রভু নন্দরাজকে সিংহাসন-চ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ফলে তিনি নিজের সঙ্গীগণকে লইয়া প্রাণ লইয়া পলাইতে বাধ্য হ'ন।··· অতঃপর চন্দ্রগুপ্তের নায়কত্বে একটি প্রবল দল গঠিত হয়। তাঁহার প্রধান সহায় হ'ন হিমালয় প্রদেশের একজন রাজা। এই দলের সহায়তায় চন্দ্রগুপ্ত মগধরাজ্য আক্রমণ করেন। চন্দ্রগুপ্তের মগধ আক্রমণ যে প্রত্যন্ত প্রদেশ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, এই বিষয়ে একটি বৌদ্ধ ও একটি জৈন গল্প প্রচলিত আছে।"

যে সকল মূল পুস্তকের তথ্যাবলির উপর উপরি-উদ্ধৃত মতগুলি প্রতিষ্ঠিত, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(ক)। ম্যাক ক্রিণ্ডল্ কৃত গ্রীক ঐতিহাসিক জাষ্টিন হইতে অনুবাদ। হলজের Inscriptions of Asoka পুস্তকের ভূমিকার ৩৩-৩৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। বঙ্গানুবাদ।

"এলেকজেণ্ডারের মৃত্যুর পর ভারতীয়গণ যেন এলেক-জেণ্ডারের দাসত্ব ঋণ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে এই মনে করিয়া এলেকজেণ্ডারের ভারতশাসনে নিযুক্ত সেনাপতি-গণকে সংহার করিয়া ফেলিল। যে নায়কের নায়কত্বে ভারতীয়গণ পুনরায় এইরূপে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল, তাহার নাম চন্দ্রগুপ্ত। কিন্তু বিজয় লাভের পরে চন্দ্রগুপ্ত প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার করিয়া দেশের স্বাধীনতার উদ্ধারকারী বলিয়া বিবেচিত হইবার সমস্ত অধিকার হারাইয়াছিলেন। কারণ বিদেশীয় অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া তিনি নিজের অত্যাচারে প্রজাবর্গকে পুনরায় দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

"চন্দ্রগুপ্ত সামান্য অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং একদা এক দৈব ব্যাপারে তিনি রাজত্বাভিলাষে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। এই দৈব ঘটনায় বুঝা গিয়া-ছিল যে অতুলনীয় সৌভাগ্য তাঁহার ভাগ্যে লিখিত আছে।

"নিজের রূঢ় ব্যবহারে তিনি নন্দরাজের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন এবং নন্দরাজ তাঁহার হত্যার আদেশ দিলে তাঁহাকে প্রাণলইয়াপলায়নকরিতেহইয়াছিল। (পলায়নকালে একদা) যখন তিনি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়া-ছিলেন তখন একটি প্রকাণ্ডকায় সিংহ নিদ্রিত চন্দ্রগুপ্তের নিকটস্থ হইয়া, তাহার শরীর হইতে প্রচুররূপে যে ঘর্ম্মস্রাব হইতেছিল তাহাই জিহ্বা দিয়া চাটিতে আরম্ভ করিল এবং চন্দ্রগুপ্তের নিদ্রাভঙ্গ হইলে শান্তভাবে একদিকে চলিয়া গেল। এই বিচিত্র ব্যাপারে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে লাগিলেন এবং একদল দস্যু সংগ্রহ করিয়া তিনি ভারতবর্ষীয়গণকে তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত শাসন বিনষ্ট করিতে উৎসাহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর তিনি এলেকজেণ্ডারের সেনাপতিগণকে যখন আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন তখন এক প্রকাণ্ডকায় বন্যহস্তী তাঁহার নিকটে আসিয়া গৃহপালিত হস্তীর মত নিতান্ত নম্রভাবে তাঁহার নিকট অবনত হইয়া তাঁহাকে পীঠে তুলিয়া লইল এবং সৈন্যদলের পুরোভাগে তাঁহাকে লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপে সিংহাসন লাভ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত ভারতে যখন রাজত্ব করিতেছিলেন তখন সেলিউকাস নিজের ভবিষ্য সৌভাগ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন।"

বিশ্লেষণ করিলে জাষ্টিনের এই বিবরণ হইতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলির উদ্ধার করা যায়।

(i) ভারতে গ্রীক অধীনতা দূর করিবার চেষ্টা এলেকজেণ্ডারের মৃত্যুর পরে আরব্ধ হয়।

(ii) এই চেষ্টার নায়ক ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত।

(iii) গ্রীক সেনাপতিগণকে বিনাশ করিয়া

ভারতীয়গণকে গ্রীক অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া পরে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

অতঃপর কি করিয়া চন্দ্রগুপ্ত ভারতীয়গণকে গ্রীক অধীনতা হইতে মুক্ত করেন, জাষ্টিন তাহারই বিবরণ দিতেছেন।

(ঙ) তিনি নন্দরাজের বিরাগভাজন হইয়া প্রাণ লইয়া পলাইতে বাধ্য হন।

(চ) এই নির্ব্বাসিত অবস্থায় চন্দ্রগুপ্ত এক দস্যুদল সংগ্রহ করিয়া ভারতীয়গণকে তৎকাল-প্রতিষ্ঠিত শাসনপাশ ছিন্ন করিতে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। এই তৎকাল প্রতিষ্ঠিত শাসন যে গ্রীক শাসন—নন্দরাজ শাসন নহে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কারণ এই শাসনপাশ ছিন্ন করিতে চন্দ্রগুপ্তকে গ্রীক সেনাপতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। দস্যুদলের সাহায্যে বল হইবার পূর্ব্বে গ্রীক সেনাপতিগণের সহিত নাসিরে (যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী সৈন্যদলে) যুদ্ধের যে বর্ণনা জাষ্টিন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা নন্দ সাম্রাজ্যের অধিপতি স্বয়ং প্রবল-প্রতাপ সম্রাট চন্দ্রগুপ্তে প্রয়োগ করা যায় না। স্পষ্টই বুঝা যায়, এই সময় চন্দ্রগুপ্ত ভাগ্যান্বেষী যোদ্ধা মাত্র ছিলেন এবং গ্রীকদিগকে পরাজিত করিয়াই তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হয়।

(ছ) এইরূপে পঞ্জাব হইতে গ্রীকদিগকে তাড়াইয়া পঞ্জাবের অধিপতি হইয়া ক্রমশঃ চন্দ্রগুপ্ত সমস্ত ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য অধিগত করেন।

জাষ্টিনের এই বিবৃতিতে গ্রীক সেনাপতিগণের সহিত চন্দ্রগুপ্তের সম্বন্ধের বিবরণই আছে—নন্দের সহিত নহে। ডাঃ ভি-এ স্মিথ উহা কি করিয়া বুঝিলেন তাহা বোধগম্য নহে।

(খ) এই সঙ্গে প্লুটার্ক নামক ঐতিহাসিকের নিম্নলিখিত বিবরণও বিবেচ্য।

"চন্দ্রগুপ্ত নিজে এই সময় অল্পবয়স্ক যুবক মাত্র এবং স্বয়ং এলেকজেণ্ডারের সহিত তিনি দেখা করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত অতঃপর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে এলেকজেণ্ডার সহজেই সমগ্র ভারতবর্ষ দখল করিতে পারিতেন কারণ প্রজাবর্গ ভারতের তৎকালীন সম্রাটকে তাহার দুষ্ট স্বভাব ও নীচকুলে জন্মের জন্য ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিত।"

প্লুটার্ক লিখিত এলেকজেণ্ডারের জীবন-চরিত—ভি-এ স্মিথের আর্লি হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়া, ৩য় সং, ৪৩ পৃষ্ঠা, পাদ-টীকায় উদ্ধৃত। বঙ্গানুবাদ।

চন্দ্রগুপ্ত যে নির্ব্বাসিত অবস্থায় পঞ্জাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তথায়ই তিনি এলেকজেণ্ডারের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, প্লুটার্কের উপরি উদ্ধৃত বিবরণ হইতে তাহাই বুঝা যায়। এই উক্তি হইতে এই অনুমানও অসঙ্গত নহে যে পঞ্জাবই চন্দ্রগুপ্তের আদি কার্য্যক্ষেত্র।

(গ)। সিংহলের বৌদ্ধগ্রন্থে কোন এক মাতাপুত্রের আলাপ হইতে চন্দ্রগুপ্তের উপদেশ গ্রহণের গল্পটি এই :—

"(নির্ব্বাসন কালে) এক গ্রামে এক স্ত্রীলোকের ঘরে চন্দ্রগুপ্ত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রমণী পিষ্টক ভাজিয়া পুত্রকে দিতেছিল। পুত্র পিষ্টকের মধ্যভাগ খাইয়া কিনারাগুলি দূরে ছুড়িয়া ফেলিতেছিল এবং ফেলিয়াই আর একখানা চাহিতেছিল। ইহা দেখিয়া রমণী বলিল, "এই (হতভাগা) ছেলের কাণ্ড ঠিক চন্দ্রগুপ্তের (নন্দ) রাজ্য আক্রমণের মত।" বালক বলিল—"কেন মা, আমি কি করিলাম, আর চন্দ্রগুপ্তই বা কি করিয়াছিল?" রমণী বলিল—"পুত্র, তুমি পিষ্টকের কিনারা ফেলিয়া মধ্যে কামড় বসাইতেছ। চন্দ্রগুপ্তও তেমনি (বোকার মত) কিনারা হইতে রাজ্যজয় এবং নগরগুলি একটির পর একটি অধিকার করিতে চেষ্টা না করিয়া প্রথমেই রাজ্যের মধ্যভাগ (রাজধানী) আক্রমণ করিয়াছে।...আর তাই দেখ, তাহার সৈন্যদল শত্রু কর্ত্তৃক বেরাও হইয়া সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে। ইহাই হইল তাহার বোকামী।"

মহাবংশ টীকা। রিছ্ ডেভিড্ কৃত Buddhist Indin নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত। ১৬৯ পৃষ্ঠা।

চন্দ্রগুপ্ত এই আলাপ শুনিয়া জ্ঞানসঞ্চয়পূর্ব্বক প্রান্তদেশ হইতে রাজ্য জয় আরম্ভ করিলেন এবং অবশেষে জয়ী হইলেন।

(ঘ)। এই বিষয়ে জৈনগ্রন্থের গল্পটি হেমচন্দ্র কৃত স্থবিরাবলি চরিতে নিম্নলিখিতরূপে লিপিবদ্ধ আছে :—

একদা চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য নন্দরাজধানী পাটলীপুত্র আক্রমণ করেন এবং পরাজিত ও শত্রুকর্ত্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া প্রাণ লইয়া পলাইতেছিলেন—

"সন্ধ্যায় চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য এক গ্রামে যাইয়া পৌঁছিলেন এবং খাদ্যান্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা এক দীনা বৃদ্ধার কুটীরে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা তখনই মাত্র পুত্রদের জন্য খাদ্য রাঁধিয়া থালায় ঢালিয়াছে। পুত্রদের মধ্যে একজন আর রহিতে না পারিয়া থালার মধ্যে হাত দিয়া ফেলিল এবং গরম খাদ্যে হাত পুড়িয়া গেলে কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধা পুত্রকে চাণক্যের মত প্রকাণ্ড বোকা বলিয়া গালি দিতে লাগিল। (বৃদ্ধাভিমানী) চাণক্য নিজের নাম এইরূপে উল্লিখিত হইতে শুনিয়া ঐ গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং বৃদ্ধাকে তাহার বাক্যের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রীলোকটি বলিল—"এই (বোকা) ছেলে থালার খাদ্যের গরম মধ্যভাগে হাত দিয়া হাত পোড়াইয়া ফেলিয়াছে। কিনারার খাদ্য হইতে খাইতে চেষ্টা করিলে হাত পুড়িত না; কারণ, কিনারার খাদ্য এতক্ষণে ঠাণ্ডা হইয়াছে। ঠিক ঐ রকম করিতে যাইয়াই চাণক্যও পরাজিত হইয়াছেন। কারণ প্রান্তদেশ প্রথমে আক্রমণ না করিয়া তিনি শত্রুর যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বল সেই রাজধানীই আক্রমণ করিয়া বসিয়াছেন, তাই পরাজিতও হইয়াছেন।

এই অজ্ঞাতসারে প্রদত্ত উপদেশে উদ্বুদ্ধ হইয়া চাণক্য হিমবৎকূটে যাইয়া তথাকার রাজা পর্ব্বতকের সহিত মিত্রতা করিলেন।...প্রত্যন্ত প্রদেশ হইতে এইবার আক্রমণ আরম্ভ হইল। (বিষকন্যা গ্রহণ করিয়া পর্ব্বতক মরিয়া গেল)। এইরূপে চন্দ্রগুপ্ত পর্ব্বতক ও নন্দের রাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন। মহাবীরের নির্ব্বাণের ১১৫ বৎসর পরে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল।"

স্থবিরাবলি চরিত—বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পরিশিষ্ট।

এই বৌদ্ধ ও জৈন গল্পের সহিত যদি আমরা গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বিবরণগুলি মিলাইয়া পাঠ করি তবে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি স্থিরীকৃত করা যায়:—

(i) চন্দ্রগুপ্তের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া নন্দরাজ চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে চন্দ্রগুপ্ত প্রাণ লইয়া পলাইতে বাধ্য হ'ন।

(ii) চাণক্যের সাহায্যে তিনি কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নন্দরাজধানী পাটলীপুত্র আক্রমণ করেন এবং পরাজিত হইয়া পঞ্জাবে পলায়ন করেন।

(iii) পঞ্জাবে তিনি একটি দল গঠন করিয়া গ্রীকদিগের বিরুদ্ধে উত্থিত হ'ন এবং গ্রীকদিগকে দূর করিয়া পঞ্জাবের অধিপতি হইয়া বসেন।

(iv) এইরূপে পঞ্জাব অধিকার করিয়া ক্রমশঃ তিনি নন্দরাজধানী পাটলীপুত্রের দিকে অগ্রসর হ'ন এবং নন্দরাজকে পরাজিত ও নিহত করিয়া ভারত-সম্রাট হইয়া বসেন।

ভারতে গ্রীকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং গ্রীকদের পরাজয় ঠিক কোন্ বৎসর হইয়াছিল, এইবার তাহার নির্দ্ধারণ আবশ্যক। *

* বিলাতের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণেলে লেখকের লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

তাজমহলে

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

(১)

উঠি তাজমহলের সুগঠিত সমুচ্চ মিনারে
মনে হয় আজি মোর, কত কবি রসছন্দোহারে
পূজিয়াছে এ মন্দিরে, দিবা-প্রেমে মর্ম্মরের রূপ
এখানে দিয়াছে বুঝি প্রিয়াহারা ভারতের ভূপ।
আমার অকবি-চিত্ত চলে যায় অতীতের পানে
যখন অদ্ভুত-শিল্পী জুটিয়াছে ইহার নির্ম্মাণে
শ্বেদসিক্ত ক্লিষ্ট দেহে। কত কৃষকের অশ্রুজল
প্রজার হৃদয়শুক্তি—নয়নের কত মুক্তাফল
রাজার শাসনে এসে অঙ্গপুষ্ট করেছে ইহার
রাজশ্রীমণ্ডন শিল্পে। হাহাকার করেছে পাহাড়,
তাহার হৃদয় ভেদি দুষ্টতার শোণিত-পঞ্জর
বহুন্ধরা কুক্ষি চিরি সম্রাটের শাণিত-খঞ্জর
এনেছে সর্ব্বস্বধন। কত বধূ কর্ণের কুণ্ডল,
সঁপেছে রাণীর পরে। যমুনা তুলিয়া কোলাহল
করিয়াছে আর্ত্তনাদ। শত শত শিল্পীর ছেদনী
উৎকীর্ণ করিছে শিলা, ঊর্দ্ধে জাগে শাসন-তর্জ্জনী ;—
শত শত প্রহরীর রৌদ্রোজ্জ্বল মুক্ত তরবার
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর তলে। কত জনে করিয়া বঞ্চনা
নিজ নিজ প্রেয়সীর বক্ষে হানি বিচ্ছেদ-বেদনা
কত শিল্পী প্রণয়ের প্রথমান্ধ না হতে সমাধা
ছুটিল যে রাখিবারে সম্রাটের প্রেমের মর্য্যাদা
সর্ব্বব্রত পরিহরি। তারপর বিদারে জানি না—
তাহারা লভিল কিনা দাক্ষিণ্যের প্রতুল দক্ষিণা
কিনিতে মথুরা হ'তে এক গাছি কণ্ঠহার হায়
প্রেমের রাজশ্রী-গর্ব্বে সাজাইতে আপন কান্তায় ;
অথবা ফিরেছে যবে বক্ষে বহি প্রেম উপহার
দেখেছে তাদের গৃহ অন্ধকার,—উঠে হাহাকার !
প্রেম ধরিয়াছে শোকে মর্ম্মরের মর্ম্মে অবয়ব
তাই যদি সত্য হয়, শোকার্ত্তের রাজশ্রী-গৌরব
রাজদম্ভ আড়ম্বর কোথা গেল ? রাজার প্রতাপ
সমারোহে ঘটা ক'রে কোথা তবে করিছে বিলাপ ?

(২)

আজি শুধু মনে পড়ে,—গিয়াছিনু দূরবর্ত্তী গ্রামে—
শুক্ল অষ্টমীর চাঁদ, যখন সে অস্তে নামে নামে,—
ফিরিয়া আসিতেছিনু মাঠপথে ; সম্মুখেই গ্রাম ;
কোথা সাড়া শব্দ নাই, জীবলোক করিছে বিশ্রাম
নিদ্রার বৎসল অঙ্কে। পাশে এক তেঁতুলের গাছে
বাদুড়েরা জানাইছে একমাত্র তারা জেগে আছে।
আম-বাগানের পাশে নিমগাছে ঘেরা গোরস্থান,
পাশ দিয়া আসিবারে ভয়ে ভয়ে ধরিলাম গান।
চেয়ে দেখি মোরে দেখে তাড়াতাড়ি কে যেন লুকায়,
বিদ্যুৎ তাড়নে যেন অকস্মাৎ পরাণ শুকায়,
ত্রস্তকণ্ঠে প্রাণপণে চীৎকারিয়া বলিলাম—'ও' কে ?'
নিশাচর এল কাছে—দেখিলাম জ্যোৎস্নার আলোকে,
মোদের জসিম মিঞা। বাঁচা গেল—ভূত প্রেত নয়,
শুধালাম—"এত রাত্রে হেথা তুই ? করে না'ক ভ ?"
জসিম কহিল, "কত্তা এ গরমে ঘরে থাকা দায় ;
একটুও হাওয়া নাই—আলাতন করিল মশায়,
হেথা বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া—পায়ে পায়ে বেড়াতে বেড়াতে,
জ্যোছনার আলো পেয়ে—এখানেই এলাম এ রাতে—"
কুণ্ঠিত জসিম যেন করিয়াছে কত অপরাধ।
অন্যমনা হয়ে চলি, মনে মোর বিস্ময় অগাধ।
জসিমের মুখে চেয়ে দেখি তার দুই চোখে জল,
চন্দ্রালোকে মুক্তাসম তখনো করিছে টলটল।
চলিয়াছি নিরুত্তর কত কথা জিজ্ঞাসে জসিম—
আমি ভাবিতেছি শুধু জসিমের কি প্রেম অসীম ;
একবর্ষ হলো গত জসিম হয়েছে মৃতদার,
কবরে শায়িত দেহ আজো সে ত ভুলেনি প্রিয়ার ;
অন্ধরাত্রে আসে হেথা লুকাইয়া। রহিল না ছাপা
হৃদয় যমুনা-কূলে কথা দিয়া যত দিক্ চাপা।

অপরাহ্ণে

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

সাঁওতাল পরগণার একটি ছোট ষ্টেশন্। ষ্টেশনটিকে কেন্দ্র করিয়া আশপাশে ক্ষুদ্র শহরটি গড়িয়া উঠিয়াছে। শহরটিকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একজোড়া রেল-লাইন অজগর সাপের মত চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। দিনে ও রাতে খান চারেক ট্রেণ তাহার উপর দিয়া চলিয়া যায়।

ষ্টেশনের ধারে রেল কর্ম্মচারীদের কয়েকখানা বাংলো। দুই তিন ঘর বাঙালী চাকুরে বহুদিন হইতে সেখানে বসবাস করেন। সম্প্রতি একটি ছোক্‌রা য়্যাসিষ্টাণ্টের উপর ভার দিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার কিছুদিনের জন্য ছুটি লইয়া কন্যার বিবাহ দিতে দেশে গিয়াছেন। ছোক্‌রাটি তাঁহার জায়গায় অতি সাবধানে ও সন্তর্পণে কাজ চালাইতেছিল।

ছেলেটির বয়স অল্পই; তাহার গৌরের তাম্রবর্ণ এখনও কালো হয় নাই। নাম সুকান্ত। সেদিন বেলা দশটা আন্দাজ হাতের খুচ্‌রা কাজগুলি যেমন-তেমন ভাবে শেষ করিয়া ষ্টেশন্ হইতে অতি নিকটবর্ত্তী বাসায় ফিরিয়া গিয়া সে ডাকিল, মা? মা কোথায় গো?

এই সময়টায় প্রত্যহই সে জল খাইবার জন্য একবার করিয়া বাসায় আসে; অতএব তাহার ছোট বোন সময় বুঝিয়া তাহার জন্য অতি যত্নে পেঁপের খোসা ছাড়াইতেছিল। মেয়েটি সদ্য বিবাহিতা। মুখ তুলিয়া সে কহিল, কি মাষ্টার মশাই, আপনার সময় হলো এতক্ষণে!

থাম্ থাম্, আর ঠাট্টা করতে হবে না, মুখপুড়ি!

মাষ্টার মশাই বলা কি ঠাট্টা? পাখা বললেই বুঝি ভাল হতো?

সুকান্ত কহিল, ভারি মুখ হয়েছে তোর, সত্যি যেদিন মাষ্টার মশাই হবো সেদিন এই শর্ম্মার পায়ে ধরে' সাধাসাধি করতে হবে স্ত্রী পাশের জন্যে!

ইস্, অত অংখার করিসনে দাদা!

দেখিস্, পায়ে পড়ে' কাঁদতে হবে। এই পায়ে, এই ছাখ্—

মহু চীৎকার করিয়া উঠিল, মা, এই ছাখো দাদা আবার আমায় লাথি দেখাচ্ছে, ভাল হবে না কিন্তু বলে' দিচ্ছি।

মুখ বিকৃত করিয়া সুকান্ত বলিল, তোর বর ত গরীব!

বেশ, গরীব আছে আছে, তোমার খায় না ত সে? যা, আমি তোর পেঁপে ছাড়াতে পারব না।—বলিয়া মহু উঠিয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই খপ্ করিয়া তাহার একটা হাত সুকান্ত ধরিয়া ফেলিল। তারপর তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া বলিল, ওরে বাপরে, রাগ দেখ মেয়ের!

স্বামীর প্রতি কটাক্ষে রাগে মহুর চোখে জল বাহির হইয়া আসিয়াছিল। তাহাকে আঁচড়াইয়া, খিমচি কাটিয়া, কিল মারিয়া, চুল ধরিয়া টানিয়া কিছুতেই যখন সে শান্ত হইল না, তখন সে সুকান্তর একটা হাত ধরিয়া কামড়াইয়া দাঁতের দাগ বসাইয়া দিল।

সুকান্ত হাসিয়া বলিল, যাই ডাক্তারখানায়, তোর দাঁতের যে বিষ, হয় ত আবার গোদলপাড়ায় গিয়ে—

চোখ মুছিয়া মহু এবার হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আমার দাঁতে বিষ? তোর বউ এলে দেখব তার দাঁতে কত মধু থাকে!

এমন সময় মহামায়া বাহির হইয়া আসিলেন। শুদ্ধ শুচি তাঁহার মূর্ত্তি, পরণে গরদের থান, মাথার মাঝখানে সাদা একটি সিঁথি,দেখিয়া মনে হয় এই বোধ করি সেদিনও সিঁদুরের বিন্দু ওই সিঁথিটিকে শোভা পাইত। চোখ দুটি তাঁহার স্নেহকোমল; সে-চোখে একটি উদাস এবং করুণ আনন্দ স্বপ্নস্মৃতির মত জড়াইয়া রহিয়াছে। সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধায় তাঁহার কাছে দাঁড়াইলে মাথা নত হইয়া আসে। মৃদুকণ্ঠে আহ্নিকের মন্ত্র শেষ করিয়া তিনি কহিলেন, আমি একদণ্ড না থাকলেই তোদের ঝগড়া মারামারি,—মহু খেতে দিলি সুকান্তকে?

মাকে দেখিয়া তাহারা একটি মুহূর্ত্তেই শান্ত হইয়া গিয়াছিল। সুকান্ত শুধু কহিল, দেবে কেমন করে'? রাগে মেয়ে যে হাঁসফাঁস করছে!

ঝঙ্কার দিয়া এবার মনু বলিয়া উঠিল, ও কেন বল্‌বে মা, আমার বর গরীব, আমার দাঁতে মিশি, আমার—

মহামায়া স্নিগ্ধ স্নেহের হাসি হাসিয়া বলিলেন, তুই হাসিস বলেই ত বলে!

রাগের কথা বললে কা'র মাথা ঠাণ্ডা থাকে?

সুকান্ত মায়ের দিকে তাকাইয়া এমন ভাবে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল যে, এবার অকস্মাৎ গভীর লজ্জায় মনু মাথা হেঁট না করিয়া থাকিতে পারিল না। কোনো রকমে পেণ্ডেগুলি থালায় সাজাইয়া দিয়া আড়ালে গিয়া কাঁদিবার জন্য তাড়াতাড়ি সে সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

সুকান্ত খাইতে আরম্ভ করিলে মহামায়া তাহার কাছে বসিলেন। সুকান্ত কহিল, আমার আর বেশিদিন মাষ্টারী করতে হলো না মা!

মহামায়া কহিলেন, কি রকম?

নতুন মাষ্টার মশাই আজ সকালে এসে পৌঁছেছেন।

ও, তাই নাকি? বাঁচলাম। ভয়ে ভটস্থ হয়ে আছি; দারিদ্রের কাজ, ভাগ্যি এ কদিনে কোনো বিপদ আপদ ঘটিয়ে ফেলিসনি!

সুকান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, তুমি ত খুসী হবেই, তোমার ছেলের ঘাড় থেকে বোঝা নেমে গেল! আমি কিন্তু বেশ ছিলাম মা, সবাই মান্য করে চল্‌ত।

মান্য যারা সত্যিই করে, তারা মান্য করবেই রে। বেশ বেশ, মাষ্টার মশায়ের নাম কি?

নাম এখনো জিজ্ঞেসা করিনি। আমার সঙ্গে কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যে খুব ভাব হয়ে গেছে মা।

মহামায়া কহিলেন, তুইও একদিন মাষ্টার হবি, সেই আশায় আমি বেঁচে থাকব, মিনু শুণ্‌চি। এইবার কোম্পানী থেকে তোর মাইনে বাড়িয়ে দিক্ না, এক বছর ত হলো?

বাড়িয়ে দেবার কথা চল্‌চে।—সুকান্ত বলিল।

মহামায়া কহিলেন, মাষ্টারের সঙ্গে কে কে এসেছে?

কেউ না, তিনি একাই। আমি জিজ্ঞেসা করেছিলাম, বললেন, চাকরটা ছাড়া তাঁর সঙ্গে আসবার আর কেউ নেই!

দূর হোক গে ছাই, বৌ-ঝি এলে কেমন হতো! এই মাঠের মাঝখানে একা থাকা যে কী কষ্টকর! আগেকার মাষ্টারের বাড়ীর মেয়েরা এসে পড়লে বাঁচি আমি। বিয়ে দিতে আজো গেল, কালও গেল!

সুকান্ত কহিল, আমিও মিনু শুণ্‌চি, এখনো কুড়িদিন তাঁর আসবার দেরী রয়েছে। কিন্তু তাঁর চেয়ে এ লোকটি অনেক ভাল মা।

বেশ, তোর কাছে ভাল হলেই ভাল!

সুকান্ত একটু উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, আমাকে বলেছেন রাতের ডিউটি আমার করবার দরকার নেই, তিনিই করবেন। রাতে তাঁর নাকি ঘুম না-হওয়ার রোগ আছে মা।'

মহামায়া কহিলেন, সামান্য দু' ঘণ্টার মধ্যে তোর সঙ্গে এত আলাপ হয়ে গেল?

সুকান্ত আত্মগৌরবের হাসি হাসিয়া কহিল, আমি বললাম, আপনার শরীর তেমন ভাল নয়, চাকর ছাড়া অন্তত আর একজন কাউকে আন্‌লে পারতেন? উনি হেসে বললেন, আর কে আসবে বল, দু'টি জিনিস আমার সম্বল,—চাকর আর চাকরি।

বটিখানা টানিয়া কুট্‌নো কুটিতে বসিয়া মহামায়া বলিলেন, সংসার করেনি, বুঝতে পেরেছি। অম্‌নি ছন্নছাড়া লোক আজকাল মাঝে মাঝে দেখা যায় বটে!

মায়ের তাচ্ছিল্যে মনে মনে একটু আহত হইয়া সুকান্ত কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল; তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, একদিন কিন্তু ওঁকে নেমন্তন্ন করে' খাওয়াতেই হবে মা, তা বলে রাখছি।

তা বেশ ত, আগে থাকতে বলিস্। এ আর এমন কি কথা!

সুকান্ত খুসী হইয়া বাহির হইয়া গেল।

মাষ্টার মশাইয়ের কোয়ার্টার খুব কাছেই। মাঝামাঝি খানিকটা রেলওয়ে ইয়ার্ড পার হইয়া সুকান্ত সোজা ভিতরে ঢুকিয়া দালানে উঠিয়া আসিল। সাত নম্বর আপ্ এক্স্‌প্রেস্‌কে বিদায় দিয়া মাষ্টার মশাই তখন ধীরে সুস্থে একখানি ডেক্ চেয়ারে বসিয়া একটি বর্ম্মা চুরুট টানিতেছিলেন। বয়স তাঁহার পঁয়তাল্লিশের বেশী হইবে না, বলিষ্ঠ ও সৌম্য মূর্ত্তি। কানের পাশে দুইটি রগের চুল একটু একটু পাকিয়াছে। সুকান্তকে দেখিয়া তিনি স্নেহের হাসি হাসিয়া বলিলেন, তোমার জন্যেই বসে আছি

সুকান্ত, ডাক্তারবাবু এতক্ষণ ছিলেন, এইমাত্র তিনি,—ওরে রামলগন ?

রামলগন তাঁহার হিন্দুস্থানী চাকর, কিন্তু সে বাঙালী বনিয়া গিয়াছে। রান্না করিতে করিতে সে আসিয়া দাঁড়াইল। মাষ্টার মশাই বলিলেন, ডেক্‌চিতে সরপুরিয়া আছে, ছোটবাবুকে এনে দে, অম্‌নি চা তৈরী করে' নিয়ে আয়।

সুকান্ত ব্যস্ত হইয়া কহিল, আমি এইমাত্র বাসা থেকে খেয়ে এলাম যে মাষ্টার মশাই, তা ছাড়া চা খাওয়া—

মাষ্টার মশাই তেমনি করিয়া হাসিয়া তাহার পিঠে মৃদু আঘাত করিয়া প্রতিবাদ করিতে বারণ করিলেন। কথা তিনি অল্প বলেন, এবং ধীরে ধীরে বলেন। তাঁহার দিকে একবার তাকাইয়া রামলগন চলিয়া গেল।

চুরুটে একটা টান্ দিয়া তিনি কহিলেন, আমি এখানকার কিছুই বিশেষ চিনিনে, এদিকে নাকি কোথায় এক যোগিনীর আশ্রম আছে সুকান্ত ?

হ্যাঁ, সে ওই পশ্চিম দিকে মাঠ পার হয়ে যেতে হয়, অনেকখানি পথ। আপনি কি অতদূর হাঁটতে পারবেন ?

কি আছে সেখানে ?

মেয়েরা থাকেন, তাঁদেরই আশ্রম। সন্ধ্যের সময় ঠাকুরের আরতি হয়। মা মাঝে মাঝে মেয়েদের দেখতে যান্, মনুও যায়। আপনি যাবেন একদিন ? আপনি এসেছেন খবর পেলে যোগিনী-মা নিজেই আসবেন আপনার কাছে চাঁদা চাইতে। চাঁদা উঠিয়েই ওঁদের চলে কিনা !

মাষ্টার মশাই আর একবার চুরুটে টান্ দিতে গিয়া কাশিয়া ফেলিলেন। কাশিতে কাশিতে তাঁহার মুখ-চোখ টক্‌টকে রাঙা হইয়া উঠিল। কাশি যখন থামিল তখন দেখা গেল তাঁহার মুখ দিয়া কয়েক ফোঁটা রক্ত উঠিয়া আসিয়াছে।

শঙ্কাব্যাকুল দৃষ্টিতে সুকান্ত তাঁহার দিকে তাকাইয়া ছিল। মাষ্টারবাবু উঠিয়া মুখ ধুইয়া আবার আসিয়া বসিতেই সে ভগ্নস্বর কণ্ঠে কহিল, ডাক্তারবাবু এসেছিলেন, তখন বললেন না কেন আপনার অসুখের কথা ? আমি ডাক্তারবাবুকে একবার ডেকে আন্‌ব, মাষ্টার মশাই ?

মাষ্টার মশাই হাসিয়া কহিলেন, ভয় নেই, এ এমনিই, তুমি ব্যস্ত হয়ো না সুকান্ত।

সুকান্ত কহিল, রোগ ত সারানো দরকার !

এ ত' রোগ নয় সুকান্ত, এ অসুখ। এ সারবেও না, বাড়বেও না।

ভেতর থেকে রক্ত উঠলো যে মাষ্টার মশাই !

মাষ্টার মশাই তাহার পিঠের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, বদ্‌রক্ত কিনা, তাই ভেতরে ওর জায়গা নেই !

চিন্তিত হইয়া সুকান্ত কহিল, কিন্তু এমনি ক'রে আপনি ভুগবেন ?

ভুগিনি একদিনও, এ অসুখের যন্ত্রণা নেই সুকান্ত, আছে দুঃখ। রোজ একবার কি দু'বার করে' এই কাশি ওঠে !

আপনাকে দেখে কিন্তু বোঝবার যো নেই, যে, এই অসুখ আপনার আছে।

মাষ্টার মশাইয়ের মুখ বিচিত্র হাসিতে একটু একটু করিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে বলিলেন, বোঝবার যো নেই, না ?

এমন সময় রামলগন চা ও মিষ্টান্ন আনিয়া রাখিল। মাষ্টার মশাই এক পেয়ালা চা ও এক প্লেট্ মিষ্টান্ন সুকান্তর দিকে সরাইয়া দিয়া নিজেও লইলেন। তারপর কহিলেন, ঠিক বলেছ, বোঝবার যো নেই, এ বোধ হয় এমনিই, ভেতরের অসুখ ভেতরেই থাকে।

কথাটি ভাল করিয়া তলাইয়া সুকান্ত বুঝিল না বটে কিন্তু মনে মনে কথাগুলিকে সে আস্বাদন করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে চা পান করিয়া এক সময় মাষ্টার মশাই কহিলেন, তুমি এত ছোটবেলায় চাকরী করতে এলে কেন সুকান্ত ? পড়াশুনো কি তোমার ভাল লাগছিল না ?

সুকান্ত একটু করুণ হাসিয়া কহিল, আপনাকে কি আর বুঝিয়ে বল্‌তে হবে কেন এর মধ্যেই চাকরী করতে এলাম ?

কিন্তু এতে ত তোমার নিজের উন্নতি হবে না, হবে তোমার চাকরির উন্নতি।

সুকান্ত আবার একটু হাসিয়া কহিল, সংসার তাইতেই সুখী হবে মাষ্টার মশাই !

চা খাওয়া শেষ করিয়া মাষ্টার মশাই তাহার হাত ধরিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। শীত শেষ হইয়া তখন সবেমাত্র বসন্তকাল পড়িয়াছে। মাথার উপরে মধ্যাহ্নের

সূর্য্য প্রখর তেজ বর্ষণ করিতেছিল। মাঠের চারি দিকে ধূলি-জঞ্জাল উড়াইয়া এলোমেলো বাতাস থাকিয়া থাকিয়া হু হু করিয়া বহিয়া যাইতেছে।

প্ল্যাটফরম্ পার হইয়া আপিস ঘরে ঢুকিয়া তিনি কহিলেন, এবেলা তুমি আমার এখানেই খাবে সুকান্ত।

সুকান্ত ব্যস্ত হইয়া কহিল, বাসায় রান্না হয়েছে, আজ থাক্ মাষ্টার মশাই। খাওয়া ত আছেই।

আচ্ছা, তবে আজ রাত্রে খেও আমার সঙ্গে, কেমন? —বলিয়া তিনি তাহাকে কাছে লইয়া একান্ত সস্নেহ কণ্ঠে কহিলেন, আমার কাছে কোনো দিন কিছু লজ্জা করো না সুকান্ত!

ষ্টেশনের জন দুই কেরাণী এবং জন চারেক চাপরাশি ও কুলী আসিয়া তাঁহার কাছে কাজ বুঝাইয়া দিল এবং বুঝিয়া লইল। সুকান্ত ইতিমধ্যে দুই তিনখানা খাতা নাড়াচাড়া করিয়া কয়েকটা সই সাবুদ ও রবার-ষ্ট্যাম্প বসাইয়া দিল। তার পর একখানি কাগজে কি যেন লিখিয়া সে সুমুখে ধরিয়া বলিল, এতে একটা সই করে' দিতে হবে মাষ্টার মশাই।

সই? বলিয়া মাষ্টার মশাই তাহার দিকে একবার তাকাইলেন। এই পুষ্পতুল্য তরুণটিকে মনোযোগ দিয়া কোনো কাজ করিতে দেখিলেই তাঁহার ভিতর হইতে কেমন একটি কৌতুকের হাসি বাহির হইয়া আসিতেছে। এত অল্পবয়স্ক বালককে লইয়া তিনি গম্ভীর হইয়া কাজ চালাইবেন কি করিয়া? তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে এই ছেলেটিই কি ষ্টেশন-মাষ্টারের কাজ চালাইতেছিল? আশ্চর্য্য!

কাগজখানি লইয়া তিনি একটি সই করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। তার পর কহিলেন, এবার তুমি বাড়ী যাও সুকান্ত।

সুকান্ত মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে তাকাইতেই তিনি পুনরায় কহিলেন, চান করে' খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমোওগে। মুখ তোমার ভারি শুকিয়ে গেছে।

সুকান্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, অনেক কাজ রয়েছে যে আমার?

থাক্ না, আমি কি করতে আছি এখানে?

ইহার উপর আর কথা চলে না। সুকান্ত চুপ করিয়া রহিল। একজনের কাজ যে নিঃস্বার্থভাবে আর একজন করিয়া দেয়—এমন উদাহরণ সচরাচর তাহার চোখে পড়ে নাই। সে শুধু মৃদুকণ্ঠে কহিল, আর একটু থাকি, এখনো আমার ক্ষিধে পায়নি।

ষ্টেশনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। একখানা ডাউন্ ট্রেণ্ আসিবার সময় হইয়াছে। মাষ্টার মশাই খাতাপত্র লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। লাল এবং সবুজ দুইখানা ফ্ল্যাগ্ হাতে করিয়া সুকান্তও তাঁহার পিছনে পিছনে বাহির হইয়া আসিল। চাপরাশিটা গিয়াছিল কেবিনে সিগ্‌নাল্ ডাউন্ করিতে; সুকান্ত লাল ফ্ল্যাগটা উড়াইয়া ষ্টেশনকে সতর্ক করিয়া দিল। মিনিট খানেক পরেই দেখা গেল, অতিকায় বন্য জন্তুর মত ট্রেণখানা হু হু করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে।

গাড়ী আসিয়া মিনিট তিনেক দাঁড়াইল, মাষ্টার মশাই ডাক এবং মালের কাজ সারিয়া লইলেন। জনকয়েক যাত্রী উঠা-নামা করিল, গোটা দুই ফিরিওয়ালা পসরা সাজাইয়া হাঁকাহাঁকি করিয়া গেল, তার পর আবার বাঁশী বাজাইয়া ও সবুজ নিশানা উড়াইয়া ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

ধীরে ধীরে ষ্টেশন আবার জনবিরল হইয়া উঠিল। মাষ্টার মশাই ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, চলন্ত ট্রেণের দূর পথের দিকে তাকাইয়া তখনও সুকান্ত অন্যমনস্কভাবে ফ্ল্যাগ্ উড়াইতেছে। তাহার পিঠের উপর অতি ধীরে হাত রাখিয়া তিনি কহিলেন, কি ভাবচ সুকান্ত?

সুকান্ত পিছন ফিরিয়া সলজ্জ একটু হাসিল, বলিল, এম্‌নি, গাড়ী চল্‌তে দেখলে আমার বেশ লাগে।

সেদিন দুপুর বেলায় ভিতরে আসিয়া সুকান্ত কহিল, চলুন মাষ্টার মশাই, আমাদের রান্না হয়ে গেছে।

মাষ্টার মশাই চুরুটটা নামাইয়া রাখিয়া ইজিচেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তার পর হাসিয়া বলিলেন, চল, ভাল রান্না অনেক দিন খাওয়া হয়নি, দেখি তোমরা কি রকম নেমন্তন্ন খাওয়াও।

সুকান্ত বিনীতকণ্ঠে কহিল, কিছুই না, অতি সামান্য—

মাষ্টার মশাই তাহার পিঠ চাপড়াইয়া পুনরায় হাসিয়া কহিলেন, অতি সামান্য, না? আচ্ছা, তোমাদের সামান্যটাই একবার চেখে আসা যাক্ সুকান্ত। কিন্তু নেমন্তন্ন করে' নিয়ে গিয়ে সামান্যই বা খেতে দেবে কেন বল ত? 'সামান্য' আমি পাবো না সুকান্ত!

দুইজনেই বিমল আনন্দে হাসিয়া উঠিলেন। সুকান্তর বিনয়, সৌজন্য, সঙ্কোচ যেন একটি মুহূর্ত্তেই ঝড়ে উড়িয়া গেল।

ব্রাহ্মণের ঘর। বাসায় ঢুকিয়া তিনি একবার পা ধুইয়া লইলেন। সুকান্ত গামছা দিল। তিনি পা মুছিয়া আসনে গিয়া বসিলেন। ষোড়শ উপচারে অন্ন ও ব্যঞ্জন থালায় করিয়া সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, মাষ্টার মশাই তাহার দিকে তাকাইয়া দিশেহারা হইয়া গেলেন। মনু পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে পাখার বাতাস করিতে লাগিল। মহামায়া আসিয়া আরও বার দুই পরিবেশন করিয়া ভিতরে গিয়া ঢুকিলেন। সেই গিয়া ঢুকিলেন, আর বাহির হইলেন না।

মাষ্টার মশাই সস্নেহে মনুকে কাছে ডাকিলেন। পাখা রাখিয়া মনু তাঁহার কাছে সরিয়া আসিতেই তিনি আদর করিয়া তাহাকে পাশে বসাইলেন। মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, তোমার খাওয়া হয়েছে মা?

আমি মা'র সঙ্গে বসব।—মনু কহিল, আপনি খেতে বসুন।

তোমার ভাল নামটি কি?

মণিমালা দেবী।

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মাষ্টার মশাই বলিলেন, এক মণিমালা, তার আবার দেবী? ভয় পাবার কথা যে!

মনু ও সুকান্ত ছেলেমানুষের মত হাসিয়া উঠিল।

সুকান্তর সঙ্গে তিনি তার পর খাইতে বসিলেন। খাইতে খাইতে গল্প করিয়া মনু তাঁহার পরম বন্ধু হইয়া উঠিল। কথা রহিল, মনুর শ্বশুরবাড়ী গিয়া কোনো সময় তিনি জামাইকে দেখিয়া আসিবেন।

খাওয়ার শেষাশেষি মনু এক-সময় উঠিয়া ভিতরে গেল, ভিতর হইতে কিয়ৎক্ষণ পরে বাহির হইয়া সুকান্তর সহিত চোখচোখি করিয়া কি যেন একটা ইঙ্গিত করিল। ইঙ্গিত করিয়া একবার পাশের ঘরে ঢুকিল এবং কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আবার বাহির হইয়া আসিল।

উঠিবার আগে মনু কহিল, আপনার পেট ভরল না মাষ্টার মশাই।

সুকান্ত কহিল, তুই যে রকম বকাচ্ছিলি, খাওয়ার সময়ই পেলেন না। বা রে, আমার দোষ হলো বুঝি?

মাষ্টার মশাই হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মনু কহিল, তাড়াতাড়িতে কী যে খেলেন, মা এসে একবার দেখতেও পারলেন না, তাঁর শরীর ভাল নেই, শুয়ে পড়েছেন।

সুকান্ত কহিল, শুয়ে পড়েছেন? কেন রে?—বলিয়া সে ভিতরে গেল।

গলা নামাইয়া মনু কহিল, বোধ হয় কোথাও কিক্ ব্যথা ধরেছে!

মাষ্টার মশাই ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, ব্যথা? অসুখ শরীর বুঝি?

না, অসুখ ত মা'র কিছু নেই!

হাত ধুইয়া বাহির হইয়া যাইবার আগে মাষ্টার মশাই কহিলেন, ভয় নেই, দাঁড়াও, ডাক্তারবাবুকে আন্‌ছি, ষ্টেশনেই তিনি আছেন বোধ হয়।—বলিতে বলিতে তিনি বাহিরের দরজায় পা বাড়াইতেছিলেন, এমন সময় ভিতর হইতে সুকান্ত বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, মা বললেন ডাক্তার আনবার দরকার নেই, এখুনি সেরে যাবে, এ রকম তাঁর হয় মাঝে মাঝে।

মাষ্টার মশাই কহিলেন, বাড়্‌চে, না কম্‌চে একটু একটু?

সুকান্ত আবার গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আসিল। বলিল, বললেন এ কিছু না, এখুনি সেরে যাবে। মনু, মা ভয়ানক রাগ করেছে তোর ওপর, তোর কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই,—তাঁর এমন কিছুই হয়নি অথচ তুই বল্‌লি—

মনু কহিল, আমি কি করব? মুখ থুবড়ে শুয়ে আছে দেখেই না এসে বললাম?

আচ্ছা, আমি ষ্টেশনে আছি, খবর দিও মনু দরকার হলে। বলিয়া মাষ্টার মশাই বাহির হইয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাইবার পর মনু ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, লোকে যখন খেতে বসে তখন কেউ গিয়ে শোয়? মা যেন কী!

সুকান্ত কিছুই না বলিয়া বাহির হইয়া গেল। মায়ের এই অস্বাভাবিক ব্যবহারে মনটা তাহার যেন খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। মা যে তাহার কাছে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা ও সৌজন্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী!

দিন চলিয়া যায়।

বিকাল বেলায় সাধারণতঃ মাষ্টার মশাইয়ের হাতে

কোনো কাজ থাকে না। রেলের লাইনের ধার দিয়া তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে প্রত্যহ অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া যান্; নির্জ্জনে বেড়াইতে তাঁহার ভাল লাগে। প্রায় আধ মাইল দূরে একটা বড় সাঁওতাল দীঘির ধারে গিয়া তিনি যেন ক্লান্ত হইয়াই বসিয়া পড়েন। দেখিতে দেখিতে জলের উপর ছায়া ফেলিয়া সূর্য্যাস্তের আরক্ত আকাশ একটু একটু করিয়া অন্ধকার হইয়া আসে।

শহরে গিয়া তিনি দুই একদিন ঘুরিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু শহরে যাইতে তাঁহার ভাল লাগে না। শহরের দোকান বাজার এবং লোকজনের কোলাহলের মাঝখানে মানুষের যে লোলুপ ক্ষুধার্ত্ত মূর্ত্তি তাঁহার চোখে ভাসিয়া ওঠে, তাহাতে তিনি দিশাহারা হইয়া যান্।

এদিকে কোথায় ধানের একটা কল্ আছে। দিনমজুরি করিয়া সাঁওতালি স্ত্রী-পুরুষ যখন সারাদিনের পর পরিশ্রান্ত পায়ে মাঠের পথ ধরিয়া গ্রামের দিকে চলিতে থাকে, তখন তাহাদের দিকে তাকাইয়া থাকিতে মাষ্টার মশাইয়ের মনটি একটি বেদনার আনন্দে দোল খাইতে থাকে।

সেদিন তিনি ষ্টেশন হইতে নামিয়া অন্য পথে চলিলেন। কয়েকদিন ধরিয়া যোগিনীর আশ্রম হইতে তাঁহার কাছে বার বার নিমন্ত্রণ আসিতেছিল। যোগিনী-মা আসিয়া একদিন তাঁহার নিকট হইতে চাঁদাও লইয়া গিয়াছেন। সেখানে একবার না গিয়া আর তাঁহার চলিতেছিল না। সুকান্ত তাঁহার সঙ্গে যাইবে বলিয়াছিল,—তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেও ভাল হইত; কিন্তু সে তখন আপিস-ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছিল। অগত্যা মাষ্টার মশাই একাই বাহির হইয়া আসিলেন; প্লাটফরম্ ছাড়াইয়া, রেলওয়ে ইয়ার্ড্ পার হইয়া সুমুখের উঁচু পাকা সড়কের উপর উঠিলেন।

সড়ক অতিক্রম করিয়া তিনি যখন মাঠে নামিলেন, পশ্চিম দিকে শালবনের মাথায় তখন রাঙা সূর্য্য হেলিয়া পড়িয়াছে। ঘন নীল পরিচ্ছন্ন আকাশ সূর্য্যাস্তের আভায় ঈষৎ ধূসর হইয়া উঠিয়াছিল। দূরে দুমকার অস্পষ্ট পাহাড়ের শ্রেণী এত দূর হইতেও দেখা যাইতেছে। মাষ্টার মশাই প্রান্তরের উপর দিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছিলেন; তাঁহার পথের দুই পাশে নূতন বসন্তকালের অনামা ও অখ্যাতনামা নানা রকমের ঘাসের ফুল ফুটিয়া বাতাসে মৃদু-মধুর গন্ধ বিলাইতেছিল।

অনেকক্ষণ হইতে যে অস্পষ্ট নারীমূর্ত্তিটি তাঁহার সুমুখের পথে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল, তাহা এতক্ষণে স্পষ্ট হইয়া তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি একবার বিপন্ন হইয়া ইতস্ততঃ করিলেন, মুখ ফিরাইয়া একবার অন্য পথে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কাঁটাগাছের ঝোপ ও ফণী-মনসার জঙ্গলে চারি দিক আকীর্ণ দেখিয়া তিনি পথ ছাড়িয়া সরিয়া যাইতে পারিলেন না। দেখিলেন, মহিলাটিও সেই অবস্থায় পড়িয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

এমনি বিমূঢ় অবস্থার মধ্যে নিরুপায় হইয়া মাষ্টার মশাই একবার মুখ তুলিলেন। কিন্তু মুখ তুলিয়া তিনি আর সহসা দৃষ্টি নামাইতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শান্ত ও কোমল চক্ষু দুইটি বিচিত্র ও অনাস্বাদিতপূর্ব্ব একপ্রকার বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। পাছে এই নির্জ্জন ও নিঃসঙ্গ পথের প্রান্তে বাক্যালাপ করিলে এই নিরাভরণা শুভ্রবেশিনী ভদ্র-মহিলার কোনোওরূপ অসম্মান ঘটে, এ কারণে তিনি নীরবে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার জন্য আর একবার পা বাড়াইলেন; কিন্তু চলিতে গিয়াই তাঁহার অবাধ্য কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল, এ কি, এদিকে যে? এ দেশে কোথায়?

মহিলাটি চোখ নামাইয়া মাথায় আর একটু ঘোমটা টানিয়া দিলেন। তাঁহার আপাদমস্তক অস্বাভাবিক আতঙ্কে ও লজ্জায় কেমন করিয়া যে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, তাহা মাষ্টার মশাই এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তাড়াতাড়ি পথ ছাড়িয়া কাঁটার জঙ্গলের উপর উঠিয়া গিয়া তিনি যাইবার পথ করিয়া দিলেন।

ঘোমটার ভিতর হইতে মুখ না তুলিয়া কম্পিত ও বিপন্ন কণ্ঠে মহিলাটি আস্তে আস্তে বলিলেন, আমি সুকান্তর মা, আপনি আর আমার সঙ্গে কথা বলবেন না, ছেলে-পুলেরা রয়েছে এখানে···

ক্ষণেকের জন্য মাষ্টার মশাই একটু অপ্রস্তুত হইলেন। তার পর বলিলেন, আমাকে 'আপনি' বলতে পারো, কিন্তু আমি তোমাকে 'তুমিই' বল্ব মহামায়া। ভাবচি,

পনেরো বছর পরে তোমাকে এত সহজে কি করে' চিন্‌তে পারলাম! কি আশ্চর্য্য, আমিই আবার এখানকার ষ্টেশন্-মাষ্টার হয়ে এসেছি! এ কি নিয়তি?

মহামায়া কথা কহিলেন না। কোন্‌ারার মুখ হইতে উচ্ছ্বসিত বারিধারার ন্যায় মাষ্টার মশাই বলিলেন, হ্যাঁ, সুকান্তকে দেখে তোমারই কথা আমার মনে হয়েছিল, তাকে আমার মন যেন চিন্‌তে পেরেছিল,—আশ্চর্য্য!

নির্ব্বাক ও নিশ্চল হইয়া মহামায়া ক্ষণকালমাত্র দাঁড়াইলেন; তার পরই আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে ইতস্তত: পা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ষ্টেশনের দিকে চলিতে সুরু করিয়া দিলেন। একটা ভয়ানক বিপদ হইতে তিনি যেন আত্মরক্ষা করিয়া পলাইতেছিলেন—বোধ করি অনেকটা এমনিই।

পথ হারাইয়া হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া মাষ্টার মশাইও চলিতে লাগিলেন। কি করিয়া ও কি বলিয়া যে এই দুইটি মিনিট কাটিয়া গেল, তাহাই একবার ভাবিতে গিয়া তাঁহার মাথার মধ্যে গোলমাল হইয়া গেল। উন্মত্ত আনন্দে পাগলের মত তিনি অস্থির হইয়া একবার হাসিয়া উঠিলেন। বহুকাল দু:খভোগের পর জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তুকে অপ্রত্যাশিতভাবে হাতে পাইলে বেদনা ও আনন্দে মানুষের যাহা হয়, মাষ্টার মশায়ের তাহাই হইয়াছিল।

পিছন ফিরিতে যেন তাঁহার সাহস হইতেছিল না, কিছুদূর গিয়া তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। প্রান্তরের উপরে পূর্ব্ব দিক হইতে সন্ধ্যার ঘনকৃষ্ণ ছায়া ইহারই মধ্যে নামিয়া আসিয়াছে। দূরের বস্তু আর কিছুই দেখা যায় না, তবু তিনি স্থিরনিশ্চয় করিয়া বুঝিলেন, মহামায়া চলিয়া গিয়াছেন। ছি ছি, এ তিনি করিলেন কি? যুবজনোচিত এই তারল্য তাঁহার আসিল কোথা হইতে? পথের উপরে ভদ্রমহিলাকে থামাইয়া আলাপ করিবার মত মূঢ়তা তাঁহার কোথায় আত্মগোপন করিয়া ছিল? পূর্ব্ব-পরিচয়? প্রেম? তাঁহার মত প্রবীণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে জনসমাজকে লুকাইয়া এই কদর্য্য কুৎসিত চৌর্য্যবৃত্তি—ইহার নাম প্রেম? লাম্পট্য তবে কাহাকে বলে? সুযোগ পাইয়া এক শুদ্ধচিত্তা সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিধবাকে অপমান করিবার কি অধিকার তাঁহার ছিল?

হঠাৎ ভিতর হইতে তাঁহার কাশি উঠিয়া আসিল। কাশিতে কাশিতে তিনি বসিয়া পড়িলেন। এই কাশি যেন দানবের মত তাঁহার বুকের ভিতর বাসা বাঁধিয়া আছে। জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার ভিতরে নাড়িভুঁড়ি মুচড়াইয়া, ওলোট-পালট করিয়া, দলিত ও মথিত করিয়া দাপাদাপি সুরু করিল। কাশি থামিবার সঙ্গে সুড় সুড় করিয়া মুখের ভিতর হইতে অন্ধকারে রক্ত গড়াইয়া আসিল। যাক্, তিনি বাঁচিলেন, আজকে আর তাঁহাকে কাশিতে হইবে না। তিনি মুখ মুছিয়া সুস্থ হইয়া লইলেন।

যোগিনীর আশ্রমে যাইবার উৎসাহ এবং অভিরুচি তাঁহার চলিয়া গিয়াছিল। পথ ভাঙিয়া ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিয়া প্লাটফরমের উপর তিনি খানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া বেড়াইলেন। সুকান্ত কাজ শেষ করিয়া বোধ করি বাসায় গিয়াছে, রাত এগারোটার আগে সে আর ফিরিবে না। আপ্ ট্রেণখানা আসিয়া পৌছিতে তখনও অনেক বিলম্ব ছিল। টিকিট-ঘরের জানালাটি বন্ধ করিয়া কেরাণীটি বাসায় খাইতে গিয়াছে; চাপরাশি এবং কুলী কেহ কোথাও নাই,—ষ্টেশন খাঁ খাঁ করিতেছিল। মাষ্টার মশাই নি:শব্দে আসিয়া একখানি বেঞ্চির উপর ক্লান্ত এবং অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িলেন। এ চাকরি আর তিনি বেশী দিন করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। চাকরি করিয়া সংস্থান করিবার কোনও প্রয়োজন তাঁহার ছিল না, শুধু দিনের পর দিন কাটানই সংসারে তাঁহার একমাত্র কাজ। সে কাজ তাঁহার এইবার হয় ত ফুরাইবে! কোথাও কোনো দূর নদীতীরে অথবা কোনো নিভৃত পল্লীচ্ছায়ায় গিয়া তিনি এই ভগ্ন জীবনের বাকি দিনগুলি শান্তিতে কাটাইয়া দিবেন। কেহ জানিবে না, কেহ শুনিবে না, একদিন মরণ আসিয়া চুপি চুপি তাঁহার দ্বারে হাত পাতিয়া অঞ্জলি চাহিবে!

অনেক রাত্রে তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আপিস-ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, রামলগন ইতিমধ্যে কখন্ আসিয়া তাঁহার খাবার ঢাকা দিয়া রাখিয়া গেছে। তাহারই পাশে টেবিলের উপর আলোর সুমুখে তাঁহারই নামে একখানি চিঠি পড়িয়া আছে। চিঠিখানি খুলিয়া তিনি পড়িয়া দেখিলেন, এখানকার পুরাতন ষ্টেশন-মাষ্টার রজনীবাবু লিখিয়াছেন, আগামী সোমবার প্রাতে তিনি

সপরিবারে আসিয়া আবার কাজ হাতে লইবেন। ছুটি তাঁহার ফুরাইয়াছে।

চিঠি রাখিয়া মাষ্টার মশাইয়ের দৃষ্টি পড়িল ঘরের ওপাশে জানালার কাছে। ইজি-চেয়ারে শুইয়া সুকান্ত ইতিমধ্যে কখন্ অচেতন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমের জানালা দিয়া শুক্লপক্ষের চাঁদের আলো আসিয়া তাহার নিষ্পাপ ও তরুণ সুন্দর মুখখানিকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল। ঘুমাইলে সুকান্তর মুখখানি হাসিতে হইয়া উঠে।

অপলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া তিনি ভাল করিয়া তাহাকে দেখিবার জন্য ধীরে ধীরে কাছে সরিয়া আসিলেন। কাছে আসিয়া তিনি চেয়ারের পাশে মেঝের উপরেই নিঃশব্দে বসিয়া পড়িয়া সুকান্তর হাতখানির উপর নিজের হাত রাখিলেন। মনে হইল, এই বালকটির মুখখানি যুগ-যুগান্ত কাল ধরিয়া তাঁহার অতি-পরিচিত—ইহার চেয়ে বড় আত্মীয় সংসারে আর তাঁহার কেহ নাই! ভাবিতে ভাবিতে ভিতরটা তাঁহার উদ্বেল হইয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে রাত্রির নিভৃত নির্জ্জনে তাঁহার কপাল ও চুম্বিত দুইটি চক্ষু জলে-জলে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল।

আবার ধীরে ধীরে তিনি এক সময় উঠিয়া গেলেন।

পরদিন ষ্টেশন্ হইতে বাসায় ফিরিয়া সুকান্ত পূজার ঘরের কাছে দাঁড়াইয়া খবর দিল, মা, মাষ্টার মশায়ের বড় অসুখ।

আহ্নিক করিতে করিতে মহামায়া তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন। সুকান্ত কহিল, ডাক্তারবাবু দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। তুমি সাবু তৈরী করে' মনুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও মা।

পূজা শেষ করিতে মহামায়ার অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল। সুকান্ত শঙ্কাকুল কণ্ঠে পুনরায় কহিল, জ্বরে প্রায় বেহুঁস, কেবল কাশি উঠ্‌ছে, তার সঙ্গে চাপ চাপ রক্ত!

আচমন করিয়া এবার মহামায়া কহিলেন, এ রোগে ত মানুষ বাঁচে না! সাবু করে' দিতে হবে? কেন, রামলগন রয়েছে না?

রামলগন ঘুরে ঘুরে কাই-ফরমাস খাটছে যে।

মহামায়া কহিলেন, এবার বুঝি আমাদের ফণীর পথ্যি যোগাতে হবে? সংসার যে করেনি, বুড়ো বয়সে তার এই শাস্তিই হয়। বলি, তোর এত মাথা ব্যথা কেন রে সুকান্ত? রোগ হয়েছে, চাকর-মনিবে বুঝুক গে, আমাদের কি?

দুইটি ভাই-বোন মায়ের দিকে সবিস্ময়ে তাকাইয়া ছিল। মহামায়ার এই অস্বাভাবিক রূঢ়তার সহিত কোনো দিনই তাহাদের পরিচয় নাই। তাঁহার কর্কশ চেহারার দিকে তাকাইয়া সুকান্ত আর কিছু না বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

রামলগনকে সুকান্ত আগেই বলিয়া রাখিয়াছিল, খানিক বেলায় সে সাগু লইতে আসিল। মহামায়া বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাবুর জ্বর কমেছে রামলগন?

সে কহিল, কমেনি মা।

ভয় নেই, সেরে যাবে। ওঁর কাছে ক'বছর তুমি চাকরী করছ?

এই বারো বছর হলো।

ও। বলিয়া মহামায়া একবার কি যেন ভাবিয়া লইলেন, তার পর পুনরায় কহিলেন, বাবু তোমার কেমন লোক রামলগন?

রামলগন শুধু কহিল, ছেড়ে যেতে পারি নি মা।

আচ্ছা, এর আগে উনি কোথায় ছিলেন?

পানাগড়ে, বর্দ্ধমানের কাছে।

মহামায়া সাগুর বাটি তাহার হাতে দিয়া কহিলেন, এক সময়ে এসে বলে' যেও উনি কেমন আছেন। ভুলবে না ত' বাবা?

নিশ্চয় বলে' যাবো।—বলিয়া রামলগন তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

সুকান্তর সহিত মনুও বাহির হইয়া গেছে, বাড়ীতে কেহ নাই। মহামায়া আসিয়া চুপ করিয়া এক জায়গায় বসিলেন। এখনো উনুনে আগুন পড়ে নাই, কুটনো-বাটনা সব পড়িয়া রহিয়াছে, রান্নার জল এইবার না তুলিলেই নয়। আহ্নিক করিয়া তিনি যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এইবার উঠিয়া দুড়্‌দাড় করিয়া তিনি কাজে লাগিয়া যাইবেন।

ট্রেণের বাঁশী বাজিয়া উঠিল, সাত নম্বরের গাড়ীখানা

কোথায় আলো
কোথায় ওরে আলো —রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

এইবার ছাড়িল বুঝি! মানুষের জীবন সম্ভবতঃ ট্রেণেরই মত,—যাত্রী নামাইয়া এবং উঠাইয়া দীর্ঘ পথ সে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। কত যাত্রী কত পথে হারাইয়া যায়; কেহ পরিচিত, কেহ সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। একই পথের দুই যাত্রী বহুকাল পরে হয় ত মুখোমুখি হয়,—একজন হয় ত চিনিতে পারে, আর একজন পারে না। পারে না, তাহার কারণ, বিস্মরণের অতল অন্ধকারে তাহাদের সত্য পরিচয় অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহাই নিয়ম, ইহাই জীবনের গভীরতম অর্থ!

পায়ের শব্দে তিনি ফিরিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, মনু আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া তিনি ভাবিলেন, মেয়ে বড় হইয়াছে, প্রশ্ন করা হয় ত সঙ্গত হইবেনা। মনু কিন্তু নিজেই সে সমস্যার সমাধান করিয়া কহিল, ঘর এমন এলোমেলো হয়ে রয়েছে মাষ্টার মশায়ের, কি বল্‌ব! এমন অবস্থায় রয়েছেন, দেখলে কান্না পায়।

মহামায়া কহিলেন, কাঁদলিনে কেন, তোর ত ছিঁচ-কাঁদুনে স্বভাব।

মনু কহিল, সত্যি মা, তুমি জানো না তাই বল্‌চ।

মহামায়া কহিলেন, কেমন আছেন এখন?

সকালের চেয়ে অসুখ বেড়েছে, সাবু খেতে পারলেন না। তুমি একবার দেখতে যাবে মা?

আমি? দেখতে যাবো? তোদের কি মাথা খারাপ?

গেলেই বা, কি দোষ?

না বাপু, না। আমার অনেক কাজ, রান্না, জলতোলা, কুটনো-বাটনা—তোদের কি কাণ্ডজ্ঞান নেই?

মনু চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু এতই বেলা হইয়া গিয়াছিল যে, সাড়ম্বরে সেদিন রান্না করিবার আর সময় ছিল না; যা হোক করিয়া ভাতে-ভাত রান্না হইল। মনুকে খাইতে দিয়া মহামায়া কহিলেন, আমার গেলে ত চল্‌বে না, তুই না হয় গিয়ে বসগে মা, একজন তবু কাছে থাকলে রুগী সুস্থ থাকে।

খাওয়া দাওয়া করিয়া মনু মাষ্টার মশায়ের কাছে চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া সে সুকান্তকে স্নানাহার করিতে পাঠাইয়া দিল। সুকান্ত ফিরিয়া আসিতেই মহামায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর রে?

একই রকম। যখন কাশি ওঠে তখন দেখলে ভয় করে মা। মনে হয় এখুনি বোধ হয় বুক ফেটে যাবে। ভারি কষ্ট পাচ্ছেন।

কথা বলচেন?

সুকান্ত কহিল, একটু একটু। আমার একটা হাত অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে' রইলেন; যখন ছাড়লেন তখন দেখি আমার হাতটা তাঁর চোখের জলে ভিজে গেছে মা। আস্তে আস্তে বললেন,—

মহামায়া পুত্রের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। সুকান্ত প্রথমে একটু লজ্জা বোধ করিল, কিন্তু কথাটা সে বলিয়াই ফেলিল, বলিল, বললেন, 'তুমি আমার বড় আপনার সুকান্ত।'

উদাসীন হইয়া মহামায়া কহিলেন, রুগীর কাছে থাকলে এর চেয়েও আরও কত কথা শুনতে হয়!—বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

স্নান করিয়া সুকান্ত আসিয়া খাইতে বসিল। মহামায়া ভাত বাড়িয়া দিয়া কহিলেন, আর কিছু বলছিলেন না?

ঘাড় হেঁট করিয়া সুকান্ত কহিল, আরো যেন কি বলছিলেন, আমি বুঝতে পাচ্ছিলাম না।

মহামায়া উত্তপ্ত হইয়া কহিলেন, কী এমন কথা? ছেলে-মানুষকে বাজে কথা শোনানো ভারি সুবিধে। তুই আর যাসনি সুকান্ত।

সুকান্তর খাওয়ায় রুচি চলিয়া গেল। বলিল, আমি ছাড়া কেউ যে এখন নেই তাঁর মা? না গেলে চল্‌বে কি করে?

এত দিন তাঁর চলেনি? কোথাকার কে তার ঠিক নেই—

তখন যে রোগ ছিল না! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যেতে বারণ ক'রো না।

বেশ যেও, কিন্তু ঘ্যান্‌ঘ্যানানি শুনতে যেও না। রুগীর সকল কথায় কান দেওয়া বড় কষ্টকর।—উত্তেজনায় তাঁহার চোখের দৃষ্টি অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল।

নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া হাত দুইয়া সুকান্ত আবার তখনই বাহির হইয়া গেল।

মহামায়া তাহাকে অনুসরণ করিয়া একবার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন, সুকান্ত তাড়াতাড়ি গিয়া

মাষ্টার মশায়ের বাসায় ঢুকিল। আতঙ্কে তাহার সর্ব্বশরীর কি রকম করিতে লাগিল। তাঁহার ছেলেমেয়ের বয়স হইয়াছে, অনেক কথাই তাহারা এখন বুঝিতে পারে, রোগের প্রলাপে লোকটা কি বলিতে কি বলিবে তাহার ঠিক নাই। তাহাদের তরুণ মনে যদি কোনওরূপ সন্দেহের কুশাঙ্কুর ফোটে, তবে তাহার চেয়ে লজ্জার ও আত্মগ্লানির আর কিছুই নাই। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার শরীর আর একবার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এক জায়গায় চুপ করিয়া তিনি দাঁড়াইতে পারিলেন না, বাড়ীময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ভিতরে আলোটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলিতেছিল। রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইয়া আসিয়াছে। নিস্তব্ধ অন্ধকার চারি দিকে থম্ থম্ করিতেছে। দক্ষিণের স্নিগ্ধ বাতাস মাঠের উপর দিয়া গাছপালায় শব্দ জাগাইয়া হু হু করিয়া বহিয়া যাইতেছিল।

দরজার বাহিরে একটা মাদুর বিছাইয়া রামলগন পড়িয়া ছিল; পায়ের শব্দ পাইয়া মুখ তুলিয়া সে কহিল, কে?

আমি রে রামলগন, আমি এসেছি।—মহামায়া কহিলেন, তোর বাবু কেমন আছেন বাবা?

ঘুমিয়েছেন বোধ হয়।

ঘুমিয়েছেন? ও,—ছোটবাবু কোথায়?

তিনি ইষ্টিশানে গেছেন। দিদিমণি আছেন ঘরে··· বাতাস করছেন।

তোর আর উঠ্‌তে হবে না, আমি দেখছি। বলিয়া মহামায়া মৃদু পদক্ষেপে ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

রোগীর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া মনু ততক্ষণে বাতাস করিতে করিতে খাটে মাথা দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মহামায়া একবার তাহার দিকে তাকাইলেন। কিন্তু সে একটি মুহূর্ত্ত মাত্র। পরক্ষণেই বুঝিলেন, মাষ্টার মশাই ঘুমান্ নাই, বরং মহামায়াকে দেখিয়া হাত বাড়াইয়া তিনি আলোটা একবার উজ্জ্বল করিয়া দিলেন।

মহামায়া বলিলেন, তবে যতটা মনে হয়েছিল ততটা নয়?

এই তাঁহার প্রথম সম্ভাষণ! তাঁহার ঈষৎ রুক্ষ কণ্ঠ শুনিয়া মাষ্টার মশাই একটু হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন, মনু-মার কাছে অনেক সেবা নিয়ে গেলাম। আমি একে আশীর্ব্বাদ করে' যাচ্ছি।

মহামায়া কাছে গিয়া মনুকে ডাকিয়া মেঝের উপর আনিয়া শোয়াইয়া দিলেন। একবার ঘুমাইলে মেয়ের আর কোনও হুঁস্ থাকে না। তাঁহারই পাশে তিনি এইবার বসিয়া পড়িলেন।

অতি কষ্টে মাষ্টার মশাই একবার উঠিয়া বসিলেন। আলোয় স্পষ্টই মহামায়াকে দেখা যাইতেছিল। রূপ দেখিয়া মনে মনে প্রশংসা করিবার মত বয়স তাঁহার ছিল না; মুখ তুলিয়া শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে আবার তিনি মুখ ফিরাইয়া আস্তে আস্তে শুইয়া পড়িলেন। তার পর ক্লান্ত ও মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, রামলগনটা বুঝি শুয়ে আছে বাইরে?

হাঁ, কিছু দরকার?

না। শুধু বলছিলাম, আমায় তুমি ক্ষমা ক'রো মহামায়া।

মহামায়া অত্যন্ত স্পষ্ট কণ্ঠে কহিলেন, আমার নাম ধরে' আর ডাকবেন না, মেয়ে রয়েছে এখানে।

মাষ্টার মশাই বলিলেন, কেবল অসামাজিক নয়, তোমার সঙ্গে কথা বলে' আমি অভদ্র আচরণ করেছি, আমি মাপ চাইছি।

আপনি কবে যাবেন এখান থেকে?

আজকেই ত যাবার কথা ছিল।-ভোর রাতের গাড়ীতে।

তবে আজকেই যান্ না? মিথ্যে দেরী করে'—

আজকেই? এই রাতে? বড় অসুখ যে—

যে অসুখে এত কথা বলা যায়, সে অসুখে—

মাষ্টার মশাই কহিলেন, হাঁ, আমাকে এমনি করে' তাড়িয়ে দেওয়াই উচিত।—কিন্তু, আচ্ছা, অন্য দিকের কথা কি কিছু নেই? এতে কি শুধু লজ্জাই আছে? কেবল কি অগৌরব মহামায়া?—দপ্ করিয়া তাঁহার চোখ জ্বলিয়া উঠিল।

মহামায়া কহিলেন, নাম ধরে' আমায় ডাকবেন না! ছেলেমেয়ে নিয়ে এখানে এক পাশে পড়ে' আছি, আপনার কি সইচে না? এত দেশ থাকতে আপনি এখানে এলেন কেন?

মাষ্টার মশাই কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন। তারপর কহিলেন, সকল কথা আমার মনে পড়ে না। মনে পড়লে চেঁচিয়েই বলতাম, আমার এ অবস্থার জন্যে তুমিই দায়ী। তুমিই। তুমি ছাড়া আর কেউ না।

মহামায়া কহিলেন, আমি আমার মেয়েকে নিতে এসেছিলাম, আপনার কথা শুনতে এত রাতে আসিনি। সুকান্তর সঙ্গেও আপনার বেশী কথা বলার দরকার কিছু নেই। সে ছেলেমানুষ!

মাষ্টার মশাই নড়িয়া চড়িয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেন। তার পর টলিতে টলিতে বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন, রামলগন!

রামলগন ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, বিছানা বাক্স গুছিয়ে নে রে, এখুনি যেতে হবে। ছোটবাবুকে একবার ডাক্।

রামলগন কহিল, বাবু, অসুখ যে—

ছি, মনিবের কথায় আপত্তি করতে নেই, রামলগন যা।

রামলগন সুকান্তকে ডাকিতে ষ্টেশনে ছুটিয়া গেল।

ভিতরে টলিতে টলিতে আসিয়া দাঁড়াইতেই মহামায়া কহিলেন, এখনো এত তেজ আপনার?

তেজ ত নয়, এ বিচার। নিজের ওপরেই বিচার। তুমি ফিরে যাও মহামায়া। এত রাতে বাড়ীর বাইরে থাকা—

মহামায়া তাড়াতাড়ি কহিলেন, মনু রয়েছে পাশে, আমার নাম ধরে' ডাকবেন না বলচি। চিরকাল আপনি লোকের অবাধ্য।

মাষ্টার মশাই একবার তাঁহার দিকে তাকাইয়া দাড়াইলেন। মহামায়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, নিজের দরকারেই আমি এসেছিলাম; সুকান্ত বড় হয়েছে, যদি কখনো আবার তার সঙ্গে দেখা হয়, তা হলে যেন আগেকার কোনো কথা—

কি কথা বল ত?

এই ধরুন, আপনি আমাকে চিনতেন, এই সব—

তোমাকে ত আমি চিনতে পারিনি,—আচ্ছা ধর, যদি কিছু কিছু বলেই থাকি?

কিছু কিছু?—মহামায়া ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, কি বলেচেন বলুন, কতদূর পর্য্যন্ত? এই সর্ব্বনাশ করতে আপনি এসেছিলেন?—ভয়ে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া কান্না আসিল।

মাষ্টার মশাই সানন্দে হাসিতেছিলেন। যত হাসি তাঁহার ভিতরে সঞ্চিত ছিল, তাহা যেন তিনি টানিয়া টানিয়া বাহির করিয়া দিতে লাগিলেন। এই যেন তাঁহার শেষ হাসি! বলিলেন, এ কথা হয় ত বলব না যে তোমার অন্তত একশোখানা চিঠি এখনো আমার বাক্সে তোলা রয়েছে! অবশ্য সকল চিঠিই তোমার বিয়ের আগে।—বলিয়া তিনি আবার হাসিলেন।

স্বর্গগত স্বামীকে স্মরণ করিয়া অপমানে ও আত্মগ্লানিতে মহামায়ার মাথা হেঁট হইয়া আসিল। পরকালে তাঁহার অনন্ত নরকবাস হইবে!

একটু থামিয়া মাষ্টার মশাই কহিলেন, কতদিন হলো তোমার স্বামী মারা গেছেন?

এই লোকটার মুখে তাঁহার দেবপ্রতিম স্বামীর কথা শুনিতে মহামায়ার সমস্ত মন কুঞ্চিত হইয়া আসিল। তবু তাঁহাকে বলিতে হইল, দু' বছর।

দু' বছর? কি করতেন তিনি?

কলেজের প্রফেসর ছিলেন।

কথা ফুরাইয়া গিয়াছিল, ইহার পর আর কোনও কথা আসিতেছিল না। মাষ্টার মশাই তাহাই লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, তুমি এত বড় হয়ে গেছ আর এত ভারিক্কে হয়েছ যে ভাল করে' কথা বলতে সাহসই হয় না!

মহামায়া একটু সন্ত্রস্ত হইয়া গা ঠেলিয়া মনুকে ডাকিতে লাগিলেন। ঘুমের ঘোরে মনু একবার ভুল বকিয়া উঠিয়া আবার নাক ডাকাইতে লাগিল।

ঘরের ভিতর থাকিতে তাঁহার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, মনে হইল একটু একটু করিয়া কে যেন তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিতেছে।

মাষ্টার মশাই ধীরে ধীরে বলিলেন, একটা কথা বলবে মহামায়া?

মহামায়া উত্তর দিলেন না, নিজের নাম পুনরায় এই লোকটার মুখে উচ্চারিত হইতে দেখিয়া গায়ের রক্ত তাঁহার অচেতন হইয়া আসিতে লাগিল, কানের মধ্যে লক্ষ লক্ষ উন্মাদের দল ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, চোখে আসিল তাঁহার অস্বাভাবিক নিদ্রার আবিলতা, তিনি প্রাণপণে একটু নড়িয়া আবার সজাগ হইয়া বসিলেন। বলিলেন, থাক্, আর আমি কিছু শুনতে চাইনে। সুকান্ত এল বুঝি!

মাষ্টার মশাই বলিলেন, একখানা গাড়ী পাস্ করে' গেলে তবে সে আসতে পারবে।

বিছানায় হেলান্ দিয়া আবার তিনি শুইয়া পড়িলেন। তার পর পুনরায় বলিলেন, আমার এক একবার কি মনে হয় শুন্‌বে? মনে হয় নিজের হাত-পা-গুলো ধারালো ছুরি দিয়ে কুচিয়ে ফেলি। মহামায়া, এক রকম পোকা আছে জানো, মাথার মধ্যে বাসা করে' থাকে? সে-পোকা মাথার ঘি কুরে' কুরে' খায়, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর···

মনু, ও মনু, হতভাগির ঘুম আর ভাঙে না, বলি শুন্‌চিস্?

মনু একবার সাড়া দিয়া আবার পাশ ফিরিয়া শুইল।

আচ্ছা, এই বোধ হয় আমাদের শেষ দেখা, কি বল?

তাই যেন হয়।—মহামায়া উত্তর দিলেন, ভগবান যেন এমন বিপদে আর না ফেলেন।

বিপদ? এতে বিপদ কি মহামায়া?

চুপ। আবার বলচি চুপ করুন, বিপদে আমাকে ফেলবেন না, চুপ করুন।—তাঁহার কণ্ঠ কাঁপিতেছিল।

মাষ্টার মশাই কহিলেন, তোমাকে বলতে হবে মহামায়া, কিসের বিপদ!

মস্ মস্ করিয়া মাঠের উপর দিয়া পায়ের শব্দ নিকটতর হইয়া বারান্দার উপর উঠিয়া আসিল। ক্ষণমাত্র সেই দিকে তাকাইয়া বিদীর্ণ কণ্ঠকে যথাসম্ভব চাপিয়া মহামায়া কহিলেন, বিপদ, বিপদ নয় ত কি, ভয়ানক বিপদ, তোমাকে নিয়ে আমার বিপদ চিরদিন!—বলিতে বলিতে তাঁহার গলা ধরিয়া আসিতেই তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া অন্য দরজা দিয়া অন্ধকারে বাহির হইয়া গেলেন।

শোয়ে-ডাগন

শ্রীসরলাদেবী চৌধুরাণী বি-এ

নমস্য সেই মহাপুরুষেরা যাঁরা বর্ম্মার বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যেখানে কথায় কথায় মানুষে মানুষের মুণ্ডপাত

মহোৎসবের দৃশ্য

করে এসেছে, যে দেশের প্রতি ধূলিকণা নররক্তে রক্তাক্ত, সেই আপূর্ব্ব-পশ্চিম-দক্ষিণোত্তর সমস্ত বর্ম্মার দেশটার বুক ফুঁড়ে ফুঁড়ে উঠেছে সভ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন এক একটি প্রকাণ্ড সুধাধবল স্বর্ণচূড়ান্বিত মন্দির,—বুদ্ধের ও তাঁর শিষ্যগণের শান্ত মূর্ত্তির অধিষ্ঠানস্থল।

বর্ম্মার ইতিহাসে পাওয়া যায় জীবনের প্রচণ্ড মধ্যাহ্নে যে যত ক্রূরতা করেছে, জীবনের শান্ত সন্ধ্যায় সে তত শান্তি-নিদান বুদ্ধের শরণাপন্ন হয়েছে। শুনা যায় বর্ম্মীজদের প্রকৃতি শিশুসুলভ। এই হাসিখুশী, আমোদ আহ্লাদে রত, এই ক্রোধে উন্মত্ত এবং একবার ক্রুদ্ধ হলে দিক্‌বিদিক্ বা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। সেই আদিম মানবের পাশব প্রকৃতিকে দমন করে যাঁরা ক্ষমা ও দয়ার অবতার বুদ্ধের নিকট মাথা নত করিয়েছিলেন তাঁদের শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য-পর্ব্বত ও উত্তালতরঙ্গময় সমুদ্রলঙ্ঘন করে দেশবিদেশে অভিযান সার্থক হয়েছিল।

নির্দ্দয়তা ও হত্যার দেশে যাঁরা দয়া ও অহিংসার বাণী প্রচার করেন, তাঁরাই যথার্থ মরুভূমিতে কমণ্ডলু ভরে ভরে তৃষ্ণার বারি বিতরণ করেছেন। কিন্তু কি তপস্যা, কি অধ্যবসায় এবং কি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তির বলেই তা

যতে পেরেছিল। সেই শ্রদ্ধার প্রেরণা ভারতের বর্ত্তমান হিন্দুর মধ্যে আছে কি? যদি বিশ্বাস করি, আমার ধর্ম্মে অমৃত আছে, এবং যদি সে অমৃত নিজে পান করে থাকি, তবেই তার মর্ম্মগ্রাহী হয়ে তা অপরকে দানের ইচ্ছা ও প্রেরণা-শক্তি আসে।

শোয়ে ডাগন মন্দির

এই যে এত লক্ষ লক্ষ লোক ভারতে থেকেও বিধর্ম্মী হয়ে গেল, কেউ বা বাইবল্, কেউ বা কোরাণের তথ্যকে ধর্ম্মের চূড়ান্ত বাক্য বলে গ্রহণ করলে —ভারতীয় হিন্দুর নিজধর্ম্মে ও ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলীতে অনাস্থাই কি তার মূল কারণ নয়? মুসলমান বাদশার অনুচরেরা জোর করে মুসলমান করেছিল? নিজের ধর্ম্মে সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকলে কেউ কাউকে জোর করে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে পারে কি? মোগের সমস্ত রাজ-কীয় বলও তৎপরবর্ত্তী কত সবল খ্রীষ্টানকে স্বধর্ম্ম ত্যাগে রত করতে পারেনি কেন? ইংলণ্ডে এবং সমস্ত ইউরোপে ল্যাটিমার প্রভৃতি শত শত স্বধর্ম্মে বিশ্বাসী সামান্য প্রজাও রাজাদেশে আগুনে পুড়ে মরা স্বীকার করেছে, তবুও নিজের ধর্ম্মকে অস্বীকার করেনি কেন? ভারতবর্ষেও মোগল বাদশাদের হুকুমে শিখগুরু এবং তাঁদের বীর অনুচরেরা প্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু ধর্ম্ম দেন

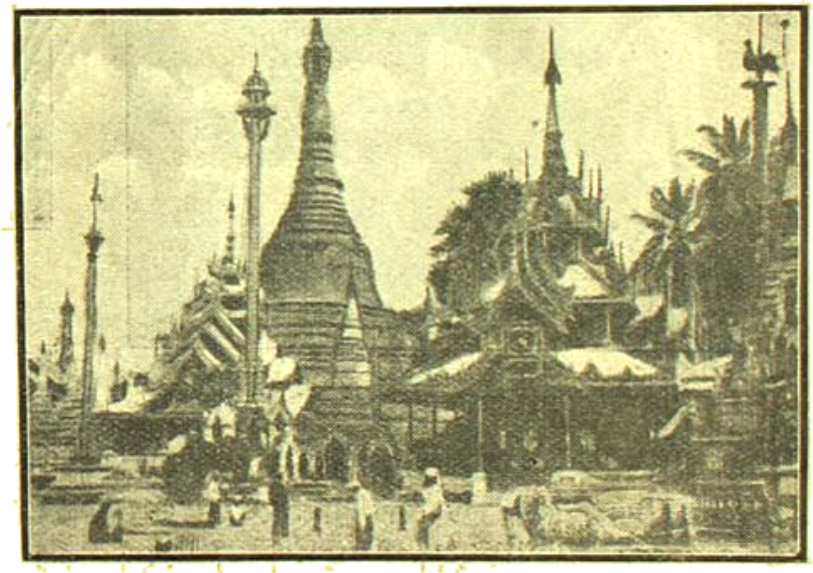

শান-মন্দিরের বৃহৎ ঘণ্টা

নি কেন? তাঁরা স্বধর্ম্মের অমৃতের মধ্যে অবগাহন করে-ছিলেন; নিজের ধর্ম্ম ছেড়ে পরধর্ম্ম গ্রহণে যে গঙ্গাস্নানের পর

গোস্পদে স্নান করা হবে তা জানতেন; সে দীনতা সে আত্মাবমাননা স্বীকার করতে প্রস্তুত হননি। তাই মৃত্যু-বরণ করেছিলেন কিন্তু ধর্মান্তর গ্রহণ করেন নি।

খ্রীষ্টধর্মে বা মহম্মদীয় ধর্মে এমন কোন নূতন তত্ত্ব, জ্ঞান বা রস নেই যা হিন্দুধর্মে পাওয়া যায় না, সুতরাং জন্ম হিন্দুর শুধু ধর্মের তৃষ্ণায় অপর ধর্ম গ্রহণ অনাবশ্যক, এবং যে ভারতবাসী মাত্রই হিন্দুধর্মের বৃহৎ খনির পাশেই বসে আছে

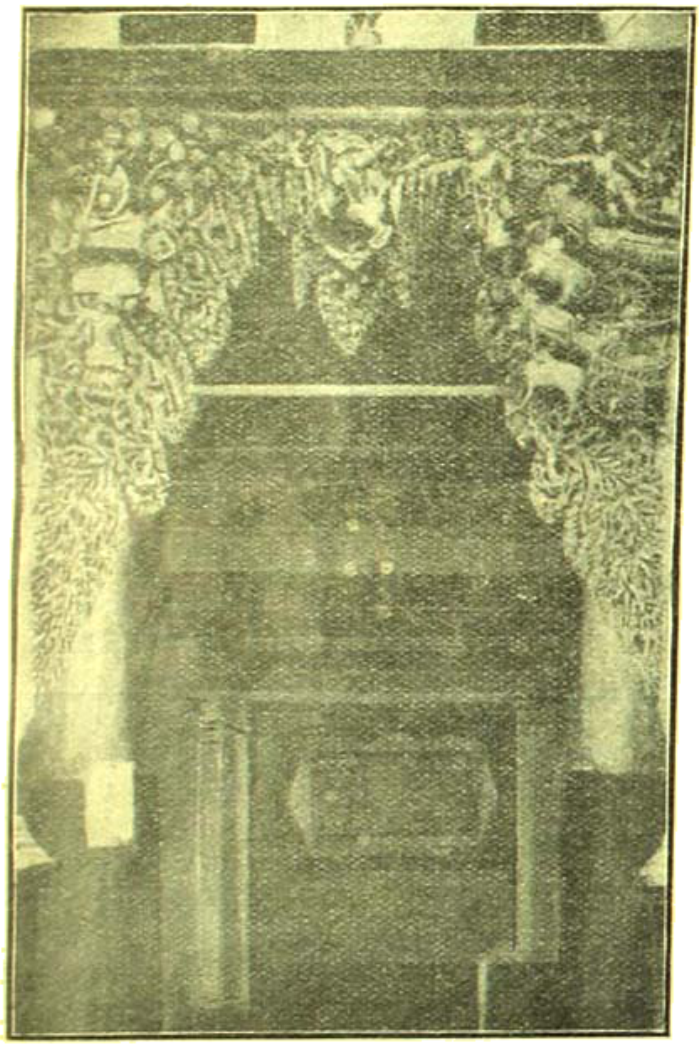

শোয়ে-ডাগন প্যাগোডা অঙ্গনে একটী ছোট প্যাগোডায় কাঠের কারুকার্য্য

তার পক্ষে শত সমুদ্র পারের ছোট ছোট খনির থেকে আমদানী-করা ধর্ম গ্রহণও নিষ্প্রয়োজন। তবে এ কথা সত্য যে, ভারতে ধর্মখনির প্রহরীরা তাদের খনিজ অমূল্য পদার্থের ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছিল বলেই বাইরের মাল এতদিন চলেছে। সুধাসাগরের তীরে বসে সুধা পান না করে শুধু সুধার প্রহরীগিরি করায় হিন্দুর ধর্মভাব মৃতকল্প, তার ধর্মদান-শক্তিও পরিক্ষীণ। কবে সে আবার সুধা-পানে মাতোয়ারা হবে? নিজের ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের হুঁসে ডুবে যাবে? কবে তার বার্ত্তা অন্যদের কাছে বহন করবার জন্যে পাগল হবে?

সেই যে একদল পাগল ভারতবাসী বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বর্ম্মার দিকে ছুটেছিলেন, তার ফলে ভারতের বাইরে ভারত-ধর্ম আজও মৌলিক অবস্থায় বর্ত্তমান। পাঁচবৎসর বয়সে ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষা, গুরু-গৃহবাস, ও স্বাধ্যায় ভারতবর্ষ থেকে উঠে গেছে, কিন্তু বর্ম্মায় এখনও স্থির আছে। রাজপুত্র হোক বা সামান্য গৃহস্থের

শোয়ে-ডাগন মন্দিরের দৃশ্য (২)

পুত্র—সকলকেই কয়েক বৎসরের জন্য বিহারে গিয়ে ভিক্ষা ব্রত গ্রহণ ও গুরুর নিকট বিনয়ত্রিপিটক শিক্ষা করতে হয়। বর্ম্মীয় শিশুদের বর্ণমালা-জ্ঞান ধর্মযাজকদের কাছে আরম্ভ হয়। শতাব্দি কাল থেকে সমগ্র বর্ম্মায় এইভাবে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা (Free Primary Eduction) চলে আসছে। বর্ম্মায় নিতান্ত গরীবগুর্ব্বা, চাষাভূষো-রাও তাই নিরক্ষর নয়, সকলেই বই পড়ে ও খবরের কাগজ পড়ে। শুনা গেল, এ অবস্থা আর

বেশীদিন টিকে কিনা সন্দেহ ; কারণ প্রাচ্য সভ্যতার নজর নেই। তাই গৃহস্থদের সাধুসেবাটা একবেলাতেই লেগেছে ; আজকাল ভারতবর্ষের ন্যায় বর্ম্মারও কর্পোরেশন সমাপ্ত হয়।

বুদ্ধমূর্ত্তি—শোয়ে-ডাগন

থেকে প্রাইমারী স্কুলের সৃষ্টি হচ্ছে ; তাতে করে বৌদ্ধধর্ম্ম-যাজকদের কাছে গিয়ে গুরুগৃহবাস ও অক্ষর-পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ পাঠও ক্রমেই বন্ধ হয়ে আসবে।

বর্ম্মার প্রত্যেক পাগোডা বা 'ফুন্না'র সংলগ্ন বিহার বা 'কুদিচঙ' আছে ; সেখানে শত শত ভুঙ্গি বা বৌদ্ধ-সাধু বাস করেন। এই সকল সাধুদের আহারের ব্যয় সমস্ত গৃহস্থেরা বহন করেন। ভোর বেলা প্রত্যেক বর্ম্মীজ গৃহিণীর প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে বৌদ্ধ ভিক্ষুর জন্যে ভাত রাঁধা। অধিকাংশ ভিক্ষু নির্দ্দিষ্ট বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভিক্ষা সংগ্রহ করে আনেন ; যাঁরা চলতে অক্ষম গৃহিণীরা তাঁদের ভিক্ষার পাঠিয়ে দেন। অন্ততঃ চার পাঁচটি ভিক্ষুকে না খাইয়ে কোন গৃহস্থ বা গৃহিণী নিজে অন্নগ্রহণ করেন না। বৌদ্ধ সাধুদের খাওয়া একবেলা, তাও মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই সেরে ফেলতে হবে ; সূর্য্য বিষুবরেখায় চড়লে আর খাওয়ার নিয়ম

অনেক সময় অনেক ডাকাত সাধু আবাসগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করে ; দিনের বেলায় ভিক্ষুর বেশ ধারণ করে

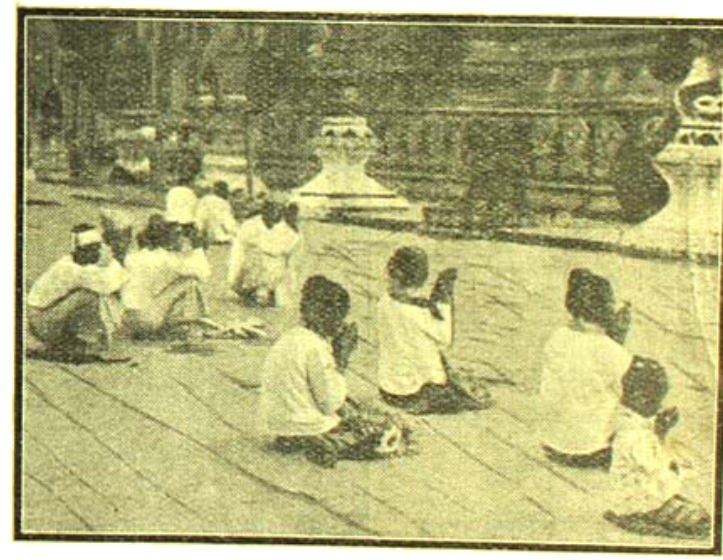

প্রাতঃকালের উপাসনা

কুদিচঙে লুকিয়ে থাকে, রাত্রে সুযোগ হোলেই ডাকাতি করতে বেরোয়। সেই জন্যে বর্ম্মীজ গৃহিণীরা সময় সময় বড়

ভীত হন, অজানা সাধুকে বিশ্বাস করবেন কিনা ভেবে পান না। আমাকেও একজন বৃদ্ধা বর্ম্মীজ মহিলা সাবধান করে দিলেন যে সাধু-আবাস দেখতে যেন না যাই, আর একলা যেন কখনই না যাই।

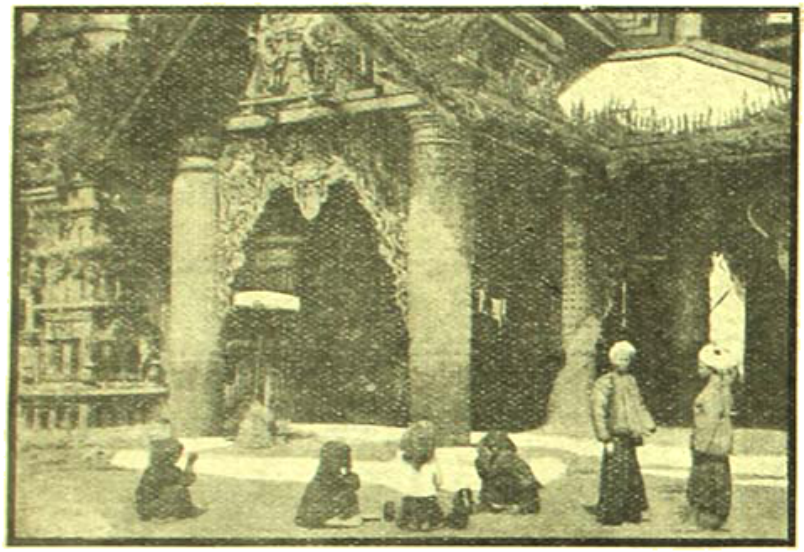

ত্রহ্মদেশীয় স্তূপিক প্রাসাদ

ভারতবর্ষের দিল্লী আগরা প্রভৃতি পশ্চিমের সহরগুলির আকৃতিগত বৈলক্ষণ্য হচ্ছে—কবরের পর কবর—সেগুলি মোগল বাদশা ও তাঁদের অনুচরগণের স্বনাম-প্রতিষ্ঠার মূর্ত্তিমান আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা; কিন্তু বর্ম্মার অধমাধম নরপতিও নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রভু বুদ্ধের প্রতিষ্ঠাতেই মনঃপ্রাণ ও ধন ঢেলে দিয়েছেন। বর্ম্মার কত সহরে, কত গ্রামে, কত ধূ ধূ প্রান্তরে কত পুরাতন ভগ্নমন্দিরের কারুকার্য্যময় ইটকাঠ পড়ে রয়েছে। তাদের জীর্ণসংস্কার হয়নি; তারই পাশে নূতন যুগের নূতন ভক্তের নূতন মন্দির ও বিহার গড়ে উঠেছে। এই সকল মন্দির ও বিহার, বা 'কয়া' বা পাগোডাই, বর্ম্মার আকৃতিগত বৈলক্ষণ্য। ইংরেজরা বর্ম্মায় প্রবেশমাত্র এটা লক্ষ্য করে এর নাম দিয়েছেন—The Land of Pagodas—পাগোডার দেশ।

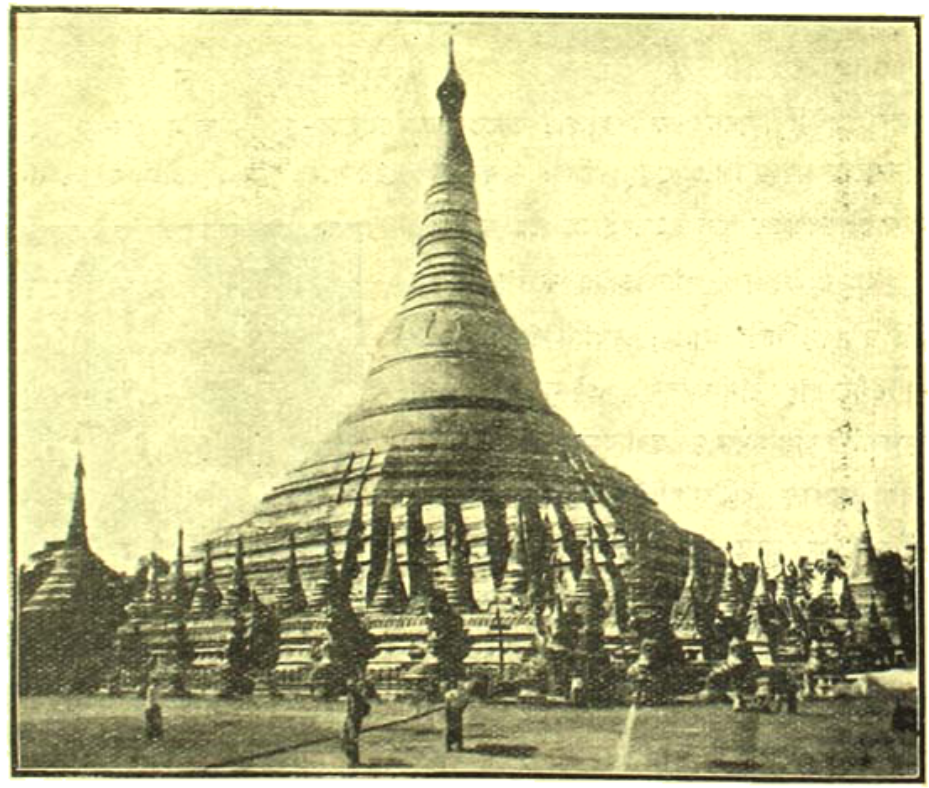

শোয়ে-ডাগন মন্দিরের দৃশ্য (১)

বর্ম্মার সমস্ত পাগোডার মধ্যে রেঙ্গুনের শোয়ে-ডাগন পাগোডা সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। এর চেয়েও বড় পাগোডা অন্যত্র আছে, কিন্তু এত কারুকার্য্য আর কোন পাগোডায় দেখা যায় না।

এর চারদিকে চারটি সিংহদ্বার; সোপানের পর সোপান আরোহণ করে তবে দ্বারে প্রবেশ করা যায়। শুটি দশ পনের ছোটছোট সোপানের পর একটি করে প্রশস্ত সোপান আসে, তার একধারে বসে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে আবার অগ্রসর হওয়া যায়। সব সোপানগুলি শেষ হলে মাথার উপর ছাদযুক্ত একটা লম্বা দালান; দালানের দুধারে বিপণি। এই পণ্যবীথিকায় বর্ম্মাজাত সব রকম শিল্পবস্তু পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে প্রভু বুদ্ধের জন্য সুন্দর সুন্দর তাজা ফুলও কিনতে পারা যায়। দোকানদার খুব

অল্প, সবই প্রায় দোকানদারণী ; পরিষ্কার ফিটফাট কাপড় পরা, কারো হাতে সোনার চুড়ি, হয়ত বা পায়েও সোনার মল, কাণে হীরের ফুল, গলায় সোনার চেন,—কখনো বা মুক্তোর মালা,—খোঁপায় সুন্দর চিরুণি বা ফুল। বিক্রেয় জিনিষ এবং বিক্রেত্রী দুই আমার পক্ষে সমান আকর্ষণজনক হল। অনেকের দোকানখানিই ঘরবাড়ী। সেখানে বসেই প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা পরচুলা বিছিয়ে, আঁচড়িয়ে নিজের চুলের সঙ্গে জড়িয়ে মাথার উপর একটা প্রকাণ্ড উঁচু খোঁপা খাড়া করে তুলছে। কেউ বা প্রাতরাশ করছে, বর্ম্মিজেলি সিদ্ধর সঙ্গে 'নাপি' (শুটকি মাছ) মিশিয়ে খাচ্ছে। আর যাই করুক আর না করুক, পরকেকে হাত ছাড়া কেউ করছে না। কোন কোন দোকান মেয়ে পুরুষ দুজনে মিলে চালাচ্ছে। আমি কতক-গুলি বর্ম্মিজ জিনিষ সংগ্রহ করলুম। মিসেস্ বার্ন এক মুঠো ফুল কিনলেন। এখানে যে ফুল বিক্রী হয় তা বৃন্তচ্যুত ফুল নয়, লম্বা লম্বা বৃন্তযুক্ত ফুল—তার কারণ পরে উপলব্ধি হল।

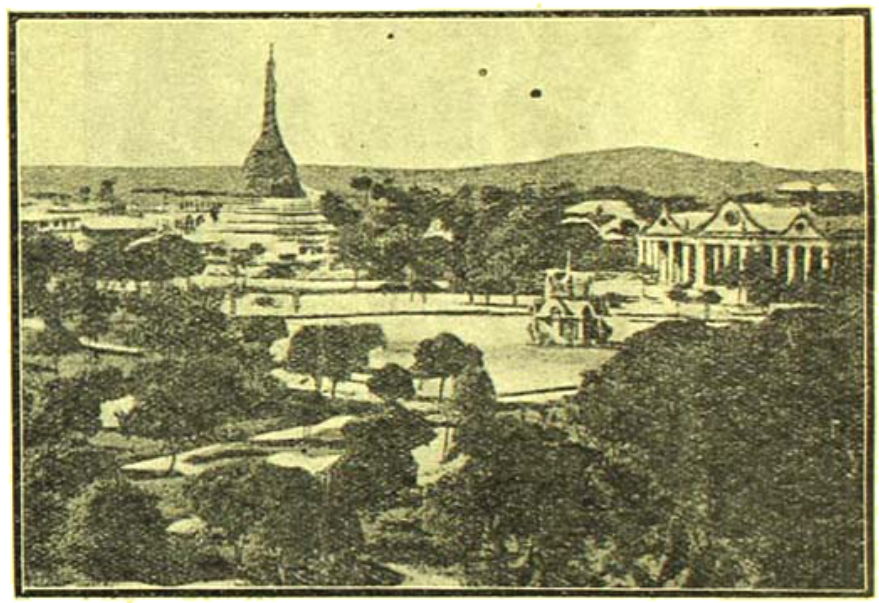

বাণী-বাগিচা—রেঙ্গুণ

বাইবেলে পড়েছিলুম ইহুদিদের ধর্ম্ম-মন্দিরে এই রকম পণ্যদ্রব্যসম্ভার দেখে যীশুখ্রীষ্ট একদিন ক্রোধোন্মত্ত হয়ে বিক্রেতাদের চাবুক মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন—তাদের দ্রব্য সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিলেন। বৌদ্ধ-মন্দিরে বুদ্ধদেবের চরণছায়ে বসে এই সকল বিক্রেতা ও বিক্রেত্রীরা তাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ করে বলে বৌদ্ধ-পুরোহিতেরা তাদের কখন দোষ ধরেন না, বা তাদের তাড়াবার জন্যে যত্নবান্ হন না।

বিপণি বীথিকার শেষে ডাইনে ও বাঁয়ে দুধারে খোলা শান-বাঁধান অঙ্গন ; সেই অঙ্গনের স্থানে স্থানে মন্দির। এক একটি মন্দিরে এক একটি প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি, তা'র পাশে পাশে আনন্দ প্রভৃতি তাঁর পারিপার্শ্বিকদের ছোট মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিগুলির অসাধারণ ধৈর্য্য ও প্রস্থ বোধ হয় বর্ম্মার ভাস্কর্য্যের বিশেষত্ব—ভারতবর্ষে কোথাও এত বড় মূর্ত্তি দেখা যায় না। অথচ প্রাত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান এই যে বর্ম্মার শিল্পসমৃদ্ধির যা কিছু পরিচয় তার সূত্রপাত হয়েছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্পরীতির প্রভাবে। দেওয়ালের চিত্রগুলি দেখলে তা সম্ভব বলে মনে হয়—বুদ্ধের জীবনচরিতের সঙ্গে সঙ্গে মহাভারত রামায়ণের অনেক কাহিনীও কোন কোন মন্দিরের দেওয়ালে চিত্রিত রয়েছে।

আমরা মন্দির-অঙ্গনে প্রবেশ করে প্রথমতঃ ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। বৃহৎ অঙ্গনের উপর বসেই অনেক ভক্ত ও ভক্তানী জপ করছেন। মন্দিরগুলির কারুকার্য্যের প্রতি বার্ন্ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কাঠের উপর খোদাই-কার্য্যই এদের বিশেষত্ব দেখলুম। শুধু ছুটি থামে ভারতবর্ষের মোগল আমলের শিস্‌মহলের ভুলা ছোট ছোট আয়না চিত্রকারী করে বসান আছে, তার উপর সূর্য্যের আলো পড়ে থামগুলি ঝকমক করছে। অঙ্গনে বহু বর্ম্মিজ মন্দিরের মধ্যে একটি চীনা মন্দিরও আছে ; সেটি বাইরে থেকেও যেমন দেখতে স্বতন্ত্র, তার ভিতরের সাজসজ্জা ও মূর্ত্তিগুলিতেও তেমনি প্রভেদ—তাদের অধিকাংশই তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্ত্তি।

গতবৎসর বজ্রপাতে শোয়ে-ডাগনের একটি মণিমাণিক্য-বিজড়িত চৈত্যচূড়া পড়ে যায়—আমাদের মন্দিরের কলসের মত বর্ম্মিজ মন্দিরের এই চূড়া—বর্ম্মিজ ভাষায় 'টী' বলে আখ্যাত। এটি বজ্রাহত হয়ে ভূপতিত হওয়া রেঙ্গুনের বর্ম্মীজরা বড় অশুভ লক্ষণ মনে করেন। তাঁরা চান

চলে, একটি শুভদিন রেখে, খুব ধুমধাম করে আবার সেটি পুনঃস্থাপিত করেন।

এই অঞ্চলের এক জায়গায় একটি অতিকায় ঘণ্টা আছে, সেটি নাড়ান যার তার সাধ্যি নয়। কিন্তু যদি কেউ কোন ইচ্ছা মনে রেখে সেটি নাড়াতে পারে, তার নাকি সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়। রেঙ্গুনেরই আর একটি পাগোডায় আর একটি ঘণ্টা আছে; সেটি নাড়ান সহজ, কিন্তু সেটি

শোয়ে-ডাগন চৈত্যচূড়া—হস্তাঘাতে ভূপতিত

নাড়ালেই নাকি বিদেশীকে এদেশে আর একবার ফিরে আসতেই হবে। এর সত্যতা সম্বন্ধে রেঙ্গুন-প্রবাসিনী দুই একটি বাঙ্গালী ব্রাহ্মমহিলা আমায় সাক্ষ্য দিলেন।

আমরা স্বচ্ছন্দভাবে দেখেশুনে বেড়াচ্ছি—কিন্তু কোন পাণ্ডার চিহ্ন নেই; তাদের ব্যস্তাব্যস্তি নেই; তাদের হাতে পড়ে যজমানের প্রাণ নিয়ে টানাটানি নেই—ভারতবর্ষের মন্দির-দর্শন থেকে মগের মুলুকের এই এক অত্যাশ্চর্য্য শান্তিময় সুশোভন প্রভেদ। তাতে যে দেবতার উদ্দেশে দান বন্ধ থাকে তা নয়। প্রত্যেক মন্দিরের কাছাকাছি বড় বড় বাক্স এঁটে বসান আছে দেখলুম; তাতে যে যার ইচ্ছে-মত টাকা পয়সা সিকি আধুলি ফেলে দিচ্ছে। এই সব বাক্সে যত টাকাকড়ি জমা হয় তা পাগোডা ট্রষ্টে'র হাতে যায়। ট্রষ্টীরা মন্দিরসংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থা করেন। প্রতি রাত্রে মন্দিরকে দীপান্বিত করার খরচ এবং মন্দির ও মন্দিরবাসী সাধুদের সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ এই দানের টাকা থেকে নির্ব্বাহ হয়। টাকা পয়সা ছাড়া ভক্তেরা অন্যান্য দানও নিয়ে আসেন—অন্ন, বস্ত্র, ছাতা, পাখা, হীরা, মতি সবই আসে, দেবতার কিছুরই অপ্রতুল হয় না। আমাদের মন্দিরের ঠাকুরের মত এখানকার ঠাকুর পুরোহিত ছাড়া আর সকলের অস্পৃশ্য বা অনধিগম্য নন। ঠাকুরের কাছে গিয়ে ঠাকুরের গলায় স্বহস্তে যে চায় মালা পরিয়ে আসতে পারে, স্বর্ণমণ্ডিত ঠাকুরের গালে ও ভালে নিজেদের হাতে আরো সোণার পাতা লাগিয়ে আসে। ঠাকুর সকলেরই নিজস্ব, সকলেরই স্বহস্তে সেবনীয়, শুধু পাণ্ডা পুরোহিতের নয়।

আমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে বার্দুন হঠাৎ একবার একটি সাধুর সঙ্গে অন্তর্ধান হলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বল্লেন—ঐ সাধুটি তাঁর কলেজের বন্ধু ছিলেন, একজন খুব প্রতিপত্তিশালী অফিসার হয়েছিলেন, হঠাৎ কয়েক বৎসর থেকে তাঁর আর কোন সম্বাদাদি পান নি। আজ তাঁকে অকস্মাৎ এই সাধুর বেশে দেখলেন। তিনি আপাততঃ মৌনব্রত নিয়েছেন, তাই আর কথাবার্ত্তা হতে পারল না।

বর্ম্মার প্রায় প্রত্যেক বড় বড় পাগোডার সংলগ্ন একটি পুষ্করিণী থাকে, তাতে পোষা মাছ ও কচ্ছপ বিচরণ করে।

এই কচ্ছপদের খাওয়ান, মন্দির-দর্শনে আগন্তুকের একটি অতি অবশ্য করণীয় কার্য্য। পুকুরের সান-বাঁধান ঘাটের উপরেই খই, পাঁউরুটির টুকরো প্রভৃতি মৎস্যজাতির প্রিয় নানা খাদ্য কিনতে পাওয়া যায়। প্রায় দশ মিনিট ধরে আমরা তাদের খাইয়ে তাদের ক্রীড়া দেখতে লাগলুম।

আমরা ঘুরতে ঘুরতে প্রধান মন্দিরটিতে এসে পৌঁছলুম। ইতিমধ্যে নানাভাবে, নানা মুদ্রায় বুদ্ধের স্থির, শান্ত, বসা মূর্ত্তি ত অনেকই দেখেছি, তার উপরে একটি সুদীর্ঘ শয়ান মূর্ত্তিরও অতি অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি অনুভব করেছি। এখানে একটি বৃহৎ ছত্রের নীচে আসীন বুদ্ধমূর্ত্তির সামনে

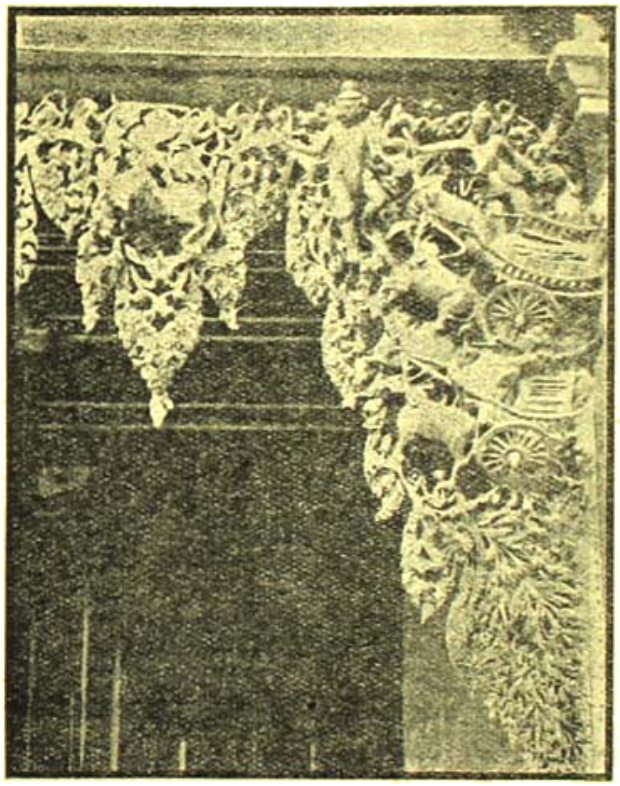

শোয়ে-ডাগন মন্দিরে কাচের কারুকার্য্য

অনেকগুলি ফুলদানিতে ফুল সাজান রয়েছে দেখলুম। ভাবলুম বুঝি মন্দিরের ব্যবস্থাপকেরা এইরূপে মন্দিরকে সজ্জিত করেছেন। তা নয়, এ ভক্তদের নিজ হাতের সাজান। এইবার মিসেস বার্ণ যে ফুলগুলি কিনে এনেছিলেন, তার মধ্যে কতকগুলি আমার হাতে দিলেন, কতকগুলি তাঁর স্বামীর হাতে দিলেন ও কতকগুলি নিজে রাখলেন। তাঁরা উভয়ে অগ্রসর হয়ে পূর্ব্বোক্ত ফুলদানির একটিতে তাঁদের ফুলগুলি সাজিয়ে রেখে দিলেন দেখলুম, আমিও তাই করলুম। আমাদের পরে যারা এল, তারাও তাই করলে। ভারতবর্ষের মন্দিরে যেমন পুরোহিতের নির্দ্দেশ অনুসারে মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করে ফুল ছুঁড়ে ফেলা হয়, কাদায় জলে পায়ে পায়ে হেঁসেলে ফুলগুলি ম্লান হয়ে যায়—এখানে তেমন নয়। বুদ্ধের মূর্ত্তির সামনে ও আশেপাশে ছোট বড় নানারকমের খালি ফুলদানি রাখা থাকে, প্রত্যেক দর্শক ও ভক্ত নিজের নিজের সুদীর্ঘ বৃন্তসমেত ফুল সেই ফুলদানির একটিতে গুঁজে দেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই রকম ফুলের স্তবকে মন্দিরের শোভা বাড়ে ও ফুলের মহিমাও অক্ষুণ্ণ থাকে। কোন

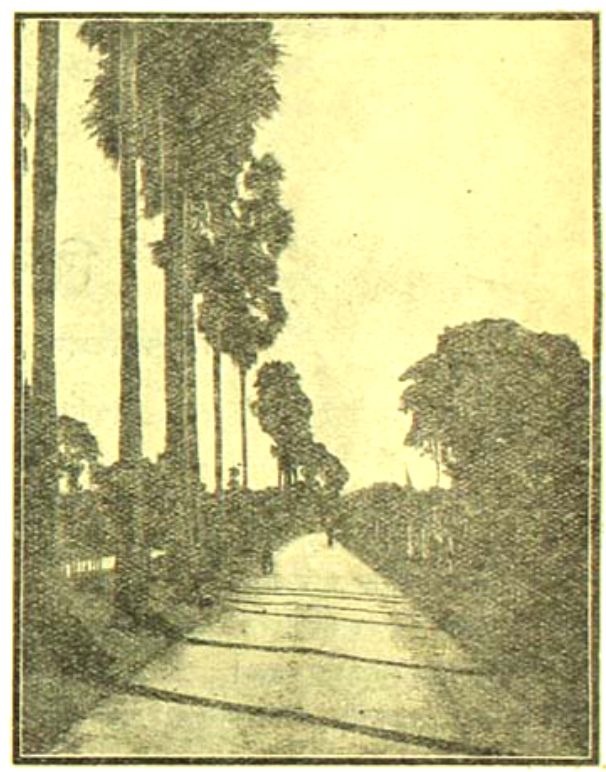

রেঙ্গুন থেকে রাজপথ

কাদা নেই, জল নেই, মলিনতা নেই—সবই সুশ্রী, শোভন, পরিপাটি। ফুলবিন্যাস জাপানে একটি বিশেষ কলা বলে গণ্য হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই কি ভারতের যত সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি বৌদ্ধজগতে পদাতকা হয়েছে? আর তাকে হতভাগ্য ভারতে ফিরে আনা যায় না? যে মন্দিরের পুরোহিতেরা আচারে ব্যবহারে, আকারে প্রকারে অপরিচ্ছন্নতা ও শ্রীহীনতার প্রতিমূর্ত্তি, সে মন্দিরগুলিও যে শ্রীহীন এবং তার দেবতারাও শ্রীহীন হবেন তার আর আশ্চর্য্য কি?

মন্দিরের অভ্যন্তরে মূর্ত্তিখানির সামনে শ্বেত মর্ম্মর বাধান বলের মত অনেকটা লম্বা জায়গা আছে; তার উপর কতকগুলি মাদুর বিছান। ভক্তেরা ফুল সাজিয়ে সেখানে বসে খানিকক্ষণ বুদ্ধের ধ্যান করেন, কেউ কেউ পালিগ্রন্থ খুলে পাঠ করেন, কেউ মন্ত্র জপ করেন, তারপর উঠে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে চলে যান। বাঙালীরা খানিকক্ষণ নিঃশব্দে প্রার্থনা করে দণ্ডবৎ হলেন। আমিও ভক্তিভরে প্রণাম করে মনে মনে আত্মনিবেদন করলুম—

বাসনাবিদ্ধ নয়নে মিত্র
নয়ন রাখ হে বুদ্ধ!
অন্তর-জ্বালা ছুড়ায়ে যাক্
শান্ত হউক শুদ্ধ!
পুণ্য মূরতি-ধ্যানেতে বিরতি
লভুক লজ্জাস্তব্ধ
হিংসা কুটিল আচরণ, হোক্
কলরব নিঃশব্দ।
তব করুণার্দ্র অমৃত ভদ্র
বাণীতে ভরুক চিত্ত!
কামনার পার লয়ে যাও মোরে,
এস হে পরম মিত্র!
এস তথাগত! শ্রীপদে আনত
তাপিত জনের শরণ!
জনমে জনমে আন হে মরমে
দুঃখ কলুষ হরণ!

বিবিধ-প্রসঙ্গ

হিন্দীভাষা ও কবি-সম্রাট্

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাগচী চৌধুরী

—পাঁচ—

হিন্দীভাষার বিস্তৃতি ক্রমেই বেড়ে চলেছিলো। তখন এদেশে যারা ছিলো হিন্দীকে আপনার ভাষা করে নিয়েছিলো।

এমন কি মুসলমানরাও এ ভাষার পরম ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। মুখে কয়েকজন মুসলমান কবির উল্লেখ করা হয়েছে।

হিন্দী ভাষা যে সকল প্রাদেশিক ভাষার মূল ভাষা সকলেই বেশ বুঝে নিয়েছিলো।

...পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করে ও আঞ্চলিক অনুবাদের দ্বারা হিন্দীভাষাকে উর্দুভাষাতে পরিণত করে এককালে মুসলমানদের সহানুভূতি পাওয়ার প্রচুর চেষ্টা কেউ কেউ করেছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা আদৌ ফলবতী হয়নি। বরং সবকিছু হিন্দীভাষা ফারসী ও আরবী ভাষা থেকে অনেক শব্দ আপনার করে নিয়েছিলো।

ইহার মূলে ছিল আমীর খসরাহ্, বাবর্‌শা নবাব, রহিম রায় ও সর্ব্বোপরি 'শাহান শাহ' আকবর ও শাহজাদা আমীর খুসরুর হিন্দীভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ও প্রগাঢ় সমাদর।...তা যেমনি আন্তরিক ছিল, তেমনি ব্যাপক ছিল।

এঁদের হিন্দীভাষায় সেবার কথা উল্লেখ করতে পেরে পরম আনন্দ হচ্ছে। এ কথাও এখানে বলা আবশ্যক যে, এই কথার যাঁরা প্রমাণ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত,—তা এই প্রবন্ধের শেষভাগে সাদরে স্বীকৃত হয়েছে।

মুসলমানরা যেদিন এদেশে এলো সেদিন থেকেই হিন্দীর সহিত তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হোলো। রাজ্যের লেখাপড়া বেশীর ভাগই হিন্দীতে করা হোতো। মুহম্মদ কাশিম, মহমুদ গজনবী, শাহাবুদ্দীন ঘোরী তাঁদের দপ্তরে হিন্দীভাষারই ব্যবহার করেন।

আমীর খুসরু হিন্দীভাষায় একজন মহাকবি ছিলেন। তিনি হিন্দু-কবিতায় বহু নতুন ছন্দের প্রবর্ত্তন করেছিলেন। তিনি বাস্তবিকই অতুল-প্রতিভাশালী হিন্দু কবি ছিলেন। তাঁর বিস্তৃত জীবনকথা এখানে বলা অসম্ভব। তবে তাঁর কবি-প্রতিভার একটি উদাহরণ এখানে দিচ্ছি।

খুসরুর গান হিন্দুস্থানে খুব প্রচলিত। প্রায় সবাইর মুখে আমীর খুসরুর গান শোনা যায়—এমনি মধুর ও প্রাণস্পর্শী তাঁর সঙ্গীতাবলী!

একদিন আমীর খুসরু বেড়াতে বেরিয়েছেন। কিছুদূর গিয়েই তাঁর পিপাসা পেল এবং রাস্তার ধারেই একটি বাঁধান কূপের কাছে তিনি গেলেন। গিয়ে দেখেন সেখানে চারটি মেয়ে মিলে তাদের কলসীতে জল তুলছে। তিনি তাদের কাছে খাবার জল চাইলেন। মহাকবি আমীর খুসরুকে দেখেই তারা চারজনই কবির খাদের কথা বলাবলি

করতে লাগল—এ সেই কবি যাঁর গান আমরা প্রায়ই খেয়ে থাকি—যাঁর কবিতা ছেলে বুড়ো সবার মুখেই শুনতে পাই।

অবশেষে মেয়েরা কবিকে বলে,—"কবি, আমাদের চারজনকে চারটি বিষয়ের কবিতা শুনাতে হবে—তারপরে আমরা আপনাকে জল খেব।" চার জনই যথাক্রমে ক্ষীর, চরকা, কুকুর ও ঢোল (ঢোলক বাদ্য বিশেষ) সম্বন্ধে কবিতা শুনতে চাইলে। কবি তৎক্ষণাৎ একটি কবিতায় উল্লিখিত চারটি বিষয়ের অবতারণা করে শুনিয়ে দিলেন ও তার পরে জল খেতে চাইলেন।

কবিতাটি এই—

"ক্ষীর পকাই যতন সে, চরখা দিয়া চলা,
আরা কুত্তা পা গয়া, তু বৈঠী ঢোলে বজা,
না পানী পিলা।"

অর্থাৎ তুমি খুব যত্ন সহকারে ক্ষীর তৈরী করলে, কাঠ ছিল না তাই চরকা জ্বালিয়ে ক্ষীর তৈরী হোলো, কিন্তু তুমি যখন ঢোল বাজিয়ে আমোদ করছিলে তখন কুকুর এসে ক্ষীর খেয়ে গেল। যাও—হয়েছে এখন জল খাও।

পাঠক দেখতে পাবেন দু লাইনের ছোট কবিতাটিতে ক্ষীর, চরকা, কুকুর ও ঢোল চারটি বিষয় সম্বন্ধেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এমনি আমীর খুসরুর অজস্র কবিতা আছে। খুসরু ছিলেন সকলের কবি, ধনীর প্রাসাদে, গরীবের কুঁড়েতে সব জায়গায় তাঁর সমান আদর ছিল। সকলের সাথে প্রাণ ঢেলে মিশতেও তিনি পারতেন।

আকবর বাদ্‌শার রাজত্বকাল হিন্দীর স্বর্ণযুগ। এমন হিন্দীর আদর আজ পর্য্যন্ত হয়নি। আকবর বাদ্‌শা নিজে হিন্দীতে অনেক কবিতা রচনা করে গেছেন।

আকবর বাদ্‌শা উঁচু দরের বিদ্বান ছিলেন না, কিন্তু তাই বলে তাঁকে নিরক্ষর বলা যায়না। লাহাজে লেখাপড়া তিনি জানতেন।

তাঁর কবিতার একটা নমুনা দিচ্ছি—

"জাকো যশ হৈ জগৎ মেঁ, জগৎ সরাহৈ জাহি,
তাকো জীবন সফল হৈ, কহত অকবর সাহি।"

অর্থাৎ যাকে জগতে সকলে প্রশংসা করে ও যার যশ জগৎব্যাপী, আকবর শাহ্‌ বলেন তার মানব জন্ম নেওয়া সফল হয়েছে।

বোধ হয় এ কবিতাটি তাঁর জীবনের একটা motto ছিল। আকবর চিরদিন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জগতের শ্রেষ্ঠতম সম্রাটদের মধ্যে স্থান পাবেন। দু'জনে আকবর বাদ্‌শার রচিত কবিতা আরো পাওয়া যেতে পারে।

আকবর নিজের ছেলে জাহাঙ্গীরকে হিন্দী শিখিয়েছিলেন। আর মিয় সৌরু খুসরুকে হিন্দী শিক্ষা দেওয়ার জন্য পণ্ডিত কুসত্ত ভট্টাচার্য্যকে শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন।

শাজাহান হিন্দীভাষায় পরম পণ্ডিত ছিলেন এবং দরবারে হিন্দী কবিগণকে পরম সম্মান করতেন। সব চেয়ে বেশী আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে শাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার হিন্দী ও সংস্কৃত সাহিত্যে অপূর্ব্ব অনুরাগের অধিকার। বাপা—চাচুর্দ্দার চাইতে এমন কি বাদ্‌শার আত্মীয়বর্গের চাইতে দারার হিন্দী ও সংস্কৃতে সকলের চেয়ে বেশী দখল ছিল। যুবরাজ দারা অতি যত্ন সহকারে উপনিষদের দারাশীতে প্রাঞ্জল অনুবাদ করেছিলেন। সে অনুবাদ যেমনি বিশদ, তেমনি সুখপাঠ্য হয়েছিল।

আওরঙ্গজেব বাদ্‌শা হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন, কিন্তু তিনিও হিন্দীভাষাকে পরম প্রীতির চোখে দেখতেন। একবার শাহজাদা মুহম্মদ আজম দুই বুড়ি উৎকৃষ্ট আম আওরঙ্গজেব বাদ্‌শার নিকটে পাঠিয়ে দেন এবং তার সঙ্গে প্রার্থনা করে পাঠান যে দু রকমের আম বাদ্‌শার জন্য দুই ঝুড়িতে পাঠান গেল—বাদ্‌শা আওরঙ্গজেব যেন বলা করে আমের নামকরণ করে যেন।

আওরঙ্গজেব বাদ্‌শা উত্তরে লিখলেন,—"তুমি স্বয়ং বিদ্বান হয়েও বুড়ো বাপকে আর কেন কষ্ট দিচ্ছ। যা হোক তোমার খুসীর জন্য দু রকমের আমের নাম আমি "খুশরস" ও "রসনাবিলাস" রাখলাম।" শাহজাদা মুহম্মদ আজম আওরঙ্গজেব বাদ্‌শার পুত্র এবং চাকা নবাবীতে সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হিন্দীভাষার এমন একদিন ছিল যেদিন আওরঙ্গজেব বাদ্‌শার মতন "কট্টর" বাদ্‌শা পর্য্যন্ত তার সেবা করে গেছেন।

* * *

হিন্দীর অনেক ছোট বড় কবির কথা বিশদ করে বলা হোলো না। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বাঙ্গলাদেশের "বরষিয়া" কবি জ্ঞান দাস, সুর-আনন্দ, রসলীন, বাস, রসনিধি ও চরণদাস প্রভৃতির কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়নি। কেবল প্রধান প্রধান কবির কথাই বলা হয়েছে।

ঘাঘ্‌-কবি ছিলেন পাড়াগেঁয়ের কবি। চলা-চুলাহের ভাষায় অজস্র কবিতা তিনি রচনা করে গেছেন। সে কবিতার ভাষা পাড়াগেঁয়ে হলেও তার সালিত্য পুরোপুরি বজায় রাখা হয়েছে। অনেক কবিতা খুব উচ্চভাবপূর্ণ।

হাসির কবিতা ও ঘাঘ অনেক লিখিতেছেন। সেগুলি খুব উপভোগ্য। সে কবিতাগুলি ছোটদের জন্য রচনা করা হয়েছে। ছেলেরা একদিন একটা কচ্ছপ ধরে ঘাঘ-কবিকে জিজ্ঞেস্ করলে—এটা কি? তিনি কবিতায় বলেন যে ওটা খোদার পুরাণো দুর্গ বোঝি।

গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে রাজার হাতী চলে গেছে। মোটা-মোটা পায়ের দাগ রাস্তার উপরে অঙ্কিত হয়ে আছে। ছেলেরা তা দেখে ঘাঘ্‌কবিকে জিজ্ঞেস করলে—এটা কি? উত্তরে কবি বলেন, বিড়ালটা তার পায়ে জাঁতা বেঁধে লাফাতে লাফাতে এই রাস্তা দিয়ে চলে গেছে—তারি দাগ রাস্তার বুকে রয়েছে।

ঘাঘ্‌, আমার বাংলায় খনার বচনের মত অনেক "বচন" রচনা করে গেছেন। সেগুলি হিন্দুস্থানী চাষাদের মুখে অনেক শোনা যায়।

ঘাঘের কবিতা বিদগ্ধ হাসির প্রস্রবণ—আনন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

তোষনিধি আর একজন কবি। এঁর কবিতা সরল ও উচ্চভাবপূর্ণ।

রঘুনাথ কাশীর মহারাজা বলিবন্ত সিংহের রাজকবি ছিলেন। কাশী-নরেশ তাঁর কবিতা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে কবিকে "চৌত্ত"

নায়ক নৌলা রাজাকে দিয়েছিলেন। কবি সপরিবারে সেই গ্রামেই থাকতেন।

শিহাবীর মোহম্মদী অধিপতি আলি আকবর খাঁ কবিবর ওমান মিশ্রকে নিজের সভাকবি নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাঁর-ই আদেশে কবিবর ওমান মিশ্র হিন্দুর কৃত মহাকাব্য মৈথলের বিবিধ ললিত ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন।

আর একজন বড় কবি ছিলেন গিরিধর কবিরায়। তাঁর রচিত কবিতাগুলি সর্ব্বজনসমাদৃত। তিনি কবিতায় বহু নূতন ছন্দের প্রবর্ত্তক। তাঁরচা "কুণ্ডলিয়া" খণ্ড কবিতাগুলি খুবই প্রসিদ্ধ।

এরূপ কথিত আছে যে গিরিধর কবিরায়ের বাড়ীর পাশেই এক ছুতার মিস্ত্রী বাস করত। সেই মিস্ত্রী একটি বিচিত্র চারটি পাখাযুক্ত পালঙ্ক তৈরী করেছিল। সে পালঙ্কে কেউ শুলেই পাখা কয়টি আপনিই বাতাস দিতে সুরু করত। মিস্ত্রী সেই পালঙ্কটি নিয়ে রাজার কাছে বিক্রয় করে। কিছুদিন পরে রাজা মিস্ত্রীকে আরো কয়েকটি ঐ রকমের পালঙ্ক প্রস্তুত করতে আদেশ করেন। মিস্ত্রী জানালে যে কবিবর গিরিধর কবিরায়ের বাড়ীতে একটি মূলের (কড়ই) গাছ আছে। সেটি পেলে অনেকটি ঐ রকমের সুদৃশ্য পালঙ্ক তৈরী করে দিতে পারে। কবিবর গিরিধর অনেক মিনতি করে রাজাকে জানালেন যে তিনি ঐ গাছটি দিবেন না। কিন্তু রাজা তা শুনলেন না। জোর করে গাছটি গিরিধরের বাড়ী থেকে আনা হোলো। গিরিধর এতে এতই মর্ম্মাহত হন যে তিনি ঐ রাজার রাজ্য তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করে যান।

গিরিধরের ছেলেপুলে ছিল না। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর স্ত্রীও প্রতিভাশালিনী কবি ছিলেন। তিনি সকলের নিকটে "সাঁই" নামে পরিচিত।

কবিবর সুরদাস জয়পুরের মহারাজ সুরজমলের পরম প্রিয় সভাকবি ছিলেন এবং সুরজমলের বহু অভিযানের বর্ণনা করেছেন। তিনি কৃষ্ণের কবিতা ও গান রচনা করে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখিয়ে গিয়েছেন।

নীলকণ্ঠ ও ব্রজবাসীদাসও বেশ উঁচুদরের কবি ছিলেন।

সইজোবাঈ ও সন্তাবাঈ বিখ্যাত স্ত্রী-কবি ছিলেন। তাঁরা উভয়ই মহারাষ্ট্র বংশের মহিলা। উভয়ই পরম গুণবতী ও ধার্ম্মিক মহিলা ছিলেন।

কবিবর ঠাকুরের রচিত কবিতাও খুব প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত।

কবিবর বোধার পুরা নাম বুদ্ধিসেন ছিল। ইনি পান্নার মহারাজার সভাকবি ছিলেন ও তাঁর দরবারে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল।

কলিকাতার সর্ব্ব পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক লল্লুজী লাল একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। ইনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

রেওয়া-কণ্ঠার মহারাজা জয়সিংহ পরম পণ্ডিত ও বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি কবিগণকে পরম আদর ও সম্মান করতেন। তিনি জীবিত থাকা অবস্থাতেই তাঁহার পুত্র বিশ্বনাথ সিংহের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন। তিনি রাজ-কার্য্য হতে অবসর নিয়ে কাব্যচর্চ্চা ও সাধুসঙ্গ নিয়ে জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করে গেছেন।

রামসহায় দাস একজন কবি ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। সেগুলি খুব প্রসিদ্ধ।

লাল কবির কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। দীনদয়াল গিরি আর একজন বড় কবি। কাশী-নরেশ তাঁকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। অন্য অনেক রাজা মহারাজা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক সাধু কবি ছিলেন।

রণধীর সিংহ নিজে অভিজাতবংশে জন্মগ্রহণ করেও কাব্যলক্ষ্মীর ষোড়শোপচারে পূজা করেছিলেন এবং অনেক সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

স্বাধীন রেওয়া রাজ্যের অধিপতি মহারাজা বিশ্বনাথ সিংহ হিন্দীভাষায় একজন মহাকবি ছিলেন।

নিজে কবি বলেই তিনি ও কবিকে চিরদিন পরম সমাদর করে গেছেন। হাজার হাজার কবিকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করেও তাঁর কবি-সমাদরের অদম্য স্পৃহা দমে যায় নি।

রাজা-মহারাজাদের সঙ্গে সরস্বতী দেবীর চিরদিন বিরোধ; কিন্তু মহারাজা বিশ্বনাথ সিংহ লক্ষ্মী-সরস্বতীর বড় আদরের দুলাল ছিলেন।..... হিন্দীভাষাতে রচিত তাঁর অনেক কাব্যগ্রন্থ আছে।.....ছন্দের বৈচিত্র্য, শব্দচয়ন প্রভৃতি গুণ তাঁর কবিপ্রতিভার পরিচায়ক।

তাঁর মৃত্যুতে এক কবি লিখেছিলেন যে "আজ সকল দীনহীন জনের সহায় সিন্ধু চিরতরে শুকিয়ে গেল।".....

তাঁর মৃত্যুর পরে রচিত শোকগাথাগুলিও হিন্দী সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য সম্পদ।

কমলার বরপুত্র আর একজন সরস্বতীরও বরপুত্র হতে পেরেছিলেন—তিনি রায় রাজা দিবসী প্রতাপনারায়ণ রায়। ইনি পড়রৌনার রাজা ছিলেন। পরম কৃষ্ণভক্ত ছিলেন বলেই তাঁর প্রায় কবিতা রাধাকৃষ্ণের লীলা নিয়েই রচিত।.....তাঁর রচিত গানও অনেক আছে।

কবিবর পজনেশ একজন সুধার রসের বড় কবি ছিলেন।

হিন্দীভাষার সেবা স্বাধীন রাজা-রাজড়ারাই বেশী করে' করে গিয়েছেন। স্বাধীন রেওয়া-কণ্ঠার মহারাজাদের মধ্যে অনেকেই সরস্বতীরও বরপুত্র ছিলেন। তাঁরা যে-সে কবি ছিলেন না। তাঁহাদের অনেকেরই অতুলনীয় প্রতিভা ছিল। রেওয়ার মহারাজা রঘুরাজ সিংহ একজন অতুল প্রতিভাশালী কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃতে তাঁর অগাধ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি ছিল।

কবি মহারাজ রঘুরাজ সিংহের পৈতৃক সম্পত্তি বলা যেতে পারে। .....তাঁর পিতা ও পিতামহও শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন।

সূর্য্যশতক, বিনয়পত্রিকা, রুক্মিণীপরিণয়, ভক্তি-বিলাস, ভক্তমাল, বিনয়মালা প্রভৃতি গ্রন্থাবলী মহারাজ রঘুরাজের অমর প্রতিভার নিদর্শন—সন্দেহ নেই।

অযোধ্যার মহারাজা মানসিংহ তাঁকে দ্বিজদেবও একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন।.....তাঁহার উত্তরাধিকারী মহারাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহও হিন্দীভাষার একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও পাণ্ডিত্যের জন্য 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পেয়েছিলেন।

কবি রামেশ্বরলাল নেউগিয়ার প্রেমাঙ্কুর প্রভৃতি গ্রন্থও বিশেষ আদৃত।

রাজা লক্ষ্মণ সিংহও একজন হিন্দী কবি ছিলেন। তাঁর মেঘদূতের অনুবাদ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের পিতা গিরিধর দাসও একজন বড় কবি ছিলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি হিন্দীভাষার সকল কবিগণের বিস্তারিত জীবন-কথা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁদের রচিত সমস্ত 'কাব্য-পরিচয়' করে বর্ণনা করাও এখানে সম্ভব হবে না।

হিন্দী সাহিত্যের প্রধান প্রধান কবিগণের উল্লেখ মাত্র করা গেল।

এ ছাড়া হিন্দী সাহিত্যে অজস্র কবিতা পাওয়া গেছে যার কে রচয়িতা এখনও নির্ণীত হয় নি।

লোকমুখে বহু সুন্দর সুন্দর কবিতা, গীতি-কবিতা শোনা যায়: কিন্তু কবির নাম এখনও ঠিক করা যায় নি।

*

* *

কাশীর 'নাগরী প্রচারিণী-সভা' বাংলাদেশের সাহিত্য-পরিষদের আর এক সংস্করণ। সেখানে বাংলা সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-তালিকার মতই কাজ করা হচ্ছে।

বাৎসরিক হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন ও কবি-সম্মেলন রীতিমতই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

প্রত্নতত্ত্ব-অনুসন্ধান সমিতিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং রীতিমত তার কাজ চলছে।

বর্ত্তমানে হিন্দীভাষার বড় কবি হচ্ছেন অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায়। তার পরই হচ্ছেন মৈথিলীশরণ গুপ্ত। প্রেমচন্দ্র ছোট গল্প লিখে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ও তাঁর লেখা গল্প ও উপন্যাস সর্ব্বজন-সমাদৃত।

বদরীনাথ ভট্টেরও গল্প ও উপন্যাস লেখার সুখ্যাতি আছে। তাঁর লেখার ছটা ও সরল গতি মনকে মুগ্ধ করে।

ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রকে হিন্দী ভাষার বঙ্কিমচন্দ্র বলে অভিহিত করা যেতে পারে। হিন্দী সাহিত্যে তাঁর অমূল্য অবদানের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

বদরীনারায়ণ চৌধুরী একজন খ্যাতনামা কবি ছিলেন এবং তাঁর কবিতাও খুব সমাদৃত হয়েছিল।

বিনায়ক রাও, প্রতাপনারায়ণ মিশ্র, অম্বিকা দত্ত ব্যাস, লালা সীতারাম, নাথুরাম শঙ্কর শর্ম্মা, জগন্নাথ দাস 'রত্নাকর' শ্রীধর পাঠক, মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী, রাধাকৃষ্ণ দাস, লালা ভগবান দীন, জগন্নাথ প্রসাদ চতুর্ব্বেদী, মিশ্র বন্ধু নামে পরিচিত শ্যামবিহারী মিশ্র ও শুকদেব বিহারী মিশ্র ভ্রাতৃত্রয়, গিরিধর শর্ম্মা, রঘুনাথ সিংহ, রূপনারায়ণ পাঁড়ে, ভূলালে ভলে ভার্গব, রামচন্দ্র শুক্ল, মন্নন দ্বিবেদী, লোচনপ্রসাদ পাণ্ডে, লক্ষ্মীধর উপাধ্যায়, শিবমাধব পাঁড়ে, গোপাল শরণ সিংহ, হরিঔধ হরি প্রভৃতি কবি ও সাহিত্যিকগণ হিন্দী সাহিত্যের ভাণ্ডারে বিশেষ আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন।

হিন্দী ভাষায় প্রবন্ধাদি পড়তে গেলেই এঁদের বই পড়তে হবে।

এ ছাড়া হিন্দী ভাষায় অজস্র কবিতা ও গান পাওয়া গেছে, যার রচয়িতার নাম এখনও পাওয়া যায় নি—আর পাওয়া যাবে বলেও আশা করা যায় না।—এ রকমের কবিতাগুলিও খুব উচ্চ রকমের এবং প্রথম শ্রেণীর কবির রচিত বলে বোধ হয়।

*

* *

হিন্দী ভাষার পুরানো নাম হিন্দ্‌বী বা হিন্দুই ছিল। পূর্বেই বলেছি হিন্দু শব্দের সহিত হিন্দী নামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়ে গেছে।

হিন্দী ভাষা বৈষ্ণবদেরও পরম প্রিয় ছিল। বিষ্ণু সম্প্রদায়, রামানুজ সম্প্রদায়, মধ্ব সম্প্রদায় ও বল্লভ সম্প্রদায়ের মূল আচার্য্য বিষ্ণু, রামানুজ, মধ্ব ও বল্লভের লীলা-কাহিনী হিন্দীতেই রচিত হয়েছে এবং তাঁদের ভক্তবৃন্দ ঐ হিন্দী ভাষাতেই তাঁদের গুণ-গান করে থাকেন। উক্ত আচার্য্য চতুষ্টয়েরও রচিত অনেক হিন্দী-পদাবলী প্রক্ষিপ্ত ভাবে পাওয়া যায়।

হিন্দী-বৈষ্ণব-পদাবলী এমনি মধুর ও প্রাণস্পর্শী হয়েছিল যে রহিম ও মালিক মুহম্মদ জায়সীর মতো মুসলমানদেরও বৈষ্ণব কবিতে পরিণত করেছিল।

জৈন ধর্ম্মাবলম্বীরাও হিন্দী ভাষার সেবা করেছেন এবং জৈন-প্রধান বানারসী দাস হিন্দী ভাষার একজন মহা কবি ছিলেন।

হিন্দী সাহিত্যের দুটি নদি-কোঠা এই দুই ধর্ম্মের আচার্য্যদের অবদান উজ্জ্বল করে রেখেছে।

তাঁদের দানের বৈশিষ্ট্য ভাবতে গেলেই মন অপূর্ব্ব পুলকে ভরে উঠে।

শিখ-গুরুদের অনেকেই হিন্দীভাষার পরম সমাদর ও সেবা করে গেছেন।

শিখদের আদি-গুরু নানক হিন্দী ভাষায় বহুল প্রচার করেন। যেখানে গেছেন সেখানেই হিন্দীতে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন।

শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জ্জুনদেব হিন্দীভাষায় প্রসিদ্ধ লেখক ছিলেন। তিনি তাঁহার আগের সমস্ত শিখ-গুরুদের বাণী সংগ্রহ করে "গুরু গ্রন্থ সাহেব" নামে পুস্তক রচনা করেন। এই গ্রন্থ এখন পাঞ্জাবে করতারপুরে বর্ত্তমান আছে।

গুরু তেগবাহাদুর সংসারের অসারতা সম্বন্ধে হিন্দী ভাষাতেই সম্রাট আওরঙ্গজেবকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

শিখ গুরুদের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী হিন্দী ভাষার আদর করে গেছেন গুরু গোবিন্দ সিংহ। হিন্দী ভাষা প্রচারের জন্য তিনি কয়েকটি হিন্দী পাঠশালা স্থাপন করেছিলেন।

তাই সন্তোষ সিংহও হিন্দী ভাষার অনেক উন্নতি সাধন করে গেছেন।

শিখদের আর একটী প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "সূর্য্য প্রকাশ" হিন্দী ভাষাতেই তিনি রচনা করেন।

গুরু গোবিন্দ সিংহ তাঁর একজন প্রিয় শিষ্য গুলাব সিংহকে হিন্দী শিখবার জন্য কাশী পাঠিয়ে দেন। কালে তিনি হিন্দী ভাষায় একজন

খ্যাতনামা লেখক হয়ে গেছেন এবং তাঁর দ্বারা হিন্দী ভাষার উপকার ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়েছে।

বর্ত্তমানেও জানী জানসিংহ হিন্দী ভাষা প্রচারের জন্য কায়মনোবাক্যে যথাসাধ্য যত্ন-চেষ্টা করছেন এবং "জ্ঞান প্রকাশ" নামক তাঁর রচিত হিন্দী গ্রন্থটি সমাদৃত হয়েছে।

হিন্দীভাষার সমাদর গুজরাটীরাও যথাসাধ্য করেছে।.....বীরা বাউরের হিন্দী কবিতায় গুজরাটী ভাষার দু-একটা শব্দ যেখানে সেখানে এসে পড়েছে।

নরসী মেহতা গুজরাটী ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।.....তিনি খুব ভাল হিন্দী জানতেন্ ও তাঁর কবিতায় যথাসাধ্য হিন্দীভাষার ব্যবহার করেছেন।

গুজরাটী কবিদলের মধ্যে ধরারাম, প্রীতম ও নর্ম্মদা শঙ্করের স্থান খুব উঁচুতে।...এঁরা সকলেই হিন্দী ভাষার সহিত বিশেষ পরিচিত।

হিন্দী ভাষাতে তুলসী দাসের চৌপাই, সুরদাসের পরাবলী ও বিহারিলালের দুঁড়লিয়া যেমন প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত ঠিক তেমনি গুজরাটী ভাষায় নরসী মেহতার প্রভাতী, বীরা বাউরের ভজন, প্রীতমের ছন্দ, ধরারামের গরবিণী ও নর্ম্মদাশঙ্করের রোলা ছন্দ পরম আদরণীয়।

* * *

হিন্দী ভাষার আদি কবি হচ্ছেন,—চন্দ, ভদ্রক ও অগস্ত্য। হিন্দী ভাষার প্রারম্ভকালের মুখ্য কবিদের নাম,—বিদ্যাপতি, অমীর খুসরো, কবীর, মলক ইত্যাদি।

... হিন্দী ভাষার মধ্যকালের কবি হচ্ছেন,—সুরদাস, তুলসীদাস, নাভাজী, চিতহরিবংশ, দাদু দয়াল, গঙ্গ, রহীম, কেশবদাস, রসখান, সেনাপতি, সুন্দরদাস, বিহারী, ভূষণ, মতিরাম, দাস, ঘন-আনন্দ, দেব, কুল ইত্যাদি।

.....হিন্দী ভাষার উত্তর সময়ের কবির নাম—দাস, দুলহ, গিরিধর, ঠাকুর, পদ্মাকর, দ্বাদ, বীনরদাস, রঘুনাথ, দ্বিজদেব, লক্ষ্মণসিংহ ও গিরিধর দাস।

এই যুগের মুখ্য গদ্য-লেখক হচ্ছেন,— লল্লুলাল, সদলমিশ্র ও রাজা লক্ষ্মণ সিংহ।

হিন্দী ভাষার কবিদের কথা অল্পপরিসরের মধ্যে যথাসাধ্য উল্লেখ করা হয়েছে।..... হিন্দী সাহিত্যে দু রকম ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। এক ব্রজভাষা, দ্বিতীয় বর্ত্তমান হিন্দী—যাকে হিন্দী ভাষাভাষীরা "খড়ী বোলী" বলে থাকেন।

পুরাতন কবিদের অনেকের লেখা-ই ব্রজ ভাষাতে লেখা। সে হিন্দী পুরাতন।

হালের কবিদলের রচনা "খড়ী বোলী" ভাষাতে ব্যক্ত করা হয়েছে।

ব্রজভাষায় রচিত কাব্য আধুনিকালের হিন্দী পাঠকদের নিকট অতি সহজবোধ্য নয়। অনেক জায়গায় কবিতার মর্ম্ম গ্রহণ করা শক্ত হয়ে পড়ে।

আধুনিকালের ভাষা বেশ সহজ সরল পরিষ্কার রাস্তা, পাহাড়-জোপ, পাড়-জঙ্গল কেটে তৈরী করা হয়েছে। মুখ তে বাধে না—একদম্ একটানা লাম্বা সড়ক চলে গেছে।... লেখার ছটা, ছন্দের গতি অব্যাহতভাবে, উড়ন্ রথে ছুটে চলেছে।

.....পড়তে গিয়ে থাকতে হয় না। কবিতার বর্ণিত বিষয় শতদল পদ্মের মত চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

এ কথার উল্লেখ করার অবশ্য এ কথা বলা হোলো না যে পুরাকালের রচিত কবিতা সবই অবোধ্য বা সহজে তার ভাব গ্রহণ করা যায় না। বরং সুরদাস, তুলসীদাসের লেখা, পড়তে গিয়ে মনে হয়, বর্ত্তমান কালের লেখার চেয়েও সরল ও সহজবোধ্য। কিন্তু অনেক পুরানো লেখা-ই বোঝা আয়াসসাধ্য।

ভানুকবি রচিত প্রবাবলীতে সবিস্তারে নানা প্রকার ছন্দের পরিচয়, পরিমাণ ও গঠনপদ্ধতি দেওয়া আছে। শব্দালঙ্কারও বিশদ ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

বাংলা ও হিন্দীর ব্যাকরণ প্রায় এক রকমের। সম্প্রতি কয়েক রকম ছন্দের নাম করা গেল—ঘনা, ঘোড়া, চৌপাই, দোহা,, নারা, সবইয়া, ধরহটা, কুঁড়লিয়া, কবিত, ঘনক্ষরী ইত্যাদি।

হিন্দীভাষায় জন্মদাতা হচ্ছেন অমেদীর তাঁটগণ। এঁরা যে রাজার রাজত্বে বাস করতেন, তাঁদেরই যশ কীর্ত্তন করে কবিতা, গান, গাথা রচনা করতেন।

* * *

কবিদের ও তাঁদের লেখার কথা বলা হোলো। এখন তাঁদের রাজ-দরবারে কাব্যচর্চ্চার দু-একটি চিত্র দিয়েই এই প্রবন্ধ শেষ করা যাবে।

...কবি হরিদাসের কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। তিনি একদিন রেওয়ার মহারাজার দরবারে গিয়ে উপস্থিত। রেওয়ার রাজা মহারাজ বিশ্বনাথ সিংহ ছিলেন একজন কবি।

বিশ্বনাথ সিংহের খ্যাতি তখন বেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি যেমন কলমের আঁচড়ের দুলাল, তেমনি বাণীর বরপুত্র ছিলেন। তাঁর সভায় কবিদের খুব সমাদর করা হোতো।

...হঠাৎ কি কারণে তিনি আদেশ প্রচার করেন যে, নূতন বিষয়ের কোনো কবিতা শোনাতে না পারলে তিনি কোনো কবিকেই "বিদাই" (কবিতে পুরস্কার) দিবেন না।

দরিদ্র কবিদের বড় দুঃখ হোলো। কারণ তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই "যে জন সেবিবে ও রাঙ্গা চরণ সেই ত ধনিষ্ট হবে।" তাঁরা গিয়ে হরিদাসকে ধরলেন।...হরিদাসকে রেওয়া নরেশের দরবারে যেতে হোলো।

রাজার সেউড়ীর নিকটে গিয়ে কবি তিন তিনবার ফিরে এলেন। অবশেষে প্রহরী ও সান্ত্রীকে অনেক বলে কয়ে তিনি প্রাসাদে ঢোকবার সুবিধা করে নিলেন। রাজার বাসভবনের নিকটে গিয়ে দেখেন

সাবনের দ্বিতল বারান্দায় মহারাজ বীর মহারাণী সমভিব্যাহারে ভোলানাথ বিশ্বনাথের পূজায় নিমগ্ন। শিব, পার্শ্বে পার্ব্বতী; মহারাজ শিবানী-পতি শিবের ও মহারাণী পার্ব্বতীর স্বর্ণার্ঘ্যে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন।

কিন্তু রাজার পাশে হুজুরী নাচী তাঁকে ভিতরে যেতে দেয় না। রাজারও পূজা তখন শেষ হয়ে এসেছে। কবি আর কি করেন—তিনি বিষতলে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে এক কবিতা রাজার উদ্দেশে শোনালেন। তখন প্রভাত। মহারাজ কবিতা শুনলেন। কবিতের মাধুর্য্য, কবিতে ভাব-প্রেরণা প্রাণের মধ্যে গুঞ্জরে উঠল। প্রাকৃতিক প্রভাতী সৌন্দর্য্যের সহিত মিলিত হয়ে, আকাশ-বাতাস মাতিয়ে, সেই কবিতার তান রাজার কানে ভেসে গেল। কবিতার অর্থ এই "আমি মহারাজ অগে তোমার সাথে দেখা করতে আসিনি; তুমি কবি, কাব্যচর্চ্চা আলোচনা; আর আমিও কাব্যরচনা-ব্যবসায়ী; তাই তোমারি সাথে শুধু কাব্য-চর্চ্চা করতে এসেছি। অর্থপ্রাপ্তি বা পুরস্কারের লোভে আসিনি।" কবিতার সরল, সরস, ছন্দায়িত আবৃত্তি রাজাকে মুগ্ধ করল। আর কি থাকা যায়—অমনি কবির তলব হোলো। কবি সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠে উপরে বারান্দায় যে দৃশ্য দেখলেন তাতে মুগ্ধ ও তৃপ্ত হয়ে গেলেন।

রাজা-রাণী কুশাসনে বসে শিব-পার্ব্বতীর পূজায় তন্ময় ও তদ্‌গত চিত্ত।···তখন কবির হৃদয়বীণা আবার বেজে উঠল। আবার কবি একটি কবিতা শোনালেন। রাজার দেবভক্তি নিয়েই এই কবিতা রচিত। কবিতাটি পড়তে গেলেই মর্ম্মস্পর্শ করে!

হিন্দী কবিগণের আরো অনেক কাজ ছিল। রাজাদের গুণ-গরিমা ও বাহাদুরী নিয়ে কবিতা রচনা করা কবিদের কাজ ছিল। আবার রাজাদের যে সব দোষ আছে তাহাও নানা উপায়ে সংশোধন করার প্রয়াস তাঁরা পেতেন।

যুদ্ধ-বিগ্রহাদির সময় কবিগণ নানাপ্রকারের প্রাণমাতান, রণোন্মাদনাপূর্ণ সঙ্গীতাবলী রচনা করে তাঁরা, সাহসহীন সৈনিককে অসম সাহসিক সৈন্যে পরিণত করতেন। এই যুদ্ধ-সঙ্গীত গেয়ে তাদের সাহস শত গুণ বেশী বেড়ে যেতো।

পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার বিবাহ ও অন্যান্য ঘটনা নিয়ে হিন্দুস্থানে "আহল্হা" নামক এক রকমের গাথা বহুদিন থেকে প্রচলিত আছে। সে গান খুব উন্মাদকতাপূর্ণ। ঢোল্ বাজিয়ে অনেকে এই গাথা গেয়ে থাকে।

অনেক ছোটখাট কবিও হিন্দীভাষাতে অনেক মূল্যবান কাব্য লিখেছেন। সে সবও নগণ্য বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। হিন্দী ভাষার বিস্তারিত ইতিহাসে বেরোলে তাঁদের কথাও তাতে থাকবে সন্দেহ নেই।

রহীম শেষ জীবনে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পড়েন।···অগাধ অপরিমিত অর্থ জলের মত দান করে দারিদ্র্যব্রতী তাঁকে হতে হয়েছিল।···আকবরের মৃত্যুর পরে তাঁর বড় সাধের "নওরত্ন" ভেঙ্গে যায়।

মিথ্যা রাজদ্রোহ অপরাধে রহীমকে জাহাঙ্গীরের আদেশানুযায়ী জেলে যেতে হয়েছিল। রহীমের সমস্ত সম্পত্তি বাদ্‌শার সরকারে বাজেয়াপ্ত করে যায়।···অনেকদিন পরে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

কারামুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই তাঁর বাড়ীতে অগণিত উপস্থিত হয়।··· প্রতিদিন তিনি লাখ্-লাখ্ টাকা গরীব দুঃখীকে বিলিয়ে দিতেন—আজ তাঁর গৃহে অন্ন নাই! কারামুক্তির পরেও বহু যাচক উপযাচক, রাজ্যসংক্রান্ত নানারূপ জটিল সমস্যা-সমাধানের পরামর্শ নেওয়ার জন্য বহু রাজন্যবর্গ তাঁর কুটীর-দুয়ারে সমাগত হতেন। তিনি তাঁদের অনেক বোঝাতেন যে, যেন তারা আর তাঁর নিকটে না আসে। কিন্তু সে কথা কেউ মানতে না। একদিন তিনি নিম্নলিখিত কবিতাটি উপস্থিত পাঠক-বর্গের নিকটে বলে চিত্রকূটে চলে যান।

এ রহীম দর্ দর্ ফিরে, মাঁগি মধুকরী সাঁচি;
মাংগো ভারী ছোঁড় দো ওই রহীম দর নাঁহি।

অর্থাৎ

এ রহীম এবে যেথায় সেথায় ফিরে,
মাধুকরী করি ভোজো যদ্যপি পায়;
বন্ধুরা আর এস না তাহার কাছে
এ রহীম ওগো সে রহীম আর নয়।

এই কবিতাটি যেন রহীমের মর্ম্মন্তুদ দুঃখের দু-ফোঁটা অশ্রুজল। অশ্রুর অর্থ দুই হাতে গরীব-দুঃখীকে যে আজন্ম বিলিয়েছে, আজ তাকে মাধুকরী বৃত্তি, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে জীবন ধারণ কর্ত্তে হয় এ কথাতেও যেন প্রাণে বাজে।

তবুও যাচকবর্গ তাঁকে সর্ব্বদাই ঘিরে থাকতো। তিনি তাঁদের কিছুতেই ছাড়াতে পারতেন্ না। একদিন এক গরীব ব্রাহ্মণ তাঁকে বলেই ফেলে—

"রহিমন দানি দরিদ্রতর, তউ যাচিবে যোগ;
জোঁ সরিতন সূখা পড়ে কুআঁ। গনাবত লোগ।"

অর্থাৎ রহীম আজ সব বিলিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন; তবুও তিনি-ই একমাত্র উপযুক্ত লোক, যাঁর নিকটে সবাই প্রার্থনা করতে পারে। নদী শুকিয়ে গেলেও সেখানেই জলের জন্য লোকে কূঁয়ো (ইঁদারা) করে নেয়।

রহীম বহুদিন অযোধ্যার সুবাদার ছিলেন বলে তাঁকে অনেকে 'অওধ-নরেশ' বলে ডাকতো; অর্থাৎ যেমন খবরের কাগজওয়ালারা বাঙ্গলার লাটসাহেবকে অনেক সময় বঙ্গেশ্বর বলে উল্লেখ করে।

গরীব ব্রাহ্মণটি যখন কিছুতেই রহীমকে ছেড়ে যায় না, তখন তিনি আর কি করেন, তাঁর পরমমিত্র বিরবর রেওয়ার মহারাজার নিকট একটি দু-লাইনের কবিতায় চিঠি লিখে দিয়ে তাকে রেওয়া-দরবারে পাঠিয়ে দেন।

কবিতাটি এই—

"চিত্রকূট মে রমি রহে,
রহিমন অওধ-নরেশ;
আপন বিপদা পড়তি হয়,
সো আবত যহ দেশ।"

এর অর্থ হোলো এই যে 'অওধ-নরেশ' রহীম দুরবস্থায় পড়ে এখন

চিত্রকূটে থাকা দেখেছেন। যার উপর বিপদ পড়ে সেই শুধু এ দেখে এসে থাকে।

মহারাজা তৎক্ষণাৎ তাকে এক লাখ টাকা পাঠিয়ে দেন। তিনি সেই টাকা পেয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁরা যাচকবৃন্দকে দান করে ফেলেন।

প্রার্থী ও যাচকদের উপদ্রবে তিনি আর চিত্রকূটে থাকতে পারলেন না। সেখান থেকে পালির রেওয়া রাজ্যের রাজধানীতে এসে এক ঘোলা-তালাওয়ালার দোকানে সামান্য "ভাজে কোরা" অর্থাৎ ছোলাভাজাওয়ালার চুলো জ্বালাবার কার্য গ্রহণ করেন। যাদুকরী ছদ্ম ত্যাগ করে তিনি আত্মগোপন অভিপ্রায়ে এই নগণ্য চাকুরী গ্রহণ করেন।

একদিন তিনি জ্বালার পাশে দাঁড়িয়ে "ভার্ দে'কে ছেন অর্থাৎ চুলোতে কয়লা ভরে দিচ্ছেন, ঠিক এমনি সময় রেওয়া-নরেশ সেই রাস্তা দিয়ে ছুটে ছুটে যাচ্ছিলেন। তিনি রহীমকে ঐ অবস্থায় দেখ্‌তে পান। দেখতে পেয়েই রাজা রথ থেকে নেমে তাঁর নিকটে এসে এই কবিতাটি আবৃত্তি করেন। বলা বাহুল্য রেওয়ার মহারাজদের মধ্যে অনেকে সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন।

"যাকে শির অস ভার্
সো কস্ কে কেত ভার অর।"

অর্থাৎ যাঁর মস্তকে অত বড় ধারিত্বের ভার ছিল সে এখন কেমন করে এমন ভাবে 'ভার' দে'কেছে। এখানে ভার শব্দটির দুই অর্থ রয়েছে। রহীম তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—

"রহিমন উতরে পার,
ভার্ দে'কে সব ভার্ দে'।"

অর্থাৎ রহীম সব ভার্ (বাহির) তারে দিয়ে (চুলোর দিয়ে) চলে এসেছেন। এখন তিনি বন্ধনমুক্ত - ধারিত্বের কঠিন শৃঙ্খল যাঁরা বহন করেন।

রেওয়ার মহারাজ তাঁকে তাঁর পরিবারবর্গসহ চিরদিন পালন করবেন—এ প্রতিজ্ঞা করেও তাঁকে রেওয়ায় রাখতে পারেন নি। তিনি অবিলম্বে রেওয়া ত্যাগ করেন।

রহীম ও আমীর খুসরু হিন্দীভাষা-দেবীর মহাগৌরবময় শুভদয়। এঁদের লেখা গোঁড়ামি ও বিদ্বেষ-ভাব-বর্জিত।

রহীমের কাব্যচর্চা ও দানের অজস্র কাহিনী শোনা যায়। রহীমের জীবন যেন তাঁরই রচিত একটি কবিতায় এক কলির মতো—

"তরুবর ফল নহি খাত হয়,
সরবর পিবৈ ন পান,
কহি রহীম পরকাজ হিত
সম্পতি সঁচহি সুজান।"

অর্থাৎ বৃক্ষ নিজের ফল নিজে খায় না—পাছকে সব বিলিয়ে দেয়; সরোবর নিজের জল নিজে পান করে না—সে জলে অন্য লোক তৃষ্ণা নিবারণ করে। তেম্‌নি সু-জন অর্থ-সম্পত্তি সঞ্চয় করে পরের হিতের জন্যে দান করে থাকে।

...এ যেন তাঁরই জীবনের কথা।...এ যেন সর্বস্ব বিলিয়ে তিনি যে সন্ন্যাসিত্ব লাভ করেছিলেন—তারই কবি! আর এক জায়গায় তিনি বলছেন—

"রহিমন দেখি বড়েনকো
লঘু নহীঁজিয়ে ডারি;
জহাঁ কাম আবৈ সুই,
কহা করে তরবারি।"

এর অর্থ হোলো এই যে রহীম বুঝি 'বড়'র সঙ্গ করা বলে 'ছোটো'কে ঘৃণা করা না; কারণ অনেক সময় দু'চ ধারা যে কাজ সাধিত হয় বৃহৎ তরবারি দিয়ে তাহা পারা যায় না।

* * *

হিন্দী সাহিত্যে দুইজন দেবতার অসীম প্রভাব লক্ষিত হয়ে থাকে। আজন্ম রঘুবীরভক্ত সাধক তুলসীদাস ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ও অন্ধ পরম ভক্ত, কবি সুরদাস শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তনের প্রবাহের বন্যায় সারা দেশটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।...মধুরস্—আনন্দ-লীলাময় ভগবানকে নিয়ে এমন কাব্য, মহাকাব্য, গান, গীতিকবিতা আর কোনো দেশে কোনো কবি রচনা করেছেন বলে শুনি নি।...রাম ও কৃষ্ণের যশঃ-কীর্তন যেন আর ফুরাতে চায় না। পাহাড়ী ঝরণার অবাধ গতি ছুটে চলেছে। অথচ সব চেয়ে উপভোগের কথা হচ্ছে এই যে ইঁহা যতই পড়া যাক্ না কেন পুরাতন বলে মনে হয় না। পড়তে সুরু করলে পড়্‌বার ইচ্ছা বেড়েই চলে।...এ যেন চিরনূতন!

হিন্দীভাষাভাষীদের দেশে প্রত্যেক ঋতুর উপযোগী গীতাবলী শুনতে পাওয়া যায়।...বেশী করেই চোখে পড়ে বর্ষার ও বসন্তের সঙ্গীতাবলী।

বর্ষাকালে ও-দেশে 'কজরী' উৎসব অর্থাৎ মেঘের উৎসব হয়ে থাকে। শ্রাবণ মাস জুড়েই এই উৎসব চলতে থাকে। আর সমাপ্ত হয় কোথাও কৃষ্ণা-তৃতীয়াতে; কোথাও বা শুক্ল-তৃতীয়া অথবা ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী পর্য্যন্ত এই উৎসব চলে।

বাংলা দেশে থেকে, বর্ষা যে কি সন্তাপহারী কত সাধনার ধন—তা বোঝাই যায় না। পশ্চিমে চৈত্র হইতে আষাঢ়ের মাঝে যখন অসহ্য গ্রীষ্মের পর আকাশে মেঘের সঞ্চার হয়, শীতল হাওয়া বইতে আরম্ভ করে, তখন সে দেশে ঘরে ঘরে উৎসব জেগে যায়। শিখীর কেকারব ও বিচিত্র কাকলীতে দেশ ছেয়ে যায়। সবাইর মনে আর আনন্দ ধরে না।

মেয়েরা ধানী রঙের ঘাগ্‌রা ও আকাশ-রঙের ওড়না গায় দিয়ে নগরের উপকণ্ঠে উদ্যানে সব সমবেত হয়।.....উদ্যান, কুঞ্জ ও তরুবীথিকা মুখরিত হয়ে ওঠে নারীদের কলোচ্ছ্বাসে.....আকাশ-বাতাস ছেয়ে যায় তাদের 'কাজরী' গানের মধুর ঝঙ্কারে; আর সকলের মনে জাগে অপূর্ব্ব পুলক।

.....বড় গাছের ডালে-ডালে হিন্দোলা পড়ে যায়। তরুণীরা তাদের খোলায় সাথে সাথে কাজরী গান গায়। আর তাদেরি একজন, ঘায়া মাটিতে বসে থাকে, ধুয়া দেয় ও সঙ্গীতটি পুরো করে দেয়।

.....হিন্দোলায়-চড়া মেয়েরা গায় বনরাজী ও নীল আকাশের গান;

আর নীচের ঠক্‌ঠকীরা গায় হরিৎ বর্ণের শস্তের ও নব দূর্ব্বাদলের সবুজ গীতি। এমনি করে বর্ষার ও গানের ধারা সমানে প্রবল বেগে বেয়ে চলে দেশকে সাবিত্ত করে দেয়।

কাশী ও মির্জাপুর অঞ্চলে এই উৎসব মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়ে থাকে।

……হোলীর গান ফাগের দিনে আবার সমগ্র দেশবাসীকে মাতিয়ে তোলে। যেমনি আবীর ও রঙে সব একেবারে লালে লাল্ হয়ে যায়, তেমনি হোলীর গানে সকলে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। আনন্দ আর ধরে না।

গানের সুর অতি মধুর। বহু রকমের গান আছে।

আবার রাধলীলার সমস্ত গান। তার সুর যেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ, তেমনি মধুর।

গ্রাম্য মেয়েলী সঙ্গীতও বহু রকমের আছে। স্ত্রী-আচারের প্রত্যেক উৎসবে সেই উৎসবোচিত গান গীত হয়ে থাকে।

বিবাহে, উপনয়নে, মস্তকমুণ্ডনে, নামকরণে, অন্নপ্রাশনে, মেয়েদের পর্ব্বের দিনে উৎসব-রীতিতে মুখরিত হয়ে ওঠে।

এ ছাড়া কথকতা, বেদপাঠ, সত্যনারায়ণ ও শনিদেবের কথা, নানারূপ মেয়েমহীর পাঁচালী হিন্দী ভাষায় ঢের ঢের আছে।

বত্রিশ সিংহাসন, বেতাল পঞ্চবিংশতি ও অন্যান্য বহু রকমের পুরাণী ঢালের উপাখ্যানমালা অজস্র আছে।……ভোতাপরীর কথা, রাজকন্যা, সেনাপতি রাজকুমারের কথা, লায়লা মজনু, সোহাব রুস্তম, হাতেম তাই ও সেকেন্দর শাহেরও অনেক উপাখ্যান আছে।

আর এক উপন্যাস আছে যাকে হিন্দীভাষাভাষীরা "তিলস্‌মী" উপন্যাস বলে থাকে। তাতে সব যাদু-মন্ত্রের কথা, চাকিনী-পক্ষিনীদের ও যাদুকরের কথা আছে।

"বটতলা" যেমন পূর্ব্বদিনের বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, ঠিক তেমনি বহুদের অনেক গ্রন্থ হিন্দী ভাষাতে আছে।

অনেক বাজে বই-ও এ পর্য্যায়ে আছে। আরবী ফারসীতে নানা রকমের প্রেম-কাহিনী বিকৃত অনুবাদ করেও চালানো হয়েছে। তবে যেমন বাংলা ভাষার "বটতলায়" বাজে মালের মধ্যে মণি-মুক্তাও পাওয়া যায়, তেমনি হিন্দীতে এই সব কু'চা মালের মধ্যে দু-একটি স'াচ্চা জিনিসও পাওয়া যায়।

ভ'াড়ে ভ'াড়ে লড়াই এখনও ও-দেশে হয়ে থাকে। এক-একজন এক-এক রকমের কবিতা বলে অপরকে জব্দ করতে চায়।

শিশুদের "ঘুম-পাড়ানিয়া গান", মেয়েদের ব্রত কথা, শিশুদের ভূত ও ভূতের গল্প, 'লোহা ও সোনার ঝগড়া', 'ছাগলোকার কথা', রাজ্যের ভাইনি বুড়ী, রাক্ষস খোক্কসের কথা অনেক আছে।

ছেলেদের খেলার গানও অনেক আছে। গ্রাম্য ছড়াও বহু রকমের আছে। এমন কি মেয়েদের ক'াতা ঘুরোবার সময়ের গান পর্য্যন্তও আছে।

* * *

হিন্দী ভাষার প্রসার ও সমাদর এবং তারি সাথে হিন্দী সাহিত্যের উন্নতি এখন বাড়িয়ে তুলছে হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন ও কাশীর নাগরী-প্রচারিণী সভা।…এ দুটি সংঘের কাজ খুবই প্রশংসার্হ।

হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনকে ভারতের প্রায় সকল প্রদেশ-প্রসারী করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এরি মধ্যে মাদ্রাজে হিন্দী ভাষা প্রচার করার জন্য বহু সহস্র টাকা ব্যয় করা হয়েছে। সেখানে এই প্রচেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হবে—এ আশা সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের মনে ক্রমেই দৃঢ়মূল হচ্ছে। তা ছাড়া হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন থেকে প্রতি বৎসর সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ রচনা করার জন্য ১২০০৲ টাকা পুরস্কার গ্রন্থকারকে দেওয়া হয়ে থাকে।

হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনের প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে প্রয়াগে। কিন্তু তার শাখা-প্রশাখা যুক্তপ্রদেশের সহরগুলি ছাড়াও ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সহরে ছড়িয়ে পড়েছে।

হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনের কার্য্যক্ষেত্র ক্রমেই সুদূর-প্রসারী হচ্ছে এবং আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে আরো ছড়িয়ে পড়বে।

কাশীর নাগরী-প্রচারিণী সভা হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন থেকে অনেক পুরানো। এই সভাকে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহিত তুলনা করা যেতে পারে।

নাগরী-প্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য বহুমুখী। যাতে দেবনাগরী লিপি সারা ভারতবর্ষে প্রচারিত হয় তার সুব্যবস্থা করা, পুরানো শিলালিপি, কাব্য, হস্তলিখিত পুঁথি প্রভৃতি সংগ্রহ ও উদ্ধার করা। পুরানো ঐতিহাসিক যত প্রকারের উপাদান সংগ্রহ করা যায়, তার জন্যে যথাযোগ্য যত্ন-চেষ্টা করাও এই সভার অন্যতম উদ্দেশ্য।

নাগরী-প্রচারিণী সভার আর এক উদ্দেশ্য হচ্ছে ভালো-ভালো বই প্রকাশ করা। এক বিরাট বিশ্বকোষ হিন্দীভাষায় লিখিত হচ্ছে এই নাগরী-প্রচারিণী সভারই একান্ত চেষ্টায়। আরো নানা রকমের দুষ্প্রাপ্য পুরাতন হিন্দী লিপি আবিষ্কার করাও এই সভার একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

বহু সচিত্র মাসিক-পত্র হিন্দীতে বেরিয়েছে। তন্মধ্যে সরস্বতী, মাধুরী, প্রভা ও চাঁদবাণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সাপ্তাহিক পত্রের মধ্যে প্রতাপ, অভ্যুদয়, কর্ম্মবীর প্রভৃতির প্রচার খুব বেশী।

দৈনিক পত্রের মধ্যে ভারতমিত্র, ভরত, আজ ও কলিকাতা সমাচারের প্রচার খুব বেশী এবং জনতার উপর প্রভাবও এই সব পত্রের খুব বেশী।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে, বিদ্যার্থী শিশুদের জন্যে বালসখা, বালক ও শিশু প্রভৃতি পত্র পরম সমাদৃত।

মেয়েদের জন্যে স্ত্রীদর্পণ, গৃহলক্ষ্মী, জ্যোতি প্রভৃতি পত্র খুবই উপযোগী ও খুব সমাদৃত।

অন্যান্য অনেক রকমের কাগজ হিন্দীতে বেরিয়েছে। এ ছাড়া স্কুল-কলেজেও অনেক ছোট-ছোট কাগজ প্রকাশিত হচ্ছে।

এ ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশে, পুনায় চিত্রময়-জগৎ বলে একখানি অতি সুন্দর মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। মাদ্রাজে হিন্দী-প্রচারক নামে একটি পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হচ্ছে।

এ ছাড়া বহু সাময়িক পত্র প্রায় প্রত্যেক ছোট-খাটো শহরে বেরোচ্ছে।

যাতে ভাষার গঠি সংরক্ষিত হয়, বহুপ্রসারী হয়, তার জন্যে অন্য প্রাদেশিক ভাষার যে সব ভালো বই আছে তার অনুবাদ করা হচ্ছে। এ অনুবাদ দেখে মনে হয় যে যতটুকু অনুবাদিত হওয়া আবশ্যক তার বেশীই করা হচ্ছে।

বাংলা ভাষার প্রায় সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থই হিন্দী ভাষাতে অনুবাদিত হয়েছে।.....অনুবাদে মূলের সহিত ঠিক যতটুকু সম্বন্ধ রক্ষিত হতে পারে তার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছে।

হিন্দীভাষাতে অন্যান্য ভাষার অনেক শব্দ দেখ্‌তে পাওয়া যাবে—যা এই ভাষা হজম করে ফেলেছে। আরবী ও পারসী শব্দও বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বহু ইংরাজি শব্দও এই ভাষা আপনার করে নিয়েছে।

আর হিন্দী লেখকগণও এই সব শব্দ অবাধে নিজেদের রচনায় ব্যবহার করে চলেছেন ঠিক যেন ঐ ভাষারই শব্দের মতো।

* * *

বর্তমানে হিন্দী ও চল্‌তে বিরোধ ক্রমেই বেড়েই চলছে। কিন্তু শব্দের দৃষ্টিতে দেখ্‌তে গেলে উর্দুকে স্বতন্ত্র ভাষা বলা চলে না।

হিন্দী ভাষাতে অল্পবিস্তর আরবী, ফারসী বা তুর্কী শব্দ প্রয়োগ করলেই তা আর এক বিভিন্ন ভাষা হয়ে উঠে না। আরো দেখ্‌তে পাওয়া যাবে যে হিন্দী ও উর্দু ভাষার ব্যাকরণ ঠিক এক ই রকমের।

বাংলা বা হিন্দীভাষাতে কথা বলবার সময় তাতে দু-চারটা ইংরেজি শব্দ মিশিয়ে অনেই তা আর স্বতন্ত্র ভাষা হয়ে ওঠে না।

এখন দেখ্‌তে হবে দুই ভাষার বিভিন্নতা কোথায়? হিন্দী দেবনাগরী লিপিতে লিখিত হয়ে থাকে, আর তাতে সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। উর্দু ফারসী ভাষাতে লিখিত হয়ে থাকে, আর তাতে আরবী ও ফারসী শব্দের আধিক্য দেখা যায়।

ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে গুজরাতী ভাষারও দুই রূপ দেখা যায়। এক রকমের গুজরাতী ভাষা হোলো যা পারসীরা (Bombay Parsis) বলে থাকে। আর এক রকমের গুজরাতী ভাষা হোলো যা গুজরাতীরা বলে থাকে।

দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ হচ্ছে এই যে, যে গুজরাতী ভাষায় পারসীগণ কথোপকথন করে তাতে ফারসী ও আরবী শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। আর গুজরাতীরা যে ভাষায় কথা বলে তাতে সংস্কৃত ও বহু অপভ্রংশ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হোলো এই যে তাতে গুজরাতী ভাষার দুই বিভিন্ন নাম হয়ে যায় নি। সেই গুজরাতী নাম-ই বজায় আছে।

হিন্দীভাষাতে আরবী ও ফারসী শব্দের প্রয়োগ বহু পূর্বকাল হতেই দেখা যায়। এমন কি মুসলমানদের এ দেশে আগমনের বহু পূর্বের রচিত হিন্দী গ্রন্থে অনেক ফারসী ও আরবী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

পৃথ্বীরাজের সভা-কবি চন্দবরদাইর কবিতায় বহু আরবী ও ফারসী শব্দের প্রয়োগ লক্ষিত হয়।

তার পর যখন মুসলমান এ দেশে এল তখন যেন হিন্দু মুসলমানের মিলনের সাথে সাথেই হিন্দী ভাষায় রাশি-রাশি ফারসী ও আরবী শব্দ এসে জমা হতে লাগল। হিন্দুরা যেমন মুসলমানদের পরম সমাদরে ভাই বলে গ্রহণ করলে, হিন্দী ভাষাও তেমনি তাদের ফারসী ও আরবী ভাষার বহু শব্দ আপনার করে নিলে—এ যেন গভীর সৌহার্দ্যের মিল স্থাপিত হোলো।

মুসলমানরাও খুশী হয়ে তাদের ফারসী ও আরবী ভাষার বহু শব্দকে হিন্দীতে মিলিয়ে দিলে। তাতে ভাষা বোঝবার পক্ষে উভয়েরি সুবিধা হোলো।

এই ভাবেই বহু দিন গত হোলো। তার পরে এমন দেখ্‌তে হবে উর্দু স্বতন্ত্র ভাষা বলে থেকে হয়ে উঠ্‌লো। যেখানে হিন্দী ভাষা যারাই সব কাজ হচ্ছিলো সেখানে আবার উর্দু ভাষার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে কি কারণ বিরোধ-ই না সৃষ্টি করা হোলো। মুসলমানেরা যখন এ দেশে এলো, বসবাস করতে আরম্ভ করল, তখন নিজেদের সুবিধার জন্যে অনেক ফারসী ও আরবী শব্দ হিন্দীভাষা হতে এসে জুড়ে বসতে লাগল।... হিন্দীভাষা তাদের প্রত্যাখ্যান করলে না—পরম সমাদরে নিজের করে নিলে।

পাঠশালায় বাদশার সময় এই আর-হিন্দী আর-ফারসী ভাষা উর্দু ভাষা বলে পরিগণিত হোলো।

কিন্তু এই নামকরণ হওয়ার অনেক আগে থেকেই কবীর, সুরদাস ও তুলসীদাস তাঁদের রচনায় আরবী ও ফারসী অনেক শব্দ ব্যবহার করে গিয়েছিলেন।

উর্দুর আর এক নাম 'রেখ্‌তা' অনেক আগে রাখা হয়েছিল। আর পূর্বের লোকে না কি এ ভাষাকে বাজারের ভাষা বলত।

* * *

হিন্দীভাষার উৎপত্তি-কাল বিক্রমাদিত্যের সময় অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দী থেকে ধরা হয়ে থাকে।

এর পর থেকেই কাব্য-সাহিত্যের ধারা ক্রমেই প্রবল বেগে ছুটেছে এবং অল্পসময় শতমুখী হয়ে সমস্ত দেশকে প্লাবিত করেছে।

বাংলা কীর্তনের মতো হিন্দীতে কীর্তনেরও পদাবলী অজস্র আছে।

হিন্দীভাষার কাব্যে দুইজন দেবতার অসীম প্রভাব লক্ষিত হয়।... ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে বহু কাব্য ও গীতি-কবিতা রচিত হয়েছে। অবশ্য লীলাময় ভগবানের অফুরন্ত লীলা নিয়ে এই সব কবিতায় অবতারণা।

এ ছাড়া বারোমাসী, জেলায়-জেলায় প্রচলিত ভিন্ন পর্বোপলক্ষে মেয়েদের ছড়া ও গান, বৈরাগী বাউলের গান অনেক আছে।

পাড়োয়ানদের মেঠো সুরের অনেক গান আছে।...বলা বাহুল্য এ সব গান গ্রাম্য মনোভঙ্গি ভাষায় রচিত হলেও মনকে খুব করে।

এখনও আমরা অযোধ্যা প্রদেশের গাঁয়ে গাঁয়ে অনেক গ্রাম্য কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তারা কবিতা শুনিয়ে দু পয়সা আয় করে থাকে। এরা প্রায় সবই নিরক্ষর।

অভিসার, নায়িকাভেদ ও শৃঙ্গার রসেরও অজস্র কবিতা হিন্দীভাষাতে পাওয়া যায়।

দেবতার পূজার্চ্চনারও গান হিন্দীতে আছে। ছোটর উপর হিন্দীতে অনেক নতুন নতুন রকমের গীতাবলী আছে।

বাংলার সাহিত্য রসিক হিন্দীভাষার আলোচনা করলেই দেখতে পাবেন পুরানো হিন্দীভাষাতে অনেক জায়গায় মিলিল আছে। বাংলার হিন্দীর সেই সব জ্ঞাতব্য বিষয় অনুবাদিত হলে—তা এক অপূর্ব্ব জিনিস হবে সন্দেহ নেই।···কিছুদিন হোলো 'ভারতবর্ষে' 'কবীর কসৌটী' নাম দিয়ে কবীরের দোঁহা ও তাঁর বাণীর যে অনুবাদ বেরোতো, তা অনেক বাংলা-সাহিত্য রসিককে আনন্দ দিয়েছে।

হিন্দীভাষার ও হিন্দী কবিদের কথা বলতে গিয়ে আমি সব কথা বিশদ ভাবে বলতে পারিনি। কবিদের বিস্তারিত জীবন-কথা লিখতে গেলেই তা এক একখানি পুঁথি হয়ে দাঁড়াবে।

*

* *

হিন্দীভাষায় নাটক এখনও খুব ভালো হয়ে ওঠে নি। বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও গিরিশচন্দ্র যা দিয়ে গিয়েছেন, তেমনি ভাবে হিন্দীভাষাতে কেউ নাটক লিখতে পারেনি এখনও।

বাংলার নাটক-নভেল, কাব্য ও রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থরাজি হিন্দীতে খুব অনুবাদিত হচ্ছে এবং তার কাটতিও হচ্ছে বেশী।

বর্ত্তমান হিন্দী কবিতা বাংলার কবিতার মতোই বেশ বহমান ও সলীল ছন্দে লেখা হচ্ছে। লোভা অথচ ভাবপূর্ণ শব্দ প্রয়োগে কবিতা লেখা হচ্ছে।

তবে এ কথা মানতেই হবে যে হিন্দীভাষার বর্ত্তমান অবস্থা তার পূর্ব্বেকার অবস্থার মতো গৌরবোজ্জ্বল নেই।···আগের মতো মহাপ্রতিভা-শালী কবি ও গ্রন্থকার এখন এ ভাষাতে নেই। কিন্তু তার সাথে এ কথাও জানতে হবে যে, ভারতে অন্য কোনো ভাষার পূর্ব্ব ইতিহাস এত গৌরবোজ্জ্বল নয়।···এক এক জন কবির খ্যাতি আজও ম্লান হয় নি—কোনো দিন হবেও না।

হিন্দী সঙ্গীতের কথা বেশী করে বলবার আবশ্যকতা নেই; কারণ, হিন্দী সঙ্গীত এখন বাঙালীর প্রায় নিজস্ব হয়ে উঠেছে।···হিন্দী গান ওদের নিকটে বাংলা গানের চেয়ে বেশী আদর পেতে আরম্ভ করেছে।

হিন্দীভাষার সবচেয়ে বড় গৌরবের কথা হচ্ছে যে মহাত্মা গান্ধি-জী প্রভৃতির ওজস্বিনী বক্তৃতা দিয়ে যশে আছে সেই দিনের অপেক্ষায় যেদিন ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলে হিন্দী সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে।

হিন্দী যেমন দেশের মুটে, কুলী মজুর গাড়োয়ান কোচম্যানের প্রিয় ভাষা, তেমনি দেশের প্রায় সকল স্বাধীন ব্যবসায়ীর দরবারী ও পারিবারিক কথাবার্ত্তারও বাহন বটে।

অন্য ভাষাভাষীর সংখ্যার চেয়ে ভারতে হিন্দী ভাষাভাষীর সংখ্যা অনেক বেশী। আর এ কথাও ঠিক যে, প্রায় সকল প্রাদেশিক ভাষারই গোড়াপত্তন হয়েছে এই হিন্দী ভাষা নিয়েই।

হিন্দী ভাষায় বর্ত্তমান সাহিত্য বৈভব বাঙালীর চোখ ধাঁধিয়ে দেবে না—কিন্তু তার পুরানো ভাণ্ডারে যে মণি কোঠায় সঞ্চিত রয়েছে—এবং চুপে চুপে যা বেড়েই এসেছিল অজস্র পূজারীর যত্নে—তা যদি আজ বাঙালী সাহিত্য রসিকেরা দেখতে পায় তবে তা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে এ কথা নিশ্চয়।

মীরাবাঈ, কবীর, দাদু, নানক, সুরদাস ও তুলসীদাসের সমগ্র বাণী, দোঁহা ও গ্রন্থরাজি অনুবাদিত হলে যে কোনো ভাষার সম্পদ বেড়ে যাবেই যাবে।

*

* *

হিন্দীভাষার ইতিহাস বিশদভাবে লিখতে গেলেই যে সকল বইয়ের সাহায্য নিতে হয়—এবং আমিও যে সাহায্য নিয়েছি—আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচনায় তাদের কথা এখানে লিখছি।

স্যার জর্জ্জ গ্রীয়ার্সন সব ও মিশ্টার ভিন্সেণ্ট স্মিথ হিন্দীভাষার ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করেছেন। তাঁদের লেখা এই হিন্দীভাষার ইতিহাস যে কত পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও যত্নের ফল তা তাঁদের রচিত হিন্দীভাষার ও ভারতীয় ইতিহাস ও অন্যান্য প্রবন্ধাবলী আলোচনা করলেই চোখে পড়বে।

বাংলা ভাষায় যেরী সাহেবের যে স্থান হিন্দীভাষাতে গ্রীয়ার্সন সাহেবেরও সেই স্থান অসঙ্কোচে দেওয়া যেতে পারে।

হিন্দীভাষার ইতিহাস জানতে হলে আর একখানি বই পড়া নিতান্ত আবশ্যক—সেখানি হচ্ছে মিশ্রবন্ধু-বিনোদ। তিন ভাইতে মিলে এই গ্রন্থখানি রচনা করা হয়েছে। বইখানির প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে খ্যাতি।···এ বইখানিও অসাধারণ অনুসন্ধিৎসার ফল।

এ ছাড়া নাগরী প্রচারিণী পত্রিকার পুরানো সংখ্যাগুলির সাহায্যও এই প্রবন্ধে নেওয়া হয়েছে।

প্রচলিত প্রবন্ধ ও হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনের প্রবন্ধাবলীর সাহায্যও আমাকে নিতে হয়েছে।

হিন্দীভাষার সব কথাই বিশদ-ভাবে এই প্রবন্ধে লিখতে পারি নি। তবে যাতে ঐ ভাষার একটা মোটামুটি ধারণা জন্মান যায়—শুধু তারই চেষ্টা করা হয়েছে।···হিন্দীভাষা-জননীর মহামহিমময়ী মূর্ত্তি আমি তাঁর পরিপূর্ণ মহিমায় দেখাতে পারি নি—তার জন্যে আমি সঙ্কোচ ও কুণ্ঠা অনুভব করছি।

আগে যে কথা বলেছি শেষে সেই কথা-ই বলে বিদায় নিতে চাই—হিন্দী কবিতা রচনার মধ্যে দিয়ে দেশবাসীর অপার আনন্দের ধারা বহুমুখী হয়ে বয়েছে, আর সবাই তা আকণ্ঠ পান করেছে—এ কথা ভাবতে গেলে মন অপূর্ব্ব পুলকে ভরে ওঠে।

শেষ

রাজা রামমোহন রায়ের ইংরাজিতে লিখিত বাংলা ব্যাকরণ

অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

মহাত্মা রামমোহন রায়ের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার কার্য্যের ন্যায় তাঁহার মাতৃভাষা-সেবাও সর্ব্বজনবিদিত। বিশেষতঃ বর্ত্তমান বাংলা গদ্যের তিনিই যে প্রথম প্রবর্ত্তক, এবং যেরূপ ভাষায় স্বেচ্ছামত ব্যবহারের তিনিই পথপ্রদর্শক, এ কথা বোধ হয় শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই অবগত আছেন।

রামমোহন রায়-প্রণীত বাংলা ব্যাকরণই কি বাংলা ভাষার আদি ব্যাকরণ? ৺ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তৎপ্রণীত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনীতে উক্ত ব্যাকরণের ভূমিকা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। উদ্ধৃত অংশে রাজা বলিতেছেন যে, তিনি বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়নে এই সর্ব্ব প্রথম হইয়াছিলেন যে তৎকালে কোন বাংলা ব্যাকরণ ছিল না। কিন্তু ৺রামগতি ন্যায়রত্ন রাজার ব্যাকরণকে ঐ শ্রেণীর পঞ্চম পুস্তক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং মঃ সাহেবের তালিকায় রাজার ব্যাকরণের পূর্ব্বে প্রকাশিত কয়েকখানি ব্যাকরণের নাম দেখা যায়।

যাহা হউক, রাজার জীবন-লেখক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে উক্ত বাংলা ব্যাকরণখানি প্রথমতঃ রাজার প্রণীত ইংরাজিতে লিখিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণের অনুবাদ। এই পুস্তকই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

এই পুস্তক (Bengali Grammer in the English Language by Raja Rammohan Roy) ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। ভূমিকায় গ্রন্থকার নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে বাংলা ভাষা-শিক্ষার্থী ইয়োরোপীয়গণের সুবিধার জন্যই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। বিদেশীয় শিক্ষার্থীদিগের জন্য ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দানের ইহাই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা। রামমোহনের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিষয়কর পরিচয় ইহা হইতেই পাওয়া যাইবে যে, এক শতাব্দী পূর্ব্বে রচিত এই পুস্তকখানি ইয়োরোপে প্রচলিত আধুনিকতম "স্বয়ং শিক্ষক" (Self-taught Readers) শ্রেণীর পুস্তকের অনুরূপ। পাশ্চাত্য দেশের অভিজ্ঞ ভাষাবিদ্‌গণ বিদেশী পাঠককে শিক্ষকের সাহায্য বিনা বহু প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যে সকল "স্বয়ং শিক্ষক" রচনা করিয়াছেন, রাজা রামমোহনের উদ্ভাবনী শক্তিও সেইরূপ পুস্তক প্রণয়নে প্রযুক্ত হইয়াছিল। ইংরাজিতে ব্যুৎপন্ন যে কোন ব্যক্তি রামমোহনের পুস্তক পাঠে বাংলা ভাষার ব্যবহারিক জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারেন। পুস্তকখানির আর একটী বিশেষত্ব—ইংরাজি ব্যাকরণের অনুযায়ী পরিভাষা নির্দ্ধারণ। যাঁহারা বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষার সহিত পরিচিত তাঁহারা জানেন যে এ কার্য্য কত কঠিন। কিন্তু রামমোহন সহজবোধ্য প্রণালীতে বাংলা ব্যাকরণকে প্রায়শঃ নূতন অবয়ব দান করিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

একণে, যাহাতে পাঠক আলোচ্য পুস্তকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারেন, সেইজন্য উহার উল্লেখযোগ্য স্থানগুলি নিম্নে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

বর্ণমালা—প্রকরণ

এই অধ্যায়ে গ্রন্থকার, যে সমস্ত বাংলা অক্ষরের উচ্চারণ সম্বন্ধে কোন বিশিষ্টতা আছে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। যথা :—

"ঙ—ইহা অনুনাসিক ও'র মত উচ্চারিত হয়—উদাহরণ—ওকারোঽ নমোনমঃ।"

"ঞ—অনুনাসিক ই'র মত উচ্চারিত হয়—যথা—ঞকার।"

(পুরাতন বাংলায় এই দুইটী বর্ণের উচ্চারণ অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন—গোসাঞ ইত্যাদি)।

"বর্ণের উচ্চারণ ব্যতিক্রম" শীর্ষক অনুচ্ছেদে গ্রন্থকার নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

"হ—অজ্ঞ লেখকেরা ইহাকে প্রায়ই ইংরাজি h অক্ষরের ন্যায় উচ্চারণ জন্য ব্যবহার করেন—যথা, মোহম্মদান, পাত্‌হা।"

(অনেক মুসলমান লেখক এইরূপ হ-এর ব্যবহার নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন)।

"ক—ইহা চ, ছ, ঝ, ষ, এই চারি বর্ণের পূর্ব্বে যুক্ত হইলে নঞর ন্যায় উচ্চারিত হয়, যথা—সঙ্কল্প, বাঙ্ময়, পিঙ্গল ইত্যাদি। কিন্তু নঞর পরে যুক্ত হইলে অনুনাসিক ণঞর মত উচ্চারিত হয়।"

"ণ—কেবল সংস্কৃত মূলক শব্দে ব্যবহৃত হয়।"

"য—শব্দের অথবা শব্দাংশের (syllables) প্রথমে থাকিলে এই বর্ণ ইংরাজি j-এর মত উচ্চারিত হয়; কিন্তু আর সর্ব্বত্রই ইহা ইংরাজি yoke শব্দের y বর্ণের মত উচ্চারিত হইয়া থাকে।"

"শ, ষ, স—সংস্কৃত ভাষায় এই তিন বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ আছে বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু বাংলায় কয়েকটী স্থল ব্যতিরেকে, তিন বর্ণকেই এক রকমে উচ্চারণ করা হয় এবং নির্ব্বিচারে একের বদলে অপরটী লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু শব্দ সকলের ব্যুৎপত্তির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইলে, এ বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া দরকার।"

"ক্ষ—ব্যুৎপত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বৈয়াকরণেরা বলেন যে এই বর্ণটী ক ও ষ'র মিশ্রণে রচিত। কিন্তু কার্য্যতঃ উহার উচ্চারণ খ ও হএর মিশ্রণের মত। যথা—পরীক্ষা—উচ্চারণ—পরীখ্যা।"

তিনটী "স", দুইটী "ন" এবং "ক্ষ"এর উচ্চারণ করিয়া বিদেশীদের সোজাসুজি তো হইবারই কথা। বাঙ্গালী বালকগণও "বর্ণ পরিচয়ের" সময় ঐ ঐ বর্ণযুক্ত শব্দের বানান লইয়া কত বিপদে পড়িয়া থাকে, তাহা সকলেই জানেন।

বাংলার অধিকাংশ অকারান্ত শব্দই যে হলন্ত উচ্চারিত হয়, গ্রন্থকার তাহাও উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই।

বলা বাহুল্য, বর্ত্তমানেও উচ্চারণের এই খুঁটি-নাটি বাংলা ভাষার

পুব কম ব্যাকরণেই বুঝাইয়া দেওয়া হয়, যদিও বুঝাইয়া দেওয়া বিশেষ দরকার।

পদ-প্রকরণ (Etymology)

ব্যাকরণের এই অংশে প্রত্যেক সম্পূর্ণ অভিনব ও মৌলিক প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। যদিও তিনি ইংরাজি ব্যাকরণের পদ্ধতি অনুকরণ করিয়াছেন, তথাপি পরিভাষা রচনা ও পদ বিভাগে তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে।

বিশেষ্য (Substantives)

"বিশেষ্যের যে পরিভাষা দেওয়া হইয়াছে তাহার ভাবার্থ এই :—

"যে বস্তু বা ব্যক্তির ধারণা, বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা (যেমন, রাম, মনুষ্য), অথবা মন দ্বারা (শ্রদ্ধা, আশা, ভয়) করা যায়, তাহাকে বিশেষ্য কহে।"

মূল ইংরাজি এই :—"A substantive is the name of a subject of which we have a notion either through our external senses, as Ram, man, or by our internal power of mind as hope, fear, submission."

ইংরাজি অথবা বাংলার কোন ব্যাকরণে বিশেষ্যের এই পরিভাষা আছে কি না সন্দেহ। অর্থে, মার্শমান দৃষ্টিতে, "ব্যক্তিবাচক, গুণবাচক" ইত্যাদি না বলিয়া বোধগ্রাহ্য বাহ্য-ইন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়গুলির নাম বিশেষ্য"—এইরূপ বলায় কোন ভুল হয় না।

ইংরাজি ব্যাকরণে Common Noun ও Proper Noun এই দুইটীর প্রয়োগ আছে। কিন্তু, বাংলায় এইরূপ নাই। বিশেষ্যের ঐরূপ বিভাগ ও উহার প্রতিশব্দও বাংলায় নাই। রামমোহন Common Noun ও Proper Nounএর বাংলা যথাক্রমে "সামান্য সংজ্ঞা" ও "ব্যক্তি সংজ্ঞা" এইরূপ করিয়াছেন।

"সর্ব্বনাম"কেও তিনি "বিশেষ্য" এই শ্রেণীভুক্ত করিয়া "প্রতিসংজ্ঞা" নাম দিয়াছেন।

বিশেষণ (Attributives),

"বিশেষ্য" ভিন্ন সমস্ত পদকেই রাজা "বিশেষণ" এই শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। এই "বিশেষণ" গুলি সাত রকমের যথা :—Adjectives Verbs, Participles, Adverbs, Prepositions, Conjunctions ও Interjections. এই পদগুলির পরিচয় ইংরাজি শিক্ষিত পাঠক মাত্রেই পাইয়া থাকিবেন। রাজা রামমোহন এই গুলির যে পরিভাষা (definition,) দিয়াছেন তাহাতে কিছু কিছু নূতনত্ব আছে। যথা :—

"যাহা বিশেষ্যের কালনিরপেক্ষ গুণ অথবা অবস্থা প্রকাশ করে তাহাকে গুণাত্মক বিশেষণ কহে।"

[Attributes that express the properties or circumstances of Nouns without relation to time are called adjectives].

"যাহা বিশেষ্যের কেবল কালসাপেক্ষ গুণই প্রকাশ করে তাহাকে ক্রিয়া আত্মক বিশেষণ কহে।"

[Those that express the attributes or accidents of nouns with absolute relation to time are called verbs].

"এবং যে বিশেষণগুলি অন্য ক্রিয়াত্মক বিশেষণের উপর নির্ভর করিয়া বিশেষ্যের কালাপেক্ষিক অবস্থা প্রকাশ করে তাহাদিগকে ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহে।"

[Those that express the circumstances of nouns with regard to time depending on that noted by another verbal attributive are called Participles].

"যাহারা অন্য বিশেষণের গুণ প্রকাশ করে তাহাদিগকে বিশেষ্যনীয় বিশেষণ কহে।"

[Such as express the attributes of other attributives are called adverbs].

এইস্থানে কোন নূতনত্ব নাই এবং Prepositionএর (সম্বন্ধসূচীয় বিশেষণের) পরিভাষারও নূতনত্ব নাই।

"সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ" (Conjunction)—ইহার পরিভাষার নূতনত্ব এইটুকু যে ঐ পদ "দুই বা ততোধিক বাক্য অথবা পদের মধ্যে থাকিয়া "সংযোজন অথবা বিয়োজন" গুণ প্রকাশ করে"—এইরূপ বলা হইয়াছে।

[express the attribute of copulative or disjunctive relation].

Interjectionকে রাজা "অনুভাব বিশেষণ" এই আখ্যা দিয়াছেন।

পূর্ব্বোদ্ধৃত পরিভাষাগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন রাজা রামমোহন কোন্ কোন্ ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই নূতন পদ-বিভাগ ও নামকরণ করিয়াছেন।

নিম্নে প্রদত্ত তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিষয়টী সহজে ও সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা যাইবে।

পরিনমন (Cases)

বাংলা ব্যাকরণে সাধারণতঃ যাহাকে "কারক" বলা হয়, রামমোহন তাহাকে "পরিনমন" এই নূতন নাম দিয়াছেন। কারকের সংখ্যা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে চারিটী কারকেই চলিতে পারে। যথা, কর্ত্তা, কর্ম্ম, অধিকরণ, ও সম্বন্ধ (Nominative, Accusative Locative, Genitive).

কর্ত্তৃকারক কাহাকে বলে? সাধারণতঃ বাংলা ব্যাকরণে "যে করে তাহাকে কর্ত্তা কহে" এইরূপ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের পরিভাষা (definition) একটু নূতন রকমের। রাজা যে ইংরাজি পরিভাষা দিয়াছেন তাহার ভাবার্থ এই :—

"কোন বিশেষ্য যদি কোন ক্রিয়াত্মক বিশেষণের সহিত এইরূপ ভাবে যুক্ত থাকে যাহাতে উভয়ে, বাক্যের অন্য পদের অপেক্ষা না রাখিয়া অর্থ প্রকাশ করিতে পারে তবে বিশেষ্যের কর্ত্তৃকারক বুঝিতে হইবে।"

[The nominative case is that in which a noun stands when coupled with a verb, so that together

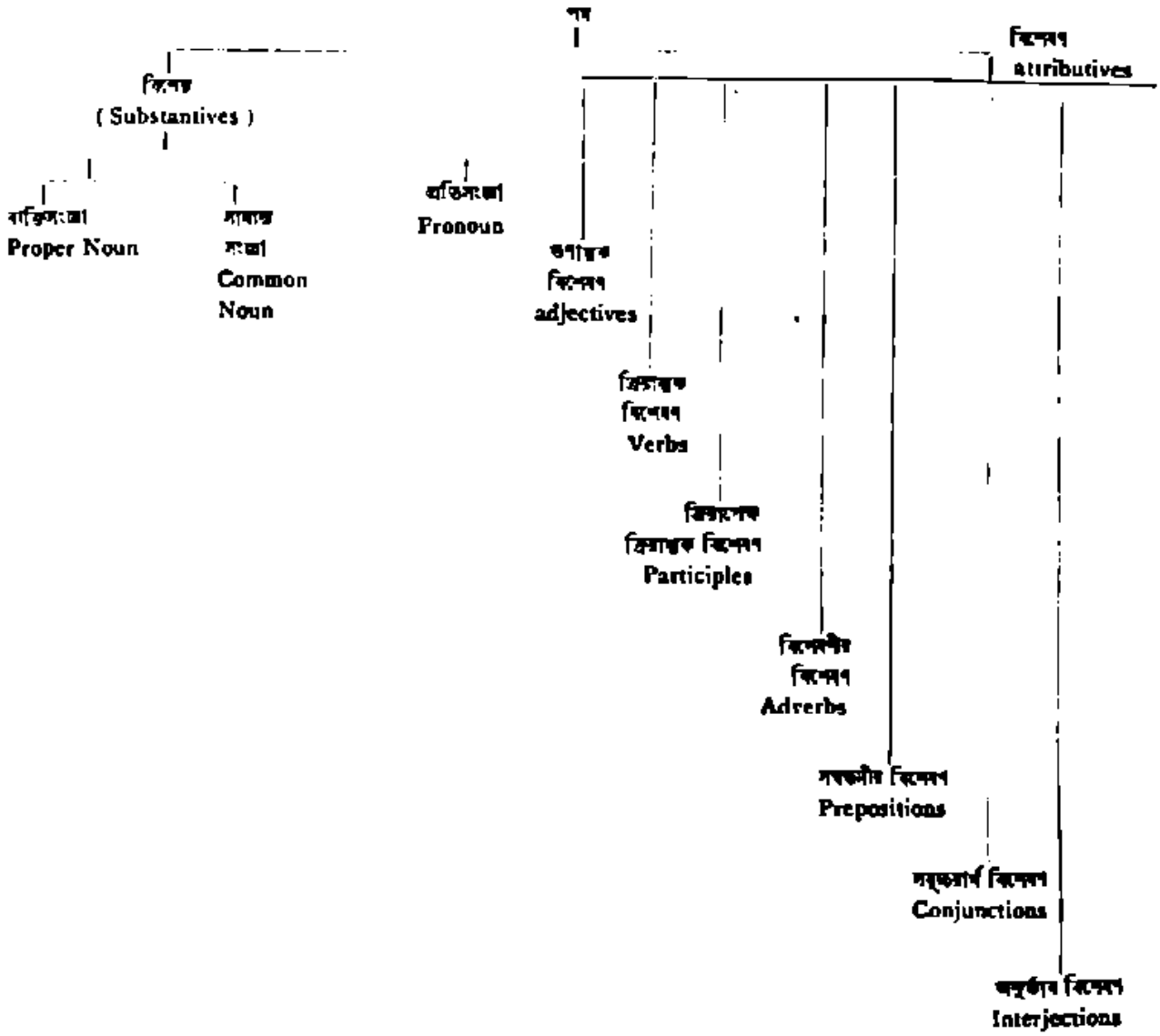

they convey a meaning though separated from all other words of the sentence expressed or understood].

এখন করণকারকের আবশ্যকতা অস্বীকার করা হইয়াছে—যেহেতু বাংলায় করণকারক কোন বিভক্তি-চিহ্ন দ্বারা সূচিত হয় না—"সম্বন্ধীয় বিশেষণ" (Preposition) দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে।

এইরূপ, "হইতে" এই সম্বন্ধীয় বিশেষণ কর্তৃকারকে যুক্ত হইয়া অপাদানকারক সূচিত করে। সুতরাং অপাদানের পৃথক সত্তা স্বীকার করার দরকার নাই।

সম্প্রদান নামে কোন "কারক" স্বীকার করা হয় নাই। আধুনিক অনেক বাংলা ব্যাকরণেও সম্প্রদান "কারকের" অস্তিত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে। কারণ, সম্প্রদানে কর্তৃকারকেরই ব্যবহার হয়। সম্প্রদান ও কর্মে বাংলায় কোন ব্যবহারিক পার্থক্য নাই।

কিন্তু অন্য কোন বাংলা ব্যাকরণে করণ ও অপাদান এই দুই কারক বর্জন করা হয় নাই। এই বিষয়টি ভাষার সম্পূর্ণ মৌলিকতাসূচক। কর্তৃকারককে প্রথমাস্থানে পদে "অভিহিত" এই নাম দিয়াছেন।

আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিলেই ভাষার বাংলা ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য সূচিত হইবে। ইয়োরোপি ব্যাকরণে যাহাকে Mood বলে, বাংলা ব্যাকরণে তাহার কোন প্রতিশব্দ অথবা আলোচনা দেখা যায় না। রামমোহন ইহারও বাংলা প্রতিশব্দ দিয়াছেন। তিনি Moodএর বাংলা নাম দিয়াছেন "প্রকার"। বিভিন্ন Moodএর নাম নিম্নরূপ দেওয়া হইয়াছে :—

Indicative—অবধারণ
Subjunctive—সংযোজন
Imperative / Optative } —নিয়োজন

প্রকার—Tenseএর বাংলা প্রতিশব্দ দিয়াছেন—বিভক্তিযুক্ত আখ্যাতকাল। এক স্থানে তিনি Verbএর বাংলা করিয়াছেন "আখ্যাতিক পদ"।

কলিকাতা পরিচয়ে সিরাজ ও মীরজাফর

শ্রীবিধিদনাথ রায় বি-এল

শ্রীযুক্ত হরিসাধন শেঠ মহাশয় 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়' নামক একখানা পুস্তক প্রকাশ করিয়া গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতার সহিত সিরাজের কোনই সম্বন্ধ নাই, তাঁহাদের কথা কলিকাতা পরিচয়ে উল্লেখ করিবার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ৺গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের কথা বলা যাইতে পারে। তাঁহার সহিত কলিকাতার কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া আমরা জানি না। আর সিরাজউদ্দৌলা ও মীরজাফর সম্বন্ধেও তাহা বলা যাইতে পারে। সিরাজ কলিকাতায় দুইবার মাত্র আসিয়াছিলেন এবং মীরজাফর ২।৩ বৎসর মাত্র অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, সিরাজ ও মীরজাফর সম্বন্ধে শেঠ মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার দু-একস্থলে আমাদের কিছু কিছু বক্তব্য আছে। নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমে তিনি যে ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে সিরাজউদ্দৌলার জন্ম বলিয়াছেন, তাহা কিরূপে স্থির করিলেন বুঝিতে পারিলাম না। সিরাজউদ্দৌলার জন্ম-সন লইয়া ইংরেজ ও মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে, কিন্তু কোন মতেই ১৭৫৬ খৃঃ অব্দ স্থির হয় না। ইংরেজ ঐতিহাসিক Orme ও Stewart সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—"Thus perished Surajuh Dowlah, in the 20th year of his age, and the 15th month of his reign," (July 1757) তাহা হইলে তাঁহাদের মতে ১৭৩৭ খৃঃ অব্দে সিরাজের জন্ম হয়, ৪৩ নহে। কিন্তু ইংরেজ ঐতিহাসিকদের এ মত যে ঠিক নহে, তাহা সায়র উল্ মুতাক্ষরীণ হইতে স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায়। সায়র উল্ মুতাক্ষরীণে লিখিত আছে যে, নবাব মুরশিদকুলীর সময় আলিবর্দী খাঁ বিহারের শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হন; তাহার কয়েক দিন পূর্ব্বে সিরাজের জন্ম হয়—"History ought to remark that a few days before this elevation (Deputyship or Nizibet of Azim-abad) a grandson was born to Aly-verdi-qhan from his youngest daughter married to his youngest nephew Zein-eddin-ahmed-qhan, and as he had no son of his own he called him Mirza Mohemed, after his own name, adopted him for his son, and had him educated in his own house." ১১৩০ হিজরী বা ১৭২৩-২১ খৃঃ অব্দে মুরশিদকুলীর বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া ৪ বৎসর তাহার কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি পদচ্যুত হইয়া বিহার প্রদেশ বাঙ্গলার সহিত মিলিত হয়। তখন মুরশিদকুলী বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা; তিনি আলিবর্দী খাঁকে বিহারের শাসনভার প্রদান করেন। তাহা হইলে ১১৩৪-৩৫ হিজরী বা ১৭২১-২২ খৃঃ অব্দে আলিবর্দীর বিহারের শাসনভার প্রাপ্তি ও সিরাজউদ্দৌলার জন্ম হয়। ইহাই ১১৩৫ হিঃ বা ১৭২৩-২৪ খৃঃ অব্দে আলিবর্দীর বিহারের শাসন ভার গ্রহণের কথা বলেন, কিন্তু মুতাক্ষরীণের কথাই প্রামাণ্য বলিয়া মনে হয়। কাজেই কোন মতেই যে ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে সিরাজের জন্ম হয় না, তাহা আমরা দেখাইলাম।

সিরাজ সম্বন্ধে শেঠ মহাশয়ের আর একটী কথারও আলোচনা করিতেছি। শেঠ মহাশয় বলিতেছেন, ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে ক্লাইব কলিকাতা পুনরধিকার করিলে সিরাজের সহিত সন্ধি হয়। সন্ধি হইলেও সিরাজ ইংরেজদিগকে বাঙ্গলা হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য গোপনে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ কথা যে সত্য নহে, তাহা এখন ইংরেজ ও ফরাসীর ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। এই সন্ধির অব্যবহিত পরেই ইংরেজেরা ফরাসীদিগের চন্দননগর অধিকারের জন্য অগ্রসর হন। ইহা লইয়া গোলযোগ বাধিয়া উঠে। নবাব অবশ্য ফরাসীদিগকে রক্ষা করাই অভিপ্রায় করেন। তাহার দুইটী কারণ থাকিতে পারে। একটী ফরাসীরা তাঁহার আশ্রিত বলিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করা তিনি কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলেন। আর দ্বিতীয় কারণ, সিরাজ ইংরেজদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের পূর্ব্ব ব্যবহারই তাহার কারণ। সেইজন্য তিনি আত্মরক্ষার জন্য ফরাসীদিগকে হাতে রাখিতে চেষ্টা করিয়াও থাকিবেন। ফরাসীদিগের সহিত সিরাজের যে পত্র লেখালিখি হইয়াছিল, তাহাই লইয়া তাঁহার গোপনভাবে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধাচরণের একটা কথা প্রচলিত আছে, এমন কি নবাব ফরাসীদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া ইংরেজেরা বলিয়া থাকেন। কিন্তু ফরাসীদিগকে নবাবের হাতে রাখিবার যে কারণ ছিল তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। নবাবের সৈন্যদলে ফরাসী সৈনিকও ছিল। পলাশীতে তাহারা নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। সৈন্যরক্ষার জন্য ফরাসীদের সহিত নবাবের অর্থ সম্বন্ধ থাকা সম্ভবও হইতে পারে। সিরাজ ইংরেজ সৈন্য প্রেরণের জন্য ইংরেজদিগকেও অর্থ প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। এই ফরাসীদিগের ব্যাপার ব্যতীত ইংরেজদিগকে গোপনে বিতাড়িত করার আর কোন চেষ্টা সিরাজ করিয়াছিলেন কি না তাহা ইতিহাস হইতে জানা যায় না। ফরাসীদিগকে রক্ষা করার জন্য নবাব প্রকাশ্য ভাবেই রাজা দুর্লভরামকে সসৈন্যে হুগলীতে পাঠাইয়াছিলেন ও হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারকেও আদেশ দিয়াছিলেন। ইংরেজেরা নন্দকুমারকে হস্তগত করিয়া তাঁহারই দ্বারা দুর্লভরামকে ফেরত দিয়াছিলেন এবং নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চন্দননগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহার 'সিরাজউদ্দৌলা' গ্রন্থে এ বিষয়ের বিশেষ রূপ আলোচনা করিয়াছেন। আমরা কর্ণেল ম্যালেসনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে শেঠ মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি,—

"Whatever may have been his faults, Sirajud daulah had neither betrayed his master nor sold his country. Nay more, no unbiased Englishman sitting in judgment on the events which passed in the interval between the 9th February and the 23rd June can deny that the name of Suraju'ddaulah stands

higher in the scale of honor than does the name of Clive. He was the only one of the principal actors in that tragic drama who did not attempt to deceive I"

১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লর্ড ও ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধ হইয়াছিল।

মীরজাফরের প্রসঙ্গে শেঠ মহাশয় বলিয়াছেন যে, তিনি খিদিরপুরের নিকট বাস করিয়াছিলেন। শেঠ মহাশয় পূর্ব্বেও তাহাই লিখিয়াছিলেন। মীরজাফর ১৭৬০ খৃঃ অব্দে রাজ্যচ্যুত হইয়া ১৭৬৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু তিনি যে খিদিরপুরের নিকট থাকিতেন ইহা জানা যায় না। তিনি কলিকাতার কোথায় থাকিতেন, তাহা আমরা প্রথমে মুতাক্ষরীণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া পরে তাহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি। বঙ্গদেশচ্যুত হইয়া মীরজাফরের কলিকাতায় আগমন সম্বন্ধে মুতাক্ষরীণে লিখিত আছে,—All these being put on board together with a number of servants of both sexes he (Mir-djaafar qhan) departed for Calcutta. * * * * Arrived there, he purchased in the most populous part of the city and near the market-place, a spot of ground whereon he raised several buildings according to his own mind and taste" খিদিরপুর অবশ্য সে সময়ে বহু জনাকীর্ণ স্থান ছিল না এবং তথায় যে কোন প্রসিদ্ধ বাজার ছিল তাহাও জানা যায় না। অতএব মীরজাফর খিদিরপুরে বাস করেন নাই, তিনি নিজ কলিকাতাতেই বাস করিয়াছিলেন। সে স্থান কোথায় তাহাও বলিয়া দিতেছি। বর্ত্তমান টেরিটী বাজারের নিকট চিৎপুর রোডের উপর মুর্শিদাবাদের নবাব বংশীয়দের গোলকুঠী বলিয়া যে সৌধ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই মীরজাফরের বাসভবন। নবাব বংশীয়েরা বরাবরই ঐ ভবনে আসিয়া অবস্থিতি করিতেন। ইহা যে মুতাক্ষরীণের বর্ণিত স্থান তাহা সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায়।

কুষ্মাণ্ড

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী ভিষগ্‌রত্ন,

এম্‌-এ-এস্‌-এস্‌

আমরা যে সকল দ্রব্য তোমারূপে গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহার দ্বারা বহু রোগের সুন্দর চিকিৎসা হইতে পারে। তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত আমি পত্রান্তরে দেখাইয়াছি। আজ যে দ্রব্যটীর কথা লিখিতেছি তাহা একটী উৎকৃষ্ট 'খাদ্যৌষধি'। ইহার নাম—

কুষ্মাণ্ড

প্রকারভেদ—ইহা দুই প্রকার (১) চালকুমড়া (২) বিলাতী কুমড়া। চালকুমড়াই ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ইহার গুণ লিখিত হইল।

বিভিন্ন নাম—বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে ছাঁচি কুমড়া, দেশী কুমড়াও বলে।

ইংরাজী নাম—Benin Casa cerifera.

সংস্কৃত নাম—কুষ্মাণ্ড, পুষ্পফল, পীতপুষ্প, বৃহৎফল এইগুলি ইহার পর্য্যায়।

প্রাপ্তিস্থান—ইহা ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র পাওয়া যায় এবং বাঙ্গালা-দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

ঔষধার্থ ব্যবহার

(১) ফল পক্ক
(২) বীজ
(৩) মূল

ঔষধের ক্রিয়া—

(১) শরীরের পুষ্টিকর
(২) শুক্রবর্দ্ধক
(৩) রক্তপিত্ত নাশক
(৪) উরঃক্ষত ও ক্ষয়কাস নাশক
(৫) বায়ুপ্রশমক কারক
(৬) শূল নিবারক
(৭) মূত্র কারক
(৮) পিত্ত নাশক
(৯) প্রমেহে হিতকর
(১০) বৃহ বিরেচক
(১১) অপস্মার নাশক,
(১২) ক্রিমি বিনাশক
(১৩) বিষক্রিয়া নাশক
(১৪) নেত্ররোগে হিতকর

বিশেষ ক্রিয়া

(১) শরীরের পুষ্টিবর্দ্ধনে
(২) রক্তপিত্তে—
(৩) উরঃক্ষতে ও ক্ষয়কাসে বিশেষতঃ রক্তস্রোত সম্বন্ধের উপর ইহার একটী বিশেষ ক্রিয়া আছে। তজ্জন্য ইহা অতি শীঘ্র মুখমুখ হইতে রক্তনির্গম বন্ধ করিতে পারে। মহামতি শার্ঙ্গধর বলেন যে, ইহা 'উরঃ সন্ধানকৃৎ' অর্থাৎ বক্ষঃক্ষত সংযোজক।
(৪) বায়ু প্রশমিতে যথা উন্মাদ ও অপস্মারে এবং বিবিধ কত ব্যাধিতে
(৫) শূলে
(৬) পিত্ত প্রশমনে

বীজ

(১) মূত্র কৃচ্ছ্রে
(২) ক্রিমি রোগে

(৩) পুষ্টি বর্দ্ধনে, বিশেষ করিয়া মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলের উপর ইহার কার্য্য

(৪) মূল—বাসে

ব্যবহার-বিধি—

মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, উন্মাদ, অপস্মার ও শূলে প্রধানতঃ ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন্ কোন্ রোগে কিরূপ ভাবে ইহা প্রয়োগ করিতে হয় নিম্নে তাহা লিখিত হইল।

রক্তপিত্তে—কুষ্মাণ্ড শাঁদে উৎকৃষ্ট ঔষধ। কুষ্মাণ্ডের তরকারী রক্তপিত্ত রোগীর পক্ষে উপযুক্ত খাদ্য এবং ঔষধ উভয়ের কার্য্য করিয়া থাকে।

(১) প্রত্যহ এক তোলা হইতে দুই তোলা মাত্রায় কুষ্মাণ্ডের রস একটু চিনি সহ সেবন করিতে দিলে রক্তপিত্তে চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

(২) কুষ্মাণ্ডের রস এক তোলা ও বাসক পাতার রস এক তোলা একটু চিনিসহ সেবন করিতে দিয়া রক্তপিত্তে সুন্দর ফল পাইতে দেখা গিয়াছে।

(৩) মুপক্ক কুষ্মাণ্ডের শাঁস রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া উহার চূর্ণ আধ তোলা মাত্রায় একটু মধুসহ সেবন করিতে দিলেও রক্তপিত্ত প্রশমিত হইয়া থাকে।

মূত্রমূত্র হইতে রক্তস্রাবেও উপরিউক্ত যোগগুলি দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। উরঃক্ষতেও ইহা অমৃতবৎ কার্য্যকরী।

কুষ্মাণ্ডের হালুয়া ও কুষ্মাণ্ডের পালো রক্তপিত্ত ও উরঃক্ষত রোগীর এবং ক্ষীণ ব্যক্তির পক্ষে চমৎকার খাদ্য ও ঔষধ। ইহা এইরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়।—

কুষ্মাণ্ডের হালুয়া—

মুপক্ক কুষ্মাণ্ড শস্য রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করিয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। উনানে কড়াই চাপাইয়া তাহাতে গব্যঘৃত দিয়া ঐ শুষ্ক কুষ্মাণ্ড-চূর্ণ কিয়ৎ পরিমাণে ভাজিয়া লইবে, তাহার পর উহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে দুগ্ধ দুগ্ধ দিয়া সিদ্ধ করিতে থাকিবে ও আবশ্যক মত চিনি মিশাইয়া উহাতে ছোট এলাইচ, তেজপত্র ও দারুচিনির অল্প গুঁড়া দিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া যখন ঘনত্বে মত হইবে তখন নামাইয়া লইবে। ইহাকে কুষ্মাণ্ডের হালুয়া বলে। ইহা প্রত্যহ প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।

কুষ্মাণ্ডের পালো—কুষ্মাণ্ডশস্য রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া হামানদিস্তায় গুঁড়া করিয়া ছাঁকিয়া লইলেই কুষ্মাণ্ডের পালো প্রস্তুত হয়। এই কুষ্মাণ্ড-শস্য চূর্ণ বা পালো কিঞ্চিৎ লইয়া খানিকটা গরম দুগ্ধ দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে সুন্দর উপকার হয়।

কুষ্মাণ্ডের সরবৎ—সুপক্ক কুষ্মাণ্ড শস্যের রস করিয়া উহাতে কিঞ্চিৎ ঘোল বা ছানার জল দিয়া গুলিয়া আবশ্যক মত চিনি মিশ্রিত করিয়া লইবে। পরে অল্প কেওড়ার জল বা গোলাপজল দিতে হয়। ইহাকে কুষ্মাণ্ডের সরবৎ বলে। এই সরবৎ রক্তপিত্তে, উন্মাদ, অপস্মারে প্রয়োগ করিলে উত্তম ফল পাওয়া যায়। ইহা অতীব স্নিগ্ধ ও বলকারক। মূত্রকৃচ্ছ্রে ও জ্বালা যন্ত্রণাযুক্ত প্রমেহ রোগীকে এই সরবৎ পান করিতে দিলেও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

কুষ্মাণ্ডের মোরব্বা রক্তপিত্ত, বন্ধ্যা, উন্মাদ ও অপস্মার রোগীদিগকে খাইতে দিলে পথ্য ও ঔষধ উভয়ের কাজ হইয়া থাকে।

কুষ্মাণ্ড কাষলেহ—ইহা রক্তপিত্ত, বন্ধ্যা, উন্মাদ, অপস্মার, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতায় বিশেষ উপকারী, বিশেষ করিয়া বক্তক্ষত নাশক।

ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—বৃন্তবীজাদি রহিত খণ্ডখণ্ডীকৃত সুপক্ক কুষ্মাণ্ড ১২॥০ সের, ২৫ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১২॥০ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই জল গ্রহণ করিবে এবং কুষ্মাণ্ড খণ্ডগুলি অল্প নিষ্পীড়িত করিয়া সূর্য্যতাপে কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিবে। পরে শূলাগ্র-শলাকাদি দ্বারা সেই কুষ্মাণ্ডগুলি বহুবার বিদ্ধ করিবে। অনন্তর তাম্র-কটাহে এক সের ঘৃত নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে ঐ কুষ্মাণ্ডগুলি অল্প ভাজিয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত কুষ্মাণ্ড সিদ্ধ জল এবং ১২॥০ সের চিনি দিয়া পাক করিবে। সুপক্ক হইলে তাহাতে পিপুল, শুঁঠ, জীরাচূর্ণ প্রত্যেক ১০ তোলা, ধনে, তেজপাতা, ছোট এলাইচ, গোল মরিচ ও দারুচিনি প্রত্যেক চূর্ণ চারি তোলা নিক্ষেপ করিবে এবং শীতল হইলে তাহাতে ৩২ তোলা মধু মিশ্রিত করিবে। ইহাকে কুষ্মাণ্ডকাষলেহ বলে।

এই ঔষধ প্রত্যহ আধতোলা মাত্রায় সেবন করিতে দিতে হয়। খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ, বৃহৎ কুষ্মাণ্ডাবলেহ, কুষ্মাণ্ডখণ্ড, বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড প্রভৃতি রক্তপিত্তরোগাধিকারের ঔষধগুলির প্রধান উপাদান কুষ্মাণ্ডশস্য। ঐ সকল ঔষধগুলি রক্তপিত্ত ভিন্ন, কাস, শ্বাস, জ্বর ইত্যাদি রোগ নাশক। ঐ ঔষধগুলি সবই শাস্ত্রীয়, সে কারণ উহাদের প্রস্তুত প্রণালী প্রদান করিলাম না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক উহাদের প্রস্তুত প্রণালী আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তকে পাইবেন।

রক্তপিত্তে—নিম্নলিখিত যোগগুলি বিশেষ উপকারী।

মকরধ্বজ, কস্তুরিভৈরব প্রত্যেক সমভাগে লইয়া বেশ করিয়া মর্দ্দন করিয়া ঐ চূর্ণ রোগীর বল বিবেচনা করিয়া একরতি হইতে দুই রতি মাত্রায় কুষ্মাণ্ডের শস্যের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিলে রক্তপিত্তে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। রক্তপিত্তে যখন দেখা যে মুখ দিয়া খুব বেশী রক্ত উঠিতেছে তখন কুষ্মাণ্ড শস্যের রস ও আদাপানের পাতার রস এবং একটু মধুসহ উহা খাইতে দিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়।

রক্তপিত্তে আয়ুর্ব্বেদীয় অন্য ঔষধের অনুপানরূপে কুষ্মাণ্ডের রস নয় ঔষধ খাইতে দিয়া অতীব উপকার পাওয়া যায়।

বন্ধ্যার প্রথম অবস্থায়—এক রতি মুক্তাভস্মের সহিত কুষ্মাণ্ড শস্যের রস ও একটু মধুসহ সেবন করিতে দিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। Calcium অপেক্ষা ইহা যে খুব বেশী উপকারী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শরীরের কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্র হইতে যদি রক্ত নির্গম হয় তাহা হইলে কুষ্মাণ্ড শস্যের রস একতোলা হইতে দুই তোলা মাত্রায় খাইতে দিলে রক্ত নির্গম বন্ধ হইয়া থাকে।

মস্তিষ্কের বেদনায়—কুষ্মাণ্ড শস্যের পাতলা কালি 'জল পটির' মত

কপালে 'পট্টি' দিলে নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কুষ্মাণ্ডের রস মস্তিষ্কে মাখাইলেও মস্তিষ্ক শীতল হইয়া থাকে।

শ্বাস—কুষ্মাণ্ডের মূল চূর্ণ দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় গরম জলের সহিত পান করিলে শ্বাসের টান বন্ধ হইয়া থাকে।

শূল—সুপক্ক কুষ্মাণ্ডের শস্য পাতলা পাতলা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া একটী মৃৎপাত্রে উহা রাখিয়া সরা ঢাকা দিবে ও সন্ধিস্থান লোহার মিশ্রিত মাটীর দ্বারা বেশ করিয়া লেপ দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। পরে উহা ঘুঁটের আগুনে পোড়াইয়া লইবে, যখন উহা লাল হইয়া যাইবে তখন জ্বাল হইতে তুলিয়া লইবে। অতঃপর উহা শীতল হইলে ঢাকা সরা খুলিয়া তন্মধ্যস্থ ভস্ম বাহির করিয়া লইবে। এই চূর্ণ দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রা। দুই আনা কাঁচচূর্ণ ও একটু গরম জল ধৃ সেবন করিলে বহুবিধ শূল আরোগ্য হইয়া থাকে।

উন্মাদ—কুষ্মাণ্ড শস্যের রস এক তোলা, কুড় চূর্ণ দুই আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া একটু মধুসহ সেবন করিলে উন্মাদ ভাল হইয়া থাকে।

অপস্মারেও ঐরূপভাবে সেবন করিতে দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

উন্মাদ—কুষ্মাণ্ড বীজের শস্যও বিশেষ উপকারী। দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় বীজের শস্য একটু মধুসহ সেবন করিতে দিলে উন্মাদ রোগে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

যাঁহাদিগকে মস্তিষ্কের কার্য্য বেশী করিতে হয় তাঁহাদের পক্ষে কুষ্মাণ্ডের বীজের শস্য বিশেষ উপকারী। তাঁহারা যদি প্রত্যহ দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় বীজের শস্য একটু মধুসহ সেবন করেন, তাহা হইলে অতীব উপকার পাইবেন।

বীজ শস্যের হালুয়া—বীজ শস্য বেশ করিয়া পেষণ করিয়া একটু ঘৃতে ভাজিয়া জাগদুগ্ধে সিদ্ধ করিতে হইবে। ঐ সঙ্গে কিছু কিসমিস দিয়া পরে আবশ্যকমত চিনি মিশাইয়া ও তাহাতে অল্প বাদামচিনি, ছোট এলাইচ, তেজপাতা দিয়া যখন 'ঘষঘষে' মত হইবে তখন নামাইয়া লইবে। ঐ হালুয়া অতীব পুষ্টিকর ও মস্তিষ্কের বলদায়ক। দুর্ব্বল ব্যক্তিরা ইহা প্রত্যহ কিছু পরিমাণে খাইলে সবল হইবেন।

কুষ্মাণ্ডের বীজের শস্য দুই আনা, ব্রাহ্মীশাকের রস এক তোলা একটু মধুসহ সেবন করিলে মস্তিষ্ক শীতল হইয়া থাকে ও মেধা এবং স্মৃতি-শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

মূত্ররোগে—সুপক্ক কুষ্মাণ্ডের বীজ শীতল জলসহ বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে প্রস্রাব বেশ পরিষ্কার হইয়া থাকে।

কুষ্মাণ্ডের শস্যের রস ও কিঞ্চিৎ যবক্ষার বেশ করিয়া মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিলে প্রস্রাব পরিষ্কার হইয়া থাকে।

উদরাধ্মানে—কুষ্মাণ্ড শস্যের রস পেটে মর্দ্দন করিলে পেটকাঁপা ভাল হইয়া থাকে ও প্রস্রাব রোধ হইলে প্রস্রাব সরল হইয়া থাকে।

ক্রিমিতে—কুষ্মাণ্ডের বীজের শস্য দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় চুণের জল সহ সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষ করিয়া ইহা পৃথুক্রিমি (Tape worms) নাশক।

পারদ সেবন জন্য দোষ নিবারণার্থ—প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে এক তোলা হইতে দুই তোলা মাত্রায় সুপক্ক কুষ্মাণ্ড শস্যের রস সেবন করিলে পারদ সেবন জনিত বিবিধ দোষ দূরীভূত হইয়া থাকে। মারক দ্রব্য সেবন জনিত মত্ততা নিবারণার্থ কুষ্মাণ্ড শস্যের রস পান হিতকর।

বিশেষ কথা এই যে সুপক্ক কুষ্মাণ্ড ও কচি কুষ্মাণ্ড ইহাদের গুণ পৃথক। সমস্ত সময় কুষ্মাণ্ড টিকসই পাওয়া যায় না; সেজন্য ইহার গুণ সেরূপ হয় না। তদকারীর জন্য কচি কুষড়া লইতে হয়; ঔষধার্থ সুপক্ক কুষড়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কুষ্মাণ্ড সম্বন্ধে শাস্ত্রকার নিম্নলিখিত গুণ বর্ণনা করিয়াছেন।

কুষ্মাণ্ডঃ বৃংহণঃ বৃষ্যঃ গুরু পিত্তাস্রবাতজুৎ।
বালঃ পিত্তাপহঃ শীতঃ মধ্যমঃ কফকারকম্।
বৃদ্ধঃ বাতিত্রিদোষঘ্নঃ সক্ষারঃ দীপনঃ লঘু।
বস্তিশুদ্ধিকরঃ চেষ্টো রোগঘ্নঃ সর্ব্বদোষজিৎ।

অর্থঃ পক্ক কুষড়া শরীরের পুষ্টিবর্দ্ধক, শুক্রকর, ঈষৎ গুরুপাক, রক্ত-পিত্ত ও বায়ুনাশক। কচি কুষড়া পিত্তনাশক ও শীতল, মধ্যম কুষড়া কফকর। সুপক্ক কুষড়া অতি শীতল নহে, মিষ্টাম্ল ও ক্ষারযুক্ত; অগ্নিদীপক ও লঘুপাক। ইহা প্রস্রাব পরিষ্কারক শ্লেষ্মনাশক ও ত্রিদোষ শান্তিকারক।

নিষ্ফল সম্ভাবনা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

গল্প, গল্প—একটা গল্প চাই—ক'দিন ধরে' সত্যপ্রিয় অবিশ্রান্ত এই কথা ভাবছে। আকাশের কাছে, বাতাসের কাছে, সমস্ত দিক্-দেবতার কাছে প্রার্থনা করছে: একটা গল্প দাও। রাত্তিরে আলো নিবিয়ে দিলে রাস্তার গ্যাসের আলো তা'র মশারির ওপর এসে পড়ে; ঘুমের আগে সেই দিকে তাকিয়ে সে বলে: ঈশ্বর, একটা গল্প দাও। রাস্তা দিয়ে যখন চলে, দু'দিকে ভালো করে' তাকাতে-তাকাতে যায়: একটা মোটার চলে' গেলে ভেতরের আরোহীদেরকে যেটুকু পারে দেখে নেয়—যদি কোথাও কোনো গল্প পাওয়া যায়। বাস্-এ যখন চলে, অন্যান্য যাত্রীদের কথাবার্ত্তা শোন্‌বার জন্য কান পেতে থাকে—অসম্ভব নয়, ও-সব অসংলগ্ন, বিচ্ছিন্ন আলাপ থেকে হঠাৎ কোনো গল্পের সূত্র পাওয়া যেতে পারে। কোনো একটা কথা মনে এসে লাগ্‌লো; তারপর—কোনো লোককে দেখেছি, বন্ধুর মুখে কোনো ঘটনা শুনেছি, চট্ করে' নিজেকে তা'র মধ্যে বিস্তৃত করে' দিলাম, কল্পনা উঠ্‌লো উত্তেজিত হ'য়ে, মনের কলের চাকাগুলো দ্রুতগতিতে ঘুরছে—বেরিয়ে এলো এক পুরোদস্তুর, ফিট্‌ফাট্, ঝক্‌ঝকে গল্প। এই মানসিক প্রক্রিয়া সত্যপ্রিয় ভালো ক'রেই জানে। ক'দিন ধরে' এই প্রক্রিয়াকে নিজের মধ্যে চালনা করবার জন্য সে কী চেষ্টাই না করছে! মনটাকে ঠিক সুরে বাঁধ্‌বার জন্য কখনো এ-বই, কখনো ও-বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে; চুপচাপ বসে' সিগ্রেট ধ্বংস করছে; মস্তিষ্ককে রীতিমত হাতুড়ি-পেটা করে' ছেড়েছে; কিন্তু বৃথা, গল্প আসে নি। জোর করে' ভালোবাসা হয় না; মনের ওপর জোর চলে না। তা'র মনেরও যেন কী হয়েছে—একেবারে বেঁকে বসেছে, কিছুতেই কাজ করবে না। তা'র মস্তিষ্কে কী-রকম একটা অসাড়তা, বৈরক্ত এসেছে; সেই সূক্ষ্ম যন্ত্রের চাকাগুলি যেন আটকে গেছে; কোনো রকম উত্তেজনার সাড়া দিতে পারছে না; কল্পনার আগুন ধরতে চাইছে না। অথচ, গল্প একটা তা'র তৈরি করা চাই-ই—যত শীগ্‌গির পারে। চাতের টাকা ফুরিয়ে এসেছে। আর দিন কয়েকের মধ্যে গল্প লিখ্‌তে না পার্‌লে তা'র সংসার অচল হ'য়ে পড়্‌বে। এ-মাসে এরি মধ্যে পনেরো টাকা ধার হ'য়ে গেছে—আর করা যায় না। নব-প্রকাশিত এক মাসিকপত্র তা'র কাছে লেখা চেয়ে রেখেছে; একটা গল্প তা'দের হস্তগত করতে পার্‌লেই কিছুদিনের জন্য অন্তত দম পাওয়া যাবে। তারপর—পরের কথা পরে, এখন থেকেই তা'র জন্য ভেবে লাভ নেই। সম্প্রতি, একটা গল্প দরকার। একটা গল্প!

কিন্তু কোথায় গল্প? তিনটে দিন কেটে গেলো—একটি লাইনও তা'র লেখা হ'লো না। কাগজ কলম নিয়ে বস্‌তেই পার্‌লো না। কী করে' যে কাটালো তিনটে দিন, নিজের কাছেও তা'র হিসেব দিতে সে পার্‌বে না। একটা নতুন বই পড়ে নি; খুব যে একটা আড্ডা দিয়েছে, তা-ও নয়। বসে' শুয়ে' কুঁড়েমি করে,' কিছু না করে' ক্লান্ত হ'য়ে সময় কাটিয়ে দিয়েছে। এ-ক'টা দিন সে যেন সম্পূর্ণরূপে বাঁচেও নি। কী-রকম এক মোহ তা'কে আচ্ছন্ন করেছে, বুদ্ধিতে গাঢ় জড়তা; হঠাৎ সে আতঙ্কে শিউরে ওঠে: তা'র মানসিক মৃত্যু হচ্ছে না তো? হয়-তো এ-ই শেষ, হয়-তো তা'কে দিয়ে আর-কোনো লেখা হ'বে না। যতই সে এ কথা ভাবে, ততই এক বিশাল হতাশা তা'কে অভিভূত করতে থাকে; লেখা ব্যাপারটা ততই আরো অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। তারপর মনের সমস্ত শক্তি একত্র করে' সে নিজেকে বিশ্বাস করাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে যে, এ-অবস্থাটা নিতান্ত সাময়িক বই কিছু নয়, কেটে গেলো বলে'। তা'র শরীর ক'দিন থেকে ভালো যাচ্ছে না—হয়-তো সেটাই কারণ। এই মেঘলা ওয়েদারে মন অনেক সময় এম্‌নিই নির্জ্জীব হ'য়ে পড়ে—রোদ উঠ্‌লেই আবার সেরে যায়। আর, স্বাভাবিক ক্লান্তির জন্যেও অবিশ্যি এ-রকম হ'তে পারে; লিখ্‌তে তো আর তা'কে কম হয় না, কত আর লেখা যায়! আপিসের বা

যে-কোনো রুটিন-বাঁধা কাজ অনায়াসে রোজ করে'-যাওয়া যায়; মানসিক অবস্থার মূল্য তারজন্যে সে-কাজের কিছু আসে-যায় না; আর, ইচ্ছা কি অনিচ্ছা, আনন্দ কি বিতৃষ্ণার কথা তো ওঠেই না; কারণ, ও-সব কাজ কখনো কেউ ইচ্ছে করে,' আনন্দ নিয়ে করে না; নিস্পৃহ, বীতরাগভাবে সহ্য করে' যায় মাত্র। কিন্তু লেখার কথা আলাদা; সেটা সম্পূর্ণরূপে মনের ইচ্ছার ওপর, মুডের ওপর নির্ভর করে; আকাশের অবস্থা, কোনো অপ্রিয় লোকের সাহচর্য্য, দৈপ্রহরিক নিদ্রা, কি আরো তুচ্ছ কোনো কারণ মনটাকে বিগড়ে দিতে পারে। আর, তা ছাড়া এমন এক-একটা সময় আসে, যখন দিনের পর দিন লেখা হয় না, লেখার কথা ভাবা যায় না, লিখতে ইচ্ছে করে না। তখন মনকে ছুটী দে'য়া ছাড়া আর উপায় থাকে না; বিশ্রাম পেয়ে মন স্বতঃই যথোচিত অবস্থায় ফিরে' আসে। এখন যদি সত্যপ্রিয় দিনকয়েক নিশ্চিন্ত আরামে অবকাশ যাপন করতে পারে, তা হ'লেই—সে জানে—পরে আর তা'কে লেখবার জন্য ভাবতে হ'বে না। নিশ্চিন্ত আরাম! অবকাশ! বটেই তো। ও-সব কথা তা'র মুখেই তো মানায়, একটা দীর্ঘ উপন্যাসের উপার্জ্জনে যা'র টায়ে-টুয়ে দু'মাসের খরচ চলে। বাঁচবার জন্য, বেঁচে থাকবার জন্য অবিশ্রান্ত, অনবরত লিখে' যেতে তা'কে হ'বেই। পয়সার মধ্যে কিছু টাকা তা'র না হ'লেই নয়; যেমন করে' হোক্, একটা গল্প তা'কে দাঁড় করাতেই হ'বে।

এক'টা দিন ধিক্কার, যন্ত্রণায়, আত্ম-ধিক্কারে কেটেছে—আর সহ্য করা যায় না, যা থাকে কপালে, একবার আরম্ভ করে' তো দে'য়া যাক্, এই আচ্ছন্নতার জাল তো ছিন্ন হ'বে। আর-কিছু না হোক্, সেটাই লাভ। মরীয়া হ'য়ে সত্যপ্রিয় আজ লিখতে বসেছে। তিন দিন বাদলার পর আজ রোদ উঠেছে; সকালে ঘুম থেকে উঠে'ই সত্যপ্রিয়র বেশ একটু প্রফুল্ল বোধ করছিলো। তখনি সে ভাবলে, এ-সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। চা খেতে-খেতে সে মনে-মনে একটা খসড়া তৈরিও করে' ফেললে। একটা নির্দ্দোষ, নিরামিষ প্রেমের গল্প লিখবে—সেমি রোমান্টিক। কোনো ঝাঁঝ থাকবে না, ঝাল থাকবে না—মিষ্টি গল্প, চকোলেটের মত, সিরাপের মত, গ্লুকোসের মত মিষ্টি। লিখতে খুব সোজা হ'বে, সময় লাগবে কম: তা ছাড়া, কাগজটার আবার একটু শুচিবাই আছে—সেদিক থেকেও নিরাপদ হ'বে। মনে-মনে সে একরকম ঠিক করে' আন্‌লে, কিন্তু লিখতে বসতে বিশেষ উৎসাহ পাচ্ছিলো না। সেই সময় যা হোক্ তা'র এক বন্ধু এসে উপস্থিত হ'লো—বাঁচলো সে। কাজে বাধা পেয়ে কেউ কখনো এত খুসি হয় নি। গল্পে-গল্পে সকালটা গেলো কেটে—কিন্তু তা'র কী দোষ? সে তো লিখতোই, অসুখোষটা এসেই তো মাটি করে' দিলে।

কিন্তু দুপুরবেলা আর ফাঁকি চললো না; লিখতে না-বসবার কোনো অছিলাই সে আবিষ্কার করতে পারলে না। সুতরাং, বাধ্য হ'য়ে তা'কে আরম্ভ করে' দিতে হ'লো। প্রথম পৃষ্ঠাটা অত্যন্ত নিরুৎসাহে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে লেখা হ'লো; এক লাইন লেখে আর ভাবে—ইস্, কতক্ষণে শেষ হ'বে! লিখতেই যখন তা'র এত খারাপ লাগছে, সে ভাবলে, তখন পড়তে না জানি আরো কত খারাপ লাগবে। কিন্তু না—যেটুকু লিখেছে, সে একবার পড়ে', দেখলে—মোটেই অপাঠ্য হয় নি। লিখতে খুব বেশি অভ্যেস থাকলে এই একটা লাভ হয় যে যে-কোনো রাবিশ বেশ পঠনীয় করে' চালিয়ে দে'য়া যায়। বাঙলা দেশের পাঠক যে কত অল্পে খুসি, তা ভেবে অবাক্ হ'তে হয়।

নিজের মনে একটু হেসে সত্যপ্রিয় আবার লিখতে আরম্ভ করলে। এইবার একটু-একটু করে' তা'র আত্ম-সচেতন ভাবটা দূর হ'য়ে গেলো; এতক্ষণে তা'র মন সত্যি-সত্যি কাজ করতে আরম্ভ করেছে, গল্পটা নিজের মধ্যেই জমে' আসছে। কাগজের সঙ্গে প্রায় মাথা ঠেকিয়ে দ্রুতগতিতে লিখতে-লিখতে সে টের পেলো, তা'র মা ঘরে ঢুকে টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু সে মাথা তুলে' একবার তাকালেও না।

একটু পরে তা'র মা ডাকলেন, 'এই, সতু,' কিন্তু সতু মাথা তুললো না। আরো একটু অপেক্ষা করে' মা আবার বললেন 'শোন্, একটা কথা আছে।'

"কী, বলো।' কাগজ থেকে চোখ না তুলে'ই সত্যপ্রিয় বললে।

'রাণীর পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে; ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে।'

সত্যপ্রিয় বললে, 'হুঁ।'

'বিপিনবাবুর স্ত্রী আজো আমাকে বল্‌ছিলেন,' মা ভয়ে ভয়ে কথাটা পাড়্‌লেন. 'এই আষাঢ়ের মধ্যেই ওঁরা মেয়ের বিয়ে দিতে চান্।'

কণ্ঠে মেজাজ ঠিক রেখে সত্যপ্রিয় বল্‌লে, 'তা বেশ তো; তোমার আমার তা'তে কী?' বলে' এমন ভাব করে' লিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌লে, যেন এর পরে আর এ-বিষয়ে কোনো দিক থেকেই কিছু বলা যেতে পারে না।

মা একটু চুপ করে' থেকে সাহস করে' একেবারে ঝাঁপ দিলেন: 'তুই রাণীকে বিয়ে কর্ না।' সত্যপ্রিয় হাতের কলম রেখে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিলে। তারপর স্থির দৃষ্টিতে মার মুখের দিকে তাকিয়ে শান্তস্বরে বল্‌লে, 'না।'

'তা কর্‌বি কেন? যেমন কপাল তোর, তেম্‌নি হ'বে তো। তুই একেবারে হতভাগা. লক্ষ্মীছাড়া—জীবনটাই তোর কষ্টে কাটবে, বেশ পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি। এ বিয়েটা কর্‌লে তুই বেশ সুখে থাক্‌তে পারিস্ কিনা, তা তুই কর্‌বি নে। যা তুই চাস্, তা-ই ওঁরা দিতে রাজি। এম্‌নি টাকা নিতে না চাস্, বিলেতে পড়্‌বার খরচও ওঁরা দিতে পারেন। আর তা ছাড়া, কল্‌কাতায় একটা বাড়ি—সেটাই কি কম কথা? টাকার জোরই তো জোর;—তা যদি না থাকে, ভারি তো হ'বে তোর বিদ্যে আর বুদ্ধি দিয়ে। তুই এখনো ভেবে ছাখ্—'

'কী ছাই তুমি প্যান্‌প্যান্ কর্‌ছো!' সত্যপ্রিয় আর আত্মসংযম বজায় রাখ্‌তে পার্‌লে না, 'তুমি যাও এখান থেকে—দেখ্‌তে পাচ্ছো না, আমি কাজ কর্‌ছি?'

'কাজ—খুব এক কাজ পেয়েছিস্ যা হোক্। কলম-বাজি করে' কদ্দিন আর চালাবি তুই শুনি? লিখ্‌তে-লিখ্‌তে পিঠ তো কুঁজো হ'য়ে গেলো, চোখ তো যাচ্ছে গর্ত্তে বসে'। দু' টাকা পাঁচ টাকার জন্য ক্যা-ক্যা করে' এখান থেকে ওখানে ঘুরে'-বেড়ানো—এরি জন্যে কি তুই এত লেখাপড়া শিখেছিলি? টাকাই যদি না হ'বে, তা হ'লে পরীক্ষাগুলো পাশ না কর্‌লেই হ'তো! তখন সবাই পই-পই করে' বল্‌লে, আই-সি-এস্ কি বি-সি-এস্ যা হোক্ একটা পরীক্ষা দে;—না, ছেলের তা'তেও মন উঠ্‌লো না। এই তো নির্ম্মল মিত্তির ডেপুটি হ'য়ে গেছে—এখন আর ওকে পায় কে? ও কি তোর চেয়ে বড় একটা ভালো ছেলে! সবারি একটা কিছু হ'য়ে যাচ্ছে, তুই-ই শুধু না খেয়ে মর্‌ছিস্। লক্ষ্মীছাড়া আর কা'কে বলে!'

মা-র এ সমস্ত প্রলাপ ও বিলাপ শুনে' সত্যপ্রিয় অভ্যস্ত; অন্য সময় হ'লে সে মোটে গ্রাহ্যই কর্‌তো না, কথাগুলো ভালো করে' তা'র কানেও ঢুক্‌তো না। কিন্তু এখন—ঠিক যখন গল্পটা তা'র জমে' আস্‌ছে (আর যে-গল্প অন্ন-সংস্থানের জন্য লিখ্‌তে হচ্ছে), এখন এ-রকম বিশ্রী বাধা পেয়ে তা'র মাথায় রক্ত চড়ে' গেলো; জ্বলে' উঠে' বল্‌লে, 'হয়েছে, অনেক হয়েছে; তুমি এখন যাও, যাও এখান থেকে।'

কিন্তু মা-ও বোধ হয় একেবারে মন স্থির করে' এসে-ছিলেন—এতেও ঘাব্‌ড়ালেন না। বরং মিষ্টি করে' বল্‌তে লাগলেন, 'আমি বলি, শোন্—পাগ্‌লামি করিস্ নে। রাণীকে তুই বিয়ে কর্। তোর মত ছেলে বিলেত যেতে পার্‌লে অনেক-কিছুই কর্‌তে পার্‌বে—তোর বাবা বেঁচে থাক্‌লে যেমন করে'ই হোক্ তোকে কি আর না পাঠাতেন! আমার কথাটা রাখ্—তোরি ভালোর জন্য বল্‌ছি, আমার কী? আমি তো দু'দিন পরেই চোখ বুজ্‌বো। টাকা নিতে তোর আপত্তি? বেশ তো, মনে কর্ না, কেউ তোকে বিলেতের খরচের টাকাটা ধার দিচ্ছে, ফিরে' এসে তুইও তো বড় হ'তে পার্‌বি—তখন শোধ দিয়ে ফেল্‌লেই হ'বে। এতে কোথায় যে অপমানের কী আছে, আমি তো বুঝ্‌তে পারি নে। আর, ও-সব যদি তুই না চাস্, বিপিনবাবু চেষ্টা কর্‌লে তোকে একটা চাকরিও জুটিয়ে দিতে পার্‌বেন—তবু তো একটু সুস্থির হ'তে পার্‌বি। তুই আজ যে-রকম কষ্টে পড়েছিস্, তা কি আমারি খুব ভালো লাগ্‌ছে দেখ্‌তে? লক্ষ্মী, এ বিয়েতে তুই মত দে।'

'উঃ, তোমার যন্ত্রণায় আমি পাগল হ'য়ে যাবো, মা! এক মুহূর্ত্ত কি তুমি আমাকে শান্তিতে থাক্‌তে দেবে না?'

'ছাখ্, বিপিনবাবুদের বেজায় গরজ, কিন্তু তাঁরা বেশি আর দেরি কর্‌তে পার্‌বেন না। ওঁরা বল্‌ছিলেন, তুই যেন অন্তত একবার মেয়েটিকে গিয়ে দেখে আসিস্।'

'দেখ্‌বো আবার কী? ও-মেয়েকে তো আমি প্রায় রোজই দেখি। ওঁদেরকে তুমি বলে' দিয়ো, মা, যে এখন আমি বিয়ে কর্‌বো না; আর যদি বা করি, ওঁদের মেয়েকে কিছুতেই কর্‌বো না।'

'আহা—হা, কথার কী ছিরি! তা তো বটেই—যাতে তোর ভালো হ'বে, এমন-কোনো কাজ কি তুই কখনো কর্‌তে পারিস্! একবারো যদি তোকে দেখ্‌তুম, বুদ্ধিমানের মত একটা কাজ কর্‌তে। খালি কতকগুলো বই গিল্‌তেই শিখেছিলি - তা ছাড়া আর এক ছিটে বুদ্ধিও যদি থাক্‌তো! চিরকালই তোর ও-ভাবে কাট্‌বে—'

'থামো, মা,' সত্যপ্রিয় অনাবশ্যক রকম বেশি শব্দ করে' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, 'হয় তুমি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে' যাও, নয় আমি যাই। তোমার সঙ্গে থাকা আর আমার পোষাবে না।'

• • • •

গেলো—চুলোয় গেলো, গোল্লায় গেলো গল্প, মেঘের মধ্যে উড়ে' অদৃশ্য হ'য়ে গেলো, টুক্‌রো-টুক্‌রো হ'য়ে হারিয়ে গেলো দশদিকের বাতাসে। লেখাটা বেশ সহজভাবে আস্‌ছিলো, বাধা না পেলে এ-বেলার মধ্যে অনেকটা লিখে' ফেল্‌তে পার্‌তো। কিন্তু—উঃ, কেন পৃথিবীর লোক এমন নির্ব্বোধ হয়? মা মুখ-ভার করে' বকুলবাগানে তাঁর 'দিদি'র বাড়ি চলে' গেছেন; সে-ই তো গেলেন—একটু আগে গেলেই হ'তো। এখন বাড়ীতে সে একা; কিন্তু মনটা এমন বিশ্রী, বেসুরো হ'য়ে গেছে, কী যে কর্‌বে, সত্যপ্রিয় ভেবে উঠ্‌তে পার্‌ছিলো না; কিছু চীনে বাসন ভাঙ্‌তে পার্‌লে ভালো লাগ্‌তো। একটা সিগ্রেট ধরিয়ে সে অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি কর্‌তে লাগ্‌লো। আজ প্রথম নয়, অনেক দিন ধরে'ই মা তা'র কানে সুর ভাঁজ্‌ছেন: বিয়ে কর্, বিয়ে কর, তা হ'লেই তোর সব দুঃখ ঘুচ্‌বে। কোনো এক নবযৌবনা, পরমা-সুন্দরী উচ্চ-শিক্ষিতা ধনী-কন্যার পাণি-গ্রহণ—পার্থিব সমস্ত ব্যাধির সে-ই হচ্ছে ধন্বন্তরি। জীবন-জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। সর্ব্বজ্বর-গজসিংহ। শুধু তা'র মা-ই নয়, যেখানে তা'র যে আত্মীয় আছে, সবাই তা'কে এই বিশল্যকরণী সেবন করাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। তা'র বি-এ পাশ কর্‌বার সময় থেকে এ-ব্যাপার চল্‌ছে। পরীক্ষায় তা'র ফলটা আশাতীত রকম ভালো হ'য়ে গিয়েছিলো, সেইজন্যই বোধ হয়। তা না হ'লে, তা'র প্রতি কন্যাপক্ষের এমন উগ্র উন্মুখতার আর কী কারণ থাক্‌তে পারে? প্রথমে এলো হাজ্‌রা-রোডবাসী এক ব্যারিস্টর-দুহিতা—জুনিয়র (না সিনিয়র? ও দুটো ব্যাপার সে ভালো করে' বুঝে' উঠ্‌তেই পার্‌লো না) কেম্‌ব্রিজ পাশ; টেনিস খেলে, পিয়ানো বাজায়, ফরাসী বলে—মাগো, ভাব্‌তেই ভয় করে। বিস্তর পয়সা; সে যদি বিয়ে করে, ব্যারিস্টর-সাহেব তা'কে বিলেত থেকে 'তৈরি করিয়ে' আন্‌তে রাজি আছেন। বাকি জীবনের জন্য সে পয়সা-ওলা আভিজাত্যের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যাবে—কিছু আর ভাব্‌তে হ'বে না। সে-ফাঁড়া যদি বা কাট্‌লো, এলেন মৈমনসিং-এর এক জমিদার। একমাত্র মেয়ে তাঁর; মনের মত ছেলে পেলে এক্ষুনি মেয়েকে পাত্রস্থ কর্‌তে রাজি। বড়লোকের ছেলের ওপর—বোধ হয় নিজের দিয়ে বিচার করে'—তাঁর গভীর অনাস্থা; সাধারণ ঘরের কোনো লেখাপড়া-জানা ছেলে পেলে তিনি ধন্য হ'য়ে যান্। মেয়েটি অবিশ্যি একটু ছোট—সবে তেরোয় পড়েছে, কিন্তু বয়েস তো আর কারো জন্যে বসে' থাকে না। আর, দেশে ছিলো বলে' লেখাপড়া শেখ্‌বারো বিশেষ সুযোগ পায়নি; তা বিয়ের পরেও কি আর শিখিয়ে না নে'য়া যায়! ভদ্রলোক নিজে সত্যপ্রিয়র কাছে এসে-ছিলেন—উঃ, কী অসম্ভব টাক ভদ্রলোকের! তারপর রেঙ্গুনের সেই কন্ট্রাক্টরের মেয়ে—নামটা তা'র মনে আছে, মাডিস্;—চেহারা দেখে নাকি মেমসাহেব না বাঙালী চেন্‌বার জো নেই; ইংরিজি বলে নাকি পঞ্জাব মেইলের এঞ্জিনের মত। গায়ের রঙ্ আগুনের মত—না, গিনি-সোনার মত? কোন্‌টা, ভুলে' গেছি। যা-ই হোক, সোনার মত মেয়েই বটে। সোনার মেয়ে—ছেলেবেলায় সত্যপ্রিয় এক কবিতা লিখেছিলো:

শোনো গো সোনার মেয়ে,
আমার পরাণ অধীর হয়েছে তব মাণিক-পানে চেয়ে।

কিন্তু এখানে সোনার মেয়ে মানে একটু আলাদা; মানে, এ-মেয়ে তা'র সমান ওজনের সোনার তুল্য—ভয়ানক ব্যাপার। ঐশ্বর্য্যের এমন-কোনো দুর্গম শিখর নেই, সত্যপ্রিয়র চোখের সাম্‌নে যা তখনকার মত তুলে' ধরা না হয়েছিলো। বেচারা সত্যপ্রিয়! এততেও নিস্তার নেই—শেষ পর্য্যন্ত তা'দেরি রাস্তায়, দুটো বাড়ি ছেড়ে উল্টো দিকের বাড়িতে—এই রাণী! যেন এম্‌নিই জীবনে যথেষ্ট দুঃখ নেই, তা'র ওপর এই উপদ্রব এসে না জুট্‌লে চল্‌তো না। এই রাণীকে নিয়ে মা তা'র জীবন দুর্ব্বিসহ

ওপারের ডাক

শিল্পী—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

করে' তুললেন একেবারে। বিপিনবাবু রাইটার্স্ বিল্ডিংস্-এর একজন হোম্‌রা-চোম্‌রা, যথেষ্ট পয়সা জমিয়েছেন। তা'র ওপর, অনেক সরকারী চাকরির স্বর্গের চাবি নাকি তাঁর হাতে। এ পর্য্যন্ত যত আক্রমণ হয়েছে, তা'র মধ্যে এটাই সব চেয়ে মারাত্মক, লাছোড়বান্দা; এঁদের প্রতি-বেশিতাই হয়েছে বিষম বিপদের। মেয়ের মা-র সঙ্গে মা-র আবার এক অদ্ভুত বন্ধুতা হয়েছে; এবং তা'র ফলে সত্যপ্রিয়র জীবনের আর শান্তি নেই। মা-র ক্লান্তিহীন প্যান্‌প্যানানি শুনে'-শুনে' তা'র মাথা খারাপ হ'য়ে গেলো। রাণীকে বিয়ে না করলে এমন এক সুযোগ সে হারাবে, যা জীবনে কখনো ফিরে' আসবে না, এ কথা নানা যুক্তি-তর্কের সাহায্যে মা তা'কে বুঝিয়ে দিয়েছেন! রাস্তা দিয়ে যেতে-আসতে মাঝে মাঝে দোতলার বারান্দায় মেয়েটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে সে দেখেছে; মেয়েটি তা'কে দেখে সরে' ঘরের ভেতর চলে' গেছে। এবং এ জিনিষটি সত্যপ্রিয়র ভালো লাগে নি। কেন? সে একজন রাস্তার লোক মাত্র, তা'র প্রতি এ-সম্মান কেন? তা'র মনে কেমন একটা বিশ্রী অস্বস্তি খচ্‌খচ্ করতে থাকে;—রাণী নিশ্চয়ই তা'কে চেনে, এবং রাণীর সঙ্গে যে তা'র বিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে, তা-ও তা'র না জান্‌বার কোনো কারণ নেই। হয়তো মেয়েটি মনে-মনে—ছি-ছি, এ কী অন্যায়! যেন দু' বাড়ির মধ্যে গোপনে এটা ঠিক হ'য়ে গেছে যে বিয়ে হ'বেই।

টাকা, টাকা, টাকার দরকার—সত্যপ্রিয় ভাবতে লাগলো—খুবই দরকার, তা ঠিক; কিন্তু তাই বলে' বিয়ে! হে ঈশ্বর, তার আগে মৃত্যু হোক্। বিয়ে যদি সে কখনো করেই, ভালোবাসার জন্যেই করবে; আর, সে-সুযোগ যদি না-ই হয়, না-হয় নিছক শারীরিক প্রয়োজনের তাগিদে করবে; কিন্তু টাকার জন্যে—তা সে কখনো পারবে না, তার প্রকৃতিতে সে-অত্যাচার সইবে না। তার আত্ম-সম্মান-বোধে, প্রায় প্রবৃত্তির মত গভীর ও মূলগত নীতিজ্ঞানে সে-চিন্তা প্রচণ্ড আঘাত করে। বরং সে রাশি-রাশি বাজে কাগজে ঝুড়ি-ঝুড়ি বাজে গল্প লিখে' যাবে; বরং সে মেয়ের ছদ্মনামে যৌন-বিজ্ঞানের বই লিখবে। হয়-তো তা'র পক্ষে এটা বোকামিই হচ্ছে; যে বেচে দিতে চায়, তা'র কাছ থেকে নেবেই বা না কেন?—বিশেষ, সে প্রত্যাখ্যান করলে যখন আর-একজন সেটা লুফে' নেবে। এটা হচ্ছে তা'র মা-র যুক্তি। হ্যাঁ, টাকার জন্য অনেক ছেলে বিয়ে করে বই কি; তেম্‌নি, অনেক মেয়েও তো টাকা নিয়ে ভালোবাসে। আর তা ছাড়া, যুক্তি দিয়ে, ব্যবসাবুদ্ধি দিয়ে, ঠাণ্ডা মাথার গণনা দিয়ে তা'কে হারিয়ে দে'য়া খুবই সোজা হ'তে পারে, নিজের সমর্থনে তেমন কোনো জোরালো তর্কেরই সে অবতারণা করতে পারবে না। কারণ, এটা তর্কের বিষয় নয়; এক-একজন লোক এক-একটা কাজ করতে পারে না; সে-অক্ষমতা প্রকৃতিগত, মজ্জাগত। যেমন, এ-ব্যাপারটা সে করতে পারবে না; এটা কোনো তত্ত্বের কথা নয়, কার্য্যকারণঘটিত যুক্তির কথা নয়, নিছক অক্ষমতা। টাকা—হ্যাঁ, টাকা দরকারী জিনিষ; টাকায় সুখ হয় বটে—একটা সীমা পর্য্যন্ত। যত বেশি টাকা, তত বেশি সুখ, এ-কথা ভুল। সুখের পক্ষে যে-জিনিষের প্রয়োজন সব চেয়ে বেশি, সে হচ্ছে নিজের স্বাধীনতা, স্বাধীনভাবে বাঁচবার অধিকার। নিজের মন যা'তে সায় দেয় না, জোর করে' তেমন কোনো কাজ করলে—আপাতত তা যতই শুভ ফলপ্রসূ হোক্, শেষ পর্য্যন্ত জীবনের মূলের তা উচ্ছেদ-সাধন করে,—না করে'ই পারে না। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনো কোনো কাজ করতে নেই, সেটাই একমাত্র অন্যায়। নিজের ইচ্ছা অনুসারে বাঁচতে না পারলে কোনো অবস্থাতেই যে সুখ হ'তে পারে না, এই অতি সাধারণ কথা মা-কে সে কী করে' বোঝাবে? কী করে' সে বোঝাবে যে এত অভাবে, এত কষ্টেও সে—হ্যাঁ, সুখী, সুখী বই কি। এই জীবন সে সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় বরণ করে' নিয়েছে—চোখ খোলা রেখে, এর সমস্ত দারিদ্র, বিপদ সম্পূর্ণরূপে জেনে। সম্পূর্ণরূপে এ জীবনকে সে স্বীকার করে' নিয়েছে; এর বিরুদ্ধে তা'র কোনো অভিযোগ নেই। সমস্ত দুঃখের মধ্যেও, তাই, সে সুখী। তা'র অন্তরে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, নিজের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন মৈত্রীতে সে জীবন-যাপন করছে। এমন-কোনো মূল্যবান জিনিষ পৃথিবীতে নেই, যা'র জন্য এই সুখ হারানো যায়। না, সে অনুতাপ করে না; এই স্বাধীনতা নিয়ে যদি দারিদ্র্যে তা'র জীবন কেটে যায়, সে নিজেকে খুব ক্ষতিগ্রস্ত মনে করবে না। নিঃসংশয়ে সে বুঝেছে,

এই তা'র পথ। বারো বছর বয়েস পর্য্যন্ত তা'র মনে সন্দেহ ছিলো; মন ঠিক করে' উঠ্‌তে পারে নি। চার বছর বয়েসে—সে মনে কর্‌তে পারে—তা'র জীবনের অ্যাম্‌বিশন্ ছিলো সার্কাসের ক্লাউন্ হওয়া। তারপর একদিন এক ব্যাণ্ড্‌পার্টি দেখে সে মত পরিবর্ত্তন কর্‌লে—যে যা-ই বলুক্, ব্যাণ্ড্‌মাষ্টারই সে হ'বে। সেটা শীগ্‌গির দূর হ'য়ে এলো—যেমন সব ছোট ছেলেরই এসে থাকে—এঞ্জিন-ড্রাইভারের যুগ; যে-এঞ্জিনটা বাইরে থেকে উঁকি মেরে দেখ্‌তেও গা-ছম্‌ছম্ করে, সেখানেই সব সময় বসে' থাক্‌বে, কলকব্জাগুলো সত্যি-সত্যি হাত দিয়ে ছোঁবে, যত খুসি নাড়াচাড়া কর্‌বে—কেউ কিচ্ছু বল্‌বে না। ওঃ, কী ভয়ানক! তারপর—যখন তা'র লেখাপড়া শেখ্‌বার সময় এলো—বিদ্যার একটু স্বাদ পেয়েই তা'র উচ্চাভিলাষ অন্যদিকে ধাবিত হ'লো। সে হাইকোর্টের জজ হ'বে, অত বড় চাকরি আর নেই; সবার ওপরে পঞ্চম জর্জ্জ, আর তার পরেই হাইকোর্টের জজ। জজিয়তি অবস্থাটা তা'র অনেকদিন ছিলো। তারপর হঠাৎ একদিন—তখন তা'র বয়স বছর দশেক হ'বে—সে এক অদ্ভুত কাণ্ড কর্‌লে; এক পদ্য লিখে' ফেল্‌লে। একটা পদ্য লিখে' থামা যায় না; সে আরো লিখ্‌লে, আরো, আরো। রোজ দুপুরবেলা বসে' সে পদ্য লিখ্‌তো;—দেখ্‌তে-দেখ্‌তে খাতার পর খাতা ভরে' উঠ্‌লো। বারো বছর বয়েসে সে একেবারে মন স্থির করে' ফেলেছে—সে লেখক হ'বে। শেষ পর্য্যন্ত তা'র ব্যত্যয় হয় নি; লেখকই সে হ'লো। ষোলো বছরের মধ্যে সে পদ্য-পদ্য মিলিয়ে যা লিখেছিলো, তা একত্র করে' ছাপালে অন্তত হাজার পৃষ্ঠার একটা বই হয়। ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে তা'র বাবা গেলেন মারা; লাইফ্-ইন্‌সিয়োরেন্স্-এর সামান্য টাকা নিয়ে তা'র মা আর সে একা পড়্‌লো। সেই টাকায় কলেজের শেষ বছর পর্য্যন্ত কষ্টে তা'দের চলেছে। অবিশ্যি তা'র নিজের রোজগারও ছিলো;—কলেজে জলপানি, লেখার আয়। সমস্ত মন দিয়ে সে অবিশ্রান্ত লিখে' গেছে। সে লেখক, লেখাই তা'র জীবনের কাজ। বি-এ পাশ কর্‌বার আগে তা'র দুটো বই বেরিয়ে গেলো। পরীক্ষার ফল যখন বেরুলো—শৈশবের পর এই প্রথম তা'র মনে মুহূর্ত্তের জন্য দুর্ব্বলতা এলো। খানিকটা অন্য লোকের প্ররোচনায়, খানিকটা লোভ সাম্‌লাতে না পেরে সে ভাব্‌লে: আচ্ছা, আই সি-এস্‌টা দিয়ে দেখা যাক্ না। সে পরীক্ষার সব নিয়ম কানুন আনালে; ঐ পর্য্যন্তই। আই-সি-এস্ দিলে হয়-তো সে হ'য়ে যেতো, কিন্তু তা'র বদলে সে নতুন একটা উপন্যাস লিখ্‌লে। লীন হ'য়ে গেলো মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা। যথাসময়ে এম্-এ পাশ কর্‌বার পর সে আবিষ্কার কর্‌লে যে তা'দের হাতে আর এক পয়সাও নেই; এখন তা'র উপার্জ্জনের ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর। দেশে দুর্দ্দিন; ইস্কুলমাষ্টারি ছাড়া অন্য যে-কোনো কাজ দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে উঠেছে। তা'র যা কাজ, সত্যপ্রিয় তা'তে আরো জোর দিয়ে লাগ্‌লো। কতটুকুই বা তা'দের দরকার, তা-ই মেটাতে—কী কষ্ট! হোক্ কষ্ট, তবু—এতে মজা আছে। এই তা'র ভালো লাগে। এই স্বাধীনতা, সংগ্রামের উত্তেজনা, নিজের শক্তি-পরীক্ষার আনন্দ—এ-সব জিনিষ কোনো এক বড়লোকের মেয়ের বাপের কাছে বেচে' দেবে কিনা সে,—সে, সত্যপ্রিয় বিশ্বাস! মা, মা, তুমি একটু বুঝ্‌তে চেষ্টা করো।

দীর্ঘ দুপুরবেলাটা একেবারে মাটি হ'লো; কোনো কাজ হ'লো না। নিজের মনে খানিকক্ষণ ছট্‌ফট্ করে' সত্যপ্রিয় বিছানায় শুয়ে' একটা বই পড়্‌বার চেষ্টা কর্‌তে-কর্‌তে ঘুমিয়ে পড়্‌লো। জাগ্‌লো—মা যখন চা তৈরি করে' তা'কে ডাক্‌লেন। মা'র মুখের অপ্রসন্ন ভাব তখনো কাটে নি। দিনে ঘুম সত্যপ্রিয়র সয় না; শরীরে আর মনে একটা বিশ্রী অসুস্থ ভাব নিয়ে সে উঠে' বস্‌লো। পাঁচটা বাজে। উঃ, প্রায় দু' ঘণ্টা সময় সে ঘুমিয়ে নষ্ট কর্‌লো—যে-ঘুমের কিছুমাত্র শারীরিক প্রয়োজন ছিলো না। দু' ঘণ্টা—এ-সময়ে অন্তত চারটে পৃষ্ঠা লেখা যেতো, ভালো একটা বই পড়া যেতো। তা'র বেজায় রাগ হ'লো—কিন্তু কা'কে সে দোষ দেবে, নিজকে ছাড়া? নিজের ওপর রাগ করে' সে ঝগ্‌ড়া কর্‌লো চায়ের সঙ্গে; তা'র মা তা'কে অত্যন্ত নির্দ্দোষ কী-একটা কথা বল্‌তেই খিট্‌খিট্ করে' উঠ্‌লো, অনাবশ্যক উদ্ধতার সহিত ঘোষণা কর্‌লে যে এক্ষুনি সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, আর ফির্‌বে রাত বারোটায়, তা'র ভাত চাপা দিয়ে রাখ্‌লেই চল্‌বে। মেজাজ ঠাণ্ডা করতে গিয়ে সে ভালো করে' চা-টাও

খেতে পারলে না—ও-রকম বিচ্ছিরি, পাৎলা চা খেয়ে মানুষ বাঁচে? ও-রকম চা খাওয়ার চাইতে ক্লীন একদিন মরে' যাওয়া ভালো। গন্‌গন্ করতে-করতে সে বাথ্‌রুমে ঢুকে' মুখ-চোখ ধুয়ে' এলো; কিন্তু কাপড় বদ্‌লাতে গিয়ে ভাখে, বাক্সে আর ফর্সা কাপড় নেই। তা'র ভয়ানক ইচ্ছে হ'লো, কাউকে মাথায় এক বাড়ি দিয়ে খুন করে' ফেলে। নাঃ, এ-রকম হ'লে আর বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই; ধোপা যে ধোপা, সে-ও তা'র জীবন বিষময় করে' তোল্‌বার চক্রান্তে সহায়তা করছে। অসম্ভব, অসম্ভব—আর পারা যায় না। মা তা'কে একটা অপেক্ষাকৃত ফর্সা কাপড় এগিয়ে দিলেন—সে সেটা ছুঁড়ে' ফেলে দিলে। কী আর আসে-যায়—নোঙরা জামা-কাপড়ই তা'র ভালো। সে যখন ডুবছে, ভালো করে'ই ডুবুক্। হাতের কাছে যে পাঞ্জাবিটা পেলো, সেটাই সে গায়ের ওপর চড়িয়ে দিলে। পাঞ্জাবিটা আধ-ময়লা, ইস্ত্রী নষ্ট হ'য়ে গেছে—লক্ষ্য করে' সত্যপ্রিয়র মনে রীতিমত আনন্দই হ'লো। বেশের অপরিচ্ছন্নতা দিয়ে সে যেন কোন্ দুর্জ্ঞেয় শত্রুর ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে। চুলও সে আঁচ্‌ড়ালে না, দু'দিন আগে বুরুশ-করা জুতোর ভেতর পা ঢুকিয়ে এঞ্জিনের মত ফোঁসফোঁস করতে করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো।

পূর্ণ থিয়েটারের কাছে গিয়ে সে দাঁড়ালো—একটা খোলা দোতলা বাস্-এর জন্য; গ্রীষ্মের সন্ধ্যার গরীবের ও-ই তো সব চেয়ে বড় বিলাসিতা। বেজায় ভিড় হয়; যেদিন বেশি গরম থাকে, বাস্‌গুলো সব ডিপো থেকেই ভর্ত্তি হ'য়ে বেরোয়; চড়কডাঙার মোড়ে আস্‌তে আস্‌তেই আর বস্‌বার জায়গা থাকে না। অন্যান্য দিন সে ডিপোর দিকে হাঁটতে-হাঁটতে এগিয়ে গিয়ে বাস্ ধরে; কিন্তু আজকে তার এক পা হাঁটতে ইচ্ছে করছে না; স্টপের কাছে সে দাঁড়িয়েই রইলো। কিন্তু বাস্-এর দেখা নেই। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনেরো মিনিট কাটলো—একটা খোলা আসছে না। পর-পর চার-পাঁচটা খোলা কালি-ঘাটের দিকে চলে' গেলো। অ—ফুল্! বাস্-সিণ্ডিকেটের এ-আচরণ অসহ্য। তোমাদের স্বদেশী লোকদের হাতে যা গেছে, তা'রি কী অবস্থা! কল্‌কাতার বাস্-সার্ভিস হচ্ছে আমাদের জাতীয় জীবনের একটা মূর্ত্তিমান কলঙ্ক। এই বাস্-সার্ভিস নিয়ে আবার আমরা স্বাধীনতা-স্বাধীনতা করে' আস্ফালন করি! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সত্যপ্রিয়র পা ধরে' গেলো। যাক্—ঐ বুঝি একটা দেখা যাচ্ছে। ওটা আবার পাঁচ নম্বর, ওপরটা শিখদের নোঙরা পাগ্‌ড়িতে আচ্ছন্ন;—তা হোক্, ওতেই সে যাবে। গাড়িটা এসে দাঁড়ালো। ওঠ্‌বার আগে দৈবাৎ সে একবার পকেটে হাত দিলে—এ কী! অন্য পকেট দেখ্‌লো—যা ভেবেছে! মান্থলি টিকিটটা আন্‌তেই সে ভুলে গেছে; সঙ্গে একটা পয়সা নেই। এ-ভুল তা'র কখনো হয় না, কিন্তু আজকে—

আজকে যে এ-রকম হ'বে, তা আর আশ্চর্য্য কী? সমস্ত দিনের সঙ্গে ব্যাপারটা বেশ মানিয়ে গেছে। এখন আবার যাও বাড়ি ফিরে'—উঃ, কোথায় তা'র বাড়ি, ভাব্‌তে পারে না। কিন্তু না গিয়ে উপায়ও নেই। কোনোদিকে না তাকিয়ে সে হন্‌হন্ করে রাস্তা পার হ'য়ে গেলো; মনে-মনে ক্ষীণ একটু আশা ছিলো, হয় তো কিছু একটা এসে তা'কে চাপা ফেল্‌বে। তা'র গা ঘেঁষে একটা ট্যাক্সি চলে' গেলো—আর ইঞ্চির জন্য তা'কে বাঁচিয়ে গেলো। সমস্ত পৃথিবী একত্র হ'য়ে তা'র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে; তা'কে জব্দ করতে, বিপর্য্যস্ত করতে, নিরাশ করতে সবাই উঠে'-পড়ে' লেগেছে; সে যা চায়, তা কখনো হ'বে না। বাস্-রাস্তা থেকে তা'র বাড়ি কতদূর—পথ আর ফুরোয় না। নাঃ, বাড়িটা না বদ্‌লালে আর চলছে না। বিচ্ছিরি এক বাড়ি—দক্ষিণটা একেবারে বন্ধ, একটু যদি হাওয়া আস্‌তো। রাত একটা-দেড়টা অবধি রাস্তায় উড়েদের হল্লা চলেইছে—ঘুমোয় কা'র সাধ্যি। তার আবার ইলেক্‌ট্রিক বিল নিয়ে বাড়িওলার সঙ্গে খিটিমিটি চলছেই—একটা পাখা আন্‌তে দেবে না। অসম্ভব—ও-বাড়িতে আর থাকা অসম্ভব।

সমস্ত সৃষ্টিকে অভিশাপ দিতে-দিতে সে তা'র ঘরে গিয়ে—ঠিক ঢুক্‌লো না, ঢুক্‌তে গিয়ে দরজার কাছে থম্‌কে দাঁড়ালো। টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে বই-পত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। বাইরে তখনো দিনের আলো; ঘরের ভেতর আধো অন্ধকার। মেয়েটিকে সে স্পষ্ট চিন্‌তে পারলো; আর-কেউ নয়, রাণী, ও-বাড়ির মেয়ে রাণী। রাণী একেবারে তন্ময় হ'য়ে আছে, তা'র পায়ের শব্দ টের

পায় নি। সত্যপ্রিয় চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলো—না, তা'র মা বাড়ি নেই। কী মুস্কিল, এখন সে কী করে? ঐ টেবিলের ড্রয়ারেই যে তা'র টিকিটটা রয়েছে। দরজার কাছেই সুইচ্‌টা ছিলো, সে হাত বাড়িয়ে সেটা টিপ্‌লে।

রাণী ভীষণ রকম চম্‌কে মুখ ফেরাতেই তা'র চোখ একেবারে সত্যপ্রিয়র মুখের ওপর এসে পড়্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে তা'র সমস্ত রক্ত মুখ টুক্‌টুকে লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। সত্যপ্রিয়র মনে হ'লো, ভালো করে' সে মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থাকে। কিন্তু সময় পেলো না; পরমুহূর্তেই রাণী অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। শুধু তা'র আঁচলের কি চুলের একটা ক্ষীণ, অবর্ণনীয় গন্ধ ঘরের হাওয়ায় ঘুরে' বেড়াচ্ছে। মুহূর্তের স্বপ্ন। সত্যপ্রিয় ব্যাপারটা ভালো করে' উপলব্ধি কর্‌তেই পার্‌লে না। নিজের মনে এটা যেন সে ঠিক বিশ্বাস করে' উঠতে পার্‌ছে না।

খানিকক্ষণ সে যেখানে ছিলো, ঠায় সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর—রাস্তা দিয়ে একটা ট্যাক্সি গেলো, তা'র হর্ণের শব্দে তা'র চমক ভাঙ্‌লো। আস্তে-আস্তে সে একটা চেয়ারে গিয়ে বস্‌লো। এর মানে কী? এর মানে কী? তা'র জন্যে কি ফাঁদ পাতা হচ্ছে? এ কি তা'কে আট্‌কাবার একটা কৌশল? কিন্তু তা'র মুখের ওপর রাণীর সেই সচকিত, লজ্জাভারাক্রান্ত দৃষ্টি স্মরণ করে' কিছুতেই সে সে-কথা মনে কর্‌তে পার্‌লে না। কোনো সন্দেহ নেই, রাণী লুকিয়ে তা'র ঘরে এসেছিলো; বাড়িতে কেউ নেই, তা জেনেই এসেছিলো। মা হয়-তো তা'দেরি বাড়িতে। কেন এসেছিলো সে? কেন? টেবিলের ওপর বইগুলো দেখ্‌ছিলো—কোনো বই চেয়ে নিতেও তো পার্‌তো। কিন্তু তা'কে দেখেই রাণী যে-রকম ঘাব্‌ড়ে গেলো! তা'র লাল হয়ে-ওঠা, ছুটে-পালিয়ে-যাওয়া এ-সবের মানে কী? মানে কী? মানে বোকা অত্যন্ত সোজা। সে কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই আসে নি; এবং তা'র পক্ষে এখানে এ-ভাবে আসা যে অন্যায়, সে-বিষয়ে সে সম্পূর্ণরূপে সচেতন। সেই অপরাধের মধুর চেতনাই তা'র রক্তিম মুখকে অমন সুন্দর করে' তুলেছিলো। মেয়েটি যে কত সুন্দর, তা সত্যপ্রিয় কখনো ভাবে নি। এর আগে দূর থেকে তা'কে দেখেছে মাত্র—এবং দূর থেকে একজন যুবকের চোখে সব যুবতীই কম কি বেশি এক রকম দেখায়। মা'র কাছে সে শুনেছে বটে যে রাণী খুব সুন্দর দেখ্‌তে—শুন্‌তে শুন্‌তে তা'র মুখ পাগল হ'য়ে যেতে বাকি ছিলো। হ্যাঁ—সুন্দর বটে। কী চোখ—আর কী ভুরু। মুহূর্তের বিদ্যুৎ-ঝলকের মত তা'র দৃষ্টির সাম্‌নে উদ্ভাসিত হ'য়ে মিলিয়ে গেলো; শাড়ির ফিকে নীল রঙ্‌টা স্বপ্নের স্মৃতির মত, তা'র চোখে লেগে রয়েছে। আর, আঁচলের কি চুলের সেই গন্ধ—এখনো যেন তা সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায় নি। ঠিক তা'র গা ঘেঁষে রাণী দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো, হঠাৎ তা'র নাক চুল্‌বুল্ করে' উঠেছিলো—মনে কর্‌তে সত্যপ্রিয়র মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে' উঠ্‌লো।

বাস্-এর টিকিটটা পকেটে ফেলে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌লো—খানিক আগে ওই রাস্তা দিয়েই সে গিয়েছিলো—সে-ই কি? সমস্ত দিন কী হয়েছে—কী করেছে না করেছে, সব তা'র মনে আব্‌ছা। সে যেন একটা স্বপ্নের ভেতরে হাঁট্‌ছে। এই, এই মেয়ে, রাণী, যা'কে সে ইচ্ছে কর্‌লেই বিয়ে কর্‌তে পারে। কী চোখ, আর কী ভুরু! ভাব্‌তে ভাব্‌তে তা'র মনে নেশা ধরে' গেলো। রাণী একটা কথাও বল্‌লে না—কেমন ওর গলার স্বর? যদি কথা কইতো, কী কথা কইতো? ওর সঙ্গে আলাপ করা যায় না? ও কি আর-একদিন আস্‌বে—সন্ধ্যের আগে সত্যপ্রিয় যখন একা বাড়ি বসে আছে? না কি সে-ই যাবে, যাবে ওদের বাড়িতে? ওর সঙ্গে আলাপ কর্‌লে ওকে ভালোবাসা বোধ হয় খুব কঠিন হ'তো না। আর রাণী—ও তো আজ স্পষ্ট ধরাই পড়ে' গেলো। অদ্ভুত এই বাঙ্গালী মেয়েরা; প্রত্যক্ষভাবে যাকে চেনেও না—শুধু বিয়ের কথাবার্তা হ'চ্ছে, এই কারণে—ছি ছি, এ কী অন্যায়। কথাবার্তা হচ্ছে মানে কী? বিয়ে তো কখনোই হ'বে না—রাণীর মাথায় এ-সব ঢোকালে কে?

কখনোই হ'বে না? না, যে-ভাবে অদৃষ্ট ওদেরকে পরস্পরের কাছে এনে ফেলেছে—তা'তে, কখনোই নয়। শুধু রাণী যদি বিপিনবাবুর মেয়ে না হ'তো—যে-বিপিনবাবু মত চাকরি করেন, জামাইকে যিনি বিলেতের খরচ দিতে চান্, টাকা দিয়ে কিনে' রাখ্‌তে চান্। শুধু যদি এমন না হ'তো যে রাণীকে বিয়ে করা মানেই এক লাফে পরের ওপর বড়লোক হ'য়ে যাওয়া। শুধু যদি আগে থেকে কোনো কথাবার্তা না হ'তো, যদি রাণীর সম্বন্ধে সে কিছুই না

জান্‌তো, শুধু যদি এম্‌নি কোনোক্রমে তা'র সঙ্গে রাণীর দেখা হ'য়ে যেতো, আলাপ হ'তো! তারপর···একদিন হয়-তো ওরা মনে কর্‌তে পার্‌তো যে ওদের বিয়ে করা দরকার। তা যদি হ'তো—তা হ'লে, রাণীর বাপের যে প্রচুর পয়সা আছে, তা'তেও কিছু এসে-যেতো না। দু'জনের ইচ্ছের যে-বিয়ে, তা'র ওপর আর কোনো কথা চলে না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায়—কী করে', রাণীকে যদি সে এখন বিয়ে করে, নিজের কাছেই তা'র মুখ থাক্‌বে? তা হ'লে, টাকার লোভেই সে বিয়ে করেছে, এ-ব্যাখ্যা কিছুতেই এড়ানো যাবে না। কেন রাণী তা'র মতই গরীব হ'লো না? রাণী যে বড়লোক, এ-ব্যাপারটা বেয়ালের মত তা'কে ঘিরে' রয়েছে; সত্যপ্রিয় একটু এগোতে গেলেই ধাক্কা লাগে।

বাস্-এ করে' অল্প একটু ঘুরে' সত্যপ্রিয় শীগ্‌গিরই বাড়ি ফিরে এলো। খাওয়ার পর বস্‌লো সেই গল্প শেষ কর্‌তে। গল্পের নায়িকার নাম তখনো দে'য়া হয় নি; নাম—রাণীই থাক্। রাণী! যতবার তা'কে কলম দিয়ে রাণী কথাটা লিখ্‌তে হ'লো, বুকের ভেতর অদ্ভুত এক আনন্দ অনুভব কর্‌লো। রাত প্রায় তিনটের সময় গল্প শেষ করে' সে শুতে গেলো। সারাটা ঘুম সে রাণীর কথা চিন্তা কর্‌লে; ঘুমের আড়ালে, স্বপ্নের আচ্ছাদনে বার-বার রাণীর কথা তা'র মনে পড়লো—কী চোখ, আর কী ভুরু!

পরের দিনও তা'র নেশার ঝোঁক সম্পূর্ণ কাট্‌লো না। নানা কাজের ফাঁকে থেকে-থেকে রাণীকে তা'র মনে পড়্‌তে লাগ্‌লো। রাণীকে সে তা'র স্ত্রী-রূপে কল্পনা করে' দেখছে; অবাধ, অসংলগ্ন মন তা'র বিবাহিত জীবনের ছবি আঁক্‌ছে। তা'র ছোট সংসারে আর একজন অংশী—একটি মেয়ে। একটি মেয়ে তা'র কথায়, হাসিতে, বেশে, সৌরভে, চুড়ির টুংটাং শব্দে—তা'র উষ্ণ উপস্থিতিতে সমস্ত বাড়ি আচ্ছন্ন করে' আছে। বাথরুমে ছপ্‌ছপ্ শব্দ হচ্ছে—সে স্নান কর্‌ছে, মাঝে-মাঝে গুন্‌গুন্ গান শোনা যাচ্ছে। আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে কপালে সিঁদুর পর্‌ছে, অলসভাবে শুয়ে'-শুয়ে' সত্যপ্রিয় তা'কে লক্ষ্য কর্‌ছে—তা'র চলা-ফেরা, হাত-তোলা, চোখ তুলে' তাকানো' তা'র শরীরের প্রতিটি ছোট ভঙ্গী তা'র মুখস্থ হ'য়ে গেছে। সত্যপ্রিয় অনেক রাত অবধি জেগে লিখ্‌ছে, রাণী বিছানা থেকে উঠে এলো, নিদ্রা-জড়িত স্বরে বল্‌লে, 'আর নয়, এখন এসো, শোবে।' না হয়—কাজ শেষ করে' সে যখন শুতে গেলো—তা'র পিঠ ব্যথা হ'য়ে গেছে, আঙুলগুলো টাটাচ্ছে, অন্ধকারে একখানা অতি-পরিচিত নরম হাত তা'র বুকে এসে লাগলো। সমস্ত দিন, সমস্ত রাত্রি সেই একটি মেয়ের উপস্থিতিতে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। ভাব্‌তে বেশ লাগে।

কিন্তু নেশা ক্ষণিক; এমন কি, যৌবনের যে-নেশা, ভালোবাসার সম্ভাবনাতেই যা নিবিড় হ'য়ে ওঠে, তা-ও কেটে যায়। সত্যপ্রিয়র নেশাও আস্তে-আস্তে কেটে গেলো। সেই সন্ধ্যার পর তা'র চোখ আর রাণীর ওপর পড়ে নি; এমন কি, রাস্তা দিয়ে যেতে-আস্‌তে বারান্দায় তা'কে দাঁড়িয়ে থাক্‌তেও আর স্বাখে নি। কল্পনা নিয়ে বেশিদিন চলে না; মাটির আশ্রয় না পেলে কল্পনা শুকিয়ে যায়, মরে' যায়। শিগ্‌গিরই এমন সময় এলো, যখন রাণীর অস্তিত্ব সত্যপ্রিয় একরকম ভুলে'ই গেলো। তা'র কথা তা'র আর একবার মনে পড়লো, যেদিন সে শুনলো রাণীর বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেছে। ইউনিভার্সিটির এক ভীষণ নাম-করা ছাত্র, আগাগোড়া ফার্স্ট হয়েছে, বি-ই-এস্‌-এ ঢুকেছে। তার বিলেত যাবার দরকার নেই—দশ হাজার টাকা নিচ্ছে। যাক্, ভালোই—বিপিনবাবু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, মেয়ের বিয়েতে এমন খরচ কর্‌বেন, যা সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। তাঁর সে-ইচ্ছা পূর্ণ হ'লো। তবু সত্যপ্রিয় একবার এ-কথা মনে না করে' পার্‌লে না যে অন্য-কোনো অবস্থায়—যদি তাঁদের অদৃষ্টের পথ অল্প একটু বেঁকে যেতো, যদি রাণীর সঙ্গে তা'র অন্য ভাবে, অন্য কোথায় পরিচয় হ'তো, তা হ'লে সে-ই হয়-তো রাণীকে বিয়ে কর্‌তো, ভালোবেসে, ইচ্ছে করে'ই কর্‌তো; এবং সে-বিয়েতে—তা'রা দু'জনেই হয়-তো সুখী হ'তো। সত্যপ্রিয় খানিকক্ষণ কথাটা ভাব্‌লে; তারপর কলম তুলে' নিয়ে আবার লিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌লো। তা'র বেশি সময় ছিলো না; তা'কে একটা উপন্যাস আরম্ভ কর্‌তে হয়েছে।

মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এম-আর-এ-এস

(২)

কলিকাতায় প্রত্যাগমন

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে রাজকৃষ্ণ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। শিক্ষাবিভাগে তখন এতদ্দেশবাসিগণের উন্নতির বেশী আশা ছিল না দেখিয়া তিনি হাইকোর্টে ওকালতীর সনদ গ্রহণ করিলেন। জুন মাসে তিনি এই উদ্দেশ্যে লাইসেন্স লন।

'বেঙ্গলী' সম্পাদন

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২৪শে সেপ্টেম্বর 'বেঙ্গলী'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক দেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ পরলোক গমন করিলে 'বেঙ্গলী' পত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গিরিশচন্দ্রের মধ্যমাগ্রজ শ্রীনাথ ঘোষ, ও তাঁহার বন্ধু কৈলাসচন্দ্র বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যাচার্য্য চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি সধিয়ান ব্যক্তিগণের সাহায্যে উক্ত পত্রখানিকে জীবিত রাখিয়াছিলেন। শ্রীনাথ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং কয়েক বৎসর পরে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান হন। কৈলাসচন্দ্র রাজস্ব বিভাগে অতি উচ্চ কর্ম্ম (এসিষ্টাণ্ট কণ্ট্রোলার জেনারেলের সহকার্য্য) করিতেন। তারাপ্রসাদ ও চন্দ্রনাথ বাবুরও অবসর অধিক ছিল না। সুতরাং বেচারাম রাজকৃষ্ণকে 'বেঙ্গলী'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। যদিও বেচারাম 'বেঙ্গলী'র সম্পাদক বলিয়া অনেকের নিকট পরিচিত ছিলেন, রাজকৃষ্ণই যথার্থ সম্পাদক ছিলেন। স্যর সুরেন্দ্রনাথ তদীয় আত্মচরিতে যদিও লিখিয়াছেন যে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন 'বেঙ্গলী' পত্র নিজ হস্তে গ্রহণ করেন, তখন বেচারাম উহার সম্পাদক ছিলেন; তিনিই ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গলী'তে রাজকৃষ্ণের মৃত্যুবিষয়ক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন "He was the Editor of this journal before we took charge of it; and it will be for the readers of the Bengalee to say with what conspicuous ability and with what rare and single-minded honesty of purpose, he discharged his editorial duties." "আমরা এই পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন এবং "বেঙ্গলী"র পাঠকেরা অবগত আছেন কিরূপ অসাধারণ নিপুণতাসহকারে এবং কিরূপ অপূর্ব্ব ও একনিষ্ঠ সাধুতার সহিত তিনি তাঁহার সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।"

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও এই সময়ে তৎ-সম্পাদিত 'রেইস এণ্ড রায়ত' পত্রে লিখিয়াছেন "He was long the editor of the Bengalee" 'নেশন' সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং অন্যান্য সংবাদপত্র সম্পাদকগণও তাঁহাকে 'বেঙ্গলী'র সম্পাদক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সেকালে সংবাদপত্রের সামরিক সন্দর্ভগুলিতেও সাহিত্যের উচ্চতম আদর্শ অনুসৃত হইত, এবং যদিও তখন 'বেঙ্গলী' পত্র সাপ্তাহিক ছিল, উহার সম্পাদনের জন্য রাজকৃষ্ণকে যথেষ্ট ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য দেশের ও সমাজের সেবার জন্যই তিনি এই গুরুভার দীর্ঘকাল বহন করিয়াছিলেন; কারণ, তখন সংবাদপত্র-সম্পাদন দ্বারা আর্থিক উন্নতি-লাভের কোনও আশা ছিল না। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বিনামূল্যে এই পত্র বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে গ্রহণ করেন, কেবল দলীলটি আদালত-গ্রাহ্য করিবার নিমিত্ত এটর্ণি রমানাথ লাহা মহাশয় উহাতে দশ টাকা মাত্র মূল্য প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন।

"এডুকেশন গেজেট"

এই সময়ে রাজকৃষ্ণ অধিকন্তু ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেটে' এবং অন্যান্য সাময়িক পত্রে

বাঙ্গালা কবিতাদি প্রকাশিত করেন। কিন্তু যে পত্রের সহিত তিনি দীর্ঘকাল লেখকরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাহার বিষয় পরে বিবৃত হইতেছে।

"বঙ্গদর্শন"

১৮৭২ খৃষ্টাব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। এই বৎসরেই বঙ্গবাণীর বরপুত্র বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত 'বঙ্গদর্শন' পত্রের প্রবর্ত্তন করেন। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ের কথায় লিখিয়াছেন :

"তখন বঙ্গসাহিত্যের যেমন প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত আমাদের সেইরূপ বয়ঃসন্ধিকাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল।

"পূর্ব্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি; কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলে-বকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত। মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গ-সাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস, কত প্রবন্ধ, কত সমালোচনা, কত মাসিক পত্র, কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"

বঙ্গভাষার সেই প্রথম যৌবনোন্মেষকালে যাঁহারা তাঁহার প্রসাধন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজকৃষ্ণের স্থান অতি উচ্চে। বহুতথ্যপূর্ণ, সারগর্ভ, চিন্তাশীল ও মনোজ্ঞ প্রবন্ধে তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠাগুলি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত তদ্বিরচিত Literature of Bengal নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

"Raj Krishna Mukerjee and Chandra Nath Basu were among the most eminent of Bankim Chandra's collaborators, and have written much that is valuable and thoughtful. Raj Krishna was a man of accurate scholarship and learning, and his Prabandhas are marked by a spirit of honest research."

"রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও চন্দ্রনাথ বসু বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠতম সহযোগিগণের মধ্যে গণ্য। তাঁহারা অনেক মূল্যবান ও চিন্তাশীল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। রাজকৃষ্ণ বিশুদ্ধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহার প্রবন্ধসম্পদে সত্যান্বেষিণী গবেষণার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়।"

কিন্তু চন্দ্রনাথ রাজকৃষ্ণের বহুদিন পরে 'বঙ্গদর্শনে'র লেখক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। প্রথম যে চারি বৎসর 'বঙ্গদর্শন' বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত করিয়াছিলেন, তাহাতে চন্দ্রনাথের একটিও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। চন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখিয়াছেন,

"যাহা লিখিতাম, ইংরাজীতেই লিখিতাম। 'বঙ্গদর্শন' পড়িতে ভাল লাগিত, ইচ্ছা হইত উহাতে লিখি: কিন্তু লিখিতে সাহস হইত না। তাহার পর বাঙ্গলায় মন গেল, এবং কলিকাতা রিভিউ নামক ত্রৈমাসিক ইংরাজী পত্রে বাঙ্গালা গ্রন্থের সমালোচনা করিতে লাগিলাম। কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা পড়িয়া বঙ্কিম বাবু বাঙ্গালা লিখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন বঙ্গদর্শন সঞ্জীব বাবুর হাতে। 'বঙ্গদর্শনে' অভিজ্ঞান শকুন্তলের আলোচনা লিখিতে আরম্ভ করিলাম।" বঙ্গদর্শনের সপ্তম বর্ষে চন্দ্রনাথের 'অভিজ্ঞান শকুন্তল'—সমালোচনা প্রকাশিত হয়। রাজকৃষ্ণ প্রথম বর্ষ হইতেই বঙ্গদর্শনের লেখক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন।

'বঙ্গদর্শনে'র অনুষ্ঠানপত্রে নিম্নলিখিত লেখকগণের নাম বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল :

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশনাথ রায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রামদাস সেন এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় মনে হইতে পারে যে যাঁহার অসংখ্য প্রতিভাদীপ্ত প্রবন্ধাবলী বঙ্গদর্শনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এবং উহার প্রভূত গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিল, সেই রাজকৃষ্ণের নাম প্রথমবারে বিজ্ঞাপিত হয় নাই। ইহার

কারণ এই যে বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে যাইবার কয়েক মাসের মধ্যেই রাজকৃষ্ণ পাটনা কলেজে যান, এবং "বঙ্গদর্শনে"র আবির্ভাবের পূর্বে বাঙ্গালা প্রবন্ধকার বলিয়া তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কিন্তু যখন তিনি "বঙ্গদর্শনে" একবার লেখকরূপে আবির্ভূত হইলেন তখন তিনি অনায়াসেই বঙ্কিমমণ্ডলে আপনার গৌরবময় আসন অধিকার করিয়া লইলেন। চন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন: "আলিপুরে বদলী হইলে বঙ্কিম বাবু কলিকাতায় বাসা করিয়াছিলেন। তখন প্রত্যেক ছুটীর দিন বৈকালে ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং আমি তাঁহার বাড়ীতে যাইতাম। নানারসজ্ঞ, গম্ভীর প্রকৃতি, বালকবৎ-সরলতা-শোভিত রাজকৃষ্ণকে বঙ্কিম বাবু যেমন ভালবাসিতেন, তেমনই ভক্তি করিতেন।"

প্রেসিডেন্সি কলেজ রেজিষ্টারে রাজকৃষ্ণকে 'বঙ্গদর্শনের' সহযোগী সম্পাদক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যদিও তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা নাই, 'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদকের উপর যে তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। এতৎ-সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক বিবৃত একটি ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতে পারে। ভারতমহিলার চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া ছাত্রাবস্থায় শাস্ত্রী মহাশয় প্রবন্ধ-পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়গণ কর্তৃক মহারাজ হোলকার প্রদত্ত পুরস্কার পাইবার যোগ্য বিবেচিত হন। লেখকরূপে সুপরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষায় শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদের সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্র 'আর্য্যদর্শন'-সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। কিন্তু প্রবন্ধলেখকের মতের সহিত তাঁহার মতানৈক্য থাকায় তিনি 'আর্য্যদর্শনে' উহা প্রকাশিত করিতে অসম্মত হইলেন। গুণগ্রাহী রাজকৃষ্ণ হরপ্রসাদকে স্নেহ করিতেন। তিনি বলিলেন "তুমি যদি ইচ্ছা কর, আমি উহা 'বঙ্গদর্শনে' ছাপাইয়া দিতে পারি।" হরপ্রসাদ বলিলেন "'আর্য্যদর্শনে' যাহা লয় নাই, 'বঙ্গদর্শনে' তাহা লইবে, এ আমার বিশ্বাস হয় না।" তিনি বলিলেন "সে ভাবনা তোমার নয়।" তাহার পর একদিন কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমের সহিত হরপ্রসাদের পরিচয় করিয়া দিয়া রাজকৃষ্ণ উহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া দেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময় বলিয়াছিলেন "নন্দের ভাই বাঙ্গালা লিখিয়াছে, রাজকৃষ্ণ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, যাহাই হোক আমাকে উহা ছাপাইতে হইবে।" সম্পাদক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ কর্তব্যপরায়ণ এবং 'খাঁটির নাদারত' ছিলেন তাহা সকলেই জানেন। রাজকৃষ্ণের বিচার-শক্তির উপর অটলা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসই যে তাঁহাকে এক কথায় অস্বীকারবদ্ধ হইতে বাধ্য করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্গদর্শনে রাজকৃষ্ণের যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

১।	জ্ঞান ও নীতি	১২৭৯	আষাঢ় ও আশ্বিন
২।	ভাষার উৎপত্তি	„	চৈত্র
৩।	প্রতিভা	১২৮০	আষাঢ়
৪।	কার্য্যকারণ সম্বন্ধ	„	মাঘ
৫।	শ্রীহর্ষ	১২৮১	বৈশাখ
৬।	চার্ব্বাক দর্শন	„	শ্রাবণ ও কার্ত্তিক
৭।	ঐতিহাসিক ভ্রম	„	ভাদ্র
৮।	দেবতত্ত্ব (প্রথম প্রস্তাব)		আশ্বিন
৯।	কোম্‌ত দর্শন	„	পৌষ
১০।	ভারত-মহিমা	„	মাঘ
১১।	সমাজ বিজ্ঞান	„	ফাল্গুন
১২।	দেবতত্ত্ব (দ্বিতীয় প্রস্তাব)	১২৮২	বৈশাখ
১৩।	বিশ্বাপতি	„	জ্যৈষ্ঠ
১৪।	মনুষ্য ও বাহ্য জগৎ	„	আষাঢ়
১৫।	সভ্যতা	১২৮৪	আষাঢ়
১৬।	প্রাচীন ভারতবর্ষ	১২৮৫	শ্রাবণ

এতদ্ব্যতীত রাজকৃষ্ণের কতকগুলি অনবদ্য কবিতাও হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের হীরকের হার সমুজ্জ্বল কবিতানিচয়ের সহিত "বঙ্গদর্শন"কে দীপ্ত করিয়াছিল।

১। "জ্ঞান ও নীতি"। সুপ্রসিদ্ধ পুণ্যাত্মবিৎ বাক্‌ল্ "সভ্যতার ইতিহাস" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই মত সমর্থন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন যে মনুষ্যের জ্ঞানের উন্নতি আছে, নীতির উন্নতি নাই। রাজকৃষ্ণ 'জ্ঞান ও নীতি' নামক প্রবন্ধে অনেক দেশের ও জাতির সামাজিক ইতিহাসের আলোচনা করিয়া প্রমাণিত করেন যে সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত কেবল জ্ঞানের নহে, নীতিরও উন্নতি হইয়াছে।

২। "ভাষার উৎপত্তি।" ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনটী মত আছে, ১ম অপৌরুষেয়ত্ববাদ, ২য় সম্মতিবাদ, ৩য় অনুকৃতিবাদ। অপৌরুষেয়ত্ববাদীরা বলেন যে ভাষা মনুষ্যনির্ম্মিত নহে, ঈশ্বর প্রদত্ত। সম্মতিবাদীরা বলেন যে কতকগুলি লোক পূর্ব্বকালে একত্রিত হইয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছিল যে এই পদার্থের এই এই নাম দেওয়া যাইবে। অনুকৃতিবাদীরা বলেন যে, কোন বস্তু হইতে যে প্রকার শব্দ নির্গত হয়, অথবা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আকস্মিক

পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি

চিত্তাবেগে আমাদের মুখ হইতে স্বভাবতঃ যেরূপ স্বর নিঃসৃত হয়, সেইরূপ শব্দ বা স্বরের অনুকরণে ভাষার উৎপত্তি। রাজকৃষ্ণ তিনটী মত বিচার করিয়া শেষোক্ত মতের সমর্থন করেন। প্রবন্ধ-রচনাকালে অনুকৃতিবাদই প্রবল ছিল, কিন্তু পরে Sayce প্রভৃতি দেখাইয়াছেন উহা অসম্পূর্ণ এবং তদতিরিক্ত সমাজ-সম্মিলনে ভাষার আর একটী উৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৩। "প্রতিভা।" এই প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ বলেন যে প্রতিভা যদিও স্বাভাবিক শক্তি, তথাপি উহা শিক্ষানিরপেক্ষ নহে। "যিনি যে প্রকার শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করুন না কেন, উপযোগী অবস্থায় পতিত না হইলে তাঁহার প্রতিভা বিকশিত হইতে পারে না। একটী সতেজ বৃক্ষও ছায়ায় প্রোথিত করিলে, তাহা সূর্য্য-কিরণাভাবে হতশ্রী ও নিস্তেজ হইয়া যায়। প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ঘটনাসমূহে সমাকৃত হইলে, স্বাভাবিক তেজস্বিতা অন্তর্হিত হয়। প্রতিকূল সংসর্গে

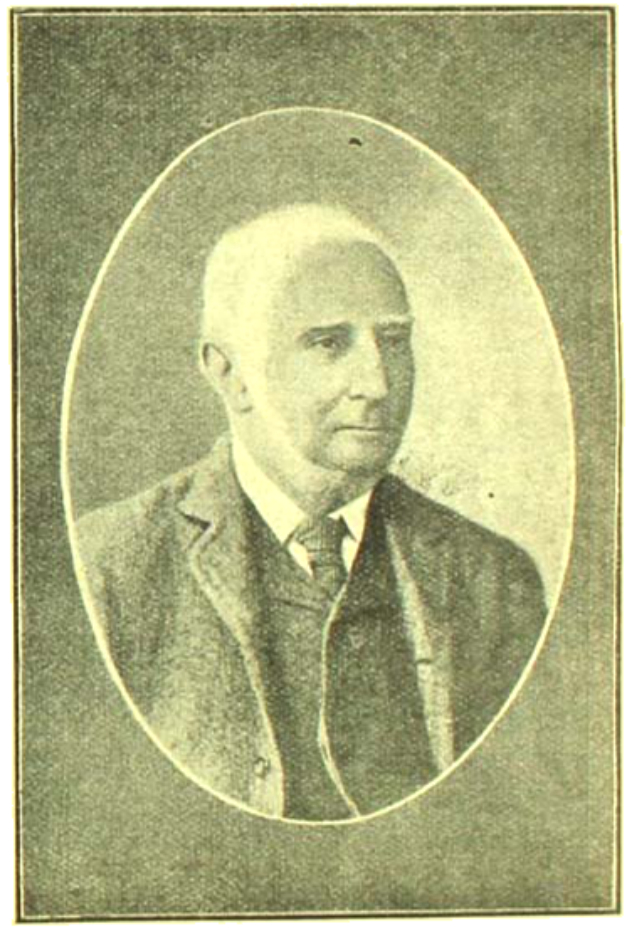

সি-এইচ-টনি

বিপদেরই সম্ভাবনা। * * প্রতিভার বিকাশ নিমিত্ত অনুকূল শিক্ষার প্রয়োজন।"

৪। "কার্য্যকারণ সম্বন্ধ"। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কি প্রকার এবং তদ্বিষয়ে এতদ্দেশীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ দার্শনিকদের মত কতদূর সত্য, তাহা এই প্রবন্ধে প্রদর্শিত হয়।

৫। "শ্রীহর্ষ"। ১২৭১ সালের ফাল্গুন মাসের "বঙ্গদর্শনে" পুরাতত্ত্ববিৎ রামদাস সেন মহাশয় শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ

লিখেন। উহাতে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষ রত্নাবলীর রচয়িতা; এবং আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তন্মধ্যে যিনি চট্টোপাধ্যায়দিগের পূর্ব্বপুরুষ তিনিই নৈষধকার। রাজকৃষ্ণ কতকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন রামদাস বাবুর দুইটী সিদ্ধান্তেই ভ্রম আছে।

৬। "চার্ব্বাক দর্শন।" এই প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ সংক্ষেপে নাস্তিক দর্শনান্তর্গত চার্ব্বাক দর্শনের সমালোচনা করিয়াছেন।

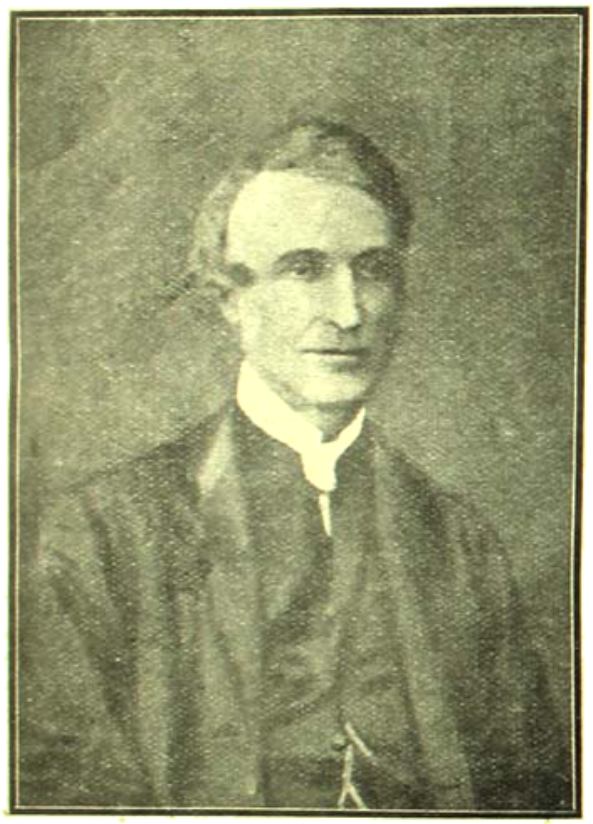

ডাক্তার জেম্‌স্, ওগিল্‌ভি

৭। "ঐতিহাসিক ভ্রম।" প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদেই উহার উদ্দেশ্য বিবৃত হইয়াছে।—"অনেকের মনে তিনটি সিদ্ধান্ত বদ্ধমূল আছে। প্রথমটী এই যে বাঙ্গালীরা কখনও বিদেশ বিজয় করে নাই; দ্বিতীয়টী এই যে, যেদিন যখ্‌তিয়ার খিলিজি সপ্তদশ জন অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে নবদ্বীপে প্রবেশ করিলেন, সেই দিনেই সেন বংশের রাজত্ব বিলুপ্ত এবং সমুদায় বাঙ্গালাদেশ মুসলমানদিগের পদানত হইল; তৃতীয়টী এই যে, মুসলমান ভূপালদিগের সময়ে যে ক্ষমতাপন্ন জমীদারদিগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহারা 'করসংগ্রাহক রাজকর্ম্মচারী ছিল মাত্র। আমরা প্রমাণ করিব যে, এ তিনটী সিদ্ধান্তই ভ্রমাত্মক।" বলা বাহুল্য, যে সকল যুক্তি দ্বারা রাজকৃষ্ণ তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণিত করিয়াছেন তাহা ইউক্লিডের প্রতিজ্ঞা পূরণে অবলম্বিত যুক্তির ন্যায় অকাট্য।

৮ ও ১২। "দেবতত্ত্ব।" কিরূপে হিন্দু দেবদেবীর উৎপত্তি হইল তৎসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গবেষণায় পরিপূর্ণ এই প্রস্তাবটী দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক নূতন আলোক বিকীর্ণ করিয়াছে।

৯। "কোম্‌ত দর্শন।" হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ ষ্টানরেল লব্, আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মনীষিগণ 'বেঙ্গলী' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের উৎসাহে তাঁহার পত্রে সর্ব্বপ্রথম ফরাসী দার্শনিক অগস্ত কোম্‌তের 'ধ্রুবদর্শন'-এর আলোচনা আরম্ভ করেন। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি মনস্বীগণ শীঘ্রই কোম্‌তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বাঙ্গালার কৃতবিদ্য সমাজে কোম্‌ত-দর্শন লইয়া মহা আন্দোলন আরম্ভ হয়। রাজকৃষ্ণ এই প্রবন্ধে সরলভাবে কোম্‌তের প্রধান প্রধান মতগুলির পর্য্যালোচনা করেন।

১০। "ভারতমহিমা।" ভূমণ্ডলের উন্নতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষ কিরূপ সহায়তা করিয়াছেন, এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। যে বিজ্ঞান লইয়াই বর্ত্তমান সভ্য জাতির গৌরব, সেই বিজ্ঞানের মূল গণিত শাস্ত্র ভারতবর্ষেই উৎপন্ন। নয়টী অঙ্ক এবং শূন্যের সাহায্যে সমুদায় সংখ্যা লিখিবার রীতি, পাটীগণিতের দশগুণোত্তর সংখ্যালিখন-প্রণালী, বীজগণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি হিন্দুরাই আবিষ্কৃত করেন। রসায়ন, চিকিৎসা-শাস্ত্রের মূলও ভারতবর্ষে। যে প্রখর প্রতিভা হইতে পাটীগণিত, বীজগণিত ও রসায়ন সমুদ্ভূত, তাহারই গুণে একটী নূতন বর্ণমালারও সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীতে ৩টী বর্ণমালা আছে,—চীনদেশীয়, ফিনিসীয় এবং ভারতবর্ষীয়। কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ এইরূপ উচ্চারণ স্থানভেদে বর্ণোৎপত্তি কল্পিত বলিয়া ভারতবর্ষীয় বর্ণমালাটী যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত অন্য দুইটী তদ্রূপ নহে। বুদ্ধদেব প্রভৃতি মহাপুরুষের জন্ম দিয়া ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে ভারতবর্ষ মনুষ্য সমাজের মহদুপকার করিয়া-

ছেন। ভারতবাসীরা সিংহল, যব ও বালিদ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন এবং অর্ণবপোতে মুক্তা, দারুচিনি, এলাচ, কার্পাস ও রেশমী বস্ত্রাদি পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রেরণ করিতেন। প্রবন্ধের উপসংহারে রাজকৃষ্ণ তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বলেন: "ভারতবর্ষ বহুকাল পর্য্যন্ত অধিকাংশ সভ্য জনপদের কার্পাস ও রেশমী কাপড় যোগাইতেন। ইংরেজদিগের লিখিত গ্রন্থেই দৃষ্ট হয় যে একশত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে ঘরে ঘরে চরকা নৃত্যিত এবং গ্রামে গ্রামে বস্ত্র ব্যবসায়ী লোক ছিল। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। আমরা পরিধেয় বস্ত্রের জন্যও ইংরেজ-

পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

দিগের মুখ চাহিয়া থাকি। ম্যানচেষ্টরের কলের কাপড়ই এখন আমাদিগের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। সকল বিষয়েই এইরূপ। যে দেশে পাটীগণিত, বীজগণিত ও রসায়নের সৃষ্টি, সেই দেশের লোকেরাই এখন বিদেশী বিজ্ঞানের ছিটাফোটা পাইয়াই আপনাদিগের জন্ম সার্থক জ্ঞান করেন। যে দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি, সেই দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সামান্য বিলাতী লেখকদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে গুরু বলিতে লজ্জিত হন না। আর কতকাল এইরূপ চলিবে? হে ভারত সন্তানগণ, ভারতের পূর্ব্ব মহিমা স্মরণ পূর্ব্বক সকলে একবার আপনাদিগের দুরবস্থা মোচনের চেষ্টা কর। তোমরা কি ছিলে এবং কি হইয়াছ, ভাবিয়া কি দেখিয়াছ?"

১১। "সমাজবিজ্ঞান।" এই প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ বলেন "যদি জ্ঞানোন্নতিই সকল উন্নতির মূল হয়, তাহা হইলে জ্ঞানোন্নতির নিয়মই সামাজিক উন্নতির প্রধান নিয়ম হইবে, এবং যে সকল কারণে জ্ঞানোন্নতির সাহায্য করে, সেইগুলি সামাজিক উন্নতিরও সহায় হইবে।"

১২। "বিদ্যাপতি।" বঙ্গভাষার প্রথম ইতিহাস

তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

লেখক মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" রচয়িতা রামগতি ন্যায়রত্ন, মিঃ জন বীম্‌স প্রভৃতি অনেকেই বিদ্যাপতির জন্মস্থান ও আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে ভুল করিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণ এই বহুগবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে প্রমাণিত করেন যে বিদ্যাপতি মৈথিল কবি ছিলেন এবং লক্ষ্মণাব্দের কাল স্থির করিয়া বিদ্যাপতির আবির্ভাব কাল নিরূপিত করেন। বীম্‌স সাহেব Indian Antiquary নামক প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক পত্রে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে

যে ভুল তথ্যের প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা রাজকৃষ্ণের প্রবন্ধ পাঠের পর তিনিই উক্ত পত্রের ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর সংখ্যায় ভুল বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন * :

"It has been usual to speak of this poet as the earliest writer of Bengal and as his language is decidedly Hindi in type, the opinion has been held by myself and others that the Bengali language had at that time not fully developed itself out of Hindi.

This view is very distasteful to Bengalis.

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

who are proud of their language and wish to vindicate for it an independent origin from some local form of Prakrit. They have apparently set to work to search out the age and country of Bidyapati, so as to show whether he was really a Bengali or not.

A very able article has appeared on the subject in the last number of that excellent Bengali magazine the Banga Darsana (no. 2, pt. IV for Joistho 1282, say June 1875). It leaves something to be desired in the shape of clearer indication of the authorities on which the statements are founded and there are some points on which I still feel unsatisfied, but the *main conclusions are*, I think, *unassailable*.

* * * *

One point however I was wrong about and must now abandon. From the expression in Padakalpataru 1317 "pancha Gaurisvaru" I

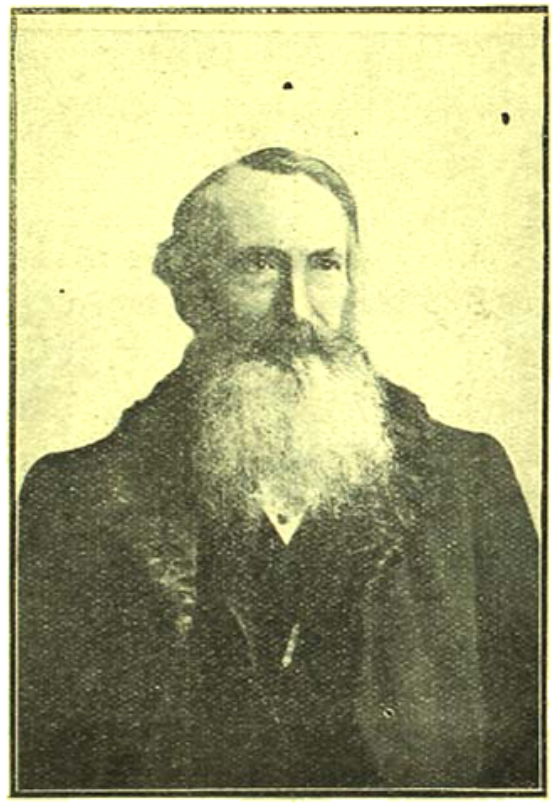

স্যর জন বাড্‌ রিয়ার

and the pandits whom I consulted were led to suppose that the poet resided at Nadiya. ** The conclusion as to the poet's country being Nadiya did not even then seem to us to harmonize with his language.

To solve this question the writer in the Banga-Darsana starts by observing that Bidyapati's contemporary Chandidas writes Bengali and this explodes the theory that Bengali was in that age unformed and closely resembling

* On the Age and Country of Bidyapati By John Beames, B. C. S.

rustic Hindi. After discussing this point he goes on to show, from the celebrated meeting of the two poets that Bidyapati's home must have been in some place not very far from Birbhumy and he has been led by this argument to seek for it in the nearest Hindi speaking province; for if Chandidas being a Bengali wrote Krishna hymns in his mother tongue, it is a fair inference that Bidyapati would also use his mother tongue and as the language he uses is Maithilo Hindi, the conclusion is that he was a native of Mithila. • • •

ডাক্তার এফ-ডব্লে-মৌয়াট

By a happy inspiration he appears to have thought of consulting some learned men of the province of Mithila, which was nearly co-extensive with the modern district of Trihut, occupying the country between the Ganges to the Himalayas and extending on the west as far as the Gundak river and on the east quite up to, if not beyond, the old bed of the Kusi river in Purneah. • • •

As the result of his researches he found that Bidyapati is still well-know in Trihut, and has left some lyrics which are still sung by the people and are in Maithile.

"সচরাচর এই কবি বাঙ্গলার অন্যতম প্রথম কবি বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন, এবং যেহেতু তাঁহার ভাষা নিঃসন্দেহ হিন্দী ছাঁচের, আমি এবং অন্যান্য কোন কোন ব্যক্তির এই অভিমত ছিল যে তখনও পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষা হিন্দী হইতে আপনার বৈশিষ্ট্য লইয়া সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠে নাই।

"বাঙ্গালীর নিকট এ অভিমত রুচিকর হয় নাই। তাঁহারা তাঁহাদের মাতৃভাষার জন্য গর্ব্বিত, এবং উহা যে কোনও স্থানীয় প্রাকৃত ভাষা হইতে স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট

ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হইয়াছে ইহা প্রমাণ করিতে উৎসুক। ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে তাঁহারা বিদ্যাপতির দেশ ও কাল নির্ণয় করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং তিনি যথার্থ বাঙ্গালী ছিলেন কি-না তাহা স্থির করিতে চাহেন।

"বঙ্গদর্শন' নামক উপাদেয় বাঙ্গালা মাসিকপত্রের শেষ সংখ্যায় (২য় সংখ্যা ৪র্থ খণ্ড জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ অর্থাৎ জুন ১৮৭৫) এই বিষয়ে একটি অতি সারগর্ভ সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছে। কোন কোন সিদ্ধান্তের মূলে যে সকল প্রমাণ আছে তৎসম্বন্ধে স্থানে স্থানে আরও একটু স্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকিলে

ভাল হইত এবং যদিও কোনও কোনও বিষয়ে আমি এখনও সন্তোষজনক উত্তর পাই নাই, তথাপি মূল সিদ্ধান্তগুলি, আমার বিবেচনায়, অটুট।

• • • •

"একটি সিদ্ধান্তে আমার ভ্রম হইয়াছিল, তাহা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে। পদকল্পতরুতে উল্লিখিত 'পক্ষ গৌড়েশ্বর' শব্দ হইতে আমি (ও আমার পরামর্শদাতা পণ্ডিতগণ) মনে করিয়াছিলাম যে কবি 'নদীয়া'য় বাস করিতেন। • • • অবশ্য তখনও নদীয়ার কবির বাসস্থান এবং তাঁহার ভাষার সহিত অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

গঙ্গাচরণ সরকার

"এই প্রশ্নের সমাধানারম্ভে বঙ্গদর্শনের লেখক প্রথমেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে বিদ্যাপতির সমসাময়িক চণ্ডীদাস বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য রচনা করিয়াছেন; ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বাঙ্গালাভাষা যে তৎকালে সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠে নাই এবং উহা গ্রাম্য হিন্দীর মত ছিল এই মত ভ্রান্তিমূলক। এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া তিনি কবিদ্বয়ের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সম্মেলন হইতে দেখাইয়াছেন যে বিদ্যাপতি বীরভূমের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে অবস্থান করিতেন এবং এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া বীরভূমির নিকটতম কোন প্রদেশে হিন্দী ভাষা ব্যবহৃত হয় তাহার সন্ধান করিয়াছেন; কারণ যদি চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্ত্তি বাঙ্গালায় লিখিয়া থাকেন তাহা হইলে এইরূপ অনুমান স্বাভাবিক যে বিদ্যাপতিও তাঁহার মাতৃভাষায় রচনা করিয়া থাকিবেন এবং যেহেতু বিদ্যাপতির ভাষা মৈথিল হিন্দী, তিনি যে মিথিলার অধিবাসী এরূপ সিদ্ধান্তও ঠিক। • •

"শুভক্ষণে মিথিলাপ্রদেশে কতিপয় পণ্ডিতের সহিত তিনি পরামর্শ করেন। মিথিলা এখনকার ত্রিহুত জেলার সমবিস্তৃত ছিল (অর্থাৎ উহা গঙ্গা ও হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী

মনোমোহন ঘোষ

প্রদেশটুকু—যাহার পশ্চিমে গণ্ডক নদী এবং পূর্ব্বে পুরাতন কুশী নদী)।

"তাঁহার গবেষণার ফলে তিনি অবগত হইয়াছেন যে বিদ্যাপতি এখনও ত্রিহুতে সুপরিচিত কবি এবং মৈথিল ভাষায় লিখিত তাঁহার কতকগুলি গীতিকবিতা এখনও তত্রত্য অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক গীত হইয়া থাকে।"

বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হইলেও রাজকৃষ্ণ তাঁহাকে বাঙ্গালি কবিগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন, কারণ, তিনি লিখিয়াছেন "বল্লাল সেন বাঙ্গালা দেশ পাঁচ ভাগে বিভক্ত

করেন, তন্মধ্যে মিথিলা এক ভাগ।" রাজকৃষ্ণের এই আবিষ্ক্রিয়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক উচ্চ কণ্ঠে প্রশংসিত হইয়াছিল, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে এক নূতন আলোকপাত করিয়াছিল। বিদ্যাপতির পদাবলীর অন্যতম সম্পাদক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এক স্থানে লিখিয়াছেন * :

"১৮৮২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের বঙ্গদর্শনে স্বর্গগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাতে বিদ্যাপতির প্রকৃত ইতিহাস নির্ণয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। তৎপূর্ব্বে এই কবির সম্বন্ধে লোকে যাহা জানিত, তাহা লোক-প্রবাদ মাত্র। প্রকৃত কথা কেহ জানিত না, জানিবার তেমন কোন প্রয়াসও হয় নাই। রাজকৃষ্ণ বাবু প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, অসামান্য মৌলিক গবেষণা দ্বারা কবির সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণ করিলেন।"

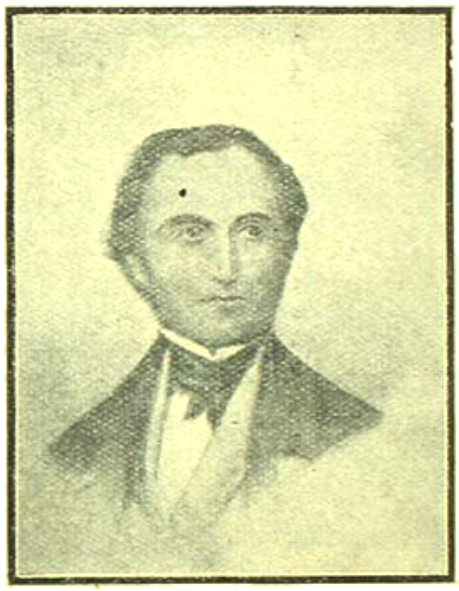

ডন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন

রাজকৃষ্ণের প্রবন্ধ শিক্ষিত বাঙ্গালীকে বিদ্যাপতির পদাবলীর আলোচনায় কিরূপে আকৃষ্ট করিয়াছিল তৎসম্বন্ধে নগেন্দ্রনাথ পুনশ্চ লিখিয়াছেন :

"রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রবন্ধ প্রকাশ হইবার অব্যবহিত পরেই শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' সঙ্কলনে ব্রতী হইলেন। বিদ্যাপতির পদাবলী সঙ্কলন ও টীকা প্রভৃতির ভার সারদাবাবু লইলেন, অবশিষ্ট গ্রন্থসমূহ অক্ষয়বাবু সম্পাদন করেন। পরে বিদ্যাপতির পদাবলী সারদাবাবু স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। * * * সারদাবাবু মেধাবী, সহপাঠিদিগের অগ্রণী, কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ যশস্বী হইয়া এক্ষণে উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। একদিকে রাজকৃষ্ণ বাবুর ন্যায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য, বহু শাস্ত্রবিশারদ, চিন্তাশীল, মনীষী লেখকের আবিষ্কার, অপর দিকে সদ্য পরীক্ষোত্তীর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়-ভূষণ ছাত্রের উৎসাহপূর্ণ আগ্রহ—শিক্ষিত সমাজে বিদ্যাপতির আদর হইবার উপক্রম হইল। এতকাল এই মৈথিল কবি ভিক্ষুক বৈষ্ণবের কণ্ঠে ও কন্যার আশ্রয়

কৈলাসচন্দ্র বসু

লইয়াছিলেন, বটতলায় জীর্ণ মলিন বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, এতদিনে তাঁহার ভদ্রবেশে ভদ্রসমাজে স্থান হইল।"

১৪। "মনুষ্য ও বাহ্য জগৎ।" মানুষ, পূজা করা দূরে থাকুক, অগ্নি, বায়ু, বিদ্যুৎ প্রভৃতিকে দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে। কালে বোধ হয় প্রাকৃতিক শক্তি পরম্পরা এতদূর মনুষ্যের আজ্ঞাধীন হইবে যে তাহা কবিরাও কখন কল্পনা করিতে সাহস করেন নাই।

১৫। "সভ্যতা।" বাঙ্গালার খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২৯শে এপ্রিল বেথুন

* বঙ্গদর্শন (নব পর্য্যায়)—১৩১১

সভায় "বাঙ্গালী সমাজের উপর ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহার এক স্থানে তিনি বলেন—

"It is curious to reflect that the most learned works on European literature and science should be studied and appreciated by the student who sits on a mat, eats with his fingers, does not think it necessary to cover his body, and reads under the light of the primitive lamp."

অর্থাৎ ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে আমরা ইয়োরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান বুঝিতে শিখিয়াছি, অথচ মাদুরে বসি,

শ্রীনাথ ঘোষ

হাত দিয়া আহার করি, সর্ব্বদা গায়ে বস্ত্র রাখি না, ও মৃন্ময় দীপের আলোকে লেখাপড়া করি।

মনোমোহনের বক্তৃতাটী সভায় একটু আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল। এমন কি একজন পাদ্রী রেভারেণ্ড সি, এম্, গ্রাণ্ট বলেন যে বক্তা য়ুরোপীয় সভ্যতার যে উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা কিছু অতিরঞ্জিত। য়ুরোপীয় সভ্যতার সমস্ত কল্যাণকর নয়, উহার অনেক ঘোষ আছে। এতদ্দেশবাসিগণ জাতীয়তা বিসর্জ্জন দিয়া য়ুরোপীয়ের অনুকরণে তাঁহাদের ও স্ত্রীদিগের চরিত্র গঠিত করিলে সমাজের মঙ্গল হইবে না। রাজকৃষ্ণ এই প্রবন্ধে সভ্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে যে সকল অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিবার যোগ্য।

১৬। "প্রাচীন ভারতবর্ষ।" মেগাস্থিনিসের বিবরণ অবলম্বন করিয়া প্রাচীন ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা এই প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ বিবৃত করেন।

রাজকৃষ্ণের সকল প্রবন্ধই তাঁহার অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। তিনি যাহা লিখিতেন তাহার সমর্থনে অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপিত করিতেন। প্রবন্ধের পাদটীকায় পূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ

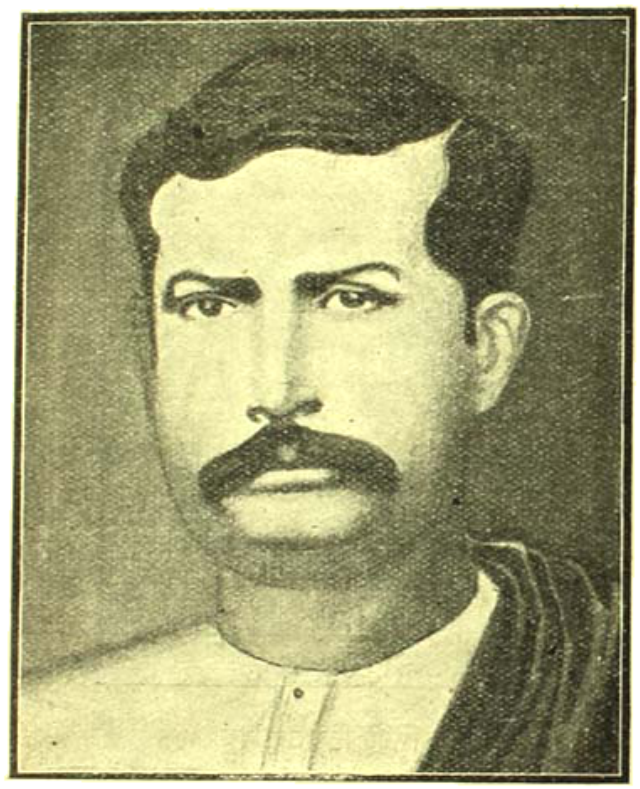

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণের মতের উল্লেখ করিবার প্রথা 'বঙ্গদর্শনে' রাজকৃষ্ণই প্রবর্ত্তিত করেন। এতৎসম্বন্ধে সাহিত্যাচার্য্য চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের নিকট বিবৃত স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :

"এককালে আমাদের লেখকদিগের মধ্যে পাদটীকায় পুস্তকের নামোল্লেখ—authority quote করা রোগের অত্যন্ত প্রাবল্য ঘটিয়াছিল। এখনও সে রোগ একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। আবার এমন অনেক লেখক আছেন, যাঁহারা যে মূল পুস্তক দেখেন নাই—অন্যত্র তাহাতে

প্রকাশিত মতের উল্লেখমাত্র দেখিয়া পাদটীকায় মূল পুস্তকের নামোল্লেখ করিয়া বিদ্যাবাহুল্যের পরিচয় দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাঙ্গালায় ইহার সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে।' রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনিই প্রথম সপ্রমাণ করেন, বিদ্যাপতি মৈথিল কবি ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালীরা বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালী কবি বলিয়াই জানিত। তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র জন্য জ্ঞান ও নীতিবিষয়ক সন্দর্ভ (প্রথম বর্ষ) লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে দিলে তিনি উহা পাঠ করিয়া বলিলেন, 'এই প্রবন্ধে যে সব মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সমর্থন করিয়া authority quote করিলে তবে এ প্রবন্ধ ছাপান যায়।' রাজকৃষ্ণ বাবু তাহাই করিলেন—প্রবন্ধের পাদটীকায় তিনি স্বীয় মন্তব্যের সমর্থনে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ লেখকদিগের মতের উল্লেখ করিলেন। সেই সময় হইতে বাঙ্গালা রচনায় পাদটীকায় এইরূপ নামোল্লেখ আরম্ভ হইল। আর এই প্রথার যে যথেষ্ট অপব্যবহার হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।"

"বঙ্গদর্শনে" রাজকৃষ্ণ যে ষোলটি সুচিন্তিত ও সারগর্ভ সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে চৌদ্দটি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত প্রথম চারি বৎসরের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলি 'বঙ্গদর্শনে'র প্রতিষ্ঠা কতদূর বর্দ্ধিত করিয়াছিল তাহা এক্ষণে বাঙ্গালী পাঠকগণ বোধ হয় বিস্মৃত হইয়াছেন। চারি বৎসর সম্পাদনের পর যখন বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রচার বন্ধ করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন, তখন তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"তৎপরে, যে সকল কৃতবিদ্য সুলেখকদিগের সহায়তাতেই বঙ্গদর্শন এত আদরণীয় হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কাছে আমার অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করিতে হইতেছে। বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বাবু রামদাস সেন, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, বাবু প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির লিপিশক্তি, বিদ্যাবত্তা, উৎসাহ এবং শ্রমশীলতাই বঙ্গদর্শনের উন্নতির মূল কারণ। ঈদৃশ ব্যক্তিগণের সহায়তা লাভ করিয়াছিলাম, ইহা আমার অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।"

"প্রথম-শিক্ষা বীজগণিত"

১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজকৃষ্ণ কেবল 'বেঙ্গলী'তে রাজনীতির আলোচনা এবং 'বঙ্গদর্শনে' কবিতা, ইতিহাস, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। এই সময়ের মধ্যে নানা বিষয়ক কয়েকখানি উপাদেয় গ্রন্থও প্রকাশিত করিয়া মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি সকল শাস্ত্রেই সমান পারদর্শী ছিলেন। কয়েক বৎসর দর্শন ও ব্যবহার-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিবার পর 'বীজগণিত' সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রকাশ ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণের 'প্রথম-শিক্ষা বীজগণিত' প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' এই পুস্তকের সমালোচন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

"ইংরাজী হইতে নূতন একটি শাস্ত্র বাঙ্গালায় সঙ্কলিত করা কত বড় কঠিন কাজ, তাহা যাঁহারা এমন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। বীজগণিত সঙ্কলন, বোধ হয়, অন্যান্য বিষয়াপেক্ষাও কঠিন। এই দুরূহ ব্যাপারে রাজকৃষ্ণবাবু যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাতে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। এমত বিষয়ে এতাদৃশ কার্য্য-সিদ্ধি রাজকৃষ্ণ বাবুর বুদ্ধিপ্রখরতার বিশেষ পরিচয়। রাজকৃষ্ণ বাবু সুকবি, উত্তম আখ্যায়িকার প্রণেতা, সুযোগ্য দার্শনিক, রাজব্যবহার অধ্যাপনায় প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত —এ সকল বিষয়ের পরিচয় পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের দ্বারা গণিতশাস্ত্রেও তাঁহার যে বিশেষ অধিকার আছে, তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। এরূপ সর্ব্বব্যাপিনী বুদ্ধি অতি বিরল। এই গ্রন্থখানি বিদ্যালয়ে ব্যবহার হইবার বিশেষ উপযোগী।"

রাজকৃষ্ণের এই গ্রন্থ এবং "পরিমিতি" নামক আর একখানি গণিত-বিষয়ক গ্রন্থ বহুদিন বাঙ্গালার বিদ্যালয় সমূহে পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল।

"মানস বিকাশ"

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণের "মানস বিকাশ" নামক একটি অভিনব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ২য় বর্ষের বঙ্গদর্শনে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধে উহার সমালোচনা করেন। উক্ত সমালোচনা হইতে আমরা অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই। বরং অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গালায় এই জাতীয় কবিতার আধিক্য। অন্যান্য কবির কথা না ধরিলেও, একা বৈষ্ণব কবিগণই ইহার সমুদ্র বিশেষ। বাঙ্গালার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবি—জয়দেব—গীতি-কাব্যের প্রণেতা। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, এবং চণ্ডীদাসই প্রসিদ্ধ; কিন্তু আরও কতকগুলিন এই সম্প্রদায়ের গীতিকাব্য-প্রণেতা আছেন; তাঁহাদের মধ্যে অন্যূন চারি পাঁচ জন উৎকৃষ্ট কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীকে এই শ্রেণীর কাব্য বলিতে হয়। রামপ্রসাদ সেন আর একজন প্রসিদ্ধ গীতি-কবি। তৎপরে কতকগুলি 'কবি-ওয়ালার' প্রাদুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত অতি সুন্দর। রাম বসু, হরুঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীতি এমত সুন্দর আছে, যে ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই। কিন্তু কবিওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই। আধুনিক কবিদিগের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত একজন অত্যুৎকৃষ্ট। হেমবাবুর গীতি-কাব্যের মধ্যে এমত অংশ অনেক আছে, যে তাহা বাঙ্গালা ভাষার তুলনা-রহিত। অবকাশ-রঞ্জিনীর কবি, আর একজন উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য-প্রণেতা। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত কাব্য-নিচয়ের মধ্যে এক একখানি অতি সুন্দর গীতিকাব্য পাওয়া যায়। সম্প্রতি "মানস-বিকাশ" নামে যে কাব্যগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তৎসম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে।

• • • •

"বঙ্গীয় গীতিকাব্য লেখকদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল, প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন; আর একদল, বাহ্য প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্য হৃদয়কেই দৃষ্টি করেন। একদল মানব হৃদয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বাহ্য-প্রকৃতিকে দীপ করিয়া তদালোকে অন্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত এবং প্রস্ফুট করেন; আর একদল, আপনাদিগের প্রতি-ভাতেই সকল উজ্জ্বল করেন, অথবা মনুষ্য-চরিত্র খনিতে যে রত্ন মিলে, তাহার দীপ্তির জন্য অন্য দীপের আবশ্যক নাই বিবেচনা করেন। প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান বিদ্যাপতি।

• • • •

আধুনিক বাঙ্গালি গীতিকাব্য লেখকগণকে একটি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহারা আধুনিক ইংরেজি গীত কবিদিগের অনুগামী। আধুনিক ইংরেজি কবি ও আধুনিক বাঙ্গালি কবিগণ সভ্যতাবৃদ্ধির কারণে স্বতন্ত্র একটি পথে চলিয়াছেন। পূর্ব্ব কবিগণ, কেবল আপনাকে চিনিতেন, আপনার নিকটবর্ত্তী যাহা তাহা চিনিতেন, যাহা আভ্যন্তরিক, বা নিকটস্থ তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান জানিতেন, তাহার অনুকরণীয় চিত্রসকল রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণকার কবিগণ জ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক, ইতিহাস-বেত্তা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিৎ। নানা দেশ, নানা কাল, নানা বস্তু তাঁহাদিগের চিত্তমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি বহুবিষয়িনী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও বহুবিষয়িনী হইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি দূর সম্বন্ধ গ্রাহিণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও দূর সম্বন্ধ প্রকাশিকা হইয়াছে। কিন্তু এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাঢ়তা গুণের লাঘব হইয়াছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়; মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, বা বিচিত্র, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্ব শক্তির হ্রাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ। যে জল সঙ্কীর্ণকূপে গভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না। 'মানস বিকাশ' এই কথা প্রমাণ করিতেছে। আমরা 'মানস বিকাশ' পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি—'মিলন' ও 'কাল' নামক দুইটি কবিতা উৎকৃষ্ট। 'কাল' হইতে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

সহসা যখন বিধির আদেশে,
সুধাংশু কিরণ শোভি নভোদেশে,
রজত ছটায় ধাইল হরষে, ভুবনময়,
নরনারী কীট পতঙ্গ সহিত
বসুন্ধরা যবে হইল স্থজিত
গ্রহ উপগ্রহ হইল শোভিত হলো উদয়
তখন ত কাল প্রচণ্ড শাসনে,
রাখিতে সকলে আপন অধীনে সব সময়॥

দুরন্ত দংশন কাল রে তোমার
তব হাতে কারো নাহিক নিস্তার,
ছোট বড় তুমি কর না বিচার, বধ সকলে,
রাজেন্দ্র মুকুট করিয়া হরণ,
দুঃখনীরে তুমি কর নিমগন
পদযুগে পরে কর রে দলন, আপন বলে,
সুখের আগারে বিষাদ আনিয়া,
কত শত নরে যাও ভাসাইয়া, নয়ন জলে।

* * * *

'মানস বিকাশে'র কবিতার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতা 'মিলন', কিন্তু তাহার অধিকাংশ উদ্ধৃত না করিলে তাহার উৎকর্ষ অনুভূত করা যায় না।

* * * *

'মানস বিকাশ' অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য নহে—অনুৎকৃষ্টও নহে। অনেক স্থলেই নবীনত্বের অভাব—অনেক স্থানে তাহার অভাব নাই। কবির বাক্‌শক্তি, এবং পদবিন্যাস শক্তি প্রশংসনীয়। "মিলন" নামক কাব্যের প্রথমাংশ এমন সুন্দর, যে তাহা হেমবাবুর যোগ্য বলা যায়; কিন্তু শেষাংশ তত ভাল নহে। কলে এই কবি বিশেষ আদরের যোগ্য সন্দেহ নাই।"

কটকের ব্যবস্থা-শাস্ত্রের অধ্যাপক পদ
গ্রহণ ও ত্যাগ

বোধ হয় এই সময়ে রাজকৃষ্ণ আর একবার কটকে ব্যবস্থা-শাস্ত্রের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারি তিনি অধ্যাপক পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন এইরূপ নিদর্শন পাওয়া যায়। *

* শ্রাবণ মাসের এই প্রবন্ধে একটা ভুল হইয়াছে, ২৪ পৃষ্ঠার শেষ ছত্রটি বেলির প্রতিকৃতির নিম্নে মুদ্রিত হইবে এবং ২৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় ছত্রের প্রতিকৃতির নিম্নে [illegible] মুদ্রিত হইয়াছে।

দেওয়ান রামকমল সেন

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

গৌরিকার সেনবংশ ধনে মানে বংশমর্য্যাদায় বিদ্যাবত্তায় বঙ্গদেশে সুপ্রসিদ্ধ। এই বংশীয়েরা বলেন, তাঁহারা বল্লাল সেনের বংশধর। দেওয়ান রামকমল সেন ছিলেন এই বংশের অলঙ্কার।

গৌরিকা ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম, ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত। এখান হইতে সেন বংশের এক শাখা কলিকাতা, কলুটোলায় আসিয়া বাস করেন।

রামকমলের পিতার নাম গোকুলচন্দ্র। সন ১১৮৯ সালের চৈত্র মাসে (১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ) রামকমলের জন্ম হয়। রামকমল পিতার দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠের নাম ছিল মদন এবং কনিষ্ঠের নাম রামধন।

রামকমলের পিতা পারস্য ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি হুগলীর সেরিস্তাদার ছিলেন এবং মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতন পাইতেন। রামকমল প্রথমে এক শিরোমণি উপাধিক বৈদ্যের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন।

কলিকাতায় তখন সবেমাত্র ইংরেজী শিক্ষার গোড়াপত্তন হইতেছে। Yes, no, very well বলিতে পারিলে, বাকীটা আকারে-ইঙ্গিতে সারিয়া একরকম করিয়া কাজ চলিয়া যাইত। এই উপায়েই তখন অনেকে কলিকাতায় চাকুরী এবং ব্যবসা করিয়া প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিতেন। পূর্ব্বে লোকে অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা হইবে বলিয়া পারস্য ভাষা শিক্ষা করিত। এখন ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিলে অর্থোপার্জ্জন করা যায় দেখিয়া ইংরেজী শিখিবার জন্য লোকের মনে আগ্রহ জন্মিতে লাগিল। তাহার ফলে দুই একটি করিয়া ইস্কুলও প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। এইরূপে কলুটোলা অঞ্চলে রামজয় দত্তের একটি ইস্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। অনুমান ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রামকমল কলিকাতায় আসিয়া এই ইস্কুলে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন। রামকমল বলেন, এই ইস্কুলে তখন "তুতিনামা" এবং "আরব্য উপন্যাস" এই দুইখানি ইংরেজী বই ক্লাসে

পড়া হইত, বালকরা ইহা হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া ইংরেজী শিখিত। অভিধান কিম্বা ব্যাকরণ পড়িবার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

এখন যেখানে কলুটোলা ষ্ট্রীট, রামকমল সেইখানে একখানি ছোট বাড়ী ক্রয় করেন। পরে এই বাড়ী বিক্রয় করিয়া মাধবচন্দ্র সেন পূর্ব্বে যে বাড়ীতে বাস করিতেন, কলুটোলার সেই বাড়ীখানি ক্রয় করেন।

ইংরেজী ও বাঙ্গলা ছাত্রপাঠ্য পুস্তকের অভাববশতঃ এবং কতকটা দারিদ্র্যের জন্যও বটে, ইস্কুলে রামকমলের শিক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে Mr. Namey নামক এক ইয়োরোপীয় ভদ্রলোকের নিকট তিনি কর্ম্ম করিতেছিলেন। Mr. Namey কলিকাতার তৎকালীন প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্লাকোয়ারের সহকারী ছিলেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার বিবাহ হয়। ঐ বৎসরই তাঁহার পিতা তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের সিবিল স্থপতি মিঃ আর, ব্লেকিনডেনের নিকট আনিয়া শিক্ষানবীশীতে নিযুক্ত করিয়া দেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে রামকমল মাসিক ৮ টাকা বেতনে হিন্দুস্থানী প্রেসে একটি কম্পোজিটরের চাকুরী পান। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে দেখা যায় তিনি চাঁদনী হাসপাতালে চাকুরী করিতেছেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কর্ণেল রামজের অধীনে একটি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন।

হিন্দুস্থানী প্রেসে কর্ম্ম করিবার সময় তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা, শ্রমশীলতা, অধ্যবসায় ও সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞতা দর্শনে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ডাক্তার এইচ, এইচ, উইলসনের দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। সেই সূত্রে রামকমল ১৮১৮-১৯ সালে মাসিক ১২ টাকা বেতনে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির আপিসে একটি কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এখানে তিনি এমন সন্তোষজনক ভাবে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন যে, পরে তিনি ঐ সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক, এবং তাহার পর উহার কাউন্সিলের সদস্যপদ লাভ করেন।

দারিদ্র্যবশতঃ ১৭।১৮ বৎসর মাত্র বয়সে আরব্ধ শিক্ষা অসম্পূর্ণ রাখিয়া উদরান্নের সংস্থানের জন্য রামকমল অর্থ উপার্জ্জনে নিযুক্ত হইতে বাধ্য হন বটে, কিন্তু যে জ্ঞানার্জ্জনের প্রবল স্পৃহা লইয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সেই অতৃপ্ত স্পৃহার পরিতৃপ্তির জন্য তিনি একদিনের জন্যও জ্ঞানার্জ্জনে বিরত হন নাই। যখনই যে কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকুন না কেন, অবসর কালটুকু তিনি অধ্যয়নে ও আত্মোন্নতি সাধনে কাটাইয়া দিতেন। এইরূপে নিজের চেষ্টায় তিনি প্রচুর জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এইরূপে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে এবং প্রাচীন বাঙ্গলা ও সংস্কৃতে তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার জন্মিয়াছিল। বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্রগুণে তিনি তৎকালীন ইংরেজ-সমাজে এবং রাজকর্ম্মচারী মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

এ দিকে বৈষয়িক কর্ম্মেও তাঁহার ক্রমোন্নতি হইতে লাগিল। ৮ টাকা বেতনে কম্পোজিটর রূপে তিনি জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন; ক্রমে তিনি (১৮৩১ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতার টাঁকশালের দেওয়ান হইলেন। সেখানেও তিনি কর্ম্মদক্ষতার এমন পরিচয় দিলেন যে দুই বৎসর পরে তিনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ানী লাভ করিলেন। এই পদের বেতন মাসিক দুই হাজার টাকা।

বেঙ্গল ব্যাঙ্কে তিনি ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী মিঃ জর্জ্জ উদনীর (Mr. George Udny) দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। কিন্তু এক সময়ে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। এই ঘটনা বিচারার্থ ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টারগণের সম্মুখে উপস্থিত হয়। বিচার ফলে রামকমল সসম্মানে জয়লাভ করেন, তাঁহার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তিনি ডাইরেক্টার-গণের অধিকতর বিশ্বাসভাজন হন। অবশেষে ডাইরেক্টাররা রামকমলের পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য প্রায়ই তাঁহাকে তাঁহাদের পরামর্শ-সভায় আহ্বান করিতেন।

সামান্য অবস্থা হইতে অর্থ, প্রতিপত্তি ও পদ-মর্য্যাদার অধিকারী হইলে অনেককেই আত্মহারা হইয়া পড়িতে দেখা যায়। কিন্তু রামকমলের ক্ষেত্রে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। চিরজীবন তিনি পরিশ্রমী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, নিরহঙ্কার ছিলেন। ধনীজনোচিত বিলাসিতা, ধনগর্ব্ব তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে নাই। দরিদ্র অবস্থায় যেরূপ সামান্য অশন বসন রুচিত, প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও তিনি সেই সাবেকী সরল সামান্য চাল বজায় রাখিয়াছিলেন। সেকালে ইংরেজী উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া অনেকেই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছিলেন; রামকমল

সেরূপ উচ্ছৃঙ্খলতায় প্রশ্রয় কখনই দেন নাই। স্বধর্ম্মে তিনি চিরদিন আস্থাবান ছিলেন—ইংরেজী শিখিয়া হিন্দু-ধর্ম্মে আস্থা হারান নাই। প্রাচীন কালের হিন্দুজনোচিত আচার অনুষ্ঠান তিনি পালন করিতেন। পরিণত বয়সে নিষ্ঠাবান হিন্দুরা যেমন স্বপাক অন্ন আহার করেন, তিনিও তাহাই করিতেন। আহার-বিহারে সংযম হিন্দুর ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠানের অন্তর্গত; রামকমলও সেইরূপ সংযত-চরিত্র ছিলেন।

রামকমল কেবল আত্মোন্নতি সাধন করিয়াই নিরস্ত হন নাই। সাধারণের উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বপ্রকার জনহিতকর কর্ম্মে যোগদান করিতেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০এ জানুয়ারী হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বৎসরই কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি, এবং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি গঠিত হয়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লোক শিক্ষার্থ সাধারণ সমিতি (General Committee of Public Instruction) প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইবার অব্যবহিত পরেই উহার ম্যানেজিং বডি বা পরিচালক-সঙ্ঘের সদস্যরূপে উহার সহিত রামকমলের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা উপলক্ষে মিঃ কার লিখিয়াছেন যে, হিন্দু কলেজ স্থাপনে যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন, রামকমল সেন তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। আবার যখন মিঃ ডিরোজিওর শিক্ষা প্রভাবে হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিল, তখন যাঁহারা ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ হইতে অপসারিত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, রামকমল সেনও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে রামকমল কাউন্সিল অব এডুকেশনের সদস্য ছিলেন। স্কুল বুক সোসাইটিরও তিনি গোড়া হইতেই সদস্য হন। স্কুল বুক সোসাইটির কমিটির সদস্য থাকা কালেই সম্ভবতঃ ইংরেজী বাঙ্গালা অভিধান সঙ্কলনের কল্পনা তাঁহার মনে উদয় হয়। Agricultural and Horticultural Society of India স্থাপিত হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি তাহার সদস্য হন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি এই সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক ও কলেক্টরের কার্য্য করিতেছিলেন দেখা যায়। তদ্ব্যতীত ইহাও জানা যায় যে তিনি সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক, চ্যারিটেবল সোসাইটির সদস্য, চাঁদনী হাস-পাতালের সদস্য এবং আরও অন্যান্য সভা-সমিতির সভ্য-তালিকা-ভুক্ত ছিলেন। এই সকল প্রতিষ্ঠানের তিনি নামমাত্র সভ্য ছিলেন না—রীতিমত কর্ম্মীও ছিলেন। এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির মুদ্রিত কার্য্য-বিবরণীতে কাগজ প্রস্তুত সম্বন্ধে তাঁহার একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া-ছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি এই সোসাইটির অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন।

রামকমল সংস্কৃত কলেজের কেবল সম্পাদক ছিলেন না; সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ এত প্রবল ছিল যে, সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতগণের সহিত প্রত্যহ সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনার জন্য তিনি কলেজের সান্নিধ্যে একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই বাটীই পরে এলবার্ট হল নামে পরিচিত হয়।

কেবল স্বদেশবাসিগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা করিয়া শিক্ষা ব্যাপারে তাঁহার উৎসাহ পর্য্যবসিত হয় নাই—বিদেশীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারেও তাঁহার সমান আগ্রহ লক্ষিত হইত। সেই জন্য Parental Academyর (অধুনা ডভটন কলেজ নামে পরিচিত) পরিচালকবৃন্দের মধ্যেও তাঁহাকে দেখিতে পাই। ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির সদস্যপদ হইতে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি উহার সহকারী সভাপতির পদে উন্নীত হন।

সেন মহাশয়ের ইংরেজী বাঙ্গালা অভিধানের মুদ্রণকার্য্য ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। উহার পত্র সংখ্যা ছিল ৭০০।

কলিকাতায় একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনা করিবার জন্য লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক যে প্রাথমিক কমিটি গঠন করেন, রামকমল সেন তাহার অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনের জন্য যে সকল প্রস্তাবের আলোচনা হইত, রামকমল সেন মহাশয়ের তাহাতেও একটা প্রধান অংশ থাকিত। রামকমলের আমলে কলিকাতা-প্রবাসী সাহেবদিগের পীড়া হইলে চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার জন্য হাসপাতাল, সুস্থ সাহেব-দিগের জন্য আশ্রয় ও খাদ্যের যথোচিত ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু দেশীয়দিগের জন্য ভাল রকম কোন ব্যবস্থা ছিল না; যাহাও ছিল তাহাও যথেষ্ট ছিল না। এই কারণে সহরের কেন্দ্রস্থলে দেশীয়দিগের জন্য একটি হাসপাতাল স্থাপনের

প্রস্তাব হয়। তৎকালে আমাদের দেশের ধর্ম্মগত সংস্কার অনুযায়ী মুমূর্ষু ব্যক্তিগণকে অন্তর্জলি করা হইত। সেই সময়ে না কি শীঘ্র ইহ নিষ্কৃতি লাভের প্রয়াসে মুমূর্ষুর বাহক ও সহচরগণ অন্তর্জলির অছিলায় মুমূর্ষু ব্যক্তিগণকে গঙ্গায় ডুবাইয়া মারিত। হাসপাতাল স্থাপন প্রস্তাবের ইহাও একটা কারণ ছিল। এই প্রস্তাব উপলক্ষে সংবাদ-পত্রে অনেক আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছিল। অন্তর্জলির ফলে মুমূর্ষুকে ডুবাইয়া মারা, চড়কের সময় গাজনের সন্ন্যাসীদিগের পিঠে বাণফোঁড়া প্রভৃতি কুপ্রথা-গুলির সম্বন্ধে রামকমল সেন মহাশয় যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন, তদনুসারে ঐ কুপ্রথাগুলি রহিত হয়। এজন্য সেন মহাশয় বঙ্গবাসীর ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছিলেন।

রামকমল কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। শ্রমবিমুখ অবস্থায় তিনি একদণ্ডও থাকিতে পারিতেন না। দেহ-যন্ত্রের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ক্রমে ভগ্ন হইতে লাগিল। কলিকাতায় থাকিয়া সুস্থ হইবার আশা না দেখিয়া তিনি গৌরিফায় গমন করিলেন। সেখানে একুশ দিন গঙ্গাবাসের পর তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়াছিল, কিন্তু জ্ঞান পূর্ণ-মাত্রায় ছিল। মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া গৌরিফায় আসিবার দুই দিন পূর্ব্ব হইতে তিনি জপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বাক্‌রোধ হইবার পূর্ব্বে তিনি পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গকে সময়োচিত ও পাত্রোচিত উপদেশ দান করেন। সন ১২৫১ সালের ১৯এ শ্রাবণ, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট ৬১ বৎসর বয়সে তাঁহার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটে।

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া বহু উচ্চ-পদস্থ রাজপুরুষের সহিত রামকমলের সৌহৃদ্য ছিল। তাঁহারা সর্ব্বদা সেন মহাশয়ের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন।

রামকমল চারিটি পুত্র রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠপুত্র হরিমোহন ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি পিতার সদ্‌গুণ-রাশির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। প্রথমে তিনি ডাক্তার উইলসনের অধীনে পুরাণ অনুবাদের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। পরে তিনি টাঁকশালের দেওয়ান, ট্রেজারির দেওয়ান, বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ পদে কার্য্য করেন। সহরের প্রায় তাবৎ বড় বড় সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর আগ্রার দরবারে জয়পুরের মহারাজের সহিত তাঁহার দৃঢ়তা জন্মে। সেই-সূত্রে তিনি উক্ত রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়া রাজ্যের বহু সংস্কার সাধন ও উন্নতিমূলক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন। তিনি পাঁচ পুত্র রাখিয়া যান—যদুনাথ, মহেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ, ও উপেন্দ্রনাথ। ইঁহাদের মধ্যে চতুর্থ নরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় থাকিয়া "ইণ্ডিয়ান মিরার" সম্পাদন করিতেন। অপর চারি ভ্রাতা জয়পুরে কোন না কোন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন।

রামকমলের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ্চ জন্মগ্রহণ করেন। সুবিখ্যাত ধর্ম্ম-সংস্কারক কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ইঁহারই পুত্র। তৃতীয় পুত্র বংশীধর টাঁকশালে কর্ম্ম করিতেন। চতুর্থ পুত্র মুরলীধর কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী ছিলেন।

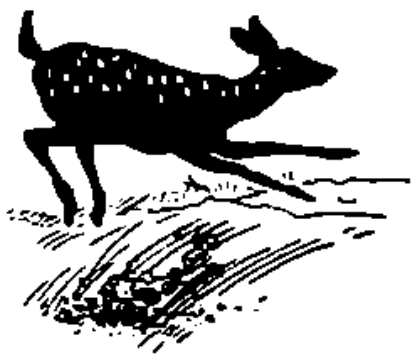

নারীর কর্ত্তব্য

শ্রীঅনুরূপা দেবী

মাননীয় শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের লেখার এবং তাঁর অশেষবিধ সমাজ-কল্যাণকর সৎকর্ম্মমালার সংবাদ আমি বহুকাল হ'তেই পেয়ে এসেছি। চন্দননগরে যাতায়াতের কালে ৺কৃষ্ণভাবিনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সুপরিচ্ছন্ন গৃহখানি আমার অনেকবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নৃত্যগোপাল-লাইব্রেরী ভবনের সম্বন্ধেও আমি সংবাদপত্রে ও লোকমুখে সংবাদ পেয়ে মনে মনে তাঁর মাতৃ-পিতৃ ভক্তির অজস্র প্রশংসা করে এসেছি এবং মনে মনে এই বলে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি যে, 'আপনার দেশের প্রত্যেক অবস্থাপন্ন লোক যেন আপনার এই মহদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করতে পারে; আপনার এই সাত্ত্বিক দানের ফলে যেন এই দানের আদর্শ আমাদের সমাজে দৃষ্টান্তস্থল হয়ে ওঠে। এ দেশের ধনী যেন আপনার মত দেশহিত-ব্রত হয়।'

আজ তাঁর কাছ থেকে আমি যখন নিমন্ত্রণ পেলেম, যোগ্যতা অযোগ্যতার হিসাব খতিয়ে দেখার অবসর আমার হলো না, আমি সাগ্রহে সম্মত হলেম। মনে হলো, মনের মধ্যে যেন এই কর্ম্মবীরের কর্ম্মের সঙ্গে আমার অন্তরের একটী গোপন সংযোগ ইতিমধ্যেই ঘটে গ্যাছে; আমার কাছে এ নিমন্ত্রণ কিছুই নূতন ঠেকলো না। এসে পৌঁছে গেলেম।

কিন্তু আসাটা যত সহজ, তার পরের কর্ত্তব্যটা ঠিক তেমন সোজা নয়। আপনারা নারীর শিক্ষা বা কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার জন্য আমায় এখানে আমন্ত্রণ করেছেন; সে সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতার অনুযায়ী কিছু বলবারও ইচ্ছা আছে, কিন্তু বলতে গিয়ে আমি যে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হই নি তা' বলতে পারি নে। বলা কওয়া আমার দিনের চাইতে তার আগের দিনে অনেকখানিই যেন সহজ ছিল, আজকের দিনে আর তা' নেই। আজকের দিনে আমাদের বলবার কথা যত বেশি হয়ে উঠেছে, বলবার পথ হয়ে যাচ্ছে ততই সঙ্কীর্ণ। এ কথা শুধু আমিই নয়, অনেকেই হয় ত স্বীকার করবেন। কাজকে কিছু বলতে গেলে, লিখতে গেলেই মনে পড়ে যায়—

"ভয়ে ভয়ে বলি কি বলিব আর?"

আমাদের মনের মধ্যের যুগ যুগ অনেক তারই ভাবের সুরে ভরা থাকে, একটুখানি আঙুলের ছোঁয়া লাগার অপেক্ষা; কিন্তু সেই আঙুলের স্পর্শ যদি আনাড়ীর স্পর্শ হয় তা' হলেই সমস্ত সুর বেসুরা হয়ে যায়, শ্রবণে বিরক্তি উৎপাদন করে মাত্র। শ্রবণেচ্ছার আসে অবসাদ। আমি এই দু'রকমেরই ভয় করছি। প্রথমতঃ আজকের দিনের সব কথা, আসল কথা, বলার পথ সেই পথের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে, যে পথকে লক্ষ্য করে আমাদের প্রাচীন কালের ঋষিরা লিখে গেছেন "—দুর্গমপথস্তৎ—"

এই দুর্গম পথকে "ক্ষুরস্য ধারা"র সঙ্গে তাঁরাই সমতুলিত করে গেছেন বলে সেই পথের যাত্রী হ'তে আমার মত ক্ষুদ্রপ্রাণ মনুষ্যেরা একটুখানি ভয় রাখে। তা' না রাখলে, আজকের দিনের মত দিনে আপনাদেরও আমায় নিমন্ত্রণ করার সুবিধা হতো না, আর আমারও আপনাদের নিমন্ত্রণ নে'বার সুযোগ থাকতো না। এই সব কারণে কোন কিছু বলতে গেলে ভেবে দেখে হিসাব খতিয়ে বিচারসিদ্ধ করে নিয়ে তা' প্রকাশ করতে হবে।

তার পর দেখুন, আমাদের এই চির-বৈচিত্র্যময়ী নৈসর্গিক নিয়মানুসারেই বহু মত ও বহু পথাবলম্বী নানা ধর্ম্মী এবং নানা কর্ম্মীর সমবায়ে বিচিত্রতর-ধাতের জন্য আবহমান কাল হইতেই "ঋজু কুটিল নানাপথ" সুবিস্তৃত রহিয়াছে, সেই ভারতবর্ষীয়দের মধ্যেও আজকালকার-মত দিনে কোন উপদেশের মত কথা বলতে যাওয়া আর তেমন সহজ নেই। উপদেষ্টার অভাব কোন দেশেই ছিল না, আজও নেই; এ দেশেও তাই; কিন্তু পর-মত-সহিষ্ণুতা এ দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও, এ দিনে যে সে বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপেই সংরক্ষিত আছে, তা বলা চলে না। বিশেষতঃ আমাদের মত সেকেলেদের মতামত এই নব্য-

তান্ত্রিকতার যথেচ্ছাচারের যুগে একান্তই অসহনীয় হয়ে ওঠা কিছুই বিচিত্র নয়। তাই একটু ভয় রাখতে হয় যে আমার কথা হয় ত বা কারু কারু কানে গিয়ে বেসুরা সুর উৎপাদন করে শান্তির বদলে অশান্তি উৎপাদন করবে।

তবে এ কথাটাও ঠিক যে, যদি আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাই ঘটে, তবে সে দোষ আমার আনাড়ী আঙুলের; মনোবীণার তার আমার উঁচু সুরেই বাঁধা আছে। আমি আপনাদের কাছে যা বলতে চাই তা'তে যদি আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকে, থাক, কিন্তু মূল উদ্দেশ্যের অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছার কিছুমাত্র অভাব ঘটে নি। যাঁর সঙ্গে আমার মতের মিল নেই তিনিও, যাঁর সঙ্গে আমার মতের মিল আছে তিনিও যেমনি আমার কাছে আজ এসেছেন, আমিও তেমনিই সবিনয়বাক্যে তাঁদের নিবেদন করে বলছি; আমার মতামত যদি আপনাদের মতের সঙ্গে না মেলে নাই মিলুক, দুঃখিত তা'তে যদি আপনারা হন, সেটুকু স্বীকার করেই নেবেন, কিন্তু তার জন্য পরস্পরের মধ্যে যেন আমাদের মনের মিলের অভাব না ঘটে। পরস্পরকে সহ্য করতে যেন আমাদের না বাধে। পরমত-খণ্ডন-চেষ্টা এ দেশে চিরদিনই হয়ে এসেছে। না হলে ষড়্‌দর্শনের সৃষ্টি হতো না এবং এই অসংখ্য মতবাদের স্থান ধর্মে সমাজে সাহিত্যে থাকতো না। কিন্তু পরমত খণ্ডন করা এক, আর বিরুদ্ধ মতবাদীদের মধ্যে দল বন্ধন করে বিরোধকে পাকিয়ে তোলা সম্পূর্ণ অন্য জিনিষ। পরমত-সহিষ্ণুতা এ দেশের ধর্ম্ম, পরম ধর্ম্ম,—এ দেশ তর্ক দিয়ে মতবাদ স্থাপন করেছে, কুতর্ক দিয়ে নয়। আর কোন দেশ এমন করে মত-বিরোধের মধ্য দিয়ে পথ খুঁজে নিতে পারে নি। সহস্রটা চোরা গলিকে নিয়ে এসে একটা সরল রাজবর্ত্মে মিলিয়ে দিতে পারে নি, অসংখ্য নদী তড়াগকে বইয়ে এনে এক মহার্ণবে ডুবিয়ে দিতে পারে নি, বহুকে একের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। সে এ দেশই পেরেছিল, চিরদিনই পারছে;—ইচ্ছা করলে আজও পারে, এবং চিরভবিষ্যকাল ধরে পারবেও তা।

এখন আমাদের আসল কথায় পৌঁছান যাক্।—

নারীর কর্ত্তব্য কি? বড় ত আমাদের এই-ই প্রশ্ন? কিন্তু এ প্রশ্ন কেন ওঠে? নারী কি এ-দেশে ছিলেন না? আজই কি তাঁদের এ দেশে এই প্রথম অভ্যুদয় ঘটলো? কিন্তু তা' তো নয়, শাস্ত্রবাক্য আমাদের শুনিয়ে দিচ্ছেন;—

পরমাত্মা নিজ শরীরকে দুই ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগে পুরুষ এবং তার আর এক ভাগে নারীর সৃষ্টি করেছিলেন,—

এই যদি সত্য হয়, তা'হলে নর এবং নারী একই সঙ্গে অর্দ্ধাঙ্গী ভাগে পরস্পরের সহজাত রূপেই সৃষ্ট হয়েছেন, তাঁদের স্রষ্টাও সেই একই; এবং সৃজন-উপাদানও তাঁদের বিভিন্ন নয়। অতএব আমরা এইটুকু নিশ্চিতরূপেই জেনে রাখলেম যে নরনারী কোন দিনই অনন্যসহায় রূপে এই বিশ্বজগতের উষর বক্ষে আকণ্ঠ পরিপূর্ণ স্নেহপ্রেমের বুভুক্ষায় শুষ্ককণ্ঠ লইয়া অভ্যুদিত হন নাই। বিশ্বপ্রভাতেই তাঁরা তাঁদের পরস্পরের স্নেহ প্রেম আশা ও বাসনা পরস্পরকে বিনিময় করিয়া দিয়া বিশ্বতার গৌরবে গৌরবান্বিত রূপেই দেখা দিয়েছিলেন। জগতের সেই প্রথম প্রভাতেই সুপ্তিমগ্ন জগদ্বাসী জেগে উঠেছিল, তাদের জননীর স্নেহে, ভগ্নীর ভালবাসায়, পত্নীর অনুরাগে এবং দুহিতার অপরিসীম শ্রদ্ধায় পরিপূরিত হইয়া। কিন্তু আমি তারও আগের থেকে একটুখানি বর্ণনা দোব। প্রভাত যখন হয় নি, বিশ্ব যখন জাগে নি, সৃষ্টিকর্ত্তা যখন নিজেই সৃষ্টিছাড়া হয়ে পড়েছেন, সেই সময়কার সেই ভয়াবহ এবং অসহায় অবস্থাটুকু তাঁর আমি আপনাদের একটু দেখিয়ে দিতে চাই;—

প্রলয়ের কালে যখন কারণ জলে ডুবলো ধরা,
তখন পুরুষ হলেন পঞ্চবটারা, বিশ্ব হলো জাম্বুর মরা,
আবার এ জগত উঠ্‌লো জেগে আদ্যা নারীর বীণার তানে
তাই নারী যেথায় সম্পূজিতা নারায়ণের বাস সেখানে।

দেখুন, তাহলে, শুধু সৃষ্টির প্রথমে পরমাত্মা নর এবং নারীকে তাঁর দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করেই যে সৃষ্টি করেছেন, তা'ও না; তারও একটুখানি আগে, যখন আদ্যাশক্তি তাঁকে ছেড়ে সরে গেছলেন, যখন সেই পরম-পুরুষ নিষ্ক্রিয় হয়ে নির্গুণত্ব লাভ করে কাজের বার হয়ে গেছলেন! অতএব নর এবং নারীর সৃষ্টি যে পরস্পরকে ছেড়ে হয় নি এবং তাঁদের যে পরস্পরকে বাদ দিয়ে পুনঃ-প্রলয়কাল পর্য্যন্ত চলতে পারা সম্ভব নয়, এটা আমরা অস্বীকার করতে কোন মতেই আর পারছি নে।—

নরের এবং নারীর সৃষ্টি যদি একত্রই হয়ে থাকে, তাহলে নরের কর্ত্তব্য এবং নারীর কর্ত্তব্য একসঙ্গেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল, এ কথাও অবিসম্বাদীরূপে সত্য বলেই স্বীকার করে নিতে হয়। 'নারীর কর্ত্তব্য' বলে নতুন কোন প্রশ্ন যে আজকাল কেন জেগে উঠ্‌ছে এ কথা আমি ভেবেই পাইনে। যখনই এতদ্বিষয়ে কোনই প্রশ্ন উঠ্‌বে, তখন নর এবং নারী দুজনকার সম্পর্কেই ওঠা সঙ্গত, আমার এই মনে হয়। যেহেতু নরনারী পরস্পর পরস্পর হইতে অভিন্ন! সেই হেতুই তাদের কর্ত্তব্যও পরস্পরকে বাদ দিয়া কোন মতেই নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। এদের একজনকার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে গেলে, আর একজনকার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন আসিয়া পড়িবেই পড়িবে এবং মীমাংসা করিতে হইবে, দুজনকার কর্ত্তব্যকে তেমনই ভাবেই এক করিয়া লইয়া, যেমনভাবে এক ব্রহ্ম নিজেকে তা'দের দুজনকার জন্য দ্বিধা বিভক্তিত করিয়াছিলেন। তাঁদের কর্ত্তব্য তেমনই ভাবেই মূলতঃ এক হইয়াও বাহ্যতঃ দুই প্রকারের—যেমন তাঁরা একই ব্রহ্মের দুই বিভিন্ন প্রকাশ।

বাস্তবিকই নরের কর্ত্তব্য আর নারীর কর্ত্তব্যে মূলতঃ কোনই প্রভেদ নাই, মূলতঃ দুজনকার কর্ত্তব্যই মোটামুটি এক। তার নীতিসূত্রে সেই "সত্যং বদ"—"ধর্ম্মং চর"—সেই—"অহিংসা পরমোধর্ম্ম"—সেই—"নাস্তি জ্ঞানাৎ পরং তপঃ।"—নর এবং নারীর শিক্ষার এই মূল বিষয়ে কোনই প্রভেদ নাই, প্রভেদ থাকা উচিত নয়, থাকা অসম্ভব ও অসঙ্গত;—কিন্তু যেমন মূল লক্ষ্যে উভয়ের ধর্ম্ম একই তেমনই আবার এর আর একটা দিক আছে সেটা—এর স্থূল দিক নয়, সূক্ষ্ম দিক। যেহেতু ব্রহ্ম তাঁর শরীরকে একলা রেখে দ্বিধা বিভক্তিত করেছিলেন, সেই দ্বিধা বিভাজিত দুইয়ের মধ্যের এককে নর এবং অপরকে নারীরূপে পরস্পরে বিভিন্নধর্ম্মীরূপে তৈরি করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই হেতু স্থূল বিষয়ে মুখ্য বিষয়ে যতই একত্ব থাকুক, সূক্ষ্ম বিষয়ে তাঁদের মধ্যে একটুখানি প্রভেদ আছে এ কথা মান্‌তেই হবে। যতই আমরা মানতে না চাই, তবু সেই শেষকালে তর্কের শেষে মেনে নিতে বাধ্য হবোই যে, হ্যাঁ, তা' আছে; নারীর কর্ত্তব্য এবং নরের কর্ত্তব্যে একটুখানি প্রভেদ আছে; এবং নৈসর্গিক নিয়মানুসারেই সেটুকু যেন থেকেই যাবে, যতই আমরা মেয়েরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মরি না কেন, সৃষ্টির শেষ দিনে পর্য্যন্ত সেটুকু হয় ত নিঃশেষ হয়ে কোন দিনেই মুছে যাবে না।

'নারীর কর্ত্তব্য' বলে যখন প্রশ্ন ওঠে, তর্ক চলে, মতদ্বৈধ ঘটে, তখন সেইটুকু নিয়েই এ-সব হয়। মূল ধর্ম্ম সে এক এবং অটুট সত্য এবং সনাতন; তার সঙ্গে কারুই কোন বিবাদ ঘটা সম্ভব নয়। সে ধর্ম্মবলে নর এবং নারী সত্যাচরণ করবেন, ধার্ম্মিক হবেন; জ্ঞানার্জ্জন করতে

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

(কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দিরে ১৯৩৯ সনের দুইটি ফটোগ্রাফ)

দুজনকারই অধিকার আছে। নরের সততা এবং নারীর সতীত্ব কোনটীই তুচ্ছ নয়, পরন্তু উভয়েরই এ বিষয়ের সাধনা একাগ্র এবং অপ্রতিহত হওয়াই সঙ্গত। কিন্তু এর পর নারীর সম্বন্ধে একটী সূক্ষ্ম নারীধর্ম্ম আছে, সেইটীর সম্বন্ধে দেশভেদে এবং কালভেদে কখন কখনও একটু আধটু পরিবর্ত্তন দেখা দেয় এবং বিবর্ত্তন আসে। এ দেশে এই নারীধর্ম্মের যেমন চরম বিকাশ ঘটিয়াছিল, অন্য কোন দেশে

তেমন ঘটিতে পারে নাই। তার একটু অর্থও আছে,—এই ভারতবর্ষীয় হিন্দুর মত এমন সুদীর্ঘজীবী জাতি আর কোন জাতির ভিতর নাই। সকল জাতিরই পতন-অভ্যুদয় একটা নির্দ্দিষ্ট বর্ষ-শতকের মধ্যেই যেন সীমা-নিবদ্ধ। কেবল এই ভারতবর্ষীয় হিন্দুই বহু সহস্র বর্ষজীবী-রূপে ধরাপৃষ্ঠে আজ বর্ত্তমান রয়ে গ্যাছে। দীর্ঘ জীবন যে অভিজ্ঞতার আকর, এ বিষয়ে সংশয় করবার উপায় নেই! ভারতবর্ষীয় হিন্দু তার জাতীয় জীবন গঠনের প্রথম প্রভাত থেকে আরম্ভ করে তার অভ্যুন্নতির দীপ্ত মধ্যাহ্নে, আবার তার অবনতির জীবন সন্ধ্যায়, সর্ব্বত্রই তার বিরাট সমাজভুক্ত নরনারীর কল্যাণ-কামনাকে একাগ্রচিত্তে পর্য্যালোচনা করেছিল। "নেতি নেতি" করে সে তার সমাজগত নারী-পুরুষের কর্ত্তব্যকে একটার পর আর একটা ধাপে তুলে সমাজ রূপেই পরীক্ষা করে গেছে; তার প্রত্যেকটী পরীক্ষার ফল আমরা প্রাচীনকালের পুঁথিপত্র হতে জানতে পারি। তার পর তার সেই এক্সপেরিমেণ্ট্যাল ষ্টেজ পার হয়ে এসে সে যখন তার সমাজকে তার সেই সকল পরীক্ষার ফল দিয়ে তার পূর্ণ অভিজ্ঞতায় বলে এক আদর্শ সমাজে গঠিত করে তুলতে পারলে, তখনই তার মাথার উপর গৌরব-ভাস্কর প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো। ভারতবর্ষীয় হিন্দুর যা কিছু নিয়ে আজও এই পরাধীন দৈন্যগ্রস্ত জীবনে গর্ব্ব করবার আছে, সে তার সেই একান্ত শুভদিনেরই দান। আজও যদি সেদিনের সেই মহিমময় গরীয়ানীয়ান্ যুগের অত্যুচ্চ আদর্শ-বাদকে আমরা অনুসরণ না করিতাম, তবে ভারতবর্ষীয় হিন্দুর এই সাত শত বর্ষকালব্যাপী পরাধীন জীবনে এমন কি আছে, যার বলে সে জগৎ সমাজের মধ্যে বুক তুলিয়া কথা কহিতে ভরসা করে? কি আছে তার, যার জোরে সে তার বহুদিনের হৃতরাষ্ট্র ফিরিয়া পাওয়ার অধিকার চায়? যার বলে সব হারাইয়াও সে নিঃস্ব নয়, ভিখারী হইয়াও রাজা। সে কি? সেই ভারতীয় সভ্যতা—যে সভ্যতার অংশভাগী হইয়াও গ্রীস রোম মিসর কোথায় কবে ধ্বংস হইয়া গেলেও, যে সভ্যতার পূর্ণ রূপকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকার জন্য, ভারতের নারী-পুরুষ এই বহুতর শতাব্দীর ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও উৎপীড়ন অত্যাচার অনুপাতের তলায় পড়িয়াও পূর্ণরূপে তলাইয়া যায় নাই, আজও মাথা তুলিয়া অটল অচল দাঁড়াইয়া আছে—এ সেই সর্ব্বশক্তিমৎ ভারতীয় সভ্যতা। যা বহুতর সহস্রাব্দির অভিজ্ঞতা-জ্ঞানলব্ধ কঠোর-কঠোর তপস্যায় অভীষ্ট দেবতার বরপ্রাপ্তিরূপে পাওয়া। যার জোরে ভারতীয় নরনারী পরাধীনতার মধ্যেও স্বাধীন, বিজিত হইয়াও আজও অপরাজেয়।

সেই ভারতীয় সভ্যতা তার সমাজকে যে আদর্শ দিয়ে গঠন করেছিল, তার বাইরে গিয়ে তার চাইতে বড় আদর্শ ভারতবর্ষের নরনারী আর কোথাও থেকে পেতে পারেন না। যেহেতু অন্য দেশের বর্ত্তমান সমস্ত সমাজেই এখনও গঠনক্রিয়া চল্‌ছে; এমন কোন মানব-সমাজ আজ পৃথিবীতে বর্ত্তমান নেই যা ভারতবর্ষীয় সমাজের সমকালীন। পরিপক্ক-বুদ্ধি, পরিপক্ক-দেহ বৃদ্ধ যদি শিশুর বা বালকের অনুকরণ করতে যায়, তা'তে সে কি রস পায় সেই জানে,—অপরের জন্য প্রচুরতর রূপে সৃষ্টি করে সে নিছক হাস্যরস। ভারতবর্ষীয় নরনারীর মধ্যে যে আদর্শবাদ রয়েছে, তাকে তাড়িয়ে দিয়ে অন্য সমাজের আধপড়া কোন নবীনতর সমাজের আপাত-মনোরম কোন আদর্শকে গ্রহণ করার তার পক্ষে বৃদ্ধ শিশুর হামা টানার মতই অপ্রয়োজনীয় পশ্চাদ্‌বর্ত্তন বলেই মনে হবে। ভারতবর্ষীয় সমাজ ও-সব ধাপ পার হয়ে এসেছে। ও-সব ধাপে সে কখনও যে পা দেয়নি তা' নয়। ওগুলো সকল সমাজের পক্ষেই ওপারে ওঠ্‌বার সিঁড়ি, বাস কর্ব্বার গৃহ নয়।

তাই আমার মতে 'নারীর কর্ত্তব্য' যা ভারতবর্ষীয় সমাজ তার গৌরবোজ্জ্বল উন্নতি সমুচ্চ যুগে স্থির করে দিয়েছিল, সেই আদর্শই তার পক্ষে শ্রেয়স্কর ও বরস্কর উচ্চাংশ;—তার থেকে বার হয়ে তার চেয়ে যথেষ্ট হীনতর আদর্শে নেমে যাওয়া তার পক্ষে একটুও সম্মানের নয়। সুবিধারও নয়। ত্যাগ সংযম শ্রদ্ধা বিশ্বাস এ-সব উচ্চতর জীবের জন্য। আরণ্যকের জন্যই অসংযম অশ্রদ্ধা স্বার্থপরতা এবং পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস এবং তার ফলে প্রতি-হিংসার ঘৃণ্য স্পৃহা। ভারতবর্ষীয় হিন্দু মহিলার পক্ষে এই অসংযমের পথ অনুবর্ত্তনীয় নহে। ত্যাগের পথ কঠোর ও বন্ধুর হ'লেও সেই পথই শ্রেয়ের পথ, শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি হ'লেও সেই পথই তাঁদের অনুসরণীয়। যে পথে গার্গী, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, মদালসা এবং এই সেদিনেও বিদ্যাসাগর মাতা, ভূদেব জননী, সার রাজেন্দ্রের, সার আশুতোষের,

সার গুরুদাসের, হরিহর শেঠের গর্ভধারিণীগণ অনুবর্ত্তন করে ঐ সকল পুত্ররত্ন লাভ করেছিলেন, এর চেয়ে সমাজ-হিতৈষণা আমাদের মেয়েরা যে আর কি দিয়ে করতে পার্ব্বেন তা' আমার মত সামান্যার বোধগম্য হয় না। জগৎপূজ্যা ভারতীয়া নারী-সমাজে বৈদেশিক অপুষ্ট সমাজের অনুকরণে, যৌথপরিবারপ্রথা নষ্ট করা, বয়স্ক নর-নারীর লালসা-প্রণোদিত স্বেচ্ছা-নির্ব্বাচন, বিবাহ-বিচ্ছেদ, অহিন্দু বিবাহ, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি দ্বারা ভারত-সতীর বৈশিষ্ট্য নাশ করায় সমাজ যে কতখানি মঙ্গল লাভ করিবে, বুঝিতে পারি না। যাদের মধ্যে ঐ সব ব্যাপার আছে, তারা কি এ দেশের মেয়েদের চেয়ে খুব বেশী সুখী? এ-সব প্রথা কি সমাজের অপরিণততা প্রমাণ করে না? এগুলি কি মানব-সমাজের আদিমাবস্থা, বর্ব্বরতা প্রতিপাদিত করে না? তা যদি না হইত, বন্য এবং অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মধ্যেই এ সকল প্রথা আমরা দেখিতে পাইতাম না। এগুলি আমাদের সমাজের সর্ব্ব নিম্নস্তরের মধ্যে প্রচুরতর রূপে বর্ত্তমান থাকিত না। এর বিধি-ব্যবস্থা খুঁজিয়া মিলিত কেবলমাত্র ইয়োরোপীয় শিক্ষিত সমাজে মাত্র!

অতএব ভারতবর্ষীয়া নারীর কর্ত্তব্য নয় যে তার সমাজ-সংস্কার জন্য নব্য-তান্ত্রিক ইয়োরোপীয়ের দ্বারস্থ হয়। তার সমাজ-সংস্কার জন্য তার নিজের ঘরের মধ্যে চাহিলেই সে তার বিধিবিধান খুঁজিয়া পাইবে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন, "আমাদের সমস্ত সমাজ যদি প্রাচীন মহৎ স্মৃতি এবং বৃহৎ ভাবের দ্বারায় আদ্যোপান্ত সজীব সচেষ্ট হইয়া ওঠে—নিজের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বহু শতাব্দীর জীবনপ্রবাহ অনুভব করিয়া আপনাকে সরল ও সবল করিয়া তোলে, তবে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ও অন্য সকল দুর্গতি তুচ্ছ হইয়া যাইবে। সমাজের সচেষ্ট স্বাধীনতা অন্য সকল স্বাধীনতা হইতেই বড়।"—"হিন্দুত্ব।"

এখন এই যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে, এই সেই সামাজিক স্বাধীনতার রূপ? পর-সমাজের অনুকৃতিকে কোনমতেই কেহ সামাজিক স্বাধীনতার নাম দিতে পারেন না। স্বাধীন কথার মধ্যেই এই স্বা-ধী-নতা শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট হইয়া প্রকট হইতেছে। তাহা স্ব-অধীনতা, স্বেচ্ছাচার নয়?—

ভারতীয়া নারী স্বতন্ত্র, বিলাসিনী, স্বেচ্ছাচারের স্রোতে আত্মনিমজ্জিতা, "নহ মাতা নহ কন্যা নহ ভগ্নি, শুধুই প্রেয়সী" এই আদর্শে গঠিতা হইবেন না। তিনি কন্যা, ভগ্নি, গৃহিণী এবং জননী; তিনি প্রথমে আদর্শ সতী, তার পর সুপুত্রের মাতা। তিনি স্বামীর সহধর্ম্মিণীরূপে গৃহে এবং বাহিরে, সংসারে, সমাজে এবং রাষ্ট্রে সর্ব্বত্রই তাঁহার অনুবর্ত্তনশীলা হউন, কিন্তু তাঁর স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। ভারতবর্ষীয় হিন্দু-সমাজ পত্নীকে পতির অনুসারিণী করিয়া তাঁর জন্য সতীধর্ম্ম, সহধর্ম্মিণীর পদ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তাঁকে তো যথেষ্ট এবং যথার্থ উচ্চাধিকারই প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যদি ভারতীয় পুরুষ তাঁর নিজের আদর্শে সুস্থির থাকিতেন, তবে আজ ভারতীয় নারীর কর্ত্তব্য বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতেই পারিত না। ভারত-সতীর একমাত্র কর্ত্তব্য তার স্বামীর ধর্ম্মের সহায়তা করা; কিন্তু তাঁর অধর্ম্মেরও অনুবর্ত্তন করা ইহা সতীধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। এইখানে অনেকেই ভ্রম করিয়া থাকেন; স্বামীর অধর্ম্মকে তিনি অনুসরণ করিতে বাধ্য নহেন, যেহেতু স্ত্রী স্বামীর সহ-ধর্ম্মিণী! তাঁর সংস্রব তাঁর ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে; অধর্ম্ম-জীবনে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিতা! •

• চন্দননগর পুস্তকাগারের উদ্যোগে বৃহস্পতিপাল স্মৃতিমন্দিরে' গত ৯ই তারিখের বিশেষ সভায় পঠিত।

ছায়ার মায়া

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(চলচ্চিত্রে ইতরপ্রাণীর অভিনয়)

অধিকাংশ ছবিতেই আমরা কোনোও না কোনো রকম জীবজন্তুর সাক্ষাৎ পাই। এ পর্য্যন্ত চলচ্চিত্রে যত রকমের পশু পক্ষী ও সরীসৃপ দেখানো হ'য়েছে সেগুলিকে সব একত্রে জড়ো করলে একটা বৃহৎ পশুশালা হ'তে পারে। ছবিতে যে সব জীবজন্তুর সাহায্য নেওয়া হয়, তাদের প্রত্যেককেই চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য বিশেষ ভাবে শিক্ষিত ক'রে তোলা হয়। সার্কাসে অভিনয়ের জন্য পশুপক্ষীকে

'রীন্ টিন্-টিন্' ও তার প্রভু 'লী ডান্‌কান্'

শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য ঐ-সব ইতর প্রাণীকে শিক্ষিত ক'রে তোলা অত্যন্ত কঠিন; তাই, চিত্রপটে অভিনয়ের উপযোগী শিক্ষিত জীবজন্তুর পারিশ্রমিক প্রায় 'ষ্টার'-অভিনেতৃদেরই সঙ্গে সমান।

হাতী, ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি জানোয়ারদের সার্কাসে অভিনয় করতে শিক্ষা দেওয়া যতটা কঠিন—তার চেয়ে যে ঢের বেশী কঠিন তাদের চলচ্চিত্রে অভিনয় ক'রতে শিক্ষা দেওয়া, তার কারণ—সার্কাসের ঘোড়া বা হাতীকে কয়েকটা নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গী শিখিয়ে নিয়ে প্রত্যহ দু'বার ক'রে সেই একই খেলা দেখাতে বাধ্য করা হয়; কাজেই তারা সে খেলায় শীঘ্রই অভ্যস্ত হ'য়ে পড়ে। সুতরাং তাদের নিয়ে খুব বেশী মুস্কিলে পড়তে হয়না। কিন্তু, বিভিন্ন চলচ্চিত্রের জন্য বিশেষ বিশেষ জীবজন্তুকে ভিন্ন ভিন্ন রকমের অভিনয় শিক্ষা দিতে হয়; কাজেই, শিক্ষকদের প্রতিবারই নূতন ক'রে পরিশ্রম না করলে চলে না। এই জন্য, একেবারে বাছা-বাছা সব চেয়ে

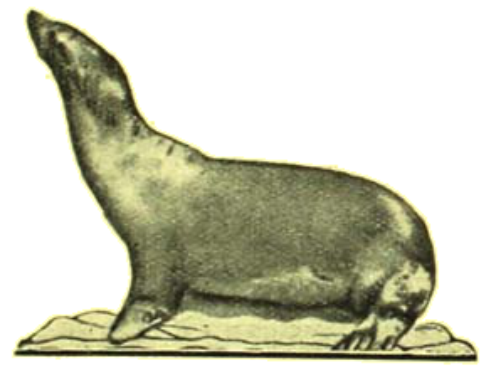

'ফ্রেডী'—শিক্ষিত সীলমাছ (চলচ্চিত্রে এর অভিনয় দর্শকদের বিস্ময়োৎপাদন করে)

সেরা জানোয়ার না হ'লে চলচ্চিত্রের অভিনয়ে নেওয়া চলেনা।

পশু পক্ষীদের যাঁরা খেলা দেখাতে বা অভিনয় ক'রতে শিক্ষা দেন, তাঁদের সকলের পদ্ধতি সমান নয়। প্রত্যেকের নিজ নিজ বিশেষত্ব আছে। মায়ের চোটে শেখানো সেকালের পাঠশালাতেও ছিল, পশুশালাতেও ছিল; কিন্তু, আজকাল বেত বা চাবুকের রেওয়াজ উভয় শিক্ষালয়েই অপ্রচলিত হ'য়ে পড়েছে, কারণ দেখা গেছে—ভয় দেখিয়ে—মেরে—শেখানোর চেয়ে, মিষ্টি কথায়—

আদর ক'রে—অথচ দৃঢ়তা ও ধৈর্য্যের সঙ্গে শিক্ষা দিলে অবোধ জানোয়াররা সুকুমার শিশুর মতই অবোধ; পাঁচবার দেখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও তারা যদি শিক্ষকের ইচ্ছার অনুরূপ অভিনয় ক'রতে না পারে, তাহ'লে তাদের নির্দ্দম প্রহার করাটা শুধু নিষ্ঠুরতা নয়—শিক্ষকের একান্ত নির্ব্বুদ্ধিতাও বটে! মার খেলে জানোয়ারদের মাথা খোলে না, বরং উল্টে তারা ভড়কে যায় এবং আজ যা শেখে কাল তা' ভুলতে বিলম্ব হয়না।

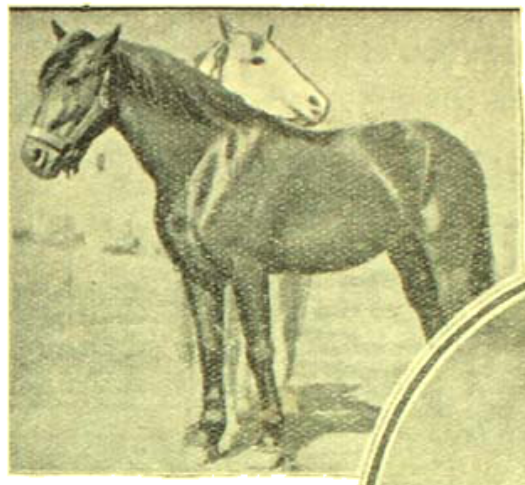

'রেক্স্' ও 'লেডী'—দুটি শিক্ষিত সুন্দর অশ্ব ও অশ্বিনী

'মাকুইস্' (শিক্ষিত অশ্ব। দুরন্ত ঘোড়ার অভিনয়ের জন্য খ্যাত)

তবে, যেখানে কোনো কোনো বিশেষ পশু দুষ্টুমী ক'রে কিম্বা কুড়েমীর জন্যে শিক্ষকের নির্দ্দেশ না মেনে তাঁর অবাধ্য হয়, সেস্থলে শিক্ষকের একটু কড়া হওয়া দরকার। কুকুরের বেলা কিন্তু তা' হবার প্রয়োজন নেই। একটু ধমক্ দিলেই, পিঠে একটা আস্তে চাপড় দিলেই যথেষ্ট! ভালো কুকুর হ'লে—শিক্ষকের চেয়ে সেই-ই নিজে বেশী লজ্জিত ও বিরক্ত হ'য়ে ওঠে—যদি

সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী 'লুপে ভেলী' ও তাঁর শিক্ষিত বানর

শিক্ষকের নির্দ্দেশ না বুঝতে পারে! সেস্থলে একটু ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় থাকলে এবং মাথা ঠাণ্ডা রেখে জানোয়ারের উপরই তার ভুল সংশোধনের ভার ছেড়ে দিলে সহজে সুফল পাওয়া যায়। একটু চাপড়ে আদর করে উৎসাহ দিলেই সে ঠিক শিখতে পারে, এবং শিক্ষক যদি তার কৃতকার্য্যতার পুরস্কার স্বরূপ তাকে কিছু খাবার দেন—যেমন একখানা বিস্কুট কিংবা একটি চকোলেট্, তাহ'লে সে আর সে খেলা ভোলে না।

বাঘ-সিংহ সম্বন্ধেও ঠিক এই ব্যবস্থাই খাটে; কিন্তু যদি এরা কখনো শিক্ষকের শুধু অবাধ্য হওয়া নয়, তাঁকে দাঁত খিঁচিয়ে আক্রমণ ক'রতে তেড়ে আসে—তাহ'লে তাদের তৎক্ষণাৎ সাজা দেওয়া দরকার। এদের অবাধ্যতা রূঢ়-ভাবে দমন ক'রতে না পারলে, শিক্ষকের প্রায়ই অমর্য্যাদা হবার সম্ভাবনা থাকে। তবে এ-কথা ঠিক যে এরা সবসময়ে

দুষ্টুমী ক'রেই অবাধ্য হয় যে তা' নয়, অনেক সময় শরীর ভালো না থাকলে এদের মেজাজ খারাপ থাকে, কাজেই কিছু ভাল লাগে না। অভিজ্ঞ শিক্ষকের পক্ষে তাদের অবস্থা বুঝতে বিলম্ব হয় না। তিনি তৎক্ষণাৎ শিক্ষা বন্ধ রেখে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এই চিকিৎসার ব্যবস্থা করার ফলে অনেক সময়ে আশ্চর্য্যজনক সুফল পাওয়া যায়। বাঘ ও সিংহকে কোনো যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি হ'তে আরোগ্য ক'রতে পারলে তারা এত বেশী কৃতজ্ঞ হ'য়ে পড়ে যে, শিক্ষকের বিরুদ্ধে আর কখনো বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে না।

চলচ্চিত্রানুরাগী মাত্রেই 'রীণ্-টিন্-টিন্' কে জানেন। চলচ্চিত্রে এই কুকুরটির অদ্ভুত অভিনয় ভোলবার নয়।

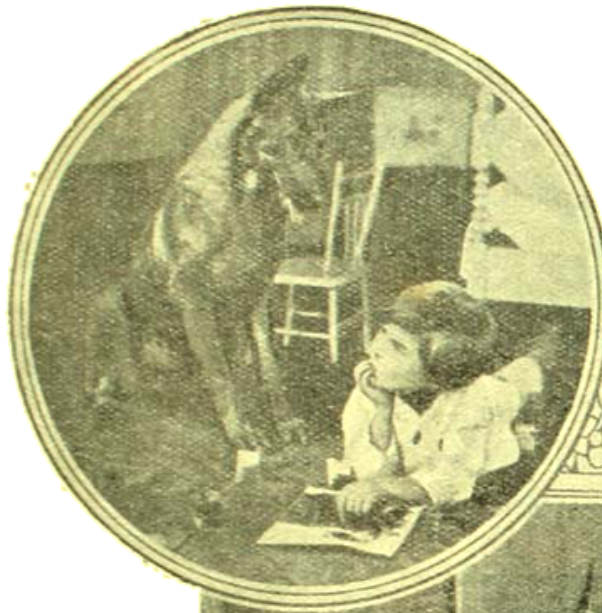

'সিন্‌ভারট্টিক্'—চলচ্চিত্রের অভিনয়ে সুদক্ষ কুকুর ('থাউস্ অব ফাইস্' ছবিতে এর অভিনয় অতুলনীয়)

'জিগ্‌স্' (ফায়ার্-ব্রিগেড্ ছবিতে এই সুচতুর কুকুরটির অভিনয় ভোলবার নয়)

'রেক্সার্' (চলচ্চিত্রের আর একটি শিক্ষিত কুকুর

'পুশিফুট' শিক্ষিত বিড়াল ('বেবি-মাইন' ছবিতে এর অভিনয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে)

কিছুদিন হ'ল রীণ্-টিন্ মারা গেছে। রীণ্-টিনের শিক্ষক শ্রীযুক্ত লী-ডান্‌কান বলেন—রীণ্-টিন্‌কে তিনি কুকুরের মতো শিক্ষা দেননি, ছোট ছেলের মতোই পড়িয়েছিলেন। খুব ছোটবেলা থেকেই তিনি তাকে তাঁর ভাষা বুঝতে শিখিয়েছিলেন। কোন্ কথায় কি মানে, কী ব'ললে কী ক'রতে হবে—রীণ্-টিন্ ক্রমে মানুষের মতই বুঝতে শিখেছিল। রীণ্-টিন্‌কে কখনো চোখ রাঙিয়ে, ধমকে কিছু ব'লতে হ'ত না। চাবুক দেখিয়ে কিছু করাতে হ'ত না। সহজভাবে

বন্ধুর মতো কথা ক'য়ে তাকে যা ক'রতে বলা হ'তো সে তাই ক'রতো। চলচ্চিত্রের দৃশ্যপটে ক্যামেরার চোখের আড়ালে দাঁড়িয়ে লী ডানকান্ তাকে যেমনটি ক'রতে বলতেন রীণ্-টিন্ সুবোধ বালকের মত তৎক্ষণাৎ তাই ক'রতো। একবারের বেশী দুবার কোনো ছবিতে রীণ্-টিন্‌কে নিয়ে মহলা দেবার প্রয়োজন হয়নি। ডানকান্ যেই ব'লতেন—"রীন্‌টী! তুমি যা ক'রেছো সে জন্য তুমি দুঃখিত ও অনুতপ্ত হও! এই সুন্দরীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে তুমি ক্ষমা চাও। উনি তোমায় ক্ষমা করেছেন। তুমি খুশী হ'য়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াও! সুন্দরীকে চুমু দাও—" চলচ্চিত্রের অনেক অভিনেতার চেয়েও নিপুণ-ভাবে রীণ্-টিন্ এই প্রত্যেকটি আদেশ পালন ক'রতো। অনেক সুদক্ষ পরিচালক মানুষকে দিয়ে যা করাতে পারতেন না—ডানকান্ সাহেব অবলীলাক্রমে রীন্-টিন্‌কে দিয়ে তার চেয়েও কঠিন অভিনয় করাতে পারতেন।

আর একটি কুকুরও চলচ্চিত্র-দর্শকদের বহুবার বিস্মিত ক'রেছে—তার নাম 'ফ্লাশ্'। মেট্রোগোল্ড্‌উইন মেয়ার্ কোম্পানীর একাধিক চিত্রে এর অভিনয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মেহাৎ বাচ্ছা বয়সেই ফ্লাশ ১২০৲ টাকায় বিক্রী হ'য়ে গেছলো; কিন্তু কিছুদিন পরেই যে ফ্লাশকে কিনেছিল সে ফিরিয়ে দিয়ে গেলো—কুকুরটা কোনো কাজের নয়, 'গোনাপার্ট'—শিক্ষিত কুকুর-পুলিশ! (মুখে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার বন্ধু শিক্ষিত কাঠবিড়াল' 'নটী'কে)

'থাণ্ডার্' ও 'হোয়াইট ফ্যাঙ্' (এই শ্বান-দম্পতী 'উলফ্-ফ্যাঙ্' প্রভৃতি একাধিক চিত্রে অভিনয় করেছে)

'পীট্' ও 'পল' (এরা দুই বাপ্ বেটা তাদের মনিব 'ছারী ল্যাসিনের' দু'পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছে)

শিক্ষিত ক্যাঙারু ('ট্যু ক্রেমিং ইয়ুথস্' চিত্রে 'চেষ্টার কন্‌লীনের' সঙ্গে অভিনয় করেছে। মুষ্টিযুদ্ধের (Boxing) জন্য এই ক্যাঙারুটি বিখ্যাত

আর একটি কুকুরও চলচ্চিত্র-দর্শকদের বহুবার বিস্মিত ক'রেছে—তার নাম 'ফ্লাশ্'। মেট্রোগোল্ড্‌উইন মেয়ার্ কোম্পানীর একাধিক চিত্রে এর অভিনয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ

নেহাৎ মোটা বুদ্ধি ব'লে! আজ সেই ক্ল্যাশের বাজার-দর উঠেছে তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা! ক্ল্যাশ যদি আরও কিছুদিন বাঁচে, তাহ'লে শুধু চলচ্চিত্রে অভিনয় ক'রেই সে এর চতুর্গুণ টাকা উপার্জ্জন করতে পারবে। রীন্‌টিনের মতই ক্ল্যাশ তার মনিবের সব কথা বোঝে, সব জিনিষের নাম জানে, সব বন্ধুদের নাম জানে; ডান ও বাম সম্বন্ধে তার এত বেশী জ্ঞান যে, তাকে যদি বলা হয় ডানপাটি জুতোটা নিয়ে এসো, বা হাতের দস্তানাটা নিয়ে এসো—সে ঠিক চিনে তাই আনে—কখনো ভুল করেনা।

'পীরো'

'প্যাল' ব'লে আর একটি খুব চতুর কুকুর চলচ্চিত্রে অভিনয় ক'রতো। এখন সে অবসর গ্রহণ ক'রেছে, কারণ তার উপযুক্ত ছেলে 'পীট্' আজকাল চলচ্চিত্রে নেমে সকল দিক দিয়ে তার বাপের নাম বজায় রাখছে। 'প্যাল' ছিল হাস্যরসের অভিনেতা। সে ঠিক মানুষের মতোই

'নোরা'

হাসতে পারতো, কাঁদতে পারতো, ঠাট্টা তামাসায় মুখ ভ্যাঙচাতে পারতো; শিক্ষিত কুকুরের মত সব রকম খেলা ও অভিনয়েই সে সুপটু ছিল। তার ছেলে 'পীট্' বাপের মতই হাস্যরসের অভিনয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে উঠেছে। 'পীটে'র একচোখে চশমার মতো একটি গোল কালো দাগ কাটা আছে, তাই ওর নাম হয়েছে 'একচোখো পীট'। 'মেট্রো'র "আমাদের দলের (Our Gang) সঙ্গে পীটের খুব ঘনিষ্ঠতা।

'থাণ্ডার' আর 'ফণ্' নামে আর একজোড়া কুকুরকে চিত্র-প্রিয়রা অনেকেই ভালো ভালো ছবিতে অভিনয় ক'রতে দেখেছেন। এদের মজা হ'চ্ছে যে, এরা দু'জনে একসঙ্গে না নামলে অভিনয় ক'রতে চায় না। 'বোনাপার্ট' বলে একটি পুলিশের শিক্ষিত চোর-ধরা কুকুরকেও ছবিতে দেখা গেছে। সে আবার 'গুটীর' বাহন। 'গুটী' হ'চ্ছে একটি শিক্ষিত ও অভিনয় দক্ষ কাঠবিড়ালী। বোনাপার্টের খুদে বন্ধু!

'মিনী' ব'লে একটি সুশিক্ষিত প্রকাণ্ড হাতী চলচ্চিত্রে প্রায়ই চমৎকার হাস্যরসের অভিনয় করে। ইতর প্রাণীদের মধ্যে 'মিনী'র মত সুচতুর জানোয়ার খুব কম দেখা যায়। হাসির ছবিতে 'মিনী' একেবারে অতুলনীয়। তার গায়ে প্রচণ্ড শক্তি বটে, কিন্তু, একটি ভেড়ার চেয়েও সে ঠাণ্ডা! 'মিনী'র কাছে 'বন্ধুত্বের কুটুম্বকম্'! চেনা-অচেনা সবার সঙ্গেই সে সমানই বন্ধুভাবে ব্যবহার করে। 'ফক্স্' কোম্পানীর তোলা একখানি হাসির ছবিতে একটি শিশুর আদেশে

'ক্ল্যাশ্' ('আণ্ডার্ দি ব্ল্যাক্ ঈগ্‌ল্' ছবিতে এই কুকুরটির অভিনয় চমকপ্রদ)

সে পরিচালিত হ'য়েছে। তার এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি যে, সেই শিশু যখন তাকে আদেশ ক'রলে যে "মিনী, তুমি এই ভীড় সরিয়ে দাও, সার্কাস ভেঙে দাও"—মিনী মত্ত হস্তীর মত তেড়ে গিয়ে সেই লোকারণ্যকে বিপর্য্যস্ত ক'রে তু'ললে এবং ডাইনে বাঁয়ে সব কিছু ধ্বংস ক'রতে ক'রতে এগিয়ে গিয়ে সার্কাসওয়ালাদের তাঁবুর আধখানা ভেঙে উড়িয়ে দিলে। তার সে অভিনয় এত স্বাভাবিক হয়েছিল যে দলের অনেকেই ভয় পেয়ে গেছ্‌লো—বুঝি হাতীটা সত্যই'

ক্ষেপে গেছে! কিন্তু, 'মিনী' জানতো যে সে অভিনয় ক'রছে, তাই দলের একটি প্রাণীকেও সে আহত করেনি। খুব সাবধানী সে।

মেট্রো গোল্ড্‌উইন মেয়ারের প্রত্যেক ছবিতে সর্ব্বপ্রথম যে সিংহটি মুখ বাড়িয়ে গর্জ্জন ক'রে দর্শকদের অভিবাদন জানায়—তার নাম "লীয়ো"। 'লীয়ো' হ'চ্ছে দক্ষিণ

"মিনী"

আফ্রিকার নিউবীয়ার অধিবাসী। মেট্রোর কর্তৃপক্ষরা একে নির্ব্বাচন ক'রে নেবার আগে প্রায় ২০০ সিংহকে পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলেন; কিন্তু 'লীয়ো' ছাড়া আর কেউ তাদের মধ্যে চলচ্চিত্রের উপযোগী ব'লে বিবেচিত হয়নি। চেহারায়, কণ্ঠস্বরে, অভিনয়-চাতুর্য্যে-'লীয়ো' অদ্বিতীয়।

চলচ্চিত্রে পরিচিত চিতাবাঘ 'নোয়া'র ভীষণ মুখখানি অত্যন্ত ভয়াবহ বলে মনে হ'লেও আসলে কিন্তু সে নেহাৎ নিরীহ! নোয়ার খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অভিনেতা হিসাবে সে খুব শান্ত ও বাধ্য! শিক্ষকের নির্দ্দেশ সে কখনো অমান্য করেনা। কাজেই, ছবিতে তাকে নিঃসঙ্কোচে নেওয়া চলে, কারণ তার উপর বিশ্বাস স্থাপন ক'রতে পারা যায়।

চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য ইতরপ্রাণী নির্ব্বাচন করবার সময় কর্তৃপক্ষের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত এই বিশ্বাস স্থাপন ক'রতে পারা যায় কিনা দেখা। যে জানোয়ার বেশ ঠাণ্ডা ও কথার বাধ্য এবং শিক্ষকের নির্দ্দেশ অবিলম্বে বুঝতে পারে, নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এলে বা অপরিচিত মানুষ দেখলে বা শব্দ শুনলে ভয় পায়না বা ভড়কে যায়না—এমন ভাবে শিক্ষিত প্রাণীর উপরই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারা যায়। নচেৎ, যে জানোয়ারের অস্থির মেজাজ, খামখেয়াল স্বভাব, যখন খোশ-মেজাজে থাকে

'ডগ অফ্ ওয়ার' ছবিতে 'ফ্লাশের' অভিনয়—(প্রভু আর একজনকে আদর করছেন দেখে ফ্লাশের ঈর্ষা)

তখন ভালো অভিনয় করে, যখন চটে তখন ক্ষেপে উঠে কামড়াতে যায়, তাকে নিয়ে চলচ্চিত্রে খেলানো বিপজ্জনক! কারণ, জানোয়ারটি যদি হঠাৎ খেঁকে দাঁড়ান, তাহ'লে একটি দৃশ্য পরিচালনা ক'রতে গিয়েই পরিচালকের

মাথার কালো চুল ভয়ে ভাবনায় একঘণ্টার মধ্যেই সব পেকে সাদা হ'য়ে উঠবে!

হাতী, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, চিতা, সাপ, কাঙারু, হরিণ, বানর, বনমানুষ, গরিলা, ভালুক, এমন কি ছাগল, ভেড়া, গাধা, উট, গরু, মহীষ, হাঁস, মুরগী, পায়রা, কেনেরী, কাকাতুয়া, ময়ূর, তোতাপাখী, তিতির, টিয়া, কোকিল, বুলবুল্ যা কিছু পশুপক্ষী আমরা ছবিতে দেখি, তাদের সকলকেই শিখিয়ে পড়িয়ে ছবিতে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত ক'রে নেওয়া হয়। জীবজন্তুদের বশবার মহলা না দিয়ে নামানো হয় না।

ওয়াল্টার্ ফোর্ড ও তাঁর শিক্ষিত খড়্গোস্

অনেক সময় অভিনেতা অভিনেত্রীরা বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও ক্যামেরার সামনে এসে ভড়কে যান' এবং ভুল ক'রে বসেন, কিন্তু এই মূক প্রাণীরা উপযুক্ত শিক্ষা পেলে ক্যামেরার সামনে এসে কখনই ভুল করেনা! এই জন্য পরিচালকেরা তাঁদের মুখর অভিনেতাদের চেয়ে এই মূক অভিনেতাদের সম্বন্ধে অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন থাকেন।

বন্যজন্তুর জন্য চিড়িয়াখানা ও সার্কাসের পশুশালার উপরই চলচ্চিত্রওয়ালাদের সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রতে হয়। কারণ, একসঙ্গে অনেকগুলি হিংস্র পশুকে ছবিতে নামাতে হ'লে এদের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কেবল, যে ছবিতে মাত্র একটি কোনো বিশেষ জানোয়ারের সম্পর্ক আছে, সেখানে লী ডান্‌কানের রীন্‌টিনের মতো কোনো ভদ্রলোকের নিজের গৃহপালিত পশুকে খুঁজে নেওয়া হয়।

চলচ্চিত্রের দর্শকেরা অনেকেই ছবিতে অরণ্যের হিংস্র পশুরা দাপাদাপি ক'রছে—দেখে হয়ত' অবাক হয়ে ভাবেন যে, এ ব্যাপারটা কেমন ক'রে সম্ভব হয়! সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বনমানুষ সমাকীর্ণ গভীর জঙ্গলের মধ্যে বিপদাপন্ন নায়ক নায়িকাকে দেখে নিশ্চয়ই তাঁরা সভয়ে শিউরে ওঠেন! কিন্তু, কেমন ক'রে এ ছবি তোলা হয় জানা থাকলে তাঁরা ভয় পেতেন না। শুনে হয়ত' অনেকেই আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন যে, এ সব ছবির অধিকাংশই লৌহ-পিঞ্জরের মধ্যে তোলা! পরিচালক যেমন ক্যামেরার চোখের আড়ালে থেকে অভিনেতা অভিনেত্রীদের গতি নির্দ্দেশ করেন, তেমনি সার্কাসে যিনি বাঘের খেলা দেখান, বা চিড়িয়াখানায় যে লোক সেই বিশেষ পশুর রক্ষক, ক্যামেরার চোখের আড়ালে থেকে সেই সেই লোকই তাদের জানোয়ারগুলিকে ছবিতে পরিচালিত করেন চলচ্চিত্র পরিচালকের ইচ্ছা ও আদেশ অনুযায়ী।

লৌহ পিঞ্জরগুলি এত সুবৃহৎ যে, তারমধ্যে কৃত্রিম অরণ্যের দৃশ্যপট প্রস্তুত করে নেওয়া চলে। নদী ও পর্ব্বত কিম্বা গুহা বা গভীর জঙ্গলের দৃশ্যপট যদি কৃত্রিম না ক'রে স্বাভাবিক দেখাবার ইচ্ছা হয়, তাহ'লে সেইরূপ স্থান বেছে নিয়ে তার খানিকটা অংশ লৌহজাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়, এবং জানোয়ারদের তার মধ্যে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারা সেই নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়লে তখন সেখানেই ছবি তোলার ব্যবস্থা হয়। পশুরক্ষক বা শিক্ষকরা ইতিমধ্যে তাদের সঙ্গে নায়ক নায়িকাদের পরিচিত ক'রে দেয় এবং মহলা দিয়ে পশুদের চিত্রোপযোগী শিক্ষা দিয়ে রাখে। সেখানে নায়ক নায়িকারা হিংস্র বন্যপশুদের সম্মুখীন হ'তে ভয় পায় সেখানে ছায়াধর-রা তাদের সাহায্য ক'রে। অর্থাৎ পশু ও অভিনেতাদের চিত্র পৃথক পৃথক নেওয়া হয় এবং পরে উভয় চিত্রকে একত্রে সংযুক্ত করে একই ছবিতে পরিণত করা হয়। ক্যামেরার এই কৌশলের গুণে চলচ্চিত্রে অনেক অসাধ্য সাধন দেখানো সম্ভব হ'য়েছে।

অনেক সময় আমরা ছবিতে দেখতে পাই নিউইয়র্কের বড় বড় গগনস্পর্শী (Sky-scrapper) বাড়ীর দেওয়াল বয়ে বয়ে একটি লোক উপরে উঠে যাচ্ছে বা নেমে আসছে। একবার যদি হাত ফস্কে পড়ে যায় তাহ'লে একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যাবে? আসলে কিন্তু সে লোক কোনো বাড়ীর দেয়াল বেয়ে ওঠে না। মাটীর উপর শোয়ানো বাড়ীর কৃত্রিম দৃশ্যপটের দেওয়ালের গায়ে গুঁড়ি মেরে মেরে চলে। 'ছায়াধর যন্ত্র উচ্চমঞ্চের উপর থেকে তার সেই ছবি তুলে নেয়। পরে ক্যামেরার কৌশলের গুণে তোলা সে ছবি যখন উল্টো ছাপা হ'য়ে পর্দ্দার উপর এসে পড়ে তখন দেখে মনে হয় একটি লোক যেন যথার্থই সেই আকাশ-চুম্বী সৌধের দেওয়াল ব'য়ে ব'য়ে সোজা উপরে উঠে যাচ্ছে! হিংস্র পশু সংক্রান্ত অধিকাংশ ছবিই প্রায় ক্যামেরার কৌশলের গুণেই দর্শকদের চোখের সামনে সত্য ঘটনা বলে প্রতিভাত হ'য়ে ওঠে, এবং তা দেখে তাদের বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না। উচ্চ পর্ব্বতের চূড়া থেকে বা বিশতলা বাড়ীর ছাতের উপর থেকে একটা লোক ঠিক্‌রে সমুদ্রের জলে পড়ে গেলো বা রাস্তার উপর আছাড় খেয়ে পড়লো দেখে আমরা অবাক্ হ'য়ে ভাবি—কী আশ্চর্য্য! এ কেমন ক'রে করে? প্রাণের ভয় নেই! কিন্তু, আসলে পাহাড়ের চূড়ো থেকে বা ছাতের উপর থেকে যেটা সমুদ্রের জলে বা রাস্তার উপর এসে পড়ে সেটা সেই মানুষের একটা কৃত্রিম মূর্ত্তি—আসল মানুষটি নয়! ক্যামেরায় শুধু আসল মানুষটির পড়ার ভঙ্গীটুকু পর্য্যন্ত নিয়ে পরে নকল মূর্ত্তিটির পড়ে যাওয়ার ছবি তোলে, এবং জলের ভিতর থেকে, বা রাস্তার উপর থেকে আবার আসল মানুষটির ছবি নেওয়া হয় একেবারে সে জলের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে, নয়ত'—রাস্তার উপর অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে! মাঝের এই ফাঁকিটুকু ক্যামেরায় এত সহজে সেরে নেওয়া যায় ব'লেই—ছবিতে মানুষের পক্ষে বড় বড় পাহাড় ডিঙিয়ে যাওয়া, সমুদ্র সাঁতরে পার হওয়া প্রভৃতি অসম্ভব কাণ্ড করাও তুচ্ছ ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

হিংস্র পশু নিয়ে নাড়াচাড়াটা অবশ্য এতটা সহজ ব্যাপার হ'য়ে ওঠেনি এখনো। পূর্ব্বেই বলেছি, তাদের জন্য বড় বড় খাঁচা ব্যবহার করতে হয়। ক্যামেরায় ছবি নেবার সময় খাঁচাটি ওঠে না! কারণ, সেটি এত বড়ো যে ক্যামেরার দৃষ্টির বাইরেই থেকে যায়। তাই অতি

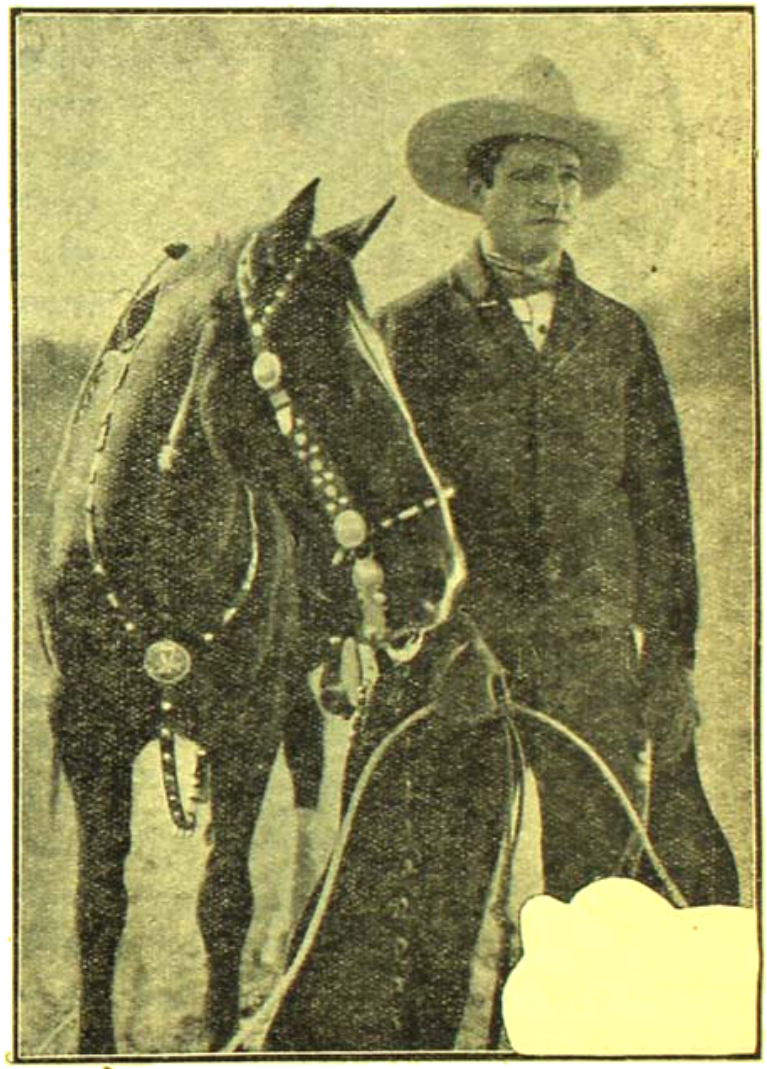

'টমমিক্স' ও 'টনি' (টমমিক্সের এই শিক্ষিত অশ্ব 'টনি' না থাকলে টমমিক্সকে আজ কেউ চিনতো না)

সহজেই খাঁচাটি বাদ দিয়ে কেবল জানোয়ারগুলির ছবি তোলা হয়। ক্যামেরা নিয়ে ক্যামেরাম্যান থাকেন সেই বড় খাঁচার ভিতর স্থাপিত আর একটি ছোট খাঁচার মধ্যে। অনেক দৃশ্যের ছবি আবার এ-সব ক্ষেত্রে জন্তুদের সঙ্গে একত্র অভিনয় ক'রে তোলা হয় না—বৃহৎ আয়নার

সাহায্যে জানোয়ারদের প্রতিবিম্ব সহযোগে অভিনয় করা হয়। 'ট্রেডারহর্ণ' ছবির কয়েকটি দৃশ্য প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকার অরণ্যে গিয়ে তোলা হ'য়েছে বলে শোনা যাচ্ছে; অবশ্য বাকীগুলি হোলিউডের চিত্রগড়েই তৈরি ক'রে নিয়ে তোলা হ'য়েছে। 'চ্যাঙ্' 'রঙ্গো' বা আফ্রিকা কথা বলে' প্রভৃতি হিংস্র জীবজন্তু বহুল ছবিগুলির

ফোর্ড টমসন্ ও তাঁর শিক্ষিত কাকাতুয়া

অধিকাংশই এই ভাবে তোলা হয়। কতক আসল, কতক নকল!

যে ছবিতে একটিমাত্র বাঘ বা একটিমাত্র ভালুক, বা একটি চিতা কি একটি সিংহ অভিনয় ক'রছে দেখা যায় সেখানে বুঝতে হবে—ঐ হিংস্র পশুটি সুশিক্ষিত কুকুর বিড়ালের মতই অত্যন্ত পোষমানা এবং একেবারে নিরীহ। 'লীয়ো' 'নোয়া' মিনী' প্রভৃতি এই জাতীয় জীব। এদের নিয়ে শিশুরাও নির্ভয়ে অভিনয় করতে পারে।

কোনো কোনো ছবিতে চরম দৃশ্যে (climax) নাটকীয় রস ঘনীভূত ক'রে তোলবার জন্য ইতর-প্রাণীর সাহায্য খুব কাজে আসে। যেমন ধরুন—অবস্থা-বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আত্মীয় বন্ধু যখন 'নায়ককে' ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলো, এমন কি তার স্ত্রী পুত্র পর্য্যন্ত যখন তার মুখের দিকে চাইলে না—যখন সে সংসারে নিতান্ত অসহায় ও একা—তখন, দু'টি চোখে অসীম সমবেদনা পূরে কোনো প্রভুভক্ত মূক জীব যদি সেই সবার পরিত্যক্ত মানুষটিকে বন্ধুর মত ঘিরে থাকে তাহ'লে সে দৃশ্য দর্শকের অন্তর স্পর্শ না ক'রে পারে না। অথবা, কোনো কঠিন বিপদের মধ্যে জীবন-মরণের সমস্যার মাঝখানে কেউ যখন রক্ষা করবার নেই—সেই সময় কোনো মূক প্রাণী যদি নিজ জীবন বিপন্ন ক'রেও তার প্রিয় প্রভুকে সেই আপদ থেকে পরিত্রাণ করে, তাহ'লে সে দৃশ্য ছবিখানিকে স্মরণীয় করে রাখে।

অকারণ ছবিতে ইতর প্রাণীর সমাবেশ ক'রে কোনো লাভ নেই। হাস্যরস-প্রধান চিত্র ছাড়া অন্য কোনো ছবিতে তাদের আনতে হ'লে পরিচালকের লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে তাদের সাহায্যে চিত্রের নাটকীয় রস ঘনীভূত ক'রে তোলা যায়। অনেক সময় 'প্রতীক্' স্বরূপ ছবিতে ইতর প্রাণীর ব্যবহার দেখা যায়—যেমন আসন্ন অমঙ্গলের সূচনা স্বরূপ কালপেঁচা, কালো বিড়াল,—আসন্ন মৃত্যুর আভাসরূপে শৃগাল বা শকুন, বসন্তের সমাগম ঘোষণাতে কোকিল বা পাপিয়া, প্রেমিক যুগলের নিবিড় মিলনের ইঙ্গিত দিতে কপোত মিথুন, ভিটে মাটি যাবার আগে সেখানে ঘুঘু চরাণো—ইত্যাদি প্রতীক্ ছবিকে সুন্দর ক'রে তোলে। চ্যাঙ, রঙ্গো, ট্রেডারহর্ণ, 'আফ্রিকা কথা বলে' প্রভৃতি ছবি বিশেষভাবে ইতর প্রাণীদের খেলা দেখাবার জন্যই তোলা এবং সেই ভাবেই গল্প লেখা! সুতরাং ও ছবিগুলিকে 'জীব চিত্র' বা Animal Seriesএর ছবি বলা চলে।

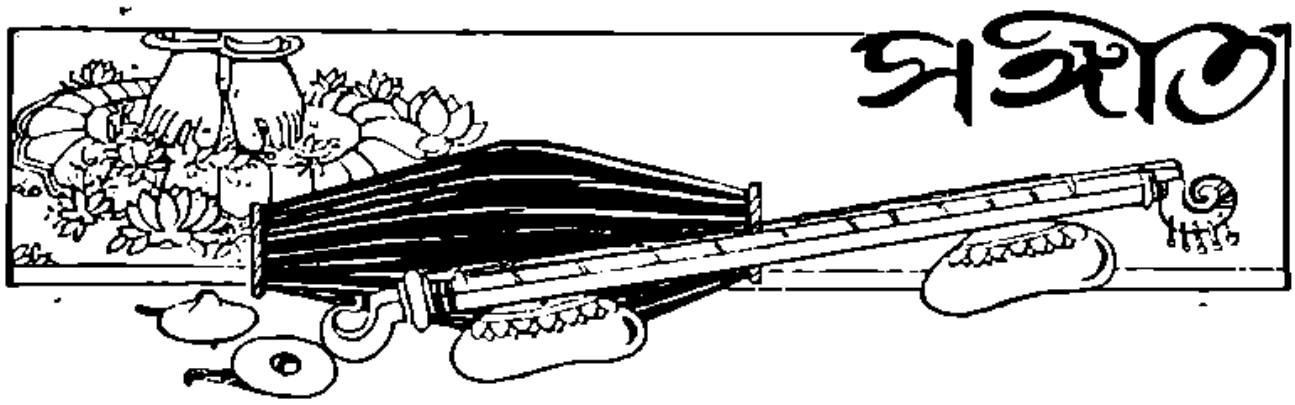

পাহাড়ী-কানাড়া মিশ্র - রূপক

বিরহের গুলবাগে মোর ভুল ক'রে আজ
ফুটলো কি বকুল।
অবেলায় কুয় বীথি মুখরিতে
এলে কি বুলবুল॥

এলে কি পথ ভুলে মোর আঁধার রাতে
ঘুম-ভাঙান চাঁদ,
অপরাধ ভুলেছ কি, ভেঙেছে কি
অভিমানের বাঁধ॥

প্রদীপ নিভে আসে—ইহারি ক্ষীণ আলোকে,
দেখে নিই সেব দেখা যত সাধ আছে চোখে;
মরণ আজ মধুর হ'লো পেয়ে তব
চরণ রাতুল॥

হে চির-সুন্দর মোর,—জীবন-সন্ধ্যা মম,
রাঙালে রাঙা-রঙে, উদয় উষার সম;
ঝরে পড়ুক তব পায়ে আমার এ
জীবন মুকুল॥

কথা ও সুর :—কাজী নজরুল্ ইস্‌লাম্ স্বরলিপি :—শ্রীজগৎ ঘটক

সা II II সা -া রা মা | মা পা পমা | ণ্ধা -া রা -া | সা -া ধা I
বি র • হে র্ ণ্ড ল্ বা গে • মো র্ ভু ল্ ক
• বে • লা র্ কু ন্ জ বী • থি • মু ন্ জ

I সা -া সা -া | রা -া সা | রা -া রপা -মপা | মণ্ধা -া সা II II
রে • আ জ্ ফু ট্ লো কি • ব • • কু • ল্ অ
বি • তে • এ • লে কি • বু • ল্ • বু • ল্ বি

সা II সা -া রমা -পধা | ধা -া ধা | ধা -া ণধা -পমা | মা রমা -মা I
এ লে • কি • • প থ্ ভু লে • মো • র্ • আঁ ধা • র

I মপা -া পা -া | মপা -ধা ধা | ধা -া ণধা -পমা | মপা -া -া I
রা • • ভে • ঘু • ঘ্ ভা ভা • ন • • • চা • •

I গমা -গরা -সা -া | -সরা -সরা -গা | -সা -া -া -া | । । সা I
• • • • • • • • • • • • • • • • ঘ্ • • অ

I সা -া রা মা | মা -পা পমা | ঘজ্ঞা -া রা -া | সা -া ধ্া I
প • রা ধ্ ত্ব • লে ছ • কি • ভে • ডে

I সা -া সা -া | রা -া সা | রা -া রপা -মপা | মজ্ঞা -া -া II
ছে • কি • অ • তি মা • নে• ঘ্• বী• ধ্ •

শেয়র্ * II গমা গমা -পধা -না -ধা না না | না নর্সা -র্সনা -ধনা -ধা । । I
প্র• থী• • • • পূ নি তে আ লে• • • • • • • •

I নর্সা সা র্সা -া র্সা -া র্সা | র্সা র্সা -া -া -া -া -া I
ই• হা রি • ক্ষী ণ্ আ লো কে • • • • •

I ধনা না না না নর্সা -নর্সা -র্সা | র্সা র্সনা -া -া -া -া -া I
লে• খে নি ই লে• • • ঘ্ লে খা • • • • •

I না না না না না র্সনা -ধপা | পধা পা -া -া -া -া সা II
ব ত্ত সা ধ্ আ ছে• • • চে• খে • • • • • ম

তালে II সা সা রা মা | মা -পা পমা | ঘজ্ঞা -া রা -া | সা -া ধ্া I
ম ণ্ আ ঘ্ ম ধু র হ' • ল • পে • রে

I সা -া সা -া | রা -া সা | রা -া রপা -মপা | মজ্ঞা -া সা II II
ত • ব • চ • র ণ • রা• • • তু• ল্ বি

শেয়র্ * II পা পা -পা পক্ষা -গক্ষা -গা গপা | -পা পা -া -া -া -া -া I
হে চি র ঘু• • • ন্ ঘ• র মো • • • • ঘ্

I ক্ষা পা পনা -ধনা -ধা ধপা -ধা | পা -ক্ষপক্ষা -গা গমা গা -া -া I
জী ব ন• • • • ম ন্ ধ্যা • • • • ম• ম • •

I গমা -মা -মা -া মা গমা -পা | মপা -পা পদা ধপা -দা -পদপা -মা I
রা• ঙা লে • রা ঙা• • • • • ঘ• ভে • • • • •

I মা মা গমগা -ঝা গা গমা -া | -গমপা -পদা পদা -পা -দপা -দমা -া I
উ ধ ঘ• • • ঊ ষা• • • • • • ঘ্• স• ম • • • • •

I পমা -া -া -ঝা ঝা -ঝা ধসা | -া -া সা -সা -া । সা II
হে • • • চি র ঘু ন্ • ধ র • • ঙ

তালে II সা -া রা মা | মা -পা পমা | ঘজ্ঞা -া রা -া | সা -া ধ্া I
রে • প • ড়ু ক্ ত ব • পা ঘ্ আ • মা

I সা -া সা -া | রা -া সা | রা -া রপা -মপা | মজ্ঞা -া সা I II
র • এ • জী • ব ন • মু• • • তু• ল্ বি

* * 'শেয়র্' সাধারণতঃ তালে গীত হয় না ; এই হেতু, 'শেয়র' গাহিবার সময় সঙ্গত বন্ধ রাখাই নিয়ম। 'শেয়র' গীত হওয়ার পর যে স্থল হইতে সঙ্গত চলিবে তাহার পূর্বে 'তালে'—এই কথা লিখিত হইল।

গ্রন্থ-প্রাপ্তি-স্বীকার

সমালোচনার জন্য আমরা নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি—

ব্রহ্মসঙ্গীত, একাদশ সংস্করণ (মাঘ, ১৩৩৮) ; সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ।

"ভারতের রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভা" ; শ্রীঅরবিন্দ। [শ্রীঅরবিন্দের A Defence of Indian Culture হইতে অনূদিত] অনুবাদক শ্রীঅনিলবরণ রায়। ম্যাকমিলান কোং লিমিটেড। মূল্য ১৷০

"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" প্রথম খণ্ড (১—৮ অধ্যায়) ; অন্বয়, স্বামিটীকা, অনুবাদ ও বিস্তৃতার্থ সহিত। প্রকাশক—শ্রীনীলকান্ত গোস্বামি ভাগবতাচার্য্য কর্ত্তৃক অনূদিত ও ব্যাখ্যাত। ১৪.২।১ বাহির সিমলিয়া রোড, পত্তনদার হইতে শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষাল দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ১৷০

"আধুনিকী" শ্রীললিতাকান্ত গুপ্ত প্রণীত। নয়টি প্রবন্ধে আধুনিক সকল ব্যাপারের আলোচনা। ম্যাকমিলান কোং লিমিটেড। মূল্য ১৲।

"সরল বাইওকেমিক চিকিৎসা"—ডাক্তার শ্রীশৈলেন্দ্রচন্দ্র সামন্ত প্রণীত। বি সামন্ত কার্ম্মেসী, বর্দ্ধমান। মূল্য ৩৲

"দু-ভাই" সামাজিক ও নৈতিক উপন্যাস ; শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসাক প্রণীত। ৬৬নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস। মূল্য ১৲।

"মণিহারের চাবি" খণ্ডকাব্য ; শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত প্রণীত। ১২৩।৩ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ।৹

"সীতা-চিত্র" পৌরাণিক কাহিনী ; শ্রীমতী রমলা দেবী প্রণীত। Aryan Library, 204 Cornwallis St. Calcutta. মূল্য ।৹

"বিস্মৃতি" শকুন্তলা নাটকের চতুর্থ অঙ্কের পদ্যানুবাদ—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত। ডি, এম, লাইব্রেরী, ৬১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। মূল্য ।৹

"নারীর কথা" প্রবন্ধ পুস্তক ; শ্রীললিতাকান্ত গুপ্ত প্রণীত। শ্রীঅরবিন্দ লাইব্রেরী, ২০৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। মূল্য ১৷০

"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" প্রথম খণ্ড (প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়) ; সংস্কৃত ভাষ্য ও টীকা সম্বলিত ; শ্রীজ্ঞানগোপাল সান্যাল সম্পাদিত। ১১৪নং বাবুডাঙ্গা রোড, সালখিয়া, হাবড়া। ও ২০৯।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। মূল্য ২৲

"সীতা সোপান"—কুমার শ্রীবিজনেন্দ্রনারায়ণ তত্ত্বনিধি বি-এ প্রণীত। ১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৲

"ফুলের ডালি" ছেলেদের গল্পের বই—শ্রীরাধেন্দু বসু প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। মূল্য ।৹

"আমাদের দেশ বিদেশে" শিশুপাঠ্য ভ্রমণ কাহিনী—শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ।৹

"মানব-জীবন" ভাবব্যঞ্জক প্রবন্ধাবলী।—ডাক্তার শুৎফর রহমান প্রণীত। প্রকাশক—মৌলভী মইনুদ্দীন মোয়াজ্জেম, পোঃ হাজরাপুর, যশোহর। মূল্য ৸৹

"জন্ জন্" খণ্ডকাব্য ; মহম্মদ ফজর আলি খান প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান মালপাড়া, পোষ্ট ঘোড়ামারা, জিলা রাজসাহী। মূল্য ১৲

"ক্রীতদাসের আত্মকাহিনী" "Up from Slavery" নামক পুস্তক হইতে অনূদিত। শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং ৬৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৷৵৹

"স্বপ্ন-কবি" খণ্ডকাব্য ; শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। দাশ বিনয়কৃষ্ণ, হার্ডিঞ্জ হোষ্টেল, কলিকাতা ঠিকানায় প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৲

"কুসুমিকা" খণ্ডকাব্য ; শ্রীসতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ২ বি কাশিবিশের ঘাট ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা ঠিকানায় প্রাপ্তব্য। মূল্য ৷৵৹

"ব্যথার সাথী"-ছোট গল্প ; শ্রীসতীন্দ্রকুমার সিংহ প্রণীত। ৬৬নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় প্রাপ্তব্য। মূল্য ১।০

"বাঙ্গলা দেশের গাছপালা" কবিরাজী ঔষধ সংক্রান্ত বই। কবিরাজ শ্রীহরিভূষণ সেন প্রণীত। বাণী ষ্টোর্স, ২০।১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য ৷৵৹

"সটীক: জাতকালঙ্কার:" জ্যোতিষগ্রন্থের বই। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরনাথ পাঠক—কাব্য-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ কৃত—বঙ্গানুবাদ সহিত:। ৯৭।৩ হ্যারিসন রোড ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲

"বন্যা-প্রপীড়ন" শিশুমঙ্গল সমিতিতে পঠিত প্রবন্ধ—শ্রীবিভূতিভূষণ পাল প্রণীত। ১।১ আনন্দ রায় ষ্ট্রীট, আর্ম্মাণিটোলা, ঢাকায় প্রাপ্তব্য। মূল্য ।৹

"বাঙ্গালার খোড়া পত্তন" প্রথম ভাগ (ভবানন্দ) শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত। চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ২৷০

"লোহাপড়া কাহিনী"—স্থানীয় ইতিহাস ; শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বসুমদার বি-এল প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—বৈষ্ণবচরিতা কার্য্যালয়, যশোহর ; ও বসুমদার ব্রাদার্স, লোহাপড়া। মূল্য ৩৲

"চলার পথে"—উপন্যাস ; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—এসুয়াল রেজিষ্ট্রার আফিস, ৭৮।২৷১ ডি, লোয়ার সার্কুলার রোড। মূল্য ২৲

"ফেরার পথে"—উপন্যাস, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—এসুয়াল রেজিষ্ট্রার আফিস, ৭৮।২৷১ ডি, লোয়ার সার্কুলার রোড। মূল্য ১৷০

"মরণের পরপারে"—কবিতা ; শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি-বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান—২০৫, অপার্ব্ব কুণ্ড, কাশী। মূল্য এক মুদ্রা।৹

সন্ধান

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এম-এ, বি-এল, ডি-লিট (পেরিস)

(হাফিজ হইতে মূলের ছন্দের অনুকরণে)

সন্ধানে থাম্‌বো না তার, যাবৎ না পাই তার মিলন ;
হয় পাবো সেই জীবন-নাথ, নয় দেহ ছাড়বে জীবন।

দেখো গো মরণ পরে আমার সে কবর খুঁড়ে,
অন্তরের আগুন হ'তে উঠ্‌ছে ধূম "কাফন" ফুঁড়ে।

মুখখানি একটু দেখাও, হ'ক্ সারা বিশ্ব ব্যাকুল ;
ঠোঁট দু'টী একটু খোলো, লোক হউক কেঁদে আকুল।

পরাণ মোর ঠোঁটে এল, মনে খেদ তার অন্তরে
কিছুই না পেয়েই বুঝি পরাণ মোর যাত্রা করে।

তোমার ঐ মুখের খেদে প'ড়েছি প্রাণ সঙ্কটে,
পরীবের মনের আশা ঐ মুখে পূর্ণ ঘটে।

বলিলাম নিজের মনে, "তার থেকে মন ফিরে নে ;"
বলিল "এ কাজ সাজে নিজ পরে হয় প্রভু যে।"

তোমার কি' এ ভাষা চুলের পেঁচে পক্ষাশটী
মনের কি ছাই সে পেঁচে উদ্ধার আছে ?

ফুট্‌বে ফুল গোলাপ-বাগে তোমার ঐ মুখটী হেন,
এই আশে মলয় আসে পুনঃ পুনঃ।

শঠের ন্যায় নিতুই নব বঁধু কি কর্‌বো গ্রহণ !
আমি আর আস্তানা তার যাবৎ না ছাড়্‌বো জীবন।

দাঁড়াও হে, জন্মাবে "সার্ত"—"আনার" মাধুরীতে, চারি ভিতে।
তোমার গঠন আর গতির বাগিচার

প্রেমিকের দলের মাঝে হাফেজের সুনাম রটে,
যেখানেই নামটী তাহার লোক-মুখে বেয়োর ঠোঁটে

শোক-সংবাদ

পরলোকে স্বর্ণকুমারী দেবী

সত্যসত্যই বাঙ্গালা-সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল—পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী আর ইহজগতে নাই। বিগত ১২শে আষাঢ় রবিবার পূর্ব্বাহ্নে তিনি তাঁহার বালিগঞ্জের বাসভবনে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। আমরা আয়োজন করিতেছিলাম, আগামী ১৪ই ভাদ্র তিনি সাতাত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ করিলে, আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিব, বাঙ্গালা সাহিত্যিকগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিব; হঠাৎ সংবাদ পাওয়া গেল পাঁচদিনের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাতে তিনি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করিলেও আমরা তাঁহার অভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছি।

স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী

১২৬৪ সাল (ইং ১৮৫৭) ১৪ই ভাদ্র স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম হয়। ইনি স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ও রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। বাঙ্গলা, ইংরাজী ও সংস্কৃতে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। মহিলাদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস-রচয়িত্রী এবং সর্ব্বপ্রথম পত্রিকা সম্পাদিকা। স্বর্ণকুমারী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ে মিলিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে ছোট গল্পের প্রবর্ত্তন করেন, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হইবে না। ১২৯১ হইতে ১৩২১ সাল পর্য্যন্ত (মধ্যে চার পাঁচ বৎসর বাদ) যেরূপ যোগ্যতার সহিত তিনি "ভারতী"র সম্পাদনা করেন, বাঙ্গলা পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাহা আজিও আদর্শ হইয়া আছে।

নারীজাতির উন্নতিকল্পে তিনি অগ্রণী ছিলেন। সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের একত্র মিলন, স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ও বিধবাশ্রম প্রভৃতি স্থাপন করিয়া বিধবাদের সাহায্য প্রভৃতি উদ্দেশ্য লইয়া ১২৯৩ সালে তিনি তাঁহার পরলোকগতা জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবীর সহযোগে "সখি সমিতি" নামে এক মহিলা-সমিতি স্থাপন করেন। মহিলা সমাজের মধ্যে শিল্পোন্নতিকল্পে "মহিলা শিল্প মেলা" নামে এক মেলাও তাঁহার চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত পুস্তকাদির মধ্যে প্রথম উপন্যাস—দীপ-নির্ব্বাণ, দুগলীর ইমামবাড়ী, ছিন্ন মুকুল, স্নেহলতা, বিদ্রোহ, কাহাকে, মেবার-রাজ, ফুলের মালা, নবকাহিনী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে 'ফুলের মালা' ও 'কাহাকে' ইংরাজীতে ভাষান্তরিত হইয়াছিল। বাঙ্গলা সাহিত্যে তাহার অপরিমেয় দানের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণ পদক' প্রদান করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ভবানীপুরের অধিবেশনে তিনি সভানেত্রীর পদে বৃত হইয়াছিলেন। বাঙ্গলার যে পরিবার শিক্ষায়, দীক্ষায়, সাহিত্যে, সঙ্গীতে ও শিল্প-কলায় বাঙ্গলাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, তিনি ছিলেন সেই বিখ্যাত ঠাকুর বংশের সার্থক-জন্মা মহিলা। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী পরলোকগতা হইয়াছেন; এখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্না ঘোষাল ও কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী জীবিত আছেন।

৺মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

আমরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছে যে, ঋষি-প্রতিম মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিগত ৪ঠা জুন সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি 'মাষ্টার মহাশয়' নামেই পরিচিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের শিষ্য-মণ্ডলীর মধ্যে 'মাষ্টার মহাশয়' গৃহ-দেবতার মত ছিলেন। মাষ্টার মহাশয় নির্লিপ্ত গৃহ সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে; এমন

সুন্দর পুস্তক বাঙ্গালা সাহিত্যে অতি কমই আছে—নাই বলিলেই হয়। তিনি এই কথামৃতে নিজের নাম দেন নাই, 'ম-লিখিত' বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গুরু-ভক্তি অনন্য-সাধারণ ছিল, রামকৃষ্ণদেবের নাম করিতেই তিনি আবেশ-বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। তাঁহার পরলোক-

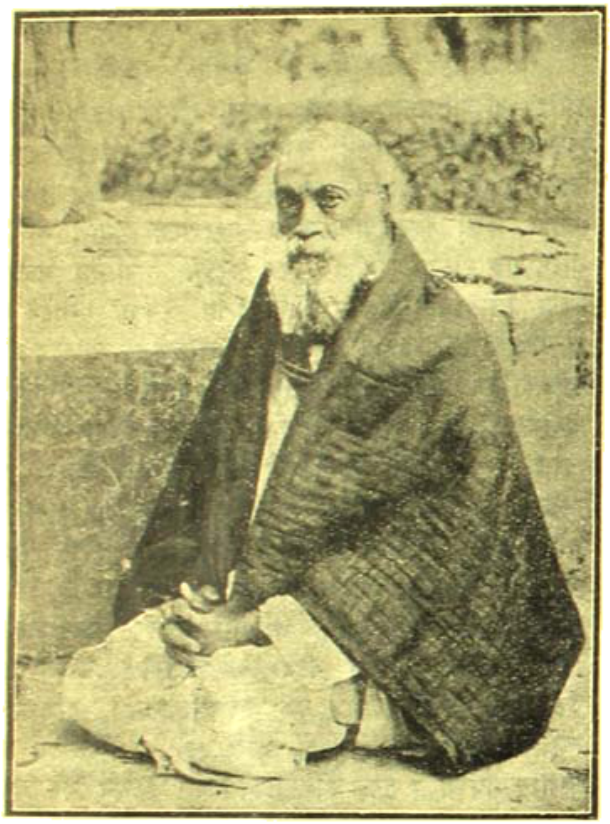

স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

গমনে আমরা শোকপ্রকাশ করিব না, তিনি তাঁহার চির জীবনের বাঞ্ছিত গুরু-চরণ-সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন যে!

পরলোকে দ্বিজেন্দ্রনাথ

বিগত ১০ই আষাঢ় শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪টা ১০ মিনিটের সময় দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার ১৪নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে সহসা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ক্রম ৫৭ বৎসর হইয়াছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি প্রথমে বি, এল পাশ করিয়া ওকালতী ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। পরে বিলাত গিয়া তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসেন। তিনি কলিকাতা হাই-কোর্টের একজন প্রবীণ ব্যারিষ্টার ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত যশঃ ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু বরদ্বাউট এসোসিয়েশনের (বেঙ্গল) সহঃ-সভাপতি এবং কলিকাতা ফুটবল লীগের সভাপতি ছিলেন। গত বৎসর তিনি ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। গত কয়েক বৎসর হইতে এ পর্য্যন্ত তিনি মোহনবাগান ক্লাবের জেনারাল সেক্রেটারী ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বেঙ্গল ওলিম্পিক এসোসিয়েশনের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পৃথিবীতে তাঁহার শত্রু বলিতে কেহ ছিল না। তিনি দরিদ্রের বন্ধু ও দানশীল ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সহধর্ম্মিণী পরলোকগমন করেন এবং মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুবেদার-মেজর শৈলেন্দ্রনাথ বসু পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার চার পুত্র ও তিন কন্যা বর্ত্তমান; তন্মধ্যে দুইটী বিবাহিতা। তাঁহার দুই ভ্রাতা বর্ত্তমান। তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু। তিনি পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহা-

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

শয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা দ্বিজেন্দ্রবাবুর আত্মীয় স্বজনগণের গভীর শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

সাময়িকী

বিশ্ববিদ্যালয়ের বজেট—

বিগত ২৮শে জুন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব-বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সিনেটের সম্মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেট দাখিল করেন। এই বাজেটে আলোচ্য বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আয় ১৯৬৭৬৮০৲, ব্যয় ১৯৭৭৮৭৲ এবং উদ্বৃত্ত ৩৯৯৩৭৲ টাকা দেখিতে পাওয়া যায়। বাজেট দাখিল করিতে গিয়া ডাক্তার রায় এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের নিকট ৫ লক্ষ টাকা অর্থসাহায্য চাহিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট যদি উহা মঞ্জুর না করেন, তাহা হইলে দুই এক বৎসরের ভিতরই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠিবে। বর্ত্তমান বাজেটে যে টাকাটা উদ্বৃত্ত দেখা যাইতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়-সঙ্কোচ করিয়া, আয় বৃদ্ধি করিয়া এবং গবর্ণমেণ্ট ৩৬০,০০০৲ টাকা অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন, তাহা হিসাবে ধরিয়া ঐ টাকা উদ্বৃত্ত দাঁড়াইয়াছে। তিনি আরও বলেন, গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অর্থসাহায্যের দ্বারাই হউক, কিম্বা আয়ের নূতন পথ বাহির করিয়া, অথবা ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া আয় বৃদ্ধি না করিতে পারিলে দুই এক বৎসরের অধিককাল সুযোগ্যভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ চালান আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। অতঃপর ডাক্তার রায় বলেন, এই নবম বার তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট উপস্থিত করিয়া সৌভাগ্যলাভ করিলেন। গত ১৯২২ সাল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্কট আরম্ভ হইয়াছে। স্যার আশুতোষ মুখুয্যের মৃত্যুর পর হইতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্দ্দিন দেখা দিতে থাকে। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা আপোষ নিষ্পত্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাকে খুব সন্তোষজনক বলা যায় না।

শোনা কথা—

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতিক ব্যবস্থা কি হইবে, তাহা জানিবার জন্য দেশের অনেকেই উৎসুক হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে বিলাতের ভারত-সচিব, এ দেশের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সেদিন যে ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতেই মোটামুটি অনেক কথা জানিতে পারা গিয়াছে। স্থানান্তরে আমরা সে বিবরণ প্রকাশ করিলাম। কিন্তু, এ বিষয়ের গুজবের আর অন্ত নাই। এখানকার সংবাদপত্রগুলির সিমলার সংবাদদাতাগণ যখন-তখনই 'বিশ্বস্তসূত্রে' অবগত হইয়া অনেক সংবাদ প্রেরণ করিয়া থাকেন; সরকার হইতে সে সম্বন্ধে কোন কথাই জানিতে পারা যায় না এবং তাহার সত্যমিথ্যাও নির্দ্ধারণ করা যায় না। এই রকম একটা বিশ্বস্তসূত্রে শোনা কথা 'আনন্দবাজার পত্রিকা' হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। কথাটা এই—

"শোনা গেল, ভারত গবর্ণমেণ্ট নাকি মোটামুটি সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের ১৪ দফা দাবী মিটাইয়া দিবার জন্য লণ্ডনে সুপারিশ করিয়াছেন। স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-প্রথা থাকিবে, বাঙ্গলা ও পঞ্জাবে শতকরা ৫১টি পদ মুসলমানদের ভাগে পড়িবে—এমন কি জমীদার, ব্যবসায়ী, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বিশেষ যুক্ত নির্ব্বাচিত সদস্যদের মধ্যেও মুসলমান পদসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে, মন্ত্রিমণ্ডলেও মুসলমান মন্ত্রীপদ সংখ্যা "রিজার্ভ" থাকিবে ইত্যাদি। বড়লাটের মন্ত্রিসভার মধ্যে নাকি স্যার ব্রজেন্দ্র মিত্র এবং স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার এই সুপারিশের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং সাহস করিয়া নাকি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, ইহাতে হিন্দু সমাজের প্রতি ঘোরতর অবিচার হইবে।" 'আনন্দ বাজার' কিন্তু এ সংবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই এবং ইহাকে সাম্প্রদায়িক ধাপ্পাবাজী বলিয়াছেন।

ভারত-সচিবের বক্তৃতা—

বিলাতের কমন্স সভায় ভারত-সচিব শ্রীযুক্ত স্যার সামুয়েল হোর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার সার-মর্ম্ম বিবৃত হইল। তিনি তিনটী বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন (১) অর্ডিনান্স,

(২) সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও (৩) রাষ্ট্রতন্ত্র-রচনার পদ্ধতি। প্রথমেই অর্ডিন্যান্স সম্বন্ধে সার স্যামুয়েল বলেন, ভারতের কর্তৃপক্ষ যে কার্য্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, সাধারণভাবে বলিতে গেলে তাহা আইন অমান্য আন্দোলনকে সম্পূর্ণ দমনে রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া গিয়াছে। আমি এখনও বলিতে চাই যে, অত্যধিক ক্ষমতা প্রয়োগের যে অভিযোগ করা হয় তাহার মূলে ভিত্তি নাই। তবে এই সব ক্ষমতা যে খুব কঠোর তাহা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু রাষ্ট্রের সুসংহত বল ও শক্তি নষ্ট করিয়া আইন অমান্য আন্দোলন যে সাফল্য লাভ করিতে পারে না, তাহা প্রমাণ করিবার আবশ্যকতাবোধে এই সব কঠোর ক্ষমতা একান্তই সমর্থনীয়। আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে দশ হাজার লোকের মধ্যে এক জনকেও এবং অর্ডিন্যান্স অনুসারে কুড়ি হাজারের মধ্যে একজনকেও অভিযুক্ত করা হয় নাই। পক্ষান্তরে, এই সব জরুরী ক্ষমতা থাকায় লোকের ধন প্রাণ নষ্ট হওয়া নিবারিত হইয়াছে এবং বল প্রয়োগ করিবার প্রয়োজনীয়তাও বহুল পরিমাণে যে কমিয়া গিয়াছে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। বাস্তবিক যেখানে প্রয়োজন হইয়াছে, শুধু সেখানেই অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং এখন ইহার প্রয়োগও ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। কিন্তু দুষ্কৃতকারীরা দমিত হইলেও তাহারা এখনও তাহাদের ধ্বংসকর অভিযান ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহেন।

এইরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের নীতি কত দূর সঙ্গত তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে,—আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং গবর্ণমেণ্টের মঙ্গলকল্প গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্য আবশ্যকীয় কি না এবং ইহা দ্বারা জাতিকে অত্যাচার-উৎপীড়নের হাত হইতে রক্ষা করা যাইবে কি না। গবর্ণমেণ্ট এই দিক দিয়া পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বিশেষ ক্ষমতাগুলি রাখা একান্তই প্রয়োজন। প্রদেশ সমূহের এবং জেলাসমূহের প্রয়োজন অনুসারে এই সমস্ত ক্ষমতা খুব সতর্কতা ও সমবেদনার সহিত প্রয়োগ করা হইবে। এ কথাও বলা প্রয়োজন যে, কর্তৃপক্ষের জনতাকে যে সংঘর্ষে স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আহ্বান করা হইয়াছে, আমরা তাহা দমন করিবার জন্য আমাদের সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।

তাহার পর সার স্যামুয়েল সদস্যদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, যাবৎ সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা না হইবে, তাবৎ কেন্দ্রীয় কিম্বা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টে কোন শাসনতন্ত্রগত উন্নতি বিধান করা যাইবে না। গবর্ণমেণ্ট আশা করিয়াছিলেন যে, সম্প্রদায় সমূহ নিজেরাই এই সমস্যার মীমাংসা করিবেন; কিন্তু সেই আশায় নিরাশ হইতে হইয়াছে। গত ৬ মাসে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর তীব্র ও জটিল হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই এই বিষয়ের একটা সিদ্ধান্ত করিবেন এবং সেই সিদ্ধান্ত তাঁহারা গ্রীষ্মকালেই প্রকাশ করিবেন। কবে এই সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা হইবে, তৎবিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখ প্রকাশ করা সম্ভব নহে। তবে বাধা-বিঘ্ন যতই প্রবল হউক না কেন এবং বিপদ যতই থাকুক না কেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের শাসনতন্ত্রগত কার্য্যপদ্ধতি লইয়া অগ্রসর হইবেনই এবং গ্রীষ্মকালের মধ্যেই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিবেন।

নিখিলভারত যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়া সার স্যামুয়েল হোর বলেন যে, গোলটেবিল বৈঠকের মত বৃহৎ সভার নিয়মমাফিক অধিবেশন দ্বারা গুরুতর সমস্যা-গুলির মীমাংসা করিতে গেলে শুধু বিলম্বই ঘটিবে। সুতরাং তাঁহারা সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত দিতে চান। ভারতের অন্যান্য সমস্যাগুলি সম্বন্ধেও যদি অনেকখানি অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা হইলে কোন বিল পেশ করিবার পূর্ব্বেই শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করিবার জন্য পার্লামেণ্টের উভয় গৃহের একটি মিলিত কমিটি গঠন করা হইবে। এই কমিটি ভারতীয় প্রতিনিধিগণের সহিত পরামর্শ করিবেন এবং পার্লামেণ্ট কর্তৃক স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ভারতীয় মতের প্রভাব বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের বিবৃতি—

কমন্স সভায় ভারত-সচিব যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা স্থানান্তরে দিলাম। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সহকারী সেক্রেটারী রাইটার্স বিল্ডিংএর এক বিশেষ অধিবেশনে সেই সকল বিষয় সম্পর্কে একটী তালিকা পেশ করিয়াছেন। কলিকাতার বিভিন্ন

সংবাদ-পত্রের এবং সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থির করা হইয়াছে।

(১) একটি বিলে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইবে, এই নীতি গৃহীত হইয়াছে।

(২) শাসন সংস্কারের পথে সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে মহামান্য সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

(৩) প্রধান প্রধান বিষয়গুলি ভারতবাসীদের সহযোগিতা এবং পরামর্শ অনুসারে মীমাংসিত হইবে।

(৪) গ্রীষ্মকালের ভিতর সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান (৫) কি প্রকারে ভারতবাসীদের মতামত গ্রহণ করা হইবে তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত ভাবে আলোচনা।

(ক) পরামর্শ-সমিতির দীর্ঘ অধিবেশন, (খ) যে সকল বিষয় পরামর্শ-সমিতি আলোচনা করেন নাই, সেই সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ভারতীয়গণের সহিত লণ্ডনে আলোচনা, (গ) বিল পেশ করিবার পূর্ব্বে ভারতীয় প্রতিনিধিগণের সহিত বিশেষ প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটী যুক্ত-কমিটী গঠন। ১৯১৯ সনের যুক্ত-কমিটির সহিত ইহার যথেষ্ট পার্থক্য থাকিবে। পার্লামেণ্ট বিল গ্রহণের পূর্ব্বে কমিটি সরকারী প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন এবং সে সকল ভারতীয়গণের সহিত আলোচনা করা হইবে তাঁহারা সাক্ষী বলিয়া গ্রাহ্য হইবেন না। (ঘ) প্রয়োজন হইলে (ক) ও (গ) সম্বন্ধীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনার জন্য লণ্ডনে আলোচনার বন্দোবস্ত করা হইবে।

(৬) মোট কথা এই যে, কার্য্যক্ষেত্রে নামিলে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইবে গোলটেবিল বৈঠকের নীতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কার্য্য করিবার জন্যই এই তালিকা উপস্থিত করা হইয়াছে।

প্রবেশিকা-পরীক্ষা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য বিষয় কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার সার হাসান সারওয়ার্দ্দির সভাপতিত্বে গত ডিসেম্বর মাসে এক কমিটী নিযুক্ত হয়। এই কমিটির রিপোর্ট শীঘ্রই সিনেট সভায় পেশ হইবে। সিনেট সভায় গৃহীত এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে আগামী ১৯৩১ সাল হইতে উহা কার্য্যকরী হইবে। প্রকাশ, কমিটি এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন যে, পরীক্ষার্থীগণ ইংরাজী ব্যতীত অপর সকল বিষয়ে মাতৃভাষা, যথা বাঙ্গালা, উর্দ্দু, আসামী বা হিন্দী ভাষার সাহায্যে উত্তর দিতে পারিবে। পরীক্ষার্থীগণকে (১) ইংরাজী, (২) গণিত, (৩) মাতৃভাষা, (৪) একটী প্রাচীন ভাষা, যথা, সংস্কৃত, পার্শি, ল্যাটিন প্রভৃতি, (৫) প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং (৬) ইতিহাস ও ভূগোল, এই কয়েকটী বিষয়ে পরীক্ষা দিতেই হইবে। মাতৃভাষা দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। মুখ্য মাতৃভাষা, যথা,—বাঙ্গলা, উর্দ্দু, আসামী ও হিন্দী এবং গৌণ মাতৃভাষা, যথা,—খাসী, গারো, মণিপুরী ও নেপালী। তাহা ছাড়া, যে কেহ ইচ্ছা করিলে মেকানিকস্, প্রাথমিক স্বাস্থ্যতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ব্যবহারিক ভূগোল প্রভৃতি যে কোন একটী বিষয় লইতে পারিবে। ইহার নম্বর ১০০র মধ্যে ৩০এর অধিক হইলে তাহা মোট নম্বরের সহিত যোগ হইবে। যে সকল পরীক্ষার্থী মুখ্য মাতৃভাষা না লইয়া গৌণ মাতৃভাষা লইবে, তাহাদিগকে এই ইচ্ছাধীন বিষয় সমূহের মধ্যে একটী লইতেই হইবে, কিন্তু দুইটীর অধিক লইতে পারিবে না। ছাত্রীদের জন্য কমিটি পৃথক ব্যবস্থা করিয়াছেন। ছাত্রীরা ইচ্ছা করিলে ব্যাবহারমূলক গণিত, প্রাচীন ভাষা বা প্রাথমিক বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে কারুশিল্প, সঙ্গীত ও পারিবারিক বিজ্ঞান—এই কয়টী পাঠ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে। ইংরাজী শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন জন্য কমিটী প্রতি স্কুলে অন্ততঃ তিন জন এম, এ কিম্বা বি,এ অনার্স অথবা বি টি পাশ শিক্ষক রাখিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন। বর্ত্তমানে যে সকল হেডমাষ্টার ও সহকারী মাষ্টার ১০ বৎসরকাল অধ্যাপনা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যোগ্যতার সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে। ইহা ব্যতীত অপর শিক্ষকদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যোগ্যতার সার্টিফিকেট লইতে হইবে। যাঁহারা ইংরাজী পড়াইবার জন্য নিযুক্ত হইবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাদের নাম রেজেষ্টারী করিতে হইবে। কমিটী আরও প্রস্তাব করিয়াছেন যে, প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে কৃষিকার্য্য, বয়ন, সূত্রধরের কাজ, কর্ম্মকারের কাজ প্রভৃতির যে কোন একটী বিষয়ে কর্ম্মকারের কিছুকালের জন্য শিক্ষালাভ

করিতে হইবে এবং স্কুলে এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব—

'ভারতবর্ষে'র খ্যাতনামা লেখক, কবি শ্রীমান্ হুমায়ুন কবীর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সরকারী বৃত্তি লইয়া উচ্চ শিক্ষার জন্য অক্সফোর্ডে গিয়াছিলেন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "মডার্ণ গ্রেট্‌সে" প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোন ভারতীয় "মডার্ণ গ্রেটসে" প্রথম শ্রেণী লাভ করেন নাই। অক্সফোর্ডে তিনি ইউনিভার্সিটী ইউনিয়ানের সেক্রেটারী এবং পরে লাইব্রেরীয়ান নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ভারত বাসীর পক্ষে লাইব্রেরীয়ানের পদ লাভও এই প্রথম। তিনি গত ১০ই জুন কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি অচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে যোগদান করিবেন। ডাঃ সৈয়দ হেদায়েতুল্লাও সরকারী বৃত্তি লইয়া উচ্চ শিক্ষার জন্য লণ্ডনে গিয়াছিলেন। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "বোটানী"তে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করিয়া ১০ই জুন কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা ইঁহাদের উন্নতি কামনা করি।

অর্ডিন্যান্সের পুনরাগমন—

সিমলা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বিগত ৩০শে জুন স্পেশাল ক্ষমতা বিষয়ক অর্ডিনান্স জারী করা হইয়াছে। পূর্ব্বে যে কয়েকখানি অর্ডিনান্স জারি হইয়াছিল, তাহার মেয়াদ গত জুলাই শেষ হইয়া যাওয়ায় এই মিলিত অর্ডিনান্স জারি হইল। ইহাতে জরুরী ক্ষমতা বিষয়ক অর্ডিন্যান্স, বে-আইনী সমিতি বিষয়ক অর্ডিন্যান্স এবং বঙ্গকট অর্ডিন্যান্সের অধিকাংশ বিশেষ বিধানই স্পেশাল ক্ষমতা বিষয়ক অর্ডিন্যান্সের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

কয়েকটি বিধান পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহা এই :—

(১) সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা।

(২) অস্থাবর সম্পত্তি দখল করার ক্ষমতা।

(৩) অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগ করার ক্ষমতা এবং রেল ষ্টীমার ইত্যাদি। সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় যানবাহন নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা।

স্পেশাল ক্ষমতা বিষয়ক অর্ডিন্যান্স দ্বারা কতকগুলি বিধান বৃটিশ ভারতের সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। এগুলি ভারতের সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হইবে। এই শ্রেণীর বিধানগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় হইল—প্রেস আইন সংশোধক বিধান। অন্যান্য বিধানগুলি অবশ্য ভারত শাসন আইন অনুসারে যে কোন প্রদেশে অথবা প্রদেশের অংশ বিশেষে প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে। তবে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত সেগুলি কার্য্যতঃ প্রচলিত হইবে না।

নূতন অর্ডিন্যান্সের দ্বারা গৃহীত ক্ষমতা একরূপ সীমাবদ্ধ ও সংযতভাবে প্রয়োগ করা হইবে, তাহা বুঝাইবার জন্য করেকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। যথা :—

১। নূতন অর্ডিন্যান্সের মধ্যে এমন কয়েকটি বিধান আছে যেগুলি ভারতের সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হইবে। এইগুলি ব্যতীত অন্যান্য বিধানগুলি বৃটিশ ভারতের নিম্নলিখিত অংশে মোটেই প্রয়োগ করা হইবে না :—(ক) উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঁচটি জেলার মধ্যে চারিটি জেলায়, (খ) মুলতান ও রাওলপিণ্ডি বিভাগসহ পাঞ্জাব প্রদেশের ২৯টি জেলার মধ্যে ১৭টি জেলায়, (গ) যুক্তপ্রদেশের ৪৮টির মধ্যে ২৬টি জেলায়, (ঘ) বাঙ্গালার ১১টি জেলায়, (ঙ) মধ্য-প্রদেশে ২২টি জেলার মধ্যে ১০টি জেলায়, (চ) আসামের ১৪টি জেলার মধ্যে ছয়টি জেলায়।

ইহাতে দেখা যায় যে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশের অর্দ্ধাংশেরও বেশী স্থান অর্ডিন্যান্স দ্বারা আবদ্ধ হইবে না। তথাকার অধিবাসীরা যদি গোল-মাল না করে তাহা হইলে অর্ডিন্যান্সের কোন বিশেষ বিধান তথায় প্রয়োগ করা হইবে না। এইরূপে মধ্য প্রদেশেরও প্রায় অর্দ্ধাংশ অর্ডিন্যান্স-মুক্ত থাকিবে।

২। উপরোক্ত স্থানগুলি ব্যতীত মাদ্রাজ, আসাম, মধ্যপ্রদেশ এবং আজমীঢ়মাড়োয়ারের সমস্ত স্থানই জরুরী ক্ষমতা বিষয়ক অর্ডিন্যান্সের অনুরূপ বিশেষ বিধানের অধীন হইবে।

(৩) বে-আইনী প্ররোচনা নিবারক অর্ডিন্যান্সের অনুরূপ বিশেষ বিধানগুলি (যাহাতে খাজনা বন্ধ ও রাজস্ব বন্ধ

আন্দোলন দমনের বিধান আছে) খুব অল্প পরিমিত স্থানেই প্রচলিত হইবে। প্রকৃতপক্ষে যুক্ত-প্রদেশের ২১টি জেলায়, বোম্বাইয়ের একটি জেলায় এবং আজমীঢ়মাড়োয়ারের একটু সামান্য স্থানে এই সমস্ত বিধান প্রবর্ত্তন করা হইবে।

(৪) এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কতিপয় ক্ষমতা রক্ষা করিতে বাধ্য হইলেও অপর কয়েকটি ক্ষমতা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, অথবা কোন কোন জেলায় সেগুলি প্রয়োগ করার প্রয়োজন বোধ করিতেছেন না। দৃষ্টান্তস্থলে মধ্যপ্রদেশের কথা বলা যাইতে পারে। বয়কট অর্ডিনান্স তথায় প্রচলিত রহিয়াছে বটে; তবে ছয়টি জেলায় তথাকার গবর্ণমেণ্ট এই বিধানগুলি প্রয়োগ করিতেছেন না।

জরুরী ক্ষমতা বিষয়ক অর্ডিনান্সের অনুরূপ কতিপয় ক্ষমতা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন বলিয়া দিল্লীর শাসনকর্ত্তা জানাইয়াছেন। বর্ত্তমানে মাদ্রাজের তিনটি জেলায় বে-আইনী প্ররোচনা নিবারক অর্ডিনান্স প্রচলিত রহিয়াছে। এই অর্ডিনান্সের অনুরূপ ক্ষমতাগুলি পরিত্যাগ করিতে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট সম্মত হইয়াছেন। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ২০টি জেলায় বয়কট ও ভীতি প্রদর্শক অর্ডিনান্সের অনুরূপ ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করিবেন না।

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে তাঁহাদের যে বিশেষ ক্ষমতা আছে, তাহার কোনটির ১০টির জেলায় প্রয়োগ করা হইবে না।

যুক্তপ্রদেশের ২৬টি এবং পাঞ্জাবের ১৭টি জেলায় বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইবে না।

বিহার উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট ৫টি জেলায় কয়েকটি বিধান প্রবর্ত্তন করিবেন না।

বয়কট ও ভীতি প্রদর্শন নিবারক অর্ডিনান্সের অনুরূপ ক্ষমতা আসামের ছয়টি জেলায় প্রবর্ত্তন করা হইবে না।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট একমাত্র পেশোয়ার জেলা ছাড়া আর সমস্ত জেলা হইতেই সমস্ত প্রকার বিশেষ বিধান তুলিয়া লইতেছেন।

কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে বলা হইতেছে, বিশেষ ক্ষমতার বন্ধন একটু শিথিল করা হইল বটে, কিন্তু ইহাতে যদি দেখা যায় যে, কোনও স্থলে আবার বে-আইনী কার্য্যারম্ভ হইয়াছে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট সেই সকল স্থলে প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে বিরত হইবেন না।

বাঙ্গালা সরকারের ইস্তাহার—

শ্রীযুক্ত বড়লাট ৩০শে জুন তারিখে ১৯৩২ সালের স্পেশাল পাওয়ার্স অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। বিগত ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে যে ৪টি অর্ডিন্যান্স জারী হইয়াছিল, তাহার বিধানাবলী মিলাইয়া এই অর্ডিন্যান্স রচিত হইয়াছে। এই নূতন অর্ডিন্যান্সের পঞ্চম অধ্যায় বাদে অন্যান্য সমস্ত অংশ বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত হইল। কিন্তু বাঙ্গলা সরকারের ইচ্ছা যে, বাঙ্গলা দেশের যে সমস্ত স্থানে এই বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া বুঝা যাইতেছে, সেই সমস্ত স্থান ব্যতীত অন্যান্য স্থানে বর্ত্তমানে এই অর্ডিন্যান্স জারী করা হইবে না। তদনুসারে নিম্নলিখিত কয়টি জেলায় এই অর্ডিন্যান্স প্রযুক্ত করা হইবে না :—

দার্জ্জিলিং, মালদহ, বগুড়া, ফরিদপুর, মৈমনসিংহ, বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, খুলনা, নোয়াখালি এবং পার্ব্বত্য-চট্টগ্রাম।

ভরসা করা যায় যে, এই সমস্ত জিলার কোনটিতে অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ করা হইবে না। কিন্তু এই সমস্ত জিলার অধিবাসীদের আচরণের ফলে গবর্ণমেণ্ট যদি উহা প্রয়োগ করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন, তবে তাহা প্রয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না।

সম্পাদকের বিপত্তি—

এদেশে সংবাদপত্র পরিচালনের অনেক বিপদ আছে; মানহানির জন্য আদালতে অভিযুক্ত হওয়া তাহার অন্যতম। সংপ্রতি সাপ্তাহিক "বাঙলা"র সম্পাদক, সাহিত্যিক মেহাস্পদ শ্রীমান বিজয়রত্ন মজুমদার এই বিপদে পড়িয়াছিলেন। আদালতের বিচারে তিনি বিপমুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। "বাঙলা" বহুদিন হইতে বঙ্গদেশীয় টেক্সটবুক কমিটির কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন; যে সকল পুস্তক কমিটির বিজ্ঞ সভ্যদিগের মতে ছাত্রদিগের পাঠ্য হইবার উপযুক্ত, সে সকল পুস্তক কিরূপ ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ তাহা দেখাইয়া সহযোগী "বাঙলা" বাঙ্গালার ছাত্রদিগের উপকার সাধনের চেষ্টা করিতেছেন।

সেই প্রসঙ্গে সহযোগী ডাক্তার বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের রচিত বলিয়া প্রচারিত 'শরীর পালন' পুস্তকের আলোচনা করিয়া তাহার ত্রুটী প্রদর্শন করেন এবং বলেন, জানা গিয়াছে, উহা অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির লিখিত। ইহাতে বিশ্বেশ্বরবাবু তাঁহার মানহানি হইয়াছে বলেন নাই বটে, কিন্তু অবনীবাবু মানহানির দাবীতে নালিশ রুজু করেন। বিচারকালে অনেক রহস্য প্রকাশ পাইয়াছিল। বিজ্ঞ বিচারক যাহা বলিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, কতকগুলি পেশাদার পাঠ্যপুস্তক-লেখক ও ব্যবসায়ী ভিন্ন ভিন্ন নামে পুস্তক ছাপাইয়া কোন কৌশলে সেগুলি কমিটির দ্বারা পাঠ্যপুস্তক-তালিকাভুক্ত করিয়া লন। বিচারক মিঃ কে, কে, বিশ্বাস মহাশয় এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া অনাচারের মূলোৎপাটন করিবার জন্য টেক্সট বুক কমিটিকে পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। এখন কমিটি তাহা করেন কি না, তাহা দেখিবার জন্য বাঙ্গালার শিক্ষার্থীদিগের অভিভাবকবর্গের কৌতূহল অবশ্যই স্বাভাবিক; কেন না, অনাচারের অভিযোগ সাধারণ বলিয়া উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করা যায় না।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীযুক্ত শৈলবালা মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "পরপ্রেমে"—২৲

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুহ রায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

"৺ঈশ্বরকৃষ্ণ মোক্তারীর উপদেশাবলী" ১ম ভাগ—১৲

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত রহস্য-লহরী উপন্যাসমালার সপ্তদশ

"পৈশাচিক প্রতিহিংসা" ও দ্বিতীয় খণ্ড "রহস্য"

প্রত্যেকখানি—৸৹

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ বি এল প্রণীত উপন্যাস

"প্রণয়ের ছেলে"—২৲

শ্রীযুক্ত পশিভূষণ মল্লিক বি-এ প্রণীত "মুসোলিনি"—৸৹

শ্রীযুক্ত শৈলবালা মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "সীতারাণী"—৷৹

অবসর প্রাপ্ত সাবজজ শ্রীযুক্ত জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এল প্রণীত

"সন্ধ্যা-বন্দনা বা ভগবচ্চিন্তা"—৷৹

শ্রীযুক্ত বনবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ধর্ম্মচক্র"—১৲

শ্রীযুক্ত বিমলকুমার সরকার প্রণীত ভ্রমণ-কাহিনী

"ইতালিতে বারকয়েক"—১৷৹

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র বাগচী প্রণীত কাব্য "তীর্থপথে"—১৲

শ্রীযুক্ত রাইমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত প্রবন্ধাবলী "গুরু"—৷৵৹

শ্রীযুক্ত মৌলবী আলী মিঞা প্রণীত গল্পের বই "মেঘকুমারী"—৷৹

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গল্পের বই "এ যুগের দৈত্য"—৷৹

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি-বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত

"মরণের পরপারে বা বৈদিক সাহিত্যে পরলোক-তত্ত্ব"—১৲

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী প্রণীত উপন্যাস "সোনার বাঙ্গলা"—৷৹

শ্রীযুক্ত প্রবন্ধনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বাঙ্গালীর বউ"—৷৹

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত উপন্যাস "মায়াজাল"—১৲

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী সেন প্রণীত ছেলেদের গল্পের বই

"সোণার কলম"—৷৵৹

শ্রীযুক্ত বাণিক ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "অমর প্রেম"—২৲

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু এম-এ প্রণীত কাব্য "পরশমণি"—১৷৹

ডাক্তার এস, কে, বসু এল-এম-এস, জি-সি-এম-সি প্রণীত

হোমিওপ্যাথিক "চিকিৎসা-প্রকরণ"—২৲

শ্রীযুক্ত রাধারমণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত কাব্য "বীণা"—১৷৹

শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত "ভাগ্য চক্র"—৸৲

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA
of Messrs. GURUDAS CHATTERJEA & SONS.
201, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA.

Printer—NARENDRA NATH KUNAR
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS.
203-1-1, CORNWALLIS STREET, CALCUTTA

ভারতবর্ষ

ভাদ্র—১৩৩৯

প্রথম খণ্ড | বিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

তুলসী রামায়ণ

শ্রীসতীশচন্দ্র দাস এম-এ

রাম-চরিত্র

তুলসী রামায়ণখানা হিন্দী ভাষায় লেখা। হিন্দী কবিতা অনেকটাই ব্রজ-ভাষায় লেখা হয়; তুলসী রামায়ণের ভাষাও ইহাই। ইহা গ্রাম্য ভাষা—হিন্দী-জানা লোকের বুঝিতে কোন কষ্ট নাই। এই রামায়ণের মত আর একখানা বহিও ভারতবর্ষে নাই যাহা এত লোকে পড়ে। অন্য দেশেও কোনও এক-ভাষায় একখানা বহি এত লোকে পড়ে কি না সন্দেহ। তুলসী রামায়ণের বিক্রয়ের শেষ নাই। যত ছাপা হয় বিক্রয় হইয়া যায়। একখানা চারি টাকা দামের রামায়ণের ৭ম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে প্রকাশক লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী ৮০ হাজার বই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। অন্য রামের রামায়ণ যে কতই বিক্রয় হয়, তাহার সংখ্যা নাই।

তুলসী রামায়ণ প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে লেখা। এই গ্রন্থখানা আজও প্রথম দিনের মত নূতন রহিয়াছে। সারা ভারতের স্ত্রী-পুরুষ ইহা পড়িয়া পড়িয়া আশ মিটাইতে পারে না। ইহার অন্তরের সৌন্দর্য্য এত বেশী যে, ইহা নিজের গুণে হিন্দুস্থানের সকল হিন্দীভাষী বা হিন্দী-জানা লোকের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এমন হিন্দীভাষী চাষা নাই যে, ইহার দুই দশটা চৌপাই বা দোহা না জানে ও প্রয়োজনমত উল্লেখ না করিয়া থাকে।

বাংলায় এ জিনিষের অনুরূপ কোন গ্রন্থ নাই। বাংলার কৃত্তিবাসী রামায়ণ একমাত্র লোকপ্রিয় রামায়ণ, কিন্তু তুলসী রামায়ণ উহা হইতে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। ইহাতে গল্পাংশ বড়ই কম। যাহাতে রামের প্রতি ভক্তি হয়, যাহাতে মানুষ নীতি-পথ চিনিয়া লইতে পারে ও আচরণ করিতে পারে, তুলসী তাহার অবলম্বন দিয়াছেন। ঘটনা-গুলিও এমন করিয়া সাজান ও বর্ণনায় এই ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, রাম সীতা যেমন এক দিক দিয়া হৃদয়-রাজ্যের রাজাসনে বসিয়াছেন, অমনি আমাদের ঘরে আমাদের ছেলে-মেয়ে বধূ হইয়াও রহিয়াছেন। রামসীতা ভরতাদির কথা ভাবিতে তুলসী আমাদিগকে রাজবাড়ীতে লইয়া যান নাই, কাঙ্গালের ঘরের ছেলে মেয়ে বউ দিয়াই তৃপ্ত করিয়া-ছেন। তিনি রামের গলায় সোণার হার ও সীতার গায়ে

বণিমুক্তার ভূষণ দিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেগুলি নিতান্তই আলগোছে গায় লাগিয়া আছে, উহা তাঁহাদের পরিচ্ছদের অংশ নয়—মামুলি ভাবে রাজার ছেলে বউকে দিতে হয় বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের চালচলন কথাবার্ত্তা গ্রামের যে-কোনও গরীবের ঘরে খাপ খায়।

জনক সীতার বিবাহে ত কত আয়োজন করিলেন—কত লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ বিদায় করিলেন, এ সব তুলসী খুব গম্ভীর ভাবে লিখিয়াছেন। কিন্তু গোঁসাই এমনি চাতুরী করিয়াছেন যে, যখনই তাঁহার সীতার বিবাহ-বর্ণনা পড়ি, তখন মনে হয় আমাদেরই ঘোপা নাপিত বামুন কায়স্থ গরীব মধ্যবিত্তের ঘরে যে বিবাহ হয় সেই বিবাহই যেন দেখিতেছি। আমাদের পাড়ার কায়ালের ঘরে যে বিবাহ দেখিয়াছি, সেই বিবাহের বরই যেন রাম, সেই কনেই যেন সীতা। যে-বিবাহে মোট পাঁচ টাকা খরচ হয়, সে বিবাহে বেয়াইয়ের আদর যেন জনকের আদরেরই মত।

রাম যখন একেবারে শিশু, কেবল চলিতে শিখিয়াছেন তখন—

ভোজন করত বোল জব রাজা
নহিঁ আবত তজি বাল সমাজা
কৌসল্যা জব বোলন জাঈ
ধূসর ধূরি ভরে তনু আঈ
ভূপতি বিহঁসি গোদ বৈঠারে
ভোজন করত চপল চিত ইত উত অবসর পাই
ভাজি চলে কিল কত দুই ধরি জননী লপটাই।

রাজা যখন রামকে খাইতে ডাকেন তখন সঙ্গী ছেলেদেরকে ফেলিয়া সে আসিতে চায় না। কৌশল্যা ডাকিতে গেলে সে ছেলে ধুপধাপ করিয়া ছুটিয়া পালায়। ধূলায় ধূসর ছেলেকে রাজা হাসিয়া কোলে বসান। চঞ্চল মন খাইতে খাইতে একটু অবসর পাইলেই, খিল খিল করিয়া সে হাসিয়া পালায়—মুখে ঘষি ভাত লেপ্‌টিয়া থাকে।

এই রামকে দেখিতে রাজার বাড়ী যাইতে হয় না, দেশ খুঁড়িয়া ঘরে-ঘরেই এই রাম আছে। এই জন্যই তুলসীর এত আদর। ইহা প্রত্যেকের নিজের ঘরের নিজের হৃদয়ের জিনিষ। তুলসী রাম লক্ষ্মণ সীতাকে সাধারণ লোকের আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া দিয়াছেন।

কেবল তাহাই নয়; গীতার আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলিও নীতির ভিতর ও আচরণের ভিতর দিয়া তিনি স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। তুলসী রামায়ণের কাব্য-সৌন্দর্য্যও অতুলনীয়। এমন সহজ ভাষায়, এমন গ্রাম্য কথায় এমন ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, মনে হয় যে সংস্কৃত ভাষা ছাড়া আর কোনও অলঙ্কারময় ভাষাতেই যেন সে ভাব প্রকাশ করা যাইত না।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ সর্ব্ব-সাধারণের চলতি ভাষায় লেখা হইলে যাহা হয় তুলসী রামায়ণ তাহাই। তুলসী রামের প্রতি অনুরাগে ডুবিয়াছিলেন। রাম-ভক্তিরস তিনি তাঁহার রামায়ণে অকাতরে বিলাইয়া হিন্দী-ভারতবাসীকে রামায়ণ-ভক্ত করিয়াছেন। রাম-ভক্ত করিয়াছেন এ-কথা বলিতে পারি না, কেননা তুলসীর যে রাম তাহার ভক্ত হওয়া অতি-বড় সৌভাগ্য। সে সৌভাগ্য যেদিন ভারত-বাসীর হইবে, সেদিন পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য বসিবে—কলিযুগের মধ্যেই সত্যযুগ ফিরিয়া আসিবে।

তুলসী রামায়ণ পড়িতে হ্রস্ব দীর্ঘ বুঝিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। তুলসী রামায়ণে 'শ' নাই বলিলেই চলে। সকল স্থানেই 'স' ব্যবহৃত হইয়াছে—উচ্চারণ ইংরাজী sawএর মত। তুলসীর ব ও সএর একই উচ্চারণ করিতে হইবে। বাঙ্গালী পাঠক দুই চার লাইন কোনও হিন্দু স্থানীকে দিয়া পড়াইয়া লইলেই তুলসীর দোহা ও চৌপাইয়ের পড়ার ধাঁচ ধরিতে পারিবেন। তুলসী রামায়ণ স্থির করিয়া পড়িতে হইবে, নতেৎ উহার রস পাওয়া যাইবে না। ছন্দের মিল্ রাখার জন্য সুবিধামত ঈ ব্যবহার হইয়াছে, কোথাও বা "সিয়া" কোথাও বা "সীতা"—কোথাও বা 'সিতা' কোথাও বা 'সীতা'। চৌপাইয়ের শেষ অক্ষর দীর্ঘ উচ্চারণ হইবেই, কাজেই সেখানকার বানান দীর্ঘ হইতেই হইবে।

তুলসী রামায়ণ বাঙ্গালীর পক্ষে পড়া সহজ—বোঝা আরো সহজ। দুই চারিটা চৌপাই পড়িয়া আড় ভাঙ্গিয়া লইলেই হইল;—আর গোটাকতক হিন্দী শব্দের মানে শিখিতে হয়; তাহাও পড়িতে পড়িতে শেখা যায়। যাহাতে বাঙ্গালী পাঠকেরা তুলসী রামায়ণের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন, সেই জন্য এই রামায়ণের চরিত্র ও বিষয় লইয়া কিছু আলোচনা করিব। যথাসম্ভব তুলসীর রামায়ণের

শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া অর্থাৎ তুলসীদাসের ভাষাতেই চরিত্রগুলির আলোচনা করিয়াছি। যদি এই আলোচনা পড়িয়া তুলসী রামায়ণের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে ও পাঠকেরা আগ্রহের সহিত রামায়ণ পড়িতে আরম্ভ করেন, তবে ধন্য হইব।

রাম কে ?

তুলসীদাস রামায়ণখানার নাম দিয়াছেন "রাম চরিত মানস" অর্থাৎ রাম চরিত্ররূপ মানস-সরোবর। ইহাতে রাম-কথারূপ হাঁস বিচরণ করে। লোকে তুলসীর নাম ছাড়িয়া সোজাসুজি তুলসী রামায়ণই বলিয়া থাকে।

তুলসী যে রামায়ণ রচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার মন-গড়া জিনিষ। উহা বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ নয়। বাল্মীকি রামায়ণ ছাড়া অন্যান্য যে সকল গ্রন্থে রাম-কথা আছে, তুলসীদাস সে সকলেরও সাহায্য লইয়া নিজের অন্তরের তৃপ্তির জন্য এই রামায়ণ লিখিয়াছেন।

তুলসী সকলকেই ডাকিয়া বলিতেছেন যে, জীবন সফল করার জন্য রাম-ভক্তি চাই। রাম-কথা পড়িলে রাম-ভক্তি আসিবে; মন শান্ত হইবে, দুঃখ শোক দূর হইবে। তাঁহার রামায়ণ ভক্তির ভাব জাগাইবার ও পুষ্ট করিবার বিশেষ সহায়ক।

রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র। তিনি মাতার ষড়যন্ত্রে বনে যান। রাবণ সীতা হরণ করিয়া লইয়া গেলে তিনি যুদ্ধ করিয়া রাবণ বধ করেন ও সীতাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসেন। রামচন্দ্র মানুষের মতই চলিয়া ফিরিয়া সুখে দুঃখে জীবন কাটাইয়াছেন। সেই জন্য রামকে আদর্শ-চরিত্র বলিয়া ধরা যাইতে পারে কি না বলিয়া বাদানুবাদ আছে। কোন কোন বিদ্বান ব্যক্তি রামকে কেবলমাত্র সমালোচকের চক্ষে দেখেন। ঈশ্বরই যে রাম অবতার হইয়া নিজ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, সে অনুভূতি না থাকায় রামকে একজন লোক মাত্র বলিয়া ধরা হয়, যিনি রাবণবধাদি কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু ঐ প্রকারের রামে তুলসীদাসের প্রয়োজন নাই। তুলসীর রাম তাঁহার ইষ্টদেব, জগৎ-পিতা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, ভক্তের দুঃখ-হারী, প্রভু।

তুলসীদাস নিজে যে রস আস্বাদ করিয়াছেন, সেই রস সকলকেই বিলাইতে চান। উহার প্রধান বাধাই বুদ্ধির বাধন।

যে রাম মানুষের মত, যিনি স্ত্রী-বিরহে কাতর হইয়া বনে-বনে পথে-পথে সীতাকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন, যাঁহাকে মেঘনাদ নাগপাশে ধরিয়া কাবু করিয়া ফেলিতে পারেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, এ কথা কেমন করিয়া বলা যায় ? বুদ্ধির এই প্রশ্নকে তুলসীদাস এক বড় স্থান দিয়াছেন এবং উহাকেই অবলম্বন করিয়া রামের ঈশ্বরত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া রাম-চরিত খুলিয়া দেখাইয়াছেন।

'রাম চরিত মানসে'র অবতরণিকায় যেখানে রাম কথা সুরু হইল সেইখানে "রাম কে ?" এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে যাজ্ঞবল্ক্য আসিয়াছেন। তিনি প্রয়াগে আসিয়াছিলেন। মকর স্নান করিয়া ফিরিবার পূর্ব্বে ভরদ্বাজকে দেখিতে আসিয়াছেন। ভরদ্বাজ তাঁহাকে বলিলেন যে, তাঁহার একটা বিষয়ে বড় সন্দেহ আছে; উহার মীমাংসা করিয়া দিতে হইবে।

"রাম কবনু প্রভু পূছউঁ তোহী
কহিয় বুঝাই কৃপানিধি মোহী
এক রাম অবধেস কুমারা
তিন্হ কর চরিত বিদিত সংসারা
নারি বিরহ দুখ লহেউ অপারা
ভয়উ রোষু রন রাবনু মারা
প্রভু সোই রামু কি অপর কোউ জাহি জপত ত্রিপুরারী
সত্যধাম সর্ব্বজ্ঞ তুম্হ কহহ বিবেকু বিচারি।

হে প্রভু, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি রাম কে ? হে কৃপানিধি আমাকে তুমি বুঝাইয়া বল। এক রাম ত ছিলেন অযোধ্যাপতি দশরথের কুমার। তাঁহার চরিত-কথা সকলেই জানে। তিনি স্ত্রী-বিরহে বড়ই দুঃখ পান ও রাগ করিয়া রাবণকে যুদ্ধে মারেন। হে প্রভু, শিব যাঁহাকে জপ করেন তিনিই কি সেই রাম, অথবা অপর কেহ। তুমি সত্যনারায়ণ সর্ব্বজ্ঞ, তুমি জ্ঞানের সহিত বিচার করিয়া বল।

ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য হাসিয়া বলেন, তুমি ত কায়মনোবাক্যে রামভক্ত, তোমার চাতুরী আমি জানিয়াছি। তুমি রাম-গুণ শুনিতে চাও বলিয়াই এমন বোকা সাজিয়া প্রশ্ন করিয়াছ, রাম-কে ! তিনিই কি ভগবান ? এই

প্রশ্ন হইতে তুলসী রামায়ণ আরম্ভ। তুলসীদাস আর একটু অগ্রসর হইয়া বালকাণ্ডেই সতীর মুখ দিয়া সেই প্রশ্নই করিতেছেন—রাম কে? রাম তখন দণ্ডকবনে। সেই স্থান দিয়া শিব সতীকে লইয়া চলিয়াছেন: তখন—

"বিরহ বিকল নর ইব রঘুরাঈ
খোজত বিপিন ফিরত দোউ ভাঈ।

সীতা আশ্রমে নাই। রাম বিকল হইয়া খুঁজিতেছেন।

হাওঁ খানি জানকী সীতা
রূপশীল ব্রত নেম পুনীতা
লছিমন সমুঝায় বহু ভাঁতী
পূছত চলে তরু লতা পাঁতী
হে খগ মৃগহে মধুকর শ্রেণী
তুম দেখী সীতা মৃগনৈনী।

রামচন্দ্র তরুলতা পশুপক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়াছেন যে তাহারা কি মৃগনয়নী সীতাকে দেখিয়াছে। এমনি ব্যাকুল অবস্থায় শিব রামকে দেখিতে পান। রামকে তিনি নিজ ইষ্টদেব জানিয়া "জয় সচ্চিদানন্দ" বলিয়া প্রণাম করিলেন। শিব এত অভিভূত হইলেন যে তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চ হইল। শিবের এই অবস্থা দেখিয়া সতী আশ্চর্য্য হইলেন। যিনি জগতের পূজ্য বিশ্বেশ্বর শিব, তিনি আবার একজন রাজার ছেলেকে সচ্চিদানন্দ বলিয়া প্রণাম করিলেন, ইহা দেখিয়া সতী বড় সন্দেহে পড়িলেন।

শিব সতীকে বুঝাইয়া সন্দেহ করিতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন, যে রামের কথা আমরা এইমাত্র অগস্ত্য ঋষির নিকট শুনিতেছিলাম, যাঁহাকে ভক্তি করার কথা আমি মুনিকে শুনাইলাম ও যিনি আমার ইষ্টদেব, ইনিই সেই রাম। কিন্তু সতীর সন্দেহ যায় না। সতী ভাবেন যে যদি বিষ্ণু দেবতাদের হিতের জন্য মানুষের শরীর ধারণ করিয়া থাকেন, তবে ত তিনিও শিবেরই মত সর্ব্বজ্ঞ। সেই বিষ্ণু কি অজ্ঞের মত স্ত্রী খুঁজিয়া বেড়াইতে পারেন?

"খোজই সো কি অজ্ঞ ইব নারী
জ্ঞানধাম শ্রীপতি অসুরারী।

সতীর মনে এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। তিনি তখন শিবের কথায় রামকে পরীক্ষা করিতে যান। গিয়া রামকে দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া যান। সতী সীতার বেশ ধরিয়া রামকে পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া শিব তাঁহাকে ত্যাগ করেন।

পরে সতী দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করিয়া হিমালয়ের ঘরে পার্ব্বতী হইয়া জন্মিয়া শিবকে পাইবার জন্য অনেক হাজার বৎসর কঠোর তপস্যা করেন। বিবাহের পর পার্ব্বতী শিবকে আবার সেই প্রশ্ন করেন—"রাম কে?" পূর্ব্বজন্মে একবার বলিয়াছিলেন, কিন্তু তখন ভাল করিয়া বুঝি নাই, আবার বলুন!

"রামু সো অবধ নৃপতি-সুত সোঈ
কী অজ অগুণ অলখ গতি কোঈ।

যিনি অযোধ্যার রাজপুত্র তিনিই রাম। অথবা আর কোনও অজন্মা গুণরহিত পুরুষ যাহার গতি দেখা যায় না।

জৌ নৃপ তনয় তো ব্রহ্ম কিমি নারি বিরহ মতি ভোরি।
দেখি চরিত মহিমা সুনত ভ্রমতি বুদ্ধি অতি মোরি॥

যদি রাজপুত্রই হয় তবে ব্রহ্ম কেমন করিয়া হইল? স্ত্রীর বিরহে রামের বুদ্ধিই ত নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অথচ এদিকে রাম-চরিত দেখিয়া তাঁহার মহিমার কথা শুনিয়া মাথা ঘুরিতেছে।

শিব পার্ব্বতীকে আবার উপদেশ দেন, বলেন—

মুঠই সত্য জাহি বিনু জানে
জিমি ভুজঙ্গ বিনু রজু পহিচানে।
জেহি জানে জগ জাই হেরাঈ
জাগে জথা সপন ভ্রম জাঈ॥
বন্দউ বালরূপ সোই রামু
সব সিধি সুলভ জপত জিসু নামু॥

"তিনিই রাম যাহাকে না জানিলে মিথ্যাও সত্য বলিয়া মনে হয়, জাগিলে যেমন স্বপনের ভুল মিলাইয়া যায়। তেমনি রামকে জানিলে জগৎ হারাইয়া যায়। যাঁহার নাম জপিলে সকল সিদ্ধিই সুলভ হয়, সেই বালক রামকে বন্দনা করি!"

পার্ব্বতী যে প্রশ্ন করিলেন ও রাম-কথা শুনিতে চাহিলেন, সেজন্য শিব তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া কেবল একটা কথায় ব্যথা পাইয়াছেন বলেন—

এক বাত নহিঁ মোহি সুহানী
জদপি মোহবস কহেহু ভবানী।

তুম্হ জো কহা রাম কোউ আনা
জেহি শ্রুতি গাব ধরহিঁ মুনিধ্যানা ॥

'তুমি মোহ-বশে বলিলেও তোমার একটা কথা আমার কাছে ভাল লাগে নাই। তুমি যে বলিয়াছ যে যাহার কথা বেদ বলে, মুনিরা যাহার ধ্যান করে সে রাম কি আর কেহ?'

কহহিঁ সুনহিঁ অস অধম নর গ্রসে জে মোহপিসাচ্।
পাখণ্ডী হরি-পদ-বিমুখ জানহিঁ ঝুঠ ন সাচ্ ॥

এমন কথা সেই মানুষেরাই বলে ও শোনে যাহাদিগকে মোহ-পিশাচ পাইয়া বসিয়াছে; যাহারা পাষণ্ড, যাহারা হরিপদে বিমুখ ও যাহারা সত্যমিথ্যা জানে না। এই ভাবে নর-দেহধারী রাম যে নির্গুণ ব্রহ্ম তাহাই বুঝাইতে গিয়া বলেন—

জো গুণ রহিত সগুণ সোই কৈসে
জল্ হিম উপল বিলগ নহি জৈসে।

গুণরহিত যিনি তিনিই সগুণ হন, যেমন জল ও বরফ একই জিনিষ, ভিন্ন নয়।

জগত প্রকাস্য প্রকাশক রামূ
মায়াধীন জ্ঞানগুণধামূ
জাসু সত্যতা তেঁ জড় মায়া
ভাস সত্য ইব মোহ সহায়া।

রামচন্দ্রই দৃষ্টিগোচর জগৎ। তিনিই জগতের প্রকাশক, তিনি মায়াপতি জ্ঞান ও গুণের আলয়। তাঁহারই সত্যতায় জড়মায়া মোহের সাহায্যে সত্যের মত বলিয়া দেখা যায়।

রজত সীপ মহঁ ভাস জিমি জথা ভানুকর বারি।
জদপি মৃষা তিহুঁ কাল সোই, ভ্রম ন সকই কোউ টারি॥

ঝিনুক দেখিয়া রূপা বলিয়া বোধ হয়, সূর্য্য-কিরণকে মরীচিকার জল বলিয়া বোধ হয়। ইহারা ত্রিকালে মিথ্যা হইলেও এ ভ্রম দূর করা যায় না।

এহি বিধি জগ হরি আশ্রিত রহঈ
জদপি অসত্য দেত দুখ অহঈ।
জৌ সপনে সির কাটই কোঈ
বিনু জাগেন দূরি দুখ হোঈ ॥

তেমনি ভাবে জগত রামচন্দ্রের আশ্রিত হইয়া আছে। ঐ জগত অসত্য হইলেওদুঃখ দেয়। স্বপ্নে মাথা কাটা গেলে যেমন দুঃখটার, আর না জাগা পর্য্যন্ত যেমন সে দুঃখ যায় না, তেমনি রাম যে কে, তাহা না জানা পর্য্যন্ত জগতের মিথ্যা দুঃখ যায় না।

রামচন্দ্র কেমন?

বিনু পদ চলই সুনই বিনু কানা
কর বিনু করম করই বিধি নানা
আনন রহিত সকল—রস-ভোগী
বিনু বাণী বকতা বড় জোগী।
তন বিনু পরস নয়ন বিনু দেখা
গ্রহই ঘ্রাণ বিনু বাস অসেষা
অসি সব ভাঁতি অলৌকিক করণী
মহিমা জাসু জাই নহিঁ বরণী।

তাঁহার পা নাই তবুও তিনি চলেন। কান বিনাই শোনেন, হাত না থাকিলেও কাজ করেন। কথা না বলিলেও তিনি বক্তা, শরীর না থাকিলেও তিনি স্পর্শ করেন, চোখ না থাকিলেও তিনি দেখেন, নাক না থাকিলেও তিনি গন্ধ লয়েন। এমনি সকল রকম কার্য্য তাঁহার অলৌকিক, তাঁহার মহিমা বর্ণনা করা যায় না।

'সোই দসরথ সুত ভগতহিত কোসলপতি ভগবান' ভক্তের মঙ্গলের জন্য সেই অরূপ ভগবানই কোশলপতি রামচন্দ্র হইয়াছেন।

সোই প্রভু মোর চরাচর স্বামী
রঘুবর সবউর অন্তর জামী ॥

সেই সচরাচরের স্বামীই আমার প্রভু রঘুনাথ, তিনি সকলের হৃদয়ের কথাই জানেন।

রাম সো পরমাতমা ভবানী
তহঁ ভ্রম অতি অবিহিত তব বাণী
অস সংসয় আনত উর মাহীঁ
জ্ঞান বিরাগ সকল গুণ জহীঁ।

শঙ্কর বলিলেন ভবানী, রাম সেই পরমাত্মা, এ বিষয় তোমার ভুল করাটা বড় অন্যায় হইয়াছে। এ-রকম সন্দেহ মনে আনিলেও জ্ঞান বৈরাগ্য ও সকল গুণ চলিয়া যায়।

এমন করিয়া উপদেশ দিয়া শঙ্কর পার্ব্বতীকে শান্ত করিলেন। পার্ব্বতীর তপস্যা ছিল, সংস্কার ছিল, তিনি এবার বুঝিলেন। কিন্তু সকলে ত বুঝে না। যাহারা বুঝে না, তাহারা বুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারা কেবলই প্রশ্ন করিতে থাকে—

সর্ব্বজ্ঞ হইলে অজ্ঞের মত ঘুরিয়া বেড়াইলেন কেন?

রাবণকে মারিতে এত বেগ পাইতে হইল কেন? ইচ্ছা করিলেই ত রাবণকে মারিতে পারিতেন? তিনি অমন করিয়া পিছন হইতে ব্যাধের মত বালীকে বধ করিলেন কেন? সীতার অগ্নি-পরীক্ষা করিলেন কেন? এমনি সকল প্রশ্ন তুলিয়া মানুষকে তাহার বুদ্ধি বিব্রত করে। এই বুদ্ধিকে ঠিক পথে চালাবার প্রশ্ন এখন আসিয়া পড়িতেছে।

মেঘনাদ রামকে নাগপাশে বাঁধিলে গরুড় গিয়া সেই বাঁধন কাটিয়া দিয়া আসিল। ইহাতে গরুড়ের মোহ হইল। সে শুনিয়াছে যে রাম বিষ্ণু অবতার। তিনি কেমন অবতার যাঁহাকে বাঁধা যায়, আর গরুড়ের সাহায্যে যাঁহার বাঁধন কাটিতে হয়?

ব্যাপক ব্রহ্ম বিরজ বাগীসা
মায়া মোহপার পরসীসা
সো অবতার সুনেউ জগমাহা
দেখেউ সো প্রভাব কছু নাহী
ভব বন্ধন তেঁ ছুটহিঁ নর জপি-জাকর নাম
খর্ব্ব নিসাচর বাঁধেউ নাগপাস সোইরাম

শুনিয়াছিলাম যে ব্যাপক ব্রহ্ম বিরাজ, বাক্‌পতি, মায়া-মোহের অতীত পরমেশ্বর রাম অবতার লইয়াছেন। কিন্তু দেখিলাম তাঁহার কোনও প্রভাব নাই। যাঁহার নাম জপ করিয়া লোকে ভব বন্ধন হইতে মুক্তি পায়, ক্ষুদ্র রাক্ষস তাঁহাকে নাগপাশে বাঁধে?

গরুড়ের মানসিক অশান্তি হইল। সে নারদকে জিজ্ঞাসা করিল। নারদ বলিলেন, ঐ প্রকার মোহ তাহাকে অনেক নাচাইয়াছে, গরুড় যেন ও-কথা ব্রহ্মাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করে। ব্রহ্মা বলিলেন, ঐ মায়া তাহাকেও অনেক নাচাইয়াছে। তুমি গিয়া শঙ্করকে জিজ্ঞাসা কর। শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—

"তবহিঁ হোই সব সংসয় ভংগা
জব বহুকাল করিয়া সত সংগা
জেহি মই আদি মধ্য অবসানা
প্রভু প্রতিপাদ্য রাম ভগবানা
বিনু সত সংগ ন হরি কথা তেহি বিনু মোহ ন ভাগ
মোহ গএ বিনু রামপদ হোই ন দৃঢ় অনুরাগ

তুলসী মহেশ্বরের মুখ দিয়া এইবার শেষ কথা বলাইলেন। অনেকদিন সৎসঙ্গ করিলে তবে সন্দেহ যায়। সৎসঙ্গে হরি-কথা শুনিবে। নানা প্রকারে মুনিরা উহা গাহিয়া থাকেন। সে কথার আদিতে, মধ্যে ও অন্তে ঐ একই বিষয়ের প্রমাণ করা হয় যে, প্রভু রাম হইতেছেন ভগবান। সৎসঙ্গ ছাড়া রাম-কথা হয় না। রাম-কথা ছাড়া মোহ যায় না। আর মোহ না গেলে রামপদে গভীর অনুরাগ হয় না।

ভক্তি না হইলে বিশ্বপতি রামই যে ভগবান, সে বিশ্বাস আসে না। রাম ত ভক্তের জন্যই দেহ ধারণ করিয়াছিলেন।

ভগত হেতু ভগবান প্রভুরাম ধরেউ তনু ভূপ
কিরে চরিত পাবন পরম প্রাকৃত নর অনুরূপ
জথা অনেক বেষধরি নৃত্য করই নট কোই
সোই সোই ভাব দেখাবই আপুন হোই ন সোই
অসি রঘুপতি লীলা উরগারী
দনুজ বিমোহিনি জন সুখকারী
জে মতি মলিন বিষয় বস কামী
প্রভুপর মোহ ধরহিঁ ইমি স্বামী।

ভক্তের হিতের জন্যই ভগবান রাম রাজার শরীর ধারণ করিয়াছিলেন। সাধারণ মানুষের মত অথচ পরম পবিত্র চরিত্র দেখাইয়া গিয়াছে। কিন্তু রামের মানুষরূপ সম্পূর্ণ নিজের রূপ নয়। কোনও নট যেমন নানা প্রকার বেশ যেমন নানা প্রকার বেশ ধরিয়া নৃত্য করেন ও যে বেশ ধরিয়াছেন সেইরূপ ভাব দেখান, কিন্তু সে সকল ভাবের কোনটাই নটের নিজের নয়, ভগবান তেমনি নটের মত মানুষ হওয়ার নাটকে রাম সাজিয়াছিলেন—ইহাই রাম-চরিত বুঝিবার ও আলোচনা করিবার প্রথম ধাপ বলিয়া মানিয়া লইতে হয়।

অবতারবাদ সম্বন্ধে গান্ধীজি বলিয়াছেন যে, কোনও যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ পরের যুগে অবতার বলিয়া গণ্য হন ও তাহার পর মানুষ তাঁহার উপর পূর্ণত্ব আরোপ করিয়া পূজা করিতে থাকে।

গীতার কৃষ্ণ মূর্তি শুদ্ধ জ্ঞান কিন্তু কাল্পনিক। ইহাতে কৃষ্ণ নামক অবতার-পুরুষকে অস্বীকার করা হইতেছেনা, মাত্র বলা হইতেছে যে, পূর্ণ-কৃষ্ণ কাল্পনিক। পূর্ণ অবতারের কল্পনা পরে আরোপিত হইয়াছে।

রামায়ণের রাম সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। অবতার রাম জন্মিয়াছেন, খেলা করিয়াছেন, বিবাহ করিয়াছেন,

যুদ্ধ করিয়াছেন—সকলই করিয়াছেন, কেবল তাঁহার উপর পূর্ণত্ব আরোপিত হইয়াছে। অপূর্ণের উপর পূর্ণত্ব আরোপ করিয়া মানুষ নিজের প্রয়োজন মিটাইয়া লইতেছে। পদেপদেই মানুষ রূপধারী অপূর্ণ অবতারের অপূর্ণতা ও ত্রুটি ধরা যাইতে পারে। কিন্তু নিজের হিতের জন্য তাহা না করিয়া আদর্শ পুরুষত্ব তাঁহাতে আরোপ করিয়া লোকে কার্য্য সিদ্ধ করিয়া আসিতেছে, ভক্তি সমর্পণ করিতেছে। যাঁহারা রাম-চরিত্রে মানুষের দোষগুণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার বিচার করিতে চাহেন, আদর্শত্ব বা ঈশ্বরত্ব আরোপ করিতে চাহেন না, তাঁহারা তাহা না করুন; ভক্তের তাহাতে ক্ষতি নাই। ভক্ত যাহা চায়, রামচন্দ্রে পূর্ণত্ব আরোপ করিয়া সে তাহা পায়। যে পথে সে চলিতে চায়, কাল্পনিক অবতার তাহার কাছে ইতিহাসের লোক অপেক্ষাও সত্য।

রামচন্দ্র মানব-চরিত্র গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন্য হওয়ার পথ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্ম কর্ম্মের চিন্তা আমাদিগকে মুক্তির পথে লইয়া যায়। এক খণ্ড শিলারও কোনও চরিত্র নাই; তথাপি মানুষ তাহাতেও পূর্ণত্ব আরোপ করিয়া—শালগ্রাম শিলাকে ভক্তি দিয়া নিজের যাহা পাওয়ার তাহা পাইয়া থাকে। তুলসীদাসের অভিজ্ঞতা এই যে, যত রকম আরোপ ও কল্পনাই করা যাক্, রামনামে ও রামভক্তিতে যত সহজে কাজ হয় এমন আর কিছুতে হয় না। মুক্তি-পথের দীন পথিকের নিকট এই আশ্বাসের কথার মধ্যে মন্ত্রশক্তি রহিয়াছে। এই দিক দিয়াই রাম-চরিত বিচার করার বিষয়। প্রত্যেক ঘটনাটি লইয়া চুল চিরিলে বুদ্ধির দাবা-খেলা হইবে। কিন্তু দাবা-খেলায় যেমন সত্যই চতুরঙ্গ সেনায় সেনায় যুদ্ধ হয়, তেমনি ঐ ভাবের রাম-চরিত্র আলোচনাও অলীক। রাম হরিণ শিকার করিতেন—

বহু সথা সঙ্গ লেহিঁ বোলাঈ
বন মৃগয়া নিত খেলহি জাঈ
পাবন মৃগ মারহি জিয় জানী
দিন প্রতি নৃপহি দেখাবহি আনী।

তুলসীদাস এই বর্ণনা দিয়াছেন। যাঁহার সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি, তিনি অকারণ প্রাণী বধ করিতেন। ইহাই কি আদর্শ চরিত্র? উত্তরে বলা যায় যে, তখনকার দিনে রাজার ছেলের মৃগয়া করা একটা অবশ্য করণীয় ছিল। তিনি সমসাময়িক লোকাচার-সম্মত কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি মনুষ্য-চরিত্র অনুসরণ করিয়াই মানুষকে পরমপদ পাওয়ার অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর হিসাবে বিচার করিলে তাঁহার প্রত্যেক কাজের জন্যই তাঁহাকে দোষ দিতে হয়। স্ত্রী-বিরহে তিনি কেনই বা কাতর হইলেন—তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও আদর্শ চরিত্র হইলেও ঐ সময় সাধারণ মানুষের মতই আচরণ করিয়া গিয়াছেন। তাহা করিয়াছেন বলিয়াই রাম-চরিত্র এত মধুর, এত আকর্ষক ও এত শক্তিশালী হইয়াছে।

ভারতবর্ষের শিক্ষার ধারার ভিতর রূপকের আশ্রয় লওয়ার একটা মনোহর পথ ছিল। উহা দ্বারা কঠিন বিষয় সহজে বুঝান যাইত। আমরা যখন পুতুল-নাচ দেখি, তখন পুতুলগুলি পুতুল, সে কথা জানিয়াও পুতুলের আর্ত্ত চিৎকারে আর্ত্তি বোধ করি, আনন্দে আনন্দ করি, যুদ্ধ করিতে দেখিলে উত্তেজিত হই। আমরা সত্য ঘটনা দেখিয়া যে রসের আস্বাদ পাইতাম, পুতুল-নাচ দেখিয়াও প্রায় তাহাই পাই। এই জন্যই পুতুল-নাচ, যাত্রা থিয়েটার বায়োস্কোপ সমাজে একটা স্থান লইয়াছে।

সাহিত্যের ভিতর দিয়াও এই পুতুল-নাচ বা রূপকের স্রোত চলিয়া গিয়াছে। কথা-সাহিত্য রূপকের এই মোহন বেশে সাজান। কাশী ও কোশল রাজের ভিতর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা এককালে প্রসিদ্ধ ছিল। উহাই আশ্রয় করিয়া কত না গল্প রচিত হইয়াছে, লোকশিক্ষার পথ দিয়াছে।

গল্প আছে, একদিন কোশলরাজ বলিলেন, লোকে তাঁহাকে কি রকম মনে করে তাহা ছদ্মবেশে দেখিবেন। তিনি বিনা আড়ম্বরে রথে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। কিছুদিন প্রজার সুখ দুঃখ দেখিয়া এই প্রকার ঘুরিতে ঘুরিতে এমন একটা পথে আসিয়া পড়িলেন যাহার দুইদিকে খাত। পথও এমন সরু যে, একখানা মাত্র রথ চলিতে পারে। এদিকে আবার এই হইয়াছে যে, কোশলরাজ যেদিন যাত্রা করেন, কাশীরাজও সেইদিনই নিজের প্রজাদের কথা জানিবার জন্য সেই সময়ে সেই ভাবে যাত্রা করিয়াছেন। তিনিও প্রজাদের অবস্থা দেখিতে দেখিতে ঠিক সেই সময় সেই রাস্তার বিপরীত দিক হইতে রথ লইয়া আসিয়া

উপস্থিত। দুই রথ মুখোমুখি দাঁড়াইল। কাশীরাজের সারথি হাঁকিয়া বলে—পথ ছাড়িয়া যাও—এ রথে রাজা আছেন। অপর সারথি বলে—এ রথেও রাজা আছেন। এ বলে—এ রাজার বয়স এত, ও বলে—সে রাজার বয়স তত। এ বলে—ইঁহার রাজ্য এত বড়, ও বলে—তাঁহার রাজার রাজ্যও তত বড়। সৈন্য-সংখ্যা—তাহাও দুইজনের ঠিক সমান। তখন কাশী-সারথি বলে—তাহার রাজা বিপুল শক্তিবান, তাঁহার ক্রোধ হইলে শত্রুকে তিনি মর্দ্দন করেন, গ্রাম নগর বিধ্বস্ত করেন। প্রতিদ্বন্দ্বির প্রতি তাঁহার হিংসাবৃত্তি জাগ্রত। কোশল-সারথি বলে—তাঁহার রাজা অক্রোধ দ্বারা ক্রোধ জয় করেন, অহিংসা দ্বারা হিংসা জয় করেন, বিনয় দ্বারা অবিনয় জয় করেন। তখন কাশী-সারথি মাথা নীচু করিয়া নিজ রথ খুলিয়া কোশলের রথের জন্য পথ ছাড়িয়া দিল।

এই গল্পে গল্পকার তাঁহার রঙ্গমঞ্চে ক্রোধ ও অক্রোধ, হিংসা ও অহিংসা, বিনয় ও অবিনয়কে দাঁড় করাইয়া অক্রোধ, অহিংসা ও বিনয়ের জয় দেখাইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কথা বুঝাইবার জন্য কাশী-কোশল-রাজ লইয়া আসিয়াছেন; কেন না পাঠকের তৃপ্তির জন্য রঙ্গমঞ্চ চাই; রথ ও রথী, সারথি ও রাজা চাই। কথাকার এমন সুন্দরভাবে জিনিষগুলি সাজাইয়াছেন যে, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। তিনি জানেন ও তাঁহার পাঠকেরাও জানে যে, কাশী-কোশলের অবলম্বন তিনি বিশেষ উদ্দেশ্যে করিয়াছেন। এই গল্পে মূলের অসম্ভাবনা, একই সময় একই উদ্দেশ্যে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার যাত্রা করা, তাহাদের সম বয়স, সম রাজত্ব ও সম সৈন্যবল হওয়ার অসম্ভাবনা কাহাকেও পীড়া দেয় না। রূপকার যে রূপকের আশ্রয় লইয়াছেন তাহা তাঁহার পাঠকেরা জানে বলিয়াই তাঁহার গল্প বাস্তবের মত সুন্দর লাগে।

আর একটা উদাহরণ ধরুন, নচিকেতার উপাখ্যান। নচিকেতার পিতা সর্ব্বস্ব-দান যজ্ঞ করিলে নচিকেতা পিতাকে বলিল—এই পীতদুগ্ধ গাভীগুলি দান করিয়া লাভ নাই। আর তুমি আমাকেই বা কাহাকে দিয়া দিলে? তিন বারের বার ঐ একই কথা জিজ্ঞাসা করায় পিতা রাগ করিয়া বলিলেন "তোমাকে যমকে দিলাম"। বলা মাত্র নচিকেতার মৃত্যু হইল; সে যমের বাড়ী গিয়া হাজির। যম তখন বাড়ীতে নাই, কোথাও নিমন্ত্রণে গিয়াছেন। যম আসিয়া দেখেন ব্রাহ্মণ অতিথি, তিন দিন অভুক্ত রহিয়াছে। যম বলিলেন, নচিকেতা—তোমাকে তিনদিন অভুক্ত রাখায় দোষ হইয়া গিয়াছে। এখন তুমি বর চাও। নচিকেতা বলিল, আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা দাও। যম বলিল, ঐটি ছাড়া আর যাহা চাও তাহাই দিব। সসাগরা পৃথিবীর রাজত্ব চাও, অমরত্ব চাও, বহু দাস দাসী, রমণী চাও, হস্তী অশ্ব রথ চাও, নৃত্যগীত-কুশলা স্ত্রীলোক চাও, যাহাই ভোগের জন্য চাও না কেন, তাহাই দিব। নচিকেতা বলিল, ইন্দ্রিয়-ভোগের সুখ আর তুমি আমাকে কি দেখাইতে চাও? উহার তৃপ্তিতে সুখ নাই। ইন্দ্রিয়গুলি ব্যবহারে ক্রমে জরাগ্রস্ত হয়। ও-সকলে দরকার নাই। দাসদাসী হাতী ঘোড়া নৃত্যগীত তোমারই থাকুক—আমার উহাতে দরকার নাই। আমি যাহা চাহিয়াছি, তুমি ছাড়া উহা দেওয়ার মত আর কেহ নাই, আমাকে উহাই দাও। যম সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, লোকে যাহা চায় সে সমস্তই আমি তোমাকে দিতে চাহিয়াছি। তুমি সে সমস্তই প্রত্যাখ্যান করিয়াছ। তুমিই উপযুক্ত অধিকারী। আমি তোমাকে সেই গুপ্ত-বিদ্যা দিতেছি।

এই ত গেল উপন্যাস। ইহার ভিতর ইতিহাস খুঁজুন, সত্যঘটনা খুঁজুন, গল্পের কি পড়িয়া থাকিবে? যমরাজ কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তি নয়—তাহার বাড়ীতে কেহ অতিথি থাকে না, সে কাহাকেও বিদ্যা দেয় না, তথাপি এই উপাখ্যান নিরর্থক নহে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাসনার নিবৃত্তি না হইয়াছে, যতক্ষণ উহাদের মৃত্যু না হইয়াছে, ততক্ষণ ব্রহ্মবিদ্যা পাওয়ার বা চাওয়ার অধিকার হয় না। বাসনার মৃত্যুর ভিতর দিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পথ। এই উপাখ্যানের পশ্চাতে ঐতিহাসিকতার ছাপ চাওয়ার কোনও মানে নাই। ইহা দেখাই যাইতেছে যে, গল্পটা কল্পিত। একটা উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য উহার সৃষ্টি হইয়াছে। উহার ঐতিহাসিক ভিত্তি না থাকিলেও নচিকেতা-উপাখ্যানের ঘটনাগুলি বা কাশী-কোশল কাহিনীর ঘটনাগুলির মূল্য কম নহে। ঐ সকল ঘটনার আশ্রয়েই আমাদের কাম্য শিক্ষা আমরা পাই।

রামায়ণের ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকিলেও রামায়ণে রূপক হিসাবেই উহা ব্যবহার হইয়াছে। যে রামের অয়ন

বা পথ রামায়ণ, সে রাম হৃদয়বিহারী ; যে রাবণের সহিত রাম যুদ্ধ করিয়াছেন, সে রাবণও হৃদয়েই আছে ; আর সে যুদ্ধক্ষেত্রও হৃদয়ই।

সুভ আচরণ কতহুঁ নহিঁ হোঈ
দেব বিপ্র গুরু মানন কোঈ
নহিঁ হরি ভগতি যজ্ঞ তপ দানা।
সপনেহু সুনিঅ ন বেদ পুরানা
জপ জোগ বিরাগা তপ মখভাগা শ্রবন সুনই দসসীসা।
আপুন-উটি ধাবই রহই ন পাবই ধরি সব ঘালই খীসা॥
অসভ্রষ্ট অচারা ভা সংসারা, ধরম সুনিঅ নহিঁ কানা।
তেহি বহ বিধি ত্রাসই দেস নিকাসই জো কহ
বেদ পুরানা।
বরনিন জাই অনীতি ঘোর নিসাচর জো করহিঁ
হিংসা পর অতি প্রীতি তিহু কে পাপহিঁ কবনি মিতি।
জিহ্ব কে ইহ আচরণ ভবানী
তে জানহ নিসিচর সব প্রাণী
অতিসয় দেখি ধরম কৈ গ্লানী
পরম সভীত ধরা অকুলানী।

কোনও স্থানে আর কোনও শুভ আচরণ রহিল না। কেহ আর দেবতা ব্রাহ্মণ ও গুরুকে মানে না। হরিভক্তি নাই। যজ্ঞ জপ দানাদি নাই। স্বপ্নেও বেদ ও পুরাণ কেহ শোনে না। জপযোগ বিরাগ তপস্যা যজ্ঞ এ সকলের কথা কানে শুনিলেই রাবণ উঠিয়া নিজেই ছোটে। সমস্ত লণ্ড ভণ্ড করিয়া দেয়। সংসার এমন ভ্রষ্টাচার-সম্পন্ন হইল যে ধর্ম্মের কথা আর কানেও শুনা যায় না। যে বেদ পুরাণের কথা বলে, তাহাকে নানা ভয় দেখাইয়া দেশের বাহির করা হয়। পার্ব্বতী, যাহাদের আচরণ এইরূপ জানিবে তাহারা রাক্ষস। ধর্ম্মের গ্লানি দেখিয়া পৃথিবী বড় ভীত ও আকুল হইলেন।

রামের সহিত রাবণের যুদ্ধ হইয়াছিল। রাবণ রাক্ষসদের রাজা। রাক্ষস কাহারা ? যাহারা শুভ আচরণ করিতে দেয় না, দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু মানে না, যজ্ঞ পণ্ড করে, সংসার ভ্রষ্টাচারী করে। বেদ পুরাণের কথা বলিলে তাহাকে দেশছাড়া করিয়া তাড়াইয়া দেয়, তাহারাই রাক্ষস জানিবে। এই রাক্ষস খুঁজিতে বেশীদূর যাইতে হয় না। মানুষের হৃদয়েই এই রাক্ষস-দল বাস করে। তাহাদের সর্দ্দার বা রাজা হৃদয়েই বাস করে। এই রাক্ষসের অত্যাচারে পৃথিবী পীড়িতা হইয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন—

গিরি সরি সিংধু ভার নহিঁ মোহী
জস মোহি গরুঅ এক পরদ্রোহী
সকল ধরম দেখই বিপরীতা
কহি ন সকই রাবণ ভয় ভীতা।

পৃথিবী কাঁদিয়া বলে একজন পরদ্রোহী আমার কাছে যত ভার, পর্ব্বত নদী সাগর এ সকল আমার কাছে তত ভার বোধ হয় না। আমি সমস্তই ধর্ম্ম-বিপরীত দেখিতেছি, রাক্ষস ভয়ে ভীত হইয়া কিছু বলিতে পারিতেছিনা। কিন্তু এক পরদ্রোহ রূপ রাক্ষস নয়, নানা হিংস্র ও পাপ-বৃত্তির রাক্ষস পুষিয়া মানুষ হৃদয়-পুরকে রাবণপুরী লঙ্কা করিয়া রাখিয়াছে।

পৃথিবী কাঁদিয়া ব্রহ্মার কাছে গেলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, তাঁহার দ্বারা কিছুই হইবে না। তাঁহারা সকলেই রাবণ-ভয়ে ভীত। একমাত্র বিষ্ণু রক্ষা করিতে পারেন। তখন গাভীর বেশে পৃথিবী ও দেবতারা মিলিয়া উতলা হইয়া খুঁজিতে লাগিলেন—কোথায় বিষ্ণুকে পাওয়া যায়। কেহ বলে, চল বৈকুণ্ঠে যাই ; কেহ বলে, তিনি ক্ষীর-সমুদ্রে বাস করেন।

পুর বৈকুণ্ঠ জান কহ কোঈ
কোউ কহ পরনিধিমহঁ বস সোঈ"

শিব ছিলেন রামভক্ত ; রাম বা বিষ্ণু কোথায় থাকেন তাহা তিনি জানেন।

"তেহি সমাজ গিরিজা মৈঁ রহেউঁ
অবসর পাই বচন এককহেউঁ।
জাকে হৃদয় ভগতি জস প্রীতী
প্রভুতই প্রগট সভা তেহি রীতি
হরি ব্যাপক সর্ব্বত্র সমানা
প্রেম তেঁ প্রগট হোহিঁ মৈঁ জানা
দেস কাল দিসি বিদিসহ মাহীঁ
কহহ সো কহাঁ জহাঁ প্রভু নাহীঁ
অগ জগময় সব রহিত বিরাগী
প্রেম তেঁ প্রভু প্রগটই জিমি আগী।"

শঙ্কর বলিলেন "সেই সকলের মধ্যে আমিও ছিলাম। অবসর পাইয়া একটা কথা বলিলাম। যাহার হৃদয়ে

ভক্তি যেমন, প্রভু সেই ভাবে সেখানে প্রকাশ হয়েন, ইহাই রীতি। হরি সকল স্থানে সমানভাবে ব্যাপ্ত থাকেন। আমি জানি তিনি প্রেমের বলে প্রত্যক্ষ হন। দেশ কালে দিকবিদিকে কোথায়ই বা তিনি না আছেন। সর্ব্বশূন্য বৈরাগী প্রভু স্থাবর জঙ্গমে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। আগুন যেমন কাঠের ভিতরেই আছে, ঘসিলেই প্রত্যক্ষ হয়, হরি তেমনি হৃদয়েই আছেন—প্রেমেই প্রত্যক্ষ দেখা যেন।

রাক্ষসেরা হিংসা পরদ্রোহ লোভ ও কামাদির রূপ লইয়া হৃদয়-ক্ষেত্রকে পীড়িত করিতেছিল। হরি তাহাদিগকে দমন করিবেন। হরি বা রামও হৃদয়ের ভিতরেই আছেন। চাই কেবল রামভক্তি; তাহা হইলেই তিনি প্রকাশ হইতে পারেন।

হৃদয়ে যখন রাক্ষসের উৎপাতের বোধ দেখা দেয়, তখনই রাম-জন্মের সূচনা হয়। দেবতারা যখন রাক্ষস দ্বারা পীড়িত হইয়া বিষ্ণুকে খুঁজিতেছিলেন এবং শিব যখন তাঁহাদিগকে বুঝাইয়াছিলেন যে, বিষ্ণুকে খুঁজিতে কোথাও যাইতে হইবে না, নিজের হৃদয়ের মধ্যে খুঁজিলেই তাঁহার দেখা পাওয়া যাইবে, তখন দেবতারা শ্রীভগবানের স্তুতি আরম্ভ করিলেন। ভগবান প্রসন্ন হইয়া বলিলেন যে, তিনি দশরথ রাজার ঘরে দশরথ কৌশল্যার পুত্ররূপে জন্মিবেন। কেন না মনু ও শতরূপা তাঁহাকে পাওয়ার জন্য অনেক তপস্যা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারাই এ জন্মে দশরথ কৌশল্যারূপে জন্মিয়াছেন।

কস্যপ অদিতি মহাতপ কীন্হা
তিন্হকর মৈঁ পূরব বর দীন্হা
তে দসরথ কৌশল্যা রূপা
কোসলপুরী প্রগট নর ভূপা।
তিন্হকে গৃহ অবতরি হউঁ জাই
রঘুকুল তিলক সো চারিউ ভাই।

রাবণের উৎপাতে হৃদয়ের প্রভু জাগিয়া উঠিয়া রাক্ষস মারার সঙ্কল্প লইলেন। রাবণ সদলে মারা গেল। রাক্ষসের শক্তি কম নয়। সে সমস্ত সৎগুণ দাবাইয়া রাখিয়াছিল; সে পার্থিব ধনে ও পার্থিব শক্তিতে পূর্ণ। সেও শক্তি অর্জ্জনের জন্যে তপস্যা করিয়াছে। সেই তপস্যার ফলে রাবণ রাজসিকতাই ক্রমশঃ অধিক করিয়া পাইয়াছে। সীতাকে হরণ করিয়া সে জগৎপিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু যাহার হৃদয়ে রামভক্তি আছে, সেখানে কালক্রমে রাক্ষসের পরাজয় হয়। সহজে ত দুষ্টবৃত্তি পরাজয় মানে না। বিপুল যুদ্ধ, রাম-রাবণের যুদ্ধ হয়। রাবণ মরিয়াও মরে না—বার বার তাহার মাথা গজায়, দুষ্টবৃত্তি ও হিংসা নির্ম্মূল করা বড়ই শক্ত। অবশেষে রাবণ মারিলে ধর্ম্মরাজা বা রামরাজ্য হৃদয়ে স্থাপিত হয়।

ইহাই রাম-রাবণের যুদ্ধের অন্তরের দিক। ইহার বাহিরের দিক হইতেছে রাম-অবতারের অযোধ্যার জন্ম ও কর্ম্ম। সে কাহিনীও পবিত্র, মঙ্গলদায়ক ও ভক্তিপ্রদ। রামায়ণের ভিতর দিয়া এই দুইটা ধারা—একটা বাহিরের একটা অন্তরের ধারা বহিয়া চলিয়াছে। দুই-ই মনোহর, দুই-ই ভক্তিদায়ক। এই বর্ণনা করিতে করিতে তুলসীদাস বার বার মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন, এমন প্রিয় হিতকারী এমন নিকটতম প্রভু রামকে কেন না ভজনা করিবে?

যাঁহারা রামায়ণের বাহ্যিক ধারায় খাঁটি ইতিহাস খোঁজেন, তাঁহাদিগকেও বাল্মীকি মহারাজ প্রথমেই ব্যর্থ করিয়া রাখিয়াছেন; স্বর্গ, পাতাল, দৈত্য দেবতা, আদিয়া রাবণের ঘাড়ে দশটা মাথা চাপাইয়া, যখন-তখন মায়া-মূর্ত্তি ধরার শক্তি দিয়া, বানর ভালুক ও পাখীকে দিয়া কথা বলাইয়া, হনুমানকে কখনও বা মাছির মত ছোট কখনো বা শতযোজন পরিমিত করিয়া, অতিপ্রাকৃত করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, কেহ যেন ইহার মধ্যে ইতিহাস না খোঁজেন।

এই রাম-কথার একজন প্রধান বক্তা কাক ভুষণ্ডী। সে কালের অতীত। মহাপ্রলয়েও তাহার মৃত্যু নাই। শুদ্ধ ভক্তিই কাকের রূপ ধরিয়া আছে। ধর্ম্মের ও সত্যের মতই সে কাক অবিনশ্বর। বার বার, কল্পে-কল্পে রাম অযোধ্যায় জন্মিতেছেন, বার-বার কাক তাঁহার শিশু-লীলা দেখিয়া তৃপ্ত হইতেছে।

"জব জব অবধপুরী রঘুবীরা
ধরহিঁ ভগতহিত মনুজ সরীরা
তব তব জাই রামপুর রহউঁ
সিসুলীলা বিলোকি সুখ লহউঁ

যে অযোধ্যা কল্পে-কল্পে দেখা দেয়, বার বার যে

অযোধ্যায় রামের জন্ম হয়, যে দণ্ডকবন হইতে রাবণ বার বার সীতাহরণ করে, যে অযোধ্যায় বার বার রামের অভিষেক হয়, সে কি কোন ইতিহাসের, কোন ভূগোলের রামসীতা, অযোধ্যা ও দণ্ডকবন ?

কিন্তু তাই বলিয়া বাহ্যিক ধারার ঘটনা-স্থান ও চরিত্রগুলি কি অসত্য ? এই রামসীতার কাহিনী, রামের জন্ম, বাল্যলীলা, সীতার সহিত রামের সাক্ষাৎ, ধনুর্ভঙ্গ, বিবাহ, কৈকেয়ীর মন্ত্রণা, রামের বনবাস, রাবণের সীতাহরণ, লঙ্কায় যুদ্ধ এ সকল কি অসত্য ? আমি দৃঢ়ভাবে বলি যে উহা কখনো অসত্য নয়। ইতিহাস হিসাবে উহার কোনও স্থান নাই ; কিন্তু কল্পলোকে উহা সৃষ্ট। কতক বা ঐতিহাসিক কিছু আছে, তাহা হইলেও সকল মিলিয়া কাহিনীটা ইতিহাসের কাহিনী অপেক্ষাও সত্য ও বাস্তব। তাঁহারা বাস করিয়া গিয়াছেন এই ভারতভূমিতে ; ঐ অযোধ্যা, ঐ চিত্রকূট তাঁহারা পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। যেখান যেখান দিয়া সীতাদেবী শুধু পায় হাঁটিয়া গিয়াছেন সেই স্থানের ধূলিকণা পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। সেই ধূলিতে জন্মিয়া ভারতীয় কন্যারা নির্মল হইয়াছে, সাধ্বী হইয়াছে।

রামায়ণের অঙ্গীভূত হর-পার্ব্বতী-কাহিনী, সতীর দক্ষযজ্ঞে দেহনাশ, পরে পর্ব্বতগৃহে, জন্ম, নারদের উপদেশ, উমার হাজার হাজার বৎসর তপস্যা, এ সকল কি মিথ্যা ? এ সকল মিথ্যা নহে ; ইতিহাসের সত্য অপেক্ষা অধিকতর সত্য। এমন সত্য যে, ভারতবাসী সমস্ত হিন্দুই নিজ অনুভূতি ও ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে উহার সাক্ষী সংগ্রহ করিয়া সত্য বলিয়া প্রমাণ দিবে।

রামায়ণ পড়িতে বসিয়া এই অনুভূতি ও এই বিশ্বাসের সাক্ষ্য লইয়া পড়িলে ফল পাওয়া যাইবে। রামায়ণকে ছেলে-ভুলানো গল্প বলিয়া যিনি মনে করেন, তিনি কৃপার পাত্র। রামায়ণে হয় ত বা সবটাই কাল্পনিক, হয় ত বা কতকটা ঐতিহাসিক আছে। কিন্তু সমস্তটুকুই শ্রদ্ধা পাইয়া আসিয়াছে ও শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য।

তুলসীদাস লিখিয়াছেন যে তাঁহার রাম-কথা সকলের জন্য নয় ;—

যহ ন কহীঅে সঠ হঠ—সীলহিঁ
জো মন লাই ন সুন হরি লীলহিঁ
কহিঅ ন লোভিহি ক্রোধিহি কামিহি
জো ন ভজই সচরাচর স্বামিহি।

এই কথা, দুষ্ট জেদী লোক, যাহারা মন দিয়া হরিলীলা শুনে না, তাহাদিগকে বলিবে না। এ কথা কামী ক্রোধীকে ও যে জগৎপতিকে ভজনা করে না, তাহাকে বলিবে না। হয় ভক্তির সহিত পড়িবে, নয় ত পড়িবে না—ইহাই গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায়।

তুলসী রামায়ণ পাঠের পূর্ব্বে ইহার কতকগুলি চরিত্র লইয়া আলোচনা করিলে শ্রদ্ধার ভাব বাড়া সম্ভব। পরে আরও কতকগুলি চরিত্র আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বন্যা

শ্রীসীতা দেবী বি-এ

(৫)

বৃষ্টি বাদলের দিন, গ্রামের পথে বেশী লোকচলাচল নাই। প্রতুলচন্দ্র হাঁটিয়া যাইতে যাইতে দুই-চারিটির বেশী মানুষ দেখিলেন না। সকলেই বিস্মিত দৃষ্টিতে গরুর গাড়ীর দিকে তাকাইতে লাগিল। প্রতুলচন্দ্রকে কেহই এ গ্রামে চেনেনা, গরুর গাড়ীর ভিতর সুবর্ণ দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে, তাহাকেও ভাল করিয়া দেখা যায়না। যাহারাই তাঁহাদের দেখিল, মনে মনে নানারকম কল্পনা করিতে লাগিল।

গাড়ী আসিয়া একটি বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। প্রতুলচন্দ্র ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। বাড়ীটি দেখিলে সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ী বলিয়াই বোধ হয়। বাহিরের বৈঠকখানা-ঘরটি পাকা, ভিতরের ঘরগুলিও না দেখা যায়, পাকা দেওয়াল, খড়ের চাল। চালে নূতন খড় পড়িয়াছে। সদর দরজাটি বেশ ভাল মজবুৎ কাঠের। সম্প্রতি উহা বন্ধ রহিয়াছে।

সুবর্ণ কম্পিতপদে গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া পিতার পাশে দাঁড়াইল। প্রতুলচন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন, ভয়ে মেয়ের মুখ একেবারে শাদা হইয়া গিয়াছে। একটুখানি হাসিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "এত ভয় কিসের রে? আমার সঙ্গে এসেছিস্, তাতেও সাহস হচ্ছেনা?"

সুবর্ণ ঢোঁক গিলিয়া কোনোমতে চোখের জল সাম্‌লাইয়া লইল। অত্যাচারের স্মৃতি তাহার বক্ষ জুড়িয়া রহিয়াছে, তাহা সে ভুলিবে কেমন করিয়া? তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা কেহ কোনোদিন করে নাই, সুতরাং পিতার আশ্বাস-বাণী তাহার কানে ঢুকিল বটে, কিন্তু মনকে স্পর্শ করিলনা।

প্রতুলচন্দ্র দরজায় আঘাত করিলেন। সুবর্ণর বোধ হইল আঘাতটা যেন তাহারই বুকের উপর পড়িতেছে। ভয়ে, উত্তেজনায়, তাহার সারা শরীর ঝিন্‌ঝিন্ করিতে লাগিল।

হড়াৎ করিয়া দরজাটা খুলিয়া গেল। একজন যুবতী বিধবা কপাটের আড়াল হইতে গলা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রতুলচন্দ্রের দিকে চাহিল। তিনিই সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন। পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু অবগুণ্ঠিতা সুবর্ণকে দেখিতে পাইয়া, তাহার মুখ কুটীল হাস্যে একেবারে ভরিয়া উঠিল। কপাট ধরিয়াই সে বাড়ীর ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইয়া, ডাকিয়া বলিল "ওগো, রাজনন্দিনী দেশ বেড়িয়ে ফিরে এলেন গো, এবার রসুনচৌকী বাজাও!"

পরক্ষণেই দরজাটা দড়াম্ করিয়া তাঁহাদের মুখের উপর বন্ধ করিয়া দিল!

সুবর্ণ ক্রন্দন-জড়িত স্বরে বলিল, "দেখ্‌লে ত বাবা!"

প্রতুলচন্দ্রের মুখ রাগে লাল হইয়া উঠিল। তিনি প্রাণপণ বলে নিজেকে সংযত করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, ভয় পাস্‌নে, এর শেষ দেখে যাওয়া যাক্।" তিনি দরজাটার ঠেলা দিয়া দেখিলেন, হুড়কা বন্ধ করা হয় নাই, শুধু ভেজান আছে। সুবর্ণকে টানিয়া আনিয়া দরজা খুলিয়া ভিতরে ঢুকাইয়া দিলেন, বলিলেন, "ভিতরে যা, এ বাড়ীতে তোর অধিকার আছে। কম দাম দিস্‌নি

এর অন্তে। দরজা ভেঙিয়ে দিলেই এত বড় শেকলের বাঁধন কেটে যাবে?"

সুবর্ণ অগত্যা কাঁপিতে কাঁপিতে চলিল। প্রতুলচন্দ্র দেখিলেন বৈঠকখানার জানালার কাছে একজন ছেলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে উগ্র কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেছে। তিনি তাহার দিকে চাহিবামাত্র, সে চোখ নীচু করিল। প্রতুলচন্দ্র আন্দাজ করিলেন এইটিই তাঁহার জামাই হইবে। জোর করিয়া মুখে একটুখানি হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন "দরজাটা খোলো, আমি কি রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে থাকব?"

যুবক অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলিয়া দিল। প্রতুলচন্দ্র গরুর গাড়ীর দিকে নির্দ্দেশ করিয়া যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জিনিষপত্র কোথায় রাখবে?"

যুবক নির্ব্বোধের মত বলিল "তা আমি কি জানি?"

প্রতুলচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি শ্রীবিলাস না?"

যুবক ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে শ্রীবিলাসই বটে।

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "আমি সুবর্ণর বাবা, তাকে নিয়ে এসেছি, দেখতেই পাচ্ছ। জিনিষপত্রের কি ব্যবস্থা হবে, সেটা কে বলে দেবে?"

শ্রীবিলাস কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। প্রতুলচন্দ্রের শেষের প্রশ্নগুলির কোনো উত্তর দিলনা। কোনোমতে অবনত হইয়া, প্রতুলচন্দ্রকে একটা প্রণাম করিয়া বলিল, "বসুন।"

ঘরে একজোড়া তক্তপোষের উপর ফরাশ পাতা; মোটা মোটা তাকিয়াও কয়েকটা আছে। এক কোণে ছোট একটা টেবিল এবং চেয়ার। ইহা শ্রীবিলাসের পড়িবার আড্ডা। প্রতুলচন্দ্রের ফরাশে বসা তত অভ্যাস ছিলনা, তিনি চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া বসিলেন। জামাইয়ের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পড়?"

শ্রীবিলাস একটু যেন বিরক্তভাবে বিড়বিড় করিয়া বলিল, "এবার সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছি।"

প্রতুলচন্দ্র আবার কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সুবর্ণর ভয়ার্ত্ত চিৎকার তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিল। চেয়ার ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি তিনি উঠিয়া পড়িলেন। সুবর্ণ পরমুহূর্ত্তেই আর্ত্তনাদ করিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঝাঁটা হাতে এক বিধবা প্রৌঢ়া।

প্রতুলচন্দ্র এক লাফে সিঁড়ি কয়েকটা অতিক্রম করিয়া উঠানে নামিয়া পড়িলেন; কাঁটা-গাছ আবার উদ্যত হইয়াছিল, ডানহাতে সেটাকে ঠেকাইয়া, কঠোরস্বরে বলিলেন, "এ কি কাণ্ড? আপনি করছেন কি?"

প্রৌঢ়া বিকট মুখভঙ্গি সহকারে, গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "এত বড় আস্পর্দ্ধা, পোড়ামুখ নিয়ে আবার আমার বাড়ীতেই ঢুকেছে? এই দণ্ডে বেরিয়ে যাও, নইলে ঝাঁশবটি দিয়ে কেটে দুখান করব।"

প্রতুলচন্দ্র ঝাঁটাটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিলেন। সুবর্ণকে পিছনে ঠেলিয়া দিয়া, নিজের শরীর দিয়া তাহাকে আড়াল করিয়া বলিলেন, "আপনি এসব কি বলছেন বেয়ান? মা মৃত্যুশয্যায়, তাকে দেখতে গিয়েছিল, সেটা কি এমন অপরাধ?"

শ্রীবিলাসের মা ক্ষিপ্তের মত মুখ খিঁচাইয়া উঠিলেন "আ মরি মরি, যেমন বেটি, তার তেমনি বাপ। ইনি আবার এলেন সাফাই গাইতে, ধর্ম্ম দেখাতে। বলি এতদিন ছিলে কোথা? এতদিন ত কোনো বাপের সন্ধান মেলেনি? পেরস্তবাড়ীর বৌ, রাত বেরাত পালিয়ে গেলে অপরাধ হয় না? কোন্ দেশ থেকে এসেছ?"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "যে দেশ থেকেই আসি, তাতে কিছু এসে-যাচ্ছেনা। আপনারা সুবর্ণকে ঘরে নেবেন কিনা, সেইটা আমার জানা দরকার।"

সুবর্ণর শাশুড়ী হাত নাড়িয়া বলিল "ও বাবা, আবার চোখ রাঙানি! বেরোও মেয়ে নিয়ে।"

শ্রীবিলাসও বৈঠকখানার দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে একটা কথাও বলে নাই। প্রতুলচন্দ্র এবার তাহার দিকে ফিরিয়া রোষতিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমারও কি ঐ মত নাকি?"

শ্রীবিলাস একবার মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। কি যেন বলিতে যাইতেছিল, আবার সামলাইয়া গেল। সুবর্ণ তখন পিতার পিছনে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে। শ্রীবিলাস একবার বিরক্তভাবে তাহার দিকেও চাহিয়া দেখিল। প্রতুলচন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা

করিলেন "কি, তোমার এ বিষয়ে বলবার কিছুই নেই নাকি? বিয়েটা তুমিই ত করেছিলে?"

শ্রীবিলাস নীচুগলায় বলিল "আমার মা যা বল্‌ছেন, তার উপর আমার আর বল্‌বার কিছু নেই। আপনার মেয়ে নিয়ে যান্।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "বেশ কথা, রেখে যেতে হলেই দুঃখের কারণ হত। কিন্তু এই নিয়ে যাওয়াটাই শেষ নিয়ে যাওয়া, তা মনে রেখো।"

সুবর্ণর হাত ধরিয়া, এক টান দিয়া তিনি মাটি হইতে উঠাইয়া ফেলিলেন। বাঁ হাতের লোহাটা তাঁহার হাতে ফুটিয়া গিয়া, নিজের অস্তিত্ব জানাইয়া দিল। তিনি একবার তীব্র দৃষ্টিতে সেটার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পর সজোরে সেটা টানিয়া মেয়ের হাত হইতে খুলিয়া ফেলিলেন। শ্রীবিলাসের গায়ের উপর লোহাটা ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন, "আমার মেয়ের স্বামী নেই জান্‌লাম। মাটির ঢেলার সঙ্গে কখনও স্ত্রীলোকের বিয়ে হয়না।"

শ্রীবিলাসের বোন্ আকাশ ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। প্রতুলচন্দ্র সুবর্ণকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। গঙ্গর গাড়ীর হতবুদ্ধি গাড়োয়ানকে ঠেলা দিয়া সচেতন করিয়া বলিলেন, "নাও, চল, আবার নৌকার ঘাটে যেতে হবে।"

সুবর্ণ আবার গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। প্রতুলচন্দ্রও এবার গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

নৌকার ঘাটে আসিতে বেশী দেরি হইলনা। মাঝি সুবর্ণকে শুদ্ধ ফিরিতে দেখিয়া অত্যন্তই অবাক হইল, কিন্তু প্রতুলচন্দ্রের ভ্রূকুটি দেখিয়া কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে আর সাহস করিলনা। জিনিষপত্র নৌকায় তুলিয়া দিয়া গঙ্গর গাড়ীর গাড়োয়ান বিদায় হইয়া গেল।

নৌকার ভিতর সুবর্ণ মুখ গুঁজিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার ক্ষুদ্র মনের ভিতর কি যে ঝড় বহিতেছিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। তাহার অপরিণত বুদ্ধি দিয়া সে বুঝিতেছিল, এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল, নারীর জীবনে যাহার চেয়ে শোচনীয় আর কিছু ঘটিতে পারেনা। জন্মাবধি সে দেখিয়াছে, শুনিয়াছে, স্বামীর আশ্রয়ে বাস করা ভিন্ন সুদূর-অতীতের নারীর অন্য কোনো গতি নাই। আজকার ঘটনায় চিরদিনের জন্য সে সেই আশ্রয় হারাইল। ইহার পর সে কোথায় যাইবে, কি ভাবে দিন কাটাইবে? বালিকা ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া ভীষণ অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইল না। নিজ হইতেই চোখ তাহার জলে ভরিয়া আসিল, হৃদয়ের দারুণ বেদনা ক্রন্দনে ফাটিয়া পড়িল। নারী দুঃখ পাইলে ভাগ্যকে অপবাদ দিয়া কাঁদিতে বসে, ইহা ভিন্ন আর কিছু সে দেখে নাই।

প্রতুলচন্দ্র কাছে আসিয়া, তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন, বলিলেন, "কার জন্যে কাঁদছ মা? ওদের মত কশাইয়ের হাত থেকে মুক্তি পেলে, এতে ত দুঃখ করবার কিছু দেখছি না?"

সুবর্ণ মুখ তুলিয়া বলিল, "কিন্তু এর পর আমার কি হবে বাবা?"

প্রতুলচন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন। "কি হবে কি রকম? এখন তো অনেক কিছু হবার পথ খোলা পড়ে রয়েছে? বরং, তোমাকে যদি ওরা ঘরে নিত, তা হলেই কিছু হবার পথটা বন্ধ হত। আমি তোমাকে যেমন ভাবে মানুষ করব ভেবেছিলাম, তাই এখন করব; আরম্ভ করতে অনেকটা দেরী হয়ে গেল, এই যা। তোমাকে এ-সব একেবারে ভুলে যেতে হবে; সমস্ত মন দিতে হবে নিজেকে তৈরী করার জন্যে। কোনো কিছুতে আপত্তি করবেনা, কিছুতে ভয় পাবেনা, দুঃখ পাবেনা।"

সুবর্ণ সব কথা ভাল করিয়া বুঝিল কিনা কে জানে; কিন্তু, পিতা যে তাহাকে আশ্বাস দিতেছেন তাহা বুঝিল; তিনি থাকিতে তাহার আশ্রয়ের অভাব নাই, তাহাও বুঝিল! চোখ মুখ মুছিয়া সে শান্ত হইয়া বসিল। শ্বশুরবাড়ীর কাহারও সহিত তাহার স্নেহ, ভালবাসার সম্বন্ধ হয় নাই, সুতরাং তাহাদের ছাড়িয়া আসিতে তাহার কোনো বেদনা বোধ হইলনা। তাহার ভয় ছিল খালি অপবাদের, খালি আশ্রয়হীনতা, অবলম্বনহীনতার।

নৌকা যখন জাম্‌রালের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল, তখন বর্ষা-সন্ধ্যার অন্ধকার ধরণীকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিয়াছে। প্রতুলচন্দ্র সম্মুখে তাকাইয়া বলিলেন, "ওহে, একটা হারিকেন-টেন জোগাড় করতে পার? যা আঁধার দেখ্‌ছি, এতে ত পথ-চলা অসম্ভব।"

মাঝির সঙ্গে তাহা হারিকেন লণ্ঠন একটা ছিল।

তাহাতে আলো গত হোক বা নাই হোক, ধোঁওয়া হয় প্রচুর। কিন্তু অন্য আলোর অভাবে, এই লণ্ঠনই আলা হইল। রাত্রি হইয়া আসিয়াছে, এখন আর গরুর গাড়ীর আশা করা বৃথা। মাঝি হাঁকডাক করিয়া দুইজন লোক জোগাড় করিল। তাহাদের কাঁধে জিনিষপত্র চাপাইয়া, নিজে সুবর্ণর হাত ধরিয়া প্রতুলচন্দ্র সাবধানে অগ্রসর হইলেন। রাস্তায় জনমানব নাই। পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে যে সাক্ষাৎ হইলনা, কোনো কৈফিয়ৎ যে তাঁহাকে দিতে হইলনা, ইহাতে প্রতুলচন্দ্র খুসিই হইলেন।

সুবর্ণর মাসী-মা কোনোমতে একটা প্রদীপ জ্বালাইয়া, গৃহস্থঘরের অকল্যাণ দূর করিয়াছিলেন। আর সারা বাড়ী অন্ধকার। নিজে সামান্য জলযোগ করিয়া, মুড়িসুড়ি দিয়া শুইয়া ছিলেন। ঘুমান নাই, কারণ প্রতুলচন্দ্রের ফিরিয়া আসার কথা ছিল। ভদ্র কুটুম্ববাড়ী হইলে, তাহারা আদর-আপ্যায়ন করিয়া ধরিয়া রাখিত। এ-ক্ষেত্রে সে-রকম সম্ভাবনা কিছুই ছিলনা। বিধবা ভগিনীপতির খাবার তৈরায়ী করিয়া রান্নাঘরে উনুনের উপর চাপা দিয়া রাখিয়া, শুইয়াছিলেন; প্রতুলচন্দ্র আসিলে উঠিয়া বাড়িয়া দিবেন। ভয়ও খানিকটা করিতেছিল। এই সে-দিন এ-বাড়ী হইতে শ্মশান-যাত্রা ঘটিয়াছে, ভাবিতেই গা কেমন ছমছম করিতেছিল। সংসারে মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালবাসার সম্বন্ধ কি নিবিড়! কিন্তু একবার এই পার্থিব জগতের গণ্ডি পার হইয়া গেলেই, সে ভালবাসা কেমন করিয়া দারুণ ভীতিতে পরিণত হয়। ভগিনীকে দেখিবার কথা আর যেন তিনি মনেই করিতে পারেননা।

হঠাৎ বাহিরের দরজায় করাঘাত হইল। প্রতুল ফিরিয়া আসিল নাকি? আচ্ছা চামার কুটুম্ব হইয়াছে, মানুষটাকে একেবারে দাঁড়াইয়া বিদায় দিয়াছে, বসিবার আসনও দেয় নাই বোধ হয়। নহিলে এত চট্ করিয়া ফিরিয়া আসিবে কেমন করিয়া?

ডাকিয়া বলিলেন, "একটুখানি সবুর কর ভাই, লণ্ঠনটা জেলে নিয়ে গিয়ে দোর খুলছি। পিদ্দিম নিয়ে বেরলে, এখনি হাওয়ায় নিভে যাবে।"

বালিশের তলা হাতড়াইয়া দেশলাই বাহির করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি লণ্ঠন জ্বালাইলেন। আঁচলটা ভাল করিয়া দুই কের দিয়া গায়ে জড়াইয়া, উঠানে নামিয়া সদর দরজার হুড়কো খুলিয়া বলিলেন "এস ভাই এস, যা—"তাঁহার মুখের কথা মুখেই থাকিয়া গেল। হতবুদ্ধি-ভাবে তিনি সুবর্ণর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রতুলচন্দ্র ভিতরে ঢুকিয়া, পিছনের লোক দুজনকে বলিলেন, "এই দিকে নিয়ে এস হে। ঐ ঘরের ভিতর নামিয়ে রাখ।"

লোক দুইজন বাক্স বিছানা নামাইয়া রাখিয়া পয়সা লইয়া চলিয়া গেল। মাঝিও ভাঙা লণ্ঠন লইয়া পথ দেখাইয়া আনিয়াছিল; সেও নিজের পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়া লইয়া বিদায় হইল। প্রতুলচন্দ্র মেয়েকে লইয়া ঘরের ভিতর গিয়া বসিলেন।

বিধবা শালিকা এতক্ষণে মুখ খুলিলেন; "এ কি কাণ্ড ভাই, সুবর্ণকে ফিরে নিয়ে এলে যে?"

প্রতুলচন্দ্র মাথা নীচু করিয়া জুতার ফিতা খুলিতেছিলেন। তিনি সেইভাবে থাকিয়াই বলিলেন, "ওরা বৌ নেবেনা।"

মাসী-মা গালে হাত দিয়া বলিলেন, "কি কাণ্ড, মাগো মা! এমন চামারের ঘরেও মেয়ে দিয়েছিল গা! এখন মেয়েটার গতি কি হবে?"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "এইবার সম্প্রতি একটা কিছু হলেও হতে পারে। ও-বাড়ীতে আবার ঢুকলে, নিতান্ত জানোয়ারের গতির বেশী কিছু হতনা।"

শালিকা সব কথা তলাইয়া না বুঝিয়া বলিলেন, "মিথ্যে না ভাই। নামেই ভদ্দরলোক। তা যা হবার তা হল, হাতমুখ ধুয়ে খাও দাও। যা ভাত আছে, হয়ে যাবে হয় ত। কম হয় ত ফলটল রয়েছে, কিছু কেটে দেবো।"

কম পড়িলনা। সারাদিনের উত্তেজনা এবং ক্লান্তির ফলে পিতা বা কন্যা কাহারও আহারে বিশেষ রুচি ছিলনা। নামমাত্র খাইয়া, বিছানা করিয়া সকলে শুইয়া পড়িলেন। সুবর্ণই ঘর ঝাঁট দিয়া বিছানা পাতিল। পিতার জন্য পান সাজিয়া আনিল, খাবার জল আনিয়া ঢাকা দিয়া রাখিল। পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল "মশারি টাঙিয়ে দেব বাবা? এ ঘরটাতে মাঝে মাঝে মশা লাগে।"

প্রতুলচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "না মা, মশারিতে আমার দরকার নেই, ও ঘেরাটোপের মধ্যে আমি ঘুমুতে পারিনা।"

দ্বারের নিকট দণ্ডায়মানা বালিকাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এইটুকু মেয়ে ত খুব গুছিয়ে কাজ করতে শিখেছে?"

সুবর্ণর মাসী-মা বলিলেন, "তা খুব। না হলে রক্ষেকালী শাশুড়ী, ওকে আস্ত রাখত? দজ্জাল শাশুড়ীর হাতে পড়লে, খোয়ার হয় বটে, তবে কাজকর্ম ভাল শেখে।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "হ্যাঁ, তবে ভাল কাজ শেখার ওর চেয়ে সুবিধাজনক ব্যবস্থাও হতে পারে।"

সুবর্ণর মাসী-মা একটুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আমার কিন্তু কাল না গেলেই চলবেনা ভাই। ঘরসংসার সব ত ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি, গিয়ে কি অবস্থা যে দেখব তাও জানিনা।"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন, "আমিও ত কালই যাচ্ছি। সুতরাং আপনার যাওয়ার কোনো অসুবিধে হবেনা।"

বিধবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলকাতায়ই আপাতক যাবে ত?"

প্রতুলচন্দ্র সংক্ষেপে বলিলেন "হ্যাঁ।"

(৬)

পরদিন সকাল হইতে-না-হইতে এ বাড়ীতে যাওয়ার ধুম লাগিয়া গেল। কোনোমতে ভাতে-ভাত দুটা সিদ্ধ করিয়া সুবর্ণর মাসীমা নিজে খাইলেন; বোনঝি, ভগিনীপতিকেও খাওয়াইলেন, কারণ কিছু মুখে না দিয়া এতখানি পথ যাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়না। তাঁহার নিজের সঙ্গে ছোট একটি টিনের প্যাট্‌রা ভিন্ন অন্য কোনো জিনিষ ছিলনা, সুতরাং তাঁহার গোছগাছ সহজেই হইয়া গেল। প্রতুলচন্দ্রের সব ব্যবস্থা সাঙ্গ করিতে খানিকটা বেলা হইল। দেশের বাড়ীতে আর শীঘ্র ফিরিবার কোনো সম্ভাবনা ছিলনা, সুতরাং জিনিষপত্র এখানে কিছু আর না রাখিয়া যাওয়াই ভাল। যাহা কিছু লইয়া যাওয়া যায়, তাহা সুবর্ণ গুছাইয়া লইল। বাকি জিনিষ, যেমন বাসন-কোষণ, খাট, চৌকী প্রভৃতি এক নিকট আত্মীয়ের ঘরে রাখিয়া আসা হইল। বাড়ীতে থাকিবার লোক চট্ করিয়া কাহাকেও পাওয়া গেলনা; প্রতুলচন্দ্র কলিকাতায় গিয়া সে ব্যবস্থা করিবেন মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন। সম্প্রতিকার মত, গ্রামের পাঁচু নাপিতকে রাত্রে আসিয়া শুইয়া থাকিতে অনুরোধ করিলেন। মাসিক চারিটা টাকা পাইবার লোভে সে সহজেই রাজী হইল।

বিধবা বালিকা প্রথমে বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার বাড়ী যে গ্রামে, তাহা জাদুরালের উত্তর দিকে; সেখানে যাইতে হইলে বিজয়নদ পার হইতেই হয়না। তাঁহার জন্য গরুর গাড়ী আসিল। একটি নীচ-জাতীয়া স্ত্রীলোক তাঁহার সঙ্গে যাইবে, সেও খাইয়া দাইয়া প্রস্তুত হইয়া আসিল।

সুবর্ণ তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পরিচিত সংসারের এই মাসিমাই শেষ প্রতিনিধি। আর যাহাদের চিনিত, তাহাদের জন্মের মত সে ছাড়িয়া আসিয়াছে। সকলের চেয়ে আপন যিনি ছিলেন, সেই মা তাহাকে চিরদিনের মত ছাড়িয়া গিয়াছেন। পিতাকে সে চেনেনা। তাঁহার গম্ভীর মুখ, রাশভারি কথাবার্ত্তা সুবর্ণর মনে অনেকটা ভয়েরই সঞ্চার করে। তবু বারো তেরো বৎসরের মেয়ে, বুদ্ধিশুদ্ধি খানিকটা হইয়াছে। পিতাই যে তাহার এখনকার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, তিনি যে তাহার একান্ত হিতকামী, তাহা সে বুঝিতে পারে। তবু মাসিমাকে ছাড়িয়া দিতে তাহার বুক কাটিয়া যাইতে লাগিল।

মাসিমাও কাঁদিতে লাগিলেন। চোখ মুছিতে মুছিতে প্রতুলচন্দ্রকে বলিলেন "তোমাকে কি আর বলব ভাই, এখন এই মেয়ে নিয়ে না জানি কত বিপদ হবে। মেয়ে সন্তান, কুসন্তান, চিরটা কাল দুঃখ দিতেই আছে। ওর মা হতভাগীও এমন সময় গেল!"

সুবর্ণকে বলিলেন, "কাঁদিস্‌নে মা, কেঁদে আর হবে কি? তোর অদৃষ্টের লিখনই এই রকম। বরাতে থাকে ত ওদের মন কোনোদিন ফিরেও যেতে পারে। ঠাকুর-দেবতার উপর মতি রাখিস্, বাপকে যেন কখনও তোর জন্যে দুঃখ না পেতে হয়।"

প্রতুলচন্দ্র কথা বলিলেন না। মাসিমার আক্ষেপ শুনিয়া তাঁহার মুখে একটু যেন স্নেহের ভাব দেখা দিল। সুবর্ণ কাঁদিতে কাঁদিতে মাসিমাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিল।

তাহার পর আসিল নিজেদের বিদায়ের পালা। দুই তিনখানা গরুর গাড়ী ডাকিতে হইল, কারণ জিনিষপত্র সঙ্গে অনেকগুলি। পাড়া-প্রতিবেশী যাহারা বিদায় দিতে

আসিয়াছিল, সংক্ষেপে তাহাদের কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া, তিনি মেয়েকে লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। পাঁচু আসিয়া বাড়ীর চাবি লইয়া গেল। সুবর্ণ মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিল; তাহার পরিচিত জীবন আজ সকল দিক হইতেই শেষ হইতে চলিল, তাহার আর কাহারও মুখের দিকে চাহিতে ইচ্ছা করিতেছিলনা। তাহার বুক নিরুদ্ধ ক্রন্দনের বেগে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল। পিতাই এখন তাহার একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র অবলম্বন; কিন্তু এই পিতাকে সে একেবারেই চেনেনা। মাতার নিকট পিতার বিষয় কোনো কথাই সে কোনোদিন শুনে নাই; শাশুড়ী ননদের কাছে যাহা শুনিয়াছে তাহাতে পিতার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা বা ভালবাসা কিছুই তাহার জন্মে নাই। পিতার মতিগতি ভাল নয়, ইহাই সে বারবার শুনিয়াছে। তিনি যে সুবর্ণকে কোন্ পথে চালাইতে চাহিবেন, তাহা কিছুই সে বুঝিলনা। কিন্তু যে পথেই চালান, তাহাকে চলিতে হইবে। আর তাহার গতি নাই, স্বামীর ঘরের দরজা চিরদিনের মত তাহার কাছে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

নৌকায় অনেকক্ষণ যাইতে হইল। জলপথ তাহার কাছে সুপরিচিত, চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে তাহার বেশী কিছু ইচ্ছা করিলনা। তাহা ছাড়া বিজয়নদের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া মনে আশঙ্কা বই অন্য কোনো ভাবের উদ্রেক হয়না। সুবর্ণর মন এমনই কাতর ছিল, সে আর কোনোদিকে না তাকাইয়া এক-কোণে একটা মাদুরের উপর গুটি-সুটি মারিয়া শুইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িল। প্রতুলচন্দ্র সারাটা পথ একাসনে বসিয়াই কাটাইয়া দিলেন। বিশ্বের ভাবনা তাঁহার মাথার ভিতর ভীড় করিয়া আসিতেছিল, ভাবিয়া তিনি শেষ করিতে পারিতেছিলেন।

অনেকখানি পথ আসিয়া তবে ট্রেন পাওয়া যায়। গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে বেলা দুপুর হইয়া গেল। কলিকাতা-গামী ট্রেন আসিতে তখনও ঘণ্টা-খানেক দেরি ছিল। প্রতুলচন্দ্র মেয়েকে নামাইয়া একটা গরুর গাড়ীতে বসাইলেন, জিনিষপত্র আর একখানা ছইবিহীন গাড়ীতে বোঝাই করা হইল। নৌকার ঘাট হইতে ষ্টেশন কিছু দূরে, জিনিষ-পত্র লইয়া হাঁটিয়া যাওয়া যায় না। জিনিষ তোলা শেষ হইলে পর সুবর্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খিদে পেয়েছে মাকি? তাহলে সামনের দোকানে খাওয়া-দাওয়া করে নেওয়া যায়।"

সুবর্ণ বলিল, "না বাবা, আমার একেবারে কিছু খেতে ইচ্ছা করছেনা।" সুতরাং গরুর গাড়ী একেবারে ষ্টেসনে গিয়া দাঁড়াইল।

সুবর্ণ ইতিপূর্ব্বে কোনোদিন ট্রেনে চড়ে নাই। ট্রেন চোখে দেখিবারও তাহার প্রয়োজন হয় নাই। জন্মিবার পর কয়েকটা বৎসর তাহার কাটিয়াছিল জামুরালে, বাকি কয়েকটা বৎসর মাতুলালয় ভাটগ্রামে। এক গ্রাম হইতে আর একটা গ্রাম নৌকাযোগেই যাইতে হয়, কাজেই ট্রেনের সহিত সুবর্ণর চাক্ষুষ পরিচয়ও এতদিন হয় নাই।

ছোট গ্রাম্য ষ্টেশন; যাত্রীর ভীড় খুব বেশী যে, তাহা নয়। লাল সুরকি-বিছান প্ল্যাটফর্ম, দুখানি মাত্র পাকা-ঘর, আর কয়েকটা টিনের শেড্। ইহাই সুবর্ণর চোখে কি আশ্চর্য্যই লাগিল! বাবা, লোক কত! ইহারা সব চলিয়াছে কোথায়? কি কোলাহল! ঐ পাগ্‌ড়ী-বাঁধা লোকটা কোন্ দেশের কে জানে? কি অদ্ভুত ভাবে কথা বলিতেছে, ইহাই কি হিন্দি ভাষা? সুবর্ণ হিন্দিও কোন দিন কাণে শোনে নাই। মেয়েমানুষটি উহার কে? বউ হইবে বোধ হয়। মেয়েমানুষ আবার সামনে কোঁচা দিয়া কাপড় পরে। এতক্ষণ পরে সুবর্ণর মুখে কৌতুকের হাসি দেখা দিল। প্রতুলচন্দ্র টিকিট কেনা, লগেজ করা, কলিকাতায় টেলিগ্রাম করা প্রভৃতি সব কাজ সারিয়া, মেয়ের কাছে আসিয়া বসিলেন। সুবর্ণ তখনও সেই হিন্দুস্থানী মেয়েটির দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে। পিতাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ বাবা, ওরা কোন্ দেশের মানুষ?"

প্রতুলচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "কেন, তোরা কি হিন্দুস্থানীও দেখিস্‌নি? আচ্ছা চল, কলকাতায় দুনিয়ার যত জাতের মানুষ আছে সবই সেখানে দেখ্‌তে পাবি।"

সুবর্ণর চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বালিকার মনের উপর এতকাল সমাজ যেন পাষাণ-ভার চাপাইয়া রাখিয়াছিল। হাসিতে পর্য্যন্ত সে ভুলিয়া গিয়াছিল। একদিন কি কারণে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠায় শাশুড়ীর হাতে যা লাঞ্ছনা হইয়াছিল, তাহা সে এখনও পর্য্যন্ত ভুলিতে পারে নাই। শাশুড়ী গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিলেন, "গেরস্ত ঘরের বৌ, অমন দাঁত বার করে হা হা করে হাসে? কেমন মায়ের মেয়ে গা তুমি? ভদ্দর ঘরের চালচলন কিছুই জাননা দেখি। অমন

দাঁত বার করা দেখলে এবার নোড়া দিয়ে দাঁত ভেঙে দেব।" সেই অবধি ভয়ে সুবর্ণ আর হাসে নাই। অবশ্য শাশুড়ী, ননদের কল্যাণে হাসির খোরাক যে নিত্যই তাহার জুটিত, এমন কিছু নয়।

অচেনা পথের যাত্রী হইয়া ভয়ে তাহার বুক কাঁপিতেছিল বটে। কিন্তু বুকের পাষাণভার অনেক খানিই যে হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে, তাহা সে অনুভব না করিয়া পারিতেছিলনা। বাবা গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ বটে, কিন্তু কথা বলিলে কথার জবাব দেন, হাসিতে দেখিলে নোড়ার ঘায়ে দাঁত ভাঙিয়া দিবার প্রস্তাব করেন না। কালে সঙ্গে থাকিতে থাকিতে ইঁহার সম্বন্ধে ভয় সঙ্কোচ সব দূর হইয়া যাওয়াই সম্ভব।

ট্রেন আসিয়া পড়িল। ইহাতেই যাইতে হইবে? বিপুলকায় লৌহদানবের দিকে চাহিয়া সুবর্ণর বুক ভয়ে বিস্ময়ে যেন স্তম্ভিত হইয়া আসিতে লাগিল। এমন জিনিষ জীবনে সে কখনও দেখে নাই। এমন তীব্র বেগে গাড়ী যাইতে পারে, তাহা সে কল্পনাও করে নাই।

প্রফুলচন্দ্র বেয়ারাকে নাড়া দিয়া বলিলেন "আরে, হাঁ করে দেখ্‌ছিস্ কি? শীগ্‌গির চল্, গাড়ী দাঁড়ায় ত মোটে তিন মিনিট!"

সুবর্ণ সচেতন হইয়া বাবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিল। সব গাড়ীগুলিই মানুষে ভরপুর, কোথায় তাহারা উঠিবে? মাত্র তিন মিনিট গাড়ী দাঁড়ায়? হায়, হায়, তাহাদের বুঝি আর যাওয়া হইল না।

প্রফুলচন্দ্র একটা গাড়ীর দরজা টানিয়া খুলিয়া বলিলেন "উঠে পড় শীগ্‌গির।" তিনি একরকম তাহাকে কোলে করিয়াই গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। কুলীরা হড়াহড়ি করিয়া বাক্স প্যাঁটরা যেমন তেমন ভাবে গাড়ীর ভিতর ঢুকাইয়া দিতে লাগিল। বিস্ময়ে আতঙ্কে সুবর্ণর বুকটা যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ওমা গো, কি হইবে! হতভাগা কুলীরা বাবাকেই যে উঠিতে দিতেছেনা! এই বুঝি গাড়ী ছাড়ে। সুবর্ণ একলা মেয়ে গাড়ীর মধ্যে, আর সব পুরুষ মানুষ! কি সর্ব্বনাশ! বাবা যদি না উঠিতে পারেন, তাহা হইলে সে ত একেবারে অকূলে ভাসিয়া যাইবে।

যাহা হউক, শেষ মুহূর্ত্তে একটা কুলীকে প্রায় ঠেলিয়া উল্টাইয়া ফেলিয়া প্রফুলচন্দ্র গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন। গাড়ীও সেইক্ষণেই ছাড়িয়া দিল। কুলী কয়টা পয়সার জন্য চিৎকার করিতে করিতে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া চলিল। তাহারা যাহা চাহিল, প্রফুলচন্দ্র দরদাম না করিয়া তাহাই দিয়া দিলেন। তাঁহার তখন এ সকল ছোট কথা লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় ছিলনা।

গাড়ীটায় ভীড় খুব বেশী ছিলনা। দুইখানা বেঞ্চি জুড়িয়া গিয়াছিল, তৃতীয়টিতে একজন বৃদ্ধ এতক্ষণ শুইয়াছিলেন। সুবর্ণকে ঢুকিতে দেখিয়া তিনি উঠিয়া বসিয়া নিজের কম্বল প্রভৃতি গুটাইয়া লইয়া তাহাকে বসিবার জায়গা করিয়া দিলেন। সুবর্ণ জড়সড় হইয়া বসিল বটে, কিন্তু প্রফুলচন্দ্র যতক্ষণ গাড়ীতে উঠিয়া তাহার পাশে না বসিলেন, ততক্ষণ সে পাথরের মূর্ত্তির মত নিঃস্পন্দ হইয়া রহিল।

প্রফুলচন্দ্র বসিয়া বলিলেন, "ওকি রে, অমন করে বসেছিস্ কেন? ঢের ত জায়গা রয়েছে, ভাল করে বোস্ না? এখনও রাত দশটা অবধি এই গাড়ীতেই যেতে হবে।"

সুবর্ণ একটু আরাম করিয়া বসিল। সহযাত্রী বৃদ্ধ প্রফুলচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মশায় কি কল্‌কাতা যাচ্ছেন?"

প্রফুলচন্দ্র বলিলেন, "হ্যাঁ।"

বৃদ্ধের বোধ হয় আরো কিছু কথাবার্ত্তা বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রফুলচন্দ্র স্বভাবতঃই স্বল্পভাষী, চেনা মানুষের সঙ্গেই তিনি সহজে কথা বলিতেন না; অপরিচিতের সঙ্গে একেবারেই বলিতেননা। বৃদ্ধের কথার উত্তর সংক্ষেপে এক কথায় চুকাইয়া দিয়া, সেই যে তিনি পাশ ফিরিয়া বসিয়া, জান্‌লা দিয়া বাহিরে চাহিয়া রহিলেন, আর ঘণ্টা দুইয়ের ভিতর নড়িলেননা। মাঝে কেবল একবার সুবর্ণকে বলিলেন, "কিদে পেলে আমায় বলিস্, সেই কোন্ সকালে দুটো ভাতে-ভাত মুখে গুঁজে বেরিয়েছিস্।"

কিন্তু খাইবার দরকার আর সুবর্ণর হইলই না। তাহার দুই চক্ষুর যা খোরাক জুটিতেছিল, তাহাতেই সুধাতৃষ্ণা তাহার মিটিয়া গিয়াছিল। সে একেবারে আকুল আগ্রহে জানলার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতেছিল। পৃথিবী বলিয়া একটা জিনিষের নাম সে কথায় কথায় শুনিত বটে, কিন্তু তাহার অর্থ বুঝিতনা। ছোট দুইখানি

গ্রাম, ভৈরব মূর্ত্তি বিজয় নদ, এই ছিল তাহার জগৎ। ইহার সীমানার বাহিরে এতবড় পৃথিবী পড়িয়া ছিল? তাহার এমন বিচিত্র রূপ? বিস্ময়ে বালিকার মন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আরো কত না জানি তাহার দেখিতে বাকি আছে।

এক-একটা ষ্টেসনে গাড়ী থামিতেছিল, আর সুবর্ণর বিস্ময় আরো যেন বাড়িয়া যাইতেছিল। বাবা রে, কতরকম লোক, কি ভীষণ গোলমাল। বুদ্ধি দিয়া পরিষ্কারভাবে না বুঝিলেও সে অনুভব করিতে লাগিল, এই বাহিরের পৃথিবীটা যেমন বড়, মানুষের জীবনও হয় ত তেমনি বড়। উহার মধ্যে খালি স্বামীর অবহেলা, শাশুড়ী ননদের অত্যাচার নাই, আরো কিছু থাকিতে পারে। সে যে কি, তাহা সুবর্ণ জানেনা; কিন্তু নিজের অজ্ঞাতেই তাহার অপরিণত মন সেই অদূর ভবিষ্যতের অচেনা জীবনকে বরণ করিয়া লইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল।

গাড়ীর অবিশ্রাম শব্দ আর দোলানিতে ক্রমে তাহার চোখের পাতা বুজিয়া আসিতে লাগিল। প্রতুলচন্দ্র তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ রে, ঘুম পেয়ে গেছে নাকি? শুবি একটু?"

সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক এতক্ষণে আর একটা কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া বলিলেন "হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুইয়ে দিন, ছেলেমানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ও-দিকের বেঞ্চে অনেকখানি জায়গা খালি হয়ে গিয়েছে, আমি উঠে গিয়ে বসছি।"

তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলেন। প্রতুলচন্দ্র খানিকটা সরিয়া বসিলেন; সুবর্ণ পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল এবং মিনিট দুইয়ের মধ্যেই গভীর ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িল।

কলিকাতা আসিয়া পড়িল। দূর হইতে তাহার উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা নৈশ আকাশকে রঙীন করিয়া যেন নিজের দৃপ্ত জয়ধ্বজা তুলিয়া ধরিয়াছে। প্রতুলচন্দ্র সুবর্ণকে ঠেলা দিয়া বলিলেন "এইবার ওঠ, হাওড়া এসে পড়ল বলে।"

সুবর্ণ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। ঘুম-জড়ান চোখে বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল। এত আলো, এত কোলাহল কিসের? কিছু যেন বুঝিতেই পারিলনা। পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল "এটা কি বাবা?"

প্রতুলচন্দ্র বলিলেন "এই ত কলকাতার ষ্টেসন। খুব বড় না?"

সুবর্ণ হাঁ করিয়াই রহিল। এ ধরণের বিরাট ব্যাপার সে কখন কল্পনাও করে নাই। দেখিয়াও যেন নিজের চোখকানকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলনা। এমন জায়গায় সে থাকিবে? গ্রামের কটা মানুষ এতবড় জায়গা দেখিয়াছে? সে যদি কখনও ফিরিয়া যায়, জানুয়ালের সকলকে গল্প করিয়া তাক্ লাগাইয়া দিতে পারিবে। গর্ব্বে তাহার ক্ষুদ্র বুক ভরিয়া উঠিল।

কিন্তু গাড়ী প্লাটফর্ম্মে আসিয়া থামিবামাত্র ভয়ে তাহার হাত-পা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এই ভীষণ জন-সমুদ্রের ভিতর তাহাকে নামিতে হইবে? কোথায় সে ভাসিয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই। কান যে তাহার বধির হইয়া আসিতেছে?

প্রতুলচন্দ্র মেয়ের মুখ দেখিয়া তাহার মনের অবস্থা বুঝিলেন; হাসিয়া বলিলেন, "ভয় নেই, ভয় নেই, জিনিষপত্রগুলো কুলীরা নাবিয়ে নিক্, তারপর তুই আমার সঙ্গে নামিস্ এখন। কিছু ভাবনা নেই।"

সুবর্ণ গুটিসুটি হইয়া বেঞ্চির কোণে বসিয়া রহিল। কুলীরা হুড়াহুড়ি করিয়া বাক্স বিছানা সব নামাইতে লাগিল। প্রতুলচন্দ্র বলিয়া দিলেন ট্যাক্সিতে লইয়া গিয়া উঠাইতে। পথ একটুখানি সুগম হইবামাত্র তিনি সুবর্ণর হাত ধরিয়া নামিয়া পড়িলেন।

সুবর্ণর আর পা চলেনা। সে বাপের হাত আঁকড়াইয়া ধরিয়া একেবারে ঝুলিয়া পড়িল। প্রতুলচন্দ্র বলিলেন "অত ভয় পেলে চলবে কেন? কলকাতা দেখেই এই? এরপর যে তোকে বিলেত শুদ্ধ যেতে হবে?"

সুবর্ণ কথা বলিলনা। বিলাত যে কি বস্তু, তাহা বিশেষ সে জানিতনা। বিলাতে সাহেব মেমরা থাকে, এই পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞান। বিলাত যখন যাইবার যাইবে, সম্প্রতি কলিকাতার ঠেলা সাম্‌লাইতে তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছিল।

কোনো রকমে টানিয়া ঠেলিয়া প্রতুলচন্দ্র মেয়েকে ট্যাক্সিতে আনিয়া বসাইলেন। সুবর্ণকে বলিলেন "এই দেখ, এরই নাম মোটর গাড়ী, কত জোরে যায় দেখিস্ এখন।"

সুবর্ণকে কিছু দেখিতে বলিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিলনা। এত দেখিবার খোরাক তাহার চোখের সারা-জীবনে জোটে নাই। মেসের সামনে আসিয়া গাড়ী যখন দাঁড়াইল, তখনও সুবর্ণ গাড়ী হইতে নামিতে চায়না।

মেসের বাড়ীখানা তিনতলা। একতলা দুইতলায় মেস, তিনতলায় মাত্র দুখানি ঘর; আলাদা ভাড়াটে কখনও বা থাকিত, কখনও থাকিতনা। রান্নাঘর উপরে ছিলনা, মেসের রান্নাঘরের পাশে ছোট একটা রান্নাঘর তালা বন্ধ থাকিত, তিনতলায় ভাড়াটে আসিলে খুলিয়া দেওয়া হইত। এই অসুবিধার জন্য বড় কেহ তিনতলায় আসিতনা। পরিবার লইয়া এখানে থাকার বিশেষ সুবিধা ছিল না। জলও পাওয়া যাইতনা, নীচের তলার কল হইতে তুলিতে হইত।

প্রতুলচন্দ্র এই ঘর দুইখানির জন্য মেসে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। সুবর্ণকে লইয়া মেসের ঠিক মধ্যে থাকা চলেনা, কিন্তু একেবারে আলাদা বাড়ী করিয়া ঝি চাকর রাখিয়া হাঙ্গাম করিবার তাঁহার ইচ্ছা সম্প্রতি ছিলনা। এই ঘর দুইখানিই ঠিক হইবে। মেস হইতে দূরত্ব রক্ষা করাও হইবে, আবার খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতিও একসঙ্গে হইতে পারিবে।

মেসের লোকেরা তাঁহার টেলিগ্রাম পাইয়া বাড়ী-ওয়ালাকে বলিয়া ঘর ঠিকঠাক করিয়া রাখিয়াছিল। প্রতুলচন্দ্র সুবর্ণকে লইয়া উপরে উঠিয়া দেখিলেন, একটা ঘরে তাঁহার খাট, টেব্‌ল্ চেয়ার, বইয়ের আল্‌মারী, বাক্স প্রভৃতি সব আনিয়া সাজান হইয়াছে। আর একখানা ঘরও খালি নাই। ছোট একটা তক্তাপোষ এবং কাপড় চোপড় রাখিবার আল্‌না, সে ঘরে বিরাজ করিতেছে। দুইটাই নূতন। মেসের বাবুরা অনেকেই ঘুমাইয়া পড়িয়া-ছিলেন, দুই চারিজন থিয়েটার বায়োস্কোপ্ দেখিতেও বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। ম্যানেজার হিমাংশুবাবু এবং চাকর বামুনের ধাওাই প্রতুলচন্দ্রের অভ্যর্থনা সম্পন্ন হইল। হিমাংশুবাবু বলিলেন "তক্তপোষ আর আল্‌নাটা আমিই কিনেছি, যদিও আপনি লেখেননি। নইলে খুকীর শুতে অসুবিধা হত।"

সুবর্ণ চমকিয়া উঠিল! খুকী আবার কে? সেই নাকি? সে যে বালিকা, তাহা সে বহুকাল ভুলিয়া গিয়াছিল।

প্রতুলচন্দ্র হিমাংশুবাবুকে বলিলেন "বেশ করেছেন, আমার অর্দ্ধেক কথা মনেই থাকেনা। তা আপনি আর রাত করবেননা, শুয়ে পড়ুন গিয়ে। ঠাকুর আমাদের খাবার দিয়ে যাবে এখন।"

হিমাংশুবাবু নীচে চলিয়া গেলেন। চাকর বিছানা খুলিয়া দুই ঘরে পরিপাটি করিয়া পাতিয়া দিল। চাকর বামুনে মিলিয়া খাবার উপরে লইয়া আসিয়া জায়গা করিল, জল গড়াইয়া দিল, আরো কিছু চাই কিনা জানিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিল।

আদর-যত্ন বহুকাল সুবর্ণর অনভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। মনটা তাহার আনন্দ ও সঙ্কোচে ভরিয়া উঠিল। ভাবিল ভবিষ্যৎ জীবনটা এমনই সুন্দর কি হইবে? কে জানে?

(ক্রমশঃ)

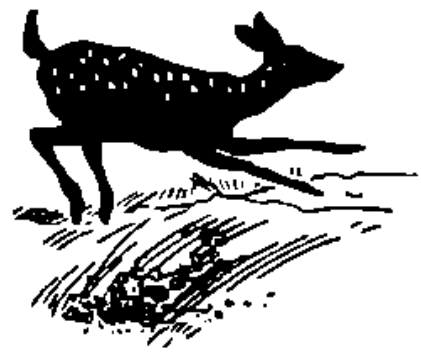

মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এম-আর-এ-এস

(৩)

প্রথম-শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে পঠিত হইবার জন্য তাঁহার প্রসিদ্ধ "প্রথম-শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস" প্রকাশিত করেন। কিন্তু এই বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তিকার মধ্যে তিনি এত নূতন তথ্যের সমাবেশ করিয়াছিলেন এবং এরূপ ঐতিহাসিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছিলেন যে, তাহাতেই তাঁহার যশঃ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লিখিয়াছিলেন :

His little work on the History of Bengal throws a flood of light upon an unexplored region of historical research. It is a little unpretentious work which more ambitious authors would hesitate to call a book, but in point of research and learning, it stands unsurpassed among the modern works on the History of Bengal.

"তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি ঐতিহাসিক-গবেষণার তমসাবৃত প্রদেশের উপর অজস্র আলোকপাত করিয়াছে। উহা একটি ক্ষুদ্র অপ্রতিষ্ঠাকামী পুস্তক, যাহা হয় ত যশোলিপ্সু গ্রন্থকারগণ একটি গ্রন্থ বলিতেই ইতস্ততঃ করিবেন; কিন্তু পাণ্ডিত্য ও মৌলিক গবেষণার জন্য বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান গ্রন্থগুলির মধ্যে উহা অতুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী।"

এই ইতিহাসখানি সঙ্কলন করিবার জন্য তিনি অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন; কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উহা রচিত হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তৃতীয় বর্ষের 'প্রচারে' লিখিয়াছিলেন: "তিনি ভারতীয় ইতিহাসে এতদূর পণ্ডিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার গভীর-গবেষণা-পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাসখানি লিখিতে সাত দিন মাত্র সময় লাগিয়াছিল।" বঙ্কিমচন্দ্র যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধে এই গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধে' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না;—

"এক্ষণে বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধার কি সম্ভব? নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু সে কার্য্যে ক্ষমবান্ বাঙ্গালি অতি অল্প। কি বাঙ্গালি, কি ইংরেজ, সকলের অপেক্ষা যিনি এ দুরূহ কার্য্যের যোগ্য, তিনি ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন না। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন; কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম স্বীকার করিবেন, আমরা এত ভরসা করিতে পারি না। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা অন্ততঃ এমন একখানি ইতিহাসের প্রত্যাশা করিতে পারি, যে তদ্দ্বারায় আমাদের মনোদুঃখ অনেক নিবৃত্তি পাইবে। রাজকৃষ্ণ বাবুও একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের দুঃখ মিটিল না। রাজকৃষ্ণবাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন; তাহা না লিখিয়া তিনি বালক-শিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য, এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় দিয়াছে।

"মুষ্টিভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি। গ্রন্থখানি মোটে ৯০ পৃষ্ঠা, কিন্তু ইদৃশ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস বোধ হয় আর নাই। অল্পের মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তত বাঙ্গালা ভাষায় দুর্লভ। সেই সকল কথার মধ্যে অনেকগুলি নূতন; এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য। ইহা কেবল রাজাগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকা মাত্র নহে; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস। বালক-শিক্ষার্থ যে সকল পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় নিত্য নিত্য প্রণীত হইতেছে, তন্মধ্যে ইহার ন্যায় উত্তম গ্রন্থ অল্প। ইংরেজিতেও যে সকল ক্ষুদ্র

ইতিহাস বালক-শিক্ষার্থ প্রণীত হয়, তন্মধ্যে এরূপ ইতিহাস দেখা যায় না। কেবল বালক নহে, অনেক বৃদ্ধ ইহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারেন।"

এই গ্রন্থখানি বহু বৎসর বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত ছিল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে উহার চতুঃপঞ্চাশৎ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৫৭টী সংস্করণ আমরা দেখিয়াছি। তাহার পর আর হইয়াছে কি না অবগত নহি।

পাইকপাড়ার রাজকুমারের শিক্ষক

বেলগাছিয়া থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, দেশের সকল সদনুষ্ঠানে অগ্রণী রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিন-চারি বৎসর বয়স্ক একটি পুত্র রাখিয়া অকালে পরলোক গমন করেন। গবর্ণমেণ্ট এই পুত্রের (পরে রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ) শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। মেজর আর ডি অসবোর্ণ নামক একজন য়ুরোপীয় ইঁহার শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইনি অবসর গ্রহণ করিলে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে রাজকৃষ্ণ চারি শত টাকা মাসিক বেতনে উক্ত পদে নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞান-সভা

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার বহুবিশ্রুত বিজ্ঞান-সভার প্রতিষ্ঠা করেন। রাজকৃষ্ণ ও তাঁহার অগ্রজ রাধিকাপ্রসন্ন এই প্রতিষ্ঠানে যথোচিত অর্থসাহায্য করেন। রাজকৃষ্ণ প্রথম হইতে উক্ত সভার কার্য্য-নির্ব্বাহিকা সমিতির অন্যতম উৎসাহশীল সদস্য ছিলেন।

কবিতামালা

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ১০ই এপ্রিল তাঁহার "কবিতামালা" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে যে সকল কবিতা সন্নিবিষ্ট আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই 'এডুকেশন গেজেট' 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজকৃষ্ণের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "যৌবনোদ্যান" যত খণ্ড ছাপা হইয়াছিল তাহা বহুদিন পূর্ব্বে নিঃশেষিত হইয়াছিল, এজন্য উহাও এই নব-প্রকাশিত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়।

রাজকৃষ্ণের অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের এই কবিতা-গুলিতে বিলক্ষণ কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তখন বাঙ্গালার কাব্যরাজ্যে হেমচন্দ্র একচ্ছত্র অধিপতি, সুতরাং তাঁহার প্রভাব তৎকালীন অনেক কবির কাব্যেই লক্ষিত হয়,—রাজকৃষ্ণের অনেকগুলি কবিতাতেও পরিদৃষ্ট হয়। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন "এই সকল কবিতা দুষ্ট প্রণয় বা হতাশ প্রণয়ের বিকাশ নয়।' ইহার বিষয় সকল অতি উদার—মহান্। তাঁহার 'সৃষ্টি' নাম্নী কবিতা যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারেন।" বাস্তবিক আমরা 'সৃষ্টি'র ন্যায় কবিতা বঙ্গ-সাহিত্যে অতি অল্পই পাঠ করিয়াছি। উহাতে একাধারে কাব্য, দর্শন ও বিজ্ঞান। এই দীর্ঘ কবিতাটী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই, কিন্তু উহার অন্ততঃ কিয়দংশ না পাঠ করিলে কেবল প্রশংসাবাক্য দ্বারা উহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে ;—

"ধূ ধূ ধূ করিত অনন্ত আকাশ,
নাহি ছিল তাহে রবির প্রকাশ,
নাহি ছিল শশী, নাহি ছিল তারা,
নাহিক ছুটিত আলোকের ধারা,
পুলকে প্রকাশি রূপের রাশি।
না হাসিত দিবা কিম্বা বিভাবরী,
না খেলিত সন্ধ্যা-লাবণ্য-লহরী,
না আসিত উষা অদিতিনন্দিনী,
মুকুতা-জড়িত কুসুম-মালিনী,
প্রফুল্ল বদনে মধুর হাসি॥

* * * *

দশদিক্ ব্যাপি আছিল তিমির,
অনাদি অনন্ত গাঢ় সুগম্ভীর,
অকূল অতল অলঙ্ঘ্য অপার,
আকৃতিবিহীন ভীম পারাবার,
ভাবিলে হৃদয়ে উপজে ভয়।
এজাত অজের জগত কারণ
সে তিমির মাঝে নিদ্রিত মতন
আছিলা অনন্ত আকাশে বিলীন,
অতরঙ্গ-কাল-সলিলে আসীন,
অনন্ত শয়নে শকতিময়॥

* * *

আন্তরিক বলে ভাব-সংঘর্ষণে
বাহিরিল তেজ অচিন্ত্য কারণে ;
আলোক ছুটিল ঝলকে ঝলকে,
নব নব বেশে পলকে পলকে,
তিমিরের ঘটা হাসিতে নাশি ;
পাতল পাতল জলধর তুল,
হাসিল সহস্র পরমাণু কুল,
অনন্ত আকাশে গাঁথা থরে থরে,
বিবিধ বরণ শোভা কলেবরে,
বরষি নূতন সৌন্দর্য্য রাশি।

• • • •

রঙ্গের তরঙ্গে, স্তবকে স্তবকে,
নাচিতে নাচিতে বিচিত্র ঠমকে,
সে জলদতুল পরমাণু কুল,
ঘুরে অবিরত আবর্ত্ত সঙ্কুল,
অখণ্ড গগনে মণ্ডলাকারে ;
আত্মাশক্তি বলে ঘুরিতে ঘুরিতে
একে একে এক স্তবক হইতে
কত অণু রাশি ছুটিয়া পড়িল,
মাঝে তমোময় সবিতা রহিল,
অন্ধ তৃণগণ বেড়িয়া তারে।

• • • •

অবনী মণ্ডল ঘুরে অবিরল
জলধে বেষ্টিত গোলক তরল,
যেন কুজ্ঝটিকা আবৃত ধরণি,
নাহি কূল স্থল নাহিক অবধি,
নিয়ত প্রবল পবনাহত ;
এ মহী ক্রমশঃ তাপ বিকিরণে
তরলতা ঢাকে কঠিনাচরণে ;
কুজ্ঝটিকাসম জলধরদল
জলে পরিণত হইয়া শীতল,
জনমিল সিন্ধু সলিল-গত।

• • • •

সাগর গভীর অভ্যন্তর স্থিত
উত্তাপ উগরি ক্রমে সঙ্কুচিত ;
সঙ্কুচিত তাহে ধরার শরীর,
কোথা উঠে কুটে গিরি অভ্রশির,
কোথায় জাগিয়া উঠয়ে স্থল ;
পর্ব্বত শিখরে জলদ বরষে,
তরঙ্গিণী পড়ে ছুটিয়া হরষে,
বঙ্কিম তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে
চলে নিম্ন পথ করিতে করিতে,
পাইতে অন্তিমে অনন্ত জল।

• • • •

দ্বীপ মহাদ্বীপ পর্ব্বত জাগিল ;
জল হৈতে স্থল পৃথক্ হইল ;
জীব-লীলা-ভূমি উদ্ভিদ্ আবাস,
নবসৃষ্ট ক্ষেত্রে পাইল প্রকাশ ;
অভিনব কাণ্ড দেখ আবার।
আত্মাশক্তি বলে সবিতা হইতে
তেজ নিরন্তর ছুটিতে ছুটিতে
পড়িয়া জীবন-বিহীন ধরাতে
সজীবন বীজ রচিল তাহাতে,
পরমাণু পুঞ্জে প্রাণ সঞ্চার।

• • • •

অংশুরূপ ধরি জগতকারণ
জড় অণুপুঞ্জে হইলা জীবন ;
তেজের প্রভাবে সে বীজ হইতে
অঙ্কুর সুন্দর বাহিরে ত্বরিতে,
জীব কি উদ্ভিদ্ না হয় স্থির।
পরিণামে তাহে দ্বিবীজ জন্মিল,
এক হৈতে জীব উৎপন্ন হইল,
অপর হইতে উদ্ভিদ্ শোভন ;
ভাতিল ধরায় নূতন ভূষণ,
উথলি উঠিল সুখের নীর।

• • • •

'কবিতামালা'র সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচিত একটি কবিতাও আছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমাদের প্রথম সাধারণ নাট্যশালা—"ন্যাশন্যাল থিয়েটার" প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাতে ৺কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "ভারতমাতা" নামক একটি একাঙ্ক নাট্যলীলা অভিনীত

হইত। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের দ্বারা স্বদেশ-প্রেমের উদ্দীপনের ইহাই বোধ হয় প্রথম প্রচেষ্টা। প্রপীড়িতা ভারতমাতা যেখানে মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় ভগবানকে এবং তাঁহার পরলোকগত সুসন্তান—"হিন্দু পেট্রিয়ট" সম্পাদক স্বদেশ-বৎসল হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও বেঙ্গলীর প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক দেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও বিখ্যাত বাগ্মী রামগোপাল ঘোষকে সাশ্রুনয়নে ডাকিতে ডাকিতে মূর্চ্ছা গেলেন, সে দৃশ্য দর্শকদিগের হৃদয়ে কি অনির্ব্বচনীয় ভাবের তরঙ্গ তুলিত, তাহার আভাস আমরা কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট শুনিয়াছি। রাজকৃষ্ণও এই অভিনয় দর্শনান্তে 'ভারতমাতা' নামক কবিতায় তাঁহার মনোভাব অতি সুন্দর ভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা

যখন "কথাসরিৎসাগর" "মালবিকাগ্নিমিত্র" প্রভৃতির ইংরাজি অনুবাদক সুপণ্ডিত চার্লস এইচ টনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষপদে সমাসীন, তখন উক্ত বিদ্যালয়ে একটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্ট হয় এবং রাজকৃষ্ণ উক্ত পদে নিযুক্ত হন। তাঁহাকে ইংরাজী, ইতিহাস ও দর্শন সকল বিষয়েই অধ্যাপনা করিতে হইত। সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ রাজকৃষ্ণ অতি সন্তোষজনক ভাবেই তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট হইতে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত তিনি দর্শন ও ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। 'প্রেসিডেন্সী কলেজ রেজিষ্টারে' কিন্তু তাঁহাকে ১৮৭৬ হইতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজীর অধ্যাপক বলিয়া লেখান হইয়াছে। শেষোক্ত তারিখগুলি বোধ হয় ঠিক নহে।

গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা অনুবাদক

গবর্ণমেণ্টের অনুবাদের কার্য্য এতকাল রবিন্সন নামক একজন য়ুরোপীয়র দ্বারাই সম্পাদিত হইত। কিন্তু গোপাল উড়ের 'যাত্রা' যখন Flying Journey of cowherdএ রূপান্তরিত হইত, তখন উহা সাধারণের হাস্য-রসই উদ্রিক্ত করিত। বিদেশীয়ের দ্বারা বাঙ্গালা হইতে ইংরাজী অনুবাদের কার্য্য যে যথোচিত ভাবে সম্পাদিত হইতেছেনা, কিছুদিন হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছিল। স্যার আশ্‌লি ইডেন রবিন্সনের মৃত্যুর পর তাঁহার স্থানে একজন এতদ্দেশবাসী সুপণ্ডিত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ মিষ্টার চার্লস টনি এবং শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ স্যার আলফ্রেড ক্রফ্‌ট্-এর সুপারিসে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি হইতে রাজকৃষ্ণ বাঙ্গালা অনুবাদকের পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁহার বেতন মাসিক ছয়-শত টাকা হইতে সাত শত টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। 'বেঙ্গলী'-সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"It was impossible to have selected a more scholarly man; and the ability and conspicuous devotion with which Rajkrishna applied himself to his new duties fully justified his selection. It was the first time that a native of India, and a native of India of the new school, had been appointed an Oriental Translator, and Rajkrishna has completely vindicated the claims of his countrymen to this office. We know from personal knowledge that he worked hard and that he prolonged his labours far into the small hours of the morning. But in the midst of his arduous official duties, his zeal for his favourite studies continued, and Rajkrishna Mukerjee will be remembered not as the Oriental Translator to Govt. but as the antiquarian, the poet and the linguist."

"তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর বিদ্বান ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করা অসম্ভব ছিল; এবং যে নিপুণতা এবং অনন্যসাধারণ কর্ত্তব্যপরায়ণতার সহিত তিনি তাঁহার নূতন কর্ম্মগুলি সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে যোগ্যলোকই নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সেই প্রথম একজন ভারতবাসী—নূতন যুগের ভারতবাসী, প্রাচ্য অনুবাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার দেশবাসী যে উক্ত পদের সম্পূর্ণ যোগ্য তাহা রাজকৃষ্ণ প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে, তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিতেন, এমন কি শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত কায করিতেন। কিন্তু রাজকার্য্যের এই গুরু ভারেও

তাঁহার প্রিয় বিষয়সমূহের আলোচনায় উৎসাহ একটুও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই; এবং রাজকৃষ্ণ গবর্ণমেণ্টের প্রাচ্য অনুবাদক বলিয়া নহে, পরন্তু কবি এবং বহুভাষাবিৎ বলিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।"

বাস্তবিক এই পদে নিযুক্ত থাকার সময় রাজকৃষ্ণকে অসামান্য পরিশ্রম করিতে হইত। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ এবং রেণ্ট বিল এবং ইলবার্ট বিলের আলোচনার সময় তাঁহাকে অহোরাত্র পরিশ্রম করিতে হইত। তৎকালে অনুবাদকের পদ এতদ্দেশবাসীর পক্ষে অতি

স্যর রিভার্স টমসন্

লোভনীয় উচ্চ পদ বলিয়া গণ্য হইলেও রাজকৃষ্ণের প্রতিভার উহাই কি চরম পুরস্কার বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে? 'ইণ্ডিয়ান নেশন'-এর সুধী সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এতৎসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই:

"রাজকৃষ্ণবাবুর জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে মর্ম্মান্তিক দুঃখ হয়। দুঃখ আরও এই জন্য যে, ভবিষ্যতেও তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী ও মনস্বিগণকেও ঐরূপ অদৃষ্টের বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে। এ জীবনে কৃতকার্য্যতা আছে, কিন্তু পুরস্কার নাই। এত বিদ্যা, এত প্রতিভা আফিসে তৃতীয়শ্রেণীর গাধার খাটুনীর নীচে চাপা পড়িল। যে ভাবে এরূপ বহুমূল্য জীবন নষ্ট হইতেছে তাহা কি সাধারণ, কি গবর্ণমেণ্ট কাহারও গৌরবের পরিচায়ক নহে। অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের এরূপ অলঙ্কার ফেলোশিপ পাইতেন, সাহিত্যসেবায় সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিতে পারিতেন। এখানে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে শিক্ষা-বিভাগে লইলেন বটে, কিন্তু যিনি প্রথম শ্রেণীর অক্সফোর্ড গ্রাজুয়েটের সমকক্ষ, অক্সফোর্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রাজুয়েট-দিগের অপেক্ষা নিম্নতর পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইল।

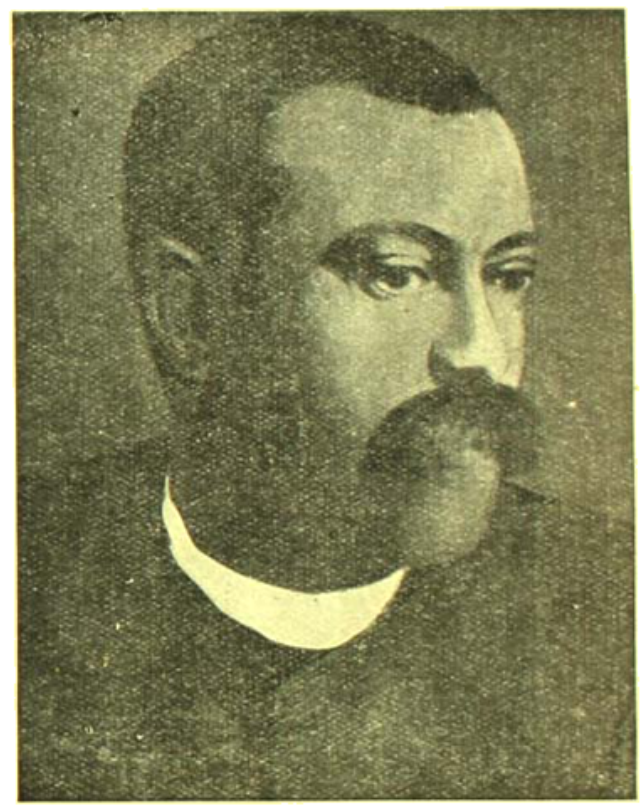

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজকৃষ্ণ 'দর্শন'শাস্ত্রে অসামান্য পারদর্শিতা দেখাইলেন; তাঁহাকে পড়াইতে দেওয়া হইল কখনও ইতিহাস, কখনও বা ইংরাজী সাহিত্য। আশ্চর্য্য আমাদের এই শিক্ষা-বিভাগটী! এখানে যে কেহ যে কোন বিষয়ে অধ্যাপনার যোগ্য বিবেচিত হন। শিক্ষা-বিভাগে বেতন অল্প, রাজকৃষ্ণ ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। ইহাতে সাফল্যলাভ করিতে গেলে কেবল গুণ ও বিদ্যা থাকিলেই হয় না, কতকগুলি দোষও থাকা চাই—যাহা

তাঁহার ছিল না। তাঁহাকে ব্যবসায় ছাড়িয়া সংবাদপত্র-সেবী হইতে হইল। কিন্তু ইহাতেও অর্থ নাই। রীতিমত সাহিত্যসেবা আরম্ভ করিলেন, উহারও ফল ঐরূপ। আবার গবর্ণমেণ্টের চাকুরী লইতে হইল। টনি ও ক্রুটের সুপারিসে, তাঁহার নিজের গুণের জন্য নয়, গবর্ণমেণ্ট একটি পদ দিলেন, মন্দ নহে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতিভার কি সম্মান দিলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোও করিলেন না। এ সকল চিন্তা করিলে কি দুঃখ হয় না?"

পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন-সমিতির সদস্য

নগেন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহা অনেকাংশে সত্য। এদেশে যথার্থ গুণের পুরস্কার নাই! ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়

২৪শে ফেব্রুয়ারি স্যর এলফ্রেড ক্রফ্‌ট রাজকৃষ্ণ ও চন্দ্রনাথ বাবুকে পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচন-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহাদের প্রতিভার কথঞ্চিৎ মান রাখিয়াছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রাজকৃষ্ণ এই সমিতির অন্যতম উৎসাহশীল সভ্য ছিলেন।

'মেঘদূত'

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর রাজকৃষ্ণ বাঙ্গালা পদ্যে 'মেঘদূতে'র একটি সুললিত অনুবাদ প্রকাশিত করেন। উহাতে কালিদাসের প্রত্যেক শ্লোক ছয় ছত্রে অনুবাদিত হইয়াছে। যথা,—

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিত-হরিণী-প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রাস্তনাভ্যাং
যা তত্রস্যাৎ যুবতি বিষয়ে সৃষ্টি রাদ্যেব ধাতুঃ॥

কৃশাঙ্গী যৌবনযুতা, সুপ্রান্তদশনা,
ক্ষীণমধ্যা, নিম্ননাভি, পক্কবিম্বাধরা,
চকিত হরিণীতুল্য ললিত-লোচনা,
স্তনভরে কিছু অবনত-কলেবরা

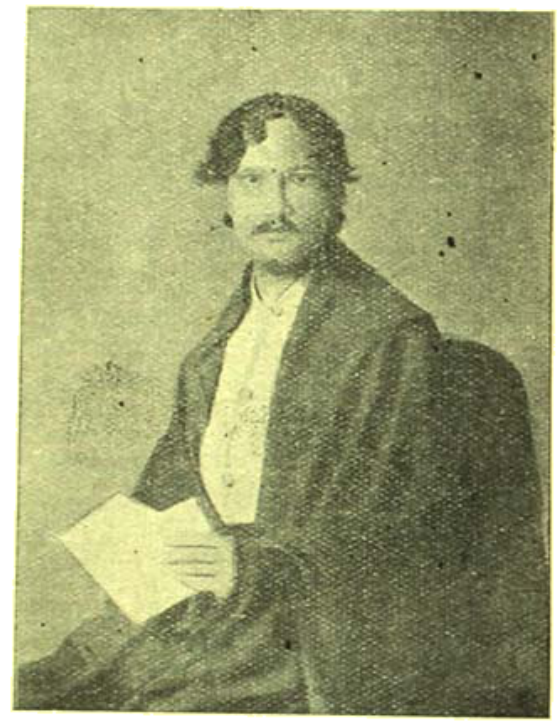

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শ্রোণীভারে মন্দগতি তথা যে বিরাজে
বিধাতার আদ্য সৃষ্টি যুবতী-সমাজে॥

রাজকৃষ্ণের পূর্ব্বে ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতী প্রভৃতি 'মেঘদূতে'র বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজকৃষ্ণের অনুবাদটি একটু বিভিন্ন প্রণালীতে সম্পাদিত। "মেঘদূতে"র ভূমিকার প্রারম্ভে রাজকৃষ্ণ লিখিয়াছেন :—

"আমি যখন বাঙ্গালা পদ্যে মেঘদূতের অনুবাদ

লিখিতে আরম্ভ করি, তখন বঙ্গভাষায় ইহার যে অন্য কোন পদ্যানুবাদ আছে, তাহা জানিতাম না। পূর্ব্ব-মেঘের প্রায় অর্দ্ধেক লেখা হইলে, জানিতে পাইলাম যে শ্রীযুত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতী এবং আরও কেহ কেহ বাঙ্গালা ছন্দোবন্ধে মেঘদূতের অনুবাদ প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু দেখিলাম যে, তাঁহারা যে প্রণালীতে অনুবাদ করিয়াছেন আমার অনুবাদ সে প্রণালীর হইতেছে না। উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থের যত স্বতন্ত্র অনুবাদ বঙ্গভাষায় থাকে, মূল বুঝিবার পক্ষে তত সুবিধা হইবে, বিবেচনা করিয়া আমার অনুবাদও শেষ করিলাম। অনুবাদকালে শ্রীযুত বাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুত পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও তারাকুমার কবিরত্ন প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুর নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়

"পণ্ডিতবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঠাদিবিবেক ও মল্লিনাথের টীকা সহিত মেঘদূতের যে সংস্করণ প্রচার করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া, এই অনুবাদ পুস্তক লিখিত হইল। কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া যাহা ত্যাগ করিয়াছেন, এরূপ দুইটী শ্লোক উত্তর-মেঘের দ্বিতীয় শ্লোকের পর রাখিয়া দিয়াছি। শ্লোক দুইটী অনেকে মেঘদূত হইতে [illegible] করেন বলিয়া রাখিলাম।"

সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একটী দীর্ঘ প্রবন্ধে 'মেঘদূতে'র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন :

"কালিদাস কবি, মেঘদূত কাব্য, রাজকৃষ্ণবাবু অনুবাদক, এ তিনের কিছুতেই তাঁহার কোন বক্তব্য থাকা সম্ভব নহে। কালিদাসের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই; মেঘদূতের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন; রাজকৃষ্ণবাবু গবর্ণমেণ্টের বঙ্গানুবাদক, সুতরাং তাঁহারও পরিচয় দিবার প্রয়োজনাভাব। মূলের ভাব রাখিয়া সংস্কৃতের প্রতি বাক্যের সম্পূর্ণ অনুবাদ করণে রাজকৃষ্ণবাবুর ন্যায় দক্ষ ব্যক্তি বাঙ্গালায় অতি দুর্লভ। রাজকৃষ্ণবাবু নিজে কবি এবং কালিদাসের সম্পূর্ণ মর্ম্মগ্রাহী। আমরা তাঁহার অনুবাদ আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি। যদি কেহ সংস্কৃত পাঠের পরিশ্রম স্বীকার না করিয়া মেঘদূত পাঠের ফললাভ করিতে চান, তাঁহার পক্ষে রাজকৃষ্ণবাবুর গ্রন্থ অত্যন্ত উপযোগী হইবে। বাঙ্গালায় মেঘদূতের আর দুই একখানি অনুবাদ আছে,

জগদীশনাথ রায়

তদপেক্ষা মূলের সহিত ঐক্য রাখা সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণবাবুর অনুবাদ যে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট তাহা বলা অনাবশ্যক।"

"সোমপ্রকাশ"-সম্পাদক পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছিলেন :—

"শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাকবি কালিদাস-বিরচিত সংস্কৃত মেঘদূতের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন। প্রথমে অনুবাদ, তাহার নীচে সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথমে একটী ভূমিকাও লিখিত হইয়াছে। অনুবাদের বিশেষ প্রশংসা করা বিফল। কিন্তু রাজকৃষ্ণবাবু এই অনুবাদে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাতে ইঁহার বিশেষ প্রশংসা করা আবশ্যক। অনুবাদিত

পদগুলি সংস্কৃতের ঠিক অনুরূপ এবং রচনাও প্রাঞ্জল হইয়াছে। অধিকাংশ অনুবাদক মূল অবলম্বন করিয়া ইচ্ছামত অনুবাদ করিয়া থাকেন। তাহাতে মূলের কোন কোন স্থলে কিছু কিছু পরিত্যক্ত, কোন কোন স্থলে বা কিছু কিছু পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কিন্তু রাজকৃষ্ণবাবু সেরূপ করেন নাই, ইনি মূলের অনুগত হইয়া অনুবাদ করিয়াছেন। মেঘদূত যেমন একবিধ ছন্দে বিরচিত, অনুবাদও সেইরূপ একবিধ ছন্দে করা হইয়াছে।"

কৃষ্ণদাস পাল সম্পাদিত হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রেও এই গ্রন্থের প্রশংসাসূচক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। কালিদাস ও তাঁহার অপূর্ব্ব কাব্য মেঘদূতের পরিচয় দিয়া সমালোচক লিখিয়াছিলেন :—

"The growing literature of Bengal demanded a translation of this wonderful poem for

প্রেসিডেন্সী কলেজ

the sake of its reputation, for its enrichment, and, above all, for its guidance. And Babu Rajkrishna Mukerji has furnished us with a noble translation. A man of thoroughly scholarly instincts Babu Rajkrishna Mukerji has nowhere forgotten the reverence that was due to the great Poet. His translation is accordingly as faithful as possible from the beginning to the end, and reflects in a remarkable degree the majestic and dignified tune of the original. The translation of the second part of the poem is particularly beautiful. We think it will move the reader's mind as deeply as the great original itself. Considering the difficulty of translating a thing of perfection like the *Meghaduta* into a language which is yet so undeveloped as the Bengali, we are bound to say that Babu Rajkrisna Mukerji has performed his work with a tact and skill which do him immense credit. That he has been able to produce a work of such a difficult and delicate nature in the midst of his very arduous and undoubtedly prosaic duties as the Government Translator, speaks greatly in his favour and for the cause of Bengali literature."

"বাঙ্গলার ক্রমবর্দ্ধমান সাহিত্যের সম্মান, সমৃদ্ধি ও আদর্শের জন্য এই অপূর্ব্ব কাব্যের অনুবাদের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উহার একটি

রমানাথ লাহা

অনুবাদ বাণীচরণে উপহার দিয়াছেন। প্রকৃত পণ্ডিতজনোচিত প্রতিভার অধিকারী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মহাকবির প্রাপ্য সম্মান দিতে কোথাও বিরত হন নাই। সুতরাং তাঁহার অনুবাদ আদ্যোপান্ত যতদূর সম্ভব মূলানুসারিণী, এবং মূলের উদাত্ত স্বর ও রাজগাম্ভীর্য্য উহাতে আশ্চর্য্যভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। কাব্যের উত্তর খণ্ডের অনুবাদের সৌন্দর্য্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের মনে হয় উহা পাঠ করিলে মূল কাব্য পাঠের ন্যায় পাঠকের মনকে উদ্বেলিত করিবে। বাঙ্গালা ভাষা এখনও সম্পূর্ণ-

ভাবে বিকশিত হয় নাই ; সুতরাং মেঘদূতের ন্যায় অনবদ্য কাব্য অনুবাদ কিরূপ দুরূহ তাহা স্মরণ করিলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার গ্রন্থখানিতে অতি প্রশংসনীয় শক্তি ও লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের অনুবাদকের কঠোর ও নীরস কার্য্যের উপর তিনি যে এরূপ শ্রমসাধ্য ও কমনীয় কাব্য রচনা করিয়াছেন ইহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।"

এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২রা মে রাজকৃষ্ণ এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এই সভার সদস্য

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হইবার বহু পূর্ব্বেই তিনি নানা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তিনি মৌলিক গবেষণার জন্য সংস্কৃত, উড়িয়া, হিন্দী, উর্দ্দু, পারসী প্রভৃতি বহু ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবগণের সিদ্ধান্ত-সমূহ পরীক্ষা ও আলোচনা করিবার জন্য তিনি ফরাসী, জার্ম্মাণ এবং ল্যাটিন ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। এসিয়াটিক সভার সদস্যপদ গ্রহণের পর বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে মৌলিক গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া গবেষণা করিবার জন্য তিনি বহু সহকারে পালি ভাষা শিক্ষা করেন। 'হিন্দুপেট্রিয়ট' সম্পাদক রায় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর লিখিয়াছেন, "His knowledge of Pali and Sanskrit enabled him to prosecute original researches into the Buddhistic scriptures which commanded the admiration of his fellow-members of the Asiatic Society."

হিন্দু জ্যোতিষের আলোচনা

এই সময়ে রাজকৃষ্ণ প্রভূত পরিশ্রম সহকারে হিন্দু জ্যোতিষ-শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। অফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর গভীর রাত্রি অবধি

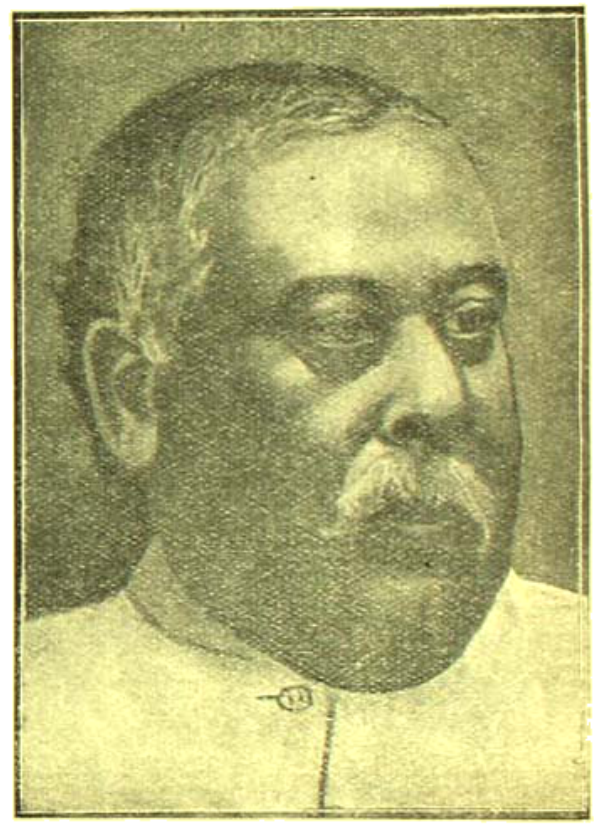

রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর

হিন্দু জ্যোতিষের আলোচনা করিতে তিনি ক্লান্তিবোধ করিতেন না।

"নানা প্রবন্ধ"

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ২১শে নভেম্বর রাজকৃষ্ণ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি একত্রিত করিয়া 'নানা প্রবন্ধ' নামে প্রকাশিত করেন। আমরা পূর্ব্বেই এই প্রবন্ধগুলির

পরিচয় দিয়াছি। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের বেঙ্গল লাইব্রেরীর রিপোর্ট হইতে কিয়দংশ এতৎপ্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য :—

"The most important work received under this head (miscellaneous) is *Nana Prabandha*, a collection of essays, by the Late Babu Raj Krishna Mukerji, on subjects of historical, philosophical, sociological, moral, literary, linguistic and antiquarian interest. The

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

work is a monument of the industry and scholarship of the writer. Some of his conclusions on the subject of Indian antiquities have been accepted as final by great scholars. The work shows clear marks of the spirit of research that animated him, and of the maturity of judgment which he possessed."

"বিবিধ গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের "নানা প্রবন্ধ"। উহাতে ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ক অনেকগুলি সন্দর্ভ আছে। এই গ্রন্থ লেখকের পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায়ের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ। ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় লেখকের কতকগুলি সিদ্ধান্ত প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসা ও বিচার-ক্ষমতার পরিচয় পদে পদে পাওয়া যায়।"

এই গ্রন্থ কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং উহার একাধিক সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল।

স্বর্গারোহণ

রাজকৃষ্ণ, কালিদাসের ভাষায় "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশু মহাভুজঃ" ছিলেন। তাঁহার শরীরে প্রভূত বল ছিল এবং তিনি প্রচুর পরিমাণে আহার করিতে পারিতেন। তিনি যে অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন, ইহা কেহ সন্দেহ করিতে পারিত না। কিন্তু অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভঙ্গ হইল। তিনি বহুমূত্র রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। অবশেষে কার্য্যাক্ষম হইয়া ২৫শে আশ্বিন ১২৯৩ সালে (ইং ১০ই অক্টোবর ১৮৮৬) তিনি তাঁহার পরিবারবর্গকে এবং দেশবাসীকে শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন।

তিনি মৃত্যুকালে ক্ষেত্রমোহন, সুশীলা, ললিতমোহন ও সরলা এই চারিটী সন্তান রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠপুত্র ক্ষেত্রমোহন এখন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টরের কার্য্য করিতেছেন, কনিষ্ঠ পুত্রটী অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। জামাতৃগণের মধ্যে [redacted] ৺পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র অবসরপ্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় সমাজের একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি এবং অপরটি এলাহাবাদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

উজ্জ্বল রত্ন এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠাপন্ন এডভোকেট ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা সুশীলাও আর ইহলোকে নাই।

শোক প্রকাশ

রাজকৃষ্ণের মৃত্যু জাতীয় শোকের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় সাধু, সদাশয়, দেবতুল্য লোক সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি নিরভিমান, অমায়িক, মৃদুস্বভাব ও ধীর প্রকৃতির ছিলেন। বাঙ্গালার যে

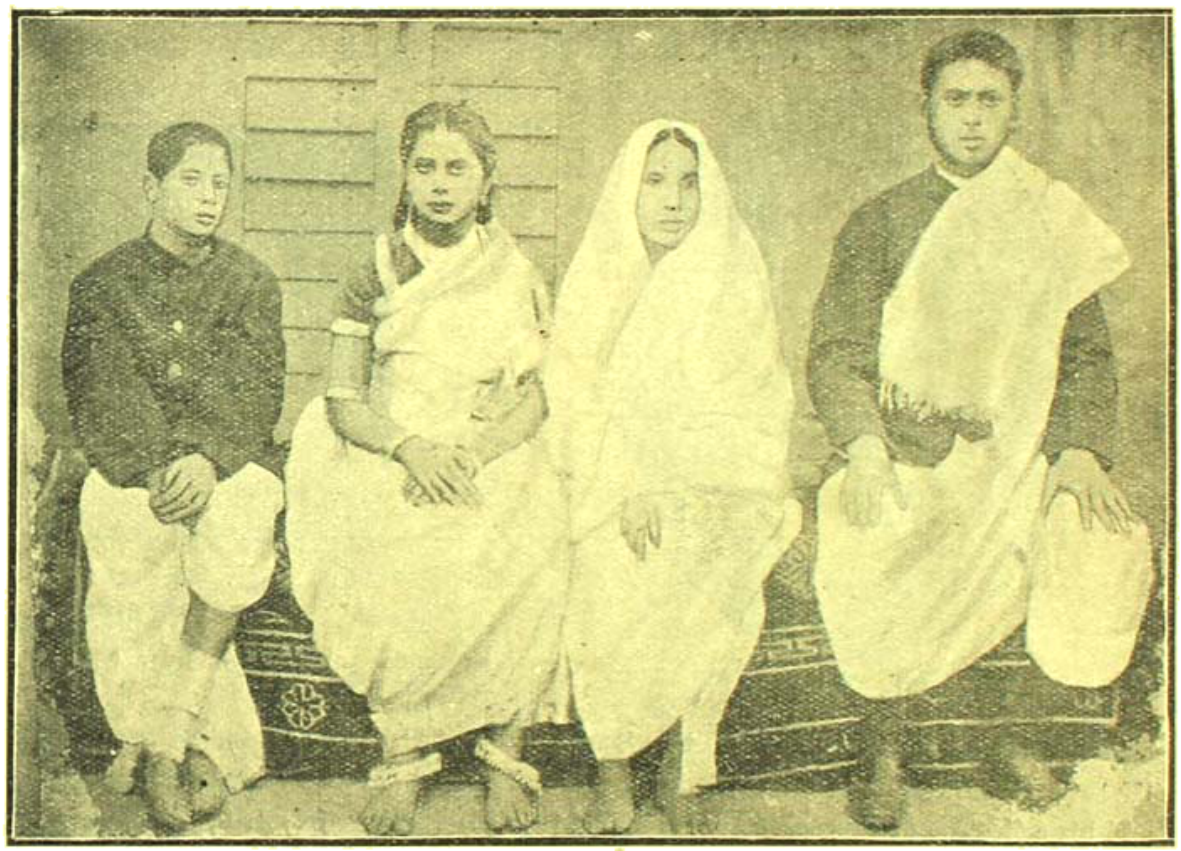

রাজকৃষ্ণের সহধর্ম্মিণী (পুত্রদ্বয় ও কনিষ্ঠা কন্যা সহ)

অল্প কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর সম্বর্ত্তকার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ। ঐতিহাসিক ও কবি বলিয়াও তিনি স্বল্প সমাদর লাভ করেন নাই। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১২৯৩ সালে ৩০শে চৈত্র সাবিত্রী লাইব্রেরীর দ্বিতীয় বাৎসরিক অধিবেশনে পঠিত "বাঙ্গালা সাহিত্য" নামক উপাদেয় প্রবন্ধের এক স্থানে বলিয়াছেন "বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাঁহার কবিতাগুলিও মহীয়ান্ চিত্রসমূহে পরিপূর্ণ। ইংরেজি, সংস্কৃত সাহিত্যে যাহা কিছু মহান্, সমস্ত তাঁহার কবিতায় আছে; তাঁহার কবিতা বিশুদ্ধ, সদ্ভাবাবলী পরিপূর্ণ।"

রাজকৃষ্ণের মৃত্যুর পর সমস্ত ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাময়িক-পত্র তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্কিম-চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জামাতা রাধালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত "প্রচার" নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে রাজকৃষ্ণের একটি বিস্তৃত জীবন চরিত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ একসংখ্যায় সামান্য কিয়দংশ লিখিয়া শাস্ত্রী মহাশয় নিরস্ত হন। সুকবি রাজকৃষ্ণ রায় তৎসম্পাদিত "বীণা" নাম্নী মাসিকপত্রিকায় রাজকৃষ্ণের মৃত্যু উপলক্ষে "বীণার রোদন" শীর্ষক একটি শোকগীতি লিখিয়া-ছিলেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ২রা ফেব্রুয়ারি এসিয়াটিক সোসাইটীর বাৎসরিক অধিবেশনে উহার সভাপতি (বাঙ্গালার ভূত-

পূর্ব্ব একাউণ্টেণ্ট জেনারেল) মিষ্টার ই, টি, এটকিন্সন বলিয়াছিলেন :—

"It has ever been the painful duty of your President to bring more prominently before you on these occasions the names of those whom death has removed from us, and who have done good work through, or for, our Society. I have not been spared in this respect and it is now my duty to announce the deaths of three distinguished members of our Society during the year, Mr. Edward Thomas, Mr. James Gibbs and Mr. Arthur Grote • • • Nor must I omit to mention the name of the Late Babu Raj Krishna Mukherji though but

রোহার চট্টোপাধ্যায়

for a short time connected with this Society. He was favourably known as a Bengali writer, and his collection of Essays, historical and antiquarian, published under the name *Nana Prabandha* showed considerable learning and industry.

"এইরূপ অন্বিবেশনে আপনাদের সভাপতিকে একটি দুঃখজনক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হয়; যাঁহারা এই সভা হইতে বা এই সভার জন্য প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন তাঁহাদের নাম বিশেষভাবে আপনাদের গোচরে আনয়ন করা একটি চির-প্রচলিত প্রথা। আমিও এই কর্ত্তব্যসম্পাদন হইতে অব্যাহতি পাই নাই—এবং আমাকে আমাদিগের সভার তিন জন প্রসিদ্ধ সভ্যের মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করিতে হইবে, যথা, মিঃ এডওয়ার্ড টমাস, মিষ্টার গিবস্, এবং মিষ্টার আর্থার গ্রোট্। • • • যদিও অপেক্ষাকৃত অল্পকাল এই সভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তথাপি স্বর্গীয় বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নামের উল্লেখ না করিলে কর্ত্তব্যহানি হইবে। তিনি বাঙ্গালা লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার 'নানা প্রবন্ধ' নামে প্রকাশিত ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধাবলী যথেষ্ট বিদ্যা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দেয়।"

স্যর রিভার্স টমসন তাঁহার শাসন-বিবরণীতে (Report on the Administration of the Lower

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

Provinces of Bengal from 1882-3 to 1886-7) লিখিয়াছিলেন :

"Although cut off at a comparatively early period of his career, Babu Raj Krishna Mukherji, the Late Bengali Translator to Government, achieved a considerable reputation by his patient researches regarding various obscure points of Indian History."

"যদিও অপেক্ষাকৃত অল্প কাল কার্য্যের পরই তিনি অবসৃত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা অনুবাদক বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত বিষয়ে গভীর গবেষণা করিয়া প্রভূত খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।"

যে পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচন-সমিতিতে রাজকৃষ্ণ বহু বৎসর

আগ্রহের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন, সেই সমিতিও ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এই মের অধিবেশনে, সারদাচরণ মিত্রের প্রস্তাবে এবং গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত অবধারণ লিপিবদ্ধ করেন :—

"That this meeting records its deep sense of regret at the untimely death of Babu Raj Krishna Mukherji, one of the most active and useful members of the Committee."

"এই সমিতির অন্যতম উৎসাহশীল ও বিচক্ষণ সদস্য বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।"

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর স্যর এলফ্রেড ক্রফ্‌ট্‌ও ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জুন তারিখ সম্বলিত এক পত্রে গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছেন :—

"Nor should I pass over in silence the names of those members whose loss we have to deplore, namely, Babu Raj Krishna Mukherji M. A., B. L., Dr. Uday Chand Dutt, and Babu Girija Bhusan Mukherji M. A., B. L., whose work in the committee, until they were removed by the hand of death, was of the highest value and importance."

"যে সকল সদস্যের তিরোধানে আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে নীরব থাকা উচিত নহে। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, ডাক্তার উদয় চাঁদ দত্ত এবং বাবু গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল কালকবলিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সমিতিতে যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহা অতি উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান।"

রাজকৃষ্ণের মৃত্যুর দিন (চন্দ্রনাথবাবু লিখিয়াছেন) বঙ্কিমচন্দ্র বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণ সমবেত হইয়া ১২৯৩ খৃষ্টাব্দের ২রা ফাল্গুন সাবিত্রী লাইব্রেরীতে একটী শোক-সভা আহূত করিয়া রাজকৃষ্ণের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিচারপতি স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র, চন্দ্রনাথ বসু, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মনোমোহন বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রজনীকান্ত গুপ্ত, সারদাচরণ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, তারাকুমার কবিরত্ন, হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন, কুঞ্জবিহারী সেন, প্রাণনাথ সরস্বতী, যাদবেশ্বর তর্করত্ন, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর রাসবিহারী ঘোষ, রজনীনাথ রায় প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। "অশ্রু-কণায়" কবি গিরীন্দ্রমোহিনী এই উপলক্ষে যে শোক-গীতি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

রাজকৃষ্ণ

"সখা হে তোমার তরে
আজিকে ব্যাকুলান্তরে,
মিলিত হয়েছি সেই সাবিত্রী-ভবনে,

এ নহে হে সুখ-মেলা,
এ নহে হাসির খেলা,
জুড়াতে হৃদয়-জ্বালা গুণের কীর্ত্তনে!

কে জানিত একদিন,
হইয়া এমন দীন,
হায়রে তোমারে মোরা আসিব হেথায়,

তোমার দু'খানি স্মরি
ফেলিব শোকাশ্রু বারি,
রহিবে না (পাশে তুমি বসন্তের প্রায়!)

তোমার সে হাসি-মুখ,
স্মরিলে এখনও সুখ,
পুলকে পূরিয়া উঠে হৃদয় নিলয়,

সে কি সন্তোষের ছবি,
যেন প্রভাতের রবি
আলোকে জাগায়ে ধরা করে মধুময়!

নয়নে অমৃত-রাশি,
মুখে পূত পুণ্য-হাসি
একাধারে গুণ-রাশি রাজকৃষ্ণ-কায় ;

কেমনে ভুলিব সখা ! (লইতে বিদায়)
বিদরি যে যায় বুক কি বলিব হায় !

হায় !
আঁধার মলিন পুরী,
রতন গিয়েছে চুরি !
নিভেছে উজ্জ্বল দীপ কাল-ঝড়-বায় !

কেন, দু বিন্দু লোকাশ্রু-বারি স্মরি সবে তাঁর
স্মরি' সে পবিত্র মূর্ত্তি রাজকৃষ্ণ-কায় !

বন্ধুতার প্রতিদান, বিজয়ের সম্মান,
থাকে যদি লোকালয়ে থাকে মুগ্ধ মন,
(তবে, আসিবে নয়নে বারি স্মরি' সে আনন) !

আজি বসন্তের দিন, ফুটেছে নুকুল,
গাঁথিছে সকলে মালা কুড়াইয়া ফুল,

স্নেহ-প্রতিদান ছলে,
পরাবে সখার গলে ;
হায় ! মোর স্মরি' গুণ তব হয়েছি ব্যাকুল !
অভাগা বঙ্গেরে বিধি সদা প্রতিকূল !

আজি এ নিধন হেন,
প্রতিমা বিসর্জ্জি যেন !
আঁধার মণ্ডপ মাঝে আনত আনন ।

লিখি' তব গুণ-গাথা,
স্মরি তব প্রেম-কথা !
গভীর হৃদয় ব্যথা, হবে কি মোচন ?

কি বলিব আর ?
সখা !
এই শত আঁখি-আগে
নবীন অরুণ রাগে,
সদা যেন হৃদে জেগে তোমার আনন ।

হবে কি প্রণয় ভাল,
করেছে যে ক্ষতি কাল,
লয়ে অসময়ে তোমা, দীন বঙ্গ হ'তে ।

সে ক্ষতি পূরাতে বিধি
পুনঃ কি মিলাবে নিধি,
তোমার অভাব যাহে পারিবে পূরিতে !

হায় !
"সাবিত্রী" তোমারে স্মরে,
কাঁদিবে গো চির-তরে,
করিবে সতত তব গুণের কীর্ত্তন,
(রাখিবে হৃদয়ে তব মূরতি মোহন) !
হায় ! শত আঁখি অশ্রুবারি,
স্মরিবে তোমারে স্মরি'
আদর্শ সে গুণ যেন সবাকারি হয় ।

যশের মন্দির মাঝে
উজ্জ্বল পবিত্র সাজে
সদা, অমর হইয়া থাক সাধু সদাশয় !"

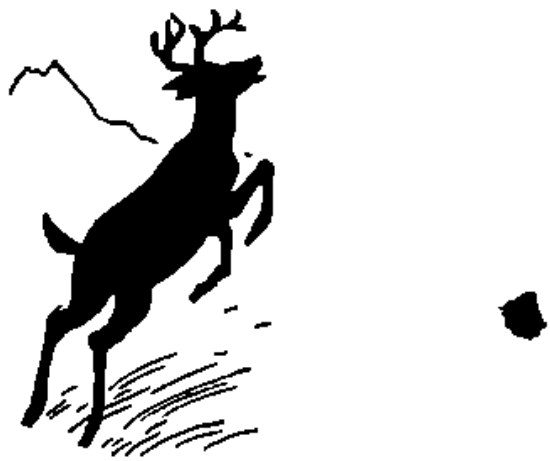

বিজিত

শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

মঞ্জুলার বাপ কলেজের অধ্যাপক। বৃদ্ধ হলেও আধুনিক তন্ত্রের মতাবলম্বী। মঞ্জুলাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, গান শিখিয়েছেন,—এক কথায়, আধুনিক শিক্ষার সব কিছুই মঞ্জুলা আয়ত্ত করেছে,—আয়ত্ত কর্‌তে পারে নি কেবল সত্যকার শিক্ষা। বাপের স্নেহ-দৃষ্টির নিকট সেটুকু ত্রুটি ধরা পড়ে নি। মঞ্জুলার ত্রুটি বা দোষ তার বাবা সুধাময়বাবু মেয়ের স্নেহমাখুরী ব'লেই লোকের কাছে উড়িয়ে দিতে চাইতেন। এর ফলে হয়েছিল মঞ্জুলা, চঞ্চলা। তার সাজগোছের অন্ত ছিল না। ধারণা ছিল তার মত সুন্দরী নারী আর কেউ আছে কি না সন্দেহ। নিত্য নতুন কাপড়, নিত্য নতুন জামা, সবলের ফ্যাশানকে টেক্কা দেবার জন্য তার চাই। এসব আবদারও সুধাময় বাবু হাসিমুখে সহ্য কর্‌তেন।

মঞ্জুলার মা সুধাময়বাবুকে অনুযোগ ক'রে বল্‌তেন—গরীবের মেয়ের অত বাবুয়ানী কেন? যা রয় সয় তাই ভাল। তোমার আস্কারাতেই ও অমন হচ্ছে। আজ বাদে কাল পরের বাড়ী যেতে হবে, তখন কি হবে।

সুধাময়বাবু স্ত্রীর অভিযোগে হেসে বল্‌তেন—কিচ্ছু ভাব্‌তে হবে না, বড় হ'লে সব শুধ্‌রে যাবে।

কথাটা সুধাময়বাবুর স্ত্রীর মনঃপুত হ'তো না। তিনি মুখ ভার ক'রে চ'লে যেতেন। তিনি মেয়েমানুষ বলেই মেয়ের ভবিষ্যৎ দুর্গতির কথা স্মরণ ক'রে শিউরে উঠ্‌তেন। মেয়েকে পরের বাড়ী যেতেই হবে। সেখানে কি তারা মেয়ের এত আবদার ও বাবুগিরি সহ্য কর্‌বে? যদি না করে, আর না করাই তো সম্ভব, তা হ'লে মেয়ের সমস্ত জীবন কি হবে ভাব্‌তেও তাঁর গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌তো। যা হয় হবে ভেবে তিনি বেশী কথা বল্‌তেন না।

সেদিন সুধাময়বাবু ঘরে ব'সে পড়্‌ছিলেন। ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে মঞ্জুলা তাঁর হাত থেকে বই কেড়ে নিয়ে ব'লে উঠ্‌লো—বাবা, আমি বায়স্কোপ দেখ্‌তে যাচ্ছি। "বীণা থিয়েটারে" 'স্বামী' বই দেখাচ্ছে। আমি যতীন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখ্‌তে যাচ্ছি। ব'লে যেমন ঘরে ঢুকেছিল তেমনি বের হ'য়ে গেল।

সুধাময়বাবু মেয়ের অপসৃয়মান দেহের দিকে চেয়ে একটু হাস্‌লেন। সমস্ত ঘরটা মঞ্জুলার অঙ্গ-সৌরভে ভরে গেল। তার শাড়ীর বাহার যেন তখনও ঘরটাকে ঝলমলিয়ে দিচ্ছিল।

রাত্রে মঞ্জুলা বাড়ী ফিরে সুধাময়বাবুকে বল্‌লে—জান বাবা, "স্বামী" বইটা পড়্‌তেও আমার ভাল লাগে না আর, দেখ্‌তেও ভাল লাগ্‌লো না। শরৎবাবু মেয়েদের ভারী ছোট ক'রেছেন। কেন, মেয়েরা কি এতই হীন যে, তাকে স্বামীর কাছে মাথা নোয়াতেই হবে? তা স্বামী তার মনের মত হোক আর না হোক। নাঃ, আমি সব সইতে পারি মেয়েদের এই হীনতা,—পুরুষের কাছে নত হওয়া কিছুতেই আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না কোন দিন। নিজেও পার্‌বো না এমন করে নিজের সত্তা ভুলে মাথা নত কর্‌তে।

সুধাময়বাবু মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। যতীন্দ্র সেখানে ছিল, সে বল্‌লে—আমারও তাই মত। মেয়েদের আমরা নারী, দেবী বল্‌বো, আর পরে দু'পায়ে থেঁৎলাবো, এ আমিও চাই না। স্বামী স্ত্রীর অধিকার সমান সমান হওয়া উচিত। হয় না বলেই তো এত ঝগড়া, বিবাদ, মনকষাকষি। আমাদের হিন্দুর সংসার একেবারে যাচ্ছেতাই।

মঞ্জুলা প্রশংসমান দৃষ্টি তুলে যতীন্দ্রের মুখের দিকে তাকালে। যতীন্দ্র আত্মগর্বে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লো।

যতীন্দ্র সুধাময়বাবুর ছাত্র। এ বাড়ীতে তার অবাধ মেলামেশা। সে মঞ্জুলার প্রতি অনুরক্ত, মঞ্জুলাও তাকে ভালবাসে। যতীন্দ্র মঞ্জুলার প্রতি কথায় সায় দেয়, তার সমস্ত ফরমাস খাটে। মঞ্জুলা ভাবে, হাঁ, পুরুষ তো এই রকমই হবে। মেয়েদের স্বাধীন মতকে স্বাধীনভাবে উপভোগ কর্‌তে দেবে। যতীন্দ্র এই বাড়ীর সঙ্গে এত

ঘনিষ্ঠভাবে মিশে গিয়েছিল যে, সে ও মধুলা একলা কোথাও বেড়াতে গেলেও কারো মনে কিছু সন্দেহ হতো না। সকলেই জানে মধুলার সঙ্গে যতীন্দ্রের বিয়ে হবে। তারা দু'জনেও তাই জানে—অন্ততঃ মধুলা জানে তাই।

শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ আকাশে হাসছে। শরৎকালের প্রথম। তখনও বৃষ্টির জল গাছের পাতা হ'তে, মাটির গা হ'তে শুকিয়ে যায় নি সম্পূর্ণ। শেফালী ফুলের গন্ধ, প্রথম-বিবাহিত লাজ-ভীত বধূর মত বাতাসে নিজেকে হারিয়ে দিয়েছে। মৃদু গন্ধ ঘরে ভেসে আসছে।

মধুলা ছবির মত সেজে জানলায় বসেছিল। যতীন্দ্র এক গোছা আধফোটা গোলাপগুচ্ছ নিয়ে ঘরে ঢুকলো। মধুলা মৃদু হেসে বললে—বাঃ, কি সুন্দর গোলাপ!

যতীন্দ্র কৃতার্থ হ'য়ে ফুলগুলো মধুলার হাতে দিয়ে বললে—মধু, আমার কাছে কিন্তু এ ফুলগুলোর দাম তোমার দামের চেয়ে ঢের কম।

ব'লে জানলাতেই মধুলার পাশে ব'সে পড়লো। দু'জনের শরীরের বিদ্যুৎপ্রবাহ চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। মধুলা হেসে বললে—পুরুষগুলো ভারী খোসামুদে। তাদের সঙ্গে কথায় পারবার উপায় নেই।

যতীন্দ্র মধুলার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে—না, মধু, এ একেবারে আমার প্রাণের কথা। তোমার ভালবাসার দাম নির্দ্ধারণ করতে গেলেই আমার নিজেকে নিজের ছোট মনে হয়। সত্যিই আমরা পুরুষরা এতো হীন যে, তোমাদের কোন মূল্যই দিতে পারি না।

যতীন্দ্রের কথাগুলো মধুলার মন্দ লাগলো না। সে মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়লো।

সুধাময়বাবু মধুলার বিয়ের জন্য এতদিন বাদে একটু সচেতন হ'য়ে পড়েছেন। লোক নাকি যতীন্দ্র ও মধুলার নাম নিয়ে একটু বেশী রকম চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে।

সুধাময়বাবু একদিন নিভৃতে যতীন্দ্রকে ডেকে বললেন—বাবা যতীন, আমার ইচ্ছে তোমার হাতে মধুলাকে দিই—তা তোমার কি মত?

যতীন্দ্র মাথা নীচু ক'রে বললে—বাবার অমতে তো আমি বিয়ে করতে পারবো না।

সুধাময়বাবু তার বাবাকে জানালেন; কিন্তু যতীন্দ্রের বাবা মত দিলেন না।

মধুলার কানে সব কথাগুলো গেল। সে একদিন যতীন্দ্রকে নিভৃতে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে—যা শুনছি তা কি সত্যি?

যতীন্দ্র মধুলার হাতটা ধরতে গেল। মধুলা ছিটকে সরে গিয়ে দৃঢ়স্বরে বললে—আগে যা জিজ্ঞাসা করছি তার উত্তর দাও।

যতীন্দ্র মাথা নীচু করেই বললে—তোমায় সত্যই ভালবাসি মধু, কিন্তু তাই ব'লে বাবার অমতে তোমায় গ্রহণ করবার ক্ষমতা নেই।

মধুলা বাধা দিয়ে বললে—থাক্, ভালবাসার আর অপমান করো না। তুমি দেখছি কলিযুগের পরশুরাম। পিতৃ আজ্ঞাই তোমার কাছে যখন বড় তখন কথা বাড়িয়ে ভালবাসার অমর্য্যাদা করো না। আজ থেকে এইখানেই তোমার আমার মধ্যে চিরদিনের মত যবনিকা পড়লো।

এই ঘটনার পর মধুলা কিছুতেই আর বিয়ে করতে চায় নি—পুরুষের উপর বিদ্বেষ তার দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল বলে। পরে সুধাময়বাবু অনেক বুঝিয়ে মধুলাকে বিয়ে করতে রাজী করেছেন এই সর্ত্তে যে, মধুলা যেখানে বিয়ে করতে চাইবে সেইখানে বিয়ে হবে। অনেক পাত্র এলো, গেল, কোনটাই মধুলার পছন্দ হয় না। শেষ তার পছন্দ হলো সফলকে।

সফল তরুণ সাহিত্যিক। সাহিত্যের বাজারে তার একটু পসার আছে। মধুলা সফলের গল্প পড়েছে মাসিকে। গল্প প'ড়ে ও সফল নামটা শুনে তার মন্দ লাগলো না। সফলের গল্পের বিশেষত্বই ছিল মেয়েদের গুণগরিমা প্রচার করা। মধুলা মনে করলে লোকটা মন্দ হবে না। অন্ততঃ তাকে আদর না করুক অনাদর করবে না। মধুলা সফলকে বিয়ে করতে রাজী হ'লো। কিন্তু তাই ব'লে তার মন থেকে পুরুষের উপরকার বিদ্বেষ কিছুমাত্র কমলো না। বিয়ে করাটা হ'লো যেন পুরুষকে কৃতার্থ করা।

যেদিন সফল সবান্ধবে মধুলাকে দেখতে এলো, সেদিন মধুলা মুখ নীচু ক'রে গম্ভীর হ'য়ে ব'সে রইলো, কোন কথাই বললে না। তার লজ্জা করবার যতখানি ক্ষমতা ছিল সে তা করেছিল সেদিন। সে যেন দেখাতে চায় সেও বড় কেউ কেটা নয়। তোমরা যে যাচাই করতে এসেছো, আমিও তোমাদের যাচাই করতে জানি।

আমার কাছে তোমরা কিছুই না। সে সকলকে ভাল করে দেখেও দেখলে না এমনি বিতৃষ্ণা।

সকলের সঙ্গেই বিয়ের ঠিক হ'য়ে গেল। মধুলা সকল সম্বন্ধে বিশেষ কোন কিছুই ইচ্ছে ক'রে জান্‌লে না। কারণ, বিয়ে কর্‌তে হবে, অতএব বিয়ে করা চাই একজনকে। সেই একজন অন্য আর কেউ হয় নি, সকলকে সে পছন্দ করেছে। এ কথাটা পরে সকলকে জানিয়ে দিয়ে মধুলা তাকে কৃতার্থ ও ধন্য কর্‌বে। সে অন্য কাউকে বিয়ে কর্‌লেও কর্‌তে পার্‌তো, এমন কি ধর্তীন্দ্রকেও জোর ক'রে বিয়ে কর্‌তে পার্‌তো, কিন্তু, সে তা করেনি শুধু তার নিজের স্ত্রীত্ব বজায় রাখ্‌বার জন্য। অতএব সকলের ভাগ্য যে, মধুলা তাকে স্বামীত্বে বরণ কর্‌তে রাজী হয়েছে। এর ভিতর আবার জানাজানির কি আছে।

বিয়ের দিন সকলের চেহারা দেখে তার পিত্ত জ্বলে উঠ্‌লো। মা গো, এ কি বিশ্রী চেহারা আর সাজ! পরনে আধময়লা মোটা কাপড়, গায়ে তেমনি একটি জামা। বুল্‌সের মত কড়া খোঁচা খোঁচা না-কামানো গোঁপ দাড়ি। চুলগুলো রুক্ষ আর এলোমেলো। এই লোকটাই যে এমন লিখ্‌তে পারে এ মধুলা কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লে না। সে শুনেছিল বিয়েতে মনে বদল হয়, এ কি তার বরাতে বর বদল হলো? এমন সাজে কি কেউ বিয়ে কর্‌তে আসে না কি? অসভ্যরাও বোধ করি এর চেয়ে সভ্য। সমস্ত মন সকলের উপর বিরূপ হ'য়ে উঠ্‌লো। শুভদৃষ্টির সময় জ্বালাময়ী তীব্র দৃষ্টি হেনে সে সকলকে পুড়িয়ে ফেল্‌তে চাইলে। সকল তার মুখের ভাব দেখে নিজের মুখে কোন ভাবই ফুটিয়ে তুল্‌লে না।

ফুলশয্যার দিন সকলের বন্ধুরা তার ঘর ফুল দিয়ে চমৎকার ক'রে সাজিয়ে দিলে। রাত্রে সকল আগেই ঘরে এসে শুয়েছিল। মধুলাকে একরকম জোর ক'রে ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো। মধুলা ঘরে ঢুকে দোরে খিল লাগিয়ে দিলে এবং এসে খাটের ফুলগুলো দু'হাতে ছিঁড়ে ফেল্‌তে লাগলো। সকল মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে —ও কি কর্‌ছো?

মধুলা ব্যঙ্গস্বরে বল্‌লে—তারী তো বিয়ে তার আবার দু' পায়ে আল্‌তা। আর ফুলশয্যা করে না। একটা জানোয়ারের পাশে শুতে ঘৃণা হয় না, কিন্তু তোমার কাছে শুতে ঘৃণা হচ্ছে। মানুষ সবাই সুন্দর হয় না জানি; কিন্তু পরিষ্কার হওয়া তো নিজের হাত। সেটাও কি শিখিয়ে দিতে হয় না কি।

সকল কোন উত্তর কর্‌লে না। সে নীরবে চোখ বুজে শুয়ে রইলো। তার নীরবতা মধুলাকে আরো বেশী বিঁধতে লাগ্‌লো, বেশী ক'রে আঘাত দিতে লাগ্‌লো। শেষে বল্‌লে—সরে শোও, আর লোক হাসিও না, তোমার লজ্জা কর্‌ছে না কিন্তু আমার লজ্জা কর্‌ছে।

এই তাদের প্রথম মিলন-রাত্রির প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণ।

মধুলা যে-পরিমাণ সাজ-গোছ করে থাক্‌তো সকল ঠিক সেই-পরিমাণ অগোছালো হ'য়ে থাক্‌তো। দু'জনের মধ্যে পাল্লা চল্‌তো যেন কে কাকে হারাতে পারে। মধুলা রেগে ব'কে অনর্থ বাধাতো, সকল স্থির ধীরভাবে সহ্য কর্‌তো। এতে মধুলা আরো রেগে যেতো।

একদিন মধুলা একটা দর্জি জামা আর কাপড় এনে সকলকে দিয়ে বল্‌লে—এইটা পর, আমার সঙ্গে বায়স্কোপ দেখ্‌তে যেতে হবে।

সকল কোন কথা না ব'লে সেগুলো মাটিতে ফেলে দিয়ে চ'লে গেল। মধুলা রাগে ফুল্‌তে লাগ্‌লো। এ কী অপমান! অপমান সে কোন দিন সয় নি, আজো সইবে না—বেশ ক'রে দু'কথা শুনিয়ে দেবে। কিন্তু এই লোকটার কি হায়া আছে? কোন সাড়াই যে দেয় না। এক পক্ষে লড়াই চলে কতক্ষণ? মধুলা বুঝ্‌তে ঠিক পার্‌তো না যে, এ লোকটি কি প্রকৃতির। তার মধ্যে ভালবাসার নিদর্শন সে জান্‌তে পেরেছে, যদিও সে তা আমোলে আনে নি। কত রাত্রে মধুলা ঘুম ভেঙে দেখেছে যে, সকল তাকে হাওয়া কর্‌ছে, তার ঘর্মাক্ত মুখ সন্তর্পণে মুছিয়ে দিচ্ছে। সকলের তপ্ত নিশ্বাস তার মুখে লেগে অপূর্ব্ব আবেশ এনে দিয়েছে, কিন্তু মধুলা জোর ক'রে ঘুমের ভান ক'রে প'ড়ে থেকেছে। মনকে জানিয়েছে এ আর এমন বেশী কি করেছে। স্বামীর সম্বন্ধ তো শুধু নেবারই নয়—দেবার তো বটে। সকলকে তার এই ক'দিনে ভালও লাগ্‌তো না, অথচ মন্দ মনে কর্‌তেও কোথায় যেন বাধতো। সকলকে বুঝ্‌তে পার্‌তো না ব'লে, অবুঝ-রাগে সে জ্ব'লে উঠ্‌তো। সে এতদিন কারো অধীনতা স্বীকার করে নি, সকল কি করে তাকে

অধীন কর্‌বে। না, সে কিছুতেই হবে না। কিন্তু সঞ্চয় তো খুলে বলে না সে কি চায়। এ কি জ্বালা! মধুলার মন হাঁপিয়ে উঠ্‌তো—এ কি বিড়ম্বনা!

সেদিন রাত্রে সঞ্চয় ঘরে আস্‌তেই মধুলা বোমার মত ফেটে উঠে বল্‌লে—জান, তোমায় বিয়ে করেছি দয়া ক'রে। পুরুষগুলো এমনি অকৃতজ্ঞ যে, দানের মূল্য বোঝে না। জান, আমি যাকে ভালবাসতাম তার নাম বতীন্দ্র—ইচ্ছে কর্‌লে তাকে আমি বিয়ে কর্‌তে পারতাম। কিন্তু তার বাপের অমতে বিয়ে করার অনিচ্ছার জন্যে আমি তাকে বিয়ে করি নি। তাকে আমি সত্যিই ভালবাস্‌তাম, বিয়ের দিন সকালে পর্য্যন্ত তার জন্যে কেঁদেছি। সে ভালবাসার মূল্য বোঝে নি ব'লে তাকেও দূরে ঠেলেছি। তোমাকে আমি একটুও ভালবাসি না—জান!

সঞ্চয় প্রায় মধুলার কথার সঙ্গে সঙ্গে ধীর ভাবে উত্তর কর্‌লে—হাঁ।

আর কিছু না ব'লে শুয়ে পড়্‌লো। মধুলা যে এত কথা ব'লে গেল, এত কাণ্ড ক'রে গেল—সঞ্চয়ের কাছে যেন সেগুলো কিছুই না। এমন কিছু নতুন মধুলা বলে নি বা এমন কিছু নতুন সঞ্চয় শোনে নি যেন। সবই যেন তার জানা কথা। সঞ্চয় চোখ বুজে চুপ কোরে শুয়ে রইল—কোন সাড়া শব্দ দিলে না। মধুলা খানিকক্ষণ সঞ্চয়ের মুখের দিকে জলন্ত দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে রইল। এ লোকটা কি মানুষ না কি! আঘাত কর্‌লেও, অপমান কর্‌লেও, তার মর্ম্ম কিছু বুঝে না। সে আস্তে-আস্তে নীচে নেমে মেঝের উপর শুয়ে পড়্‌লো। হঠাৎ তার তন্দ্রা ভেঙে গেল। দেখ্‌লে সঞ্চয় তার মাথার নীচে বালিশ দিয়ে দিচ্ছে সযত্নে। ঘুমের ঘোরে এ ব্যাপারটা তার মর্ম্ম লাগ্‌লো না। সব ভুলে গিয়ে সে পাশ ফিরে পরম আরামে শুলো। একখানি হাত তার অজ্ঞাতে সঞ্চয়ের কোলের উপর এসে পড়্‌লো। তেমনি ভাবে মধুলা আবার ঘুমিয়ে পড়্‌লো। সঞ্চয় স্থির হ'য়ে ব'সে রইলো।

সেই অবস্থাতেই যখন মধুলার ভাল ক'রে ঘুম ভাঙ্গলো, তখন সে নিজের এই লজ্জাকর ব্যবহারে নিজেই চম্‌কে উঠ্‌লো। যে লোক তাকে অবজ্ঞা করে, সে যাকে অবজ্ঞা করে, তারই কোলের উপর হাত রেখে সে পরম নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়েছে! কিন্তু কে জানে কেন আজ সে আর তেমন করে রূঢ় আচরণ কর্‌তে পার্‌লে না সঞ্চয়ের উপর, শুধু মুখখানা গম্ভীর ক'রে পাশ ফিরে শুলো। সঞ্চয় কোন কথা না ব'লে চুপ ক'রে রইলো।

মধুলা সঞ্চয়কে বল্‌লে—দেখ, কাল তো আমি বাবার কাছে যাবো, তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে, কিন্তু দোহাই অমন ক'রে যেও না। একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'য়ে ভাল জামা কাপড় প'রে যেও। নইলে সবাই বল্‌বে, মধুলা এমন বাবুয়ানী ক'রে চলে আর তার স্বামী এমন। তোমার লজ্জা না করুক আমার লজ্জার সেব থাক্‌বে না।

মধুলা এখন ক'দিন থেকে তার রাগের বাঁজ সাম্‌লেছে। কেন সেই জানে। সঞ্চয়ের সঙ্গে সে কোন মতেই পার্‌ছে না। বাইরে সে হার না মান্‌লেও মনে মনে সে বুঝ্‌ছে যে, সঞ্চয় নীরবতার মধ্যে দিয়েই তাকে জয় কর্‌ছে। রাগও হচ্ছে অথচ রাগ প্রকাশ করবার ক্ষমতাও যেন তা'র কমে আস্‌ছে। এক রকম সাপ আছে, তার দৃষ্টির সাম্‌নে কোন জন্তু পড়্‌লে, সে তাকে তার দৃষ্টির আকর্ষণী শক্তি দিয়ে মোহাচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। তার পর তাকে ক্রমশঃ গ্রাস করে। সঞ্চয়ও যেন মধুলাকে তেমনি ভাবেই আয়ত্ত কর্‌তে আরম্ভ কর্‌ছে। বিষের জ্বালায় মধুলা মনের মধ্যে ছট্‌ফট্ কর্‌ছে, অথচ বাইরে তার প্রকাশ করবার ক্ষমতা ক্রমশঃ লোপ পেয়ে আস্‌ছে। নিজের হীনতা বুঝ্‌তে পেরেও নিরুপায় হ'য়ে পড়্‌ছে। অভিমানে তার চোখ ফেটে জল আস্‌তো। কিন্তু মুক্তির আর কোন পথই দেখ্‌তে পেতো না। তাই এখন বোধ করি সুর বদ্‌লেছে।

সঞ্চয় বল্‌লে—আমার তো এ ছাড়া আর কিছু পোষাক নেই। আমি না হয় নাই যাবো তুমি যদি লজ্জা পাও।

মধুলা রুখে উঠে সঞ্চয়ের কথার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠ্‌লো—ওগো, না, না, না, সে হবে না। তাতে আরো বেশী লজ্জা পাবো। সকলকে কৈফিয়ৎ দিতে পার্‌বো না কেন তুমি আস নি। তোমার দোহাই আমায় আর জ্বালিও না। যা খুশী তাই কর—নিজের স্ত্রীর লজ্জা অপমানও তোমার কাছে কিছুই নয়।

মহুলা আজ বোধ করি প্রথম সকলের সাম্‌নে নিজমুখে উচ্চারণ কর্‌লে সে সকলের স্ত্রী। নিজের কথায় নিজেই চম্‌কে উঠ্‌লো। এতখানি পরিবর্ত্তন কেন হচ্ছে!

বাপের বাড়ী এসে মহুলার হ'লো আর এক জ্বালা। সকলে বলে—হ্যাঁরে তুই এমন ফিট্‌ফাট্ তোর স্বামী কেন এমন। তাকে সাজাতে পারিস নে।

মহুলা এ কথার উত্তরই বা কি দেবে? রাগ হ'তো সকলের উপর, আর এই লোকগুলোর উপর। তোদের কেন এত মাথাব্যথা? হায়! তার অদৃষ্টে এতো নিগ্রহও ছিল! পুরুষগুলোর নিজেদেরও কি মান-অপমান-জ্ঞান নেই। লজ্জায় মাথা কাটা যায়, আর ঐ লোকটা পরম নির্ব্বিকার চিত্তে সব সহ্য কর্‌ছে। মহুলা নিজের নারী-অভিমানকে যত সোজা ক'রে রাখ্‌তে চায়, ততই যেন বেশী ক'রে তাতে ঘা দেয় সকল। রেগে, ব'কে, মিনতি করেও লোকটার সাড়া পাওয়া যায় না।

মহুলা বাপের বাড়ী আস্‌তেই যতীন্দ্র আবার আসা-যাওয়া সুরু করেছে। মহুলা প্রথমটা ঘৃণাভরে তার সঙ্গে ভাল ক'রে কথাই বলে নি। কিন্তু তার পর তার মনে হ'লো সকলকে আঘাত কর্‌বার এই একমাত্র পথ। এটা সে জান্‌তো যে, পুরুষ সব সহ্য কর্‌তে পারে কিন্তু ভালোবাসার অপমান সহ্য কর্‌তে পারে না। মহুলা এই অস্ত্র অবলম্বন কর্‌লে। সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে সে যতীন্দ্রের সঙ্গে হাসি গল্প কর্‌তো, যদিও সে যতীন্দ্রকে মনে মনে ঘৃণাই কর্‌তো। মহুলা সকলকে যতই জব্দ কর্‌তে চায়, সকল যেন ততই তাকে পরাজিত করে। মহুলার শ্রেণী একরোখা মন এ কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পারে না, তাই মনে হীনতা স্বীকার করেও তাকে যতীন্দ্রের সঙ্গে ভাব জমাতে হলো। অথচ সে বুঝ্‌তেও ঠিক পার্‌তো না যে, সকল যখন তাকে চায়ই না তখন তারই বা এত আগ্রহ কেন সকলকে জব্দ কর্‌বার। এ কেনর উত্তর সে মনের মধ্যে খুঁজে পেতো না। আর সেই জন্যেই সে জ্বলে-পুড়ে খাক্ হ'য়ে যেতো।

যতীন্দ্রের সঙ্গে মহুলা আবার তেমনি পূর্ব্বের মত ব্যবহার কর্‌তে লাগ্‌লো। যতীন্দ্রও কৃতার্থ হ'য়ে গেল। মহুলার ব্যবহারে যতীন্দ্রের পৌরুষ সাহস অনেকখানি বেড়ে গেল। মহুলা কিন্তু মুখে যতই স্ফূর্ত্তি টেনে আসুক না কেন, মনের মধ্যে তৃপ্তি পেলে না। কারণ সকল এবারেও কোন ভাবান্তর দেখালে না। যেন এও তার কাছে কিছুই নয়। সকল যদি রাগ্‌তো, বোক্‌তো, তাহ'লে হয় তো মহুলার মনের অবস্থা এমন হ'তো না। সকলের নীরব উপেক্ষাই তাকে সব থেকে পীড়া দিতে লাগ্‌লো।

সেদিন যতীন্দ্র এসে মহুলাকে বল্‌লে—চল মহু, আজ একটু বেড়িয়ে আসি নদীর ধারে।

বেশ, চলো—ব'লে উৎফুল্ল মহুলা একবার পাঠ-নিরত সকলের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে। কিন্তু ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লে না সকল কথাগুলো শুন্‌তে পেলে কি না।

মহুলার বাড়ী হ'তে নদীর ধার বেশী দূর নয়। দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে গল্প কর্‌তে কর্‌তে চল্‌লো। যতীন্দ্র কত কথাই ব'লে যেতে লাগ্‌লো, কিন্তু মহুলার মনের অবস্থা তখন এমন যে, সে সব কথা শুন্‌ছিল কি না সন্দেহ। শুধু হাঁ, হুঁ, না, ক'রে যতীন্দ্রের কথার উত্তর দিচ্ছিল।

তখন সন্ধ্যা আসন্ন। ব্রহ্মপুত্রের একটা ক্ষীণ স্রোত-ধারা এই ক্ষুদ্র সহরের নীচে দিয়ে ব'য়ে গেছে। তারই তীরে সন্ধ্যায় নরনারীর মেলা ব'সে যায়। ওপারে অস্তগামী ম্লান সূর্য্যের রক্তাভ রৌদ্র এপারে বেদনাতুর হৃদয়ের রক্তের মত পৃথিবীর বুকের উপর পড়েছে। তারই এক ঝলক মহুলার মুখের উপর পড়্‌লো। মহুলা কতদিন এখানে বেড়াতে এসেছে। কত লোকের সঙ্গে গল্প করেছে, হেসেছে, নিজের সুখ-সম্পদ সকলকে দেখিয়ে গর্ব্ব অনুভব করেছে। আজ কিন্তু সে সহজ সরলভাবে এখানে বেড়াতে পার্‌লে না। সকলে যেন তারই দিকেই কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে! সে দৃষ্টি সহ্য কর্‌বার ক্ষমতা সে আজ নিজের অজান্তে কোথায় হারিয়ে ব'সে আছে। অথচ অন্য দিন সে সকলের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে গর্ব্বিতভাবেই সোজা বুকে চ'লে বেড়িয়েছে। আজ তার এ কি পরিবর্ত্তন! সে যতীন্দ্রকে এক রকম টেনে নিয়ে নিভৃতে নিরালায় গিয়ে বস্‌লো। ব'সে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লে। যতীন্দ্র যদি একটু চোখ খুলে দেখ্‌তো তো বুঝ্‌তে পার্‌তো আজ মহুলার মনের মধ্যে কী ঝড় উঠেছে। কিন্তু যতীন্দ্র মহুলাকে কাছে পেয়েছে, তার মনের কামনা জেগে উঠেছে। সে সহজ বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে আজ একটা যা হোক বোঝা-পড়া কর্‌তে চায়।

সন্ধ্যারাণী রাত্রির ঘোমটায় মুখ ঢাকলেন। তারা-বধূরা দিগন্তরাল হ'তে এক এক ক'রে প্রিয়তমের উদ্দেশে অভিসার-যাত্রায় বের হ'লেন।

যতীন্দ্র মহুলার পাশে ব'সে বললে—চল মহু, আমরা কোথাও চ'লে যাই। জীবনকে এমন হেলা-ফেলায় কাটিয়ে দিও না। বল যাবে?

মহুলা স্থির নিষ্কম্প।

মহুলার সাড়া না পেয়ে যতীন্দ্রের সাহস বেড়ে গেল। সে অনুনয়ের স্বরে বললে—বল মহু, যাবে কি না। আমার সাহস তো তুমিই বাড়িয়ে দিয়েছো।

ব'লে সে মহুলার হাত দু'টো দু' হাতে ধ'রে তাকে কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করতেই মহুলা ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো। তার হাতের হঠাৎ-ঝাপ্টা বেশ জোরেই যতীন্দ্রের চোখে লাগলো। যতীন্দ্র উঃ ক'রে দু' হাতে চোখ ঢাকলে।

মহুলা ক্রন্দন-রুদ্ধ স্বরে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—এত বড় স্পর্দ্ধা, তুমি আমায় স্পর্শ করো! জান, তোমায় আমি কতখানি ঘৃণা করি। আর কোন দিন যদি আমার সামনে আসবে তো তোমার অপমানের শেষ থাকবে না।

ব'লে একরকম ছুটেই সে বাড়ীর দিকে রওনা হলো। কান্নায় তার সমস্ত শরীর দুলে দুলে উঠ্‌তে লাগলো। চোখের জলে অন্ধকার আরো ঝাপসা হ'য়ে উঠ্‌লো। কোনো দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। কতবার সে পড়্‌তে পড়্‌তে নিজেকে সাম্‌লে নিলে—কোন খেয়াল নেই।

বাড়ী এসে যখন পৌঁছলো তখন মহুলার চেহারা দেখ্‌লে তাকে আর আগের মহুলা ব'লে চেনা যায় না। এইটুকুর মধ্যে শরীর ও মনের উপর তার এতখানি পরিবর্ত্তনের ঝড় ব'য়ে গেছে।

সে ছুটে তেমনি অবস্থায় এসে ঘরে ঢুকলো। সকুর তখনও একলা একটা আরাম-চেয়ারে ব'সে পড়্‌ছে,—নির্ব্বিকার, নিশ্চিন্ত। মহুলা ঘরে এসেই সকুরের পা দু'টো জড়িয়ে ধ'রে হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের সঙ্গে ব'লে উঠ্‌লো—ওগো, কেন এমন ক'রে আমায় দূরে ঠেলে দিচ্ছ। আমি তো তোমার স্ত্রী, তোমার কী উচিত নয় আমার মূঢ়তাকে শাস্তি দেওয়া? আমায় ক্ষমা করো, এমন ক'রে শাস্তি দিও না। আমার ভুলের শাস্তি তুমি সহজভাবে দাও।

সকুর মহুলার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললে—তোমায় তো শাস্তি আমি দিতে কোন দিনই চাইনি মহু। আমি জান্‌তুম তুমি একদিন নিজের ভুল বুঝ্‌তে পারবে নিজেই, তাই আমি কোনো কথা বলি নি। জান মহু, মানুষ যখন নিজে নিজের ভুল বুঝ্‌বে না মনে করে, তখন তার ভুল সংশোধন করতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা আর নেই। তুমি তো দোষ কিছুই কর নি, তা ক্ষমা কি করবো?

মহুলা তেমনি কাঁদতে কাঁদতে বললে—ওগো না, তুমি বল আমায় ক্ষমা করেছো। তুমি জান না আমি কত বড় পাপিষ্ঠা। আজ তোমার অপমান করেছি, নিজের অপমান করেছি—

সকুর মহুলাকে বাধা দিয়ে বললে—থাক্, যা হয়ে গেছে তার জন্যে দুঃখ কি মহু, আমি কিছু শুনতে চাই না। আমি জানি তুমি একান্ত আমার। তোমার আসন যেখানে, সেখান থেকে তুমি এতটুকুও দূরে স'রে যাও নি। আমি শুধু চেয়েছিলাম যে, তুমি যেন নিজেই বুঝ্‌তে পার যে, বাহ্য আবরণের ভিতর দিয়ে অন্তরের যাচাই হয় না। আজ সে ভুল তোমার ভেঙ্গেছে। তোমার নিজের আসন তুমি নিজেই দখল করেছো। আমার বেশভূষার বাহ্য আবরণ শুধু তোমার ভুল ভাঙ্গবার জন্য।

ব'লে সকুর মহুলাকে নিজের বুকের কাছে টেনে নিলে। তার মুখখানা মহুলার কান্না-ধোয়া মুখের উপর নত হ'য়ে পড়্‌লো।

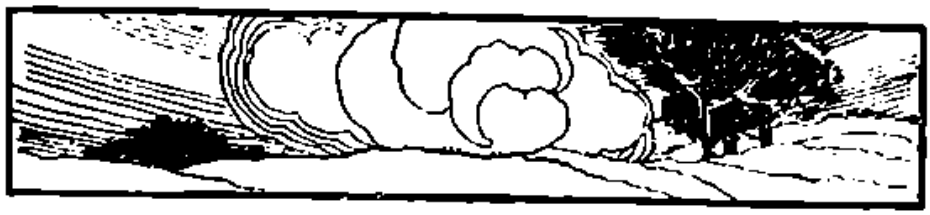

অভিমান !

শ্রীঅনিলবরণ রায়

আজিও তোমারে আমি চাহিতে নারিনু, স্বামি !
সর্ব্ব প্রাণ-মনে,
চলিতেছে অবিরত লুকোচুরি খেলা কত
আপনার সনে !

হৃদে বড় হয় সাধ কম কান্তি তব, নাথ !
পূর্ণি দিবাযামী,
তোমারে আড়াল করে আজো নানা মূর্ত্তি ধরে
আসে মোর "আমি" !

যে শুধু তোমারে চায় আপনি খসিয়া যায়
তার সব বন্ধ ;
শত দিকে আমি ধাই তাই দিশা নাহি পাই,
নাহি ঘুচে দ্বন্দ্ব ।

বসি সুধাসিন্ধুতীরে চাহিতেছি ফিরে ফিরে
মরীচিকা পানে,
বদ্ধ অন্ধ বাসনায় প্রাণ করে, হায় হায় !
প্রবোধ না মানে ।

তোমা ছাড়া কিছু আমি দেখি না, অন্তর-স্বামী !
যবে খুলে আঁখি,
তবু মায়া-স্বপ্ন দিয়ে রচিত বাস্তব নিয়ে
বেশ ভুলে থাকি !

করুণার অবতার আপনি লয়েছ ভার
তথাপি সংশয় !
জননীর স্নেহভরে রাখিয়াছ বক্ষে ধরে
তবু নিরাশ্রয় !

ছিন্ন মত মোহ-ঘোরে টানিয়া লইলে মোরে
আপনার ঠাঁই,
বন্ধু তুমি, প্রিয় তুমি, তোমার চরণ চুমি
তবু তৃপ্তি নাই !

রহিয়াছ প্রতীক্ষায় দিতে ধরা আপনায়
প্রেম-প্রতিদানে,
নয়ন বাঁধিয়া রেখে দেখিয়াও নাহি দেখে
ভাসি অভিমানে ।

তোমারে চাওয়াতে আছে যে-সুখ, তাহার কাছে
তুচ্ছ সর্ব্বধন,
রহি চেয়ে তোমা পানে জাগিছে মর্ত্তের প্রাণে
মন্দার-স্বপন ;

কাঁটা ফুল হয়ে ফোটে তটিনী উল্লাসে ছোটে
অসীমের পানে,
হয়ে ঊর্দ্ধ-স্বয়ম্বরা অটবী উজলে ধরা
পাখী মাতে গানে ।

তোমারে চাওয়ার স্বাদ যে পেয়েছে—পরমাদ
সাজে কি তাহার ?
আনন্দের পাল তুলি যাবে সে দুঃস্বপ্ন ভুলি
তমসার পার ।

সংসারে রয়েছে যারা তুচ্ছ সুখে আত্মহারা
তোমাতে বঞ্চিত,
এই করো, দয়াময় ! শিরে যেন নাহি হয়
সে-শাপ বর্ষিত ।

তোমার বিরহানলে দিবানিশি মরি জ্বলে
সেই মোর ভালো,
তোমা ছাড়া প্রাণ যম হোক্ মরুভূমি সম,
নিভে যাক্ আলো ।

প্রতি রক্ত বিন্দু মোর তব প্রেমে হোক্ ভোর
আপনা-বিস্মৃত,
মানি ভোর হবে নিশা তুমিই মিলাবে দিশা
মরণে অমৃত ।

পঞ্জাবে গ্রীক-শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়গণের বিদ্রোহ *

অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ

পূর্ব্ব প্রস্তাবে আমরা দেখাইয়াছি যে, গ্রীকগণকে তাড়াইয়া পঞ্জাব অধিকার করিয়া পরে চন্দ্রগুপ্ত নন্দ সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া ভারত-সম্রাট হইয়াছিলেন। কাজেই কোন্ বৎসর পঞ্জাব হইতে গ্রীকগণ বিতাড়িত হয়, তাহা ঠিক করিতে পারিলে সম্রাট হইয়া কোন্ বৎসর চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহার নির্ণয় সহজ হয়।

৩২৪ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দের শেষে এলেকজেণ্ডার যখন ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যা'ন, তখন তিনি বিজিত পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের শাসনের নিম্নলিখিত মত ব্যবস্থা করিয়া যা'ন।

১। পঞ্জাবের নদীগুলির সহিত সিন্ধু নদীর সঙ্গম পর্য্যন্ত সিন্ধু দেশে এগেনরের পুত্র পাইথনকে শাসনকর্ত্তা করা হইল।

২। এই সঙ্গমের উত্তরস্থ স্থানগুলি, যথা মালব, ক্ষুদ্রক ইত্যাদি স্বাধীন জাতির দেশ যাহা এলেকজেণ্ডারের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহা ফিলিপের অধীনে রাখা হইল। এই ফিলিপ-শাসিত প্রদেশের উত্তরে তক্ষশীলা রাজ্য। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন আম্ভি। আম্ভি এলেকজেণ্ডারকে ভারতে অবস্থানকালে বিবিধ উপায়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। আম্ভিকেও কিন্তু ফিলিপের কর্ত্তৃত্ব মানিয়া চলিতে হইত। ফিলিপের অধীনে প্রকাণ্ড এক দল সৈন্য ছিল। এই সৈন্যদলে গ্রীক, মেসিডোনীয়, থ্রেসীয় ইত্যাদি বিবিধ জাতির সৈন্য ছিল। থ্রেসীয় সৈন্যগণের সেনাপতি ছিলেন ইউডেমস্ নামক এক ব্যক্তি।

৩। ইহার পূর্ব্বে ছিল পুরুর রাজ্য। এলেকজেণ্ডারের আগমনের পূর্ব্বে পুরু ঝিলাম ও চিনাব নদীদ্বয়ের অন্তরস্থ (আয়তনে প্রায় মেদিনীপুর জেলার সমান) ক্ষুদ্র একটি রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। এলেকজেণ্ডারের সহিত সন্ধি হইলে পর তিনি পুরুর রাজ্যসীমানা অনেক বাড়াইয়া দেন। গ্রীক সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া পুরু নিজের রাজ্য শাসন করিতে থাকেন।

৪। আম্ভি ও ফিলিপের রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে পারোপনিসিদৈ নামক প্রদেশে এলেকজেণ্ডারের শ্বশুর অক্সিআর্ত্তিস্ নামক এক ব্যক্তি শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। এই রাজ্য হিন্দুকুশ পর্ব্বতের দক্ষিণস্থ বর্ত্তমান কাবুল রাজ্যের পশ্চিমাংশ লইয়া গঠিত ছিল।

৩২৪ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে ফিলিপকে তাহার নিজেরই কয়েকজন সৈন্য হত্যা করে। এলেকজেণ্ডারের নিকট এই খবর পৌঁছিলে তিনি অন্য কোন প্রকৃষ্টতর ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত ইউডেমস্‌কে ফিলিপের স্থানে অস্থায়ী শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ফিলিপের বিস্তৃত রাজ্যের শাসন শৃঙ্খলার জন্য তক্ষশীলারাজ আম্ভি এবং নবনিযুক্ত ইউডেমস্, এই দুইজনকে যুক্তভাবে দায়ী করা হইল। আম্ভি বরাবরই গ্রীকদের পোষকতা করিয়া আসিতেছিলেন এবং এলেকজেণ্ডারও তাঁহাকে খুব বিশ্বাস করিতেন।

খ্রীঃ পূঃ ৩২৩ অব্দের জুন মাসে এলেকজেণ্ডার বেবিলন নগরে প্রাণত্যাগ করেন, কাজেই অস্থায়ী ইউডেমস্‌ই ফিলিপের স্থানে স্থায়ী হইলেন, অন্য কোন ব্যবস্থা আর হইয়া উঠিল না।

এলেকজেণ্ডারের মৃত্যুর পরে তাঁহার সেনাপতিগণ বেবিলন নগরে এক মন্ত্রণা-সভায় মিলিত হইলেন এবং এলেকজেণ্ডারের বিজিত বিস্তৃত সাম্রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিলেন। এই সভায় ভারতীয় গ্রীক প্রদেশগুলির শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন করা হইল না। এলেকজেণ্ডারের ব্যবস্থাই এই ক্ষেত্রে বলবৎ রহিল। (ভি, এ, স্মিথের 'অশোক' ১ পৃষ্ঠা। কেম্ব্রিজ হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়া, ৪১৮ পৃষ্ঠা—২৩-২৮ পংক্তি।) কাজেই পঞ্জাবের বিভিন্ন রাজ্যগুলির শাসনের ব্যবস্থার বিবরণ পূর্ব্বে যাহা বিবৃত করিয়াছি উহার কোন পরিবর্ত্তন হইল না।

সিরিয়া প্রদেশের ট্রিপারাডিসস্ নামক স্থানে ৩২১ খ্রীষ্ট

* "চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের অভিষেক সংবৎসর"। দ্বিতীয় প্রস্তাব।

পূর্ব্বাঞ্চে সেনাপতি এণ্টিমেটরের নেতৃত্বে আবার গ্রীক সেনাপতিগণের একটি সভা হয়। এই সভায় রাজ্য বিভাগ ও রাজ্যশাসন ব্যবস্থার নানা রকম পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ভারতীয় গ্রীকরাজ্য সমূহের রাজ্য-শাসন-ব্যবস্থায় যে পরিবর্ত্তনগুলি হইল তাহা এই—

(i) পাইথনকে সিন্ধু প্রদেশ ছাড়িতে হইল। সিন্ধু নদীর পশ্চিমস্থ এবং পারোপনিসিদৈ রাজ্যের পূর্ব্বস্থ ভূভাগ পাইথনের অধীনস্থ হইল।

(ii) পুরুর রাজ্যসীমা অনেক বাড়াইয়া দেওয়া হইল। তাহার প্রভুত্ব সিন্ধু নদী ধরিয়া দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। এই ব্যবস্থা হইতে বুঝা যায়, সিন্ধু প্রদেশ শাসনে রাখিবার মত বল পাইথনের ছিল না। তাই 'উদ্ধু বৈ গোবিন্দায় নমঃ' নীতির অনুসরণ করিয়া সিন্ধু প্রদেশ পুরুর অধীনস্থ করিয়া দেওয়া হইল।

(iii) আম্ভি ও পুরুর ক্ষমতা খর্ব্ব করার কোন চেষ্টা হইল না, কারণ গ্রীক সেনাপতিগণ বুঝিলেন, উহা তাহাদের সাধ্যাতীত।

(iv) এই ট্রিপারাডিসসের ব্যবস্থায় ইউডেমসের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই বুঝিতে হইবে, ইউডেমস্ এলেকজেণ্ডারের নিয়োগ এবং বেবিলনের ব্যবস্থা মত পূর্ব্ববৎ ফিলিপের রাজ্যশাসন করিতেই রত ছিলেন। কারণ ইতিহাসে দেখিতে পাই, তিনি ৩১৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত পঞ্জাবে ছিলেন। ঐ বৎসর তিনি পুরুকে হত্যা করিয়া তাহার অনেকগুলি রণহস্তী হস্তগত করেন এবং সমস্ত গ্রীক সৈন্য ও পুরুর রণহস্তীগুলি সমেত ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করেন।

এই বিবরণ হইতে আমরা দেখিতে পাই, গ্রীক প্রভুত্ব ও গ্রীক শাসন-ব্যবস্থা পঞ্জাবে ৩১৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। এই বৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চন্দ্রগুপ্ত বা অন্য কেহ পঞ্জাব হইতে গ্রীক শাসন দূর করিতে কোন চেষ্টা করেন নাই। তবে কবে এই চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল? কবে চন্দ্রগুপ্ত জাষ্টিনের বর্ণনা মত এলেকজেণ্ডারের সেনাপতিগণকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন?

পরলোকগত ঐতিহাসিক ডাঃ ভি, এ, স্মিথ্ এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অসঙ্গত ও অসংযত চিন্তাপ্রণালীর পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। যথা—"গ্রীক সেনাপতি ইউডেমসের অধীনে এত সৈন্য ছিল না যে, তিনি জোর করিয়া নিজের শাসন ও প্রভুত্ব বজায় রাখিতে পারেন। তাঁহার প্রভুত্ব নিশ্চয়ই নামে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছিল।"—আর্লি হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়া, ১১৫ পৃষ্ঠা।

এই অনুমানের কি কোন ভিত্তি আছে? দীর্ঘ আট বৎসর কাল (৩২৪—৩১৭ খ্রীঃ পূঃ) ইউডেমস্ ভারতে একমাত্র গ্রীক সেনাপতি ছিলেন। দুই দিকে দুইজন শক্তিশালী রাজা আম্ভি ও পুরুর রাজ্যের মধ্যে তাঁহার রাজ্য অবস্থিত ছিল এবং ইহাদের মধ্যে থাকিয়াও তিনি বেশ আত্মরক্ষা করিয়া ৩১৭ খ্রীঃ পূঃ পর্য্যন্ত পঞ্জাবে ছিলেন। ৩১৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে তিনি পুরুকে হত্যা করিয়া তাহার রণহস্তীগুলি আত্মসাৎ করিয়া সমস্ত গ্রীক সৈন্যসহ আম্ভির রাজ্যের মধ্য দিয়া ভারত হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ভারত হইতে বাহির হইয়া যাইবার অন্য কোন সহজ রাস্তাও ছিল না। এই বহির্গমন কি দুর্ব্বল, অক্ষমশক্তি, নামমাত্র প্রভুত্বশালী ব্যক্তির পলায়নের মত বোধ হয়?

ডাঃ ভি, এ, স্মিথ্ বলেন—"এই ব্যবস্থায় (ট্রিপারাডিসসের ব্যবস্থায়) পরিষ্কারই বুঝা যায় যে, এলেকজেণ্ডারের মৃত্যুর দুই বৎসর মধ্যে ৩২১ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে সিন্ধুনদের পূর্ব্বপারে গ্রীক প্রভুত্ব ও শাসন একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। তবে সামান্য একটুকরা রাজ্য (সে রাজ্য যেখানেই হউক না কেন) যথায় ইউডেমস্ কোন রকমে আঁকড়িয়া ছিল, তথায় গ্রীকশাসন লুপ্ত হয় নাই, এবং ইউডেমস আরও কয়েক বৎসর সেখানে টিকিয়া ছিল।"—আর্লি হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়া, ১১৬ পৃষ্ঠা।

এইখানেও ডাঃ স্মিথের অসঙ্গত ও অসংযত চিন্তার বিকাশ দেখা যায়। ৩২১ খ্রীষ্টাব্দের ট্রিপারাডিসসের ব্যবস্থায় আম্ভি এবং পুরুকে গ্রীক সাম্রাজ্যের অধীনস্থ রাজা বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। এদিকে বহু গ্রীক সৈন্যের সেনাপতি ইউডেমস্ও ফিলিপের রাজ্যে, ফিলিপের স্থানে ক্ষত্রপের কাজ করিতেছিল। ট্রিপারাডিসসের ব্যবস্থার যে বিবরণ আমরা পাইয়াছি তাহাতে দেখা যায়, পুরু ও আম্ভি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়াছেন। তাই তাঁহাদিগকে ইচ্ছা থাকিলেও রাজ্যচ্যুত করিবার ক্ষমতা ট্রিপারাডিসসে মিলিত কর্ত্তাদের ছিল না। বেশ কথা।

কিন্তু ক্ষমতাশালী হইলেও তাঁহারা যে গ্রীক শাসনে বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন এমন কথার আভাসও কোথাও নাই। ইউডেমসেরও যে কোনরূপ দুর্ঘটনায় কোন প্রকার বলহানি ঘটিয়াছিল, এমন কথাও কোথাও পাই না। এ অবস্থায় ৩২১ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুনদের পূর্ব্বপারে গ্রীক প্রভুত্ব ও শাসন একেবারেই লুপ্ত হইয়াছিল এমন অনুমান কি যুক্তিসঙ্গত? যদি তেমন হইয়াই আসিবে, তবে দীর্ঘ আরও চারি বৎসর কাল ইউডেমস্ কি করিয়া কোথায় টিকিয়া ছিল? চারি দিকে আগুনের মধ্যে ইউডেমস্ চারি বৎসর কাল টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছিল এই কথা বড় যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

ডাঃ স্মিথ্ বলেন—"এলেকজেণ্ডারের মৃত্যু সংবাদে যখন আর কোন সন্দেহ রহিল না, এবং সৈন্য চলাচলের উপযোগী ঋতু উপস্থিত হইল, তখন ভারতে একযোগে যে সকলে গ্রীক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ফলে ৩২২ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের শেষে ভারত হইতে গ্রীক শাসন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কেবল একটুকরা জমীতে ইউডেমস্ কোন রকমে আঁকড়িয়া ছিল।"—আর্লি হিষ্টরি, ১১৬-১১৭ পৃঃ।

এই প্রবন্ধে আদিতেই বলিয়াছি, কল্পনাযোগে নিঃসন্দেহ হওয়া ঐতিহাসিক ব্যাপারে বড়ই বিপজ্জনক,—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় প্রমাণ খুঁজিয়া ঐ প্রমাণের বলে নিঃসন্দেহ হওয়া উচিত। ৩২২ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের শেষে পঞ্জাবে সার্ব্বজনীন বিদ্রোহের কোন বিবরণ কোথাও আছে কি? পর বৎসর অর্থাৎ ৩২১ খ্রীঃপূঃতে ট্রিপারাডিসসে নির্ব্বিবাদে গ্রীক নায়কগণ বিস্তৃত গ্রীকসাম্রাজ্যের সমস্ত প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলেন—পঞ্জাবেরও শাসন-ব্যবস্থা হইল। তবু যদি কেহ বলেন যে, ৩২২ সালে অর্থাৎ ট্রিপারাডিসসের ব্যবস্থার পূর্ব্ব বৎসরেই পঞ্জাব হইতে গ্রীক শাসন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে নিতান্ত অসঙ্গত অবরদস্তি ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না। প্রচুর গ্রীক সৈন্য লইয়া ৩১৭ খ্রীঃপূঃ পর্য্যন্ত ইউডেমসের পঞ্জাবে অবস্থিতি ব্যাপারটা ডাঃ ভি, এ, স্মিথ্ মোটেই তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই, এই কথা আমরা বলিতে বাধ্য।

ঠিক যে কি ঘটিয়াছিল তাহা বলিবার মত উপকরণ আমাদের হাতে নাই। কিন্তু ৩১৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে পুরুকে হত্যা করিয়া তাহার রণহস্তীগুলি হস্তগত করিয়া ইউডেমসের ভারতবর্ষ ত্যাগ দেখিয়া প্রকৃত ঘটনার ধারাটা অনুমান করা যায়। মনে হয় এই বৎসরই চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক-শাসনের বিরুদ্ধে পঞ্জাবে অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন। এই বৎসরের পূর্ব্বে যে তিনি এই সুযোগ পান নাই, সেই বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। পুরু যে এলেকজেণ্ডারকে কি প্রবল বাধা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা গ্রীক কর্ত্তাগণ নিশ্চয়ই ভুলেন নাই। কাজেই পুরুকে সম্ভবতঃ তাঁহারা সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। তাই চন্দ্রগুপ্তের বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়া মাত্র পাছে পুরু ঐ দলে যাইয়া যোগ দেন, গ্রীককর্ত্তা ইউডেমসের মনে এই সন্দেহ জাগিয়াছিল। এই সন্দেহের ফলেই সম্ভবতঃ পুরুর হত্যা। কিন্তু সম্ভবতঃ পুরুর হত্যায় পঞ্জাব আরও গরম হইয়া উঠিল এবং চন্দ্রগুপ্তের নায়কত্বে পঞ্জাবের জনসাধারণের সমবেত চাপে ইউডেমসকে চিরকালের জন্য ৩১৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে ভারত ছাড়িয়া প্রস্থান করিতে হইল।

মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ বৎসর নির্ণয় *

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, চন্দ্রগুপ্তের পঞ্জাবে গ্রীক শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান এবং পঞ্জাব অধিকার ৩১৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের পূর্ব্বে হওয়া সম্ভবপর নহে। ইউডেমস্‌কে ভারত হইতে খেদাইয়া দেওয়া এবং ভারতে গ্রীক অধিকারের সমস্তগুলি মূল একে একে উৎপাটিত করা ব্যাপারে নিশ্চয়ই অনেকখানি সময় আবশ্যক হইয়াছিল। ৩১৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে ইউডেমস ভারত পরিত্যাগ করিয়া গেলেও পঞ্জাব প্রদেশকে সম্পূর্ণরূপে স্ববশে আনিতে আরও বছর দুই লাগিবার কথা। কাজেই ৩১৭ ও ৩১৬ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ এই সকল ব্যাপারে ব্যয়িত হইয়াছিল, ধরা যায়। ৩১৫ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে চন্দ্রগুপ্ত নন্দ-সাম্রাজ্য অধিকারের জন্য অভিযান আরম্ভ করেন, এই অনুমান অযৌক্তিক

* চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের অভিষেক-সংবৎসর, তৃতীয় প্রস্তাব।

নহে। জৈন গ্রন্থ স্থবিরাবলি চরিতে হেমচন্দ্র চন্দ্রগুপ্তের নন্দ-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানের এক বিবরণ দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত পর্ব্বতক নামক এক পার্ব্বত্য সর্দ্দারের সহযোগে ধীরে ধীরে নন্দরাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। একটি একটি করিয়া নগরগুলি ক্রমশঃ অধিকৃত হইতে লাগিল। একটি নগর দখল করিতে চন্দ্রগুপ্তের বিশেষ বেগ পাইতে হয় এবং অনেক মাস সময় অতিবাহিত হয়। অবশেষে চাণক্যের কৌশলে দীর্ঘকাল চেষ্টার পরে ঐ নগর হস্তগত হয়। এই বিবরণের সমস্তই যে ঐতিহাসিক সত্য এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু কিনারা হইতে অভিযান আরম্ভ করিবার উপদেশমূলক বৌদ্ধ ও জৈন গল্পগুলি হইতে বুঝা যায়, প্রত্যন্ত পঞ্জাব হইতে আরম্ভ করিয়া পাটলীপুত্রের দিকে অভিযান ধীরে ধীরে এই ভাবেই অগ্রসর হওয়া সম্ভব। এই অবস্থায় প্রকাণ্ড নন্দসাম্রাজ্য মন্থন করিয়া রাজধানীতে পৌঁছিতে ২।৩ বৎসর লাগা কিছুমাত্র অসম্ভব মনে হয় না। যদি ৩১৫ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে এই অভিযান আরম্ভ হইয়া ২।৩ বৎসর লাগিয়া থাকে তবে ৩১৩ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে নন্দবংশের পতন হইয়াছিল এবং চন্দ্রগুপ্ত ভারতসম্রাট হইয়াছিলেন, ইহা ধরিলে কি অসঙ্গত হয়? ইহার উপর যখন দেখা যায় যে, প্রাচীন জৈন শাস্ত্রসমূহের গণনা মতে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক সংবৎসর ৩১৩ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ বলিয়াই গৃহীত, তখন অনেকটা নিশ্চিততার সহিতই চন্দ্রগুপ্তের অভিষেকের এই জৈনশাস্ত্র-সম্মত সংবৎসর সমর্থন করা যায়।

চন্দ্রগুপ্তের এই অভিষেক সংবৎসর অনেকগুলি প্রাচীন জৈন গ্রন্থে দেওয়া আছে। ডাক্তার কার্পেন্টিয়ার ১৯১৪ সালের ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারি পত্রিকায়, বুদ্ধ ও মহাবীরের নির্ব্বাণের তারিখ সম্বন্ধীয় তদীয় প্রবন্ধে একটি জৈন পুস্তক হইতে এই তারিখটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। (১) পুস্তকখানির নাম বিচারশ্রেণী,—প্রণেতা মেরুতুঙ্গ; প্রণয়নের তারিখ—১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দ। শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার তদীয় An Epitome of Jainism নামক গ্রন্থেও এই তারিখটি দিয়াছেন। নাহার মহাশয় তিথগলীর পয়ন্না এবং তীর্থোদ্ধার প্রকীর্ণক নামক দুইখানা প্রাচীন জৈন গ্রন্থ হইতে তারিখটি দিয়াছেন।(২) এই পুস্তক দুইখানার কোন বিবরণ নাহার মহাশয় দেন নাই। বিক্রমাব্দ ৫৮ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে আরব্ধ হইয়াছিল। এই সকল জৈন পুস্তকে বিক্রমাব্দের পূর্ব্বে কোন্ রাজবংশ কত কাল স্থায়ী হইয়াছিল, তাহার মোট বৎসর সংখ্যা দেওয়া আছে। এই সংখ্যা-গুলি যোগ করিয়া দেখা যায় যে মৌর্য্যবংশের আরম্ভ ৩১৩ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে পড়ে—এবং উহাই চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ বৎসর বলিয়া ধরিতে হইবে।

চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ বৎসর ভারতের ইতিহাসের একটি অসাধারণ ঘটনা। প্রাচীন জৈন গ্রন্থকারগণ এই ঘটনার একটা তারিখ দিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য ঐতি-হাসিকগণ এই ক্ষেত্রে কল্পনাকে যথেচ্ছ ছুটিতে দিয়াছেন, তবু ভারতীয় জৈন গ্রন্থকারগণের প্রদত্ত এই তারিখটি সঙ্গত কি না তাহার বিচারে তেমন করিয়া প্রবৃত্ত হ'ন নাই সমস্ত জৈন গ্রন্থে এই ঘটনার যে এই একই তারিখ পাওয়া যায়, ইহাও তাঁহারা বিচার করেন নাই। (৩) ডাঃ কার্পেন্টিয়ার—কেম্ব্রিজ হিষ্টরিতে প্রকাশিত তদীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"জৈনদের (প্রাচীন সাহিত্যে প্রাপ্ত) বংশাবলিতে দেখা যায় যে, বিক্রমাব্দের প্রারম্ভ বৎসরের ২৫৫ বৎসর পূর্ব্বে—অর্থাৎ ৩১৩ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে (৫৮+২৫৫=৩১৩) চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই

(১) "এই তিনটি শ্লোক (যাহা হইতে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণের বৎসর পাওয়া যায়) জৈনদের অনেক টীকায় এবং সময়নির্দ্ধারক গ্রন্থে আছে।" ডাঃ কার্পেন্টিয়ারের প্রবন্ধ, ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারি, ১৯১৪, ১৫০ পৃষ্ঠা।

(২) "এই ৩১২ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দটি চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ বৎসর বলিয়া অতি প্রাচীন অনেক জৈন গ্রন্থে উল্লিখিত দেখা যায়।" নাহার ও ঘোষ প্রণীত—An Epitome of Jainism,—Appendix A. Page iv. শ্রীযুক্ত নাহার বিক্রমাব্দের আরম্ভ ৪৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে ধরিয়া হিসাব করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে উহা ৫৮ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে আরব্ধ হইয়াছিল। কেম্ব্রিজ হিষ্টরি, ১৫৫ পৃ।

(৩) এইখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, জৈন প্রাচীন সাহিত্যের বহু স্থানে উল্লিখিত এই তারিখটি যে কয়টি শ্লোকে বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহাদের প্রথম দিক লিখা কিছু গোলমাল আছে। ডাঃ কার্পেন্টিয়ার তদীয় ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারীর প্রবন্ধে এই গোলযোগের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই গোলযোগে কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের তারিখের কোন ইতরবিশেষ হয় না।

তারিখ যদি ঠিক তারিখ নাও হয় তবু বিশেষ বেশ-কম হইতে পারেই না।" কেম্ব্রিজ হিষ্ট্রি, ১৪৮ পৃষ্ঠা। ইহা হইতে বুঝা যায় যে কার্পেন্টিয়ার সাহেব অস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, জৈনদের তারিখই ঠিক—কিন্তু বিচার-বিতর্ক দ্বারা এই অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করিতে আর তিনি চেষ্টা করেন নাই।

জৈনদের এই তারিখটি আশ্চর্য্যরূপে বৌদ্ধ সাহিত্য দ্বারাও যে সমর্থিত হয়, এই পর্য্যন্ত এই ব্যাপার কেহই লক্ষ্য করেন নাই। মৌর্য্যরাজগণের রাজত্বকালের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে কোথায় কি পাওয়া যায়, হল্‌জের (Inscriptions of Asoka, Introduction, P. XXXII হইতে তাহা সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

কোথায় প্রাপ্ত	চন্দ্রগুপ্ত	বিন্দুসার	অশোক
পুরাণ	২৪ বৎসর	২৫	৩৬
দীপ বংশ	„ „	×	৩৭
মহাবংশ	„ „	২৮	৩৭
বুদ্ধ ঘোষ	„ „	২৮	×
ব্রহ্মদেশীয় জনশ্রুতি	„ „	২৭	×

দীপবংশ ও মহাবংশে আরও লিখিত আছে যে বুদ্ধের নির্ব্বাণের ২১৪ বৎসর পরে বিন্দুসারের মৃত্যুতে অশোক রাজ্য প্রাপ্ত হ'ন এবং তাহার চারি বৎসর পরে অর্থাৎ নির্ব্বাণের ২১৮ বৎসর পরে অশোকের অভিষেক হয়।

মৌর্য্যরাজগণের রাজত্বকালের দৈর্ঘ্যের যে নক্সা উপরে দিয়াছি তাহাতে দেখা যাইবে যে পুরাণ মতে বিন্দুসারের রাজত্বের দৈর্ঘ্য ২৫ বছর; আর বৌদ্ধদের মতে ২৭ এবং ২৮ বছর। অশোকের রাজ্যলাভ এবং অভিষেকের মধ্যে যে চারি বৎসরের ব্যবধান ছিল, তাহারই জন্য বিন্দুসারের রাজত্বের দৈর্ঘ্যে পুরাণে ও বৌদ্ধ সাহিত্যে এই বিরোধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক ধরিয়া নেওয়া যাক্ যে পুরাণের প্রদত্ত রাজত্ব দৈর্ঘ্যগুলিই ঠিক। (Pargiter সাহেবের Dynastics of the Kali Age নামক পুস্তকের ২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) এই পুরাণকথিত মৌর্য্যরাজগণের রাজত্ব দৈর্ঘ্য ঠিক বলিয়া ধরিয়া যে ফল পাওয়া যায়, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক।

চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ ৩১৩ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসারের রাজত্বকাল—২৪ + ২৫ = ৪৯ বছর বাদ দিলে ২৬৪ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে অশোকের রাজ্যলাভ নির্দ্ধারিত হয়। ইহার সহিত ২১৪ যোগ দিলে বুদ্ধের নির্ব্বাণ ৪৭৮ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে নির্দ্দিষ্ট হয়।

একণ স্মরণ করা আবশ্যক যে ৪১ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে বিক্রমাব্দের আরম্ভ ধরিয়া ডাক্তার কার্পেন্টিয়ার অশেষ পরিশ্রম করিয়া ৪৭৭ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দকে বুদ্ধের নির্ব্বাণাব্দ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন (ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী পত্রিকা, ১৯১৪ সাল, ১৭৩ ও পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাসমূহ)। কাজেই ৫৮ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে বিক্রমাব্দের আরম্ভ ধরিলে এই তারিখ ৪৭৮ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দই হয়। বুদ্ধের নির্ব্বাণ কোন বৎসর হইয়াছিল, ইহা লইয়া নানা মুনির নানা মত। সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল মত এই যে, উহা ৫৪৩ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে হইয়াছিল। ঠিক কোন্ বৎসরটিতে নির্ব্বাণ ঘটিয়াছিল, জ্যোতিষিক গণনা করিয়া তাহা বাহির করিবার উপকরণ বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে। কোন্ বার, কোন্ তিথিতে বুদ্ধ জন্মিয়াছিলেন, কোন্ বার, কোন্ তিথিতে, কত বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন ইত্যাদি বৌদ্ধ গ্রন্থে প্রাচীন কাল হইতেই লিপিবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। জ্যোতিষে অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন পরলোকগত দেওয়ান বাহাদুর স্বামীকান্নু পিলাই মহাশয় ১৯১৪ সালেরই ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী পত্রে বিস্তৃত গণনা ও গবেষণামূলক এক প্রবন্ধ লিখিয়া দেখাইয়াছেন যে, একমাত্র ৪৭৮ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে নির্ব্বাণ ধরিলেই জ্যোতিষিক গণনায় বুদ্ধের জীবনের ঘটনাগুলির বার, তিথি ও বয়সের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়। অন্য কোন সালে নির্ব্বাণ ধরিলে এইগুলি আদপেই মিলে না। স্বামী কান্নু পিলাই মহাশয়ের মত অসাধারণ জ্যোতিষীর প্রভূত পরিশ্রমের ফল এই প্রবন্ধটি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টি তেমন ভাবে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই, ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। এই প্রবন্ধে স্বামী কান্নু পিলাই জোর করিয়াই বলিয়াছেন—বুদ্ধের নির্ব্বাণ অন্য কোন বৎসর হইতেই পারে না।

এখন ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। প্রাচীন জৈন সাহিত্য মতে চন্দ্রগুপ্ত ৩১৩ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। পুরাণ মতে তাহা হইলে ২৬৪ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে অশোকের রাজ্য প্রাপ্তি সিদ্ধ হয়। বৌদ্ধ সাহিত্য মতে ইহার ২১৪ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৪৭৮ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে বুদ্ধের নির্ব্বাণ সংঘটিত হইয়াছিল। স্বামী কান্নু পিলাইএর মত প্রবীণ জ্যোতিষী বিশেষ সূক্ষ্ম গণনা করিয়া বলিতেছেন, নির্ব্বাণ একমাত্র এই ৪৭৮ খ্রী: পূ: তে ধরিলেই বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লিখিত বুদ্ধের জীবনের ঘটনার বার, তিথি, নক্ষত্র ও বুদ্ধের বয়সের সামঞ্জস্য হয়। নির্ব্বাণের অন্য যতগুলি বৎসরাঙ্ক প্রচলিত আছে, তাহাদের প্রত্যেকটি বিচার করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে ৪৭৮ ছাড়া অন্য কোন বৎসরই গণনায় মিলে না। এ অবস্থায় শঙ্কা-দুরু-দুরু চিত্তে এই আশা করা কি নিতান্তই অসঙ্গত যে, শতাব্দী কাল ধরিয়া যে সমস্যার মীমাংসা প্রাত্নতাত্ত্বিকগণ খুঁজিয়া আসিতেছেন, অবশেষে তাহার সমাধান মিলিয়াছে? চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণ বৎসর, এবং বুদ্ধের নির্ব্বাণ বৎসরের উপর ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের সমস্ত সন তারিখগুলি নির্ভর করে। কাজেই এই দুই ঘটনার সঠিক সমাধান নির্দ্দেশের গুরুত্ব যে কতখানি, তাহা আর ইতিহাসের পাঠকগণকে বলিয়া দিতে হইবে না। এই দুই ব্যাপার লইয়া যে আজ পর্য্যন্ত কত তর্কবিতর্ক, কত লেখালেখি হইয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। এতদিন পরে এই বহু-বিতর্কিত সমস্যার সমাধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

উপরে যে সামঞ্জস্য দেখাইলাম, তর্কের মুখে যে তাহা উড়াইয়া দেওয়া কঠিন নহে, সেই বিষয়ে আমি অন্ধ নহি। যেমন, দীপবংশ ও মহাবংশ কথিত অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তি এবং বুদ্ধের নির্ব্বাণের মধ্যের ব্যবধান ২১৪ বৎসর গ্রহণ করিতেছি, অথচ ঐ পুস্তকদ্বয়েই প্রদত্ত মৌর্য্য রাজগণের রাজত্বকালের মৈর্য্য গ্রহণ করিতেছি না—ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই সকল তর্ক দ্বারবাণীশগণের জন্য রহিল.—আপাততঃ আমাদের গৃহীত তারিখগুলির বিরুদ্ধে সকলের অপেক্ষা যে গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, তাহারই মাত্র বিচার এ স্থলে করা আবশ্যক।

ঐতিহাসিকগণ জানেন, অশোকের ত্রয়োদশ সংখ্যক গিরিলিপিতে পাঁচজন গ্রীক রাজার নাম উল্লিখিত আছে। ইহারা কে এবং কোথায় কখন রাজত্ব করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত পরিচয়ের জন্য হুল্‌জের Inscriptions of Asoka পুস্তকের ভূমিকার ৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই পুস্তক হইতে এই পাঁচ জন গ্রীক রাজার নাম ও তারিখ সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

সিরিয়ার রাজা এণ্টিয়কস্ (দ্বিতীয়) থিয়স্—২৬১-২৪৬ খ্রী: পূ:।

মিশরের রাজা টলেমি (দ্বিতীয়) ফিলাডেল্‌ফাস্—২৮৫-২৪৭ খ্রী: পূ:।

মেসিডোনিয়ার রাজা এণ্টিগনস্ গোনটস্—২৭৬-২৩৯ খ্রী: পূ:।

সাইরিন দেশের রাজা মগস্—আনুমানিক ৩০০—আনুমানিক ২৫০ খ্রী: পূ:।

কোরিন্থ দেশের রাজা এলেকজেণ্ডার অস্থ—২৫২—অস্থ—২৪৪ খ্রী: পূ:।

আমাদের গণনা অনুসারে অশোক ২৬৪ খ্রী:পূ:তে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন এবং ২৬০ খ্রী: পূ:তে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। অশোকের ত্রয়োদশ গিরিলিপি অশোকের ত্রয়োদশ অভিষেক সংবৎসরের পূর্ব্বে হইতে পারে না, ইহা ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করেন। কাজেই ত্রয়োদশ গিরিলিপির তারিখ ২৫৮—২৪৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ। হুল্‌জ ধরিয়া লইয়াছেন যে, ভারতবর্ষের সম্রাট অশোক তদীয় ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে যে বৎসর গ্রীকরাজাগণের উল্লেখ করেন, সে বৎসর ঐ পাঁচজন রাজা সকলেই জীবিত ছিলেন। এই অনুমান সত্য নাও হইতে পারে। সেই সুদূর অতীতে এক দেশ হইতে আর এক দেশে খবর পৌঁছিতে অনেক সময় লাগিত। ভারতের পশ্চিম উত্তর প্রান্তের দুর্গম পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশগুলি অতিক্রম করিয়া মিশর ও সিরিয়া ইত্যাদি দেশ হইতে আসিয়া খবর ভারতে পৌঁছিতে দীর্ঘকাল লাগিবারই কথা। কাজেই অশোক ভারতে যখন কোন গ্রীক রাজার উল্লেখ করিতেছেন, তাহার দুই এক বৎসর আগেই হয়ত ঐ রাজা মরিয়া গিয়াছেন, এমন হওয়াও অসম্ভব ছিল না। তবু পূর্ব্বের তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে যে ২৫৮—২৪৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে অশোক যখন পাঁচজন গ্রীকরাজার উল্লেখ করেন, তখন তাহারা সকলেই জীবিত ছিল,—কেবল সাইরিণের মগস্ ছাড়া। হুল্‌জ ইহার রাজত্ব সমাপ্তি বৎসর আনুমানিক ২৫০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া লিখিয়াছেন। আনুমানিক ২৫০

আসলে ২৪৮—২৪৭ ও হইতে পারে। নগলের রাজত্ব সমাপ্তি বৎসর নির্ভুলরূপে নির্দ্ধারিত করিবার কোন উপকরণ আমার হাতে নাই। যদি এই বৎসর ২৫০ খ্রীঃ পূঃ বলিয়া নির্দ্ধারিতও হয়, তবু সহজ বুদ্ধিতে ইহাই বুঝা যায় যে, সাইরিনে নগলের মৃত্যুর দুই বৎসর পরেও ভারতে তাহার উল্লেখ অসম্ভব নহে, হয়ত অতদিনেও ভারতে তাহার মৃত্যু সংবাদ আসিয়া পৌঁছায় নাই।

এই প্রবন্ধের বিচারের ফলে যে তারিখগুলি স্থিরীকৃত হইল, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

৫৮৬ খ্রীঃ পূঃ—বিম্বিসারের মৃত্যু এবং অজাতশত্রুর রাজ্যপ্রাপ্তি।

৫৮৪ খ্রীঃ পূঃ—জৈনদের আজীবিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গোশালের মৃত্যু।

৪৭৮ খ্রীঃ পূঃ—বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভ।

৪৬৮ খ্রীঃ পূঃ—মহাবীরের কৈবল্য লাভ।

অনু-৩১৭ খ্রীঃ পূঃ—চন্দ্রগুপ্তের নেতৃত্বে পঞ্জাবে গ্রীক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়গণের অভ্যুত্থান ও শেষ গ্রীক-ক্ষত্রপ ইউডেমসের ভারতবর্ষ ত্যাগ।

৩১৩ খ্রীঃ পূঃ—চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের অভিষেক।

২৮৯ খ্রীঃ পূঃ—বিন্দুসারের অভিষেক।

২৬৪ খ্রীঃ পূঃ—অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তি।

২৬০ খ্রীঃ পূঃ—অশোকের অভিষেক।

বর্ষা-তৃপ্ত

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

ভেসে যাক্ ভেসে যাক্, ধরণী ডুবিয়া যাক্ উদ্দাম প্লাবনে ;
অজস্র ধারার ধোঁয়া ঢেকে দিক, ঢেকে দিক ভুবনে গগনে।
শুষ্ক তৃপ্ত নত দেহে এ পৃথিবী বরষার করুক গ্রহণ ;
দীর্ঘ মৃত্তিকার বুকে তৃণকুল জলস্রোতে লভুক জীবন।
ধারার শায়ক-বেগ মৃত্তিকার স্তরে স্তরে করুক প্রবেশ ;
প্রাণে মনে দেহে ধরা পাক আজি অবিরাম আনন্দ-আবেশ।
তরুদল তৃপ্ত হোক, তৃপ্ত হোক ব্যথাতুর জীব আর নর ;
দিশি দিশি তৃপ্ত কর হে পবন তৃপ্তিময় সজল মলয়।
বরষা নেমেছে ঘোর উতরোল উদ্দাম উচ্ছল ;—
পথে পথে জলস্রোত, মাঠে মাঠে অবারিত জল-কলকল।
ডাকে মেঘ গুরু গুরু একখানি সীমাহীন সুবিশাল মেঘ ;
ধূসর একক মেঘে এ কি প্রাণ, এ কি শক্তি, একি রে আবেগ !
বৃক্ষ-সাথে চক্ষু বুজি' কাক করে বরষা ভুবন ;
পত্রে পত্রে দোলা দিয়ে শুকরা প্রকাশে হরষণ।
আমার নয়ন দু'টি ছুটাল জলের ধোঁয়া, এ কালো নীরদ ;
মেঘের হরষ-ভাষা ভরে বুক ছুটাইয়া শ্রবণের পথ।
বরষণ-হরষণে নিমগ্ন আমি আজ কায়ে মনে প্রাণে ;
বড় তৃপ্তি, বড় শান্তি, বড় সুখ আজিকার এ বরষা আনে !

জীবন ও মরণ

শিল্পী—শ্রীযুক্তা হাসিরাশি দেবী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

দামোদরের বিপাত্ত

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দামোদরের ভয়

বাসায় ফিরিয়া চারজনে স্নান ও আহারাদি শেষ করিয়া নিজেদের ঘরে গিয়া বিশ্রাম মানসে শয়ন করিল। বেলা প্রায় ১৷৷০টা; সুতরাং এ সময় বাহিরে যাইতে কাহারও ইচ্ছা হইল না। শুইয়া শচীন বলিল, "দামোদরবাবু, আজ 'ত কিছুই হো'ল না। আজ আবার বিকালে খানকতক সংবাদপত্র কিনে দেখ্‌তে হবে। কিন্তু এবার যদি কোথাও গিয়ে অমন কিছু না দেখে-শুনে চলে আসেন, তবে বস্, আর আপনার সঙ্গে আমাদের পোষাবে না।"

দামোদর উত্তরে কহিল, "তা' আপ্‌নি 'ত গেলেই পারেন কাল, ব্যাপার দেখে আস্‌বেন।"

শচীন সখেদে বলিল, "আর কৈ যাওয়া হো'ল। নগেনের জন্যে আমার কিছু কর্ত্তার যো' আছে? ও আমার শনি। পণ্ডিতজি শুনে ঠিকই বলেছে।"

নগেন উত্তরে কহিল, "তো'র সবেতেই ন্যাঠামো কর্ত্তে হবে না। কিসের ন্যাঠামো? তুই 'রবিবাবুর আধ্যাত্মিক আকাশে'র কিছু বুঝিস্?"

শচীন বলিল, "আমি বুঝি না, তুই বুঝিস্। হয়েছে 'ত?"

রমেশ কোন কথায় কান দিতেছিল না। সে চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল। এখন হঠাৎ চোখ খুলিয়া দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রলোকটিকে দেখেছেন? কি রকম দেখ্‌তে?"

দামোদর বর্ণনা করিল। রমেশ শুনিল; তার পর জিজ্ঞাসা করিল, "বেশ্ সৌম্যমূর্ত্তি, নয়? কপালের শির উঁচু? ডান দিকে একটু কাটা দাগ? ঠিক ভুরুর নীচে?"

দামোদর বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল, "হাঁ, ঠিক তাই। আপনি কি দেখেছেন না কি?"

রমেশ উত্তর দিল না। শচীন জিজ্ঞাসা করিল, "রমেশদা, রমেশ, কি ব্যাপারটা তোমার শুনি?"

রমেশ বলিল, "শচী, বকিস্ নি। শুয়ে থাক্। আমার ঘুম পাচ্ছে, তুই বাজে বকে মাথা ধরাস্ নি।"

নগেন সখেদে বলিল, "দামোদরবাবু, আমার ভাগ্যের ঘটা দেখ্‌লেন? আচ্ছা, পণ্ডিতজিকে কি বিশ্বাস হয়?"

দামোদর উত্তর করিল, "অবিশ্বাসের কারণ কিছু দেখ্‌লুম না। অবশ্য এ রকম লোক খুব চতুর হয়; তা'দের হাত গুণ্‌বার ক্ষমতা না থাক্‌লেও লোকের মন বুঝ্‌বার ক্ষমতা যথেষ্ট থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এ লোকটার মনে হয় কিছু কিছু বিদ্যা—এই সামুদ্রিক বিদ্যা অন্তত আছে।"

নগেন বলিল, "তবেই 'ত বিপদ বাড়ালেন। কিন্তু গুণে 'ত ঠিক বলেছে পিতৃধন পেয়েছি, ও তা'ও শেষ ক'রে এনেছি। এটা 'ত আর ফাঁকা কথা নয়। না, এ দেখ্‌ছি ভাবালে। ছিলুম ভাল, শচে'র পাল্লায় পড়ে আজ দুর্ভাবনা জুটালুম। এখন দিনরাত কেবল মনে হবে ভাগ্য বড়ই দুরভিসন্ধি কর্‌ছে। এর ঔষধ কি, দামোদরবাবু? আপনি কি সত্যি রাজা হবেন?"

শচীন বলিল, "আমি অর্দ্ধেক জমিদার হবো।"

নগেন বলিল, "শচী, তো'র 'ত ভাবনা নেই; টাকার গদীতে বসে থাক্‌বি, রাজকন্যে বিয়ে করবি, আমাকে তো'র নায়েব, গোমস্তা যা' হয় রাখিস্। আমি চুরি কোর্ব্ব আর চাকরি কোর্ব্ব, বুঝেছিস্?"

শচীন গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন দিনরাত গাল দিচ্ছিস্, ধমক্ দিচ্ছিস্, তখন খোসামোদ কোর্‌বি 'ত?"

নগেন ভাবিয়া বলিল, "চেষ্টা কো'রে দেখবো। তা'ছাড়া দামোদরবাবু রাজা হলে আমার কোন্ না একটা সেনাপতি, কি মন্ত্রী, করে দেবেন? যা' মেহনত ওঁর

জন্যে কোরছি? উঃ! আজ কুকুরটা আর একটু হলেই কামড়ে ছিল আর কি। জানিস্ শচী? ভাগ্যিস্ মনে পড়ে গেল, কুকুরকে দেখে ভয় খেতে নেই। অমনি সাহস করে তা'কে তাড়া দিলুম, "হুট্! হাট্!" বস্, সরে গেল। কিন্তু বড় ফাঁড়া গেছে।"

শচীন মন্তব্য দিল, "ব্যাকরণ শুন্‌লে কুকুর কেন ভূতও পালায়। তো'র শান্তিপুরে বাড়ী কি না; ভয়ের ঠেলায় সংস্কৃত বেরিয়েছে।"

শুইয়া শুইয়া কোন রূপে চারিটা বাজিল। আর সময় কাটিতে চাহে না। দামোদর উঠিয়া বসিল। এখনও দু'তিন ঘণ্টা দেরী করিয়া তবে নারাণবাবুর বাসায় যাওয়া। এতক্ষণ কি ক'রে? এইখানে শুইয়া কত আর শচীন ও নগেনের বিবাদ বিতর্ক শুনিবে? সে উঠিল। ভাবিল, একবার সুরেনবাবুর চা-এর দোকানে যাইবে। সে ভদ্রলোকের সংবাদ নেওয়া ভাল। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া শচীন জিজ্ঞাসা করিল, "কি? মাঠে যাবেন না কি? হকি দেখ্‌তে? তা'হলে চলুন আমিও যাই।"

দামোদর বলিল, "না। আমি একটি লোকের সহিত দেখা কো'রে আস্‌বো।"

"কোন্ দিকে?"

"এই কাছেই। আপনি কোথায় যাবেন?"

শচীন বলিল, "আমার 'ত সর্ব্বত্র যাবার ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু সঙ্গী নেই। এ দু'জনে নড়্‌তে চায় না। আপনি 'ত কোথাও যাচ্ছেন?"

দামোদর কহিল, "হাঁ; আমার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সন্ধ্যে বেলায় দেখা কর্ত্তে হবে।"

"তবে আর কি হ'বে?" বলিয়া শচীন আবার শুইল।

দামোদর বাহির হইয়া গেল, নগেনের কাপড় জামা পরিয়াই। ভাবিল আজ ফিরিবার সময় একখানা ধুতি ও একটা জামা কিনিবে—ধোপাই কিনিবে। পকেটে হাত দিয়া দেখিল আর সাত টাকা আর দু'আনা আছে মাত্র। তিন টাকা জামা কাপড় কিনিলেও চার টাকা হাতে থাকিবে। তাহার 'ত আর বিশেষ কোনও খরচ নাই।

সুরেনবাবুর দোকানে গিয়া দেখিল, সুরেনবাবু হিসাবের খাতা দেখিতেছেন। তাঁ'র উনান ধরান হয় নাই; কেট্‌লির জলও গরম হয় নাই; খরিদ্দার 'ত নাইই। দামোদরকে দেখিয়া সুরেনবাবু বলিলেন, "দামোদরবাবু? এসেছেন? আজ আর চা' নেই। আজ চা' দিতে পার্‌বো না। কয়লা নেই; চা' নেই; চিনিও নেই। পয়সা 'ত নেই-ই।"

দামোদরের মন অত্যন্ত কাতর হইল। বলিল, "সুরেনবাবু, কি করি বলুন। আপনাকে সাহায্য কর্ত্তে আমার খুবই ইচ্ছা; কিন্তু আমি নিরুপায়। আমার নিজেরই অবস্থা অতি সঙ্গীন।"

সুরেনবাবু কহিলেন, "না, না, দামোদরবাবু; সাহায্য করার উপায় আর নেই। কি ক'রে করবেন? আপনি এক দিন কি এক মাসও সাহায্য করে কি কর্ব্বেন? তা'র পর? আমাকে কি চিরকাল খাওয়াতে, সাহায্য কর্ত্তে কেউ পার্‌বে? তবে? এই দেখুন হিসাবের খাতা দেখ্‌ছি। আগে কত লোক চা' খেয়ে গিয়ে দাম দের নি; এক একজনের কাছে ৫৲, ৭৲, ১০৲, ১৫৲, এই রকম করে প্রায় ২০০৲ টাকা পড়ে গেছে; কেউ তা'র এক পয়সা দেয় নি। কিন্তু কি কোর্‌বো? আদায় কর্ত্তে যেতে পার্‌বো না। অথচ আমার কাছে আসে পাওনাদার, আদায় কর্ত্তে ঝুলোঝুলি করে। এই 'ত হয়েছে বিপদ্। তাই খাতা খুলে মনকে প্রবোধ দিচ্ছি, যে আমিও পাওনাদার এককালে ছিলুম।"

দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "দোকানের কি হ'বে তা'হ'লে, সুরেনবাবু? উঠিয়ে দেবেন?"

সুরেনবাবু বলিলেন, "আমি উঠাবো না, ঐ আপনি উঠ্‌লো। না টিক্‌লে আর কি করা যাবে?"

দামোদর আর কোনও প্রশ্ন করিতে সাহসী হইল না। কি জানি আঘাত যদি অজ্ঞাতসারেও দেয়, তাহাতে ব্যথা ত কম বাজে না। সে তবু জিজ্ঞাসা করিল, "সুরেনবাবু, অন্য কোনও ব্যবসা কর্লে হয় না? আসুন না, আমরা ভেবে দেখি।"

সুরেনবাবু ম্লানভাবে বলিলেন, "দামোদরবাবু, ঘাটের কিনারায় বসে আর কি কিছু কর্ত্তে পারি? চাকরি ছেড়ে এই দোকান খুলেছিলুম, ১৫ বৎসর এই করেছি। আর কি এখন কিছু কর্ত্তে পারি?"

দামোদর শুনিল। কিন্তু কিরূপে সাহায্য করিবে সে এই লোকটির তাহা বুঝিতে পারিল না। সে রাস্তার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সুরেনবাবু বলিতে লাগিলেন, "ঘরে স্ত্রী রুগ্না, বয়স্থা ; ৪টি কন্যা ; ২টির তবু বিবাহ দিয়াছি, তা'রা শ্বশুর-গৃহে। মেয়ে ৪টিও বয়স্থা। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে ; একটি ছোট ছেলে, তা'র এখন লেখাপড়া বাকী ; একটি অনাথ ভ্রাতুষ্পুত্র, সেও পড়াশুনা করিতেছে ; একটি বিধবা ভগ্নী ; এতগুলির আহার সংস্থান কি মুখের কথা, দামোদরবাবু ?"

দামোদর বলিল, "তা বটে !"

সুরেনবাবু কহিলেন, "তা বটে নয়। আপনি ছেলে-মানুষ, জানেন না। গরীব যা'রা তা'দের অভাব যে কি ও কতমুখী তা' বুঝ্‌তে পার্বেন না। বিশেষত এই ভদ্র-ঘরের গরীব যারা। তা'রা না পারে খাট্‌তে, না পারে এই সব মুটে মজুরদের মত নির্ভাবনা হো'তে। তা'দের বাঁচাই বিড়ম্বনা।"

দামোদর কহিল, "আপনি দোকান তুল্‌বেন না, সুরেনবাবু। আমি দেখি, আমাদের মেসে বলে আপনার ধদ্দের জোগাড় ক'রে দিবার চেষ্টা করি। আরও দু'একটা মেসে না হয় বলে দেব।"

সুরেনবাবু উত্তর দিলেন, "ধদ্দের না হয় আপনি জোগাড় ক'রে দিলেন, দয়া করে ছেলেরা না হয় এলো, কিন্তু আমার যে একটা পয়সাও নেই। আমি চালাবো কি ক'রে ?"

দামোদর ভাবিল শচীন, রমেশ ও নগেনকে বলিয়া একটা উপায় করা যাইতে পারে। দরকার হয় চারুবাবুকেও বলিবে। কিছু টাকা চাই ; তাহার কাছে সাত টাকা আছে, সে না হয় তাই দিবে। জামা কাপড় দুদিন বাদেই কিন্‌বে, তার আর কি ? এখন ত' নগেনের জামা কাপড়েই চল্‌ছে। সে সুরেনবাবুকে আশ্বাস দিল আগামী কাল প্রভাতেই সে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবে। আপাতত সে সাত টাকা না হয় সুরেনবাবুকে ধার দিচ্ছে। তাহাতে সব প্রয়োজনীয় কিছু কিছু ক্রয় করিয়া কাল ব্যবস্থা করেন ; পরে দেখা যাইবে। তা' ছাড়া অন্য উপায় সে ত' খুঁজিয়া পায় না।

সুরেনবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চোখে জল আসিল। দামোদর পকেট হইতে সাতটি টাকা বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, "এই নিন্। আমি এখন যাই ; কাল সকালে আস্‌বো।" সে আর দাঁড়াইল না।

রাস্তায় নামিয়া সে নারাণবাবুর বাড়ীর দিকে চলিল। ৪৪০টা প্রায় বাজিতে চলিয়াছে ; তখনও রৌদ্র মরে নাই। সে নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে পশ্চিম দিকে, হ্যারিসন রোড ধরিয়াই অগ্রসর হইল। আজ নারাণবাবুর বাড়ীতে পৌঁছিতে তাহার বিশেষ দেরী হইল না। দিনের পরিষ্কার আলোকে সে বাড়ীখানি ভাল করিয়া দেখিয়া লইল ; সত্যই ইহা স্মৃতি বিশেষ ; ইহাকে বাড়ী বলা চলে না। গলিটি যেমন আবর্জ্জনাপূর্ণ, তেমনি দুর্গন্ধময়। ১২।১৩ একই বাড়ীর নম্বর। ১২তে কাহারা থাকে তাহার জানিবার একটু কৌতূহল হইল। সে তাহার বন্ধ দরজার ভিতর দিয়াই যেন উহার অধিবাসীর সন্ধান করিতে চেষ্টা করিল। দু'টি বাড়ীর দরজাও একই রকমের। বড় বটে ; কিন্তু অনেকটা জমির নীচে বলিয়া অত্যন্ত ছোট ও অস্বাভাবিক দেখাইতেছে। জানলার পরিবর্ত্তে শুধু ছোট ছোট ঘুলঘুলি দেখিল। একেবারে সেকেলে ; বাড়ীর ভিতর আলোক ও হাওয়ার প্রবেশ নিবারিত। নারাণবাবু নিশ্চয়ই কৃপণ, হাড় কৃপণ ; যাহার কোনও সম্পত্তি আছে সে কি এই বাড়ীতে বাস করিতে পারে ? দামোদর কখনও এই বাড়ীতে থাকিবে না ; ইহার অপেক্ষা গাছতলা ভাল।

দামোদর ইতস্তত করিয়া দরজায় শিকল নাড়িল। সে জানিত যে নারাণবাবুর এখন থাকার কোনও সম্ভাবনা নাই ; তবু সে শিকল নাড়িল। ভাবিল, যখন ইহাই তাহার ভবিষ্যতের পীঠস্থান হইবে, তখন তাহার আর লজ্জা কি ?

পাঁচ সাত মিনিট কাটিয়া গেল ; কোনও উত্তর আসিল না। সে আবার আর একটু জোরে শিকল নাড়িল। এইবার ভিতর হইতে কাহার পদশব্দ শুনিল। তা'র পর দরজা খুলিয়া গেল। দামোদর দেখিল—মানদা। সে জিজ্ঞাসা করিল, "নারাণবাবু ? নারাণবাবু কি আছেন ? আমি সকালে আস্‌তে পারি নি বিশেষ কারণে, এবেলায় তাই এসেছি।"

মানদা তাহার স্থির আয়ত চোখে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখের কোনও রূপ ভাব-পরিবর্ত্তন দেখা গেল না।

কিন্তু সে কোনও কথা কহিল না। দামোদর পুনরায় প্রশ্ন করিল, "নারাণবাবু কখন ফিরবেন?" এবারও কোনও উত্তর আসিল না। দামোদরের কেমন ভয় হইল। এ কি মূক না কি? একেবারে কথা কহিতে পারে না? সে আরও একটু নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার—ইএ—আপনার বাবা কখন আসবেন? আমি—" তাহার কথা শেষ করিতে সে পারিল না। সে কি আর বলিবে বুঝিতে পারিল না। এমন অসময়ে আসিয়া পড়ার জন্য সে নিজের উপর একটু বিরক্ত হইল।

মানদা এইবার কথা বলিল; তাহার গলার স্বর তাহার চাহনির মত একঘেয়ে, সোজা, সটান; তাহাতে কোন রকম উচ্চাবচতা, কড়িকোমল নাই। বলিল, "বাবা এখানে নেই।" একটু আশ্বস্ত হইয়া দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গেছেন?"

মানদা জানাইল, সে জানে না; বাড়ীতে কেহ জানে না। কবে যে ফিরিবে তাহাও কেহ জানে না।

দামোদর নিরুৎসাহ হইল। একটু ভাবিয়া বলিল, "এখানে তুমি আছ, আর কে আছে? তোমাদের একলা থাকতে ভয় করে না? এ পাশের বাড়ীতে কে আছে?"

মানদা তাহার জবাব না দিয়া তাহাকে ভিতরে আসিতে ইঙ্গিত করিল। দামোদর ভিতরে যাইতে একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "ভিতরে কি দরকার আর যাবো? তোমার বাপ নেই। আমি না হয় তিন-চার দিন পরে আবার আসবো।"

মানদা দাঁড়াইয়া রহিল। দামোদর চলিয়া যাইবার জন্য ফিরিয়া, কি ভাবিয়া পিছনে চাহিয়া দেখিল যে মানদা সেইরূপই তাহার দিকে অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাকাইয়া দাঁড়াইয়াই রহিয়াছে। সে পুনরায় কহিল, "তুমি যাও। আমি আজ চলি।" কিন্তু মানদা কোনও চাঞ্চল্য দেখাইল না। দামোদর আবার অগ্রসর হইল। দু'চার পা' যাইয়া পিছনে তাকাইয়া দেখিল মানদা সেইরূপ দাঁড়াইয়া আছে। সে দাঁড়াইল। কি ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিল না। মানদা কি তাহাকে কিছু বলিতে চাহে? উহার ভাবে 'ত তাহাই অনুমান হইতেছে। সে প্রত্যাবর্তন করিল; মানদার কাছে গিয়া বলিল, "আমায় কিছু বলতে চাও।"

মানদা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

"তবে চল" বলিয়া দামোদর কম্পিত হৃদয়ে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া মানদার পিছনে পিছনে চলিল।

মানদা তাহাকে পথ দেখাইয়া সেই গত রাত্রের উঠান পার হইয়া এক কোণে এক সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। দামোদরের একবার মনে হইল, উপরে উঠা কি ঠিক হইবে? মানদা তাহাকে উপরে কোথায় লইয়া যাইবে? সে ভাবিল, মানদাও নিশ্চয়ই নারাণবাবুর ও তাহার কথোপকথন শুনিয়াছে; তাই সে দামোদরকে দেখিয়া কোনও সঙ্কোচ করিতেছে না। তাহার সহিত ত' অদূর ভবিষ্যতেই একটা প্রীতির বন্ধন হইবে; তখন আর কি? দামোদর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে উঠিল। দ্বিতল বলিতে যাহা তাহা দেখিয়া দামোদর স্তম্ভিত হইল, ইহাকে গুদাম বলিলেও হয়। ঘর কোথায় সে খুঁজিয়া পাইল না। যেন এক দিকে একটা প্রকাণ্ড গুদাম, অন্য দিকে একটা ছোট গুদাম-ঘর—আর সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই একটু ছাত—তাহাতে পাঁচ সাতজন লোক দাঁড়াইতে পারে। মানদা দামোদরকে সঙ্গে করিয়া সেই বড় গুদামের ভিতর দিয়া ছোট গুদামের দিকে অগ্রসর হইল। দামোদর তাহার সহিত দু'একটা কথা কহিতে পারিলে হয় 'ত অতটা অস্বস্তি অনুভব করিত না। কিন্তু মানদার মুখ দিয়া একটিও কথা বাহির হইল না। সে সেই ছোট গুদামের ভেজান দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া, তাহার দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইল। দামোদর নিকটে আসিতে, সে তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিয়া ভিতরের অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।

দামোদর দরজায় দাঁড়াইয়া ভিতরে চাহিয়া দেখিল, ভয়ানক অন্ধকার; কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। একে এই আলোকবিহীন কক্ষ; তাহার উপর সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সে ভিতরে প্রবেশ করিতে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কেমন একটা অদৃশ্য ভয়ের স্পর্শে ও অনুভূতিতে কণ্টকিত হইল। সে অগ্রসর হইতে পারিল না। অস্ফুটস্বরে ডাকিল, "মানদা!"

কোনও উত্তর আসিল না। তাহার পরিবর্ত্তে ঘরের যেন সুদূর কোণ হইতে একটা অব্যক্তব্য গোঙানি, কাতরানির শব্দ অস্বাভাবিক হইয়া তাহার কাণে

আসিল। দামোদরের চুল পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া উঠিল। সে আবার কোনও রকমে গলা হইতে বাহির করিল, "মানদা!"

আবার গোঁয়ানির শব্দ,—ভাঙ্গা, ভারী, ছিন্ন শব্দ—সে শুনিতে পাইল। শব্দ যেন দামোদরকে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিল; সে পড়িতে পড়িতে কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইল। চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, জনপ্রাণীও নাই। পার্শ্বের বাড়ীতে 'ত কাহারও অস্তিত্বের লক্ষণ নাই! এ সব কি কাণ্ড! ঘর হইতে গোঁয়ানির সেই শব্দ রহিয়া রহিয়া, বিচ্ছিন্ন প্রবাহে, বিভীষিকার খণ্ডিত অনুভূতির মত, তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে লাগিল। দামোদর আর দাঁড়াইল না। সে দ্রুতপদে সিঁড়ি অবতরণ করিয়া, উঠান পার হইয়া, একেবারে একদমে সদর রাস্তায় গিয়া পড়িল। ভয়ে তাহার গলার ভিতর পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়াছিল; সে অত্যন্ত পিপাসা অনুভব করিল। নিকটে একজন পাণওয়ালার দোকানে দুই পয়সা দিয়া এক ভাঁড় সরবৎ খাইয়া তবে যেন একটু প্রকৃতিস্থ হইল; রাস্তার আলোক, মানুষ, হাওয়ায় তাহার মন ক্রমশঃ সুস্থির হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

"যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা আসিবেই"

ভয়ে, উত্তেজনায়, পরিশ্রান্তিতে অবসন্ন দেহ মনে দামোদর মেসে ফিরিল। তখন সকলেরই প্রায় আহারাদি সমাপ্ত হইয়াছে। নিধি তাহাকে দেখিয়া বলিল, "বাবু, এত রাতে এলেন? ৯টা থেকে ১০টার ভিতর সব খাওয়া চুকে যায়! আমরা ভাব্‌লুম আপনি বাহিরে খেয়ে আস্‌ছেন। চারুবাবু আপনাকে কত খুঁজ্‌ছিলেন।"

দামোদর কহিল, "নিধি, আমি আজ আর খাব না। খেয়েই এসেছি। চারুবাবু কেন খুঁজ্‌ছিলেন? কোথায় তিনি?"

নিধি জানাইল চারুবাবু শুইয়া পড়িয়াছেন। কে একজন লোক দামোদরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল; বোধ হয় সেই জন্যই।

দামোদর বুঝিতে পারিল না, কে। তাহার সন্ধানে কে আসিবে? সুরেনবাবু বোধ হয়। সে ভাবিতে ভাবিতে উপরে উঠিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, নগেন ও শচীন দু'জনে দু'খানা চেয়ারে গম্ভীর ও নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া আছে। রমেশ নাই। দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "রমেশবাবু কোথায়? তাঁকে দেখ্‌ছি না।"

নগেন তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিয়া আবার মুখ ফিরাইল। শচীনও তাহাকে দেখিয়া লইল। কেহ কথা কহিল না।

দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, শচীনবাবু? আমাকে বলুন। রমেশবাবু কোথায়?"

শচীন নগেনের দিকে চাহিল। নগেনও শচীনের দিকে চাহিল। তা'র পর নগেন উঠিয়া তাহার বিছানায় বসিল; হাতের কাছের আয়না লইয়া তাহাতে মুখভঙ্গী করিয়া, তাহার ছাঁটা গোঁফ নাড়িয়া দেখিয়া লইল। তা'র পর চুলের ভিতর হাত দিয়া চুলগুলিকে অবিন্যস্ত করিতে করিতে বলিল, "দামোদরবাবু, আপনার শ্বশুর নিতাই ঘোষ এসেছিল। শালা রমাই ঘোষ এসেছিল। আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে বোধ হয়।"

দামোদরের মুখ শুকাইল। সে প্রশ্নপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া রহিল।

শচীন বলিল, "এসেছিল। এসে এই ঘরে এই দুই চেয়ারে বসে ছিল।"

দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "কখন?"

নগেন বলিল, "তা' কি জানি? আমরা সন্ধ্যেবেলায় বেড়াতে গিছ্‌লুম। রমেশ কেবল যায় নি; বেড়িয়ে এসে দেখ্‌লুম,—তখন ৮।৯টা ৯টা হবে, দু'জনে এখানে বসে। রমেশ একেবারে অন্তর্হিত। সম্ভব আপনার শ্বশুরের ভয়েই।"

দামোদর প্রশ্ন করিল, "তা'র পর?"

শচীন বলিল, "আমরা পরিচয় নিলুম। শ্বশুরমশায় বল্লেন, চারুবাবু এখানে তাঁ'কে বস্‌তে বলে দিয়েছেন। তাই তিনি বসে আছেন। নগেন তাঁহাকে বলিল, বেশ্, তবে বসে থাকুন্। আমরা যাই। তা'তে আপনার শ্বশুর নিতাই ঘোষ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। হাঁ, শ্বশুর বটে। দেখ্‌লে চক্ষু জুড়ায়। আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হ'য়েছে।"

নগেন বলিল, "দেখ, শচী, তুই সব কথায় মাঝে কথা

বলিস্ নি।" সে আয়না রাখিয়া দিল। তার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ভয় নেই, দামোদর বাবু, সে নিতাই ঘোষ আর আস্‌বে না। তা'কে যে ঠিকানা দিয়েছি, এখন তা'ই খুঁজে বার করুক।"

শচীন কহিল, "নগেন, সবটা বল দামোদর বাবুকে।"

নগেন বলিল, "জানেন, দামোদর বাবু, নিতাই ঘোষ আমাকে কি না বলে, দামোদরকে এখানে রেখেছ? আমি জবাব দিই, রেখেছিলুম; কিন্তু রাখ্‌তে পার্‌লুম না। তোমার ভয়ে সে দেশান্তরী হয়েছে। আজ বেলা তিনটার গাড়িতে সে পেশোয়ার গেছে। তা'কে রাখ্‌তে পার্‌লুম না। নিতাই ঘোষ পেশোয়ারের নাম বাপের জন্মে শোনে নি। জিজ্ঞাসা কর্লে সে দেশ কোথায়? আমি তা'কে টাইমটেবল দেখালুম—টাইমটেবলের ছবি; কোথায় পেশোয়ার সে দেখে নিলে। তা'র পর কট্‌মট্ করে চেয়ে জিজ্ঞাসা কর্লে, সত্যি গেছে? আমি চটে গেলুম। বল্‌লুম, গিয়েছে ত' দেখেছি; ট্রেণেও উঠেছে; তা'র কি আর আস্‌বার যো' রেখেছ তুমি? নিতাই ঘোষ তখন পুত্রের দিকে চাহিয়া দু'জনে কি কথা কহিল; তা'র পর উঠিয়া বলিল, আচ্ছা; আমি ষ্টেশনে খোঁজ নোব্‌ছি। আমি বল্‌লুম, এখনি। হাওড়া ষ্টেশনে নিতাই ঘোষ খোঁজ কর্চ্চে? করুক। সে এখন ষ্টেশনে গেছে।"

দামোদর ম্লান মুখে কহিল, "সে আবার আস্‌বে, নগেনবাবু। আজ রাত্রে না আসে ত কাল সকালে নিশ্চয়ই আস্‌বে। তাই ত কি করা যায়?"

শচীন উত্তর করিল, "কিছু ভাব্‌বেন না। সে কাল ঠিক করে তা'কে আর একটা কোথাও পাঠালেই হ'বে। রমেশটা যে কেরার; সে থাক্‌লে এমন ঠিকানায় পাঠাতো নিতাই ঘোষকে যে ফিরতে হোত না। এ কি নগেনের কাজ?"

এমন সময় সিঁড়িতে জুতার আওয়াজ হইল। কাহারা উপরে উঠিতেছে; নগেন বলিল, "শচী দেখ্‌ ত!"

শচী দরজা দিয়া উঁকি মারিয়া কহিল, "শ্বশুরমশাই।"

দামোদর ভয়ে বিমূঢ় হইল। নগেন বলিল, "দামোদর বাবু, আমার তক্তপোষের নীচে শিগ্‌গির! শীগ্‌গির!"

শচীন দামোদরকে টানিয়া নগেনের তক্তপোষের নীচে ঠেলিয়া বেশ করিয়া ঢুকাইয়া দিল। নগেন বিছানায় অর্দ্ধশায়িত হইয়া একটা সিগারেট ধরাইল; শচীনকে বলিল, "তুই গলা ছেড়ে গান ধর্—আর এই তক্তপোষ বাজা। জোরে বাজাবি। আমি এই বইখানা বাজাই।"

শচীন গান ধরিল, "বি-ই-র হ আঙনে পু-উ-ড়ে—"

তাহার গান এইখানে পৌঁছিতেই, নিতাই ঘোষ ও তাহার পশ্চাতে রমাই ঘোষ প্রবেশ করিল। নগেন ও শচীন কেহই কথা কহিল না—গান ও বাজনাতেই প্রমত্ত রহিল।

"—পু-উ-ড়ে দেহ হোল সারা-আ—"

বি-ই-রহ-আঙ-নে!—"

নিতাই ঘোষ বলিল, "দামোদর এসেছে?"

নগেন একমুখ ধুঁয়া ছাড়িয়া কাসিতে কাসিতে বলিল, "কে? ও আপনি আবার? কি হো'ল? হাওড়াতে খোঁজ পেলেন? নিশ্চয়ই খোঁজ কর্ত্তে পারেন নি। সে কি আপনার কাজ? দেখে শুনে ভড়্‌কে গেছেন বুঝি?" নগেন হাসিয়া উঠিল।

শচীনও হাসিল, "ভড়্‌কে গেছেন? তা' যাবেন বৈ' কি! হাওড়া ষ্টেশন কি আর আপনাদের দেশের ষ্টেশন! লাইফে দেখেন নি এমন, না? বিল্‌কুল্ ভড়্‌কে গেছেন।"

নিতাই ঘোষ জিজ্ঞাসা করিল, "দামোদর এসেছে? নীচে যে বেহারা বল্লে, এসেছে।"

নগেন উত্তর দিল, "আপনাকে প্রণাম, শ্বশুর মশাই! সরে পড়ুন, দামোদর নেই। আমাকে দিয়ে কাজ হয় ত বলুন। আমি প্রস্তুত আছি।"

শচীন বলিল, "আমিও প্রস্তুত। নাই বা দামোদর গেল? তারী এক দামোদর ঘরে বসে আছেন। আমার চেহারাটা দেখুন ত'? জামাই যদি কর্ত্তে হয়, তবে এমনি। এ জোর করে বল্‌তে পারি।"

নিতাই ঘোষ জিজ্ঞাসা করিল, "সে আসে নি?"

নগেন উত্তর করিল, "বেহারাতে ঠাট্টা করে' আপনাকে বলেছে, শ্বশুরমশাই। বেটা সম্পর্ক বুঝে না, উড়ে কি না। দামোদর এতক্ষণ পেশোয়ার! কেরার! তা'র সঙ্গে আমাদের আর একটি বন্ধুও কেরার! তা'র শ্বশুরবাড়ী কাবুল। দু'জনেই কেরার। আপনি বৃথা কষ্ট কর্ব্বেন

না—বাড়ী যান্। আর আমাদের দু'জনের কা'কেও দিয়ে যদি কাজ চলে, তবে রান্না প্রস্তুত।"

রমাই নিতাই ঘোষকে অনুচ্চস্বরে কি বলিল। নিতাই ঘোষ বাহির হইয়া গেল। শচীন উঠিয়া দেখিল, দু'জনে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া নীচে গিয়া নিধিকে কি জিজ্ঞাসা করিল; তাহার পর ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

নগেন বলিল, "শচীন, নিধেকে ডাক 'ত।"

শচীন নিধিকে ডাকিল। নিধি উপরে আসিতে নগেন বলিল, "এই নিধে; তুই কি চিরকাল বোকা থাক্‌বি? মর্‌বি কি শেষে ঐরকম হাঁদারাম হয়ে? তো'র শ্রাদ্ধও হবে না, বেটা। ঐ দুটো লোক, কি অন্য কেউই দামোদর বাবুর খোঁজে এলেই বল্‌বি, দামোদরবাবু পেশোয়ার গেছে। বুঝ্‌লি? এখন তো'কে কি জিজ্ঞাসা ক'রে গেল?"

নিধি মাথা চুলকাইয়া বলিল, "দামোদর বাবু এসেছে কি না? আমি ঠিক জানি কি না? নিজে দেখেছি কি না? কোন ঘরে তিনি ঢুকেছেন? এই সব।"

শচীন জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কি জবাব দিলি?"

নিধি বলিল অজ্ঞতাবশতঃ সে সব সত্য কথাই বলিয়াছে। সে সেজন্য অনুতপ্ত।

নগেন রাগিয়া বলিল, "হাঁদারাম! নিধি ত' নিধি। খবরদার! এবার এলে বল্‌বি, যে জানিস্ না। বাবুদের খবর তুই জান্‌বি কি ক'রে? কাউকে দামোদরবাবুর নাম করে উপরে উঠতে দিবি না। আমাদের ঘরে তালা দিয়ে রাখবি! বুঝেছিস্?"

নিধি সম্মতি জানাইয়া প্রস্থান করিল।

শচীন দামোদরকে ডাকিল। দামোদর বাহিরে আসিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। মাথার ধুলা ও চুণ লাগিয়া মাথাটা অদ্ভুত হইয়াছে; কাপড়ের খানিকটা হাঁটুর কাছে ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

নগেন বলিল, "আপাততঃ শত্রুপক্ষ রণে ভঙ্গ দিয়াছে, দামোদরবাবু। আপনি নির্ভয় হউন। ভবিষ্যতে পুনরাক্রমণে পুনরায় ব্যবস্থা হইবে। আপাতত বোধ হয় কাঁড়া কাটলো।"

শচীন হাসিতে লাগিল। দামোদরও হাসিল; বলিল, "যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যে কি হবেই?"

নগেন উত্তর দিল, "তা হবে। দামোদরবাবু, এখন কি করণীয়। শুয়েই পড়া যাক্। কি বলেন? রমেশটা আজ এলো না। সে থেকে থেকে এমন কোথায় গায়ের হয়, কে জানে! ভাল সব জ্বালা, বাবু, আমার! শচী! তুই কিছু তা'র খোঁজ জানিস্? সে কোথা যায় জানিস্?"

শচী নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িয়া উত্তর করিল, "না।"

নগেন মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "না! কি জান? তো'র বাপ্ তো'কে ত্যাজ্যপুত্র আর আমাকে পোষ্যপুত্র কোর্‌ত, 'ত ঠিক্ হো'ত, না, দামোদরবাবু?"

দামোদরও নিজের নির্দ্দিষ্ট বিছানায় শুইয়া বলিল, "তা' যখন হয় নি, তখন আর কি করা যাবে, নগেন-বাবু।" শচীন হাসিয়া বলিল, 'বাবাকে লিখে দেখ্ না। তোর যে রূপ—নিতেও পারে।"

নগেন জিজ্ঞাসা করিল, "শচী, এ মাসে কত টাকা নিয়েছিস্?"

শচী মনে মনে হিসাব করিয়া বলিল "১২৫৲।"

"কত হাতে আছে?"

শচী উত্তর দিল, "তা আছে ১০।১২ টাকা। কেন?"

নগেন বলিল, "জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। এখনও মাস কাবারের ১০।১২ দিন দেরী। রোজ ১৲ টাকা পড়্‌লো, তা'হলে, না? ক'দিন তা'হলে হাত টেনে খরচ কর্ত্তে হবে বল?" শচী জিজ্ঞাসা করিল, "তো'র কাছে কিছু নেই?"

নগেন কহিল, "কাছে বিশেষ নেই। ১৫৲ টাকা ছিল, আজ বেরুবার সময় রমেশকে দিয়েছি। এ মাসে আর মাহিনা দেওয়া হবে না। তুই মাহিনা দিয়েছিস্? আমি আর দেব না। অনেক ঠকিয়েছে।"

শচীন বলিল, "না।" তা'র পর দামোদরবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "দামোদরবাবু, আপনার তহবিল আছে? exchequer?"

দামোদর উত্তর করিল, সাত টাকা সাড়ে ছ'আনা। উপস্থিত ।৵৹ আনা আছে। সাত টাকা একজনকে ধার দিয়াছে: ২১০ পয়সার সরবত খাইয়াছে।

নগেন বলিল, "কা'কে ধার দিলেন? এর ভিতর তেজারতি কোথায় সুরু কর্লেন?"

দামোদর সুরেনবাবুর কথা নগেন ও শচীনকে বিবৃত করিয়া শুনাইল।

শচীন বলিল, "বটে! বল্‌তে হয় এতদিন! নগেন, কা'ল থেকে সব ছেলে ধরে সেই দোকানে চা' খেতে যেতে হবে।"

নগেন জবাব দিল, "দামোদরবাবু, কাল আমাকে সকালে দোকানটা দেখিয়ে দেবেন ত'। জোচ্চর নয় ত'? কল্‌কাতায়, বাবা, বিশ্বাস হয় না। কি জানি বেটা ফাঁকি দিয়ে সাত টাকা গাফ্ কর্লে কি না। কাল হয় ত' গিয়ে দেখ্‌ব সব লোপাট্; কারুর পরিবেদনা।"

দামোদর জানাইল সে সুরেনবাবুকে বহুদিন হইতেই জানে। শুনিয়া নগেন বলিল, "সে কালই বোঝা যাবে।" বাতি নিভাইয়া তিনজনে চুপ করিয়া কিছুকাল শুইয়া রহিল; কিন্তু কেহই ঘুমাইল না। শেষে নগেন উঠিয়া পড়িল; বলিল, "বড় গরম, শচী! ঘুম আসছে না। শ্বশুরমশাই মেজাজ বিগ্‌ড়ে দিয়ে গেছেন। কি চাহনি, কি ভাষার তেজ, কি delivery!"

শচী চোখ বুজিয়াই বলিল, "রমেশ গেল কোথা?"

দামোদর চুপ করিয়া ভাবিতেছিল, সে কি করিবে? এদিকে নিতাই ঘোষ উদিত হইয়াছে, ওদিকে নারাণবাবু অস্তমিতপ্রায়; সে যে কোথায় তাহার কোনও সন্ধান নাই। তা'ছাড়া নারাণবাবুর বাড়ীর কথা মনে হইতেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল।

নগেন বলিল, "দামোদরবাবু! ঘুমুলেন না কি? না, শুয়ে শুয়ে নিজের স্ত্রীর কথা ভাব্‌ছেন? ফিরেই যাবেন না কি? দেখুন, তা'হলে নিতাই ঘোষের খোঁজ করি। স্ত্রীর জন্যে কি খুব বেশী মন কেমন কোর্‌ছে?"

শচীন বলিল, "তুই কি ক'রে বুঝ্‌বি? ও রসে বঞ্চিত মধু। নগেন, এইবার একটা বিয়ে কর্। দেখ, বলিস্ ত' কাল থেকেই কনে দেখ্‌তে লেগে যাই।"

নগেন উত্তর দিল, "ব্যস্ত হোস্ নি। আমার বিয়ে অমন ঘটকালি ক'রে দিতে পার্‌বি না। আমার মতন পাত্র কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার পক্ষেও অবাঞ্ছনীয়। কেন না, আমার অবস্থা দেবাদিদেব মহাদেবেরই সামিল। শেষে মক্ষযজ্ঞ বাধাবি ঘটকালি কর্ত্তে গিয়ে!"

শচীন মন্তব্য করিল, "নিতাই ঘোষের মতন শ্বশুর হলে, তবে তুই জব্দ হবি!"

নগেন সে কথায় সায় না দিয়া আপন মনে বলিল, "তাই ত' রমেশটা গেল কোথায়?" তা'র পর অন্ধকারেই একটা সিগারেট ধরাইল। দামোদর জিজ্ঞাসা করিল, "নগেনবাবু? আপনার সন্ধানে অন্য মেস আছে?"

নগেন বলিল, "কেন?"

"তা' হলে সেইখানেই না হয় দিনকতক থাক্‌তুম্।"

নগেন উত্তর দিল, "এখানে ভয় কিসের? আমরা থাক্‌তে কোন ভয় নেই। কিন্তু স্ত্রীকে ফেলে আসা আপনার উচিত হয় নি, দামোদরবাবু! তা'কে নিয়ে এলে আরও রোমান্টিক হোতো।"

দামোদর কহিল, "যে স্ত্রীর হৃদয়ে ভালবাসা নেই, সে স্ত্রী নিয়ে কি ঘর করা যায়?"

নগেন উত্তর দিল, "স্ত্রী আবার ভালবাস্‌বে কি? রাঁধবে, বাড়বে, খাওয়াবে, সেবা কর্ব্বে, ছেলে মানুষ কর্ব্বে। তা'র ভালবাসার খুরসৎ কোথায়? ও-সব আপনার অন্যায় বায়না। কোন স্ত্রী ভালবাস্‌তে পারে না।"

শচীন বলিল, "তুই শো। বেশী বকিস্ নি রাত্রিবেলায়। তো'র ঘুম নেই বলে কি কা'কেও ঘুমুতে দিবি না?"

নগেন সিগারেট নিভাইয়া শুইয়া পড়িল।

প্রভাত না হইতে হইতেই নিতাই ঘোষ পুনরায় আসিয়া মেসে উপস্থিত হইল। এবার সে চারুবাবুর সহিত দেখা করিতে চাহিল। চারুবাবু ৮টার আগে কোনও দিনই শয্যাত্যাগ করিতেন না। কিন্তু নিতাই ঘোষ ডাকাডাকি করিয়া তাঁহাকে তুলিল। চারুবাবু নিতান্ত বিরক্ত চিত্তে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাই?"

নিতাই ঘোষ বলিল, "দামোদরকে চাই,—দামোদরকে। আপনি একটু দেখে খোঁজ ক'রে তা'কে ডেকে দিন। আমি চাষাভুষা মানুষ, আপনি ডেকে দিন। আমি খুঁজে পাচ্ছি না। ছোক্‌রারা সব ঠাট্টা কর্‌ছে।"

চারুবাবু তাহাকে বসিতে বলিয়া উপরে ত্রিতলে নগেনদের ঘরের দরজায় গিয়া ধাক্কা দিয়া ডাকিলেন, "নগেন, শচীন, রমেশ!"—ভিতরে সকলেই গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন ছিল। চারুবাবু ধাক্কা দিয়া আবার আরও উচ্চ স্বরে ডাকিলেন। নগেনের ঘুম ভাঙ্গিল। সে আসিয়া দরজা খুলিয়া বলিল, "কি? এত সকালে ডাকাত পড়া কেন?"

চারুবাবু বিরক্ত সুরে বলিলেন, "ভাল আপদ দেখ না। দামোদরের শ্বশুর এসে কাল থেকে পাগল ক'রে তুলেছে।

এই ভোরে এসে ঘ্যান্ ঘ্যান্ সুরু করেছে। সে কোথায়? এখানেই ত' আছে? কি বিপদেই পড়া গেল! একবার গিয়ে দেখাই করুক্ না ছাই।"

নগেন উত্তর দিল, "চলুন, আমি তাকে তাগিয়ে দিয়ে আস্‌ছি।"

চারুবাবু বলিলেন, "সে থাকে ত' থাক্ বাবু। এ প্রাণ ওষ্ঠাগত ক'রে তুলেছে। নড়তে চায় না। আরে, বাবু, পালাবে না ত' কি কর্ব্বে? সখ্ করে কে সংসার ক'রে? আমরা পালাই নি? সবাই পালায়, উপায় থাকলে। তা'র জন্যে এত ধর্‌পাকড়্ কিসের? চুরি করেছে না ডাকাতি ক'রেছে? ওয়ারেণ্টের আসামী?"

নগেন বাহিরে আসিয়া দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া বলিল, "চলুন, তা'কে দেখ্‌ছি। বড় বেহায়া লোক ত'।"

চারুবাবুর সহিত সে নীচে আসিয়া নিতাই ঘোষকে বলিল, "কি, কেষ্ এসেছেন? দামোদরকে না হ'লে চল্‌বেই না?"

নিতাই ঘোষ উত্তর দিল, "আমি চাষাভুষা মানুষ! সে কোথায়? এখানে আছে। আপনারা রেখেছেন। তা'কে আমি নিয়ে যাবো।"

নগেন বলিল, "সে যাবে না। সে আবার বিয়ে কর্ব্বে! সব ঠিক ঠাক হয়েছে। আমরাই বিয়ে দেব। চাষার মেয়ে আর নয়!"

নিতাই ঘোষ তাহার দিকে বিস্মিত হইয়া চাহিল। তা'র পর উঠিয়া দাঁড়াইল; আবার বসিল। আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া, চেয়ারের একটা হাতল ধরিয়া ঝুঁকিয়া বলিল, "আবার বিয়ে কোর্‌বে?"

নগেন উত্তর দিল, "হাঁ। কর্ব্বে না ত' কি? কে আট্‌কাবে?"

নিতাই ঘোষ সোজা হইয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "সে কোথায়?"

নগেন বলিল, "সে কাল রাত্রে এসে, তখনি চলে গেছে। তুমি এসেছ শুনে আর দাঁড়ায় নি। ভয়ে পালিয়েছে।"

নিতাই ঘোষ চারুবাবুর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "সে কোথায়?"

চারুবাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন, "জ্বালা জ্বালা। কালা না কি? সে নেই—নেই! শুন্‌তে পেয়েছ? সে নেই।"

নিতাই ঘোষ হতাশভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িল। নগেন চারুবাবুর মুখের দিকে চাহিল, চারুবাবু নগেনের দিকে হতাশভাবে চাহিলেন। রমেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া নগেন বলিয়া উঠিল, "রমেশ! এই নিতাই ঘোষ! এমন নাছোড়বান্দা দেখি নি। কিছুতেই উঠ্‌বে না। বলছি দামোদর এখানে নেই, তবু উঠ্‌বে না, কি না-ছোড়্‌বন্দ্ লোক, বাবা!"

রমেশ আসিয়া নিতাই ঘোষকে দেখিল। ক্রমে একে একে মেসের সব ছেলে উঠিল; সবাই আসিয়া নিতাই ঘোষকে দেখিল। নিতাই ঘোষ চুপ করিয়া চারুবাবুর ঘরে বসিয়া রহিল। চারুবাবু প্রমাদ গণিলেন। নরেন, মোহিনী, সতীশ, প্রভৃতি সকলে আসিল। সকলেই বলিতে লাগিল, "ঐ নিতাই ঘোষ!" "ঐ নিতাই ঘোষ!"

চারুবাবু নরেন ও রমেশের সহিত পরামর্শ করিলেন, কি করা যায়। চারুবাবু বলিলেন, "দামোদরকে ডেকে দাও। তা'কে না নিয়ে ও উঠ্‌বে না। দেখ্‌ছো না কি না-ছোড়্‌বন্দা; একগুঁয়ে। ও জমি নিয়ে বসেছে।"

নরেন বলিল, "তাই 'ত। ওকে তাড়াতে গেলেও একটা হাঙ্গাম হবে!"

রমেশ কিছুই কহিল না। সে উপরে উঠিয়া গিয়া দামোদরকে ডাকিয়া সব কথা শুনাইল। দামোদর বিমূঢ় হইল। আবার নিতাই ঘোষের সহিত ফিরিতে তাহার কোনরকমে প্রবৃত্তি হইল না। অথচ মেস্‌শুদ্ধ সবাই বিব্রত হইয়াছে; একটা কিছু করা চাই। শচীনও উঠিয়া সব শুনিল। বলিল, "দামোদরবাবু, আপনার অন্য কোথাও গিয়ে থাক্‌বার উপায় নেই?"

দামোদর ঘাড় নাড়িয়া জানাইল 'না'। তাহার অনুতাপ হইল কেন সে সোজা সন্ন্যাস লইয়া একেবারে অজ্ঞাতবাস করে নাই! কিন্তু সে ক্রমে মরিয়া হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া জামাজুতা পরিল; রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবেন?"

দামোদর উত্তর দিল, "যে দিকে হয়।"

রমেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "আপনি আপাততঃ

কোথাও ঘণ্টা পাঁচ-ছয় গিয়ে অপেক্ষা করুন। পরে ভেবে ব্যবস্থা করা যাবে।"

শচীন পরামর্শ দিল, "সুরেনবাবুর চা-এর দোকানে না হয় যান্। সোজা ছুটে পালিয়ে যান্।"

রমেশ বলিল, "তাই যান্। আমরা পরে যাবো। সেইখানেই অপেক্ষা করবেন।"

দামোদর ঘাড় নাড়িয়া জানাইল 'আচ্ছা'। তা'র পর সে খিতলে নামিয়া চারুবাবুর ঘরের দরজায় দাঁড়াইল। চারুবাবু নিতাই ঘোষকে বলিলেন, "ঐ দামোদর।"

নিতাই ঘোষ তাহাকে দেখিয়া এক লাফে উঠিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিতে গেল। দামোদর সরিয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিল, "আমি যাবো না। আপনার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেছি।" তা'র পর সে মুহূর্ত্ত কালও আর সেই স্থানে দাঁড়াইল না; ছুটিয়া, সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিল, ও সদর দরজা দিয়া নির্গত হইয়া গেল। নিতাই ঘোষও দ্রুতপদে তাহার অনুসরণ করিয়া বাহিরে আসিল, কিন্তু রাস্তার ভিড়ে তাহাকে দেখিতে পাইল না। আপন মনেই একবার কি ভাবিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দ্রুতপদে শিয়ালদহ ষ্টেশনের দিকে চলিল। ষ্টেশনে রমাই তাহার অপেক্ষা করিতেছিল। নিতাই ঘোষ তাহাকে গিয়া বলিল, "তুই বাড়ী যা'। আমি তা'কে দেখেছি, সে যাবে না বলেছে। দেখ্‌বো যায় কি না। একবার পেলে হয়—হাতে পেলে হয়। আমি এখন যাবো। তা'কে নিয়ে যাবো। আমাকে ভাঁড়ানো! নিতাই ঘোষকে ভাঁড়ানো! তুই যা'! ঐ গাড়িতে চলে যা'। আমি পরে জানাবো সব।"

রমাই বিস্মিত হইয়া কহিল, "একা না?"

নিতাই ঘোষ আপন মনেই যেন বলিল, "আমি তা'কে নিয়ে যাবো। দেখি সে কোথায় যায়?" তা'র পর রমাইকে পাঁচটি টাকা দিয়া টিকিট করিয়া চলিয়া যাইতে বলিয়া নিজে আপনার বাস-স্থানে চলিয়া গেল। সেও শিয়ালদহের কাছে এক হোটেলে উঠিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও ব্যায়াম

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু

মানুষ চায় বাঁচিয়া থাকিতে এবং বাঁচিয়া থাকিতে হইলে চাই স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যহীন মানব জীবনে সুখ, স্বচ্ছন্দতা, আনন্দ কিছুই উপভোগ করিতে পারে না। যে রুগ্ন, যে স্বাস্থ্যহীন, সে নিজে তাহার ইচ্ছামত কিছুই করিতে পারে না; বরং অপরকে তাহার জন্য নিযুক্ত থাকিতে হয়। এই সকল কারণে মানুষের প্রথম কর্ত্তব্য শরীরের যত্ন করা ও স্বাস্থ্যবান্ হওয়া। ইহার জন্য সে নিজের কাছে,—শুধু নিজের কাছে নয়, তাহার সংসারের নিকট, তাহার প্রতিবেশীর নিকট, দেশের নিকট, এমন কি সৃষ্টিকর্ত্তার নিকটও দায়ী। অনেকের ধারণা, রোগ আপন হইতে আসে, তাহাকে রোধ করা যায় না। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। শরীরের উপর অযত্ন হইলে রোগ আপনিই আসিবে। সেইজন্য শরীরে যাহাতে রোগ প্রবেশ করিতে না পারে তাহার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বর্ত্তমানে ইয়োরোপের সহিত আমাদের দেশের মানুষের আয়ুর তুলনা করিতে গেলে দেখিতে পাই যে, আমাদের অপেক্ষা ইয়োরোপীয়গণ অধিক দীর্ঘায়ু। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, উহারা স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখে। তাহারা শুধু নিজেরা নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে তাহা নয়, দেশের মানুষ যাহাতে স্বাস্থ্যবান্ হয় তাহার দিকে শাসন-কর্ত্তারাও লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য হয়। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" শাস্ত্রবাক্য। শরীর রক্ষা করা মানবের আদি ধর্ম্ম।

এখন মনে হইতে পারে—রোগ হয় কেন? উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে, কিম্বা কুখাদ্য ভক্ষণে বা শরীরে কোন বিষ প্রবেশ করিলে—যে কোনও কারণে আমাদের শরীর অসুস্থ হইতে পারে। শরীরের উপর অযথা অন্যায়রূপে অত্যাচার করিলেও রোগ জন্মিতে পারে। কোনও রোগের বীজও

শরীরে প্রবেশ করিলে তাহাতে রোগ হয়। কোনও রোগের একটীমাত্র বীজ শরীরে প্রবেশ করিলে দশ ঘণ্টার মধ্যে দশ লক্ষ বীজ শরীরে জন্মগ্রহণ করে ও এইরূপে বৃদ্ধি পাইয়া শরীরকে অসুস্থ করে। আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, এই সকল বীজ যেন কোন প্রকারে আমাদের শরীরে প্রবেশ করিতে না পারে।

শরীরের সমস্ত অঙ্গগুলিকে ঠিক ভাবে চালাইলে ও যত্ন করিলে শরীর সুস্থ থাকে। যেমন, কোন ইঞ্জিনকে ভারী গাড়ী টানিতে হইলে তাহাকে উপযুক্ত কয়লা, জল দিতে হয়, যে সকল অংশ কাজ করে তাহাদের তৈল দিতে

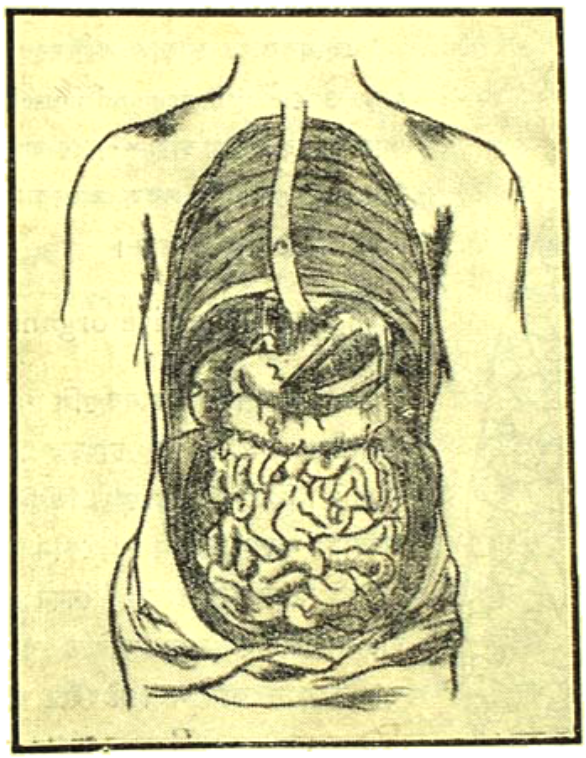

১। গলনালী ২। পাকস্থলী ৩। যকৃৎ
৪। বৃহৎ অন্ত্র ৫। ক্ষুদ্র অন্ত্র

হয়, ছাই বাহির করিয়া ফেলিতে হয় ও ইঞ্জিনটি পরিষ্কার রাখিতে হয়. এই সকল না করিলে ইঞ্জিনটি খারাপ হইয়া যায়. তেমনি মানুষের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে শরীরকে উপযুক্ত আহার ও পানীয় দেওয়া ও তৎপ্রতি বিশেষ যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

যেমন ইঞ্জিন্-চালকের ইঞ্জিনের সমস্ত অংশগুলি ভাল করিয়া জানিতে ও যত্ন করিতে হয়, নতুবা ইঞ্জিন খারাপ হইয়া যায়, সেইরূপ সকল মানুষের, তাহার শরীরের কি ভাবে যত্ন করা উচিত, তাহা জানা দরকার। শরীরকে অযত্ন করিলেই শরীর রোগগ্রস্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। শরীরকে সুস্থ রাখিতে হইলে, চাই উপযুক্ত আহার, পানীয়, মুক্ত বাতাস, রৌদ্র। শরীরের ময়লা যাহাতে নিয়মিতভাবে পরিষ্কৃত হয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কোনও রোগের বীজ যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এবং সকলের চেয়ে বেশী দরকার—প্রত্যহ উপযুক্ত ব্যায়াম ও বিশ্রাম। সাধারণতঃ এই কয়টী নিয়ম পালন করিলেই শরীরকে সুস্থ রাখিতে পারা যায়।

এবার মানুষের দেহের বিষয় কিছু বলিব। এই দেহটীকে মোটামুটি আমরা তিন ভাগে ভাগ করিতে পারি। প্রথম

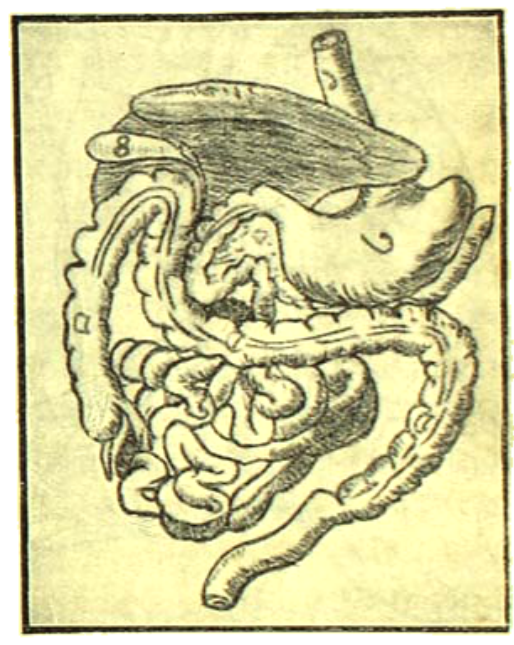

১। গলনালী ২। যকৃৎ ৩। পাকস্থলী ৪। পিত্তকোষ
৫। বৃহৎ অন্ত্র ৬। ক্ষুদ্র অন্ত্র

—মাথা (head), দ্বিতীয়—ধড় (trunk), তৃতীয়—হাত ও পা (limbs)। ধড়ের ভিতরে একটি বড় গর্ত্ত (cavity) আছে। এই গর্ত্তটি আবার একটী সরু প্রাচীরের দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত, এই সরু প্রাচীরটিকে diaphragm বলে। গর্ত্তের উপর অংশকে বুক (thoracic cavity) ও নিম্ন অংশটিকে পেট (abdominal cavity) বলে। আবার এই উপর অংশের সামনের দিকে হৃৎপিণ্ড (heart) ও ফুস্‌ফুস্ (lungs) আছে। এবং ইহাদের

পিছন দিকে শ্বাসনালী (trachea or wind pipe) এবং গলনালী (gullet or oesophagus) অবস্থান করিতেছে। পেটের মধ্যে যকৃৎ (liver), পাকস্থলী (stomach), প্লীহা (spleen), pancreas, বৃহৎ অন্ত্র ও ক্ষুদ্র অন্ত্র (large and small intestines) অবস্থান করিতেছে। কিন্তু মূত্রাশয় (kidneys) ইহাদের পিছনে পিঠের দিকে দুই ধারে দুইটি আছে।

শরীরের এই সকল যন্ত্রগুলি শরীরের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কাষ করিতেছে। কতকগুলিকে আবার একসঙ্গে কাজ করিতে হয়। যথা, কোন খাদ্য হজম করিবার সময়,

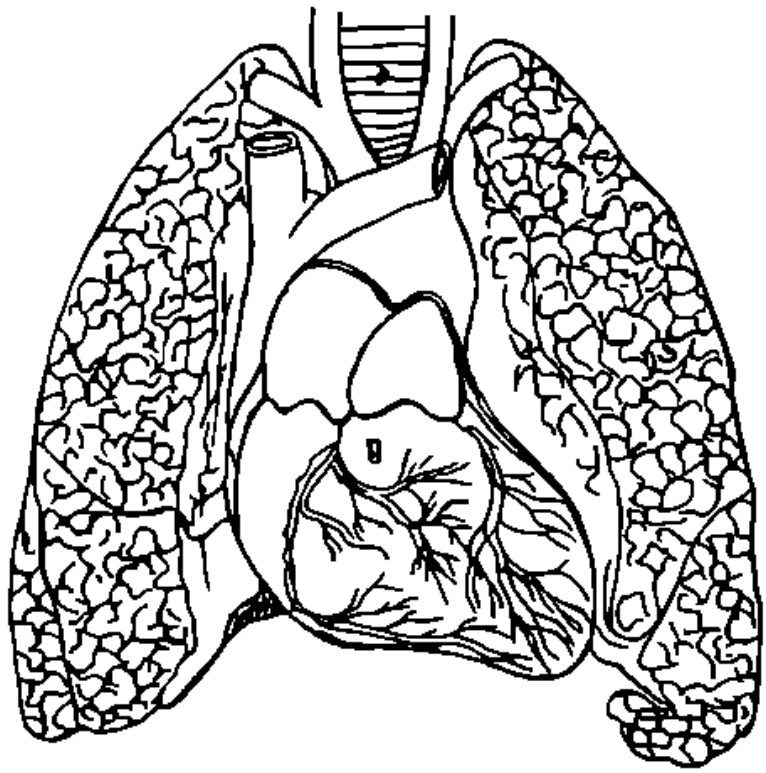

১। শ্বাসনালী ২। দক্ষিণ-ফুস্‌ফুস্ ৩। বাম-ফুস্‌ফুস্ ৪। হৃৎপিণ্ড

মুখ, দাঁত, গলনালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্র এবং pancreas প্রভৃতি শরীরের এই সকল যন্ত্রগুলি একসঙ্গে কাষ করে। শরীরের এই সকল যন্ত্রগুলিকে এক সঙ্গে পাকযন্ত্র (digestive organ) বলে।

শরীরের মধ্যে শ্বাস (oxygen) লইতে বা শ্বাস (carbon dioxide) ছাড়িতে হইলে নাক, গলনালীর উর্দ্ধভাগ, শ্বাসনালী এবং ফুস্‌ফুস্ এই সকল যন্ত্রগুলিকে এক সঙ্গে কাষ করিতে হয়। তাহাকে শ্বাসযন্ত্র (respiratory organ) বলে।

সমস্ত শরীরের মধ্যে রক্ত চলাচল করিবার জন্য হৃৎপিণ্ড ও সমস্ত বড় ও ছোট শিরাগুলি (blood vessels) এক সঙ্গে কাষ করে। তাহাকে ইংরাজীতে circulatory organs বলে।

প্রস্রাবের যন্ত্র, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্, যকৃৎ এবং বৃহৎ অন্ত্র এই সকল যন্ত্রগুলি শরীর হইতে ময়লা বাহির করে। সেইজন্য ইহাদিগকে Excretory organ বলে।

মস্তিষ্ক (brain) মেরুদণ্ড (spinal cord), এবং ছোট বড় সমস্ত শিরা উপশিরাগুলি শরীরের সমস্ত যন্ত্রগুলিকে চালিত করিতেছে। এই চালন শক্তিকেই স্নায়ুমণ্ডলী (nervous system) বলে।

এই সকল যন্ত্র ছাড়াও শরীরের মধ্যে হাড় ও পেশী (bones and muscles) আছে। হাড়গুলি দ্বারা শরীরের আকৃতি ঠিক হয় ও পেশীগুলি সকল অঙ্গকে নাড়া-চাড়া করিতে সাহায্য করে।

পাকযন্ত্র (Digestive organs)

মানুষের শরীর অনেকগুলি পদার্থে তৈয়ারী। যথা—হাড়, চামড়া, শিরা ইত্যাদি। কি জাগ্রত অবস্থায়, কি নিদ্রিত অবস্থায় মানুষের কোন না কোন অংশ সর্ব্বদাই কাজ করিতেছে। যেমন কোন ইঞ্জিন সর্ব্বদাই কাষ করিতে করিতে তাহার কোন কোন অংশ নষ্ট হইতে থাকে, সেইরূপ মানুষের শরীরেরও কোন কোন অংশ নষ্ট হইতে থাকে। তাহাকে আবার মেরামত করিতে হয়। যেমন কয়লা ও জল ঠিকভাবে পাইলে ইঞ্জিন তাহার চলচ্ছক্তি বজায় রাখিতে পারে, সেইরূপ খাদ্যের দ্বারা মানুষ তাহার জীবনীশক্তি লাভ করিয়া তাহার শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিক ভাবে চালনা করিতে পারে। কি শীতকালে, কি গ্রীষ্মে, সকল সময়েই শরীরে একটী উত্তাপ থাকে। এই উত্তাপও আমরা খাদ্যের মধ্য হইতে পাই। আবার, যে খাদ্য আমরা খাই, তাহা ভালভাবে হজম করিতে হইবে। কারণ, খাদ্য পুরাভাবে হজম হইলে আমরা শরীরে উত্তাপ,

জীবনীশক্তি পাই এবং শরীরের পুষ্টি হয়। শরীরের কোন অংশ কাটিয়া গেলে যদি তাহাতে খাদ্য দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই ক্ষত অংশ সারিয়া যাইবে না যতক্ষণ না খাদ্য খাইয়া তাহা ভালভাবে হজম করিয়া জীবনীশক্তি বাড়িতেছে।

কোনও খাদ্য মুখের মধ্যে যাইলে তাহা দাঁতের দ্বারা ভাল করিয়া চিবাইতে হয়। চিবাইতে চিবাইতে Salivary glandsএর মধ্য হইতে একরূপ রস বাহির হইয়া খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হয়। তাহাকে লালা (saliva) বলে। এই লালা হজম করিতে সাহায্য করে। সেইজন্য না চিবাইয়া একেবারে গিলিয়া খাইলে হজম হইতে দেরী হয়। খাদ্য গিলিলে গলনালীর মধ্য দিয়া পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। পাকস্থলীটি একটি বড় থলির ন্যায়, ঠিক গলনালীর নীচে অবস্থিত। পাকস্থলীর মধ্যে যাইয়া ভুক্ত খাদ্য আবার gastric juiceএর সহিত মিশ্রিত হয়। খাদ্য হজম করিবার জন্য লালা প্রথম ও gastric juice দ্বিতীয় সহায়ক। খাদ্যের উপর ও চিবাইবার উপর নির্ভর করিয়া খাদ্য পাকস্থলীতে আধ ঘণ্টা হইতে কিছু ঘণ্টা থাকিয়া আস্তে আস্তে ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। ক্ষুদ্র অন্ত্রটি একটী নলের ন্যায়—প্রায় বিশ ফিট লম্বা—পেটের মধ্যে ইহা জড়ানো অবস্থায় আছে। যকৃৎ ও পিত্তকোষ (gall bladder) হইতে একটী ছোট নল ক্ষুদ্র অন্ত্রের উপর অংশকে যোগ করিয়াছে। আবার পিত্ত (bile) এই নলের মধ্য দিয়া যাইয়া ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্যে গিয়াছে। এই পিত্ত (bile) হজমেরও সাহায্য করে। আর একটী ছোট নল pancreas (পাকাশয়স্থ ক্লোমযন্ত্র) হইতে ক্ষুদ্র অন্ত্রে গিয়াছে। এবং এই pancreas এর মধ্যে যে একটী রস জন্মে তাহাও হজমের জন্য বিশেষ দরকার। এই রূপে খাদ্য ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্য হইতে তাহার সার পদার্থ বাহির করিয়া লইয়া আইসে এবং রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। এবং তাহার মধ্যে যে অংশ মোটেই হজম হয় না তাহাই বৃহৎ অন্ত্রের ভিতর আসিয়া জমে। প্রত্যহ ভালরূপে মল-মূত্র ত্যাগ না করিলে, ইহা হইতে বদ্ গন্ধ ও বিষ জন্মিয়া রক্তের সহিত মিশিয়া গেলে শরীরের অত্যন্ত ক্ষতি করে। এই রূপে খাদ্য সম্পূর্ণভাবে হজম হইয়া জলের ন্যায় তরল পদার্থে পরিণত হয়। আবার, পাকস্থলী ও ক্ষুদ্র অন্ত্রের গায়ে যে সকল শিরা, উপ-শিরা আছে তাহারা এই তরল পদার্থকে চুষিয়া লয়। এইরূপে খাদ্যের সার পদার্থ রক্তের সহিত মিশিয়া মানুষের শরীরে উত্তাপ ও জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে। আবার, বৃহৎ অন্ত্রের মধ্য হইতে জলীয় পদার্থটী বাহির হইয়া মূত্রাশয়ে জমে।

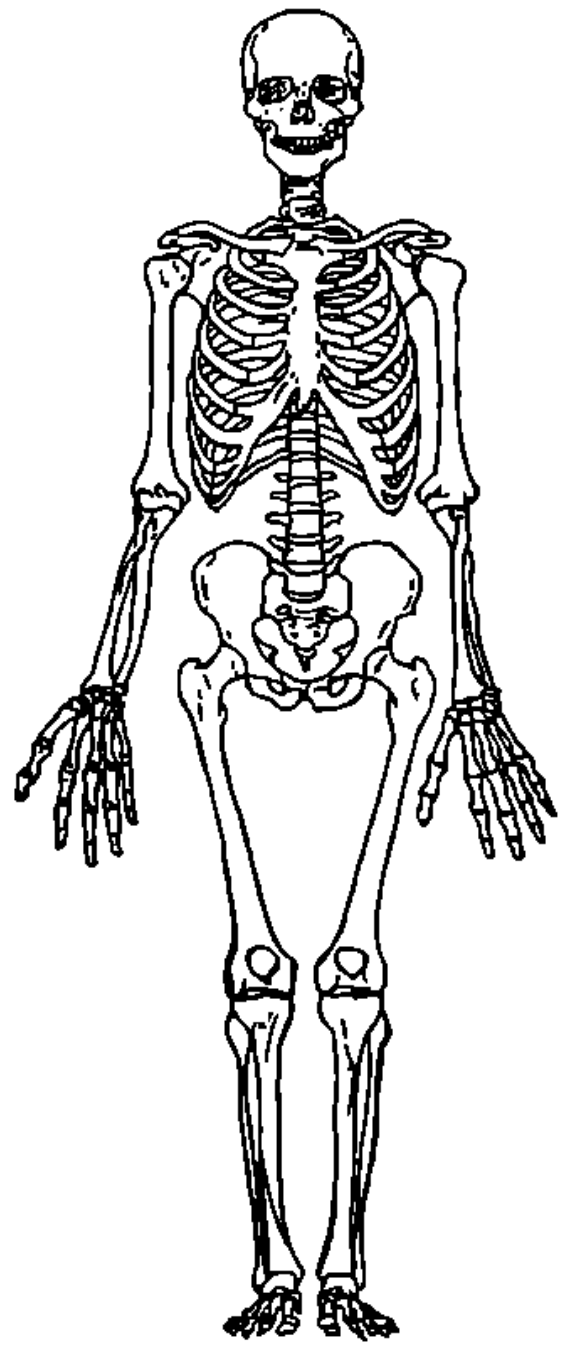

কঙ্কাল

শ্বাস ও শ্বাস-যন্ত্র (Respiration and the Respiratory organs)

মানুষ কিছুদিন মোটে না খাইয়া বাঁচিতে পারে। কিন্তু বিনা বাতাসে মুহূর্ত্ত কালের জন্যও বাঁচিতে পারে না।

ইহাতেই বুঝিতে পারি বাতাস মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য কিরূপ প্রয়োজনীয়। আমরা নাকের মধ্য দিয়া, ফুস্‌ফুসের মধ্য দিয়া যে বাতাস লই, তাহা অম্লজান বাষ্প (oxygen)। এই অম্লজান বাষ্প প্রথমে ফুস্‌ফুসে পরে রক্তের মধ্য দিয়া সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হয়। তাহা হইতে জীবনীশক্তি (energy) পাই। এবং শরীরের মধ্য হইতে রক্তের ভিতর দিয়া ফুস্‌ফুসের মধ্য হইতে যে বায়ু বাহির হয় তাহা অঙ্গারাম্লজান বাষ্প (carbon dioxide)। ইহা সম্পূর্ণ বিষাক্ত। যে বাতাস আমরা লই তাহা নাকের মধ্য দিয়া গলনালীর ঊর্দ্ধভাগে যাইয়া পরে শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে। শ্বাস-নালী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ফুস্‌ফুসের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে—একটী দক্ষিণ ফুস্‌ফুসে ও অপরটী বাম ফুস্‌ফুসে। ফুস্‌ফুসের মধ্যে ছোট ছোট হাওয়া যাওয়ার গর্ত্ত আছে। যখন আমরা শ্বাস লই তখন সেইগুলি পূর্ণ হয় ও শ্বাস ছাড়িলে ওইগুলি খালি হয়।

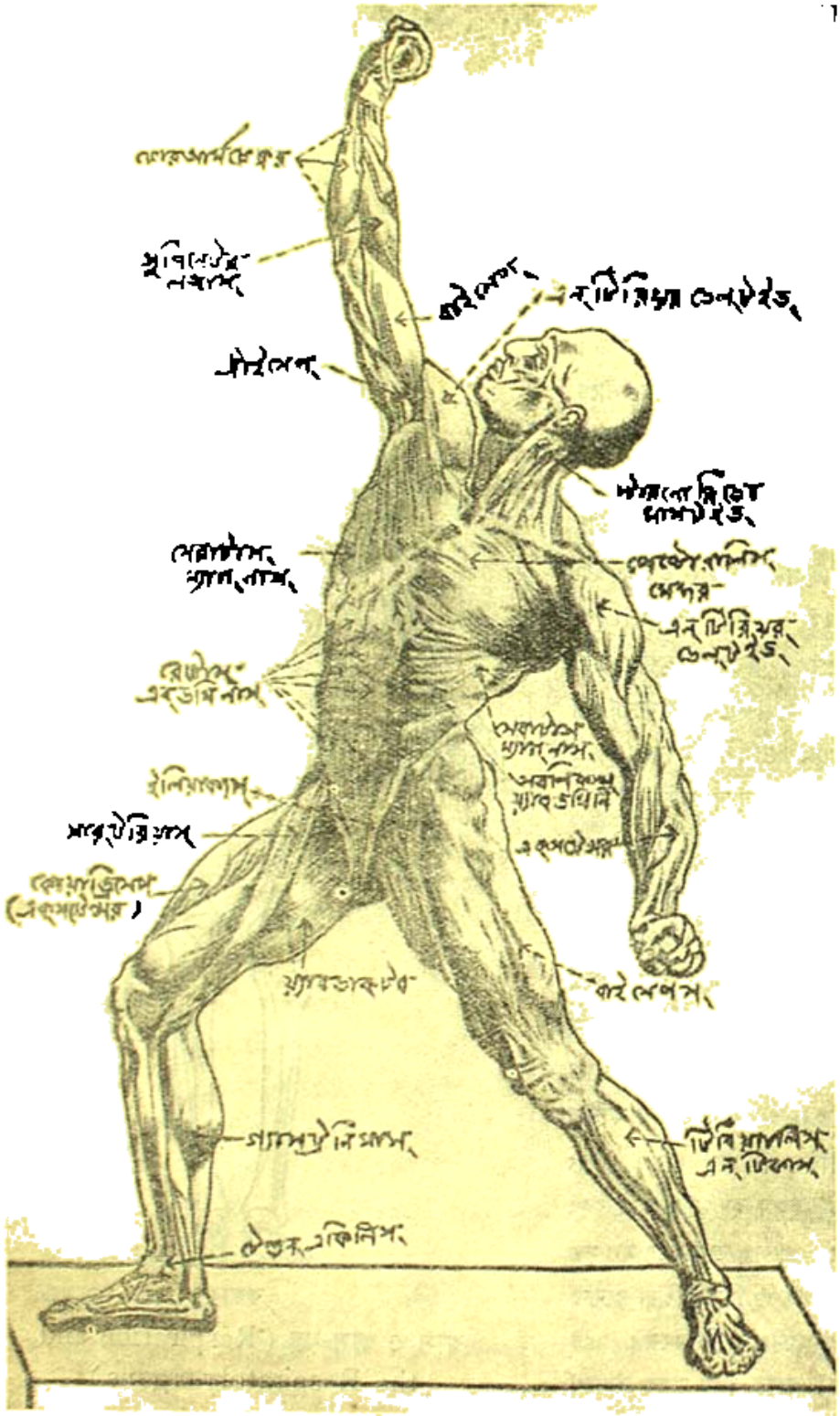

মানব-দেহ—সম্মুখ ভাগ

শ্বাস-প্রশ্বাস
(Breathing)

বিনা শ্বাসে মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। জাগ্রত অবস্থায় মানুষকে শ্বাস লইতেই হয়; এমন কি নিদ্রিত অবস্থায় যখন শরীরের অন্য সকলকার বন্ধ থাকে, শ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের কাষ বন্ধ হইতে পারে না।—তাহা হইলেই

মৃত্যু। সাধারণতঃ মানুষ এক মিনিটে ১৬ হইতে ১৮ বার শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে কিম্বা ব্যায়াম করিবার সময় শ্বাস লয় এবং প্রত্যেক শ্বাসে হৃৎপিণ্ড চার বার ধাক্কা দেয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের কায দ্রুতভাবে চলে।

মানব-দেহ—
পশ্চাৎ ভাগ

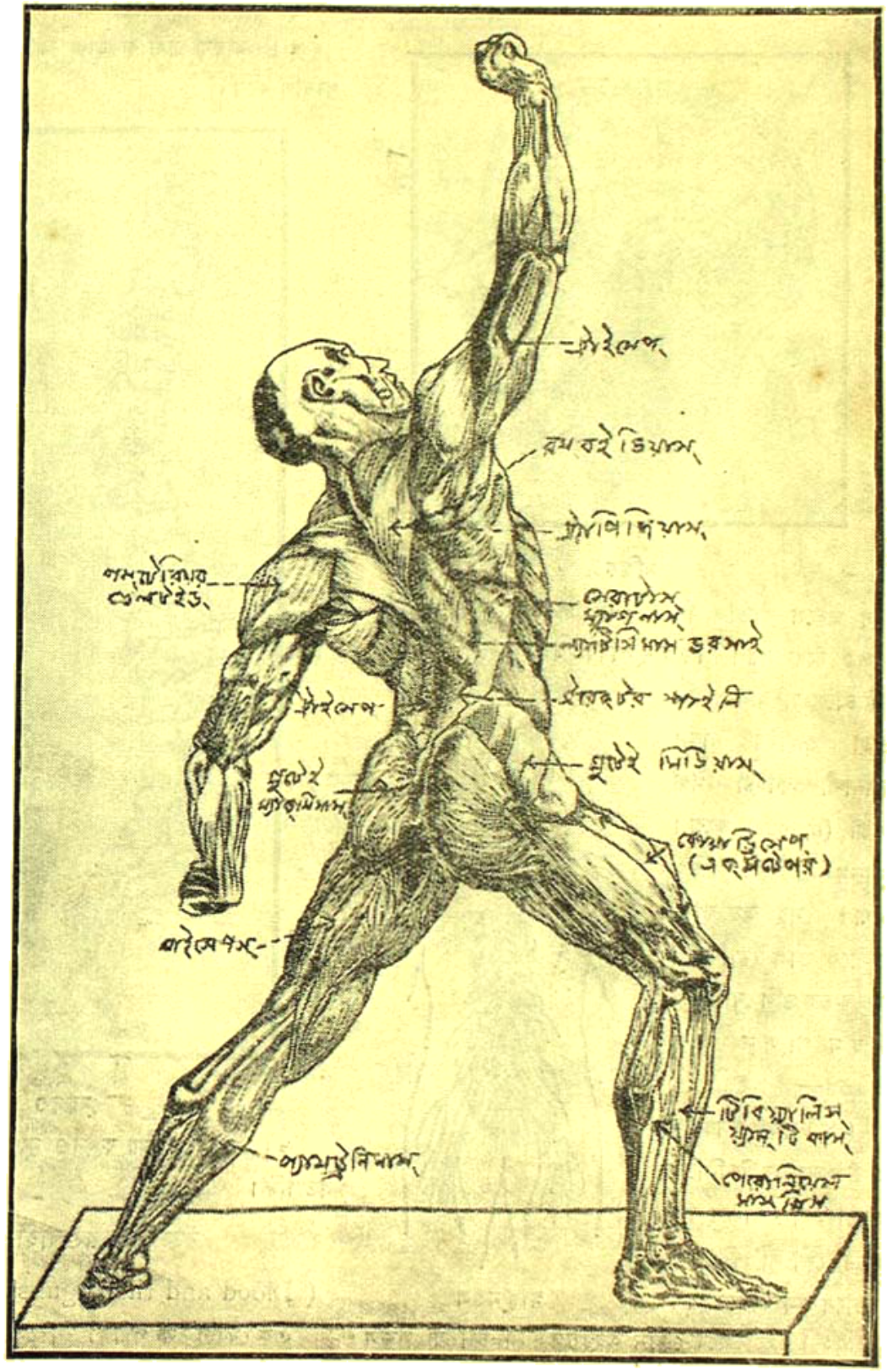

সকল সময় নাক দিয়া শ্বাস লওয়া উচিত। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। নাকের মধ্যে যে চুল আছে তাহা ধূলা ও ময়লা জিনিষ ভিতরে যাইতে দেয় না। পরন্তু নাক দিয়া

মস্তিষ্ক

শ্বাস লইলে বাতাস সিক্ত (moistened) হইয়া ফুস্‌ফুসের মধ্যে যায়। কিন্তু মুখ দিয়া শ্বাস লইলে গলনালীর উর্দ্ধ ভাগে যাইবার পূর্ব্বেই তাহা শুকাইয়া যায়। গলনালী শুকাইয়া গিয়া ঠেম্না (mucus) জন্মে। ফুস্‌ফুস প্রভৃতির অসুখ জন্মে। সেই জন্য শ্বাস-নালীকে ভাল রাখিবার জন্য কতকগুলি মোটামুটি নিয়ম পালন করা উচিত।—

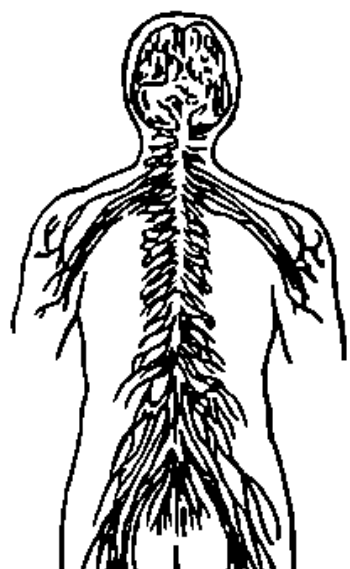

স্নায়ুমণ্ডল

(১) সকল সময় কি জাগ্রত অবস্থায় কি নিদ্রিত অবস্থায়, কি দিনে কি রাত্রে খোলা বা শুদ্ধ বাতাসে বাস করিতে হয়।

(২) ফুস্‌ফুস্‌কে কোন অবস্থাতেই না চাপিয়া সকল সময়েই পুরা শ্বাস লইতে ও ছাড়িতে হয়।

(৩) যাহাতে ধূলা বাতাসের সহিত শরীরে প্রবেশ না করা তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৪) সকল সময়েই শ্বাস নাক দিয়া লইতে হইবে।

৫। মাদক দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ; তাহাতে ফুস্‌ফুস্ খারাপ করে।

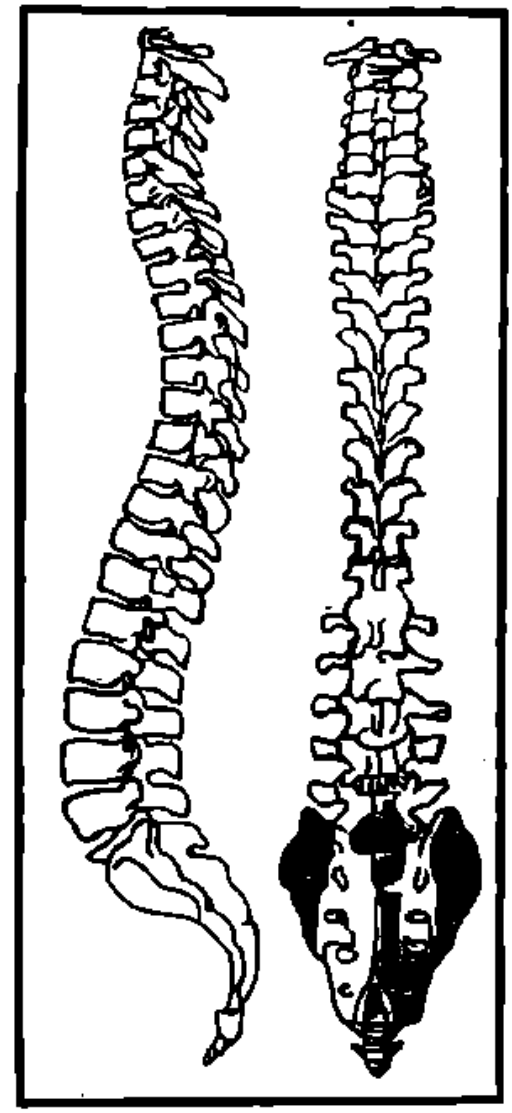

মেরুদণ্ড

৬। শুইবার সময় কখনও মুখে চাপা দিয়া শুইবে না। ইত্যাদি।

রক্ত এবং রক্তবাহী-যন্ত্র—

(Blood and the organs of Circulation)

এক ফোঁটা রক্ত পরীক্ষা করিলে আমরা তাহার মধ্যে অনেক ছোট ছোট লাল লাল পদার্থ দেখিতে পাই। এই

গুলিকে red corpuscles (লাল অণুকোষ) বলে। তা ছাড়াও অনেক এইরূপ সাদা পদার্থ দেখিতে পাই। সেই গুলিকে white corpuscles বলে এবং হজম হইয়া খাদ্যের সার পদার্থ ইহার মধ্যে চলাচল করে। সেই জন্য রক্তকে এক কথায় ইংরাজীতে শরীরের transportation department বলে। কারণ, রক্ত ফুস্‌ফুসের মধ্য হইতে অম্লজান বাষ্প সমস্ত শরীরে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং পাকস্থলীতে ও অন্ত্রে খাদ্য হজম হইলে পর তাহার সার পদার্থটিও শরীরে বহন করিয়া লইয়া যায়। তা ছাড়া শরীরের সমস্ত আবর্জ্জনা ও অঙ্গারাম্লজান বাষ্প বহন করিয়া লইয়া আসিয়া ফুস্‌ফুস্, মূত্রাশয় এবং চর্ম্মের মধ্য দিয়া বাহির করিয়া দেয়।

শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরার (vessels and capillaries) মধ্য দিয়া রক্ত সকল সময়েই চলাফেরা করিতেছে। হৃদ্‌পিণ্ড এক শক্তিশালী pumpএর ন্যায় শরীরের মধ্যে কাজ করিতেছে। তাহার দ্বারা শরীরের মধ্যে রক্ত-চলাচল হইতেছে। একটী সুস্থ পুরুষের হৃদ্‌পিণ্ড প্রায় মিনিটে ৭০ বার কাজ (beat) করে। ব্যায়ামের সময় কিম্বা শরীরে উত্তাপ হইলে তাহা বৃদ্ধি পায়। স্ত্রীলোকের হৃদ্‌পিণ্ড পুরুষ অপেক্ষা ১ মিনিটে ৮।১০ বার বেশী কাজ করে। আবার একটী বালকের ১ মিনিটে ৯০।১০০ বার কাজ করে।

হৃদ্‌পিণ্ড একটী বড় গর্ত্ত। তাহাতে সকল সময়ই রক্ত চলাচল করে। Aorta নামে একটী শিরা হৃদ্‌পিণ্ডের উপরে বাম দিকের কোণে সংযুক্ত আছে। ইহা উপর দিকে গিয়াছে এবং তাহার দ্বারা মাথায় ও হাতে রক্ত-চলাচল হইতেছে এবং পরে নীচে বাঁকিয়া আসিয়া শরীরের আর সমস্ত জায়গায় রক্ত-চলাচল হইতেছে। যখন হৃদ্‌পিণ্ড সঙ্কুচিত (contract) হয়, তখনই তাহার মধ্য হইতে রক্ত সকল aortaর ভিতর যাইয়া সমস্ত শরীরের মধ্যে প্রবাহিত হয়। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপশিরার মধ্য দিয়া রক্ত সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হয়, তাহাকে capillarics বলে। এই গুলি এত ছোট যে ইহাদিগকে ৩০০০ একত্র জড় করিলেও ১ ইঞ্চি জায়গার দরকার হয় না। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র capillariesএর মধ্য দিয়া ও veinsএর মধ্য দিয়া রক্ত পুনরায় হৃদ্‌পিণ্ডে ফিরিয়া আসে।

হৃদ্‌পিণ্ডটীকে ভাগ করিলে ঠিক দুই ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। হৃদ্‌পিণ্ডের বাম দিক হইতে aortaর মধ্য দিয়া বিশুদ্ধ রক্ত (pure blood) শরীরের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে এবং শরীরের সমস্ত জায়গা হইতে দূষিত রক্ত (impure blood) হৃদ্‌পিণ্ডের ডান্‌দিকে ফিরিয়া আসিয়া ফুস্‌ফুসের দিকে যায়। ফুস্‌ফুসের মধ্যে যাইয়া সমস্ত শরীরের যে সকল দূষিত পদার্থ বহন করিয়া লইয়া আসে তাহা সেই স্থানে ত্যাগ করিয়া তথা হইতে অম্লজান বাষ্প লইয়া সমস্ত শরীরের মধ্যে বহন করে।

রক্তের মধ্যে মানুষের জীবনীশক্তি রহিয়াছে। যদি শরীরের কোন অংশে কিছু দিনের জন্য রক্ত-চলাচল বন্ধ হইয়া যায়, তবে সেই অংশটী একেবারে অবশ হইয়া যায়। ইহাতেই আমরা বুঝিতে পারি রক্তের উপর মানুষের জীবনী-শক্তি নির্ভর করিতেছে। শরীরের কোন অংশ ক্ষত হইলে রক্তই তাহা পূরণ করে। শরীরে কোন রোগের বীজ প্রবেশ করিতে আসিলে রক্তের white cells তাহাকে বাধা দেয় ও নষ্ট করে। এই সকল নানা কারণে আমরা দেখিতে পাই রক্তই আমাদের জীবনীশক্তি এবং যে খাদ্য আমরা আহার করি তাহা হইতেই রক্ত উৎপন্ন হয়। ভাল খাদ্য আহার করিলে বিশুদ্ধ রক্ত উৎপন্ন হয়। প্রচুর জল খাইলে রক্তের মধ্যের দূষিত পদার্থ পরিষ্কার হইয়া যায়। রক্ত ভাল রাখিতে হইলে ব্যায়াম বিশেষ প্রয়োজন।

হাড় ও পেশী (Bones and muscles.)

২০৬টী হাড় যথাস্থানে মিলিত হইয়া মানুষের যে কঙ্কাল (skeleton) বা হাড়ের আকৃতি তৈয়ারী হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই জীবিত, কারণ প্রত্যেকটীরই মধ্যেই শিরা আছে ও রক্ত চলাচল করিতেছে। এই কঙ্কালের দ্বারা মানুষের আকৃতি ঠিক হয় এবং মানুষ দাঁড়াইতে সক্ষম হয়। যদি হাড়গুলি এরূপভাবে যথাস্থানে মিলিত না হইত, মানুষ মোটেই দাঁড়াইতে পারিত না, পোকার মত হামাগুড়ি দিতে হইত। প্রত্যেক হাড়টিই এমনভাবে মিলিত হইয়াছে যে, তাহার প্রত্যেকটিরই বিশেষ ব্যবহার আছে। মস্তিষ্কে যাহাতে আঘাত না লাগে, তাহার জন্য মাথার খুলি (skull) গোলাকৃতি শক্ত হাড়ের দ্বারা আবৃত আছে। সেইরূপ হৃদ্‌পিণ্ড ও ফুস্‌ফুসে যাহাতে উপর হইতে আঘাত না লাগে, তাহার জন্য পাঁজরাগুলি (ribs) যথাস্থানে

স্থাপিত হইয়া তাহাদের রক্ষা করিতেছে। হাতের ও পায়ের হাড়গুলি লম্বা থাকার দরুণ আমরা হাত পা সহজে তাড়াতাড়ি নাড়াচাড়া করিতে পারি। শৈশবকালে হাড়গুলি নরম থাকে। সেইজন্য যাহাতে হাড়গুলি বিকৃত না হইয়া যায় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি একটী সদ্যঃপ্রসূত শিশুকে সকল সময়ই একভাবে শোয়াইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে তাহার মাথার আকৃতি অস্বাভাবিক হইয়া যায়। সেইজন্য শিশুদিগকে মধ্যে মধ্যে অদল বদল করিয়া শোয়াইতে হয়। শিশুদিগকে অল্প বয়স হইতে যদি দাঁড় করান হয়, তাহা হইলে তাহার পা বাঁকিয়া যাইবে। হাড় ছোট থাকা ও দুর্ব্বলতার জন্য বালকদিগের বাড় (growth) হইতে দেরী হয়, তাহার একমাত্র কারণ উপযুক্ত আহারের অভাব। সেইজন্য তাহাদের খাদ্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

দুইটী হাড়ের সন্ধিস্থলকে joint বলে। আঙ্গুলের হাড়গুলি একভাবে যুক্ত হইয়াছে; আবার গাঁটের হাড়গুলি আর একভাবে যুক্ত হইয়াছে। এইরূপ পৃথক পৃথক স্থান, পৃথক পৃথক ভাবে যুক্ত হওয়ার বিশেষ ব্যবহার আছে। এবং হাড়ের সন্ধিস্থলগুলি খুব শক্ত শক্ত সরু সুতার ন্যায় ligaments দ্বারা আটকাইয়া আছে। এইগুলি কোন প্রকারে ছিঁড়িয়া গেলে হাড়ে মোচড় (sprain) লাগে। হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে যদি তাহার ভাল করিয়া যত্ন লওয়া হয়, তাহা আবার সারিয়া যায়।

পেশী (Muscles)

মানুষের শরীরের চামড়া ও চর্ব্বির নীচে পেশী থাকে। শরীরের মধ্যে যে পেশীগুলি জীবিত সেগুলি লাল। শরীরে ৫০০র উপর পেশী আছে এবং তাহাদের প্রত্যেকটীরই আকৃতি ও আয়তন (shape and size) পৃথক্ পৃথক্। কোন কোনগুলি লাল, কোন কোনগুলি লম্বা ও বেঁটে, কোন কোনগুলি বড় ও ছোট। পেশীগুলি শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে নাড়াচাড়া করিবার সহায়তা করে। এমন কি শুধু দাঁড়াইয়া থাকিবার সময়ও কতকগুলি পেশী এরূপভাবে সঙ্কুচিত (contracted) হইয়া থাকে যাহাতে আমরা দাঁড়াইতে পারি।

স্নায়ু-মণ্ডলী (Nervous System)

শরীরের মধ্যে অনেক প্রকারের যন্ত্র আছে ও তাহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কায করিতেছে। যথা, পাকস্থলী খাদ্য হজম করিতেছে, মূত্রাশয় শরীরের সমস্ত দূষিত পদার্থ বাহির করিতেছে। চর্ম্ম শরীরের উত্তাপ নিয়মিত করিতেছে। হৃৎপিণ্ডের সাহায্যে শরীরের মধ্যে রক্ত-সঞ্চালন হইতেছে। প্রত্যেক যন্ত্র যথাসময়ে ও একত্র মিলিত হইয়া শরীরের মধ্যে কায করিতেছে। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই শরীর অসুস্থ হয়।

শরীর ও ইহার যন্ত্রগুলিকে একটী ফৌজের সহিত তুলনা করিতে পারা যায়। একটী ফৌজের ভিন্ন ভিন্ন কায অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন লোক নিযুক্ত থাকে ও তাহারা যথাসময়ে কায করে; এবং যখন ইহারা একত্র কায করে তাহাই বিশেষ করিয়া লক্ষ্যের বিষয়। এই সকল কায ঠিকভাবে চালিত করিবার জন্য, এবং প্রত্যেক সৈন্যের উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য একটী লোক আবশ্যক হয়। সেইরূপ শরীরের মধ্যে সমস্ত যন্ত্রগুলি ঠিকভাবে চালিত করিবার জন্যও একটী চালক বিশেষ আবশ্যক। স্নায়ু-মণ্ডলী শরীরকে চালিত করিতেছে। এই স্নায়ু-মণ্ডলীই শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে দিয়া যথাসময়ে ও ঠিকভাবে কায করাইয়া লইতেছে। যখন আমরা কোন জিনিষ ধরিতে কিম্বা চলিতে ইচ্ছা করি, স্নায়ু-মণ্ডলীই আমাদিগের দ্বারা উহা করাইয়া লয়। এক কথায়, স্নায়ু-মণ্ডলীই আমাদের সমস্ত কার্য্য চালিত করিতেছে। যখন আমরা কোন বিষয় চিন্তা করি, বা স্মরণ করি, এই স্নায়ু-মণ্ডলীই আমাদের ঐ কার্য্যে সাহায্য করে।

মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড
(Brain and Spinal cord)

মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড, এই দুইটী স্নায়ু-মণ্ডলীর প্রধান বিভাগ। মস্তিষ্কটী একটী মোটা হাড়ের বাক্সের দ্বারা আবৃত আছে। তাহাকে খুলি (skull) বলে। বাস্তবিকই মেরুদণ্ড একটী লম্বা রজ্জুর আকৃতিতে মস্তিষ্কেরই প্রসারণ। মেরুদণ্ডটী প্রায় একটী আঙ্গুলের ন্যায় মোটা। ইহা মস্তিষ্কের নিম্ন অংশের সহিত সংযুক্ত হইয়া মাথার

খুলির মধ্য দিয়া, বড় গর্ত্তের মধ্য দিয়া নামিয়া আসিয়াছে। মেরুদণ্ডের এক একটী হাড়কে vertebra বলে। এইরূপ ৩৩টী vertebra একটীর উপরে একটী যথাস্থানে মিলিত হইলে যে আকৃতি হয় তাহাকে vertebral column বলে। তাহার মধ্যস্থলে একটী বড় গর্ত্ত আছে। এইরূপে হাড়গুলি যথাস্থানে একটীর উপর একটী মিলিত হইয়া যে গর্ত্তের সৃষ্টি হইল তাহাই মেরুদণ্ডের অবস্থানের স্থান। মেরুদণ্ডটী এই গর্ত্তের মধ্য দিয়া একেবারে পাছার কাছে নামিয়া আসিয়াছে, আবার মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড হইতে অনেক ছোট ছোট শিরা উপশিরা শরীরের সমস্ত জায়গায় চালিত হইয়াছে। এই শিরা উপশিরাগুলি এত বেশী ও এত কাছাকাছি ভাবে শরীরের মধ্যে অবস্থান করিতেছে যে একটী খুব সরু ছুঁচও তাহাদের কাহাকে না কাহাকেও আঘাত না করিয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

স্নায়ু রজ্জু ও স্নায়ু অংশু

(Nerve cells and fibres)

মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডটীকে যদি পৃথক পৃথক ভাবে বাছা যায় তাহা হইলে তাহার মধ্যে অনেক ছোট ছোট সাদা সুতা পাওয়া যায়। তাহাদিগকে স্নায়ু অংশু (Nerve fibre) বলে। প্রত্যেক স্নায়ু-অংশুর মুখে (end) একটী করিয়া ছোট গ্রন্থি আছে। ইহাদিগকে স্নায়ুরজ্জু (Nerve cell) বলে। প্রায় প্রত্যেকটী স্নায়ুরজ্জুই মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। মস্তিষ্কের এই স্নায়ুরজ্জুগুলির দ্বারাই আমরা চিন্তা ও কোন জিনিষ স্মরণ করিতে সক্ষম হইতেছি এবং ইহাই আমাদের শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি চালিত করিতেছে। যেমন টেলিগ্রাফের তারগুলি সদর ও শাখা অফিসের সহিত যুক্ত হইয়া কাজ করিতেছে, সেইরূপ স্নায়ুরজ্জুগুলি শরীরের সমস্ত স্থান হইতে মস্তিষ্কে যুক্ত হইয়া শরীরের সমস্ত কাজগুলি চালিত করিতেছে। আবার স্নায়ুঅংশগুলি মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের হুকুমমত শরীরের মধ্যে দূতের ন্যায় কাজ করিতেছে।

মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের কর্ত্তব্য

(Function of the brain and spinal cord)

যেমন কোন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সহরে থাকিয়া তাহার কাজ করে, সেইরূপ মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডও শরীরের মধ্যে কাজ করিয়া থাকে। যেমন টেলিগ্রাফের তারগুলি শাসনকর্ত্তার সহিত সমস্ত সহরে যুক্ত আছে, সেইরূপ শিরা-গুলিও শরীরের সকল স্থানের সহিত যুক্ত আছে। কোন কিছু ঘটিলে টেলিগ্রাফের তারের সাহায্যে শাসনকর্ত্তা সমস্ত খবর পাইয়া তৎক্ষণাৎ হুকুম জারী করে, সেইরূপ মস্তিষ্ক যে শুধু স্নায়ুসংশুর দ্বারা শরীরের পৃথক পৃথক স্থান হইতে খবর লইয়া হুকুম জারি করে তাহা নহে, শরীরের পেশীগুলি নাড়াচাড়া ও হৃৎপিণ্ডটীরও কাজ করে। যখন আমাদের হাঁটিবার ইচ্ছা হয়, মস্তিষ্কই আমাদের পায়ের পেশীগুলিকে চলিতে হুকুম করে। যদি চক্ষুর নিকট হইতে খবর আসে যে শরীরের নিকটেই একটী সাপ রহিয়াছে, তাহা হইলে মস্তিষ্কই শরীরের পেশীগুলিকে সেইখান হইতে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিতে হুকুম করিবে। যদি আঙ্গুলে গরম অনুভব হয়, তাহা হইলে আঙ্গুলের শিরাগুলি তৎক্ষণাৎ মস্তিষ্কে ও মেরুদণ্ডে খবর দিবে এবং মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডও তৎক্ষণাৎ হাতের পেশীগুলিকে সেই স্থান হইতে অঙ্গুলীটীকে সরাইয়া লইতে হুকুম করিবে। যদি শিরাগুলি শরীরের মধ্যে না থাকিত তাহা হইলে আমরা কোন জিনিষই অনুভব করিতে ও তাহার কাজ করিতে পারিতাম না। স্মরণ করা, চিন্তা করা, অনুভব করা, ভালবাসা, ঘৃণা করা, এই সকলই মস্তিষ্কের কাজ। কোন কিছু করিতে বা বলিতে ইচ্ছা করিলে মস্তিষ্কই আমাদের সমস্ত ঠিক করিয়া দেয়। এক কথায় মস্তিষ্কই শরীরের সমস্ত কিছু চালিত করিতেছে। যে সকল স্নায়ু-অংশগুলি শরীরের অঙ্গ স্থান হইতে মস্তিষ্কের সহিত যুক্ত আছে, যদি তাহাদের কোন একটীকে দুই ভাগে বিভক্ত বা আঘাত করা যায়, তাহা হইলে সেইটী অবশ হইয়া যাইবে। তাহার ফল স্বরূপ আমরা সে স্থানের কোন কিছুই অনুভব করিতে পারিব না। যাহারা মাদক দ্রব্য সেবন করে বা যাহাদের শরীরে পারা

আছে, তাহাদের শরীরের অনেক অংশ অবশ হইয়া থাকে; কারণ মাদক দ্রব্যগুলির বা পারার বিষ স্নায়ু-অংশগুলিকে ধ্বংস করে।

স্নায়ুমণ্ডলীর স্বাস্থ্য

(Hygiene of the Nerve System)

স্নায়ুমণ্ডলীকে সুস্থ রাখিতে হইলে শরীরের আর আর সকল অংশকে সুস্থ ও সবল রাখিতে হইবে। স্নায়ু-মণ্ডলীকে কার্য্যকরী রাখিতে হইলে উপযুক্ত আহার, শুদ্ধ বাতাস, নিদ্রা ও শরীরের উপযুক্ত ব্যায়াম ও মনের সুস্থতা প্রয়োজনীয়। মনের উপর স্বাস্থ্যের ও স্নায়ুমণ্ডলীর উভয়েরই অনেক কিছু নির্ভর করিতেছে। মনের উত্তেজনার সময় হৃৎপিণ্ড জোর চলে। যখন কেহ ভয় পায় তখন তাহার শরীরে উত্তাপ না অনুভব করিলেও তাহার শরীর হইতে আপনিই ঘাম বাহির হয়। অনেক সময় অপত্যাদি বিয়োগে মনে আঘাত লাগিয়া মানুষকে অজ্ঞান হইয়া যাইতে দেখা যায়। দুঃখের সময় বা রাগের সময় না খাইয়াও থাকিতে পারা যায়; তাহাতে ক্ষুধাও হয় না। মন যখন প্রফুল্ল থাকে, তখন ক্ষুধাও বাড়ে এবং সমস্ত শরীরও সুস্থ থাকে। এই সকল হইতে আমরা দেহের উপর মনের আধিপত্য অনুমান করিতে পারি। সৎ চিন্তার দ্বারা শরীরকে ও মনকে সুস্থ রাখিতে পারা যায়।

ব্যায়াম (Exercise)

শরীর সুস্থ ও সবল রাখিতে ব্যায়াম একান্ত দরকার। সকলেরই জানা আছে একটী যন্ত্র ব্যবহার না করিলে তাহা খারাপ হইয়া যায়। সেইরূপ ব্যায়াম ব্যতিরেকে শরীরও খারাপ হইয়া যায়। যদি আমরা কিছু দিনের জন্য কেবল বসিয়া ও শুইয়া থাকি, পায়ের কোন কাজ না করি, তাহা হইলে পা টী এত দুর্ব্বল হইয়া যাইবে যে, দাঁড়াইতে কিম্বা হাঁটিতে মোটেই সক্ষম হইব না। যদি আমরা ব্যায়াম না করি, তাহা হইলে মাংসপেশীগুলি ছোট এবং নরম (atrophy) হইয়া যাইবে; এবং রক্তের তেজ কমিয়া শরীরে অন্য রোগের বীজ প্রবেশ করিবে। ব্যায়ামের সময় হৃৎপিণ্ডটী জোরে তাড়াতাড়ি কাজ করে। তাহাতে রক্ত শরীরের মধ্যে ভালভাবে চালিত হয়। ব্যায়ামের সময় শরীরের মধ্যে নিশ্বাস দ্রুতভাবে চলা ফেরা করে; তাহাতে অম্লজান বাষ্প শরীরের মধ্যে ভালভাবে প্রবাহিত হয়। একটী প্রবাদ আছে শরীর ভাল থাকলে মনও ভাল থাকে। শরীরের ব্যায়াম না করিলে মনও ভাল থাকে না। আমার মনে হয়, যদি কেহ বেশী খাটিতে ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করিতে চায়, তাহা হইলে প্রত্যহ বিধিপূর্ব্বক ব্যায়াম করা বিশেষ প্রয়োজন। অনেকের ধারণা আছে যাহারা মস্তিষ্কের কাজ বেশী করে তাহাদের ব্যায়াম করিবার দরকার হয় না। ইহা একেবারে ভুল। শারীরিক ব্যায়াম যেমন বালকের ও সকল লোকেরই দরকার, তেমনি বালিকাদিগের এবং স্ত্রীলোকদিগেরও বিশেষ দরকার। প্রত্যেকেরই তাহার শরীরের দুর্ব্বলতার দরুণ লজ্জা পাওয়া উচিত। যখন ভগবান মানুষের শরীর সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন সেই শরীর যাহাতে সুস্থ ও সবল থাকে তাহার পন্থাও নির্ণয় করিয়াছেন। শরীরকে পুষ্ট রাখিবার জন্য তিনি যে কেবল খাদ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা নহে, মানুষকে যাহাতে খাদ্য জোগাড় করিবার জন্য শরীরের কাজ কিছু করিতে হয় তাহার পন্থাও ঠিক করিয়াছেন। যে প্রত্যহ কেবল খাইয়াই যায় এবং শরীরের কোন ব্যায়াম করে না, তাহার দ্বারাই স্বাস্থ্য রাখিবার প্রধান নিয়মটী লঙ্ঘিত হইয়া তাহার ফলস্বরূপ শরীর দুর্ব্বল ও রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। বালক-বালিকা-দিগকে সকল সময়ই যদি বসিয়া পড়িতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাদের নিশ্বাসের কাজ কম হইয়া আসিয়া ফুসফুসে বাতাস কম প্রবেশ করিবে। তাহাতে হৃৎপিণ্ডের কাজও কম হইবে। মনও ঠিক রাখিতে পারিবে না এবং ভালরূপ পড়াও হইবে না। সেইজন্য বালকদিগকে জোর করিয়া খেলিতে দেওয়া উচিত। এই সকল খেলাধূলা ছাড়াও প্রত্যেককে সকালে ও বৈকালে কিছুক্ষণের জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করিতে হইবে। তাহাতে তাহাদের শরীর আরো ভাল হইবে, মনও প্রফুল্ল থাকিবে।

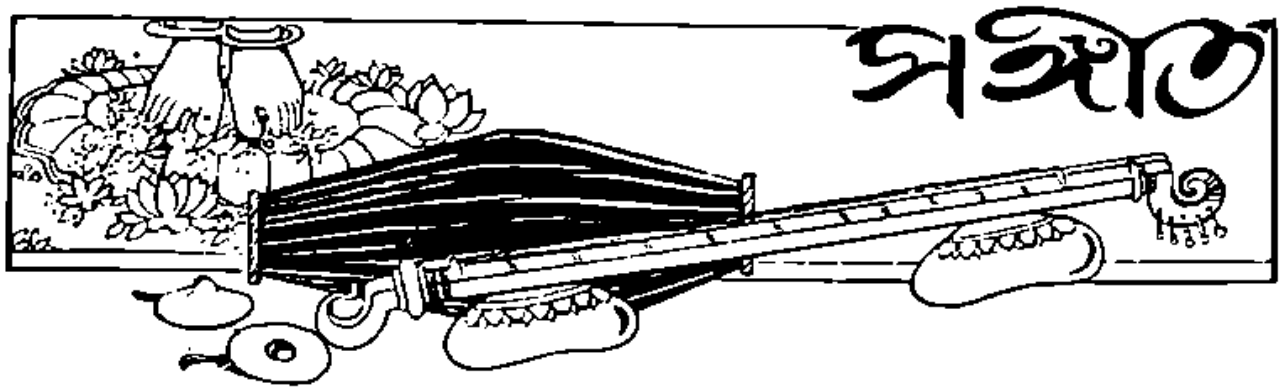

আশাপূরণ

(স্বরমাত্রিক ছন্দ)

নৃত্যসঙ্গীত

কথা ও সুর—শ্রীদিলীপকুমার রায় স্বরলিপি—শ্রীমতী সাহানা দেবী

কৃষ্ণের মঞ্জীর মাঝ সুরহীন স্বর পায় লাজ,
অন্তর গায় : "সাজ সাজ— উৎসব-রব-ছন্দে।"
মধুর প্রাণ-কুঞ্জে মূর্চ্ছন মিড় যুঞ্জে,
ভৃঙ্গের আশ গুঞ্জে— ফাল্গুন স্তব গন্ধে।

"ঘোল্ ঘোল্"—গায় মর্ম্মে, "দূর কর দায় কর্ম্মে
"তোল্ নর্ত্তন-নর্ম্মে সঙ্গীত স্রোত চঞ্চল
"ভক্তির রঙ্ দীপ্ত, বিশ্বের ছন্দ তৃপ্ত,
"স্বপ্নের দল রিক্ত ভরপূর রস-উজ্জ্বল।"

অম্বর ঐ গল্‌ল, অঙ্কুর লাখ ফল্‌ল,
খঞ্জন মন টল্‌ল— পাখ্‌নায় নীল নৃত্য,
সুপ্তির ঘোর ছুট্‌ল সিন্ধুর বাঁধ টুট্‌ল
চিত্তের ফুল ফুট্‌ল বিহ্বল প্রেম-সিক্ত।

আজ সুন্দর বল্লভ! শিঞ্জন-রূপ-সৌরভ
বায় পাণ্ডুর বৈভব ঐহিক সাজ সজ্জা :
সংশয় সব কাট্‌ল নন্দন-ধন জাগ্‌ল
মুক্তির ভায় জাগ্‌ল মুখ—বন্ধন-লজ্জা। *

FULFILMENT

The sound of Krishna's anklets has put to shame the toneless voice of the earth :
The heart sings : "Don thy bridal robes to celebrate the festival advent of the Lover."
In the slow bower of life bursts out a revelry of song
And a bee-hum of welcome tones the fragrance-hymn of Spring.

* আমার এ অনুবাদটি শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক সংশোধিত।

There is a chant in the soul : Swing in the swing of joy, push care and toil away ;
Plunge into the play of the Dance, bathe in the swirling rapids of the universal symphony ;
Relumed is the bonfire of adoration the heart of the world is satisfied ;
The hand of once empty dreams are now flushed with the wine of fulfilment."

The sky melts in a passion of sweetness, the barren seeds bear by the millions :
The bird of paradise soars towards her skies the dance of the blue glistering on her wings :
The heavy haze of slumber has fled the embankments are broken :
The flower of the heart has budded in a dewy ecstasy of Love.

Today O Beautiful O Beloved thy loveliness is like a fragrant breeze
And the glories of the world fade before it and are turned into a garish pallor.
All doubts are dispelled, the gardens of Paradise flower in the dust of earth
Before the sunshine of Love's liberation darkness and bondage are ashamed and have

hidden their faces.

একতালা

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
সা -। মা | গা মগা মা | গা মা ধা | -। -। -। | পা ধা র্সা | ণা ধা পা | ধা র্রা র্সা | -। -। ণা |
কু ঞ্জে র মন্ ঝী র মা - - ঝ্ ঝু র ঝী ন ঝ র পা র লা - - ঙ্

ণা -। ণা | ণধা ণধা ণা | র্সা ণা ধা | -। -। ণা | ণধা -। পা | ধা র্সা ণর্সা | ধণা ধপা মা | -। -। -। |
অ ন্ ত র গা র সা জ সা - - ঙ্ উ ত্ স ব ম য় ছন্ দে

মা -। মা | মা মগা পমা | রা মা ধা | -। -। -। | ধা -। ধা | ধা ধণা ধপা | পধা র্সা ণর্সা | ণা -। -। |
ম ন্ থ র প্রা ণ কু ন্ জে - - - মু ন্ ছ ন মি ড় মু ন্ জে

ণা -। ণা | ণা র্রা র্সর্রা | ণর্সা ণা ধা | -। -। ণা | ণধা পা পা | পধা ধর্সা ণর্সা | ধণা ধপা মা | -। -। -। |
ভ ঙ্ গে র আ শ ও ন্ জে - - কা ল্ ও ন ন ব গন্ - ধে - -

মা -। মা | -। পমা পমা | পা রা রা | -। -। -। | সা রা মা | পা ধা ধপা | পধা পধা র্সণা | -। -। -। |
লো ল্ লো ল্ গা র ম ন্ মে দু ন্ ক ন্ ঘা র ক ন্ মে

ধা -। ধা | -। ধা র্রা | র্সা -। র্জ্ঞর্রা | র্সণা ধণা -। | ধা -। ধা | ধা ধা র্সা | পা -। পা | -। -। র্সা |
তো ল্ ন ন্ ত ন ন ন্ মে - স ঙ্ গী ত স্রো ত চ ন্ চ - - ল

ধা ণা ধপা | ধা পমা পা | রা মা পা | ধা পমা -। | সা -। মা | পা ধা র্সা | র্রা র্গা র্সর্রা | -। -। ণা |
ত ক্ ত ি র ন ও ঝী পূ ত - - - বি শ্ শে র হৃ দি ভৃ প্ ত - - -

ণা -। ণা | ণা র্রা র্সর্রা | ণর্সা ণা ধা | -। -। ণা | ণধা -। পা | ধা ধর্সা ণর্সা | ধণা ধপা মা | -। -। -। |
স্ব প্ নে র ম ল নি ক ত - - - ত ন্ পূ র ন ন উ চ্ছ - - ল্

মা -া মা | মা পমা গমা | পা রা রা | -া -া -া | সা রা মা | পা ধা পা | ধা মা মা | -া -া -া |
অ ম্ ব র ও ই গন্ - ল অ ঙ্কু র লা খ ফ ল্ ল

মা -া ধা | পা ণা ধা | ণধা পা মা | পা -া -া | ধা ণা ধণা | র্সা না র্সা | র্সা নর্সা ধণা | র্সা না র্সা |
খ ন্ জ ন ম ন চ ল্ - ল পা খ্ না র নী ল নৃ - ত্য

র্সা-া র্ব্জ্ঞা | র্ব্জ্ঞা র্রা র্গা | র্সনা র্সা র্রা | -া -া ধা | ধা ণা র্সা | র্সপা পা পা | পা ধা পধা | ণা -া -া |
ম্ প্ তি র ঘো র ছু ট ল সি ন্ ধু র বা দ্ ট্ ট ল

ধা ণা র্সা | র্সনা র্সা র্রা | র্সা -া র্সা | পা ধা পা | সা রা মা | পা ধা র্সা | র্রা র্গা র্গা | -া -া -া |
চি - ত্তে র মু ল ছু ট ল - - - বি উ ত ল প্রে ম সি ক্ ত - - -

র্সা র্গা র্গা | -া র্গা র্মা | র্রগা র্মা র্গা | -া র্মগা র্রসা | র্সা র্রা র্রা | রমা পা পা | পা সা র্সা | -া -া ণা |
আ জ ম্ ন্ দ র ব ন্ - ল ত শি ন্ জ ন রূ প স উ র - - ত

ধা ণা র্সা | র্রা র্সা ণা | ধা ণা পা | -া পা -া | সা রা মা | পা ধা মা | পা ধা র্সা | -া -া -া |
বা য় পা ন্ ডু র ব ই ত - - ব ও ই হি ক সা জ স জ্ জা - - -

না র্সা র্রা | র্ব্জ্ঞা র্রা র্গা | না র্সা র্রা | -া -া -া | র্সর্গা -া র্মা | র্মা র্মা র্মা | র্জ্ঞা -া র্রা | -া -া -া |
স ঙ্ শ য় স ব কা ট ল - - - 'ন্ - দ ন ব ন জা গ্ ল

র্সা -া র্সা | র্সা র্রা র্সা | ণর্সা ণা ধা | -া -া ণা | ণধা পা ধা | -া র্সা ণর্সা | ধণা ধপা মা | -া -া -া |
মু ক্ তি র ভা য় র্রা প্ ল - - - মু খ ব ন্ ধ ন ল - জ্জা - - -

এ গানটি নানারূপ লয়কারী দ্রুত তান দেওয়া যাইতে পারে। বাহুল্যভয়ে এখানে স্বরলিপি দিলাম না—স্বরলিপি-পুস্তকে দিব। এ গানটি নৃত্যসঙ্গীত—তাই ঠায়ে না গাইয়া দ্রুত গেয়। এ গানটির ছন্দও নূতন। স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রতি পর্ব্বে পাঁচটি সিলেবল্ দিয়ে গান বা কবিতা ইতিপূর্ব্বে রচিত হয় নি। এটি প্রবোধ সেনের পরিভাষায়—পাঞ্চস্বর চৌপদী—স্বরবৃত্ত। অবশ্য মাত্রাবৃত্তেও এটিকে আবৃত্তি করা যায়—(ইহা স্বরমাত্রিক ছন্দেরচিত বলিয়া ইহার প্রকৃতি কবিতা উভধর্ম্মী) কিন্তু ইহার প্রকৃত রূপটি স্বরবৃত্ত—শ্রীঅরবিন্দেরও মতে। ইহার scansion এইরূপ

```
+           +           +           +
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
রুষ্ নেত্র মন্ ক্রীর মাঝ্ | সুর হীন্ স্বর পায়্ লাজ্ |
অন্ তর গায়্ সাজ্ সাজ্ | উত্ সব্ রব্ ছন্দ্ দে |
```

এবং তাল বা প্রথম প্রথম ও তৃতীয় সিলেব্‌লে। এইভাবে পড়িলে ছন্দটির গতি লচক ও নূতনত্ব সম্যক্ ফুটিয়া উঠিবে। মাত্রাবৃত্তে পড়িলে ইহার ভঙ্গী অনেকটা সাধারণ মনে হইবে।

———

বিবিধ-প্রসঙ্গ

দর্শনের পূর্ব্ব পরিচয়

অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য এম্-এ

মানুষ যখন থেকে বাহিরের ও ভিতরের কথা ভাবিতে শিখিয়াছে তখন হইতেই দর্শনের রচনা আরম্ভ হইয়াছে। 'মানুষ মৃত্যুর পর কোথায় যায়' এই প্রশ্নটী সনাতন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানুষ যখন ভাল করে ভাবিতে শিখে নাই, তখন তাহার চিত্তরোধের রুদ্ধ-দ্বার উদ্ঘাটিত করিবার জন্য সঙ্কেতে করাঘাত করিয়াছিল এই চির-অনাবৃত বিয়োগ। মৃত্যু মানবের অপ্রিয় হইলেও পরম মিত্র। একটী জীবনের জ্ঞানধারায় বিরাম ইহারই নিপিত হাতের আঘাতে হইলেও সহস্র সহস্র জ্ঞানের প্রস্রবণও উৎসারিত হইয়া থাকে। প্রিয়জনের চিতি-ভূত শোক-বহ্নি চিত্তভূমি দাহিত করিলেও উর্ব্বর করিয়া যায়। প্রিয় বন্ধুর মৃত্তিকে এমনিই উজ্জ্বল করে তুলে এই বিয়োগ যে জাগ্রত অবস্থায় সেই বন্ধুর কায়াখানি বাহিরের বস্তুরূপে যে-ভাবে প্রত্যক্ষ হইত ঠিক সেই ভাবেই স্বপ্নাবস্থায় সেই দেহটী শোক-সন্তপ্ত প্রিয়-জনকে দেখা দেয়। স্বপ্নের দেহটী কি ছায়া? না সেই দেহই নূতন স্তরে আসিয়া পড়িয়াছে। সেটী ইন্দ্রিয়ের অধিকারে ছিল, সেটিতে এখন মনের মাত্র অধিকার। যে জাগ্রত অবস্থায় দিনের আলোকে কোলাহলে আপনাকে পাঁচজনের সঙ্গে দেখা দিত, এখন সে নিদ্রিতাবস্থায় রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে গোপনে একা এসে দেখা দেয়। কিন্তু সেই আসে। তার সেই দুখার দেহ, সেই ব্যাকুল দর্শন-পিপাসু চোখ দুটি, সেই স্নেহের মত কাল চুল, সেই বহু আলিঙ্গিত ও পরিচিত বক্ষ, সেই কণ্ঠস্বর, তার সবই পুরাতন নিয়ে সে আসে। সে যদি থাকে, তাহা হইলে সে কাতর প্রার্থনায় মুক হইয়া থাকে কি করিয়া? যদি তাহার দেহ থাকে, তাহা হইলে তাহা দেখা যায় না কেন? যদি নাই থাকে, তাহা হইলে সাথে মাঝে আসে কি করিয়া? এই প্রেতের বিচিকিৎসাই প্রাচীন যুগের মানবের চিন্তা-শরীরের যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত।

এই যন্ত্রণার শান্তি পাইবার জন্য মানব কত দেবতা গড়িল। তাঁহাদের উদ্দেশে কত স্তোত্র পাঠ করিল, কত যজ্ঞের আয়োজন হইল; কিন্তু অতৃপ্ত মন বুঝিল না। নচিকেতার মত প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই আকুল হইয়া উঠিল। মানবের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি অন্তর্লীন হইল। জ্ঞানলাভের তীব্র-তৃষ্ণা মানবকে ত্রস্ত করিয়া দিল। সকল চাঞ্চল্যের বিরাম হইল। প্রশান্ত মন-সমুদ্রে চিন্তাকাশের প্রতিবিম্ব পড়িল। মানবের তীব্র তৃষ্ণার অপনয় হইল। মানবের জীবনেরও বিশ্রাম-ঘাটের সন্ধান পাওয়া গেল। জীবনের সঙ্কীর্ণ ধারায় বিরাট বিশ্ব নদীর সমুদ্রে আত্ম-সমর্পণের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। সে আপনার সত্তা হারাইল বা নূতন আকার পুনরায় পাইল। মৃত্যুর পরিচয়ও হইল আপনার পরিচয়ের সঙ্গে। বিশ্বের কেন্দ্র-শক্তির নিত্য কৃত্যের মহিমা অবগত হইতেছে একমাত্র সঙ্গতকারী এই মৃত্যু। যে অমঙ্গলরূপে আমাদের নিকট পরিচিত, সেই মৃত্যুই মরণ-বেদীর আলিপনা রচনা করিতেছে আপনার দক্ষিণ হস্তে। পদ্মের কাছে যেমন স্নিগ্ধ চন্দ্রাতপ উদ্বেগের কারণ, সেইরূপ-ব্যক্তির কাছে ব্যথার দেবতা ভয়াবহ। তাঁর অমৃত-স্পর্শে হলাহলের তীব্র জ্বালা অনুভূত হয়। প্রাচীন যুগের ঋষি সুখ-দুঃখের আঘাতে বর্জিত। তিনি মিলনেও আবেশিত নহেন, বিয়োগেও অনুমাত্র ব্যথিত নহেন। তিনিই সমাধির আলোকে সংসারের অন্ধকার ভেদ করিয়া বিশ্বনাথের হৃদ্যোবদ্ধ মর্ম্মের অনুসন্ধান পাইলেন। এই মৃত্যুই বিশ্বের কর্ম্মগতি। কর্ম্ম এখানে নিরবসাদ-ভাবে ফল প্রসব করে। এর বিরাম বা আধিক্য নাই; কিন্তু বৈচিত্র্য আছে। এর সামঞ্জস্যও বৈচিত্র্যের মধ্যে। সে সামঞ্জস্যের অনুভূতি স্থূল দৃষ্টিতে হয় না। সমাধির পূত আবেশে মনের শুদ্ধি না হইলে কে সে অপূর্ব্ব নূপুর-শিঞ্জন শুনিতে পায়? সংসারের দৈন্য ও মনের দৈন্য আমাদের দৃষ্টির দৈন্য এনে দেয়। আমাদের দৃষ্টি নির্ম্মল করিতে হইলে মনকে নির্ম্মল করিতে হইবে। মন নির্ম্মল হয় সমাধির তুষার-লেপে। জ্ঞানের যখন পূর্ণ বিকাশ, তরঙ্গ আসে নাই তখনই দর্শন, এ জ্ঞান সাধারণের নাই, তাহারা অন্ধ। দিবার আলোক তাদের কাছে পাতাল-পুরীর অন্ধতমের কুহকের মধ্যবর্ত্তী পুঞ্জীভূত অন্ধকার। এ যুগের দর্শন প্রকৃত দর্শনই বটে। দ্রষ্টার আপন-পর নাই, অহমিকা নাই। আছে তন্ময়তা, আছে অনির্ব্বাচ্য উল্লাস। এ মানসিক অবস্থা আমাদের সংসার-ধর্ম্মার হয় না। প্রিয়জনের আলিঙ্গনে ইন্দ্রিয়গণ বিকল হইয়া পড়ে, শরীরের প্রতি রোমকূপে পুলক মূর্ত্ত করে; আমরা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ি। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে সকল ইন্দ্রিয় অন্তর্গামী হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়ে; কিন্তু প্রজ্ঞান-দীপ নিষ্কম্প ভাবে জ্বলিতে থাকে। দর্শনের প্রতিষ্ঠা হইল সত্য দীর্ঘ সাধনার ফলে মনের অন্তরতম প্রদেশে; কিন্তু এ লোকে নয় অতিলোকে। আজ্ঞার থাকিলে আসল পাওয়া যায় না। আসল পাইতে হইলে জন-সমাজ ত্যাগ করিয়া, সকল কামনা বিসর্জ্জন দিয়া শুধু একেরই চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিতে হইবে।

এখানে দর্শন খুবই সত্য হইল। জ্ঞান ও ব্যবহারের কোনই দ্বৈত-ভাব বা বিরোধ রহিল না। দার্শনিক সকল বিরোধে অবিরোধ, সকল অসামঞ্জস্যে সামঞ্জস্য ও সকল অসঙ্গতিতে সঙ্গতি দেখিতে লাগিলেন। আত্মীয়-বিয়োগে মনে বিকারের দাগ নাই; গৃহমাঝে চিন্তার কলাট সঙ্কুচিত হয় নাই; অর্থের জন্য ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ নাই। অযাচিত ভাবে প্রাপ্ত অন্ন-মুষ্টিতেই সন্তোষ। অর্থনাশে মর্ম্মন্তুদ হাহাকার-ধ্বনি নাই। এ যুগের দার্শনিক এক নূতন ধরণের জীব। সংসারাক্রান্ত সমাজে

সংসারহীন যেমন আশ্চর্য্য বস্তু, তেমনই সংসারীর কাছে এই সন্ন্যাসী। দর্শনের ধর্ম্মভূমিতে অবস্থান বেশী দিন রহিল না। অর্ত্তার নিম্ন স্তরে দর্শনকে নামিতে হইল। যে ব্যক্তি সমাধির যোগ্য নয়, সে কি প্রেতলোক, ভূত, ব্রহ্ম, আত্মা, প্রভৃতির রহস্য জানিতে পারিবে না? মানুষের এই সব জানিবার আকাঙ্ক্ষা স্বভাব-প্রসূত। এই সব জানিবার ইচ্ছা শিক্ষার ফলে হয় না। চিন্তা করিতে শিখিলেই লোকের মনে এই সব প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হয়।

উপনিষদের যুগে নীতি ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব মিলন হইয়াছিল। সক্রেটিসের মতই জ্ঞান যে কি বস্তু তাহা এই যুগের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়। বৃদ্ধ বয়স দর্শন আলোচনার সময়। তখন মনের গতি মন্দ হইয়াছে বটিও সংসারের মূলমূল তৃণ অঙ্কুরিত পর্ব্বতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সেই সংস্কারকে প্রতি ভাবনার দ্বারা দূর করিতে হইবে। সেই বয়সে সংসারের প্রতি বীতরাগ প্রায় সাধারণ লোকের আসিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের সে তেজ নাই। ভোগের ব্যাঘাত প্রতি পদে। সামর্থ্যাভাবে ভোগ করিতে যাইলেই লাঞ্ছনা। ভোগের স্পৃহাও সুতরাং দূরস্থ হইয়া পড়ে। ভোগের শক্তি ইহার নিম্ন স্তর করিলেও সক্রিয় করিয়া তুলিতে পারে না। শারীরিক জড়তা, অবসাদ, জরা প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর বার্ত্তা এনে দিতেছে। মুখের অতীত জীবনের সকল কথার স্মরণ হইতেছে। কত সোপন ব্যথা হৃদ্-যন্ত্রকে নিষ্ক্রিয় করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। তারই পরিচয় আমরা মুখের অব্যক্ত চিহ্ন হইতে পাইয়া থাকি। কত গুপ্ত লীলা অনিদ্র রজনীতে বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া থাকে। কোথায় যাব? কি হবে? প্রতি কার্য্যের কি কড়ায় গণ্ডায় প্রতিশোধ পাব? শাস্তি কি জীবনই হবে? এই সব চিন্তা-বৃশ্চিকের দংশন বৃদ্ধকে আরও অবসন্ন করিয়া দেয়। তখনই সে আশ্রয়ের জন্য ব্যস্ত হয়। নিবিড় অন্ধকার রাত্রে আলোকের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকে। সে ভাবে আশ্রয় কি নাই? অভয়বাণী কি শুনিতে পাব না? গতি কি হবে না? সবই অন্ধকার! ভাবিতে তাহার প্রাণ শিহরিয়া উঠে। সে থাকিতে পারে না—তাহার আশ্রয় চাই-ই চাই। বৃদ্ধ লাভের আশায় যন্ত্রণার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায়, নিজের জীবন ব্যাপী অকার্য্যের সংশোধনের আশায় বিফলতার প্রতিশোধের আশায় গৃহত্যাগী হয়। তার চাই সকল দুঃখ হইতে অব্যাহতি, বিশ্বের অণুপরমাণু হইতে বৃহত্তম পর্য্যন্ত সকল বস্তুর জ্ঞান, আর বিশ্বের অন্তরতম রহস্যশীল প্রাণশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ —এক কথায়, সকল অসম্পূর্ণতার বিমুক্তি।

মুক্তির মুক্তি চাইই। অন্ততঃ এই আলোচনা চাই। নতুবা তিনি সহজ সরলভাবে বাঁচিতে পারেন না। চিন্তা বা দুশ্চিন্তা তাঁহাকে আপনারই ভারাক্রান্ত ভার বাড়াইবার জন্য সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী করিয়া দেয়। তিনি জগতের বিষয় নিপুণভাবে ভেবে এক চমকপ্রদ আশার রাজ্যে উপস্থিত হন্। তিনি জ্ঞানের দ্বারাই আপনাকে এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া লন যে, পূর্ব্বজীবনের জ্ঞানের অস্পষ্ট রেখাটি পর্য্যন্ত থাকে না। এই জ্ঞানকে এমন দীর্ঘ ও কঠোর অভ্যাস দ্বারা আয়ত্ত করেন, যে তাঁহার যে অজ্ঞ-জ্ঞান ছিল তাহা বুঝা যায় না। আর নূতন জীবনে যাহাতে স্খলন না হয় তাহার জন্য সর্ব্বদাই জাগরূক থাকেন। এই পুণ্য প্রয়াগতীর্থে পবিত্র দেবদারুবনে হংসের ন্যায় নিত্যই সেই সিদ্ধবাণী বিহার করিয়া থাকেন। সংসারের ঘাতপ্রতিঘাত তাঁহাকে আর কষ্ট দেয় না। তিনি জ্ঞানতরঙ্গিণীতে অতীত জীবনের সকল ভীষণ পাপ-বন্যা উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি দীর্ঘ ক্লিষ্ট সাধনার দ্বারা যে নব অনাস্বাদ্য অধিকার করিয়াছেন ও সর্ব্বদা জাগ্রত বিবেক প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন, এই রাজ্যে অন্য রাজ্যের অনভিজ্ঞ লোকের সহসা প্রবেশের সুযোগ নাই। এক কথায়, এই সব যোগীর আদর্শ জীবনের অনুপাতে মানব-জীবন চালিত হয়—একসূত্রও ব্যতিক্রম হয় না। সে সুশিক্ষিত সারথির মত পূর্ব্বদৃষ্টচক্ষুর মার্গ রেখা অনুসরণ করিয়া পথ অতিক্রম করে। যোগীকে দেখিলে মনে হয় আদর্শ জীবন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

নীতি ও জ্ঞানের মৈত্র চিরস্থায়ী হইল না। জ্ঞানপিপাসা নীতি-বাগীশের যেরূপ আছে উচ্চ মূলের তার চেয়ে কিছু কম নয়। দর্শন-যুগের সংযম ও বৈরাগ্য প্রবেশপত্র বেশী দিন রহিল না। নিয়ম শুধু কাগজেপত্রে রহিল। সৃষ্টীরও হাতে জীব জগতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনার ব্যাপার এসে পড়িল। দর্শনের তত্ত্ব যেন উচ্চে গেল। মুক্তি লোপায় কাঠিতে পরিণত হইল সত্য কিন্তু জ্ঞানের চর্চ্চা, যুক্তির পারিপাট্য, নব নব বিষয়ের অবতারণা, পদার্থের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, পুরাতন মতের অভিনব ব্যাখ্যা ও সংশোধন, সকল শ্রেণীর সাহিত্যের উপর আপনার প্রভাব বিস্তার যে হইয়াছে তাহাতে কাহারও অনুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে কি? যেখায় চেয়েও মুক্তির কথা যেখে লোকে অবাক্ হয়ে থাকে। উপনিষদের 'সবই ব্রহ্ম' 'আত্মা ব্রহ্ম', 'আমি ব্রহ্ম', 'জগন্মিথ্যা' 'তাঁহাকে জানিলেই অমৃত হয়' 'জীবই ব্রহ্ম' এই সব সিদ্ধান্তের মধ্যে যে এত গূঢ় রহস্য আছে তাহার পরিচয় আমরা মুক্তি-বাদীদের নিকট হইতেই পাইয়া থাকি। মুক্তিবাদীর গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে মনে হয় কবিরা কি ভাল করিয়া বেদেন নাই? আর যদিও দেখিয়া থাকেন তাহা হইলেও ভাল করিয়া বলেন নাই। তাঁহাদের দেখা জিনিসও বেশ মুক্তি বিস্তর সাক্ষ্য দিয়াছেন। মুক্তির স্থান চিরদিনই থাকিবে।

সমাধি প্রভৃতি দুষ্টশক্তির ও অলৌকিক প্রত্যক্ষের এত অপব্যবহার হইতে লাগিল যে সাধারণ লোকের সমাধির শক্তির উপর সন্দেহ বেশ গাঢ় হইল। জৈন দার্শনিকেরা সমাধি দ্বারা তাহার প্রচার করিলেন, ও বৌদ্ধেরা ক্ষণিকবাদই সত্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বৈয়াকরিকেরা বলিলেন যে, জগতের পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম ও ইহা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। পাতঞ্জলেরা যোগের বিশ্লেষণ সুনিপুণভাবে করিয়াছেন, যোগই তাঁহাদের মতে প্রকৃষ্ট সিদ্ধির উপায়। যোগই ধর্ম্মময়। এই দর্শনে বৈতবাদ সমর্থিত হইয়াছে। এইজন্য বহু আর্য্য দার্শনিক সমাধিকে অনুমান প্রমাণ দিলেও প্রাতীম সাক্ষ্যকেই অধিকতর প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। উপনিষদের ঋষিদের কথাগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে মনে হয়, তাঁহাদের মধ্যেও যথেষ্ট মতভেদ ছিল। সাংখ্যের প্রকৃতির, কণাদের

পরমাণুর, বেদান্তের মায়ার, বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের, শূন্যবাদের, অদৃষ্টবাদের ও অন্যান্য বহু বাদের উল্লেখ আমরা পাইয়া থাকি। পরবর্ত্তী যুগে উপনিষদের মত বলিয়া অদ্বৈতবাদ; বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি ব্যাখ্যাচাতুর্য্যে দেখান হইয়াছে। উপনিষদের বাক্যাবলীর সামঞ্জস্য করিতে গিয়া ইঁহারা বহু বাক্যের অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথাযথ নির্ণয়ের ইহার একটী প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

কুমারিল ভট্ট তাঁহার শ্লোক-বার্ত্তিক নামক মীমাংসা গ্রন্থে বেদের প্রত্যেকের উপর আপনার নিষ্ঠুরতা দেখান নাই। তাঁহার মতে কোন প্রত্যক্ষই ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ক হইতে পারে না। প্রত্যক্ষের সীমা সকল সময়ই আছে। সমাধির কালে আমরা কোন বস্তুবিষয়ক ধ্যান করি। আমরা সেই বিষয়েরই অবিচ্ছিন্নভাবে স্মরণ করিয়া থাকি। সেই বিষয় স্মরণের সময় অন্য বিষয়ের কথা আমাদের মনের মধ্যে আসে না। সেই স্মরণ সেই বিষয়ের দৃঢ় ও অচল সংস্কার মনের মধ্যে গড়িয়া দিতে পারে। তাহারই ফলে আমাদের স্বপনে স্বপনে জাগরণেও জনগণের সঙ্গে আলাপনে, ইতস্তত বিচরণেও স্থির হইয়া অবস্থানে, সেই বস্তুই একমাত্র আকর্ষণের সামগ্রী হইয়া থাকে। ইহার ফলে চিত্তে অসাধারণ একাগ্রতা জন্মিতে পারে ও ইচ্ছাশক্তির উপর বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণভাবে শাসন আসিতে পারে, পূর্ব্বার্জ্জিত সমস্ত সংস্কার ধ্বংস হইতে পারে ও নূতন মানুষ নির্ম্মিত হইতে পারে। কিন্তু সর্ব্ববর্ণিতা কোন প্রকারেই সম্ভবপর হয় না। এরূপ একাগ্রতার ফলে বুদ্ধির মার্জ্জন বেশ হইতে পারে। বুদ্ধির বিস্তার থাকিলে বিশ্ব প্রকাশিত হয়। বুদ্ধি আলোকের মত বিশ্ব সৃষ্টি করে না। কিন্তু বিশ্ব যখন অতীত ও অনাগত তখন বুদ্ধি বিশ্ব প্রকাশ করিবে কি করিয়া? যোগীর কল্পনাশক্তি প্রবল হইতে পারে এবং অনুমান করিবার শক্তিও অসাধারণ হইতে পারে; কিন্তু সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ তাঁহাদের কোনমতেই হইতে পারে না। তাঁহাদের দূরচিন্তায়, অদূর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতায় ও দূরদর্শিতার উপলব্ধি করিয়া প্রায় সকল লোকই তাঁহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যোগীও যে মানুষ এই কথাটী চাপা পড়িয়া যায় লোকে যখন তাঁহার অলৌকিক শক্তি প্রত্যক্ষ করে। কুমারিল এই কথাই বারবার করিয়া বলিয়াছেন যে প্রত্যেক মানুষের ভ্রম প্রমাদ আছেই আছে। আর এক কথা যোগীদের মধ্যে মতভেদ হয় কি না? দুইটী বিরুদ্ধ মত সত্য হইতে পারে না। অতএব অন্ততঃ একজন প্রমাদী বলিতেই হয়। যোগী প্রত্যক্ষের অনুকূলে যতই যুক্তি দেওয়া হইয়াছে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিষাদের কথা আসিয়াছে। বিষাদের কথা ঘুচিতে পারি না।

বেদ পবিত্রতার বর্ম্ম আপনাকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে বলিবার ধৃষ্টতা কাহারও নাই। কিন্তু এখন একটা হাওয়া এসেছে উল্টা। 'সত্যের প্রত্যেক স্থানেই হওয়া উচিত, এই দাঁড়িয়েছে মতবাদ। পণ্ডিতেরও এ যুগে অপরীক্ষিত হইয়া নিস্তার পাইবে না। বেদ ভগবানের দ্বারা রচিত বলিলেও বেদের প্রতি সন্দেহ থাকিয়া যায়। বেদের রচয়িতা ভগবান্ হইলেন কেন? বেদ অভ্রান্ত সুতরাং ভগবান্ ইহার রচয়িতা। অন্যান্য ও বহু গ্রন্থ আছে—সকলের রচয়িতা কি ভগবান্? বেদ অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার, সুতরাং বেদ ভগবানের দ্বারা রচিত। বহু অভিধান অভ্রান্ত ও বহু জ্ঞানের ভাণ্ডার; কিন্তু সেই গ্রন্থসমূহও ভগবদ্রচিত নহে। বেদে যত অতীন্দ্রিয় বিষয় আছে, সে বিষয়গুলি সত্য; সুতরাং বেদ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ (ঈশ্বর) রচিত। যত বিজ্ঞান-গ্রন্থে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের বিচার আছে, কিন্তু বিজ্ঞানের গ্রন্থসকল ঈশ্বর প্রোক্ত নহে। বেদ সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ। জগতের আদি অবস্থায় ভগবান্ ব্যতীত কি আর কেহ শিক্ষাগুরু থাকিতে পারেন? সুতরাং বেদ ঈশ্বর বিরচিত। জগতের আদি অবস্থায় যে সব প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁহারা ব্রহ্মার মানসপুত্র। তাঁহাদের সর্ব্বজ্ঞতাপূর্ণা প্রতিভা। তাঁহাদের জ্ঞান ও বিদ্যাশিক্ষা সহজ। পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি বশতঃ তাঁহারা জন্মের পর হইতেই সকল বিদ্যায় ও জ্ঞানে পারদর্শী। তাঁহাদের শিক্ষার জন্য বেদরচনা অবশ্যক। অন্য প্রাণী সকল ও প্রজাপতিদের দ্বারাই শিক্ষিত হইতে পারেন, তাঁহাদের জন্য ভগবানের এত আয়াস স্বীকারের আবশ্যকতা কি? বেদ ভগবানের গ্রন্থ হইলেও তাহাতে প্রায় প্রতি বিষয়ের বাদ কথা বলা হইয়াছে কেন? বেদে বিদ্যার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে কেন? সত্যকালের লোকেরা সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিলেন' ইহাই হইতেছে প্রাচীন মত। এই মত মানিলে কলা বিজ্ঞানের বীজমাত্র আমরা প্রাচীনযুগে দেখি কেন? তাঁহাদের নিম্ন বিদ্যা শিখিবার ক্ষমতা ছিল না? হাঁ বা না যে কোন পক্ষ বলা যাক্ না কেন বিপদ ঘটিবেই ঘটিবে।

কেহ কেহ মনে করেন বেদের রচনায় ও বিষয়ের কোন পরিবর্ত্তন নাই। এ জগতে যেমন হইয়াছে পর পর জগতেও তেমনিই হইবে ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জগতে ঠিক এইরূপই হইয়া গিয়াছে যেন যাদুঘরের একটী ছিল্ম। যতবারই সেই পালা হইবে, ততবারই তাহা পূর্ব্বের একান্ত অনুরূপ হইবে। জগতে একবার যে বৈচিত্র্য হইয়া গিয়াছে, সেই বৈচিত্র্যের পুনরাবৃত্তি অন্য সকল জগতে হইয়া থাকে। বিষ্ণুমায়ের একটীমাত্র গানে জানা আছে। সেই গানটীর তিনি কেবলই আবৃত্তি করিয়া থাকেন। এই সব কথা যুক্তির ধার দিয়া যায় না। এরূপ মত মানিলে ঐশী শক্তির অনন্ত বৈচিত্র্য থাকে না। সেই শক্তি সসীম হইয়া পড়ে। বৃক্ষের দৃষ্টান্তে ঐশী শক্তির এই রকমের সৃষ্টিশক্তি কল্পনা করা হইয়াছে। বৃক্ষ একবার বহু ফল দেয় ও সেই জাতীয় ফলই সে প্রতি বৎসর দিয়া থাকে। ঐশী শক্তির সৃষ্টি শক্তি এই রকমের নয় কি? সৃষ্টি অনন্ত ও অনাদি—বেদও অনাদি। এই বেদ চিরবিদ্যই স্থির হইয়া আসিতেছে; কারণ প্রথম জগতের উল্লেখ কোন স্থলেই পাওয়া যায় না। স্মৃতি অনুভবের ফল। কোথাও অনুভব না থাকিলে স্মৃতি হয় না; সুতরাং বেদের অনুভব কোন কালে হইয়াছে বলিতেই হইবে। সেকালের উল্লেখ করিলে সংসারের অনাদিত্ববাদ ধূলিসাৎ হয়। আর অনুভব স্বীকার না করিলে বেদই থাকে না, কারণ প্রতিক্ষণেই বেদের স্মৃতি হইতে পারে না।

মীমাংসকেরা বলিয়া থাকেন বেদ নিত্য। বেদের মূলে কোন দিন

হয় নাই। এই শব্দরাশি চিরদিনই ছিল ও থাকিবে। দুইটী দিক্ দিয়ে এই মতের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কোন লোকে বেদের মতবিরুদ্ধ হইলে ইহার মধ্যে ভ্রম ও প্রমাদ থাকিবেই থাকিবে। অতএব ইহার কর্ত্তা স্বীকার করা যাইতে পারে না। দ্বিতীয় কথা এই যে আমাদের একটী ধারণা আছে যে যত প্রাচীন সে ততই ভাল। সত্যকাল সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, কারণ সত্যকাল সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। বেদ প্রাচীনতম, কারণ বেদের প্রাচীনতার কোন সীমা নির্দ্দেশ নাই। সুতরাং বেদ পবিত্রতম। এ মতও আমাদের হৃদয় বলিয়া মনে হয় না। পুরুষ কৃত শব্দেরই অর্থ বুঝা যায়। অজ শব্দের অর্থ জানা যায় না। যন্ত্রনির্ঘোষে কে না মুগ্ধ হইতে পারে কিন্তু তাহার কোন অর্থ আছে কি? বেদ অর্থহীন শব্দরাশি ইহা কেহ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন কি? এরূপ বহু দোষ এই মতে আছে।

আমাদের আজকাল ধর্ম্ম রচনা করিতে হইলে বেদ বা সমাধি হইতে উৎপন্ন জ্ঞানের উপর নির্ভর করা চলিবে না। বেদকে আমরা অসম্মান করিতেছি না ও সমাধিকেও ব্যর্থ বলিতেছি না। কিন্তু এখন ধর্ম্মের উপর প্রভুত্ব থাকিবে না। বর্ত্তমানকালে ধর্ম্ম সম্পূর্ণ নূতনভাবে রচিত হইবে।

গৌতম বুদ্ধের উপদেশ

শ্রীচারুচন্দ্র বসু

যে মহাপুরুষের স্মৃতির প্রতি ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করিবার জন্য আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, অনেকেই অনেক নামে তাঁহাকে অভিহিত করিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে বলেন অবতার, কেহ বলেন World Teacher, কেহ বলেন Great man, ইংরাজ কবি তাঁহাকে Teacher of Nirvan and Law বলিয়াছেন। যে নামেই তাঁহাকে অভিহিত করা যাউক না কেন, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, জগতের ইতিহাসে আর কোন দেশে, এত বড় মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। গৌতম বুদ্ধের জন্মভূমি বলিয়া জগতের নিকট পরিচয় প্রদান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ভারতবর্ষ ধন্য হইয়াছে, পবিত্র হইয়াছে ও পৃথিবীর মধ্যে বরণীয় হইয়াছে। আমাদের পুরাণ বলিতেছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের সহায়তায় ভারতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করেন ও সেই সঙ্গে মহাভারতের পরিকল্পনা করেন; কিন্তু ইতিহাস বলিতেছে যে, প্রকৃত যে মহাভারত বা Greater India গৌতম বুদ্ধই তাহার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার যে অমৃতময় বাণী—তোমরা মনুষ্যের হিতের জন্য, মঙ্গলের জন্য, সুখের জন্য, জগতের প্রতি দেব-মনুষ্যের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ দেশে দেশে বিচরণ কর, আমার ধর্ম্ম প্রচার কর, সর্ব্বাঙ্গ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দাও—তাহা ভারতের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, এশিয়া মহাদেশের এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। সেই কারণে এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের সংযোগ গৌতম বুদ্ধই সর্ব্বপ্রথম স্থাপন করেন ও সেই সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম্মের, সভ্যতার ও চিন্তার ধারা দেশে বিদেশে প্রচারিত হয়। এই প্রাচীন সভ্যতার অনুসন্ধান করিবার জন্যই আজ আমাদের বিশ্বকবি চীনে, জাপানে, তাতারে ও পারস্যে এমন কি সুদূর বালিদ্বীপেও গমন করিতেছেন। আপনারা শ্রবণ করিয়াছেন যে বৈশাখের পবিত্র তিথিতে তিনি কপিলবস্তুর অতি সন্নিকটে অবস্থিত লুম্বিনি উদ্যানে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই বৈশাখেই পূর্ণিমা তিথিতে গয়াপ্রদেশে বোধি-বৃক্ষমূলে ছয় বৎসর ব্যাপী কঠোর সাধনার পর বুদ্ধত্ব লাভ করেন ও পরে পঁয়তাল্লিশ বৎসর মগধ, কাশী, কোশল ও শ্রাবস্তী প্রভৃতি প্রদেশে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিবার পর আশী বৎসর বয়সে কুশীনগরে মহাপরি-নির্ব্বাণ লাভ করেন। অদ্য এই পবিত্র দিনে তাঁহার সেই পুণ্যময় জীবন কাহিনী স্মরণ করে তাঁহার স্মৃতির প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার জন্যই আমরা সমবেত হইয়াছি।

যুগে যুগে মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া মানব-জীবনের রহস্য সমাধান করিয়াছেন। জীব কোথা হইতে আসিল, কেন আসিল এবং কোথায় বা ইহার পরিণতি, ভারতভূমে এই প্রশ্ন বারম্বার জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, ভারতের ঋষি ও মনীষি-বৃন্দ এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, উপনিষদ্‌কার ঋষিগণও অতি উচ্চস্তর কবিত্বপূর্ণ ভাষাতে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু গৌতম বুদ্ধ যেমন পরিষ্কার ভাষায় ও প্রবল যুক্তির সহিত এই জটিল প্রশ্নের সমাধান করিয়া গিয়াছেন, এরূপ অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। এই প্রশ্নের সমাধান করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। বাল্যে, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে বারম্বার এই প্রশ্ন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। তিনি দেখিলেন যাবতীয় জীব সংসার সাগরে জীবকুল নিরন্তর ভাসিতেছে। এই সংসার প্রবাহের বারির ন্যায় নিয়ত গতিশীল ও জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণ-স্থায়ী। সুখদুঃখের জীবন চক্রের আবর্ত্তনে জীবকুল নিষ্পেষিত হইতেছে। দুঃখের করাল কবল হইতে জ্ঞানহীন কামনার ক্রীড়নক অসহায় মানবের মুক্তির পন্থা আবিষ্কার করিবার জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর রহস্যভেদ পূর্ব্বক জীবকে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর পরপারে লইয়া যাওয়াই তাঁহার জীবনের ব্রত লক্ষ্য ছিল। এই নিমিত্ত ললিতবিস্তর গ্রন্থকার তাঁহাকে জন্মমরণবিষাক্তীভিশস্ত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গৌতমের উপদেশকে সাধারণতঃ লোকে দুঃখবাদ বলিয়া থাকে। তাঁহার পূর্ব্বে কি পরে ঠিক বলিতে পারি না, আমাদের দেশে সাংখ্যকার ও অন্যান্য দার্শনিক-গণও এই দুঃখের অস্তিত্ব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ও সেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু গৌতম বুদ্ধই এই সত্য নিজ জীবনে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার জন্যই কঠোর জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন ও উহার মূলতত্ত্বে উপনীত হইবার জন্য ছয় বৎসর ব্যাপী কঠোর সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই সাধনার বিবরণ মহাবস্তু, ললিত বিস্তর ও বুদ্ধচরিত প্রভৃতি সংস্কৃত ও অর্দ্ধ-সংস্কৃত গ্রন্থে ও জাতক ও মহাবগ্গ প্রভৃতি পালিগ্রন্থ মধ্যে পরিষ্কারে বর্ণিত আছে। অনাহার অনিদ্রায় দিন

কাটিতে লাগিল ; কত শীত, আতপ, বর্ষা, বিদ্যুৎ বজ্র তাঁহার উপর দিয়া চলিয়া গেল, তথাপি সে সময়ে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না ; ঘৃণ্য তপশ্চারণে কাঞ্চনের ন্যায় তাঁহার কান্তি কালিমায় পরিণত হইয়াছিল, শরীরের রক্ত মাংস শুকাইয়া গিয়াছিল, শরীর অস্থিচর্মসার হইয়াছিল, তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল না, কণ্ঠস্বরের বীণা ছিল না। এই সময়ে প্রথমে আনেকক্ষণ ধ্যান ও পরে ললিতব্যূহ নামক ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। ক্রমে তিনি এই প্রকার 'কৃচ্ছ্র'সাধনের অসারতা বুঝিতে পারিলেন, অনাহার ব্রত পরিত্যাগ করিয়া সুবাতা প্রভৃতি পায়সান্ন গ্রহণ করিলেন। নৈরঞ্জনাতীর হইতে কিছু দূরে অবস্থিত এক অশ্বত্থবৃক্ষমূলে আসন করিলেন ও এক দুর্জয় প্রতিজ্ঞার সহিত ধ্যানের উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিতে লাগিলেন :—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং,
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্যবোধিং বহুকল্প দুর্লভং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।

এই আসনে আমার শরীর শুষ্কতা লাভ করুক্ এবং আমার ত্বক্, অস্থি ও মাংস এই স্থানে বিলীন হউক্ ; কিন্তু দুর্লভ বুদ্ধত্ব লাভ না করিয়া আমার দেহ এই আসন হইতে বিচলিত হইবে না। ক্রমে বৈশাখের পূর্ণিমা তিথিতে উপনীত হইলেন। রাত্রির প্রথম যামে তাঁহার দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল, দ্বিতীয় যামে তাঁহার পূর্ব-পূর্বজন্মের স্মৃতি মনোমধ্যে উদয় হইল এবং রাত্রির শেষ যামে কার্যকারণ শৃঙ্খলা বিশ্লেষণ পূর্বক দুঃখের মূলতত্ত্বে উপনীত হইলেন। তিনি উপলব্ধি করিলেন, জীব জন্মিতেছে, মরিতেছে, পুনরায় জন্মিতেছে, অনবরত সংসারস্রোতে জীবকুল ভাসমান হইতেছে, কূপস্থ ভেকের ন্যায় জীবকুল ঘুরিতেছে, জরাব্যাধিমরণের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় পাইতেছে না, তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন, তিনি প্রণিধান করিলেন, যখনি সম্ভবিত্বয়াবরণ ভবতি, প্রণিধান মাত্র প্রতিভাত হইল, জাতি থাকাতেই জরামরণ হইতেছে, তাহা হইলে জাতিই বলুন, জন্মই বলুন বা শরীরোৎপত্তিই বলুন, যে নামেই অভিহিত করুন না কেন, ইহাই জরামরণের কারণ। এক্ষণে কি থাকাতে এই জন্ম বা শরীরোৎপত্তি হইতেছে, তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইল যে, ভব বা ধর্ম ও অধর্মমূলক কর্ম বশতঃ জীবের জন্ম হইতেছে, তাহার পর তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল, এই ভব বা ধর্ম ও অধর্মমূলক কর্ম কোথা হইতে উৎপন্ন হয়, কি থাকাতে এই ধর্ম ও অধর্মমূলক কর্মের উৎপত্তি হয়, প্রতিভাত হইল, উপাদান থাকাতেই এই ভব বা ধর্ম ও অধর্ম মূলক কর্মের উৎপত্তি হয়। উপাদান অর্থে কামিক, বাচিক বা মানসিক উদ্যম। এক্ষণে এই উপাদান বা কামিক, বাচিক বা মানসিক উদ্যম কি হইতে উৎপন্ন হয়? সহজেই প্রতিভাত হইল তৃষ্ণা হইতেই উপাদানের উৎপত্তি ; তৃষ্ণা অর্থে আসক্তি বা সুখস্পৃহা। পুনর্বার জিজ্ঞাসা জন্মিল, এই তৃষ্ণার মূল কোথায়? কোথা হইতে এই তৃষ্ণার উৎপত্তি? অমনি প্রতিভাত হইল বেদনা। বেদনা অর্থে সুখ-দুঃখাদি ভোগ, এই সুখ-দুঃখাদি ভোগ বা বেদনা হইতেই তৃষ্ণার উৎপত্তি। কি থাকাতেই এই বেদনার উৎপত্তি হয়। প্রণিধান মাত্র দেখিতে পাইলেন স্পর্শ থাকাতেই বেদনার উৎপত্তি। স্পর্শ অর্থে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের সংযোগ। পরে প্রণিধান করিলেন, কি থাকাতে স্পর্শ হয়, প্রতিভাত হইল ষড়ায়তন থাকাতেই স্পর্শের উৎপত্তি হয়, ষড়ায়তন অর্থে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন, তার পর এল হইল কি থাকাতে ষড়ায়তনের উৎপত্তি? ষড়ায়তনের বীজ কি? নামরূপ থাকাতে ষড়ায়তনের উৎপত্তি? নামরূপ অর্থে ক্ষিতি, জল, বায়ু, তেজ ও বেদনা, সংজ্ঞা এবং সংস্কার এই স্কন্ধ ত্রয়। এক্ষণে নামরূপের কারণ দেখিলেন, বিজ্ঞান ; বিজ্ঞান থাকাতেই নামরূপের উৎপত্তি : পঞ্চইন্দ্রিয় ও তাহার কার্য্য, যেমন দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদ ও স্পর্শ ইহাকেই বিজ্ঞান বলে, এই বিজ্ঞানই নামরূপের কারণ, এক্ষণে কি হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি? দেখিলেন সংস্কার বা বাসনা সমূহ হইতেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি। এক্ষণে এই সংস্কারের উৎপত্তি, কোথা হইতে হয়, সংস্কারের উৎপত্তি অবিদ্যা হইতে, অবিদ্যা অর্থে অহংকার বা মমকার, ইহাই অবিদ্যা বা অজ্ঞান। দুঃখের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞান, দুঃখের কারণ বিষয়ে অজ্ঞান, দুঃখের নিরোধ বিষয়ে অজ্ঞান, দুঃখ নিরোধের উপায় সম্বন্ধে অজ্ঞান, অর্থাৎ চারি আর্য্যসত্য সম্বন্ধে অজ্ঞান ; ইহার ফল হইতেছে, অনিত্য বস্তুকে নিত্যজ্ঞান, দুঃখকে সুখ জ্ঞান, অনাত্মকে আত্মজ্ঞান ; এই অজ্ঞানই ভ্রমের জননী। এখন উপলব্ধি করিলেন, অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, জাতি হইতে জরামরণ শোকপরিদেবদুঃখদৌর্মনস্য উপায়াস ইত্যাদি। জগতে যত কিছু দুঃখ কষ্টের উৎপত্তি অবিদ্যা হইতে, এই অবিদ্যার বিনাশে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। ইহারই নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ বা দুঃখের কারণ নিদান, এই বিষয়টী বুদ্ধের নিকট, ইহাই তাঁহার সাধনার ফল। তিনি সেই দণ্ডে উপলব্ধি করিলেন, দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায়। তিনি আরও দেখিলেন, জাতি বা জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, ও অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, পঞ্চস্কন্ধ ধারণই দুঃখ, পূর্বজন্মের হেতুভূত কারণ তৃষ্ণা হইতেই দুঃখের উৎপত্তি ও তৃষ্ণার নিবৃত্তিতেই দুঃখের নাশ।

ভগবান বুদ্ধ দুঃখ বিমোচনের উপায় স্বরূপ চারি আর্য্য সত্যের উপদেশ দান করিয়াছেন ; দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায় বা মার্গ। চিকিৎসা শাস্ত্রেও এই চারিপ্রকার মূল সত্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যথা রোগ, রোগের হেতু, আরোগ্য ও ভৈষজ্য। চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণেতা শারীরিক ব্যাধি বিমোচনের জন্য ব্যাধি ও তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, যোগশাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলি ভবব্যাধি হইতে জীবের মুক্তির জন্য হেয়, হেতু, হান ও হানোপায় সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। দুঃখবহুল সংসার হেয়, প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ সংসার হেতু, এই সংযোগের নিবৃত্তি হান, ও হানের উপায় সম্যগ্দর্শন।

বোধিসত্ত্ব যে মুহূর্তে জগতে দুঃখের উৎপত্তি ও তাহার নিরোধের উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন, সেই মুহূর্ত হইতে বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন। বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াই নিম্নোক্ত উদান উচ্চারণ করিলেন।

অনেক জাতিসংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং
গহকারক দিট্ঠোসি পুনগেহং ন কাহসি
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিসঙ্খিতং—
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্হানং খয়মজ্ঝগা।

যেহেতু গৃহনির্ম্মাতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে, কিন্তু তাহাকে না পাইয়া কতবার ভ্রমণ করিলাম, কতবারই সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিলাম, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ দুঃখকর। হে গৃহকারক, এইবার তোমাকে দেখিয়াছি, আর গৃহনির্ম্মাণ করিতে পারিবে না, (সংসারাবর্ত্তে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিব না; তোমার সকল কাষ্ঠও ভগ্ন হইয়াছে, গৃহকূট (গৃহযুক্ত কর্ণিকামণ্ডল) নষ্ট হইয়া গিয়াছে, নির্ব্বাণগত (সংস্কার সমূহ হইতে মুক্ত) আমার চিত্তে সকল তৃষ্ণা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

জন্ম জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্ম্মাণ—
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবে রচিবারে আর
ভেঙেছে তোমার ছাদ, চুরমার গৃহভিত্তিচয়,
সংস্কার বিগতচিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।

(সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায় নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়া গৌতম বুদ্ধই ইহাকে সর্ব্বপ্রথম এই ভারতভূমে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার মতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মুক্তি বা নির্ব্বাণলাভের উপায়, এই উপায়কেই Noble Eightfold path বা আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলা হয়। তিনি বলেন—প্রব্রজিতগণ প্রায়শঃ দুইটী পন্থার একটী অবলম্বন করেন। কেহ হীন গ্রাম্য ও সাধারণ লোকের ন্যায় সর্ব্বদা কামসুখে রত থাকে, তাহারা ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান বা ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধের প্রয়াস করে না। অপর শ্রেণীর প্রব্রজিতগণ সতত নিজকে নিপীড়িত করেন, শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। এই উভয় পদ্ধতিই হেয় ও আর্য্যজনবিগর্হিত; এই উভয় অন্ত ত্যাগ করিয়া তথাগত মধ্যপথ অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মের উপদেশ দেন। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গই মধ্যপথ বা middle path। সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসঙ্কল্প, সম্যকবাক্, সম্যককর্ম্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি ও সম্যকসমাধি। ইহা সাধনার সহজ, সরল উপায়; ইহাতে শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন নাই বা কোনরূপ ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি নাই, ইহাতে আছে চিত্তবিক্ষেপ নিবৃত্তি, মনের উপর সংযম ও চিত্তের একাগ্রতা সাধন, ইহাতে আছে, সকল প্রকার পাপ কর্ম্ম হইতে বিরতি ও পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান; ইহাতে আরও আছে বিশ্বের প্রতি মৈত্রী ও জরাব্যাধিক্লিষ্টের প্রতি করুণা। এই আটটী মার্গ বা প্রধান শীল সমাধি ও প্রজ্ঞার বিষয়। সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্পকে প্রজ্ঞাস্কন্ধ বলে; সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি ও সম্যকসমাধি, এই তিনটীকে সমাধি স্কন্ধ বলে ও সম্যকবাক্, সম্যককর্ম্মান্ত এবং সম্যক আজীব ইহা শীল স্কন্ধের অন্তর্গত। ইহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, ও অন্তে কল্যাণ, ইহাই কল্যাণ ধর্ম্ম। নিম্নোক্ত দশটী নিষেধবিধিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

গৌতম-বুদ্ধ

১। পাণাতিপাত—প্রাণীহত্যা হইতে বিরতি
২। অদিন্নাদান—অদত্ত দান বা চুরি
৩। কামেসুমিচ্ছাচার—মিথ্যা কামাচার বা পরস্ত্রীগমন প্রভৃতি
৪। মুসাবাদ—মিথ্যা কথা বলা
৫। পিসুনবাদ—ভেদবাক্য
৬। ফরুসবাদ—কর্কশ কথা বলা

৭। সম্ভিন্নলাপ—সম্প্রলাপ বা নিরর্থক কথা বলা

৮। অভিধ্যা—পরদ্রব্যে লোভ

৯। ব্যাপাদ—মানসিক হিংসা

১০। মিথ্যাদিট্ঠি—বিপরীত জ্ঞান

এই অকুশল বিধিগুলি কায় বাক্য ও মনভেদে ত্রিবিধ।

অষ্টাঙ্গব্যাপী অবিচলিত সাধনার পর তাঁহার সমস্ত কামনা বা প্রবৃত্তি সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। পূর্ণ শান্ত উপরত হইয়া তিনি নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় অবস্থান পূর্ব্বক বোধিবৃক্ষমূলে নির্ব্বাণ বা বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন। বুদ্ধত্বের দিব্যজ্যোতি বেগে দ্বারে দ্বারে সেই মহারত্ন বিতরণ করিতে লাগিলেন। সেই তেজঃপুঞ্জ অলৌকিকপ্রভাব মহাগুরুর চরণে লক্ষ লক্ষ লোক ভক্তিভরে প্রণত হইল। দলে দলে ত্রিভুবন তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত পবিত্র ধর্ম্ম প্রভার সহিত প্রবল করিয়া বেগে বেগে সর্ব্বসাধারণে বিলাইতে লাগিলেন। উচ্চনীচ ভেদ তিরোহিত হইল, প্রেমের প্রবল বন্যায় সমস্ত দেশ প্লাবিত হইল। প্রচলিত শুষ্ককর্ম্মকাণ্ড-বহুল ধর্ম্ম সেই ঊর্দ্ধমান নবধর্ম্মের উদ্ধত প্রভায় মলিন হইয়া গেল। জনসাধারণ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে বুদ্ধদেবের সেই উদার উন্মুক্ত ধর্ম্মরাজ্যে আশ্রয়লাভ করিয়া নবজীবন লাভ করিল। ধীরে ধীরে বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া সেই ত্যাগ ও নিষ্কাম মূলক পবিত্র ধর্ম্ম পরিপুষ্টি লাভ করিয়া ভারতের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল।

বৌদ্ধধর্ম্মরূপ বৃহৎ অট্টালিকা তিনটী স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত, উহা হইতেছে, অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। জগতের যাহা কিছু আমরা দেখিতেছি, অনুভব করিতেছি ও চিন্তা করিতেছি, সকলেই অনিত্য এবং পরিবর্ত্তনশীল, এমন কোন পদার্থ নাই, যাহার কোন পরিবর্ত্তন নাই, কি ভূলোক, কি দ্যুলোক বা অন্তরলোক সকল স্থানেই পরিবর্ত্তন হইতেছে। আমরা বাল্যে যাহা ছিলাম, যৌবনে তাহা নাই, যৌবনে যাহা ছিলাম, বার্দ্ধক্যে তাহা নাই, এমন কি প্রাতে যাহা ছিলাম, বৈকালে তাহারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দীপশিখার দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, রাত্রির প্রথম যামে যে দীপশিখা জ্বলিয়াছে, দ্বিতীয় যামে তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এবং তৃতীয় যামে যাহা জ্বলিয়াছে, দ্বিতীয় হইতে স্বতন্ত্র। তবে যে আমরা একই দীপশিখা দেখিতেছি, উহা একটী ধারাবাহ। নদীমধ্যে যে জলস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, একটীর সহিত অন্যের সম্বন্ধ নাই, আছে কেবল একটী ধারাবাহ। জাগতিক প্রত্যেক পদার্থই, Molecule বলুন, Atom বলুন, এমন কি যাহা কল্পনারও অতীত, যাহাকে Electrons বলে, তাহাও অস্থায়ী, পরিবর্ত্তনশীল, সেই কারণেই অনিত্য। পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, পতি, পত্নী, পুত্র ও কন্যা সকলেই অনিত্য; আমরা অবিদ্যা বশতঃ, এই অনিত্য পদার্থকে নিত্য বলিয়া ধারণা করি, ইহাই দুঃখ কষ্টের মূল কারণ। যতদিন পর্য্যন্ত জীব বা পুদ্গল জন্মমৃত্যুর অধীন থাকিবে, ততদিন দুঃখ অপরিহার্য্য। এই দুঃখের মূল কারণ কি? ইহার কারণ কাম বা তৃষ্ণা। গৌতম বুদ্ধ ইহাকে রূপকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, গৃহকারক বা দেহরূপ গৃহ-নির্ম্মাতা। কাম বা আসক্তির নিবৃত্তিই হইল দুঃখের নিবৃত্তি, ইহারই নাম বিরাগ বা ক্ষুদ্রাক্ষয়, ইহারই নামান্তর নির্ব্বাণ বা মুক্তি। এই কামকেই সমস্ত পাপ বা দুঃখের মূল কারণ বলিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থ মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহারই নাম মার বা মৃত্যু। এই মারকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া, নিজের আয়ত্তাধীনে আনয়ন করিয়াই গৌতম বুদ্ধ মারজিৎ হইয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধত্ব বলুন, অমৃতত্ব বলুন বা নির্ব্বাণই বলুন, যে নামেই অভিহিত করুন না কেন, এই মারকে জয় করিয়া সেই অবস্থা লাভ করেন। এই কারণেই এই মার-বিজয় আখ্যায়িকাটী বৌদ্ধ গ্রন্থ মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে। ইহা একটী রূপকমাত্র, ইহার অর্থ পাপের সঙ্গে পুণ্যের সংগ্রাম, মোহের সঙ্গে বিবেকের সংগ্রাম, প্রবৃত্তির সঙ্গে নিবৃত্তির সংগ্রাম। কালিদাস কুমারসম্ভবে এই কথাই বলিয়াছেন, কালিদাসের হাতে, এই কন্দর্প বিজয় আখ্যায়িকাটী আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তিনি দেখাইয়াছেন যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কাম দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছিল, ততক্ষণ পার্ব্বতী মৃত্যুঞ্জয়—মারজিৎ-মহাদেবকে লাভ করিবার আশা অনুভব করিতে পারেন নাই। উভয় বর্ণনায় অনেক সৌসাদৃশ্য আছে, বলা বাহুল্য, কুমারসম্ভব কাব্য বা শিবপুরাণ ললিতবিস্তর গ্রন্থের অনেক পরবর্ত্তী। বোধিসত্ত্ব মারের সহিত যুদ্ধ ও তর্ক করিতে অনেক সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাদেব বৃথা তর্ক বা যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া একেবারে কণকাল মধ্যেই কন্দর্পকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম লক্ষণ অনিত্য, দ্বিতীয় লক্ষণ দুঃখ এবং তৃতীয় লক্ষণ অনাত্ম। ভারতবর্ষের দার্শনিক চিন্তা সমূহের মধ্যে পরস্পর অতি বিরুদ্ধ দুইটী মত দেখা যায়। এক মতে বলে, আত্মা আছে, অন্য মতে বলে আত্মা নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের মধ্যে প্রভেদ এই স্থানে। বেদপন্থী বা আত্মবাদীদের মূল কথা হইল, আত্মার নিত্যত্ব, বৌদ্ধ মতাবলম্বী আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই। আত্মবাদীরা বলেন আত্মা স্বতন্ত্র, দেহাদির স্বামী, নিত্য কর্ত্তা, ভোক্তা ইত্যাদি। বুদ্ধদেব বলেন, আত্মা যদি এইরূপই হয়, তবে সে আত্মা কোথায়? তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই বিশ্বের মধ্যে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নাই। অতএব আত্মা নামে যদি কিছু থাকে, তবে এইগুলির মধ্যে কোন একটী অথবা ইহাদের সমষ্টি বলিতে হয়। আত্মা বলিয়া বস্তুতঃ কোন পদার্থ নাই; উহা কেবল একটা সংজ্ঞা মাত্র। যাহাকে আত্মা বলা যায়, পঞ্চস্কন্ধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভগবান বুদ্ধ তন্ন তন্ন ভাবে বিচার ও বিশ্লেষণের দ্বারাই দেখাইয়াছেন যে, জগতের কোন বস্তুই আমার নহে, কোন বস্তু আমি নহি বা কোন বস্তুই আমার আত্মা বা সত্তা নহে। ন এতং অস্থি, ন এসহি অহম অস্মিতি, নমে এস অত্ততি। এই অনাত্মবাদকেই কোন কোন দার্শনিক ইরাণ লেখক, The flower of Indian thought বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গৌতম বুদ্ধ আত্মার দেশ মাত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, তাঁহার মতে কোন প্রকার আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই জীব বা পুদ্গল দুঃখ কষ্টের ভাগী হয়। মোট কথা আমরা আত্মা বলিয়া যাহা বুঝি তাহা অনিত্য ও দুঃখপ্রবাহ্য।

গৌতম বুদ্ধ আত্মার নিত্যত্ব বা পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে স্কন্ধগণ কেবলমাত্র দুঃখের সমষ্টি। তাহা হইলে দুঃখের বিনাশের পর কি অবশিষ্ট থাকে, কেই বা নির্ব্বাণ লাভ করে? এই সংশয় কেবল যে আমাদের মনে উদয় হয়, তাহা নহে, বুদ্ধশিষ্য মাণুক পুত্রের মনোমধ্যেও এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। তাই তিনি ভগবান বুদ্ধ সমীপে উপনীত হইয়া বলিলেন—"ভগবন! দেহ ও আত্মা এক কি না, কিম্বা দেহ ও আত্মা পৃথক, দেহত্যাগের পর ভগবান কি অবস্থায় অবস্থান করিবেন, সে বিষয়ে ও কোন উপদেশ দান করেন নাই।" ভগবান উত্তর করিলেন—মাণুকপুত্র, মনে কর, তুমি কোন দুষ্টলোক বিষাক্ত বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছ ও যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছ, তোমার আত্মীয়গণ যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য, চিকিৎসক আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। তখন কি তুমি বলিবে যে, বিদ্ধ বাণ মোচন করা আবশ্যক নাই, আমি অগ্রে জানিতে চাই যে, যে ব্যক্তি আমাকে বাণ বিদ্ধ করিয়াছে, সে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র, তাহার কোন জাতি বা কি কুল, সে দীর্ঘাকৃতি বা খর্ব্বাকৃতি। সেইরূপ হে মাণুকপুত্র, জন্ম, জরা ব্যাধি ও মৃত্যু তোমাকে আক্রমণ করিয়াছে, বাসনা বা তৃষ্ণানলে তুমি আবদ্ধ, এখনে বৃথা বিতর্কাদি পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে জন্ম জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাও, তোমার কি তাহাই করা উচিত নহে? কারণ বৃথা বিতর্কাদি দ্বারা সত্য লাভ হয় না বা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, ধর্ম্মসিদ্ধ হয় না, ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হয় না, ইহারা নির্ব্বেদের জন্য নহে, বৈরাগ্যের জন্য নহে, নিরোধের জন্য নহে, উপশমের জন্য নহে, অভিজ্ঞার জন্য নহে, সম্বোধের জন্য নহে, নির্ব্বাণের জন্য নহে। আমি তোমাকে চারি আর্য্য সত্য ও আর্য্য মার্গ শিক্ষা দিয়াছি, তোমার কি উচিত নহে, অগ্রে সেই শিক্ষা অনুশীলন করা? আমি এই বিষয়গুলিকে ঐকান্তিক বলিয়া দিয়াছি ও জানাইয়াছি। সেই বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা যখন অবিদ্যা দূরে যাইবে, সম্যক সমাধির অবস্থায় উপনীত হইবে, তখন তোমার সর্ব্ব সংশয় অপনীত হইবে, নির্ব্বাণ কি আপনিই প্রতিভাত হইবে। ভগবান বারম্বার বৃথা বিতর্কাদি পরিত্যাগ করিবার জন্য উপদেশ দান করিয়াছেন।

সিঞ্চ ভিক্খু ইমং নাবং, সিত্তায়ে লহুমেস্সতি
ছেত্বা রাগঞ্চ দোসঞ্চ ততো নিব্বাণ মেহিসি।

নৌকা যেমন জলপূর্ণ থাকিলে শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারে না, অপর দিকে ডুবিবার ভয় থাকে, সেরূপ স্থলে নৌকা হইতে জলসিঞ্চন আবশ্যক হয়, সেইরূপ হে ভিক্ষু তোমার যেরূপ নৌকা হইতে বৃথা বিতর্কাদি রূপ জল সিঞ্চন কর, উহা লঘু হইবে, রাগ দ্বেষাদির বন্ধন যেমন করিয়া তুমি শীঘ্র নির্ব্বাণ সাগরে উপনীত হইবে।

গৌতমের প্রধান শিক্ষা হইতেছে বাসনার ক্ষয় বা তৃষ্ণার নিবৃত্তি। তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইলেই জীবের রাগ দ্বেষ ও মোহ দূরে যায় ও সেই সঙ্গে জীবও জন্ম জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। অনেকেই প্রশ্ন করেন যে, জীব যদি পাঁচটী স্কন্ধ ব্যতীত আর কিছুই নহে, তখন এই স্কন্ধের বিনাশ বা ধ্বংসের পর আর কি থাকে? ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, স্কন্ধরূপ অনিত্য বস্তু যখন দূরে যায়, তখন একমাত্র নিত্য বস্তু যে নির্ব্বাণ তাহাই বিদ্যমান থাকে, কারণ উহা নিত্য, শাশ্বত, অবিনশ্বর ও নিরোধ: উহা Annihilation or Extinction or Negation নহে। ইহাকে নির্ব্বাণই বলুন বা শূন্যই বলুন, উহা মানব চিন্তার সর্ব্বোচ্চ সোপান। ধার্ম্মনিক চিন্তা ইহা অপেক্ষা আরও উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে পারে নাই। বৌদ্ধধর্ম্মে অনেক প্রকার ধ্যান ধারণার উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে শূন্যতার ধ্যানই সাধন মার্গের উচ্চতম সোপান। এখানে কোন পার্থক্য বা ভেদাভেদ নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, অস্তি নাই, নাস্তি নাই, উহা অস্তিনাস্তির সমন্বয়, এখানে উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই, উহা উৎপত্তি ও বিনাশের মিলন স্থান, এখানে নিত্যত্ব বা অনিত্যত্ব এই সকল আপাত-বিরুদ্ধ ধর্ম্ম পরস্পরের বিরোধ ত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থিত আছে; ইহা সৎ নহে, অসৎ নহে, সৎ ও অসতের মিলন নহে, বা সৎ ও অসতের অভাব নহে। ইহা বাক্য ও মনের অগোচর; এই জন্যই প্রভু বলিয়াছেন—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। এই কারণেই ঋষিগণ নেতি নেতি বলিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, এই নেতি নেতি Negation নহে; ইহা অস্তি নাস্তি এবং ভাব ও অভাবের মিলন। সেই জন্যই ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন—যে সুন্নতে, ইহা (এই নির্ব্বাণ বা শূন্যতা) গম্ভীর, ইহা অপ্রমেয় ও অক্ষয়। ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন:—

সুঞ্ঞ পুরে, সুঞ্ঞ পচ্ছাতা, মজ্ঝে সুঞ্ঞ, তরস্থ পারগূ।
সব্বত্থ বিমুত্ত মানসো ন পুন জাতি জরং উপেহিসি।

হে ভিক্ষু তোমার সম্মুখে, মধ্যে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, সংসারের পরপারে গমন কর এবং সর্ব্ব প্রকারে বিমুক্ত চিত্ত হইলে তোমাকে জন্ম জরা ভোগ করিতে হইবে না

গৌতম বুদ্ধই সর্ব্বপ্রথম ভারতভূমে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁহার পূর্ব্বে ধর্ম্মের উচ্চতর কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। গৌতম বুদ্ধই সর্ব্বপ্রথম সকল শ্রেণীর ও সকল বর্ণের লোককে তাঁহার ধর্ম্মমধ্যে আশ্রয় দান করেন। তাঁহার শিক্ষা অতি উদার, অতি উচ্চ, তাহার মধ্যে সঙ্কীর্ণতা আদৌ লক্ষিত হয় না। সেই সকল উপদেশ সর্ব্বদেশের সকল জাতি ও সকল সময়ের উপযোগী। ভিক্ষুগণের আদর্শ জীবন তিনি সকল শ্রেণীর জন্য উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন, সেই কারণে কাশ্যপ ও সারিপুত্র প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সংঘমধ্যে যেরূপ উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, মাণিত জাতীয় উপালিও সেইরূপ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অনন্ত অসীম মহাসমুদ্রগর্ভের যেমন একটীমাত্র স্বাদ অনুভব করা যায়, সেটী হইতেছে তাহার লবণত্ব, সেইরূপ নির্ব্বাণরূপ মহাসাগরের একটীমাত্র স্বাদ বিদ্যমান আছে, সেটী হইতেছে মুক্তি। যেমন গঙ্গা, যমুনা, ব্যাধি ও অচিরাবতী প্রভৃতি নদী একবার সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইলে, তাহার আর পার্থক্য থাকে না, উহারা যেমন মহাসমুদ্রে এক হইয়া যায়, সেইরূপ নির্ব্বাণরূপ মহাসাগরে জীব প্রবিষ্ট হইলে, তাহার জাতি বর্ণের আর পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। গৌতম বুদ্ধ জাতীয় জীবনের যেরূপও কোথায়, তাহা

বুঝিয়াছিলেন, জাতির প্রাণশক্তি কোথায় তাহা অনুভব করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ ত্যাগের মন্ত্রে যেরূপ সাড়া দেয়, এরূপ আর কিছুতেই লক্ষিত হয় না। আজ স্বামী বিবেকানন্দ যে ত্যাগ ও সেবা ধর্মের মহিমা চারিদিকে প্রচারিত করিয়াছেন ও যাহার মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া শত শত নৈষ্ঠিকব্রতী যুবক তাঁহার পতাকাতলে মিলিত হইয়াছেন, সেই ত্যাগ ও সেবা ধর্মের সর্বপ্রথম পথ প্রদর্শক গৌতম বুদ্ধ।

বুদ্ধদেবের মহা ত্যাগের অব্যবহিত পরে, মহারাজা কাঙ্কণের রাজত্বে, সপ্তপর্ণি গুহাতে যে প্রথম ধর্মসঙ্গীতির অধিবেশন হয়, তাহাতে ৫০০ সংসারত্যাগী ভিক্ষু যোগ দান করেন। ইহার শত বৎসর পরে বৈশালী নগরীতে যশির মহান্ নেতৃত্বে যে দ্বিতীয় ধর্মসঙ্গীতির অধিবেশন হয়, তাহাতে প্রায় সাত শত বৌদ্ধ ভিক্ষু যোগদান করেন। তাহার পর বুদ্ধ নির্বাণের ২৩৬ বৎসর পরে, মহারাজ প্রিয়দর্শীর রাজত্বের সপ্তদশ বৎসরে পাটলিপুত্রের ধর্মসঙ্গীতির তৃতীয় অধিবেশন হয়, তাহাতে প্রায় এক হাজার ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। প্রায় নয় মাস ধরিয়া এই অধিবেশন চলিয়াছিল।

এরূপ কথিত আছে যে, অশোকপুত্র মহিন্দ্রমহেন্দ্র যখন সিংহল যেমে ধর্মপ্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন, সিংহলরাজ তিষ্য তাঁহার সৈনিক-বাস দেখিয়া আশ্চর্য্য হন ও সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন যে, মগধে তাহলে এরূপ ভিক্ষু আছেন। ইহার উত্তরে মহেন্দ্র বলেন যে, সমগ্র মগধ কাষায়বসনের উজ্জ্বল প্রভায় আলোকিত। Magadha glitters with yellow robes. এক্ষণে আমরা Missionary বলিলে যাহা বুঝি, গৌতমবুদ্ধই জগতের সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম Missionary। তাঁহার ধর্ম যে, তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া, তাতার, জাপানে একদিকে, অন্যদিকে সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, আসাম প্রভৃতি দেশে, পশ্চিমে এমন কি এসিয়া মাইনর, ও মিসিয়া প্রভৃতি দেশে তাঁহার ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, উহা তাঁহার ত্যাগ-করুণ-সঙ্কুল জীবনের শান্তিপ্রদ নির্বাণ ধর্ম প্রচারেরই ফল।

তাঁহার ধর্মমধ্যে পুরুষদিগের যেরূপ অধিকার ছিল, স্ত্রীলোকদিগকেও সেইরূপ সমান অধিকার দিয়াছিলেন। জগতের ইতিহাসে ইনিই সর্বপ্রথম ভিক্ষুণী সঙ্ঘ স্থাপন করেন ও তাঁহার মাতৃস্বসা মহাপ্রজাবতী গৌতমী প্রথম ভিক্ষুণী সঙ্ঘে যোগদান করেন। তৎপরে তাঁহার পত্নী যশোধরা উহাতে যোগদান করেন। অনেকেই কবিবর রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক মন্দির পূজা দেখিয়াছেন, ইহা বৌদ্ধ আদর্শে, সেইরূপ অনেক স্ত্রীলোক তাঁহার ধর্মে আশ্রয়লাভ করিয়া পরাশান্তি লাভ করিয়াছেন।

বৌদ্ধনীতি জগতে অতুলনীয়, কোন দেশের বা কোন ধর্মের নৈতিক উপদেশ ইহার সহিত তুলনা হয় না। অতি সহজ ও সরল কথায় এই নীতির মূল তত্ত্বগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :—

সব্বপাপস্স অকরণং কুসলস্স উপসম্পদা
সচিত্তপরিয়োদপনং এতং বুদ্ধানসাসনং

কোনপ্রকার পাপকর্ম না করা, কুশলকর্মের অনুষ্ঠান করা এবং চিত্তকে নির্মল রাখা ইহাই বুদ্ধের শাসন।

মহি হেরেন বেরানি সম্মীধীধ কুদাচনং
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো।

জগতে শত্রুতা দ্বারা কখনও শত্রুতা দমন করা যায় না, পরন্তু শত্রুতা মুক্ততা দ্বারা ইহাকে দমন করা যায়, ইহাই সনাতন ধর্ম।

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধু সাধুনা জিনে
জিনে কদরিয় দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং।

ক্রোধকে অক্রোধ (ক্ষমা) দ্বারা জয় করিবে, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করিবে, কৃপণকে দান দ্বারা জয় করিবে এবং মিথ্যাবাদীকে সত্য দ্বারা জয় করিবে।

তাঁহার সময়ে সমাজমধ্যে ব্রাহ্মণদিগের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। এই ব্রাহ্মণ একাধিপত্যের মূলে তিনি আঘাত করিয়াছিলেন ও সকল বর্ণকে সমান অধিকার দান করিয়াছিলেন।

তিনি ব্রহ্মায়ুসূত্রে ব্রাহ্মণবর্গকে বলিয়াছেন যে,ব্রাহ্মণ জাতিতে উৎপন্ন হইলে, কিংবা ব্রাহ্মণগর্ভজাত হইলে আমি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি না, যিনি আসক্তি রহিত এবং যিনি নিষ্পাপী, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

যাঁহার তৃষ্ণা বিজ্ঞান নাই এবং যিনি সম্যক জ্ঞান দ্বারা সংসার ক্ষেয় করিয়া অমৃতপদ লাভ করিয়াছেন তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। যিনি পাপ ও পুণ্য উভয় বন্ধন হইতে মুক্ত আছেন, যিনি শোকশূন্য, রাগাদি ক্লেশ রজ হইতে মুক্ত ও নির্মলচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। এইরূপ শত শত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার উপদেশের উদারতা ও মহত্ত্ব বুঝাইতে পারা যায়।

গৌতমবুদ্ধের মহত্ত্ব আমরা ভুলিয়াছি ; তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব বা তাঁহার চরিত্রের সম্যক ধারণা করিবার সামর্থ্য আমরা হারাইয়াছি, ভারতীয় চিন্তা ধারায় বা ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্যে বৌদ্ধ-যুগের প্রভাব আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। উহা কেবলমাত্র ইতিহাসের অন্বেষণার বিষয় হইয়াছে। গৌতম বুদ্ধের প্রতি অন্যায়ই আমাদের জাতীয় জীবনের অবনতির কারণ হইয়াছে। যে জাতি আত্মবিস্মৃত, বা যে জাতির অতীত দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, তাহাদের ভবিষ্যতের দৃষ্টিও সঙ্কীর্ণ অবস্থা লাভ করে। কিন্তু সুখের বিষয় মহাবোধি সোসাইটী গত ৩০ বৎসর স্থাপিত হইয়া, বিশেষতঃ ইহার প্রতিষ্ঠাতা ভিক্ষু ধর্মপালের ঐকান্তিক চেষ্টায়, যত্ন ও পরিশ্রমের ফলে ও সেই সঙ্গে কতিপয় ভারতবাসীর সহায়তায় বৌদ্ধধর্ম তাহার জন্মস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম, সাহিত্য ও দর্শনের পুনঃ আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। মহাবোধি সোসাইটি এই কলিকাতার কেন্দ্রস্থলে প্রাচীন বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যের নিদর্শন অনুসারে এক মন্দির স্থাপন করিয়াছেন এবং এই মন্দির মধ্যে এক মনোরম বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে ও সেই সঙ্গে এক বৃহৎ স্তূপের মধ্যে বুদ্ধদেবের পবিত্র অস্থি রক্ষিত আছে। সম্প্রতি এই সোসাইটী বারাণসীর সারনাথ নামক স্থানে, যে স্থানে গৌতম বুদ্ধ সর্বপ্রথম তাঁহার ধর্ম প্রচার করেন, সেই পবিত্র তীর্থে একটী উচ্চ চূড়া বিশিষ্ট বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন। গত মে মাসের মাসে সেই মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে দেশ বিদেশ হইতে শত শত ব্যক্তি যোগদান

করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত উক্ত সোসাইটী অন্যান্য স্থানে জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। কলিকাতা ব্যতীত মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরীতেও বুদ্ধ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল কার্য্যে উঁহারা Mrs. Foster নাম্নী এক মহীয়সী আমেরিকান মহিলার সাহায্য লাভ করেন, তাঁহারই সহায়তায় এই সকল কার্য্য সম্ভবপর হইয়াছে। ভারতের এই প্রাচীন ধর্ম্মের প্রতি যদি আমরা শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে অগ্রসর হইতে পারি এবং গৌতম বুদ্ধের উপদেশের প্রতি যদি আমরা যথোপযুক্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে পারি, তবেই আমরা জাতীয় জীবনে পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া পাইব এবং জগতের দ্বারে সেই প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারীরূপে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইব। উপসংহার করিবার পূর্ব্বে সেই দেবেন্দ্র, নাগেন্দ্র, নরেন্দ্র পূজিত মহাপুরুষের শ্রীচরণে বারম্বার প্রণাম জানাইতেছি। ব্রহ্মা ও দেবরাজ ইন্দ্র যাঁহার ধর্ম্ম প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন, বাসুকীনাগ ফণা দ্বারা যাঁহাকে রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়াছেন ও মহারাজ বিম্বিসার ও অজাতশত্রু প্রভৃতি নৃপতিগণ যাঁহার চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, অদ্য এই পবিত্র তিথিতে তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম জানাইতেছি।

নমোস্তু বুদ্ধায় নমোস্তু বোধয়ে
নমো বিমুক্তায় নমো বিমুক্তয়ে
নমোস্তু জ্ঞানস্য নমোস্তু তাদিনে
লোকাগ্র নেত্রায় নমো নমোঽস্তু তে।

ইংরাজ কবি Edwin Arnolda সহিত আমরাও বলিতেছি —

Lord Buddha—Prince Siddartha styled on Earth
In Earth and Heavens and Hells Incomparable
All-honoured wisest best, most pitiful ;
The Teacher of Nirvan and Law.

কবি পদ্মগুপ্ত পরিমল

অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, পিএইচ-ডি

পরমার রাজগণ খ্রীঃ নবম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মালব দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে মালবে স্বয়ংপ্রভ বহুসংখ্যক কবির আবির্ভাব হয়। ইঁহাদের মধ্যে কবি পদ্মগুপ্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খ্রীঃ দশম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম মৃগাঙ্ক গুপ্ত। পদ্মগুপ্তের অপর একটী নাম পরিমল। তৎকালে বাক্‌পতি মুঞ্জ মালবের অধিপতি ছিলেন—তিনি স্বয়ং কবি ছিলেন। তাঁহার রাজকার্য্যে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিলেও, তিনি সাহিত্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় মালবদেশ যেন সাহিত্যে নবজীবন লাভ করিয়াছিল।

এই বিদ্যানুরাগী নৃপতির অনুপ্রেরণায় পদ্মগুপ্ত পরিমলের কবি-প্রতিভার উন্মেষ হয় এবং তিনি সরস্বতীর আরাধনায় জীবন মন সমর্পণ করেন। কবিরে তিনি এতদূর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন, যে মুঞ্জ নৃপতি সভাস্থলে তাঁহাকে সভাপণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি নিজের রচনায় এক স্থলে লিখিয়াছেন "সরস্বতী রূপ কল্পলতার মূলাধার বাক্‌পতি রাজের প্রসাদে তিনি প্রসিদ্ধ কবিবৃন্দের দ্বারা রচিত পদে বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।" ইহাতে কবির মুঞ্জ নৃপতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। কালিদাস, ভবভূতি, বাণ ও ময়ূর প্রভৃতি ভারতবিখ্যাত কবিবৃন্দের উপর তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। তাঁহাদের পদানুসরণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া তিনি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। তাঁহার রচনায় উক্ত কবিগিরির নাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুদিনের জন্য কবির লেখনী বন্ধ হয়। ইহার সহিত একটী মর্ম্মন্তুদ দুঃখ-কাহিনী জড়িত আছে। যে মুঞ্জ নৃপতির পৃষ্ঠপোষকতায় ও উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া পদ্মগুপ্ত লেখনী ধারণ করেন সেই পরম শুভানুধ্যায়ীর শত্রুহস্তে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুই ইহার কারণ।

বাক্‌পতি মুঞ্জ তাঁহার রাজ্য বিস্তারকল্পে গুর্জ্জরদেশ আক্রমণ করেন এবং বীর রণকৌশলে গুর্জ্জরাধিপতি দুর্লরাজকে পরাজিত করেন। ক্রমে তাঁহার আধিপত্য রাজপুতনার নরবর প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। মালবের দক্ষিণ সীমান্তে কর্ণাটরাজ্য অবস্থিত ছিল। সেই সময় কর্ণাটে চালুক্য বংশের নৃপতিগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। কর্ণাটরাজ দ্বিতীয় তৈলপ কয়েকবার মালবদেশ আক্রমণ করেন ও লুণ্ঠনের চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রত্যেকবারই মুঞ্জের নিকট পরাজিত হয়েন। পরমার রাজবংশের প্রতি দৈববাণী হইয়াছিল যে, তাঁহারা সঙ্গমের গোদাবরী অতিক্রম করিলে তাঁহাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয় তৈলপ মালবরাজের নিকট বারম্বার যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও যখন পরমার রাজ্য লুণ্ঠনে বিরত হইলেন না—তখন মুঞ্জ গোদাবরী অতিক্রম করিয়া তৈলপের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। অদৃষ্টের লিখন মুঞ্জের খণ্ডন করিবার উপায় ছিল না। তিনি তৈলপের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। তাঁহাকে চালুক্য রাজধানী কল্যাণনগরে এক প্রাসাদে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। তৈলপ স্বীয় ভগ্নী মৃণালবতীকে বন্দী নৃপতির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হইলে মুঞ্জ মৃণালবতীর প্রণয়াবদ্ধ হইলেন। এদিকে মালবের অমাত্যবর্গ মন্ত্রিকার বিষে এক সুড়ঙ্গ খনন করিয়া মুঞ্জের বন্দীশালার সঙ্গে সংযোগ করিলেন এবং তাহার দ্বারা দিয়া মালবরাজের পলায়নের সংবাদও দিলেন। মুঞ্জের মুক্তিপথের আর কোনই অন্তরায় রহিল না। কিন্তু তিনি মৃণালবতীকে ছাড়িয়া যাইতে বিশেষ কষ্টানুভব করিলেন। রাজকুমারীকে নিজ রাজ্যে লইয়া যাইতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি তাঁহাকে নিজের পলায়নের সংকল্প জ্ঞাপন করিলেন ও তাঁহার সহিত মালবদেশে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মৃণালবতী মনে মনে ভাবিলেন যে বন্দী নৃপতি তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়াই এ কথা বলিতেছেন। মানুষের রূপ ক্ষণস্থায়ী—প্রৌঢ়াবস্থায় যখন রূপ নষ্ট হইয়া যাইবে তখন নৃপতি তাঁহাকে হেলায় পরিত্যাগ করিবেন। মুঞ্জের নিকট নিজের

করোজার গোপনপূর্বক তিনি স্বীয় ভ্রাতা হৈমপের সহিতে মালবরাজের গুপ্ত সন্ধানের কথা প্রকাশ করিলেন। মূলের যুক্তির আশা চূর্ণ হইয়া গেল। হৈমপ মালবরাজের পলায়নের সমস্ত পথ বন্ধ করিয়া দিলেন এবং তাঁহার অন্বেষণে বন্দীর নিগড় আরও কঠিন হইয়া উঠিল। মূলের আর দুঃখের অবধি রহিল না। প্রত্যহ তাঁহাকে হস্তপদ বন্ধন পূর্বক ভিক্ষাপাত্রের একটী কাষ্ঠপিঞ্জরে নিক্ষেপ করা হইত এবং ভিক্ষার জন্য নগরবাসীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরাইয়া আনা হইত। ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলই তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি চরিতার্থের একমাত্র উপায় ছিল। এই দুঃখের দিনে মূল অনেক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন—তাহারই কতকাংশ বেলভূল তাঁহার প্রবন্ধ চিন্তামণিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দিনের পর দিন মূল পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার দুঃখের অবসান হইল। একদিন প্রত্যূষে প্রহরীরা তাঁহাকে যমভূমিতে লইয়া গেল। অসির আঘাতে তাঁহার মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। হৈমপের প্রতিহিংসাবৃত্তি ইহাতেও চরিতার্থ হইল না। তিনি মূলের ছিন্ন মস্তক শূলে বিদ্ধ করিয়া রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে স্থাপন করিলেন। এই দুঃসহ সংবাদ যখন মালবরাজ্যে ছড়াইয়া পড়িল—মালববাসীরা শোকসাগরে নিমগ্ন হইল। পরমগুরুর দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার গুরুভক্তিপরায়ণ এইরূপ মূলের হত্যা—তাঁহার বক্ষে শেল সম বিদ্ধ হইল। এই মর্মন্তুদ দুঃখ তিনি নিজের রচিত কবিতায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেই রচনার সমস্ত অংশ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। তাহার কয়েকটী শ্লোক দ্বাদশ শতাব্দীর কাশ্মীরের কবি ক্ষেমেন্দ্র নিজের রচিত "সুবৃত্ত তিলকে" লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কবিতায় প্রথমাংশে পরমগুরু পরিকর মূলের রাজ্যচ্যুতি বৃত্তান্ত এবং অন্যান্য সমনুষ্ঠান প্রকাশ করেন এবং শেষ ভাগে প্রভুর শোচনীয় মৃত্যুকাহিনী মর্মন্তুদ ভাষায় ব্যক্ত করেন। এই নিদারুণ শোক কি ভাবে তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল, আমরা ইহা হইতে কিছুটা উপলব্ধি করিতে পারি। তিনি লিখিয়াছেন :—

হা পুণ্যাহরক্তিপ্ত কুলগিরি হা রাজচূড়ামণি
হা সৌজন্য সুধানিধি হা জনের দুষ্কর্মপি নরাসপের
হা উজ্জয়িনীর প্রেমিক হা পুরন্ধীর প্রত্যক্ষ কন্দর্প
হা সমাশ্রয় হা অমৃতরশ্মী চন্দ্র

হা আমার রাজা কোথা তুমি অন্তর্হিত হইয়াছ! আমার জন্য অপেক্ষা কর।

ইহার পর কিছুদিনের জন্য পরমগুরু সাহিত্যচর্চা একেবারেই বন্ধ করিয়া দেন। মূলের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই নৃপতির অভাবে তিনি সরস্বতীর মন্দির দ্বারে সহায়হীন হইয়া পড়েন।

মূলের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সিন্ধুরাজ মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিন্ধুরাজও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তিনি পরমগুরুকে অনেক অনুরোধ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে পুনরায় অবতীর্ণ করাইলেন। তাঁহারই আশ্রয়ে পরমগুরু বিখ্যাত গ্রন্থ 'নবসাহসাঙ্কচরিত' রচনা করেন। উক্ত পুস্তকের গ্রন্থপ্রণয়িতে তিনি লিখিয়াছেন যে, 'বাক্‌পতিরাজের মৃত্যুতে তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়াছিল, কিন্তু সিন্ধুরাজ সেই বাক্যপথের দ্বার খুলিয়া দেওয়ায় পুনরায় তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।'

নবসাহসাঙ্ক চরিতের বিষয়টী এই :—'একদা নৃপতি নবসাহসাঙ্ক সিন্ধুরাজ, মন্ত্রী রামাঙ্গদ সমভিব্যাহারে, বিন্ধ্য পর্ব্বতে মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন। সহসা তিনি একটী বিচিত্র মৃগ দেখিতে পাইলেন। তাহার গলদেশে একটী স্বর্ণ নির্ম্মিত হার ছিল। মৃগটীকে পাইবার জন্য নৃপতির অত্যন্ত কৌতূহল হইল। তিনি ইহাকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিলেন। শরবিদ্ধ হরিণ শরসহ দ্রুত পলায়ন করিল। সন্ধ্যা আগত হওয়ায় নৃপতি মৃগের পশ্চাদ্ধাবনে বিরত হইলেন। পরদিবস আবার তিনি মৃগের অন্বেষণে বাহির হইলেন। কত পর্ব্বতশিখর এবং উপত্যকা তিনি অতিক্রম করিলেন; কিন্তু প্রাণীটীর সন্ধান পাইলেন না। নর্ম্মদা-তীরে পর্ব্বতোপত্যকার নীল সরোবর তীরে এক রাজহংস চঞ্চুপুটে একটী মুক্তার মালা লইয়া বিচরণ করিতেছিল। সহসা উহা রাজ নৃপতির দৃষ্টি-পথে পতিত হইল। নৃপতি অনায়াসেই হংসটীকে ধরিতে পারিলেন এবং মালাটী পরীক্ষা করিয়া তাহাতে শশীপ্রভা নামাঙ্কিত দেখিতে পাইলেন। এই শশিপ্রভাকে দেখিবার জন্য নৃপতির বিশেষ কৌতূহলের উদ্রেক হইল।

শশিপ্রভা নাগরাজ শঙ্খপালের কন্যা। তিনি হরকৈলে, মলয় পর্ব্বতে, এবং হিমাচলে ভ্রমণ করিতে খুব ভালবাসিতেন। তিনি অসাধারণ রূপবতী ছিলেন। কোন এক সময় তিনি বিন্ধ্য পর্ব্বতে ভ্রমণ-কালীন শশাঙ্কমূর্ত্তির নৈকত ভূমিতে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে তিনি তাঁহার প্রিয় হরিণটীকে বাণবিদ্ধাবস্থায় সম্মুখে ধাবমান দেখিতে পাইলেন। তিনি শরটী মৃগদেহ হইতে বিমুক্ত করিলেন এবং তাহাতে নবীন সাহসাঙ্ক সিন্ধুরাজ এই নাম অঙ্কিত দেখিতে পাইলেন। তিনি মনে মনে কল্পনা করিলেন যিনি নবীন সাহসাঙ্ক এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন তিনিই নিশ্চয় প্রবলপ্রতাপশালী নৃপতি। রাজকন্যার সেই নৃপতিকে দেখিবার জন্য প্রবল বাসনা হইল এবং নিজের মনোভাব সখীদের নিকট প্রকাশ করিলেন। এদিকে সহচরী পাটলা রাজকুমারীকে জানাইল যে তাঁহার মুক্তার মালা কেহ হরণ করিয়াছে। একটী রক্ত-রাজহংস রাজকুমারীর মালাটী মৃণাল ভাবিয়া অপহরণ করিয়াছিল এবং উহাই সিন্ধুরাজের হস্তগত হয়। পাটলা মালা অন্বেষণে বহির্গত হইয়া পার্ব্বত্যপথে সহসা সিন্ধুরাজকে দেখিতে পাইল এবং তাঁহার পরিচয় অবগত হইয়া তাঁহাকে অতি সমাদরে শশিপ্রভার সহিত সাক্ষাৎ করাইল। সিন্ধুরাজ ও শশিপ্রভা পরস্পর দর্শনমাত্র প্রেমাবদ্ধ হইলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ এক দৈববলে রাজকন্যা সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে অদৃশ্য হইলেন ও নাগরাজধানী ভোগবতীপুর নীত হইলেন। নৃপতি রাজকন্যার রূপে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন। তিনি মন্ত্রী রামাঙ্গদ সমভিব্যাহারে নর্ম্মদা নদী অতিক্রম করিলেন। দেবী নর্ম্মদার নিকট জানিতে পারিলেন যে, শশিপ্রভা

নাগরাজ শঙ্খপালের কন্যা। শঙ্খপালের প্রবল শত্রু ছিল দৈত্য সম্প্রদায়। নর্মদা নদী হইতে ৫০ যোজন (২০০ মাইল) দূরে দৈত্যরাজ বজ্রাঙ্গদের রাজধানী রত্নাবতী অবস্থিত ছিল। শঙ্খপাল তাঁহার এই সংকল্প সমস্ত রাজ্যে প্রচার করিয়া দেন যে যদি কেহ ঐ দৈত্যরাজকে পরাজিত করিয়া তাহার প্রাসাদ সানুর সন্নিধান হইতে সসম্মানে আহরণপূর্বক শশিপ্রভাকে উপহার দিতে সমর্থ হয় তবে তাহারই হস্তে তিনি রাজকুমারীকে সমর্পণ করিবেন।

অনেক নৃপতি রাজকন্যার পাণিগ্রহণের জন্য বজ্রাঙ্গদের সহিত যুদ্ধ করেন ; কিন্তু সকলেই দৈত্যরাজের নিকট পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়েন। এই কথা জানিতে পারিয়াও সিন্ধুরাজ প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে প্রকারেই হউক তিনি শশিপ্রভার পাণিগ্রহণ করিবেন। তিনি বিপুল সৈন্যসংগ্রহ করিলেন। রাজার সৈন্যের সাহায্যার্থে নাগসৈন্য ও বিদ্যাধরগণ যোগদান করিল। ৫০ যোজন পথ অতিক্রম করিয়া সিন্ধুরাজ হিরণ্যগঙ্গাতীরে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। তৎপর তিনি হিরণ্যগঙ্গা অতিক্রম করিয়া দৈত্যরাজকে আক্রমণ করিলেন। সেই তুমুল সংগ্রামে মন্ত্রী রামাঙ্গদ দৈত্যরাজপুত্র বিদ্যুদ্বেগের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু অবশেষে সিন্ধুরাজই জয়ী হইলেন। বজ্রাঙ্গদ সমরে প্রাণ হারাইল ও তাহার রাজ্য সিন্ধুরাজের হস্তগত হইল। সিন্ধুরাজ দৈত্য সরোবর হইতে প্রাপ্ত স্বর্ণপদ্ম নাগরাজকন্যাকে উপহার দিলেন। বিপুল সমারোহে নাগরাজ্যে সিন্ধুরাজ ও শশিপ্রভার বিবাহ হইল।

নবসাহসাঙ্ক চরিতের আখ্যানটী উপাখ্যানের ন্যায় বোধ হইলেও ইহাতে যে ঐতিহাসিক সত্য আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কবি গ্রন্থপ্রণয়নে লিখিয়াছেন যে এই গ্রন্থ তিনি তাঁহার কবির শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব নিদর্শন করাইবার জন্য রচনা করেন নাই। ইহাতে তিনি সিন্ধুরাজের আদেশে উক্ত নৃপতির জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মন্ত্রী রামাঙ্গদের সত্রাসহস্তে নিধনবার্তা লিপিবদ্ধ করিয়া কবি আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে সিন্ধুরাজ ও তাঁহার অনুচরদের বীরত্ব কাহিনী ঘোষণা করিবার জন্যই তিনি এই পুস্তক রচনা করেন নাই, ঐতিহাসিক সত্য প্রচারও তাঁহার বিশেষ একটী উদ্দেশ্য।

মনীষী বুলার (Mr. Buhler) নবসাহসাঙ্ক-চরিত আর্য্যায় তাহার অনুবাদ করিবার সময় মত প্রকাশ করিয়াছেন যে এই গ্রন্থ যে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে ইহার প্রকৃত তথ্য উদ্ধারে তিনি স্বয়ং অসমর্থ এবং আশা করেন যে ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকেরা প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনে সমর্থ হইবেন।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে কবি প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা আখ্যানে দ্বারা গ্রন্থস্থ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। স্বপ্রণীত "পরমার বংশের ইতিহাস" নামক পুস্তকে আমি নানা প্রমাণ দ্বারা নবসাহসাঙ্ক চরিতের প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছি এবং যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহারই সারাংশ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

খ্রীঃ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ রাজ্যে এক নাগবংশ রাজত্ব করিত (Epigraphia Indica vol. IX) নাগদের পরমপক্ষ ছিল বস্তররাজ্যের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত বজ্রাঙ্গদের অধিপতি অসভ্য মানবংশীয় নৃপতিগণ। নাগরাজ মানবিদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া পরম প্রতাপান্বিত পরমার বংশ সম্ভূত মালবাধিপতি সিন্ধুরাজের সাহায্য ভিক্ষা করেন। সিন্ধুরাজ তাঁহাকে সাহায্যদানে ইচ্ছুক হইলে মন্ত্রী রামাঙ্গদ সহ সৈন্যে বজ্রাঙ্গদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। পথে তাঁহাকে গোদাবরী নদীর শাখা ওরেইন গঙ্গা অতিক্রম করিতে হয়। যুদ্ধে রামাঙ্গদ নিহত হয় কিন্তু সিন্ধুরাজ মানবিদকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া তাহাদের মণি-রত্ন লুণ্ঠন করেন। নাগরাজ ইহাতে পরম তুষ্ট হইয়া সিন্ধুরাজের হস্তে তাঁহার পরমা সুন্দরী কন্যা সমর্পণ করেন। সিন্ধুরাজ সেই কন্যাকে লুণ্ঠিত মণি-রত্নে সুসজ্জিত করিয়া মালবদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

নবসাহসাঙ্ক চরিত একটী বিশেষ পাণ্ডিত্য পূর্ণ গ্রন্থ। ইহা হইতে অনেক শ্লোক বল্লভদেবের রচিত গুণরত্ন মহোদধিতে, ভাবপ্রকাশে এবং ভোজরাজের অলঙ্কার বিষয়িণীতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পদ্মগুপ্ত আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সারঙ্গধর পদ্ধতিতে তাঁহার রচিত একটী পংক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

পদ্মগুপ্ত একজন বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কবি ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে দুঃখের বিষয়, তাঁহার রচিত আর কোন বিশেষ গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয় নাই।

ভরা ভাদরে

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

ঘন আঁধিয়ারে ঘেরি ভাদরের সেদিন দুপুরে
বাদরের বারিধারা এলো নেমে দশদিক জুড়ে ;
রুদ্ধ গৃহমাঝে বসি সুকোমল অলস শয়নে
অপূর্ব্ব রসের হর্ষ উচ্ছলিয়া উঠিল এ মনে
অকারণে। এ মুহূর্ত্ত যেন আজ ব্যর্থ নাহি হয়,
ভাবিনু কবিতা রচি এরে আমি করিব অক্ষয়।

একটি জানালা খোলা তার ফাঁক দিয়ে যায় দেখা,
—মুছে গেছে জলস্রোতে একেবারে দিগন্তের রেখা,
অই ফাঁকে চলে গেল অলক্ষিতে দুরন্ত কল্পনা
দিগন্তের পরপারে, হেরিতেছি আমি অন্যমনা
—ভিজিছে গাভীর দল তরুতলে, কাঁপিছে রাখাল
মলিন গামোছা গায়ে জড়াইয়া। ভিখারী কাঙাল
আছে আজি উপবাসে, জলে ভেজা হ'লো তার সার,
কোন গৃহে সাড়া নেই—সব গৃহ আজি রুদ্ধদ্বার।

মাঠে মাঠে খাটে চাষী—এই তার খাটার সময়,
দিতে নারে ভাড়া টোকা আজ তার মাথারে আশ্রয়।
কাঙালের কুঁড়ে ঘরে থই থই করে কাদা জল,
জ্বলেনি উনুন তার,—ভিজে চাল চিবায়ে কেবল
শান্ত করে ক্ষুধানল। রুদ্ধচিত্তে ব'সে গৃহকোণে
নদী-পানে নিরুদ্দেশ, জেলে আজি শুধু জাল বোনে।

ভুবন ভাসিছে জলে,—তবু হায় কে অই রূপসী
ভিজে ভিজে চলিয়াছে দূর ঘাটে ভরিতে কলসী,—
গ্রামের পিছল বাটে বধূ তার ভাঙ্গিয়াছে পাঁখা,
ভেঙেছে পাথর বাটি। শাশুড়ীর বাক্য বিষমাখা
বিঁধিছে ব্যথিত অঙ্গে।

কাদা জলে বসেনিক' হাট,
পসারীরা এসেছিল পার হয়ে দূরদূর মাঠ,
তরুতলে বসি ভাবে,—শিরে বহি পসারার ভার
সেই মাঠ পার হয়ে কেমনে বা ফিরিবে আবার।

ডাক-হরকরা ছুটে মাঠপথে বহি বার্ত্তাভার
দুর্গম দুর্য্যোগ-পথে,—তিন ক্রোশ ছয় ক্রোশ তার,
পথে যেতে যেতে দেখে, বসে গেছে কাদা পাঁক জলে
একটি গোরুর গাড়ী। ঠেলে তারে প্রাণপণ বলে
তুলে দিয়ে নিরুপায় গাড়োয়ানে পরিত্রাণ করে,
প্রতীক্ষা না করি আর আরোহীর ধন্যবাদ তরে
চলে পুনঃ গ্রামদূত সহি পথে দুর্য্যোগের ব্যথা
বহি পৃষ্ঠে জলধৌত অক্ষরের প্রাণের বারতা।

বন্ধ খেয়া পারাপার। খেয়া-তরী বাঁধি তরুমূলে
পাটনী কোথায় গেছে,—কূলে বসি ভাসিছে অকূলে
পারার্থীরা নিরুপায়। তুলি দূরে ধূমের কেতন
মাঝে মাঝে তরীগুলি ভেসে যায় উল্কার মতন।
কোথাও বা দূরপান্থ ঘটতল করেছে আশ্রয়
মাঝপথে এসে তার প্রাণে মনে দারুণ-সংশয়,
ফিরে-যাওয়া আগে-চলা এবে তার দুই-ই সমান,
গ্রামান্তের রেখা লুপ্ত,—অনন্ত সে পথ ব্যবধান।
বাঁটঘাট ছেড়ে এসে উঁকি দিয়ে দেখি ঘরে-ঘরে
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ—কাঁথা গায়ে ধুঁকিতেছে জ্বরে।
আরো দূরে গিয়ে দেখি—এ কি সেই সমুদ্র সৈকত ?
এরি মধ্যে অতিক্রম করিয়াছি এত দীর্ঘপথ ?
ভাল ক'রে চেয়ে দেখি—এ'ত নয় নীলের পাথার,
চালাঘর, পালাখড়, গাছপালা দিতেছে সাঁতার ;
বন্যায় ভাসিছে দেশ—

অকস্মাৎ পশিল এ কাণে
পাখীদের কলরব,—হৃষ্টকণ্ঠে তারা একতানে
ক্ষণিক বর্ষণ-ক্লান্তি—দিগ্বিদিকে করিল ঘোষণা
ভাঙি দিবাস্বপ্ন-ঘোর। হেরি ফিরে এসেছে কল্পনা
পাখা দুটি গুটাইয়া কাঁপিতেছে শীতে থর থর

নতমুখ অবসন্ন ঘনশ্বাসে চকিত কাতর,
কেশান্ত পক্ষাগ্র হ'তে জলবিন্দু ঝরে অবিরল ;
যতনে মুছায়ে তাহা দিয়া মোর শুকানো আঁচল।
বুঝিনু আরাম-কক্ষে রুদ্ধ করি দ্বার বাতায়ন
হয় নাক' বিরসনে এ চিত্তের বিচ্ছেদ সাধন,
ভুবন ভাসিবে জলে,—আরামের শয্যা 'পরে তবু
ওরে ওরে আনন্দের গান রচা হয়নাক' কভু।

শেষের পরিচয়

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(৩)

পরদিন অপরাহ্ণের কাছাকাছি দুই বন্ধু চায়ের সরঞ্জাম সম্মুখে লইয়া টেবিলে আসিয়া বসিল। টি-পটে চায়ের-জল তৈরি হইয়া উঠিতে বিলম্ব দেখিয়া রাখাল চামচে ডুবাইয়া ঘন ঘন তাগিদ দিতে লাগিল।

তারক কহিল, নামের মাহাত্ম্য দেখলে তো?

রাখাল বলিল, অবিশ্বাস ক'রে মা দুর্গাকে তুমি খামোকা চটিয়ে দিলে বলেই তো যাত্রাটা নিষ্ফল হলো,—নইলে হোতোনা।

প্রতিবাদে তারক শুধু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

সত্যই কাল কাজ হয় নাই। ব্রজবাবু বাড়ী ছিলেননা, কোথায় নাকি নিমন্ত্রণ ছিল, এবং মাধাবাবু কিঞ্চিৎ অসুস্থ থাকায় একটু সকাল-সকাল আহারাদি সারিয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাখাল বাটীর মধ্যে দেখা করিতে গেলে সে যে এখনো তাঁহাদের মনে রাখিয়াছে এই বলিয়া ব্রজবাবুর স্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবং ফিরিবার সময়ে অন্তের চোখের অন্তরালে রেণুও কাছে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে ঠিক এই মর্ম্মেই অনুযোগ জানাইয়াছিল।

—তোমার বাবাকে বলতে ভুলোনা যে আমি সন্ধ্যার পরে কাল আবার আসবো। আমার বড় দরকার।

—আচ্ছা। কিন্তু চাকরদেরও বলে যাও।

সুতরাং ব্রজবাবুর নিজস্ব ভৃত্যটিকেও এ কথা রাখাল বিশেষ করিয়া জানাইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু যথাসময়ে বাসায় পৌঁছিতে পারে নাই। আসিয়া দেখিল দরজার কড়ায় জড়ানো এক-টুকরা কাগজ; তাহাতে পেন্সিলে লেখা—আজ দেখা হোলোনা, কাল বৈকাল পাঁচটায় আসবো। ন-মা।

আজ সেই পাঁচটার আশাতেই দুই বন্ধুতে পথ চাহিয়া আছে। কিন্তু, এখনো তা'র মিনিট কুড়ি বাকি। তারক তাগাদা দিয়া কহিল, যা হয়েছে চালো। তাঁর আসবার আগে এ সমস্ত পরিষ্কার করে ফেলা চাই।

কেন? মানুষে চা খায় এ কি তিনি জানেননা?

রাখাল কহিল, তর্ক কোরোনা। মানুষে মানুষের অনেক-কিছু জানে, তবু, তার কাছেই অনেক-কিছু সে আড়াল করে। গুরু-বান্ধবের এ প্রয়োজন হয়না। তা ছাড়া এ গুলোই বা কি? এই বলিয়া সে অ্যাশ-ট্রে সমেত সিগারেটের টিনটা তুলিয়া ধরিল। বলিল, পৌরুষ ক'রে এ-ও তাঁকে দেখাতে হবে নাকি?

রাখাল হাসিয়া ফেলিল,—দেখে ফেললেও তোমার ভয় নেই, তারক, অপরাধী যে কে তিনি ঠিক বুঝতে পারবেন।

তারক খোঁচাটা অনুভব করিল। বিরক্তি চাপিয়া বলিল, তাই আশা করি। তবু, আমাকে ভুল বুঝলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু একদিন যাকে মানুষ কোরে তুলেছিলেন তাকে বুঝতে না পারলে তাঁর অন্যায় হবে।

রাখাল কিছুমাত্র রাগ করিলনা, হাসিমুখে নিঃশব্দে চা ঢালিতে প্রবৃত্ত হইল।

তারক চা খাইতে আরম্ভ করিয়া মিনিট দুই পরে কহিল, হঠাৎ এমন চুপচাপ যে?

কি করি? তিনি আসবার আগে সেই ন'শো নিরানব্বুইর ধাক্কাটা মনে মনে একটু সাম্‌লে রাখ্‌চি ভাই, এই বলিয়া সে পুনশ্চ একটু হাসিল।

শুনিয়া তারকের গা জ্বলিয়া গেল। কিন্তু, এবার সেও চুপ করিয়া রহিল।

চা খাওয়া সমাপ্ত হইলে সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দুজনে প্রস্তুত হইয়া রহিল। ঘড়িতে পাঁচটা বাজিল। ক্রমশঃ পাঁচ, দশ, পনেরো মিনিট অতিক্রম করিয়া ঘড়ির কাঁটা নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার দেখা নাই। উন্মুখ অধীরতায় সমস্ত ঘরটা যে ভিতরে ভিতরে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা প্রকাশ করিয়া না বলিলেও পরস্পরের কাছে অবিদিত নাই; এম্‌নি সময়ে

সহসা তারক বলিয়া উঠিল, এ কথা ঠিক যে তোমার নতুন-মা অসাধারণ স্ত্রীলোক।

রাখাল অতি-বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া বন্ধুর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

তারক বলিল, নারীর এমনি ইতিহাস শুধু বইয়ে পড়েচি, কিন্তু চোখে দেখিনি। যাঁদের চিরদিন দেখে এসেচি তাঁরা ভালো, তাঁরা সতী-সাধ্বী, কিন্তু ইনি যেন—

কথাটা সম্পূর্ণ হইবার আর অবসর পাইলনা।

—রাহু, আসতে পারি বাবা?

উচ্চয়েই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাখাল দ্বারের কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া প্রণাম করিল, কহিল, আসুন।

তারক ক্ষণকাল ইতস্তত: করিল, কিন্তু তখনি পায়ের কাছে আসিয়া সেও নমস্কার করিল।

সকলে বসিবার পরে রাখাল বলিল, কাল সব দিক দিয়েই যাত্রা হোলো নিষ্ফল; কাকাবাবু বাড়ী নেই, মামাবাবু গুরু-ভোজনে অসুস্থ এবং শয্যাগত, আপনাকে নিরর্থক ফিরে যেতে হয়েছিল; কিন্তু এর জন্যে আসলে দায়ী হচ্চে তারক। ওকে এইমাত্র তার জন্যে আমি ভর্ৎসনা করছিলাম। খুব সম্ভব অপরাধের গুরুত্ব বুঝে ও অনুতপ্ত হয়েছে। না দেবে ও মা-দুর্গাকে রাগিয়ে, না হবে আমাদের যাত্রা পণ্ড।

তারক ঘটনাটা খুলিয়া বলিল। নতুন-মা হাসি-মুখে প্রশ্ন করিলেন, তারক বুঝি এসব বিশ্বাস করোনা?

বিশ্বাস করি বলেই তো ভয় পেয়েছিলাম আজ বোধ হয় কিছু আর হবেনা।

তাহার জবাব শুনিয়া নতুন-মা হাসিতে লাগিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কার সঙ্গেই দেখা হোলোনা?

রাখাল কহিল, তা' হয়েছে না। বাড়ীর গিন্নী আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, পথ ভুলে এসেছি কিনা। ফেরবার মুখে রেণুও ঠিক ঐ নালিশই করলে। অবশ্য আড়ালে। তাকেই বলে এলাম মাকে জানাতে আমি আবার কাল সন্ধ্যায় আসবো। আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। জানি, আর যে-ই বলতে ভুলুক, সে ভুলবেনা।

তোমরা আজ আবার যাবে?

হাঁ, সন্ধ্যার পরেই।

ওরা সবাই বেশ ভালো আছে?

তা' আছে।

নতুন-মা চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া মনের অনেক দ্বিধা সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিলেন, রেণু কেমনটি দেখতে হয়েছে রাহু?

রাখাল বিস্ময়াপন্ন মুখে প্রথমটা স্তব্ধ হইয়া রহিল, পরে কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে কহিল, প্রশ্নটি তো শুধু বাহুল্য নয়, মা, —হোলো অন্যায়। নতুন-মার মেয়ে দেখতে কেমন হওয়া উচিত এ কি আপনি জানেন না? তবে রহুটা বোধ হয় একটুখানি বাপের ধার ঘেঁষে গেছে;—ঠিক স্বর্ণ-চাঁপা বলা চলেনা। বলুন, তাই কি নয় নতুন-মা?

মেয়ের কথায় মায়ের দুই চোখ ছল্ ছল্ করিয়া আসিল; দেয়ালের ঘড়ির দিকে এক মুহূর্ত্ত মুখ তুলিয়া বলিলেন, তোমাদের যাবার সময় বোধ হয় হয়ে এলো।

না. এখনো ঘণ্টা দুই দেরি।

তারক গোড়ায় দুই একটা ছাড়া আর কথা কহে নাই, উত্তরের কথোপকথন মন দিয়া শুনিতেছিল। যে অজানা মেয়েটির অশুভ, অমঙ্গল-ময় বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিবার সঙ্কল্প তাহারা গ্রহণ করিয়াছে, সে কেমন দেখিতে, জানিতে তাহার আগ্রহ ছিল, কিন্তু ব্যগ্রতা ছিলনা, কিন্তু, এই যে রাখাল বর্ণনা করিলনা, শুধু অনুযোগের কণ্ঠে মেয়েটির রূপের ইঙ্গিত করিল, সে যেন তাহার অন্ধকার অবরুদ্ধ মনের দশ দিকের দশখানা জানালা খুলিয়া আলোকে আলোকে চকিত চঞ্চল করিয়া দিল। এতক্ষণ সে যেন দেখিয়াও কিছু দেখে নাই, এখন মায়ের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিলনা।

নতুন-মার বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। রূপে খুঁৎ নাই তা' নয়, সুমুখের দাঁত দুটি উঁচু, তাহা কথা কহিলেই চোখে পড়ে। বর্ণ সত্যই স্বর্ণ-চাঁপার মতো, কিন্তু হাত-পায়ের গড়ন ননী মাখনের সহিত কোন মতেই তুলনা করা চলেনা। চোখ দীর্ঘায়ত নয়, নাকও বাঁশী বলিয়া ভুল হওয়া অসম্ভব; কিন্তু একহারা দীর্ঘচ্ছন্দ দেহে সুষমা ঘরেনা। কোথায় কি আছে না জানিয়া অত্যন্ত সহজে মনে হয় প্রচ্ছন্ন মর্য্যাদায় এই পরিণত নারী-দেহটি যেন কানায়-কানায় পরিপূর্ণ। আর সব চেয়ে চোখে পড়ে নতুন-মার আশ্চর্য্য কণ্ঠস্বর। মাধুর্য্যের যেন অন্ত নাই।

তারকের চমক ভাঙ্গিল নতুন-মার জিজ্ঞাসায়। তিনি

হঠাৎ যেন ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিলেন, রাজু, তোমার কি মনে হয় বাবা এ বিয়ে বন্ধ করতে পারবে?

সে কথা তো বলা যায়না মা।

তোমার কাকাবাবু কি কিছুই দেখবেন না? কোন কথাই কানে তুলবেন না?

রাখাল বলিল, চোখ-কান তো তাঁর আর নেই মা। তিনি দেখেন মামাবাবুর চোখে, শোনেন গিন্নীর কানে। আমি জানি এ বিয়ের সম্বন্ধ তাঁরাই ক'রেছেন।

কর্ত্তা তবে কি করেন?

যা' চিরদিন করতেন,—সেই গোবিন্দজীর সেবা। এখন শুধু তার উগ্রতা বেড়ে গেছে শতগুণে। দোকানে যাবারও বড় সময় পাননা। ঠাকুর-ঘর থেকে বার হতেই বেলা পড়ে আসে।

তবে বিষয় আশয়, কারবার, ঘর-সংসার দেখে কে?

কারবার দেখেন মামা, আর সংসার দেখেন তাঁর মা—অর্থাৎ শাশুড়ী। কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করে লাভ কি বলুন, কিছুই আপনার অজানা নয়। একটু থামিয়া বলিল, আমরা আজও যাবো সত্যি, কিন্তু তার নিশ্চিত পরিণামও আপনার জানা নতুন-মা।

নতুন-মা চুপ করিয়া রহিলেন, শুধু মুখ দিয়া একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। বোধহয় নিরুপায়ের শেষ মিনতি।

হঠাৎ শোনা গেল বাহিরে কে-যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে, ওহে ছেলে, এইটি কি রাজুবাবুর ঘর?

বালক-কণ্ঠে জবাব হইল, না মশাই, রাখালবাবুর বাসা।

হাঁ হাঁ, তাঁকেই খুঁজ্‌চি, এই বলিয়া এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, রাজু আছো? বাঃ—এই তো হে! রাখালের প্রতি চোখ পড়িতেই সহসা স্মিত হাস্যে গৃহের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, ভেবেছিলাম বুঝি খুঁজেই পাবোনা। বাঃ—দিব্যি ঘরটিতো।

হঠাৎ চোখের ঈষৎ অন্তরালবর্ত্তিনী মহিলাটির প্রতি দৃষ্টি পড়ায় একটু বিব্রত বোধ করিলেন, পিছু হটিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া কিন্তু স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত নিরীক্ষণ করার পরে বলিলেন, নতুন-বৌ না? বলিয়াই ঘাড় ফিরাইয়া তিনি রাখালের প্রতি চাহিলেন।

একটা কঠিনতম অবমাননার মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য বিদ্যুদ্বেগে রাখালের মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিয়া মুখ তাহার মড়ার মতো ফ্যাকাশে হইয়া গেল। তারক ব্যাপারটা আন্দাজ করিয়াও করিতে পারিলনা, তথাপি অজানা ভয়ে সেও হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। ভদ্রলোক পর্য্যায়ক্রমে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন,—তোমরা করছিলে কি? ঘড়ঘর? গুলির আড্ডায় কনেষ্টবল ঢুকে পড়লেও ত তারা এতো ঘাবড়ে ওঠেনা। হয়েছে কি? নতুন-বৌ ত?

মহিলা চৌকি ছাড়িয়া দূর হইতে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া একধারে সরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, হাঁ, আমি নতুন-বৌ।

বোসো, বোসো। ভালো আছো? বলিয়া তিনি নিজেই অগ্রসর হইয়া চৌকি টানিয়া উপবেশন করিলেন; বলিলেন, নতুন-বৌ, আমার রাজুর মুখের পানে একবার চেয়ে দেখো। ও বোধ হয় ভাবলে আমি চিনতে পারামাত্র তোমাকে বুকে আহ্বান করে এক ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়ে দেবো। ওর ঘরের জিনিসপত্র আর থাকবেনা, ভেঙে তছ্‌নচ্‌ হয়ে যাবে।

তাঁহার বলার ভঙ্গীতে শুধু কেবল তারক ও রাখালই নয়, নতুন-মা পর্য্যন্ত মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তারক এতক্ষণে নিঃসন্দেহে বুঝিল ইনিই ব্রজবাবু। তাহার আনন্দ ও বিস্ময়ের অবধি রহিলনা।

ব্র. বাবু অনুরোধ করিলেন, দাঁড়িয়ে যেকোনা নতুন বৌ, বোসো।

তিনি ফিরিয়া আসিয়া বসিলে ব্রজবাবু বলিতে লাগিলেন, পরশু রেণুর বিয়ে। ছেলেটি স্বাস্থ্যবান সুন্দর, লেখা-পড়া, কথাচে,—আমাদের জানা-ঘর। বিষয়-সম্পত্তি টাকা-কড়িও মন্দ নেই। এই কলকাতা সহরেই খান চারেক বাড়ী আছে। এ-পাড়া ও-পাড়া বললেই হয়, যখন ইচ্ছে মেয়ে-জামাইকে দেখতে পাওয়া যাবে। মনে হয়তো সকল দিকেই ভালো হলো।

একটু থামিয়া বলিলেন, আমাকে তো জানোই নতুন-বৌ, সাধ্যি ছিলনা নিজে এমন পাত্র খুঁজে বার করি। সবই গোবিন্দর কৃপা! এই বলিয়া তিনি ডানহাতটা কপালে ঠেকাইলেন।

কন্যার সুখ-সৌভাগ্যের সুনিশ্চিত পরিণাম কল্পনায়

উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সমস্ত মুখ স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন, একটা তিক্ত ও একান্ত অপ্রীতিকর বিরুদ্ধ প্রস্তাবে এই মায়া-জাল তাঁহারই চক্ষের সম্মুখে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইলনা।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমাদের রাখাল-রাজকে তো আর চিঠিতে নিমন্ত্রণ করা যায়না, ওকে নিজে গিয়ে ধরে আন্‌তে হবে। ও ছাড়া আমার করবে কর্ম্মাবেই বা কে? কাল রাত্রে ফিরে গিয়ে রেণুর মুখে যখন খবর পেলাম রাজু এসেছিলো, কিন্তু দেখা হয়নি,—তার বিশেষ প্রয়োজন, কাল সন্ধ্যায় আবার আসবে—তখনি স্থির কোরলাম এ সুযোগ আর নষ্ট হতে দিলে চল্‌বেনা—যেমন কোরে হোক্ খুঁজে পেতে তার বাসায় গিয়ে আমাকে ঐ ত্রুটি সংশোধন করতেই হবে। তাই দুপুর বেলায় আজ বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু, কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম মনে নেই, আমার এক-কাজে কেবল দু-কাজ নয়, আমার সকল কাজ আজ সম্পূর্ণ হলো।

স্পষ্টই বুঝা গেল তাঁহার ভাগ্য-বিড়ম্বিতা একমাত্র কন্যার বিবাহ ব্যাপারটিকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি এ কথা উচ্চারণ করিয়াছেন। মেয়েটা যেন তাহার অপরিজ্ঞাত জীবন-যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে জননীর অপ্রত্যাশিত আশীর্ব্বাদ লাভ করিল।

রাখাল অত্যন্ত নিরীহের মত মুখ করিয়া কহিল, বেরোবার সময় মামাবাবু ছিলেন বলে কি মনে পড়ে?

কেন বলো ত?

তিনি ভাগ্যবান লোক, বেরোবার সময়ে তাঁর মুখ দেখে থাকলে হয়ত—

ওঃ—তাই। ব্রজবাবু হাসিয়া উঠিলেন।

নতুন-মা রাখালের মুখের প্রতি অলক্ষ্যে একটুখানি চাহিয়াই মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার হাসির ভাবটা ব্রজবাবুর চোখ এড়াইল না, বলিলেন, রাজু, কথাটা তোমার ভালো হয়নি। যাই হোক্, সম্পর্কে তিনি নতুন-বৌয়েরও ভাই হন; ভাইয়ের নিন্দে বোনেরা কখনো সইতে পারে না। উনি বোধ করি, মনে মনে রাগ করলেন।

রাখাল হাসিয়া ফেলিল। ব্রজবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, অসঙ্গত নয়, রাগ করারই কথা কি না।

তারকের সহিত এখনো তাঁহার পরিচয় ঘটে নাই, এ লোভটা সে সম্বরণ করিতে পারিল না, বলিল, আজ বার হবার সময়ে আপনি দুর্গা নাম উচ্চারণ করেননি নিশ্চয়ই?

ব্রজবাবু প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেন না, বলিলেন, কই না। অভ্যাস মতো আমি গোবিন্দ স্মরণ করি, আজও হয়ত তাঁকেই ডেকে থাক্‌বো।

তারক কহিল, তাতেই যাত্রা সফল হয়েছে, ও-নামটা করলে শুধু-হাতে ফিরতে হোতো।

ব্রজবাবু তথাপি তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেন না, চাহিয়া রহিলেন। রাখাল তারকের পরিচয় দিয়া কালকের ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, ওর মতে দুর্গা নামে কার্য্য পণ্ড হয়। কালকে যে আপনার দেখা না পেয়ে আমাদের বিফল হয়ে ফিরতে হয়েছিল, তার কারণ বার হবার সময় আমি দুর্গা নাম উচ্চারণ করেছিলাম। হয়ত এ রকম দুর্ভোগ ওর কপালে পূর্ব্বেও ঘটে থাকবে, তাই ও-নামটার ওপরেই তারক চটে আছে।

শুনিয়া ব্রজবাবু প্রথমটা হাসিলেন, পরে হঠাৎ ছদ্ম-গাম্ভীর্য্যে মুখখানা অতিশয় ভারি করিয়া বলিলেন, হয় হে রাখালরাজ হয়,—ওটা মিথ্যে নয়। সংসারে নাম ও দ্রব্যের মহিমা কেউ আজও সঠিক জানেনা। আমিও একজন রীতিমত ভুক্তভোগী। 'ফুট-কড়াই' নাম করলে আর আমার রক্ষে নেই।

জিজ্ঞাসু মুখে সকলেই চোখ তুলিয়া চাহিল; রাখাল সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, কিসে?

ব্রজবাবু বলিলেন, তবে ঘটনাটা বলি শোন। ব্রজ-বিহারী বলে ছেলেবেলায় আমার ডাক-নাম ছিল বলাই। ভয়ানক ফুট-কড়াই খেতে ভালোবাসতাম। দুপ্রতাপও তেম্‌নি। আমার এক দূর-সম্পর্কের ঠাকুরমা সাবধান করে বল্‌তেন—

ব'লাই, কলাই খেয়োনা—

জানলা ভেঙে বউ পালাবে দেখ্‌তে পাবেনা।

ভেবে দেখ দিকি ছেলে-বেলায় ফুট-কড়াই খাওয়ার বুড়ো-বয়সে আমার কি সর্ব্বনাশ হলো। এ কি দ্রব্যের দোষ-গুণের একটা বড় প্রমাণ নয়? যেমন দ্রব্যের তেম্‌নি নামেরও আছে বৈকি!

তারক ও রাখাল লজ্জায় অধোবদন হইল। নতুন-মা ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া চাপা গলায় তর্জনা করিয়া কহিলেন, ছেলেদের সাম্‌নে এ তুমি কোরুচ কি?

কেন? ওদের সাবধান করে দিচ্চি। প্রাণ থাক্‌তে যেন কখনো ওরা মুট-কড়াই না খায়।

তবে, তাই করো, আমি উঠে যাই।

ঐ তো তোমার দোষ নতুন বৌ, চিরকাল কেবল তাড়াই লাগাবে আর রাগ করবে, একটা সত্যি কথা কখনো বল্‌তে দেবে না। ভাব্‌লাম, আসল দোষটা যে সত্যিই কার, এতকাল পরে খবরটা পেলে তুমি খুশী হয়ে উঠবে,—তা হোলো উল্টো।

নতুন-মা হাত জোড় করিয়া কহিলেন, হয়েছে,—এবার তুমি থামো। রাজু?

রাখাল মুখ তুলিয়া চাহিল। নতুন-মা বলিলেন, তুমি যে জন্যে কাল গিয়েছিলে ওঁকে বলো।

রাখাল একবার ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু ইঙ্গিতে পুনশ্চ সুস্পষ্ট আদেশ পাইয়া বলিয়া ফেলিল, কাকাবাবু, রেণুর বিবাহ তো ওখানে কোনমতেই হতে পারে না।

শুনিয়া ব্রজবাবু এবার বিস্ময়ে সোজা হইয়া বসিলেন, তাঁহার রহস্য কৌতুকের ভাবটা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল, বলিলেন, কেন পারেনা?

রাখাল কারণটা খুলিয়া বলিল।

কে তোমাকে বল্‌লে?

রাখাল ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, নতুন-মা।

ওঁকে কে বল্‌লে?

আপনি ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।

ব্রজবাবু স্তব্ধভাবে বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, নতুন-বৌ, কথাটা কি সত্যি?

নতুন-মা ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, হাঁ, সত্য।

ব্রজবাবুর চিন্তার সীমা রহিলনা। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিলে বলিলেন, তা'হলেও উপায় নেই। রেণুর আশীর্বাদ, গায়ে-হলুদ পর্য্যন্ত হয়ে গেছে, পর্শু বিয়ে, একদিনের মধ্যে আমি পাত্র পাবো কোথায়?

নতুন-মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, তুমি তো নিজে পাত্র খুঁজে আনোনি মেজকর্ত্তা, যাঁরা এনেছিলেন তাঁদের হুকুম করো।

ব্রজবাবু বলিলেন, তারা শুন্‌বে কেন? তুমি তো জানো নতুন-বৌ, হুকুম করতে আমি জানিনে,—কেউ আমার তাই কথা শোনেনা। তারা তো পর, কিন্তু তুমিই কি কখনো আমার কথা শুনেচো আজ সত্যি ক'রে বলো দিকি।

হয়ত' বিগত দিনের কি-একটা কঠিন অভিযোগ এই উল্লেখটুকুর মধ্যে গোপন ছিল সংসারে এই দুটি মানুষ ছাড়া আর কেহ তাহা জানেনা। নতুন-মা উত্তর দিতে পারিলেননা, গভীর লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে কাটিল। ব্রজবাবু মাথা নাড়িয়া অনেকটা যেন নিজের মনেই বলিয়া উঠিলেন, অসম্ভব।

রাখাল মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, অসম্ভব কি কারণে কাকাবাবু?

ব্রজবাবু বলিলেন, অসম্ভব বলেই অসম্ভব রাজু। নতুন বৌ জানেনা, জানবার কথাও নয়, কিন্তু তুমি তো জানো। তাঁহার কণ্ঠস্বরে, চোখের দৃষ্টিতে নিরাশা যেন লুটিয়া পড়িল। অন্যথার কথা যেন তিনি ভাবিতেই পারিলেননা।

নতুন-মা মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, নতুন-বৌ তো জানেনা, তাকে বুঝিয়েই বলোনা মেজকর্ত্তা, অসম্ভব কিসের জন্যে? রেণুর মা নেই, তার বাপ আবার যাকে বিয়ে করেছে তার ভাই চায় পাগলের হাতে মেয়ে দিতে,—তাই অসম্ভব? কিছুতেই ঠাকানো যায়না এই কি তোমার শেষ কথা? তাঁহার মুখের পরে ক্রোধ, করুণা, না তাচ্ছল্য কিসের ছায়া যে নিঃসংশয়ে দেখা দিল বলা কঠিন।

দেখিয়া ব্রজবাবুর তৎক্ষণাৎ স্মরণ হইল যে-অবাধ্য নতুন-বৌয়ের বিরুদ্ধে এইমাত্র তিনি অভিযোগ করিয়াছেন এ সেই। রাখালের মনে পড়িল যে-নতুন-মা বাল্যকালে তাহার হাত ধরিয়া নিজের স্বামী-গৃহে আনিয়াছিলেন ইনি সেই।

লজ্জা ও বেদনায় অভিসিঞ্চিত যে-গৃহের আলো-বাতাস মিথ্যাস্ত-পরিহাসের মুক্তস্রোতে অভাবনীয় সহৃদয়তায় উজ্জ্বল হইয়া আসিতেছিল, এক মুহূর্ত্তেই আবার তাহা শ্রাবণের অমানিশার অন্ধকারের বোঝা হইয়া উঠিল। রাখাল ব্যস্ত হইয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মা, অনেকক্ষণ তো আপনি পাণ খান্‌নি? আমার মনে ছিলনা মা, অপরাধ হয়ে গেছে।

নতুন-মা কিছু আশ্চর্য্য হইলেন—পাপ? পাপের দরকার নেই বাবা।

নেই বই কি! ঠোঁট দুটি শুকিয়ে কালো হয়ে উঠেচে। কিন্তু আপনি ভাবচেন এখুনি বুঝি হিন্দুস্থানী পাপ-বালার দোকানে ছুটবো। না মা, সে বুদ্ধি আমার আছে। এসো ত তারক, এই মোড়টার কাছে আমাকে একটু দাঁড়াবে, এই বলিয়া সে বন্ধুর হাতে একটা প্রচণ্ড টান দিয়া দ্রুতবেগে দুজনে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

এইবার নিরালা গৃহের মধ্যে মুখোমুখি বসিয়া দুজনেই সঙ্কোচে মরিয়া গেলেন। নিঃসম্পর্কীয় যে-দুটি লোক মেঘ-খণ্ডের ন্যায় এতক্ষণ আকাশের সূর্য্যালোক বাধাগ্রস্ত রাখিয়াছিল, তাহাদের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই বিনির্মুক্ত রবিকরে আপসা কিছুই আর রহিলনা। স্বামী-স্ত্রীর গভীর ও নিকটতম সম্বন্ধ যে এমন ভয়ঙ্কর বিকৃত ও লজ্জাকর হইয়া উঠিতে পারে এই নিভৃত নির্জ্জনতায় তাহা ধরা পড়িল। ইতিপূর্ব্বের হাস্য-পরিহাসের অবতারণা যে কত অশোভন ও অসঙ্গত এ কথা ব্রজবাবুর মনে পড়িল, এবং অপরিচিত পুরুষদের সম্মুখে ঐ লজ্জাবলুণ্ঠিত নিঃশব্দ নারীর উদ্দেশে অবশিষ্ট ফুট-কড়াইয়ের রসিকতা যেন এখন তাঁহার নিজেরই কান মলিয়া দিল। মনে হইল, ছি ছি, করিয়াছি কি!

পাপ আনার ছল করিয়া রাখাল তাঁহাদের একলা রাখিয়া গেছে। কিন্তু সময় কাটিতেছে নীরবে। হয়ত তাহারা ফিরিল বলিয়া। এমন সময়ে কথা কহিলেন, নতুন-বৌ প্রথমে। মুখ তুলিয়া বলিলেন, মেজকর্ত্তা আমাকে তুমি মার্জ্জনা কর।

ব্রজবাবু বলিলেন, মার্জ্জনা করা সম্ভব বলে তুমি মনে করো?

করি কেবল তুমি বলেই। সংসারে আর কেউ হয়ত পারেনা, কিন্তু তুমি পারো। তাঁহার চোখ দিয়া এতক্ষণে জল গড়াইয়া পড়িল।

ব্রজবাবু ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিলেন, নতুন-বৌ, মার্জ্জনা করতে তুমি পারতে?

নতুন-বৌ আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, আমরা তো পারিই মেজকর্ত্তা। পৃথিবীতে এমন কোন মেয়ে আছে যাকে স্বামীর এ অপরাধ ক্ষমা করতে হয়না? কিন্তু আমি সে তুলনা দিইনে, আমার ভাগ্যে এমন স্বামী পেয়েছিলাম যিনি দেহে-মনে নিষ্পাপ, যিনি সব সন্দেহের ওপরে। আমি কি ক'রে তোমাকে এর জবাব দেবো?

কিন্তু আমার মার্জ্জনা নিয়ে তুমি করবে কি?

যতদিন বাঁচবো মাথায় তুলে রাখ্‌বো। আমাকে কি তুমি ভুলে গেছো মেজকর্ত্তা?

তোমার মনে কি হয় বলো ত নতুন-বৌ?

এ প্রশ্নের জবাব আসিলনা। শুধু স্তব্ধ নত-মুখে উভয়েই বসিয়া রহিলেন। খানিক পরে ব্রজবাবু বলিলেন, মার্জ্জনা চেয়োনা নতুন-বৌ, সে আমি পারবোনা। যতদিন বাঁচবো তোমার ওপরে এ অভিমান আমার যাবেনা। তবু, পাছে স্বামীর অভিশাপে তোমার কষ্ট বাড়ে এই ভয়ে কোনদিন তোমাকে অভিশাপ দিইনি। কিন্তু এমন অদ্ভুত কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারো নতুন-বৌ?

নতুন-বৌ মুখ না তুলিয়াই বলিল, পারি।

ব্রজবাবু বলিলেন,—তা'হলে আর আমি দুঃখ কোরব না। সেদিন আমাকে সবাই বল্‌লে অন্ধ, বল্‌লে নির্বোধ, বল্‌লে দেখিয়ে দিলেও যে দেখ্‌তে পায়না, প্রমাণ করে দিলেও যে বিশ্বাস করেনা তার দুর্দ্দশা এমন হবেনা তো হবে কার! কিন্তু দুর্দ্দশা হয়েছে বলেই কি নিজেকে অন্ধ বলে মেনে নিতে হবে নতুন-বৌ? বল্‌তে হবে যা' করেছি আমি সব ভুল? জানি, তাই আমাকে ঠকিয়েছে, আমাকে ঠকিয়েছে বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী কর্ম্মচারী,—ঠকিয়েছে অনেকেই। কিন্তু, যখন সব যেতে বসেছিল সেই দুর্দ্দিনে তোমাকে বিবাহ ক'রে আমিই তো ঘরে আনি। তুমি এসে একে একে সমস্ত রক্ষা করলে, সব লোকসান পূর্ণ হয়ে এলো,—সেই-তোমাকে অবিশ্বাস কর্‌তে পারিনি বলে আমি হোলাম অন্ধ, আর যারা চক্রান্ত কোরে, বাইরের লোক জড়ো করে তোমাকে নীচে টেনে নামিয়ে বাড়ীর বার করে দিলে তারাই চক্ষুষ্মান? তাদের নালিশ, তাদের নোঙরা কথায় কান দিইনি বলেই আজ আমার এই দুর্গতি? আমার দুঃখের এই কি হলো সত্যি ইতিহাস? তুমিই বলো ত নতুন-বৌ?

নতুন-বৌ কখন্ যে মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখের প্রতি দুই চোখ মেলিয়া চাহিয়াছিল বোধহয় তাহা নিজেই

জানিতনা, এখন হঠাৎ তাঁহার কথা থামিতেই সে যেন চমকিয়া আবার মুখ নীচু করিল।

ব্রজবাবু বলিলেন, তুমি ছিলে শুধুই কি স্ত্রী? ছিলে গৃহের লক্ষ্মী, সমস্ত পরিবারের কর্ত্রী, আমার সকল আত্মীয়ের বড় আত্মীয়, সকল বন্ধুর বড় বন্ধু,—তোমার চেয়ে শ্রদ্ধা-ভক্তি আমাকে কে কবে করেছে? এমন কোরে মঙ্গল কে কবে চেয়েছে? কিন্তু একটা কথা আমি প্রায় ভাবি নতুন-বৌ, কিছুতে জবাব পাইনে। আজ দৈবাৎ যদি কাছে পেয়েছি বলো ত সেদিন কি হয়েছিল? এত আপনার হয়েও কি আমাকে সত্যিই ভালোবাস্‌তে পারোনি? না বুঝে তুমি তো কখনো কিছু করোনা,—দেবে এর সত্যি জবাব? যদি যাও, হয়ত আজও মনের মধ্যে আবার শান্তি পেতে পারি। বলবে?

নতুন-বৌ মুখ তুলিয়া চাহিলনা, কিন্তু মৃদুকণ্ঠে কহিল, আজ নয় মেজকর্ত্তা।

আজ নয়? তবে, কবে দেবে বলো? আর যদি দেখা না হয়, চিঠি লিখে জানাবে?

এবার নতুন-বৌ চোখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, না, মেজকর্ত্তা, আমি তোমাকে চিঠিও লিখ্‌বনা, মুখেও বোলবনা।

তবে, জান্‌বো কি করে?

জান্‌বে যেদিন আমি নিজে জান্‌তে পারবো।

কিন্তু, এ যে হেঁয়ালি হোলো।

তা' হোক্। আজ আশীর্ব্বাদ করো এর মানে যেন একদিন তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারি।

দ্বারের বাহিরে হইতে সাড়া আসিল, আমার বড্ডো দেরি হয়ে গেল। এই বলিয়া রাখাল প্রবেশ করিল, একডিবা পাণ সম্মুখে রাখিয়া দিয়া বলিল, সাবধানে তৈরি করিয়ে এনেছি মা, এতে অশুচি স্পর্শদোষ ঘটেনি। নিঃসঙ্কোচে মুখে দিতে পারেন।

নতুন-বৌ ইঙ্গিতে স্বামীকে দেখাইয়া দিতে রাখাল ঘাড় নাড়িল। ব্রজবাবু বলিলেন, আমি তেরো বছর পাণ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, নতুন-বৌ, এখন তুমি হাতে ক'রে দিলেও মুখে দিতে পারবোনা।

সুতরাং, পাণের ডিবা তেম্‌নিই পড়িয়া রহিল, কেহ মুখে দিতে পারিলেননা।

তারক আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার বাসায় যাইবার কথা, অথচ যায় নাই, কাছেই কোথাও অপেক্ষা করিতেছিল। যে-কারণেই হোক সে দীর্ঘক্ষণ অনুপস্থিত থাকিতে চাহেনা। তাহার এই অবাঞ্ছিত কৌতূহল রাখালের চোখে বিসদৃশ ঠেকিল, কিন্তু সে চুপ করিয়াই রহিল।

ব্রজবাবু বলিলেন, নতুন-বৌ, তোমার সেই মোটা বিছে-হারটা কি ভট্টাচার্য্যি মশায়ের ছোট মেয়েকে বিয়ের সময়ে দেবে বলেছিলে? বিয়ে অনেকদিন হয়ে গেছে, দুটি ছেলে-মেয়েও হয়েছে, এতকাল সঙ্কোচে বোধ করি চাইতে পারেনি, কিন্তু এবার পূজোর সময়ে এসে সে হারটা চেয়েছিল,—দেবো?

নতুন-বৌ বলিলেন, হাঁ, ওটা তাকে দিয়ো।

ব্রজবাবু কহিলেন, আর একটা কথা। তোমার যে-টাকাটা কারবারে লাগানো ছিল সুদে-আসলে সেটা হাজার পঞ্চাশ হয়েছে। কি করবে সেটা? তুলে তোমাকে পাঠিয়ে দেবো?

তুল্‌বে কেন, আরও বাড়ুক্‌না।

না নতুন-বৌ সাহস হয়না। বরিশালের চালানি সুপারির কাজে অনেক টাকা লোকসান গেছে,—থাক্‌লেই হয়ত টান্ ধরবে।

নতুন-বৌ একটু ভাবিয়া বলিলেন, এ ভয় আমার বরাবর ছিল। গোকুল সাহাকে সরিয়ে দিয়ে তুমি বীরেনকে পাঠাও। আমার টাকা মারা যাবেনা।

ব্রজবাবুর চোখ দুটা হঠাৎ সজল হইয়া উঠিল। সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, নিজেও তো বুড়ো হোলাম গো, আরও খাটবো কত কাল? ভাব্‌চি সব তুলে দিয়ে এবার—

ঠাকুরঘর থেকে বার হবেনা,—এই তো? না, সে হবেনা।

ব্রজবাবু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত একটি কথাও কহিলেন না। মনে মনে কি যে ভাবিতে লাগিলেন বোধ হয় একটিমাত্র লোকই তাহার আভাস পাইল।

হঠাৎ একসময়ে বলিয়া উঠিলেন, দেখো নতুন-বৌ, সোনাপুরের কতটা অংশ দাদার ছেলেদের ছেড়ে দেওয়া তুমি উচিত মনে করো?

নতুন-বৌ বলিলেন, তাদের তো আর কিছুই নেই। সবটাই ছেড়ে দাওনা।

সবটা ?

ক্ষতি কি ?

বেশ, তাই হবে। তোমার মনে আছে বোধ হয় দাদার বড় মেয়ে জয়দুর্গাকে কিছু দেবার কথা হয়েছিল। জয়দুর্গা বেঁচে নেই, কিন্তু তার একটি মেয়ে আছে, অবস্থা ভালো নয়, এরা ভাগ্নীকে কিছুই দিতে চায় না। তুমি কি বলো ?

নতুন-বৌ বলিলেন, সোনাপুরের আর বোধ হয় হাজার টাকার ওপর। জয়দুর্গার মেয়েকে একশো টাকার মতো ব্যবস্থা করে দিলে অন্যায় হবেনা।

ভালো, তাই হবে।

আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল।

হাঁ, নতুন-বৌ, তোমার গয়নাগুলো কি সব সিন্দুকেই পচ্‌বে ? কেবল তৈরিই করালে, কখনো পরলেনা। দেবো সেগুলো তোমাকে পাঠিয়ে ?

নতুন-বৌ হঠাৎ বোধ হয় প্রস্তাবটা বুঝিতে পারেন নাই, তারপরে মাথা হেঁট করিলেন। একটু পরেই দেখা গেল টেবিলের উপরে টপ্‌ টপ্‌ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

ব্রজবাবু শশ-ব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, থাক্ থাক্, নতুন-বৌ তোমার রেণু পরবে। ও-কথায় আর কাজ নেই।

মিনিট পাঁচ ছয় পরে তিনি ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিলেন, সন্ধ্যা হয়ে আসচে, এবার তাহলে আমি উঠি।

তাঁহার সন্ধ্যা-আহ্নিক, গোবিন্দর সেবা—এই সকল নিত্যকর্ত্তব্যের কোন কারণেই সময় লঙ্ঘন করা চলেনা তাহা রাখাল জানিত। সেও ব্যস্ত হইয়া পড়িল। প্রৌঢ়কালে ব্রজবাবুর ইহাই যে প্রত্যহের প্রধান কাজ নতুন-বৌ তাহা জানিত না। আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, রেণুর বিয়ের কথাটা তো শেষ হলোনা মেজকর্ত্তা।

ব্রজবাবু বলিলেন, তুমি যখন চাওনা তখন ও-বাড়ীতে হবেনা।

নতুন-বৌ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বাঁচলাম।

ব্রজবাবু বলিলেন, কিন্তু বিয়ে তো বন্ধ রাখা চল্‌বেনা। সুপাত্র পাওয়া চাই, দুটো খেতে-পরতে পায় তাও দেখা চাই। রাজু, তোমার তো বাবা অনেক বড় ঘরে যাওয়া-আসা আছে, তুমি একটি স্থির করে দিতে পারোনা ? এমন মেয়ে তো কেউ সহজে পাবেনা।

রাখাল অধোমুখে মৌন হইয়া রহিল।

নতুন-বৌ বলিলেন, এত তাড়াতাড়ির দরকার কি মেজকর্ত্তা।

ব্রজবাবু মাথা নাড়িলেন,—সে হয়না নতুন-বৌ। নির্দ্দিষ্ট দিনে দিতেই হবে,—দেশাচার অমান্য করতে পারবোনা। তা'ছাড়া আরও অমঙ্গলের সম্ভাবনা।

কিন্তু এর মধ্যে সুপাত্র যদি না পাওয়া যায় ?

পেতেই হবে।

কিন্তু না পাওয়া গেলে ? পাগলের বদলে বাঁদরের হাতে মেয়ে দেবে ?

সে মেয়ের কপাল।

তার চেয়ে হাত-পা বেঁধে ওকে জলে ফেলে দিয়ো। তাই তো দিচ্ছিলে।

আলোচনা পাছে বাদানুবাদে দাঁড়ায় এই ভয়ে রাখাল মাঝখানে কথা কহিল, বলিল, মামাবাবু কি রাগারাগি করবেন মনে হয় কাকাবাবু ?

ব্রজবাবু ম্লান হাসিয়া বলিলেন, মনে হয় বই কি। হেমন্তর স্বভাব তুমি জানোই ত রাজু। সহজে ছাড়বেনা।

রাখাল খুব জানিত,—তাই চুপ করিয়া রহিল।

নতুন-বৌ হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, তোমার মেয়ে, যেখানে ইচ্ছে বিয়ে দেবে, ইচ্ছে না হলে দেবেনা, তাতে হেমন্তবাবু বাধা দেবেন কেন ? দিলেই বা তুমি শুনবে কেন ?

প্রত্যুত্তরে ব্রজবাবু না বলিলেন বটে কিন্তু গলায় জোর নাই তাহা সকলেই অনুভব করিল। নতুন-বৌ বলিতে লাগিলেন, তোমার ছেলে নেই, শুধু দুটি মেয়ে। এরা যা পাবে তাতে খুঁজলে কলকাতা সহরে সুপাত্রের অভাব হবেনা, কিন্তু সে ক'টা দিন তোমাকে স্থির হয়ে থাকতেই হবে। আশীর্ব্বাদ, গায়ে-হলুদের ওজর তুলে ভূত-প্রেত, পাগল-ছাগলের হাতে মেয়ে সম্প্রদান করা চল্‌বেনা। এর মধ্যে হেমন্তবাবু বলে কেউ নেই। বুঝলে মেজকর্ত্তা ?

ব্রজবাবু বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ।

রাখাল কথা কহিল। বলিল, এ হোলো সহজ যুক্তি ও

ভাল-অন্যায়ের কথা মা, কিন্তু হেমন্তবাবুকে তো আপনি জানেন না। রেণু অনেক-কিছু পাবে বলেই তার অদৃষ্টে আজ মামাবাবুর পাগল আত্মীয় জুটেছে, নইলে ছুটতোনা —ও নিশ্বাস ফেলবার সময় পেতো। মামাবাবু এক কথার হাল ছাড়বার লোক নয় মা।

কি করবেন তিনি শুনি?

রাখাল জবাব দিতে গিয়া হঠাৎ চাপিয়া গেল। ব্রজবাবু দেখিয়া বলিলেন, লজ্জা নেই রাজু, বলো। আমি অনুমতি দিচ্চি।

তথাপি রাখালের সঙ্কোচ কাটেনা, ইতস্তত: করিয়া শেষে কহিল, ও লোকটা গায়ে হাত দিতে পর্য্যন্ত পারে।

কার গায়ে হাত দিতে পারে রাজু? মেজকর্ত্তার?

হাঁ, একবার ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, পোনর-ষোল দিন কাকাবাবু উঠ্‌তে পারেন নি।

নতুন-মার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, —তারপরেও ও বাড়ীতে আছে? খাচ্চে পরচে?

রাখাল বলিল, শুধু নিজে নয়, মাকে পর্য্যন্ত এনেছেন। কাকাবাবুর শাশুড়ী। পরিবার নেই, মারা গেছেন, নইলে তিনিও বোধ করি এতদিনে এসে হাজির হতেন। শেকড় গেড়ে ওরা বসেছে মা, নড়ায় সাধ্য কার? আমাকে এক-দিন নিজে আশ্রয় দিয়ে এনেছিলেন বলে কেউ টলাতে পারেনি, কিন্তু মামাবাবুর একটা ভ্রূকুটির ভার সইলোনা, ছুটে পালাতে হলো। সত্যি কথা বলি মা, রেণুর বিয়ে নিয়ে কাকাবাবুর সম্বন্ধে আমার মস্ত ভয় আছে।

নতুন-বৌ বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। নিরুপায় নিষ্ফল আক্রোশে তাঁহার চোখ দিয়া যেন আগুনের স্রোত বহিতে লাগিল।

রাখাল ইঙ্গিতে ব্রজবাবুকে দেখাইয়া বলিল, এখন হেমন্তবাবু বাড়ীর কর্ত্তা, তাঁর মা হলেন গিন্নী। এই দাবানলের মধ্যে এই শান্ত, নিরীহ মানুষটিকে একলা ঠেলে দিয়ে আমার কিছুতে ভয় ঘোচেনা। অথচ, পাগলের হাত থেকে রেণুকে বাঁচাতেই হবে। আজ আপনার মেয়ে, আপনার স্বামী বিপদে কূল-কিনারা পাবনা মা, এ ভাব্‌লেও আমার মাথা খুঁড়ে' মরতে ইচ্ছে করে।

নতুন-মা জবাব দিলেননা, শুধু সম্মুখের টেবিলের পরে হাতে ধীরে মাথা রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তারক উত্তেজনায় ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিল। সংসারে এতবড় নালিশ যে আছে ইহার পূর্ব্বে সে কল্পনাও করে নাই। আর ঐ নির্ব্বাক, নিস্পন্দ, পাষাণ মূর্ত্তি,—কি কথা সে ভাবিতেছে!

মিনিট দুই-তিন কাটিল, কে জানে আরও কতক্ষণ কাটিত,—বাহির হইতে রুদ্ধদ্বারে ঘা পড়িল। বুড়ি-ঝি মনে করিয়া রাখাল কবাট খুলিতেই একজন ব্যস্ত-ব্যাকুল বাঙালী চাকর ঘরে ঢুকিয়া পড়িল,—মা?

নতুন-মা মুখ তুলিয়া চাহিলেন,—তুই সে?

সে অত্যন্ত উত্তেজিত, কহিল, ড্রাইভার নিয়ে এলো মা। শীগ্‌গীর চলুন, বাবু ভয়ানক রাগ করচেন।

কথাটা সামান্যই, কিন্তু কদর্য্যতার সীমা রহিলনা। ব্রজবাবু লজ্জায় আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

চাকরটার বিলম্ব সহেনা, তাগাদা দিয়া পুনশ্চ কহিল,— উঠে পড়ুন মা, শীগ্‌গীর চলুন। গাড়ী এনেচি।

কেন?

লোকটা ইতস্তত: করিতে লাগিল। স্পষ্টই বুঝা গেল বলিতে তাহার নিষেধ আছে।

বাবু কেন ডাক্‌চেন?

চলুননা মা, পথেই বোল্‌ব।

আর তর্ক না করিয়া নতুন-মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, চোল্‌লাম মেজকর্ত্তা।

চল্‌লে?

হাঁ। এ কি তুমি ডেকে পাঠিয়েচো যে জোর করে, রাগ করে বোল্‌ব, এখন যাবার সময় নেই তুই যা? আমাকে যেতেই হবে। যাকে কখনো কিছু বলোনি, তোমার সেই নতুন-বৌকে আজ একবার মনে করে দেখো ত মেজকর্ত্তা, দেখো ত তাকে আজ চেনা যায় কিনা।

ব্রজবাবু মুখ তুলিয়া নির্নিমেষে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

নতুন বৌ বলিলেন, মার্জ্জনা ভিক্ষে চেয়েছিলাম, কিন্তু স্বীকার করোনি,—উপেক্ষা করে বল্‌লে এ নিয়ে তোমার হবে কি! কখনো তোমার কাছে কিছু চাইনি, চাইতে তোমার কাছে আমার লজ্জা করে,—অভিমান হয়। কিন্তু আর যে-যাই বলুক মেজকর্ত্তা, অমন কথা তুমি কখনো আমাকে বোলোনা। বল্‌বেনা বলো?

ব্রজবাবুর বুকের মধ্যে যেন ভূমিকম্প হইয়া গেল। বহুদিন পূর্ব্বের একটা ঘটনা মনে পড়িল,—তখন রেণুর জন্মের পরে নতুন-বৌ পীড়িত। কি-একটা জরুরি কাজে তাঁহার ঢাকা যাইবার প্রয়োজন, সেদিনও এই নতুন-বৌ কণ্ঠস্বরে এমনি আকুলতা ঢালিয়াই মিনতি জানাইয়াছিল,—ঘুমিয়ে পড়লে ফেলে রেখে আমাকে পালাবেনা বলো? সেদিন বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াই তাঁহাকে ঢাকা যাওয়া বন্ধ করিতে হইয়াছিল। সেদিনও স্ত্রৈণ বলিয়া তাঁহাকে গঞ্জনা দিতে লোকে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু আজ?

চাকরটা বুঝিলনা কিছুই, কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া হঠাৎ কেমন ভয় পাইয়া বলিয়া ফেলিল, মা, তোমার নীচের ভাড়াটে একজন আফিং খেয়ে মর-মর হয়েছে,—তাই এসেচি ডাকতে।

নতুন-বৌ সভয়ে প্রশ্ন করিল, কে আফিং খেলে রে?

জীবনবাবুর স্ত্রী।

জীবনবাবু কোথায়?

চাকরটা বলিল, তাঁর সাত-আটদিন খোঁজ নেই। শুনেচি, আফিসের চাকরি গেছে বলে পালিয়েছে।

কিন্তু তোর বাবু করছেন কি? হাঁসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে?

চাকরটা বলিল, কিছুই হয়নি মা, পুলিশের ভয়ে বাবু দোকানে চলে গেছেন।

তোমার বাড়ী, তোমার ভাড়াটে, তুমিই তার উপায় করো মা। বউটা হয় ত বাঁচবেনা।

রাখাল উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, দরকার হতে পারে মা, আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি?

নতুন-মা বলিলেন, কেন পারবেনা বাবা, এসো।

যাবার পূর্ব্বে এবার তিনি হাত দিয়া স্বামীর পা দুটি স্পর্শ করিয়া মাথায় ঠেকাইলেন।

সকলে বাহির হইলে রাখাল ঘরে তালা দিয়া নতুন-মার অনুসরণ করিল। (ক্রমশঃ)

ওপারে

আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল

সারথি, রথের গতি সংযত করগো ক্ষণতরে;
পিছু পথে, নীচু পথে ফিরে দেখি, যেথা স্তরে স্তরে
পর্ব্বত-প্রান্তর-সিন্ধু সঙ্কুচিত আকাশের তটে,
আলোকের তুলিকায় অঙ্কিত রয়েছে চিত্রপটে।

অই সেই জন্মভূমি, জীবনের স্পন্দনেতে কাঁপে;
ব্যথা তার, গাথা তার ফুটে ওঠে কিরণের তাপে।
শঙ্কিত আকাঙ্ক্ষা লোটে বাতাসের প্রবাহে ধূলায়;
সমীরে সুরভি তার আপনারে মাতারে ভুলায়।

প্রীতির নির্ঝর তার উছলিয়া ঝরে নিজপথে;
প্রতিবিম্বে আপনার ছায়া নাচে আপনার বুকে।
কল্লোলে কাঁদিয়া বলে—কত দূরে আমার প্রসার!
নিজের ক্ষুদ্রতা মাঝে রচিছে সে অসীম অপার।

চিরকান্ত অদূরন্ত মহিমায় যে প্রতিমা ঘেরা—
জানি, জানি, অসম্ভব আর বার তার মাঝে ফেরা।
রূপ-রস-গন্ধ তার একবার আহরিয়া যাই,—
লুপ্ত পুলকের স্বপ্নে একবার শিহরিয়া চাই।

সারথি, চালাও রথ, দেখি পথ নবতা-নন্দিত।
অই কিগো লুপ্ত প্রীতি প্রতিবিম্বে রয়েছে রঞ্জিত!
জগতের ক্ষুদ্রধারা অই যেন গ্রথিত ভূমায়;
জাগিছে চেতনা নব লুপ্তপ্রায় ভাবের ধূঁয়ায়।
চূর্ণ চক্রবাল-রেখা, কোথা একা চলেছি জানাও!
সারথি, রথের গতি আর বার থামাও, থামাও।

পঞ্জাব-সীমান্তে কয়দিন

ডাক্তার শ্রীবর্ত্তিদাস মুখোপাধ্যায় এম-বি (হোমিও)

গত পূজার পর মধ্যভারত ও বোম্বাই—নাসিক ভ্রমণ করিয়া বাটী ফিরিবার দিন হইতে বে ম্যালেরিয়া সাড়ম্বরে আক্রমণ করিল, দীর্ঘ চারিমাসের বিবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার কবল হইতে অব্যাহতির আশা সুদূর রহিল। তখন 'যঃ পলায়তি সঃ জীবতি' এই নীতি অবলম্বন করিয়া ম্যালেরিয়ার 'এলাকা' অতিক্রম করিয়া স্থানান্তরে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত কি না ইত্যাদি যখন বিবেচনা করিতেছি, তখন সুদূর পঞ্জাব-সীমান্ত হইতে মদীয় কুটুম্বপ্রবর শ্রীযুক্ত সরোজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জরুরী তলব তাঁহার ভ্রাতা পঙ্কজনাথের মারফতে পাইলাম। একেবারে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা (body warrant)—অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশ শান্তিপুরের আদি অধিবাসী হইলেও তিন পুরুষ যাবৎ কর্ম্মোপলক্ষে ('রুজী রোজগারকা ওয়াস্তে' ইতি ভাষ্য) পঞ্জাব প্রদেশেই আছেন। সরোজ বাবুর পিতামহ স্বর্গীয় বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে Assistant Engineer হইয়া N. W. Railwayতে কর্ম্ম-জীবন আরম্ভ করেন ও নিজ কর্ম্মকুশলতায় 'রায় সাহেব' উপাধি পান এবং সরগোড়া জেলায় সরকার-প্রদত্ত ২৫০ একর নিষ্কর জমি 'ইলাম' প্রাপ্ত করেন। অনেক প্রবাসী বাঙ্গালী স্বদেশের সহিত যাবতীয় বন্ধন-সূত্র ছিন্ন করিয়া নিজেদের 'ছাতু' বানাইয়া গৌরবান্বিত বোধ করেন; ইঁহারা সেরূপ নহেন। ইঁহাদের পৈতৃক ভিটা ও বসতবাটী অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ভবানীপুরেও 'ইঁট গাড়িয়া' দেশের সহিত সম্বন্ধ দৃঢ়তর করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি কুলগত সংস্কারগুলি দেশে আসিয়া সম্পন্ন করেন এবং কর্ম্ম-জীবনের মধ্যে অবকাশ পাইলেই দেশস্থিত আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আসিয়া নিজেরা তৃপ্তিলাভ করেন। N. W. Railway ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে লিপ্ত থাকায় পঞ্জাব, সিন্ধু-প্রদেশের, এমন কি বেলুচিস্থানের বিভিন্ন স্থানেও ইঁহাদিগকে ঘুরিতে হয়। বর্ত্তমানে সরোজবাবু পঞ্জাব সীমান্তে 'খুসাব' নামক স্থানে কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতেছেন।

তাঁহার তলব গ্রহণ করিলাম এবং সনাতন প্রথানুসারে শুভদিনের নির্ঘণ্ট দেখিয়া ১১ই মার্চ্চ তারিখে সপরিবারে হাওড়া হইতে E. I. R. কোম্পানীর ট্রেণের রাজা 'তুফান মেলে' রওনা হইলাম। সরোজবাবুর অপরা ভগিনীও সপুত্রকন্যা আমাদের সহিত হাওড়া ষ্টেশনে মিলিতা হইলেন। ১২ তারিখ বৈকালে আমরা দিল্লী পৌঁছিলাম। দিল্লী হইতে রাত্রির ট্রেণে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতে লাহোর আসিলাম। লাহোরে একদিন বিশ্রাম করিয়া মধ্যাহ্নের ট্রেণে রওনা হইয়া সন্ধ্যা নাগাদ লালামুসায় গাড়ী বদল করিলাম। লালামুসা হইতে মুলতানগামী ট্রেণে উঠিয়া আমরা রাত্রি ১১টার সময় খুসাব ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। লাহোর হইতে লালামুসার মধ্যে ওয়রাণওয়ালা, ওয়াজিরাবাদ, গুজরাট প্রভৃতি স্থানগুলি পড়িয়াছিল। লালামুসা ছাড়িয়া খুসাব আসিতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চিলিনওয়ালার যুদ্ধক্ষেত্র পড়িয়াছিল। এই যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই পঞ্জাবের গৌরব-রবির শেষ রেখা অস্তমিত হয়। কুটুম্বপ্রবর সস্ত্রীক ষ্টেশনে আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া বাধিত করিলেন। ষ্টেশনের নিকটেই ব্যানার্জ্জী সাহেবের বিস্তৃত বাংলো। বাংলোর 'হাতার' মধ্যে সব্জি ও ফুলের বাগান।

রাওলপিণ্ডি ডিভিসনের মধ্যে শাপুর জেলার অন্তর্গত খুসাব একটী ছোট মহকুমা সহর। এ অঞ্চলের চতুর্দ্দিকেই মরুভূমি। দিবা দ্বিপ্রহরে সূর্য্যকিরণ-ঝলকিত বালুরাশির দিকে চাহিলে চক্ষুপীড়া অবশ্যম্ভাবী। তবে স্থানে স্থানে নয়নরঞ্জন মরীচিকার আভাষ পাওয়া যায়। দেখিলে মনে হয়, যেন কোন জলস্রোত মরুবক্ষ শীতল করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা ভ্রমাত্মক। সহরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ সীমায় ঝিলাম নদী; উত্তর-পশ্চিম সীমায় Salt Range; অবশিষ্টাংশ মরুভূমি। এই Salt rangeটী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সিন্ধুনদের অপর পারস্থিত সুলেমান পর্ব্বত হইতে শাখারূপে বাহির হইয়া Sind Sagar Doab

নামক সিন্ধু ও ঝিলাম নদীর মধ্যস্থিত ভূভাগের উপর অবস্থিত। এই পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে তিনটী লবণের খনি পাশাপাশি ভাবে থাকায় ইহাকে Salt Range নাম দেওয়া হইয়াছে; ১নং কালাবাগ, ২নং ওয়রেছা, ৩নং খেওড়া খনি। শেষোক্ত খনিটীই বৃহৎ। এই খনিগুলি হইতে Rock Salt (সৈন্ধব লবণ) সমগ্র ভারতে সরবরাহ হইতেছে। খেওড়া খনিটী আমরা দেখিয়াছি ও তৎসম্বন্ধে পরে বলিতেছি। খুসাবের লোকসংখ্যা দশহাজার। তাহার মধ্যে হিন্দু মাত্র দুই হাজার, অবশিষ্ট মুসলমান। এ অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর মধ্যে মনোমালিন্য এখনও প্রকট নহে। অধিবাসীদিগকে দেখিলে মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়। দৈহিক বল-বিক্রমের অনুপাতে মানসিক গুণেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সরল ব্যবহারের উত্তর ইহারা সরলভাবেই দেয় এবং বাঙ্গালীকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখে। হিন্দুর সংখ্যা কম হইলেও, অর্থে, বিদ্যাবত্তায় ও প্রতিপত্তিতে হিন্দুই অগ্রগামী। পোষাক-পরিচ্ছদ ও সাধারণ আচার-ব্যবহারে হিন্দু-মুসলমানে পার্থক্য বোঝা নবাগতের পক্ষে শক্ত। এ অঞ্চলের নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদিগকেই আমরা কলিকাতার তথা সমগ্র বাঙ্গলার 'পেশোয়ারী' বলিয়া থাকি। স্থানীয় মহকুমা আদালতটী একটী দুর্গ-বিশেষ। ইহা ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত। চারিদিকে দুর্গ-প্রাকারের অনুকরণে সুদৃঢ় ও সুউচ্চ প্রাচীর। প্রবেশপথ সশস্ত্র প্রহরী দ্বারা বিশেষ ভাবে সুরক্ষিত। সহরের প্রধান পথটী বাজারের মধ্যে দিয়া ঝিলাম নদীর তীর পর্য্যন্ত গিয়াছে। বাজার অতি ক্ষুদ্র। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলিরও কিছু কিছু পাওয়া দুষ্কর। তবে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য সহর অপেক্ষা অনেক সস্তা। এখানকার জলবায়ু খুব স্বাস্থ্যকর। ঝিলাম নদীর সান্নিধ্যবশতঃ মরুভূমি-মধ্যে অবস্থিত হইলেও এখানে জল-কষ্ট নাই। পানীয় জলের আস্বাদ ঈষৎ লবণাক্ত। ভূমিজ দ্রব্যের মধ্যে কনক (গম) প্রধান। নদীতীরস্থিত নিম্ন-ভূমিতেই কৃষিকার্য্য সম্ভব হইয়াছে; অবশিষ্ট অনুর্ব্বর উচ্চভূমি। এই মরুভূমির মধ্যে বাবলা ও বাউলাতীয় এক-রকমের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়; অনেক স্থানে আবার তাহাও বিরল। এই মরুভূমির মধ্য দিয়া একটী প্রশস্ত পথ লাহোর হইতে 'নির্ম্মাওয়ালী' ছাউনী হইয়া বান্নু, কোহাট প্রভৃতি সীমান্ত অঞ্চলে গিয়াছে। এই পথে উষ্ট্রপৃষ্ঠে সীমান্তবাসী পাঠানের দল শীতাবসানে দেশে ফিরিতেছে। ইহাদের সঙ্গে অশ্বতর, দুম্বা, ছাগল, মুরগী প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষী ও যাবতীয় গৃহস্থালীর সরঞ্জামের অসদ্ভাব নাই। ইহাদের সঙ্গে ভীষণকায় দীর্ঘলোমাবৃত কতকগুলি কুকুর থাকে; তাহারা প্রহরীর কার্য্য করে। এই কুকুরগুলিকে 'খদ্দি' কুকুর বলে এবং এই কুকুরের উপর নির্ভর করিয়া ইহারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের শ্বাপদ-সঙ্কুল পার্ব্বত্য-পথে যাতায়াত করে ও স্বচ্ছন্দে রাত্রিতে আকাশতলে নিদ্রা যায়। অনেক চেষ্টা করিয়া মিঃ ব্যানার্জ্জীর একজোড়া চৌকীদারের সাহায্যে এই জাতীয় একটী কুকুরের বাচ্চা গজনীবাসী এক পাঠান সর্দ্দারের নিকট হইতে মুদ্রা-বিনিময়ে আদায় করিয়াছি। বাচ্চাটী মাত্র চারি মাসের। বাঙ্গলার জলহাওয়ায় 'গজনী-বীর' কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা বলা যায় না।

স্থানীয় সরকারী হাইস্কুলের পারিতোষিক-বিতরণ উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া সভায় উপস্থিত ছিলাম। মহকুমার 'মা বাপ' (S. D. O.) Mr. Tollinghon I. C. S. উক্ত সভার সভাপতি ছিলেন। সেই মামুলী আবৃত্তি, গীত, অভিনয়াংশ, এবং 'হাল ফ্যাসানের' scout display ছাড়া নূতনত্ব কিছু দেখিলাম না। তবে হেডমাষ্টার Mr. Kolhi সুযোগ্য ব্যক্তি। তাঁহার report হইতে বুঝা গেল, স্কুলটী স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে এবং ছাত্রদিগের চরম পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতাও বিশেষ প্রশংসনীয়। মিঃ ব্যানার্জ্জীর সহিত অনত্রাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। সকল স্থানেই যথেষ্ট সৌজন্যের পরিচয় পাইয়াছি ও বিদেশীকে বিশেষ করিয়া সম্মান দেখাইবার আগ্রহ সর্ব্বত্র লক্ষ্য করিয়াছি। আদব-কায়দায় এ অঞ্চলের অধিবাসীরা আমাদের পরাস্ত করিয়াছে, ইহা অবিসংবাদী সত্য।

খুসাবে মাসখানেক থাকিবার পর নষ্ট-স্বাস্থ্য অনেকটা ফিরিয়া পাইলাম। 'মোটে রুটী, ডুম্বকা গোস্ত' সহজেই হজম হইতে লাগিল। তখন নিকটবর্ত্তী দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিবার আগ্রহ হইল।

একদিন প্রত্যূষে ৪৪০ টার ট্রেণে আমাদের নাতি-বৃহৎ দলটী খেওড়া লবণ খনি ও পার্ব্বত্য তীর্থ 'কটাস-রাজ' দেখিতে রওনা হইল। খুসাব হইতে লালামুসার

দিকে আসিতে 'পিওয়াদন গাঁ' নামক ষ্টেশনে আমরা বেলা ৭॥০ টায় নামিলাম। ষ্টেশনের Rest Roomএ চা-যোগ সারিয়া আমরা মোটর-যোগে ৪৷৷ মাইল সমভূমি অতিক্রম করিয়া খেওড়া ষ্টেশনে আসিলাম। এখানে ভারত-সরকারের লবণ বিভাগের অফিস, কর্ম্মচারী-বৃন্দের বাসগৃহ ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের উপযুক্ত একটী বাজার আছে।

মোটর হইতে নামিয়া উঁচু-নীচু আঁকা বাঁকা পাহাড়ে রাস্তায় উঠিতে আরম্ভ করা গেল। প্রায় দেড় মাইল উঠিয়া আমরা খনি-প্রবেশ-পথে আসিলাম। সরকারী অফিস হইতে পূর্ব্বেই পাশ সংগ্রহ করা হইয়াছিল। প্রবেশ-পথে পাশ দেখাইয়া আমরা গৃহ মধ্যে গেলাম। প্রবেশ-মুখেই আমাদের একটী মহিলা দমিয়া গেলেন ও হাঁফাইয়া উঠিবার আশঙ্কায় খনির মধ্যে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। অনেক আশ্বাস দেওয়ার পর সাহস সঞ্চয় করিয়া অবশেষে তিনি আমাদের সঙ্গ লইলেন। পর্ব্বতগাত্র বিদীর্ণ করিয়া বরাবর সুড়ঙ্গ চলিয়াছে। সুড়ঙ্গের মধ্যে অন্ধকার বিদূরিত করিবার জন্য বিজলী-আলোর বন্দোবস্ত আছে। ভিতরে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইল। উপর হইতে লবণ-জল চুয়াইয়া

মরুপথে পাঠানদের সীমান্তে প্রত্যাবর্ত্তন—খুসাব

পড়িতেছে ও সেগুলি জমিয়া শলাকার রূপ ধারণ করিয়াছে। সুড়ঙ্গস্থিত উভয়পার্শ্বের দেওয়ালে ও ছাতে বিজলী-বাতির সাহায্যে লবণের চাঙড়গুলি বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। এই সুড়ঙ্গ ঘুরিয়া-ফিরিয়া প্রায় সাত মাইল চলিয়াছে। অবশেষে আমরা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া একটী বৃহৎ চৌবাচ্চার ধারে আসিলাম। উক্ত চৌবাচ্চার তলদেশ লবণ-জলে পরিপূর্ণ। আমাদের সঙ্গে যে সরকারী পরিদর্শকগুলি আসিয়াছিল, তাহারা রংমশাল জ্বালিয়া ও ২।৩টী কাদুদ ছাড়িয়া ঐ স্থানটী স্পষ্ট দেখিবার সুযোগ করিয়া দিল। উপরের ছাতটী সমস্তই লবণের, আশ-পাশের দেওয়ালগুলিও তদ্রূপ। উজ্জ্বল আলোক-ছটায় বৃহৎ গুহাটী সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্বের

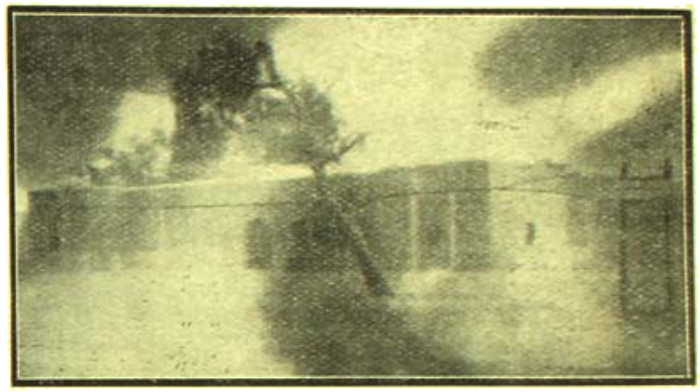

কটিকার আক্রমণে আবাসত গৃহ—খুসাব

সমাবেশে এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃষ্টি করিল। এ স্থানে সুড়ঙ্গ-গাত্রে লবণের চাঙড়ের মধ্যে একটী বৃহৎ কাঠের গুঁড়ি প্রোথিত অবস্থায় দেখা গেল। শুনিলাম, উহা কি কাঠ এবং কিরূপ ভাবে এখানে আসিল তাহা সঠিক নির্ণয় করিবার জন্য উহার কিয়দংশ বিলাতে পাঠান হইয়াছে। এই লবণ-প্রস্তর-রাজ্যে উদ্ভিদ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহা খনিবিদ্‌গণের গবেষণার বিষয়। আরও কিছুদূর যাইয়া আমরা একটী লবণস্তম্ভের (column) নিকট আসিলাম। স্তম্ভটী ২৫ ফিট উচ্চ ও ৭ ফিট গভীর। কিন্তু উহা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ; এক পার্শ্বে বাতি জ্বালিয়া অপর পার্শ্বে আলোকরশ্মি ভেদ করিয়া আসিতেছে দেখা গেল। বিশ্বস্রষ্টা নির্জ্জনে বসিয়া কতই অপরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন ও সেই সৃষ্টিকলা মানব-বুদ্ধি কিরূপে আপন কার্য্যে নিয়োজিত করিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া যথার্থ আনন্দ পাওয়া যায়। কাচ্চা-বাচ্চা ও মহিলাত্রয় সঙ্গে থাকায় এই রত্নপথে অধিকক্ষণ থাকিতে সাহস হইল না। যে পথে যাওয়া হইয়াছিল সেই পথেই ফিরিয়া বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া মনে হইল বুঝি রাত্রির অন্ধকারে এক স্বপ্নরাজ্যে যাওয়া হইয়াছিল।

তাহার পর খেওড়া ষ্টেশনের Waiting Roomএ আসিয়া মধ্যাহ্নভোজন শেষ হইল ও পুনরায় বেলা ২টার সময় মোটরে উঠিলাম। অতঃপর মোটরখানি ধীরে ধীরে পার্ব্বত্যপথে উঠিতে লাগিল। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই আমরা প্রায় ৩০০ ফুট উচ্চে উঠিলাম। পথটীর

পাহাড়ের উপর সহরের দৃশ্য—খেওড়া

এক ধারে সুউচ্চ পর্ব্বত-প্রাচীর, অপরদিকে ঢালু খাদ নামিয়া গিয়াছে। মোটরচালকের মুহূর্ত্তের ভ্রমপ্রমাদে গাড়ীখানির ও যাত্রীদিগের কি অবস্থা হইতে পারে তাহা

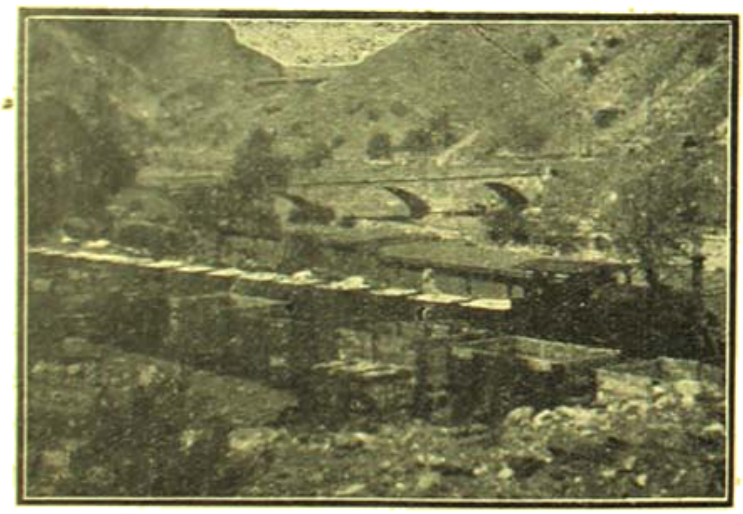

খনি হইতে আনীত লবণ ট্রেণে বোঝাই হইয়াছে—খেওড়া

কল্পনা করিতেও রোমাঞ্চ হয়। ক্রমশঃ আরও উচ্চে, আরও উচ্চে উঠা গেল। এক স্থানে danger post দেওয়া আছে। এখানে চড়াই এতই বেশী যে, যাত্রীদিগকে নামাইয়া খালি গাড়ী চালাইবার আদেশ দেওয়া আছে। আমরা নামিয়া পায়ে হাঁটিয়া উপরে আসিলাম। এই স্থানে একটী যাত্রীপূর্ণ গাড়ী একেবারে ছটকাইয়া প্রায় ৮০০ ফিট নীচে পড়িয়া অস্তিত্ব হারাইয়াছিল; তদবধি সরকার-পক্ষ হইতে এই নিয়ম জারী হইয়াছে। এখান হইতে ঘুরিয়া ফিরিয়া অনেকগুলি 'লুপ' ভাঙ্গিয়া অবশেষে আমরা প্রায় ২৫০০ ফিট উচ্চে উঠিলাম। এখান হইতে পথটী ক্রমশঃ নামিয়া গিয়াছে। ৮ মাইল পার্ব্বত্য-পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে আমরা উপত্যকায় নামিলাম। এখান হইতে চাষবাসের ও গাছপালার দেখা পাইলাম। বেলা ৪৷৷০ টার সময় আমরা উপত্যকাস্থিত 'চুয়া সদন সা' নামক মনোরম পল্লীতে উপস্থিত হইলাম।

'চুয়া সদন সা' নামের তাৎপর্য্য এই যে, এই স্থানে অনেকগুলি 'চুয়া' বা উৎস আছে। সেই উৎসগুলি হইতে যে নির্ম্মল জল বাহির হইতেছে, তাহাই স্থানীয় অধিবাসীদিগের পানীয়। নিঃসৃত জলধারাগুলি মিশিয়া একটী নদীরূপে গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে; তাহার জল গৃহকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। গ্রামবাসীরা অধিকাংশ পার্ব্বত্যজাতির ন্যায় কৃষিকার্য্য ও পশুপালন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। এখানে অনেকগুলি সুন্দর বাগিচা আছে; তাহাতে গোলাপ ফুলের বিস্তৃত চাষ হইয়া থাকে। ঐ ফুলগুলি বাজারে টাকায় /৪ সের হিসাবে বিক্রয় হয়। ঐ ফুল হইতে গোলাপ-নির্য্যাস প্রস্তুত হইতেছে দেখিলাম। ছোট নদীটির উত্তর পার্শ্বে গোলাপ-জলের ছোট ছোট কারখানা। কলিকাতা অঞ্চলে গাজিপুর, জৌনপুর প্রভৃতি সহরের গোলাপ-জলই আনীত হইয়া থাকে। এ স্থানের গোলাপের নির্য্যাস ঐ সকল স্থানের নির্য্যাস অপেক্ষা আদৌ নিকৃষ্ট নহে। এখানকার

উৎপন্ন জল পঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ ও বোম্বাইয়ে চালান হইয়া থাকে।

বৈকালে আমরা বাগিচা দেখিতে বাহির হইলাম। পথে নদীর পুলের নিকটে তিন চারিটী বিপুলকায় ষণ্ড পরস্পরের সহিত লড়াই করিতেছিল। আমাদিগের সঙ্গিনী মহিলাদিগের রঙ্গীন সাড়ী দেখিয়া উহার মধ্যে একটী ষণ্ডরাজ অকস্মাৎ 'যুদ্ধং দেহি' ভাবে পথরোধ করিলেন। ষণ্ডরক্ষক অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া আমরা পথিপার্শ্বে এক দালানের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ষণ্ডরাজও আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া দালানের সন্নিকটে শ্রুতিমধুর গাম্ভার রাগিণী আলাপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে আমাদের 'বৃদ্ধোরক্ষঃ বৃষদ্বন্দ্বঃ' ভৃত্য রূপলাল এক বংশখণ্ড সহযোগে ষণ্ডরাজকে শিক্ষাদান করিলে, তিনি নিম্নপুচ্ছ হইয়া আপন দলে ভিড়িয়া গেলেন। বুঝিলাম 'অসহযোগ' অপেক্ষা চণ্ডনীতি ক্ষেত্র-বিশেষে কার্য্যকরী। দু-চার পদ অগ্রসর হইতে-না-হইতে আর একটী ষণ্ডের দল অন্তদ্রভাবে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, 'শূন্যানাং শতহস্তেন' এই নীতি অনুসারে পূর্ব্ব হইতেই নিরাপদ স্থানে সরিয়া দাঁড়াইলাম। এ স্থানের ষণ্ডবাহুল্য দেখিয়া মনে হইল স্থানটীর নাম 'ষণ্ডসদন সা' হইলেও অসঙ্গত হইত না।

অতঃপর আমরা কতকগুলি বাগিচা দেখিতে দেখিতে একটী অপেক্ষাকৃত বড় বাগিচায় প্রবেশ করিলাম। বাগিচার মধ্যে সহস্র সহস্র গোলাপ ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া শোভা ও সুবাস বিতরণ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে

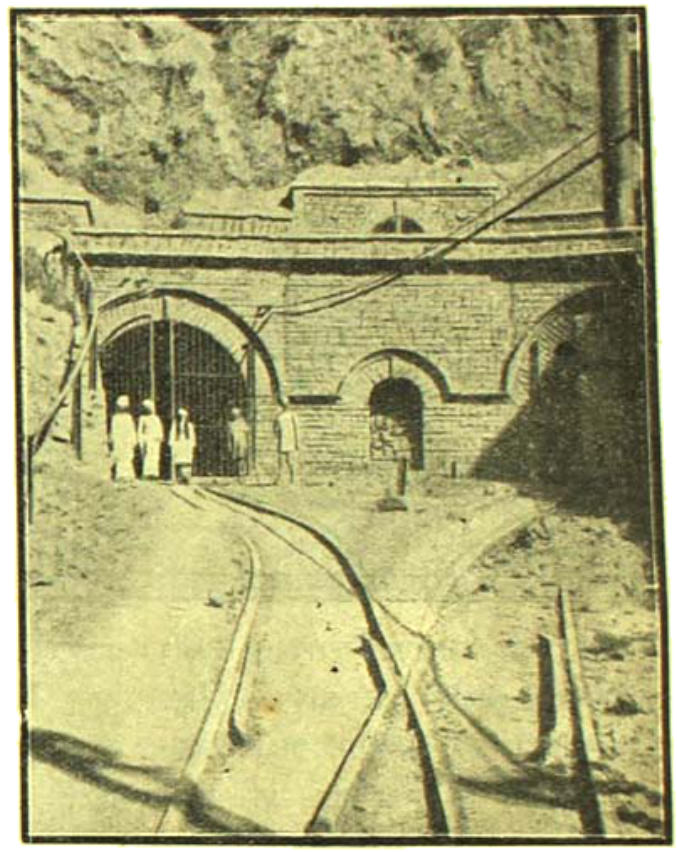

লবণ খনির প্রবেশ-পথ—খেওড়া

দ্রাক্ষা, লোকাট, আনার, আপেল, আখ্‌রোট প্রভৃতি মূল্যবান মেওয়ার গাছ। এ সময়ে লোকাট ও আলুচা (আলুবোখার জাতীয়) ব্যতীত অপর ফল হয় না। পঞ্জাবে মেওয়ার রাজ্যে আসিয়া মেওয়ার আস্বাদ পাওয়া হইল না, ইহা বাস্তবিক আক্ষেপের বিষয়। বাগিচা-মধ্যে ঘুরিয়া-ফিরিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা বাসায় ফিরিলাম। বাসাটী বাজারের মধ্যে ছিল। রাত্রে বেশ শীত অনুভব করা গেল; ঘরের জানালা, দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও মধ্য রাত্রে কম্বল টানিতে হইয়াছিল।

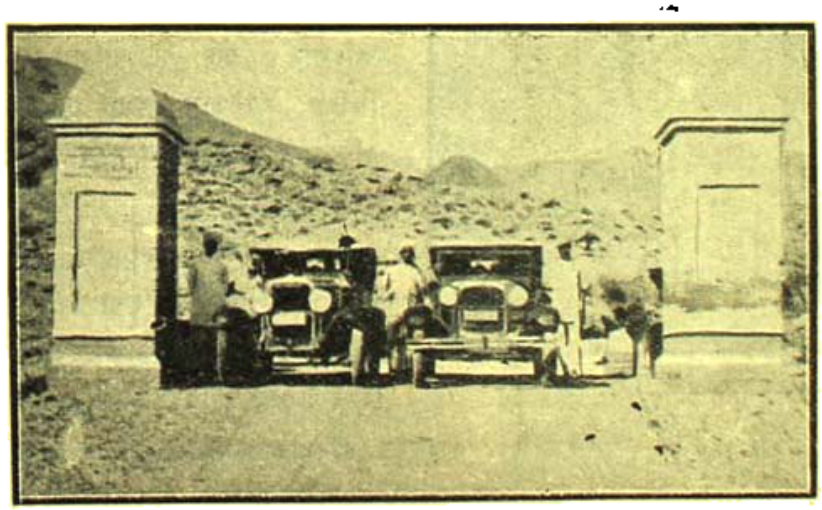

পার্ব্বত্য পথে ভ্রমণকারীদের মোটর—Salt Range.

প্রাতে পুনরায় মোটর-যানে আরোহণ

করিলাম ও চারি মাইল চড়াই ভাঙিয়া 'কটাসরাজ' তীর্থে পৌঁছিলাম। পথে সরকারী ডাক-বাংলোয় ভারত-সরকারের অন্যতম সদস্য শ্রযুক্ত কমলা হোসেন 'সফরে' আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন শুনিলাম।

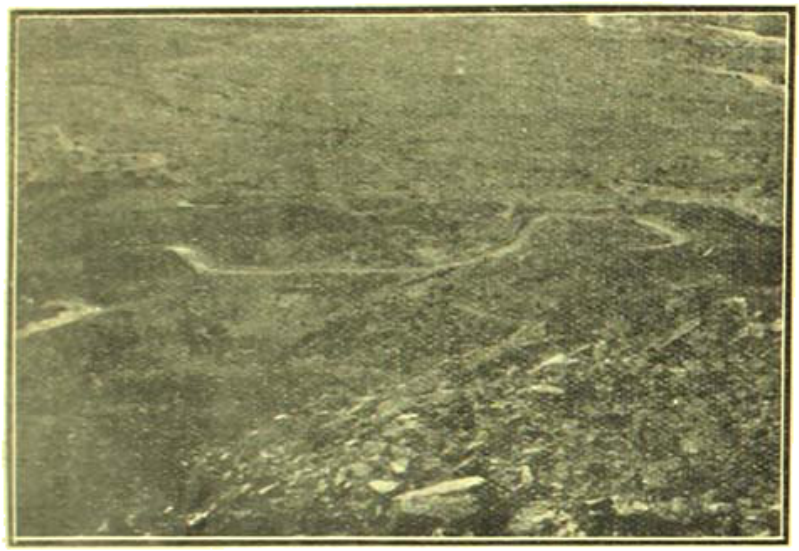

পার্ব্বত্য-পথে নূনের স্তূপ—Salt Range

'কটাসরাজ' একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। চারিদিকে ধূসর গিরি-শ্রেণীর চতুর্ভূমি। ঐ সকল পাহাড়ে সবুজের নাম-গন্ধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গ্রাম-মধ্যে প্রবাহিতা

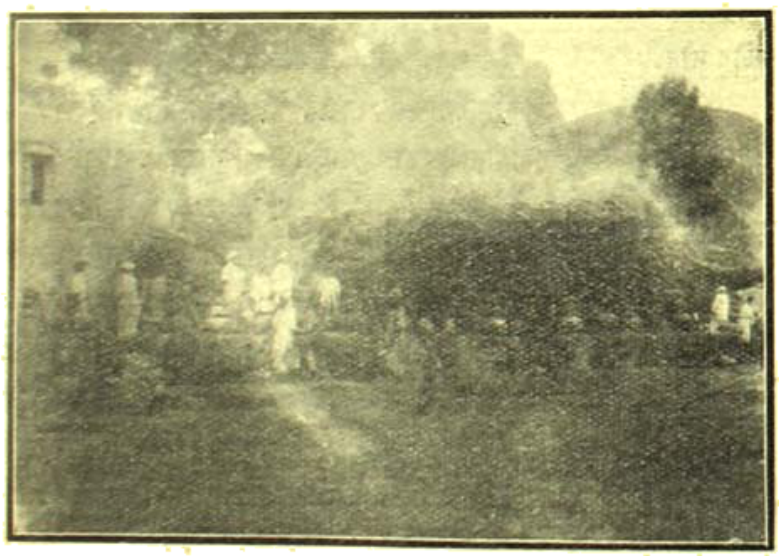

নদী-তীরে গোলাপ জলের কারখানা—চুয়াসদন সা

ক্ষীণকায়া তটিনীর উভয় কূলে কিছু গাছপালা আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, এই স্থানে পঞ্চপাণ্ডব অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। একটী পাহাড়ের শীর্ষদেশে তাঁহাদের 'আস্তানা' দেখান হয়। পাহাড়গুলির উপরে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষিত আছে। ২।৩টী গৃহের ভগ্নাবশেষ ও স্তূপের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া মনে হয় সেগুলি কোন সুদূর অতীতের শিল্প নমুনা। কোন্‌টী কোন্ যুগের বা কাহার কীর্ত্তি, তাহা জানিবার উপায় নাই, কারণ স্থানীয় অধিবাসীরা এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মহারাজ রণজিৎ সিংহের আমলেরও একটী দুর্গের প্রাকার এখনও বর্ত্তমান আছে। এখানকার প্রধান কার্য্য 'অমৃত কুণ্ড' নামক উৎস-নিঃসৃত সরোবরে স্নান। এখানে স্নান করিয়া আমরা পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম, এরূপ তৃপ্তি ইহার পূর্ব্বে হরিদ্বার স্বর্গাশ্রমের ঘাটে স্নান করিয়া পাইয়াছিলাম। স্নানকালে একটী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমাদের স্নান শেষ হইলে মহিলারা যখন স্নান করিতেছিলেন, তখন আমাদের একটী বালিকা অন্যমনস্ক হইয়া গভীর জলে পড়িয়া যায়। স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্ত চীৎকারে নিকটস্থ একজন স্নানার্থী ভদ্রলোক সাঁতরাইয়া ঐ বালিকাটীকে উদ্ধার করেন। আমরা সে সময়ে ঘাটে উপস্থিত ছিলাম না। মহিলারা স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলে তাঁহাদের নিকট আমূল বৃত্তান্ত শুনিয়া 'কটাস রাজ'কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম। যদি এই বালিকাকে না ফিরিয়া পাইতাম, তবে যে কিরূপ হরিষে বিষাদ হইত তাহা সহজেই অনুমেয়।

স্নানের পর মন্দিরগুলি দেখিতে যাওয়া হইল। মন্দিরগুলি পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত, কাজেই অনেক চড়াই-উৎরাই ভাঙিতে হইয়াছিল। ২।৩টী শিবমন্দির, একটীতে রামসীতা ও মহাবীর আছেন, বাকী অধিকাংশই পাণ্ডবদিগের কীর্ত্তি-সংশ্লিষ্ট। চৈত্র-সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখ মাসের ৩।৪ তারিখ পর্য্যন্ত এখানে

এক বিরাট মেলা হয়। ঐ সময়ে পঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু স্ত্রী পুরুষ, সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। প্রবাদ এই যে, ১লা বৈশাখে ঐ অমৃতকুণ্ডে সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে শেষনাগ মহারাজ আসিয়া দেখা দেন। তাঁহার দর্শন আশায় সহস্র সহস্র নরনারী কুণ্ডপার্শ্বে জমায়েত হয়, কিন্তু পুণ্যাত্মা ভিন্ন অপর কেহ তাঁহার দর্শন পায় না। আমরা মেলার পর গিয়াছিলাম, কাজেই প্রবাদ শুনিয়াই ক্ষান্ত

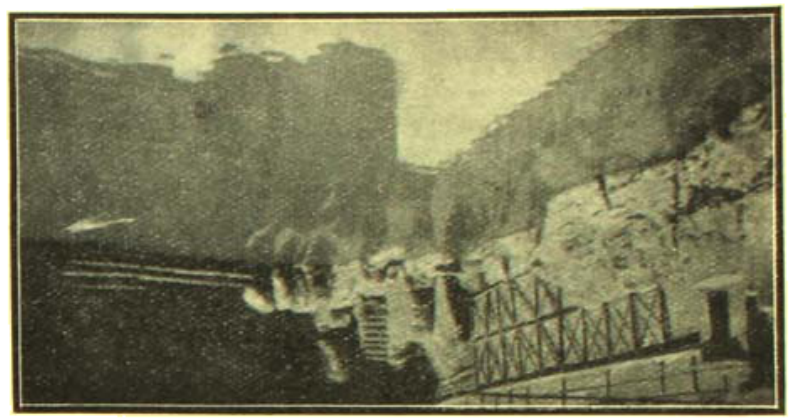

অমৃতকুণ্ড—কটাসরাজ

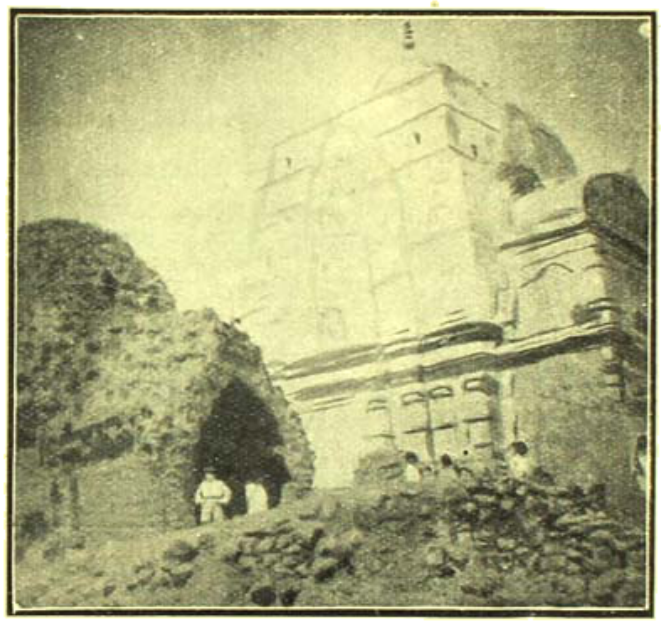

পাণ্ডবদিগের বাস-মন্দির—কটাসরাজ

হইলাম। দর্শনাদি কার্য্য শেষ করিয়া 'আড্ডায়' ফিরিয়া আমিষ-পলাণ্ডু-বর্জ্জিত সাত্ত্বিক আহার শেষ করিলাম। বেলা ২।৷০টায় আমরা 'কটাস' ছাড়িলাম।

প্রত্যাবর্ত্তন-পথে 'চুয়াসদন সা' হইয়া 'খেওড়া' আসিলাম। 'খেওড়া'য় সপরিবারে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক আছেন শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে গেলাম। ভদ্রলোক লবণ-বিভাগে কর্ম্ম করেন ও গত সাত বৎসর যাবৎ 'খেওড়া'য় আছেন। তাঁহার স্ত্রী ও একটী আত্মীয় বালক সম্প্রতি 'টাইফয়েড' হইতে ভুগিয়া উঠিয়া-ছেন। এখনও উভয়েই শয্যাশায়ী। এই সুদূর প্রবাসে তাঁহার বিপদ দেখিয়া প্রবাস-বাসের কষ্ট প্রত্যক্ষ করিলাম। তাহার পর আমরা সমতল ভূমিতে নামিয়া 'পিণ্ডদাদন খাঁ' সহরে মিঃ ব্যানার্জ্জীর জনৈক পঞ্জাবী বন্ধুগৃহে হাজির হইলাম। বন্ধুটী আমাদের অভ্যর্থনা ও অতিথি-সৎকারের বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন। পার্ব্বত্য জলবায়ুর গুণে সকলেই ক্ষুধায় পীড়িত ছিলাম; সুতরাং চর্ব্বচুষ্য লেহ্যপেয়—সকল উপকরণগুলির উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করা হইল।

'পিণ্ডদাদন খাঁ' সহরটীও ঝিলাম নদীর উপর অবস্থিত। 'পিণ্ডদাদন খাঁ' নামের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম, রাজপুতানা হইতে তিন রাজপুত-মুসলমান সহোদর পঞ্জাব-সীমান্তে আসিয়া বিভিন্ন

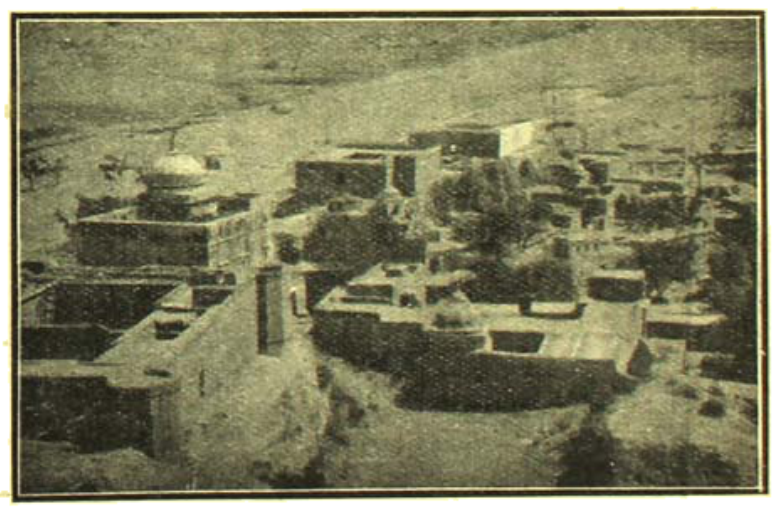

পাহাড়ের উপর হইতে সাধারণ দৃশ্য—কটাসরাজ

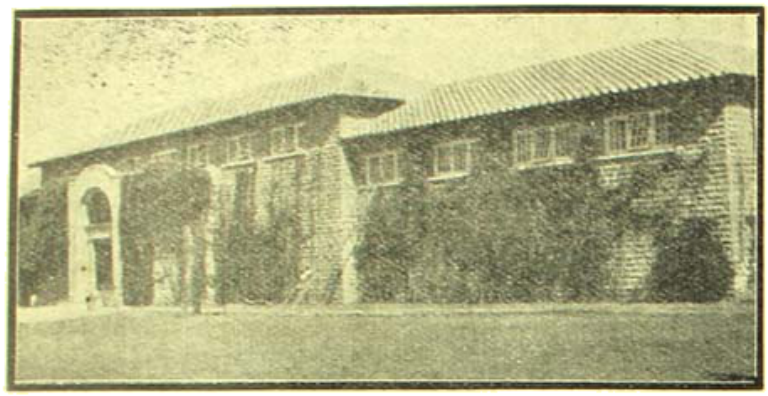

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মিউজিয়ম—তক্ষশীলা

স্থানে বাস করেন। তাঁহাদের নাম গাজি খাঁ, ইস্‌মাইল খাঁ, ও দাউদ খাঁ। তাঁহাদেরই নাম অনুসারে যথাক্রমে 'ডেরাগাজি খাঁ,' 'ডেরা ইস্‌মাইল খাঁ' (ডেরা অর্থে বাসস্থান) ও 'পিওদাউদ খাঁ' (পিও অর্থে গ্রাম) তিনটী নগর হইয়াছিল। রাত্রি ৯ টার ট্রেণে পিওদাউদ খাঁ ছাড়িয়া কিছুদূর অগ্রসর না হইতে তুমুলবেগে মরুভূমির 'তুফান' (Dust Storm) আরম্ভ হইল। 'তুফানের' বেগে ট্রেণের গতি মন্থর হইল; সার্সি, জানালা বন্ধ করিয়াও ধূলিরাশির আক্রমণ রোধ করা কঠিন হইল। এ অঞ্চলে ইহাই 'কাল বৈশাখী'। আকাশে মেঘ-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া বন্ধ হইয়া 'গুমট' আরম্ভ হয়। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত ভাবের পর প্রকৃতির উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ হয়। যেরূপ কর্ণবধিরকারী প্রলয় সঙ্গীত, সেইরূপ বালুরাশির তাণ্ডব বিক্ষেপ। এই 'তুফানের' জন্য অনেক সময় রেলপথের উপর ২।২॥০ ফিট বালি জমিয়া ট্রেণের গতিরোধ করে এবং যাত্রীদিগের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। কিন্তু এইরূপ ঝটিকার

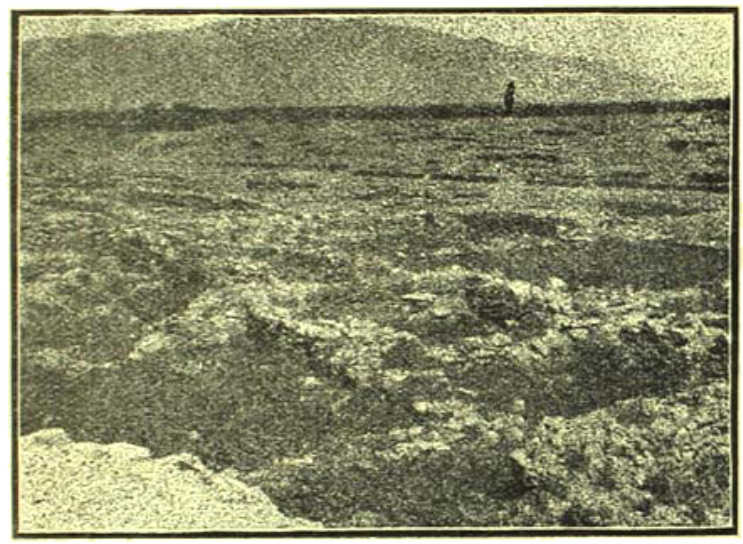

সারকাপে গ্রীকদিগের আস্তানা ভূমি—তক্ষশীলা

অব্যবহিত পরেই যে ঠাণ্ডা পড়ে, তাহা বড়ই আরাম-দায়ক। প্রায় ২ঘণ্টা 'তুফান' খাইতে খাইতে অবশেষে আমরা খুসাবে রাত্রি ১১টার সময় ফিরিলাম।

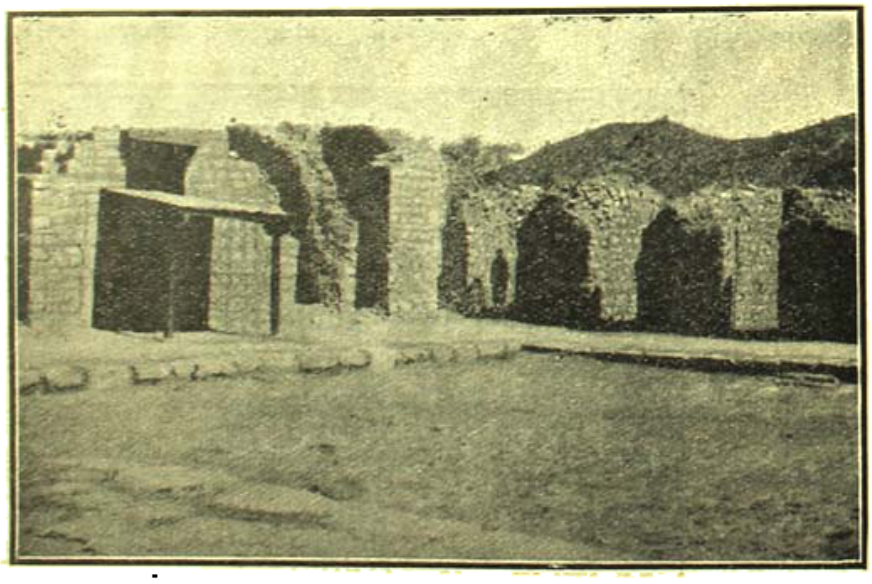

জুলিয়ান থনন কার্য্যে আবিষ্কৃত গৃহাবশেষ—তক্ষশীলা

খুসাব হইতে রাওলপিণ্ডি হইয়া আমরা অতঃপর এক-দিন তক্ষশীলা দেখিতে গিয়াছিলাম। তক্ষশীলা ষ্টেশনের নিকটেই ভারত-সরকারের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের একটী সুন্দর মিউজিয়ম আছে।

এখানে যে সকল খননকার্য্য হইয়াছে ও প্রাচীন যুগের সভ্যতার ও শিল্পের যে সমস্ত নিদর্শন আছে, তাহা দেখিবার ও ভাবিবার বিষয়। সুপ্রাচীন হিন্দু সভ্যতা, গ্রীক্ সভ্যতা, সিথিয়ান্ সভ্যতা, বৌদ্ধযুগের শিল্প ও ইতিহাস, এই সমস্ত নিদর্শনের মধ্য দিয়া স্ব স্ব বিশিষ্টতার পরিচয় দিতেছে। রঙ্গপুর জেলার অধিবাসী মিঃ দত্তগুপ্ত, এখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। তিনি অতি অমায়িক লোক। তাঁহার সৌজন্যে আমরা যাবতীয় দ্রষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়াছি ও জানিয়াছি। গত ১৭ বৎসর যাবৎ এই ভদ্রলোক এই সুদূর প্রবাসে কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতেছেন। স্বদেশীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ে ইনি অনেক গবেষণা করিতেছেন। আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, অনেক অভাব, অসুবিধা স্বীকার করিয়া প্রকৃতির এই নিভৃত বক্ষে বসিয়া ইনি জ্ঞানার্জ্জনে ও স্বদেশের অতীত গৌরবের প্রমাণ সংগ্রহে ছাত্র-সুলভ ঐকান্তিকতার সহিত নিবিষ্ট আছেন। তক্ষশীলা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে মাসিক পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। সেজন্য তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কয়েকখানি চিত্র ইহার মধ্যে দেওয়া হইল।

মিউজিয়ম অভ্যন্তরে রক্ষিত স্তূপের দৃশ্য—তক্ষশীলা

তক্ষশীলা হইতে পুনাবে ফিরিবার এক সপ্তাহ মধ্যেই দেশে ফিরিবার আয়োজন পড়িয়া গেল। 'যত্নমুখো বাঙ্গালী আর রণমুখো সেপাই'—দুইয়ের অবস্থাই সমান। বিদায়ের আসন্ন মুহূর্ত্তে পঞ্চনদবিধৌত, ঋক্-সাম-যজু-মুখরিত, হোমাগ্নিপূত এই পুণ্যভূমিকে আন্তরিক বন্দনা না করিয়া থাকিতে পারি না। অতীতের অন্ধকারের স্তর ভেদ করিয়া কোন্ এক ভাস্কর যুগের ক্ষীণ আলোকরশ্মি আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে; যে আকর্ষণ আমরা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে উপলব্ধি করিতেছি এবং অযোগ্য পশু হইলেও আপনাদিগকে এক সুযোগ্য, মহান্ পূর্ব্বপুরুষের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরবে উৎফুল্ল হইতেছি। কে জানে কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে প্রাচীনের এই বিরাট সম্বন্ধ পশুদিগকে মহাপশু হইতে উদ্ধার করিয়া বিশ্বের দরবারে আপন মাহাত্ম্য পুনঃ প্রকট করিবে? সে নবযুগের সূচনা কি দৃষ্টিপথে আসিয়াছে?

মিউজিয়মে প্রাপ্ত নিদর্শন সমূহ—তক্ষশীলা

অকাল-বসন্ত

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মেয়েদের হস্‌টেলে ঘরে-বারান্দায় তুমুল হট্টগোল সুরু হয়েছে। দীপ্তি খবরটা এতোক্ষণ লুকিয়েছিলো, সদলবলে বায়স্কোপ থেকে ফিরে কাপড় ছাড়বার সময় ব্লাউজের তলা থেকে চিঠিটা বের করে' সে সুষমার হাতে দিলে।

আর যায় কোথা! তাই মেয়ের আজ এতো ফুর্তি! তাই সবাইকে সে আজ নিজের পয়সায় বায়স্কোপ দেখালে।

দীপ্তিকে সবাই ছেঁকে ধরলো। কারুর কাঁধের থেকে আঁচল তখন বাতর ওপর আলগা হ'য়ে ঝলমল্ করছে, এলানো চুলের মধ্যে মোট-পাড়া রঙিন চিরুনি চালিয়ে দিতে দিতে কামড়ে কেউ এসে দাঁড়িয়, তাড়াতাড়িতে স্যাণ্ডেলের ষ্ট্রাপ্‌টা কেউ ঠিকমতো পায়ে বসাতে পারে নি।

চিঠিটা খুলে নাড়তে-নাড়তে সুষমা খবরটা চারদিকে রাষ্ট্র করে' দিলো।

—ওমা, মেয়েটা ডুবে-ডুবে এতো জলও খেতে পারে!

—তাই ক'দিন থেকে এমনি উড়ু-উড়ু, শাড়িগুলো রোদে পেড়ে নতুন করে' শুকোতে দেওয়া হচ্ছে।

—বিকেল বিকেল মেয়ের আর দেখা পাওয়া যায় না। বেণীতে ফাৎনা ঝুলিয়ে চলেছেন তিনি কালীঘাটে—মামার বাড়িতে।

—মামাবাড়ি না হাতি। কালীর মন্দিরে হত্যে দিতে। পেটে তোর এতো বুদ্ধিও ছিলো, দীপ্তি।

—স্যাপ্, ওর দিকে চেয়ে স্যাপ্ একবার। খুসিতে একেবারে ফেটে পড়ছে। আনন্দে ওকে ম্যালেরিয়ায় ধরলো বুঝি।

—অতো অংখার কিসের লো ছুঁড়ি! আমাদেরো একদিন হ'বে।

—খুসিতে আমরাও একদিন অমনি হি-হি করে' কাঁপ্‌বো। বোকা একটু আমাদেরো হ'তে হ'বে।

অনেক হাসি ও কোলাহল, অনেক ক্ষিপ্র পদশব্দ।

সুষমা চারদিকে চোখ ফিরিয়ে বললে,—শান্তি, শান্তি কোথায়? খবরটা ওর কাছেই বা চাপা থাকে কেন?

দক্ষিণে বারান্দাটা যেখানে বাথ্‌রুমের দিকে ঘুরে' গেছে তারই পাশে শান্তির ঘর। দরজার মোটা খদ্দরে নীল রঙ-করা পরদা ঝুলছে।

হুড়মুড় করে' মেয়ের দল এবার সেই ঘর আক্রমণ করলে।

হস্‌টেলের মধ্যে এই ঘরটিই সব চেয়ে ছোট, নিরিবিলি—একজনের থাকবার মতো। এই ঘরের ওপর শান্তির দাবির কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী জোটে নি। এই ঘরেই তাকে বেশি মানায়, কেননা সব চেয়ে সে কম কথা কয়, সবার থেকে নিজেকে সে আড়াল করে' রাখে। নিজের উপস্থিতিটা অনুচ্চারিত রাখতে পারলেই সে খুসি হয়। কিন্তু এমন রোমহর্ষক খবরটার কিছু ভাগ তাকে না দিলে তাকে নিয়ে হস্‌টেলে একসঙ্গে থাকার কোনোই মানে হয় না।

সিলিঙ থেকে ইলেকট্রিক আলোর বাল্‌বটা ঝুলছে, তারই দিকে পিঠ করে' শান্তি লোহার চেয়ারে বসে' সামনের টেব্‌লের ওপর এক-রাশ্যের বই-খাতা ছড়িয়ে পড়ায় মগ্ন হ'য়ে আছে। টেব্‌লের ওপর গোল একটু ছায়া পড়েছে, পাশের বাড়ির একটা ঘর উদ্ধত চোখে এই দিকে তাকায় বলে' দক্ষিণের জান্‌লাটা বন্ধ, ছোট ঘরটি ঘিরে কঠিন স্তব্ধতা।

এতো গোলমালেও কেউ কুঁজো হ'য়ে বসে' পড়া করে' যেতে পারে—মেয়ের দল রীতিমতো খাপ্পা হ'য়ে উঠ্‌লো।

ছো মেরে শান্তির চোখের সাম্‌নে থেকে বোটানির নোট্‌টা কেড়ে নিয়ে সুষমা বল্‌লে,—হয়েছে লো হয়েছে, বিদ্যের জাহাজ হ'লেই আর সংসার-সমুদ্রে ভেসে পড়তে পারবি নে। এদিকে ব্যাপার কী, জানিস্?

চেয়ার থেকে না উঠে মাত্র ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে শান্তি সস্মিতমুখে বল্‌লে,—কী?

—আর কী! সুষমা দীপ্তির এক গোছা চুল মুঠো করে' চেপে ধরে' সাম্‌নের দিকে তাকে টান্‌তে-টান্‌তে

প্রহ্লাদ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অসিতকুমার রায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

বল্‌লে,—এই পোড়ারমুখির কীর্ত্তি। আস্‌চে পঁচিশে তারিখে ওর বিয়ে।

—বিয়ে? চেয়ার নিয়ে শান্তি এবার ঘুরে বস্‌লো: তাই তোদের এতো ফুর্ত্তি! কান্নাকাটি না করে' দিব্যি মাতামাতি সুরু করেছিস্?

—কাঁদতে যাবে কোন্ দুঃখে? শতদল বল্‌লে: এ তো আর কাঠগড়ায় গলা পেতে বলি হওয়া নয়, দস্তুরমতো লাভ্-মেরেইজ্। বাবা ওর মত দিয়ে চিঠি লিখেছেন।

প্রতিভা বল্‌লে,—ও তার কী করে' বুঝ্‌বে বল্? ও তো আগাগোড়া একটি কাঠ—মূর্ত্তিমান ব্যাচি-সেপ্‌টিক্।

শান্তি ঠোঁট কুঁচকে নীরবে একটু হাস্‌লো।

সুষমা খাতাটা শান্তির কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বল্‌লে,—নে, বাবা, পড়্ বসে'-বসে'। ডজন-খানেক লেটার্ পেয়ে ডিগ্‌বাজি খেয়ে গেজেটের মাথায় গিয়ে ওঠ্। আমরা ভাই এখন থেকেই জোলাপ্ নিতে সুরু করি।

সুনন্দা বল্‌লে,—দীপ্তির বিয়েতে আমরা ভাই নিয়ম উল্‌টে দেব। মিছিল করে' মেয়ে যাবে বিয়ে করতে, সঙ্গে আমরা যাবো বধূযাত্রিনীর দল। বলে'ই তার অনর্গল হাসি।

এক-এক করে' আস্তে-আস্তে সবাই সরে' পড়তে লাগ্‌লো। যাবার আগে সুষমা বল্‌লে,—মুখ গোম্‌রা করে' যতোই কেন পড়ো না বাপু, শেষকালে একদিন গাঁটছড়া বেঁধে এমনি সরে' পড়তে হ'বে। কোথায় বা তখন তোমার মেকলের হাইস্, কোথায় বা তোমার ইকলজি!

ঘরটি আবার ছোট হ'য়ে এলো। শান্তি টেব্‌লের ওপর ঝুঁকে পড়ে' আবার পড়ায় মন দিলে। দুই চক্ষু দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ করে' বইয়ের অক্ষরগুলিকে সে স্পষ্ট, পরস্পর-সংলগ্ন ও অর্থবান্ করে' ধরে' রাখবার চেষ্টা করতে লাগলো; কিন্তু তার মন কখন বিমুখ হ'য়ে উঠেছে।

বই খাতা তেমনি ছড়িয়ে রেখে চেয়ারে পিঠ দিয়ে সে চুপ করে' একমনে মেঝের দিকে চেয়ে রইলো।

একপাশে নিচু একখানি তক্তপোষ পাতা, সেল্ফ্-এর অভাবে তারই শিয়রের দিকে এক তা খবরের কাগজ বিছিয়ে শান্তি তার ওপর থরে-থরে তার বই সাজিয়ে রেখেছে—প্রত্যেকটি বইয়ে পুরু করে' মলাট দেওয়া। অনেক বই—কেরোসিন-কাঠের ছোট টেব্‌লে কুলিয়ে ওঠে না। বইয়ের ওপর তার ভীষণ ঘর; ময়লা-সাড়িতে নিজে সে দু' সপ্তাহ কাটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু মলাটের ওপর একটি কালির আঁচড় সে সইতে পারে না। সামান্য একটা দাগ পড়লে বা কোণ দিয়ে একটু ছিঁড়ে গেলে তক্ষুনি সে মলাট বদ্‌লে ফেলা চাই। খাতা কাগজে মলাট দিলে চল্‌বে না—মলাটের জন্যে সে আর-আর মেয়ের ঘরে কাগজ খুঁজে বেড়ায়—ডাইং-ক্লিনিংএর দোকান থেকে যদি কারুর কাপড় ব্রাউন ব্রাউন্-পেপারের প্যাকেটে কোথাও এসে থাকে। ব্রাউন্-পেপার না হ'লে অন্তত ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্‌এর ছবির পৃষ্ঠাটা। তা না জুটলে মাসান্তে ধোপার-জোড়া ক্যালেণ্ডারের হাতড়ে দু' একটা ছেঁড়া পাতা। নিজের না জুটলেও বইগুলিকে তার এমনি জ্যাকেটে সাজিয়ে রাখা চাই। ওদের পৃষ্ঠায় ধারে-ধারে হিজিবিজি নোট টুকতে পর্য্যন্ত তার মায়া করে।

এ-ছাড়া আর তার কোনো আসবাব নেই। তক্তপোষের নিচে ছোট একটা টিনের ট্রাঙ্ক—মা'র অধিবাসের সময় পাওয়া, বাবার সঙ্গে অনেক দূর দেশ অতিক্রম করবার অভিজ্ঞতা তার সর্ব্বাঙ্গে মুদ্রিত হ'য়ে আছে। এই ট্রাঙ্কটিই মা তাকে দিয়ে দিয়েছেন। বাড়িতে বেতের দু'রেকটা যে বাক্স আছে তাতেই ওদের চলে' যাবে। রাত হ'য়ে এলে পাশের বাড়ির কোলাহল যখন থেমে যায়, তখন দক্ষিণের জান্‌লাটা সে খুলে দেয়। দেয়ালের বাধা ডিঙিয়ে কোথা থেকে সুদূরের একটু হাওয়া আসে—সারা দিনের প্রান্তির পর ঠিক মা'র ঝিমিয়ে-পড়া ক্লান্ত স্বরের ঘুম-পাড়ানি ছড়া-কাটার মতো—তার মশারির দরকার হয় না। যেদিন রাত জেগে পড়বার খুব ইচ্ছে হয়, প্রতিভার ঘর থেকে চীনে ধূপের দু'-একটা 'করেল্' সে চেয়ে আনে। শীত এসে পড়লে আর তো ভাবনাই নেই, মাথা পর্য্যন্ত লেপ মুড়ি দিয়ে আগাগোড়া নিটোল একটি ঘুম। তা, শীত এই এসে গেলো আর-কি।

ভারি তো দুরেকখানা সাড়ি—তার জন্য ব্র্যাকেট চাই না হাতি! দুটো দেয়াল যেখানে এসে মিশেছে তারই দু' পায়ে দুটো পেরেক পুঁতে একটা দড়ি সে টাঙিয়ে

নিয়েছে—তারই ওপর সাড়ি সেমিজ পেটিকোটগুলি কুলুছে। একখানি আয়না পর্য্যন্ত নেই, না একটা চিরুনি,—যে কোনো ঘরে গেলেই সে নির্ব্বিবাদে চুল-বাঁধা সেরে আসতে পারে। যা একখানা মুখ, তার জন্যে আবার স্নো-পাউডার চাই, না, আর-কিছু। সেলুলয়েডের কয়েকটা কাঁটা, আর একটা কেলে-কুষ্টি তেল-কুচকুচে ফিতে। মা নেহাৎ রোজ সন্ধ্যার চুল বাঁধতে বলে' দিয়েছেন বলে'ই শান্তি এই একটু যা প্রসাধন করে, চুল আঁচড়াবার সময় তার মা'র কথা, খেলা ছেড়ে ছোট ভাই দু'টির বাড়ি-ফেরার কথা, গ্রামের সন্ধ্যার কথা, দীপান্বিত পরিচ্ছন্ন তুলসী-তলাটির কথা মনে হয়।

হ্যাঁ, টেব্‌লের ওপর এক বাণ্ডিল মোমবাতি—কয়েকটা তার খরচ হয়েছে বটে। এগারোটার পর আলো জ্বাল্‌বার নিয়ম নেই—দারোয়ান মেইন্ সুইচ্ বন্ধ করে' দেয়। তখন এই মোমবাতির স্নিগ্ধ আলোয়—পড়ায় যখন আর মন বসে না—শান্তি মা'র কাছে চিঠি লেখে। শুধু মা'র কাছে লিখেই তার নিস্তার নেই, ছোট ভাই দু'টিকেও লিখ্‌তে হয়—তাদের কারুর প্রতি বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব করলে চলবে না। দস্তুরমতো তারা পৃষ্ঠা মেপে ও লাইন্ মিলিয়ে নেয়,—এবং কোন্ মূল্যবান খবরটা কাকে জানানো উচিত ছিলো এই নিয়ে দিদির কাছে অভিযোগের তাদের অন্ত থাকে না। খবর দেবার মৌলিকতায় দিদিকেও তারা ছাড়িয়ে গেছে। গ্রামের ঝাকুরকাটির জঙ্গলে কোথায় একটা বাঘ এসেছে বলে' শোনা যাচ্ছে—দিদিকে চিঠিতে সেই খবর দিতে গিয়ে দুই ভাই কালি-কলমের সাহায্যে প্রকাণ্ড দুটো বাঘ এঁকে বসে। সেই দুটো গোলাকার-চক্ষু বিস্ফারিত-দন্ত নামহীন জন্তুর দিকে চেয়ে কাকে যে সে প্রতিযোগিতায় জয়ী করবে শান্তি কিছুতেই তা ভেবে ঠিক করতে পারে না।

আর, বেরালের এক কোণে একটা ছাত্তি—অতোটা পথ সে খালি-মাথায় হাঁটতে পারে না। একটা রিক্‌সা করে' গেলে হয় বটে, কিন্তু অতো তার পয়সা কোথায়? তারপর বিকেলে আবার টিউসানি আছে, বলা-কওয়া নেই ঝুপ্‌ঝাপ্ করে' নেমে এলেই হ'লো!

টেব্‌লের সামনে চেয়ার টেনে এনে শান্তি আবার পড়ায় মন দিলে। কুড়েমি করবার তার সময় নেই। সামনেই একটা পরীক্ষা আছে—কিছুই তৈরি হয় নি। আর, এখন না পড়লে তার সময় কই? রাত জেগে আজ একটু পড়বে বলে' বেলাবেলিতেই সে রাতের খাওয়া সেরে নিয়েছে।

কিন্তু বলতে কি, পড়ায় সে কিছুতেই মন বসাতে পারলো না।

সহরের ইট-কাঠ পাথর-লোহা ডিঙিয়ে মন তার কখন তাদের গ্রামের আকাশে পাখা মেলেছে। এখন গ্রাম একেবারে নিঝুম, কবির অলিখিত পৃষ্ঠাটির মতো নিঃশব্দ। রান্নাবান্না চুকিয়ে মা এতোক্ষণে ঘরে গিয়ে পাখা-হাতে বসে' মশা তাড়াচ্ছেন আর দেয়ুখোতে মাটির বাতি জ্বালিয়ে মোহন গুনগুন করে' পড়া করছে। এই সবে তার থার্ড-ক্লাস্। টপাটপ্ বেরিয়ে পড়া চাই—এক বছরো তার সবুর করা চল্‌বে না। ভোর-রাতে উঠে মা আবার তাকে জাগিয়ে দেবেন। মিণ্টুরই মজা—অতো পড়ে'ও সে ফার্ষ্ট হ'য়ে ফিফ্‌থ-ক্লাসে উঠেছে। তার জন্যে দিদির ভাবনা নেই, ম্যাট্রিকে সে তাঁকে মাস মাস অন্তত পনেরো টাকার বৃত্তি এনে দেবে ঠিক।

নিজের ওপর বিরক্ত হ'য়ে শান্তি এবার গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে পড়তে লাগলো। একটা-কিছু মুখস্ত করবার কসরৎ না করলে মন তার সায়েস্তা হচ্ছে না।

মেয়ের দল খেতে নিচে চলে' গেছে। আঁচিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠ্‌তে-উঠ্‌তেও তাদের সেই কথা: দাই বলো, দীপ্তি খাসা শিকার বাগিয়েছে—বিলেত থেকে ফিরে এসেও কি না সে এই জীবন্ত পুতুলটাই চেয়ে বস্‌লো। বলিহারি ভাই প্রেম, অত দূরে গিয়েও মানুষে মনে করে' রাখতে পারে। এতোও গোবার! আর, বাপই বা মত দেবেন না কেন শুনি? অমন একটি চৌকস চাকরি যখন জোটাতে পেরেছে, তখন স্বয়ং উনিই প্রেমে পড়ে' যেতে পারেন—মেয়ে তো কোন্ ছার!

হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দ শুনে শান্তি চম্‌কে উঠ্‌লো। দীপ্তি এসেছে। সারা শরীরে খুসি আর সে বইতে পারছে না।

শান্তি সামনের দিকে ডান-হাতটা সামান্য একটু বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে,—এসো। বিয়ের নামে মাটিতে যে আর পা পড়ছে না।

আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে দীপ্তি তক্তপোষের উপর

বল্‌লো; বল্‌লে,—একেবারে উড়ে চলেছি, না? তা, বিয়ের নাম শুনে নয়, পাত্রের নাম শুনে। বিলেত যাবার আগে বাবার কাছে সে নেহাৎই ছিলো একটা চাষা, আস্‌তে-না-আস্‌তেই পুণায় একটা এগ্রিকাল্‌চারেল্ কলেজে চাকরি পেয়ে প্রায় সে এখন প্রিন্‌স্-ওফ্-ওয়েল্‌স্। রাজকুমারী তো বটেই, বাবা দস্তুরমতো এখন পণ দিতে রাজি আছেন।

শান্তি নীরবে একটু হেসে বইর পৃষ্ঠা ওল্‌টাতে লাগ্‌লো।

এতোতেও তার একটু সাড়া নেই, শরীরের রেখাগুলি এতোতেও সে একটু কোমল করে' আন্‌লো না। দীপ্তি রীতিমতো অস্থির হ'য়ে শান্তির কোলের থেকে বইটা কেড়ে নিয়ে বল্‌লে,—কী কেবল রাত-দিন পড়ো?

শান্তি বল্‌লে,—কই আর পড়ি। এই রাতেই যা একটু সময় পাই। সকালে কলেজ, দুপুরে ইস্কুল-মাষ্টারি, বিকেলে আবার টিউসানি। রাত ছাড়া আর পড়বো কখন? তাও এতো খেটে আসবার পর এক-একদিন এমন ঘুম পায় যে খেয়ে-দেয়েই ঘুমিয়ে পড়ি। তারপর মাথাটা তো একরকম সব সময়েই ধরে' থাকে।

দীপ্তি পা দোলাতে-দোলাতে বল্‌লে,—অতো পড়ে' কী হ'বে? আমার তো বাপু এইখেনেই খতম্। চেহারাখানা কী করেছ আয়নায় একবার দেখ তো গিয়ে।

অল্প একটু হেসে শান্তি বল্‌লে,—আমি চেহারা দিয়ে কী করবো? আমি তো আর পাত্র জোটাবার জন্যে পড়ছি না।

—তবে কিসের জন্যে পড়ছ? মেয়েরা তবে কিসের জন্যে পড়ে?

—আমার ছোট ভাই দু'টিকে মানুষ করতে হ'বে। আমি ছাড়া মাথার ওপরে তাদের কেউ নেই। গেলো-বছর হঠাৎ বাবা মারা গেলেন বলে'—

দীপ্তি বল্‌লে,—তোমার বাবা কিছু রেখে যান নি?

—কিছু ঋণ রেখে গেছেন। সব আমার কাঁধে। কর্পোরেসান্‌এর ইস্কুলে টিচারি করে' মোটে পঁয়ত্রিশটি টাকা পাই, আর টিউশানিতে কুড়ি। আমার হস্‌টেলের খরচ রেখে বাড়িতে যা পাঠাই তা দিয়ে সুদের টাকা শোধ করে' মা আর ছোট ভাই দু'টির কিছুতেই চলে না। তবু আমি যতোদূর পারি, কম করে' চালাই। তা, এই অল্প টাকায় কি করে' কী হ'বে বলো?

—তারপর কী করবে?

—কী আবার করবো! অন্তত বি-এটা তো এমনি করে'-করে' পাস্ করি। চাকরিতে তা হ'লে একটা লিফ্‌ট্ পাবো মনে হয়। বি-এর সময় প্রাইভেটে পড়বো ভাবছি, তা হ'লে সময় করে' আরো এক-আধটা টিউশানি জোগাড় করতে পারবো। ওদিকে ভাইয়েদেরো তখন খরচ বাড়বে।

—তারপর?

শান্তি দূর ভবিষ্যতের দিকে অন্ধ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলো, কিন্তু কিছুই নজরে পড়লো না। অসহায়ের মতো হেসে উঠে বল্‌লে,—তারপর আর জানি না। ভাইয়েরা একটা-কিছু সুবিধে করে' নিতে পারলে ট্রেইনিঙেও চলে' যেতে পারি, ঠিক নেই। তখনকার কথা তখন। অতো দূরের কথা এখনো ভাবতে পারি না।

দীপ্তি হেসে বল্‌লে,—মাত্র এইটুকু তোমার ambition?

—ভাইয়েদের মানুষ করতে চাই, বলতে গেলে এর চেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জীবনে সম্প্রতি আমার আর কিছু নেই। আমার ছেলে হ'য়ে জন্মানোই উচিত ছিলো—তা হ'লে আরো কত কাজ করতে পারতাম। মেয়েদের পদে পদে কতো বাধা, কতো দারিদ্র্য।

—আর কতো প্রলোভনও।

—হ্যাঁ, প্রলোভনও কম নয়। তা আমি কোনোদিন আমোলে আনিনি, দীপ্তি। ভাই দুটিকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার নিদারুণ লোভই আমাকে পেয়ে বসেছে।

একটা বালিস কোলের ওপর কনুইয়ের তলায় দুম্‌ড়ে নিয়ে দীপ্তি বল্‌লে,—কোনোদিন তবে বিয়ে করবে না?

আধো লজ্জায় আধো বিদ্রূপে শান্তি হেসে উঠ্‌লো। বল্‌লে,—পাগল নাকি? বিয়ে করবার আমার সময় কই—আর করবোই বা কাকে? ভাই দুটিকে তবে দেখবে কে? বাবার ঋণ কোত্থেকে তবে শোধ হ'বে? মাথামুণ্ডু কী যে তুমি বলো।

দীপ্তি বল্‌লে,—তবে চিরকাল তুমি এমনি আইবুড়ো হ'য়ে থাকবে নাকি?

—আমার আবার 'চিরকালটা' তুমি কোথায় দেখ্‌লে? আগে বাঁচতে দাও তো। তা, না বাঁচলেই বা চলছে কেন? আমি ছাড়া ওদের আর কে-ই বা আছে? তা, রইলামই বা না আইবুড়ো—সংসারে আমার কাজের তো কিছু

অভাব নেই। বলে' শান্তি বিমনা হ'য়ে টেব্‌লের ওপর থেকে আরেকখানা বই কোলের ওপর টেনে নিলো।

দীপ্তি বল্‌লে,—এই বয়সে কাউকে কোনোদিন ভালোবাসো নি, শান্তি?

—আদার বেপারি, জাহাজের খবর কী করে' রাখবো বলো? অতো বাবুয়ানা কি আমাদের পোষায়? ভালোবাসা হ'লেই তো আর হ'লো না, তাকে টিঁকিয়ে রাখবার সুযোগ কই? ভগবান পৃথিবীতে সব লোককেই ত' সমস্ত কাজের জন্যে উপযুক্ত করে' পাঠান্ না। কী জানি মিল্‌টনের সেই লাইন্‌টা? "They also serve who only stand and wait." বলে' শান্তি হেসে ফেল্‌লো।

এবং সেই হাসি মেলাতে-না-মেলাতেই আলো নিভে ঘর অন্ধকার হ'য়ে গেলো।

তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে' দীপ্তি বল্‌লে,—রাত তো নেহাৎ কম হয়নি দেখছি। তোমাকে একটা চিঠি দেখাতে এসেছিলুম, শান্তি।

—কা'র? তোমার বাবার? খবর তো শুন্‌লুমই। বিয়ে কোথায় হ'বে?

দীপ্তি দরজার কাছে এগিয়ে এলো; বল্‌লে,—না, বাবারটা তো পোস্ট্ কার্ড। এটা একটা রঙিন খাম। বিয়ে ঠিক হ'বে জেনে লিখেছে।

দরজার একটা পাল্লা খুলে ধরে' দীপ্তি একটু থাম্‌লো: দেশ্‌লাই জেলে শান্তি ক্যাণ্ডেল্ ধরাচ্ছে।

টেব্‌লের ওপর ফোঁটা ফেলে মোমবাতিটা বসাতে-বসাতে শান্তি বল্‌লে,—ও-সব আমি কিছু বুঝবো না ভাই, আমাকে দেখিয়ে লাভ কী!

পল্‌তেটা খানিক পুড়ে আলোটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠতেই দেখা গেলো দীপ্তি চলে' গেছে। এবং সেই অসহ্য নির্জনতায় করবার কিছুই না পেয়ে হাতের হাওয়ায় শান্তি আলোটা নিবিয়ে দিলো। আবার সেই অন্ধকার। দক্ষিণের জান্‌লার পাখির ফাঁক দিয়ে ও-বাড়ির ঘরের আলো একটু-একটু দেখা যায়।

দরজা বন্ধ করে' শান্তি শুধুনি শুয়ে পড়লো।

এই অন্ধকারে সে যেন তার নিজের চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে।

স্কুলে ঢুকেইছিলো সে বেশি বয়সে, এবং তারপর ম্যাট্রিক যখন সে পাস্ করলে তখন তার বাবা তাকে হঠাৎ পাত্রস্থ করবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন। গাঁয়ের লোকদের প্ররোচনা একটু ছিলো বটে, কিন্তু বাবার মত ছিলো অভিমাত্রায় মৌলিক ও অসাধারণ। মেয়েদের লেখাপড়া-শেখার মোটেই তিনি বিরোধী নন্, বরং লেখা-পড়া শিখলেই তারা পারিবারিক জীবনে লাবণ্য বিস্তার করতে পারবে; কিন্তু সেইদিক থেকেই মেয়ের শিক্ষানুরাগকে তিনি নিজ হাতে নষ্ট করতে চান্ নি। তাড়াতাড়ি তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে চাচ্ছেন এই ভেবে যে শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে জীবনে মাধুর্য্য এলেও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে শরীরের লাবণ্য যাবে বিবর্ণ হ'য়ে। একমাত্র সাড়ি পরে' নারী বলে' পরিচিতা হওয়াটাই হচ্ছে আধুনিক শিক্ষার বিড়ম্বনা। তাই বয়সের স্বাভাবিক সম্পদে দেউলে হ'বার আগেই মেয়েকে তিনি পার করতে চান্।

সে-আশা তাঁর পূর্ণ হ'লো না। মেয়ে দেখাবার আগেই তিনি মারা গেলেন।

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে' শান্তি সেই সব কথাই এখন ভাবছিলো। বাবা সেই ফাঁড়াটা উৎরে গেলে এতোদিনে সে নিশ্চয়ই কোন্ সে অপরিচিত পুরুষের দাসত্ব করতে গেছে। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন, এই বহুবিশ্রুত নীতি-কথাটা এখনেই বা সে খাটাতে যাবে না কেন? বিয়ে হ'য়ে গেলে জীবন-সংগ্রামের এই কঠিন ও নিষ্ঠুর আনন্দ থেকে সে চিরদিন বঞ্চিত হ'য়ে থাকতো। তার স্নায়ু তখন শিথিল, দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ও আকাঙ্ক্ষা পঙ্গু হ'য়ে গেছে। অহোরাত্র এই যে উন্মুখ যুদ্ধমত্ততা—এর তীব্র স্বাদ তা হ'লে সে পেতো না। সে যে এতো ত্যাগ করতে পারে, এতো সহ্য করতে পারে, এতো প্রতীক্ষা করতে পারে—নিজেকে অলক্ষ্যে এই আবিষ্কার করার অহঙ্কার সে পেতো কী করে'? সংসারে সেই প্রবল মৃত্যু তাকে উলঙ্গ জীবনের সামনে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে এই নির্লজ্জ সঙ্ঘর্ষে শান্তি ক্ষণে-ক্ষণে নূতন শক্তি সংগ্রহ করছে। কিছুতেই সে হারবে না—এই তার প্রতিজ্ঞা।

বিয়েটা তার জীবনের পক্ষে সামান্য একটা ব্লাউজের প্যাটার্নের মতো তুচ্ছ বাবুগিরি মাত্র—তার চেয়ে কতো বড়ো অসাধ্যসাধন তাকে করতে হ'বে। সে এখন পরিপূর্ণ একটি ব্যক্তি, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, আপনাতে আপনি পরিচিত। সে নিজেই নিজের সারথি। কারুর সে সম্পূরক নয়, কারুর সাহায্যপ্রার্থিনী হ'য়ে সে ঘুচে নামে নি, এবং এই একাই তাকে যুদ্ধজয় করতে হ'বে।

অনেক ক্লান্তি, অনেক অবসাদ—তা হোক্—তবু ভাইবোনের সেই একমাত্র দিদি, মাসান্তে মা তার মাইনের ঐ ক'টি টাকার জন্যে চেয়ে আছেন। বাবার ওপের টাকাটা শান্তি নিজের নামে লিখে নিয়েছে—তা পরিশোধ করে' তবে সে পরিষ্কার করে' নিজের দিকে চাইতে পারবে। মোহনের পড়া-শোনায় মন্ নেই, ছোটখাটো একটা মাষ্টার রেখে দিলে ভালো হয়। আসছে মাসে কিছু ছিট কিনে ওদের দুটো সার্ট তৈরি করে' দিতে হ'বে। মা তো তাঁর নিজের অভাবের কথা কিছুই লেখেন না, কিছু লিখতে গেলে উল্টে তাকেই তিনি ভালো দেখে একজোড়া সাড়ি কিন্তে বলেন, হাতের মোটা রুলি দু'গাছ ভাঙিয়ে সরু করে' চার গাছ চুড়ি যেন সে তৈরি করিয়ে নেয়—বাবির টাকা আস্তে-আস্তে শোধ করে' দিলেই চল্‌বে। তার চেয়ে সেই টাকায় বাড়িতে একটা চাকর রাখলে কাজ দিতো। দু' বেলা রান্না করে' মাকে আবার বাসন মাজতে হ'তো না।

অন্ধকারে কখন সে তার গ্রামে চলে' গিয়েছিলো, পাশের বাড়িতে কিসের একটা শব্দ হ'তেই শান্তি আবার নিজের কাছে ফিরে এলো। চট্ করে' মনে পড়ে' গেলো আজ শনিবার—রাত এগারোটা কখন বেজে গেছে। হঠাৎ খুসি হ'য়ে উঠে বিছানা ছেড়ে আস্তে-আস্তে দক্ষিণের জান্‌লার ছিট্‌কিনি তুলে সামান্য একটু ফাঁক করলে। হ্যাঁ, আজকেই তো তাঁর ফেরবার কথা।

এখনো তিনি ফেরেন নি। বউটি মেঝের ওপর ছেলেকে কোলে করে' বসে' ঝিনুকে করে' দুধ খাওয়াচ্ছে। বাটির দুধের চেয়ে বুকের দুধের জন্যেই ছেলেটির বেশি লোভ, দুর্বল ক'টি আঙুল মেলে মার বুকের কাপড়ের কাছে আঁকুপাকু করছে। বউটি বাটির গায়ে ঝিনুকের শব্দ করে'-করে' ছেলেকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করছে, আর সুর করে' ছড়া কাট্‌ছে :

দেরা, বাও করো রে,
খোকার দুধ জুড়িয়ে যাও।

একপাশে পেতলের টোপে ভাত ঢাকা, সাম্‌নে পাড়-মোড়া চটের একখানি আসন, কলাই-করা ছোট্ট একটি প্লেটে পাৎলা করে' দু'খানা নেবু কাটা আর একটু নুন। স্বামী তার এক্ষুনি এসে পড়বেন। ব্যাণ্ডেলে না সাঁৎরাগাছিতে কোথায় নাকি ইষ্টিশানে কি কাজ করেন, শনিবারের কাজ চুকিয়ে রাত্রে তিনি বাড়ি ফেরেন। শনিবারের রাত্রি আর রবিবারের সমস্তটা দিন—রাত দশটা বাজতে না বাজতেই আবার তাঁর পাততাড়ি গুটোতে হয়—সেই ভোরবেলায় তাঁর ডিউটি। সপ্তাহান্তে এই ক'টি ঘণ্টার মাত্র সান্নিধ্য। তারি জন্যে বউটি প্রতিমুহূর্ত মুহূর্ত গোণে। আগেভাগেই ছেলেকে দুধ খাইয়ে জামা ছাড়িয়ে বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে রাখে—পাছে তার নির্বোধ দৌরাত্ম্যে তাদের এই প্রতীক্ষাপ্রখর মিলনের আনন্দে কোনো ব্যাঘাত না হয়। অন্ন একটু পাখি তুলে শান্তি চোরের মতো চুপিচুপি সেই দৃশ্যটি আনুপূর্বিক অনুধাবন করে। শনিবারের রাত্রে কখন সেই স্বামীটি ফিরে আসেন তারই প্রতীক্ষায় ঐ বউটির মতো সে জেগে থাকে, ঘুমুতে যেতে পারে না।

তারপর সিঁড়িতে জুতোর শব্দ করতে-করতে যখন তিনি আসেন, বউটির মতো তারো সর্বাঙ্গ সহসা আনন্দে ও আশায় আন্দোলিত হ'য়ে ওঠে। মূর্তিটা ঘরের মধ্যে আবির্ভূত হ'তেই বউটি তার অতি-প্রগল্‌ভ আনন্দ লুকোবার লজ্জায় স্বামীরই বুকের মধ্যে মুখ ঢাকে—সেই পরিপূর্ণ, পরুষ আলিঙ্গনের তাপ সহসা শান্তিকে ঘিরে নির্জীব অন্ধকারের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। মিলনের প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটা কাটিয়ে উঠ্‌তেই স্বামী ওপরের জামাটা খুলে ফেলে পেছনের বারান্দায় চলে' যান্—আগেই সেখানে বউটি বাল্‌তি ভরে' জল ও সোপ্‌কেস্‌এ সাবান সাজিয়ে রেখেছে—তোয়ালেখানা হাতে নিয়ে সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর স্বামী খেতে বসেন—বাটি-উপুড়-করা ভাত তাঁর আঙুলের চাপে ভেঙে-ভেঙে পড়ে, আর পাশে বসে' বউটি আস্তে-

আস্তে পাখা করে। কতো কি-সব খুঁটিনাটি কথা—রেণু-ইস্টীশানের গল্প, কোথায় কি নতুন লাইন বস্‌ছে, কবে সেদিন একটা কুলি-কামিন ট্রেনে কাটা পড়লো। বউটির পুঁজিতেও গল্প কম নেই,—খোকার ওড়াওড়া কেমন এখন স্পষ্ট মা হ'য়ে উঠেছে, সুতো দিয়ে মশারির সঙ্গে রঙিন একটা বল ঝুলিয়ে দিলে কেমন সে হাত-পা তুলে হাসে, ফিডিং-বোতল কিছুতেই সে মুখে তুলবে না। তারপর খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেলেই দেখতে-না-দেখতে দরজায় খিল পড়ে, টুপ্ করে' সুইচ্‌টা উঁচু-মুখো ঠেলে দিয়ে স্বামী আলো নিভিয়ে দেন। তখন শান্তির ঘরেও আগাগোড়া অন্ধকার।

বউটি কতো সুখেই না আছে। তার জীবনটা আগাগোড়া সমতল, একেবারে স্বচ্ছন্দ। কোথাও এতোটুকু বাধা নেই, ছন্দচ্যুতি নেই—একটানা তাটিয়াল একটি সুর। যা কিছু সে ক্ষয় করে তারই গৌরবে ধীরে-ধীরে সে পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। নিজেকে নিঃশেষ করে'ও সে রিক্ত হয় না।

কথাটা আজ এখন মনে হ'তেই শান্তি আর-দিনের মতো ধড়মড় করে' উঠেছিলো, কিন্তু ব্যাপারটা কেমন-যেন তার আজ ভারি বিস্বাদ ঠেক্‌লো। পুরুষ হ'য়ে জন্মানোই তার উচিত ছিলো, তা হ'লে এমনি উদার বিশ্বাসে বউটি কখনোই তাদের ঘরের এই জান্‌লাটা খোলা রাখতো না। তা ছাড়া লুকিয়ে এই দুষ্ট কল্পনায় অনুরঞ্জিত করে' রোমাঞ্চিত হ'বার লজ্জা তাকে বারে-বারে আজ দংশন করতে লাগ্‌লো। ঐ পরিমিত সীমা-বদ্ধ তুচ্ছ জীবন-যাপনে কোথায় কী অহঙ্কার!

শান্তি জান্‌লাটা বন্ধ করে' টেব্‌লের ওপর ফের আলো জ্বালালো। আলোটা নিতান্ত সামনে বলে' দেয়ালে তার মুখের অতিকায় একটা ছায়া পড়েছে। সেই ছায়ার দিকে তাকিয়ে শান্তি স্তব্ধ হ'য়ে বসে' রইলো। দেখ্‌তে সে কুৎসিত তা সে জানে, কিন্তু সে যে কতো শূন্য এই ছায়ার দিকে তাকিয়ে সে আজ বুঝতে পারলো। নিজেকে সে যেন এখন মুখোমুখি দেখতে পাচ্ছে,—হাতের ঝাপ্‌টায় তাড়াতাড়ি সে আলো নিভিয়ে দিলে। এখুনি বউটির স্বামী এসে পড়বেন,—সময় এই হ'য়ে এলো। তারপর তাদের সেই অনর্গল হাসি আর কথা, এবং কথা থেমে গেলে তাদের সেই স্পর্শময় নিঃশব্দ উপস্থিতি। তাঁর বাড়ি পৌঁছুবার আগেই তাকে ঘুমিয়ে পড়তে হ'বে।

তবু, দেহ-সম্পদে হোক্ সে কুরূপা, তার সৌন্দর্য্য একমাত্র তার এই নির্ভীক বলশালিতায়, এই নিষ্ঠুর রূপোল্লাসে। জীবনকে সে গোলাপের বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে রাখেনি, ঝড়ের আকাশে অবারিত বিদ্যুৎ-দীপ্তির মাঝে মুক্তি দিয়েছে। এতো সহজে পরাজয় স্বীকার করলে তার চলবে কেন? ঐ পরিমিত তুচ্ছ জীবন নিয়ে সে কী করবে?

শিয়রের বইগুলির ওপর অতি যত্নে বাঁ হাতখানি মেলে দিয়ে শান্তি আস্তে-আস্তে ঘুমিয়ে পড়লো।

সকাল হ'তেই তাদের কলেজ—চোখে-মুখে জল দিয়ে আঁচলটা দু'হাতে বুকের ওপর সামান্য একটু পাট্ করে' এক মাথা রুখু চুল নিয়েই সে বেরিয়ে পড়ে। হস্‌টেলে ফিরে আস্‌তে-আস্‌তে সাড়ে ন'টা। আধঘণ্টার মধ্যে স্নান, খাওয়া, বেশবাস। বেশবাসের মধ্যে পায়ত-পক্ষে সাড়িটা বদ্‌লে নেয়, ভিজে চুলগুলিতেই ফাঁস একটা গেরো দিয়ে মাথার ওপর ছোট্ট করে' একটি ঘোম্‌টা তুলে দেয়, হাতে একটা চামড়ার সস্তা ব্যাগ নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। ক'দিন মুচির একটাও দেখা নেই, জুতোর ঘুটি দুটো কবে ছিঁড়ে পড়ে' আছে।

সেই চিত্তরঞ্জন এভিনিয়ু থেকে একফালি একটা গলি বেরিয়েছে—তাইতেই কর্পোরেসান্‌এর সেই স্কুল। বাস্ নেবার সুবিধে নেই—এক, রিক্‌সা। রোজ-রোজ অতো পয়সা সে কোথায় পাবে? অগত্যা হেঁটেই সে যায়, আসেও তেমনি হেঁটে। চারটেয় তার ছুটি—কখনো-কখনো আগেই বেরিয়ে পড়ে। আগে বেরিয়ে পড়লে সোজা সে হস্‌টেলে চলে' আসে, চারটেয় বেরুলে সোজা সে বিডন্ ষ্ট্রীটে পড়ে' তার টিউশানির জায়গায় গিয়ে হাজির হয়। তা, সপ্তাহের মধ্যে যদি দুটো দিন সে দুপুর-বেলা হস্‌টেলে ফিরে একটু জিরিয়ে নিতে পারে। এক শনিবার আর বুধবার।

আর-আর দিন চারটের পর চিত্তরঞ্জন এভিনিয়ু ধরে' বিডন্-ষ্ট্রীটের দিকে যাবার বেলায় শান্তি টের পায় তার

পেছনে কারা তাকে সমানে অনুসরণ করছে। প্রথম-প্রথম সে তা মোটে আমোলেই আনে নি, কিন্তু পদক্ষেপের দ্রুততা বাড়িয়ে তারা যখন ক্রমে-ক্রমে তার সন্নিহিত হ'বার চেষ্টা করতে লাগ্‌লো তখন রীতিমতো সে অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লো। একে-অন্যের মধ্যে কী-সব খোলাখুলি কথা বলে, অন্য চিন্তায় মনকে শত ব্যাপৃত রাখলেও কানে তার কতক এসে ঢোকেই—এবং সে-ই যে তাদের আলোচনার বিষয়ীভূত, তাতে আর তার সন্দেহ থাকে না।

রাগে-দুঃখে শান্তির চোখে জল এসে পড়ে। কিন্তু নিঃশব্দে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কী করবার আছে! জীবনে কতো বড়ো ব্যর্থতাকেই সে হাসিমুখে স্বীকার করে' নিয়েছে, আর এই ক্ষান্তিকর অনাহূত অপমানের সে পাশ কাটাতে পারবে না? জীবন-যুদ্ধে সে একাকিনী, পথে কোথাও তার সঙ্গী নেই, সে নিতান্ত নিঃস্ব ও নিরালা—তাই তারা তাকে এমন অসম্মান করতে সাহস করছে, কিন্তু নীরব উপেক্ষা ছাড়া এই অপমানের কী প্রতিবিধান হ'তে পারে!

কানকে সমস্তক্ষণের জন্যে কালা করে' রাখা অসম্ভব—তা ছাড়া লোকগুলি এতো ঘেঁসে যাচ্ছে যে তাদের উপস্থিতিকে আর উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তাদের এগিয়ে দেবার জন্যে শান্তি দাঁড়িয়ে পড়লো। কিন্তু অসাধারণ তাদের বাধ্যতা—তারাও তেমনি থেমে পড়েছে। এবার তাদের দিকে চোখ না-ফেরানোই শান্তির পক্ষে অসম্ভব ছিলো। দুটো লোক—পোষাকে ভদ্রতা থাকলেও চেহারায় বিন্দুমাত্র শালীনতা নেই। তাদের দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত গা ঘি-ঘি করতে লাগ্‌লো, কিন্তু ফুটপাতের এক ধারে চুপ করে' দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া সে কী করতে পারে?

সামনে দিয়ে একটা রিক্‌সা যেতে দেখে শান্তি তাড়াতাড়ি সেটাকে হাত তুলে ডেকে দাঁড় করালে, দরাদরি না করে'ই লোক্সা উঠে বস্‌লো। খানিকদূর আসতেই টের পেলো তারাও একটা রিক্‌সা নিয়ে পিছু-পিছু আসছে, আর সামনের রিক্‌সাটাকে ধরবার জন্যে তারা রিক্‌সাওয়ালাকে প্রবলকণ্ঠে উৎসাহিত করছে। পেছনের রিক্‌সাটা একেবারে শান্তির পাশে এসে পড়লো। তখন কোলের ওপর বই মেলে ধরে' ঘাড় হেঁট করে' রুদ্ধ নিশ্বাসে তা পড়া ছাড়া তার পথ থাকে না। এখানেও এই বই-ই তাকে রক্ষা করে।

কিন্তু রোজ-রোজ এমনি রিক্‌সা করে' যাওয়াও অসম্ভব। অন্য শনিবার ও বুধবার ছাড়া (সেদিন তার দুপুরেই ছুটি হ'য়ে যায়, এবং কখন সে পড়াতে যায় ঠিক তারা হদিস্ পায় না বলে') প্রত্যহই তাদের রাস্তায় এই হাজিরা দেওয়া চাই। ঘামতে-ঘামতে শান্তি পথ ভাঙে, এবং ছেলে হ'য়ে জন্মানোই যে তার কতো উচিত ছিলো তা ভেবে চোখে তার জল এসে পড়ে। তা হ'লে সহজেই সে এই অন্যায় কদাচারকে শাসন করতে পারতো—এমনি করে' নির্লজ্জের মতো হাসতে দিতো না।

হয়েছেই বা না মেয়ে—তাই বলে' এমনি মুখ বুঁজে সে অপমান হজম করবে নাকি? পুরুষের মতোই সে স্বাধীন, এবং এই স্বাধীনতার সম্মান তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'বে নিজেরই দৈহিক শক্তিতে। একেক সময় হঠাৎ পেছন ফিরে সমস্ত ভঙ্গিটা কঠিন করে' ঐ লোক দুটোকে তাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, ইচ্ছে হয় মুহূর্তমাত্র প্রস্তুত হ'বার সুযোগ না দিয়ে একটার গাল বাড়িয়ে প্রকাণ্ড একটা চড় মেরে বসে—কথাটা মনে হ'তেই শান্তির কেমন হাসি পায়—এবং ঐ অভিনয়ের কোন্ দৃশ্যে যে যবনিকা পড়বে ভাবতে গিয়ে সারা গা তার শিউরে ওঠে। প্রথমে একটা তুমুল হৈ-চৈ, হয় তো মেয়ে বলে' পথচারী ও পাড়ার বাসিন্দাদের সে দলে পাবে, সব কথা সজল চোখে ও শোকার্ত গলায় সবিস্তারে তাদের খুলে বল্‌তে হ'বে—সে নিতান্ত একটা ঘিয়েটোরি ঢং; তার পর নিজেদের মুখ বাঁচাতে গিয়ে ও-পক্ষও আর মুখ বুঁজে থাকবে না, কোথা দিয়ে কী বলে' বসে তার ঠিক নেই এবং ইচ্ছে করলে কী তারা বল্‌তে না পারে! তারপর শান্তিকে আবার সেই সব কথা সাড়ম্বরে খণ্ডন করতে হ'বে, অনেক-সব সাক্ষী মানতে হ'বে, অনেকদব সার্টিফিকেট্ দেখাতে হ'বে—ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত ফৌজদারি দাঁড়িয়ে যেতে পারে। আত্মরক্ষা করতে গিয়ে ছেলেকারির আর অন্ত থাকবে না, আত্মরক্ষা করতে গিয়ে চাকরিটি সে বাঁচিয়ে রাখতে পারে কি না সন্দেহ।

বিড়ন্ স্কোয়ারের কাছাকাছি এসে তবে তার টিউশানির জায়গা। বাড়ির মধ্যে সোজা ঢুকে পড়ে' শান্তি হাঁপ

ছেড়ে বাঁচে। লোকদু'টো আস্তে-আস্তে তখন সরে' পড়ে।

শান্তি হাতের ছাতাটা ও পায়ের জুতো জোড়া সিঁড়ির নিচে রেখে ওপরে উঠে যায়। প্রকাণ্ড কৌচের ওপর পা এলিয়ে দিয়ে সরমা হাই-বুকখানা নাড়া-চাড়া করছে।

বড়-লোকের ঘরের বউ—বয়েস এই ষোলো-সতেরো হ'বে, কিন্তু সমস্ত দেহ ভরে' তার উত্তাল রূপ, রেখার বন্ধন উত্তীর্ণ হ'য়ে ভঙ্গিতে উথ্‌লে পড়ছে। মেয়েও বড়ো ঘরের—এতো দিন লাবণ্যচর্চ্চা ছাড়া আর-কিছুতে তার হাত পাকে নি। নতুন বিয়ে হয়েছে—স্বামী আর-কর আফিসের বড়ো চাকুরে। তাঁর ইচ্ছা ইংরিজি-ভাষার কয়েকটি অন্তত ছিটে-ফোঁটা সরমার পাতে পড়ুক। অন্তত তার সঙ্গে আলাপ করবার সময় তিনি যেন দুয়েকটা নতুন কথা পান্। একটু যেন মুখ-ফোটানো চলে।

অন্য সময় শান্তির সুবিধে হয় না বলে' এই বিকেলের দিকটাই সে বেছে নিয়েছে। সরমা এই সময় তাকে চা এনে দেয়, কতো রাজ্যের খাবার, কতো রকম সাধ্যসাধনা করে, অথচ নিজে এক কামড় খাবে না। আপিস্ থেকে স্বামী বাড়ি ফিরলে তবে তাঁর সঙ্গে তারো ব্যবস্থা হ'বে। আর, শান্তিই কি না এতো সহজে তার এই শিক্ষয়িত্রীর সম্মান খোয়াতে বসেছে! জলখাবারের ধার দিয়েও সে যায় না, ভঙ্গিতে অবিচল একটি কাঠিন্য এনে সে দূরত্ব বজায় রাখে, টেব্‌লের ওপর বইটা মেলে ধরে' সে বলে: কাল্‌কের পড়া তৈরি হয়েছে তো? বানান্ করুন্—

সরমা কিস্ করে' হেসে বলে: কখন তৈরি করবো বলুন দিকি। সারা সকালটা শুধু-শুধু উনি আমার সঙ্গে ঝগড়া করলেন। মিছিমিছি অমন ঝগড়া করলে মেজাজ কারো কখনো ভালো থাকে? আমিও বিলুথ কথা শুনিয়ে। মন ভারি খারাপ হ'য়ে গেলো। সারা দুপুর বই আর ছুঁতে পারলুম না।

শান্তি বলে: তবে ডিক্‌টেসান্ নিন্।

সরমা শব্দ করে' হেসে ওঠে; বলে: আপনি অমনি দারোগার মতো মুখ করে' থাকলে আমার ভয় করে। ডিক্‌টেসান্ নিয়ে কী হ'বে?

—না, কিছুই আপনার প্রোগ্রেস্ হচ্ছে না।

—ভীষণ হচ্ছে, বাইরে থেকে আপনি কিছু টের পান্ না। আমাকে কাল উনি চীনে-হোটেলে নিয়ে গিয়েছিলেন, ধস্তরমতো ছাম্‌এ কামড় দিয়ে এসেছি—শ্বশুরঠাকুর শুন্‌লে আমাদের আর আস্ত রাখবেন না।

তবু বস্‌বার ভঙ্গিটা একটুও কোমল না করে' শান্তি নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে: কিন্তু আমার তো একটা কাজ করতে হ'বে, নিন্, লিখুন।

—বা, আপনি যে রোজ রান্না করে' আসেন এই তো আপনার কাজ। এই গাধা পিটিয়ে মানুষ করার অনর্থক কষ্ট করতে যাবেন কেন? বসে'-বসে' আমার সঙ্গে গল্প করলেই তো পারেন—দিব্যি সময় কাটে।

আর গল্প করতে গেলেই তো সরমার স্বামী ছাড়া কোনো কথা নেই। শিক্ষয়িত্রী বলে' শান্তিকে সে এতোটুকু গুরুত্বের মর্য্যাদা দেয় না। ভঙ্গিটা অমন উদাসীন ও রুক্ষ করে' না রাখলে পুলিতে সরমা কখন তারই কোলের ওপর উছ্‌লে পড়তো।

শান্তি বলে: কিন্তু আমাকে তো এমনি বসে' থাকার জন্যে রাখা হয় নি।

সরমা কৌচের ওপর আরো একটু বিস্তৃত হ'য়ে বসবার ভঙ্গিটা শিথিল ও নরম করে' আনে; বলে: আপনিও যেমন, বসে' থাকলেই বা আপনাকে কে তাড়ায়! ফাঁকি দিতে না পারলে কর্ত্তব্যকাজে সত্যিই কোনো সুখ নেই। আর আপনাকে সত্যি বলছি শান্তি-দি, আমার মাথায় ও-সব মাথামুণ্ডু কিচ্ছু ঢোকে না।

শান্তি হাসি চাপতে গিয়ে মুখ আরো গম্ভীর করে' তোলে।

টেব্‌লের ওপর থেকে বই-খাতা ঠেলে দিয়ে সরমা বলে: কী হ'বে এ-সব ছাই-পাঁশ মাথায় ঢুকিয়ে। ওঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে আমার এই বাঙলা ভাষাই যথেষ্ট। আর বাঙলা ভাষা কতো যে মিষ্টি! আপনাদের মতো অমনি গ্যাড্‌ম্যাড্ করতে গেলেই হয়েছে—গানের আসরে গদা-হস্তে ভীমের প্রবেশের মতো সব মাটি হ'য়ে যাবে।

আবার বলে: আমার তো আর পেটের ধান্ধায় চাকরি খুঁজতে হ'বে না, চাকরি তো আমি পেয়েই গেছি—একেবারে ইম্পিরিয়্যাল সার্ভিস্, কী বলেন? মিছিমিছি কী হ'বে এ-সব হাঙ্গাম-হজ্জৎ করে'?

এমন সময় আপিস থেকে সরমার স্বামী ফিরে আসেন।

সরমাকে মাষ্টারের কাছে পড়তে দেখে ঘরের মধ্যে দ্রুত একটা উঁকি মেরেই তিনি তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে ঢোকেন। অরুণো বসন্তের আবির্ভাবের মতো, সরমার সারা দেহে যৌবন সহসা ঊর্ম্মি চূড়ার মতো আলোড়িত হ'য়ে ওঠে।

অভিভাবক কাছেই উপস্থিত ভেবে শান্তি অতিমাত্রায় ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে, তাড়াতাড়ি বই-খাতা টেনে এনে প্রায় ধমক দিয়ে বলে: নিন্ এবার, কোনোদিনই পড়া আপনি তৈরি করবেন না। এ রকম করলে কী করে' চলে বলুন্। নিন্।

দু' হাত তুলে আড়মোড়া ভেঙে সরমা বলে: আজ থাক্, শান্তি-দি। আমি এবার উঠি।

—এখুনি উঠ্‌বেন কি? এক লাইনো আপনার পড়া হয় নি। বসুন্।

—আপনি কিচ্ছু বোঝেন না, শান্তি-দি। আমার পড়ায় অমনোযোগের জন্যে যার কাছে আপনি নালিশ করছেন, পড়া বন্ধ করলে সব চেয়ে তিনিই যে বেশি খুসি হ'বেন। এইমাত্র আপিস্ থেকে ফিরলেন, এখন চারদিকে ঘরের শুকনো দেয়াল দেখলে কখনো ভালো লাগে? আপনিই বলুন না। তা ছাড়া, উনি যে আপিস থেকে ফিরলেন সে-খবরটা ঢাক পিটিয়ে রাষ্ট্র করার চালাকিটা ওঁর ধরতে পেরেছেন তো? অমন লোকের জন্যে মায়া না করে' পারে? বলে' সরমা উঠে পড়লো।

শান্তি কঠিন হ'য়ে বলে: কিন্তু আমি যে এসেছি—আধ ঘণ্টাও হয় নি।

—ভালোই ত'। সরমা খুসিতে টল্‌মল্ করতে থাকে: আপনার খাটুনিই বরং বেঁচে যাচ্ছে,—আমারো। আধ ঘণ্টাই চের, যেন কাটতে চায় না—কখন উনি আপিস্ থেকে ফেরেন!

শান্তি বলে: অন্য সময় বদ্‌লে নেবার সুবিধে হ'লে—

—খবরদার ওটি করবেন না, শান্তি-দি। আমারই যে সময় হ'বে না। আপিস্ থেকে ফেরার চাইতে আপিসে যাবার বেলায়ই যে বেশি সমারোহ। তারপর আজকাল আবার কথায়-কথায় রাগ করতে শিখেছেন। কী হ'বে এই সব পড়ে'-শুনে দিগ্‌গজ হ'য়ে? বলে' চঞ্চল পায়ে কতোদূর এগিয়ে সহসা সে থেমে বলে: এবার তবে যাই, শান্তি-দি, ওঁর জলখাবারের বন্দোবস্ত করতে হ'বে।

পরদাটা গায়ের সঙ্গে লেপ্‌টে নিয়ে সরমা ছেলেমানুষের মতো হাসতে-হাস্‌তে বেরিয়ে যায়, পরদাটা আবার নিজের জায়গায় এসে স্থির হয়।

ঘণ্টা খানেক হয়তো কাটে। কি-একটা কাজে সরমা ফের পড়ার ঘরে ঢুকে পড়ে। দেখে, চেয়ারটায় তখনো শান্তি চুপ করে' বসে' আছে—মুখ-চোখ অত্যন্ত ম্লান, যেন কি-একটা মারাত্মক অসুখ থেকে এই উঠে এসেছে। সরমা চম্‌কে উঠে বলে: এ কি শান্তি-দি, আপনি এখনো যান্‌নি?

কোলের বইটা হঠাৎ ক্ষিপ্র হাতে ঘাঁটতে সুরু করে' নিতান্ত লজ্জিত মুখে শান্তি বলে: না, এই বসে'-বসে' একটু পড়ছিলাম। হস্টেলে যা গোলমাল—একদম্ পড়া হয় না, তা ছাড়া সময়ো আমার কম। এই, এবার উঠি। বলে' কুণ্ঠিত মুখে সে উঠে পড়ে।

সরমার দিকে না তাকিয়ে পারে না; বলে: কোথাও এখুনি বেরুচ্ছেন নাকি?

—হ্যাঁ, ফের ভাব হ'য়ে গেলো কি না, তাই আমাকে নিয়ে তাঁর বায়স্কোপে যাবার সখ হয়েছে। দু'পা এগিয়ে এসে নিতান্ত সরল ছেলেমানুষের মতো সরমা বলে: আপনিও যাবেন, শান্তি-দি?

শান্তি থেমে পড়ে: দূর বোকা মেয়ে।

—বা, বাড়ি-শুদ্ধ সবাইকে ফেলে আমিও যেন ওঁর সঙ্গে ট্যাং-ট্যাং করে' একা-একা যাচ্ছি আর-কি। ননদরাও সঙ্গে যাচ্ছেন। আপনিও চলুন না।

এ-কথার কোনো উত্তর দরকার করে না। ম্লান একটু হেসে শান্তি আস্তে-আস্তে নেমে যায়।

ফেরবার সময় সেই লোক দুটোর উৎপাত আর থাকে না,—ও-বাড়ি থেকে কখন সে ঠিক বেরুবে তা জান্‌তে পারে না বলে'ই তাদের ধৈর্য্য আর কুলিয়ে ওঠে না, কখন আবার সরে' পড়ে। শান্তি সামনের দিকে চেয়ে দ্রুত পায়ে সমানে হাঁটতে থাকে। এক-একবার ইচ্ছা করে এই টিউশানিটা সে ছেড়ে দেয়, লোক দুটোর অভদ্র আচরণে অনন্যোপায় হ'য়ে নয়, সরমারই জন্যে। পড়তে যে চায় না, তার আবার এ কোন্ দিশি বাবুয়ানা?

তার প্রগল্‌ভতাকে প্রশ্রয় দেবার এ কী চমৎকার কৌশল বের করা হয়েছে! যেন তার মুখে তার স্বামীর গল্প শোনবার জন্যেই মাসে-মাসে সে মাইনে পাচ্ছে!

কিন্তু তবু কুড়িটে করে' টাকা। মোহন আর মিণ্টুর স্কুল-মাইনে, জামা-জুতো,—কতো কী! তার জন্যে কী না সে সহ্য করতে রাজি আছে, মাত্র তো নির্বোধ বর্বর লোকের অসম্মানসূচক ইঙ্গিত, মাত্র তো স্বামীর প্রতি সরমার সেই পূর্ণোচ্ছ্বসিত স্নেহ!

তারপর একদিন সেই লোক দুটোর উৎসাহ অত্যন্ত বেড়ে গেলো, পেছন থেকে একজন আল্‌তো করে' শান্তির আঁচলটা টেনে ধরলো।

শান্তি কী করবে কিছু ঠিক করবার আগেই অন্যদিকের ফুটপাত থেকে একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবক সাঁ করে' এই পারে ছুটে এলো—হাতে তার একটা চেন-বাঁধা কুকুর। কিছু জিগ্‌গেস করবার আগেই লোক দুটো পাশের গলি দিয়ে সরে' পড়েছে।

লজ্জায় শান্তি তখন মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। যুবক জিগ্‌গেস করলে: কী ব্যাপার?

শান্তি ম্লিয় গলায় বল্‌লে,—আমার সঙ্গে একটু চলুন, বলছি। এখানে এখুনি ভিড় জমতে সুরু করেছে।

ফুটপাত ধরে' বিডন্‌স্ট্রিটের দিকে এগোতে-এগোতে যুবক বল্‌লে,—তখন থেকে দেখছি আপনি 'ফলোড্' হচ্ছেন, লোক দুটো কে?

—ক' মাস থেকেই আমাকে এমনি ওরা জ্বালাতন করে। ঐ প্রাইমারি ইস্কুলটায় আমি টিচারি করি, এ-সময়টায় ইস্কুল ছুটি হ'লে টিউসানি করতে যেতে হয়, সেই প্রায় বিডন্-স্কোয়ারের কাছে। আর রোজ ঐ দুটো লোক আমার পেছনে হাঁটতে থাকে।

—বলেন কি! ক' মাস থেকে! লোক দুটো যে ক্লীন্ ভেগে পড়লো। আমি এক্ষুনি ওদের কুকুর লেলিয়ে দিতাম। কিছু শিক্ষাই যে ওদের দে'য়া হ'ল না।

শান্তি আরক্ত হ'য়ে বল্‌লে,—আপনাকে আসতে দেখেই সরে' পড়েছে। বোধহয় এইবার চুপ করে' যাবে।

—না, বলা যায় না। দেখি, কী করতে পারি, বের আমি ওদের করবোই। আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন?

—আমার সেই টিউশানিতে।

—চলুন। সঙ্গে একটা দারোয়ান নিতে পারেন না?

—ইস্কুল থেকে নিলে তাকে আমার এক্‌স্ট্রা দিতে হয়। আর, এইটুকুন তো মাত্র পথ।

—আপনাকে একা-একা এমনি আসা-যাওয়া করতে দেখেই ওদের এই বেজাতীয় সাহস বেড়েছে। দেখি, আমি ওদের ছাড়ছি না।

দু'জনে বিডন্‌স্ট্রিটে পড়ে' নিঃশব্দে আরো খানিকক্ষণ হেঁটে এলো। হঠাৎ থেমে পড়ে' যুবক বল্‌লে,—এই হচ্ছে আমাদের বাড়ি, আর আমার নাম হচ্ছে রণেন মজুমদার।

কথাটা এমন সুরে বলা হ'লো যেন রণেন এক্ষুনি বিদায় নিয়ে তার বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়বে। শান্তি আরেকটু হ'লে নমস্কার করতে হাত তুলছিলো, কিন্তু রণেন তার সঙ্গে-সঙ্গেই আসছে।

শান্তির ইচ্ছা হ'লো বলে—আর কেন উনি কষ্ট করে' আসছেন? কিন্তু এ নিতান্তই প্রাণহীন ভদ্রতার মতো শোনাবে—অন্তত যে তাকে এই বিপদ ও লজ্জা থেকে উদ্ধার করলো ও যে পাশে আছে বলে' তার এখন রীতিমতো সাহস হচ্ছে, তার প্রতি এই মিথ্যা ও মামুলি চাটুবাদটা তার মানায় না।

আরো খানিকটা রাস্তা নিঃশব্দে অতিবাহিত হ'লো। শান্তি ফিরে দাঁড়িয়ে নরম গলায় বল্‌লে,—এই বাড়িতে আমি পড়াই। আচ্ছা, আসি, নমস্কার। বলে' সুন্দর করে' একটু হেসে ছোট একটি নমস্কার করে' শান্তি ভিতরে অন্তর্হিত হ'লো।

কিন্তু আজো সরমা পড়বে না। তার আজ সর্দি করে' চোখ-মুখ ছল্‌ছল্ করছে। ইউক্যালিপ্‌টাস্-এর তেলে কিছু হচ্ছে না, গরম জিলিপিও সে ঢের খেলো, উনি এখন তাকে ফুট্-বাথ দেবেন। তারি জন্যে আগে-ভাগেই তিনি আপিস থেকে বেরিয়ে পড়েছেন।

—এ তো আপনার ভালোই হ'লো, শান্তি-দি। অনর্থক আধঘণ্টাও কাটতে দিলুম না। এখুনি আপনি পালান। পড়াবার নাম শুনলে গরম জলের গামলা নিয়ে না উনি

ভেঙে আসেন। বলে' তারি, ঘন্‌ঘনে গলায় সে অনর্গল হেসে উঠ্‌লো।

নিষ্প্রাণ গলায় শান্তি বল্‌লে,—আমার কী। আমার মাইনে পেলেই হ'লো।

—নিশ্চয়। আমরা তো ভাবছি আপনার মাইনে আরো বাড়িয়ে দেব, প্রায় রোজই কষ্ট করে' এসে শুধু-শুধু ফিরে যান। এবার থেকে যেদিন একজম্ পড়বো না শান্তি-দি, আপনাকে চিঠি লিখে জানাবো।

শান্তি হেসে বল্‌লে,—তা হ'লে রোজই আপনি একখানা চিঠি লিখবেন।

—কিম্বা এক চিঠিতেই আপনাকে একমাসের লম্বা ছুটি দেব, কেবল মাসের পয়লা তারিখে আসবেন এতোদিন প্রতীক্ষা করার দক্ষিণা নিতে! তা হ'লেই ভালো হ'তো, কিন্তু ওঁর কাছে ভিখে বেরাল সাজতে হ'বে যে। মুখোসটা ঠিক রাখতে হ'বে—নইলে বিপদ আমাদের দু'জনেরই, শান্তি-দি।

—আচ্ছা, এবার তবে আসি। বলে' নিচে নেমে জুতো পরে' ছাতা কুড়িয়ে শান্তি বাইরে চলে' এলো।

দেখলে কুকুর-হাতে রণেন তখনো দাঁড়িয়ে আছে।

শান্তি বিব্রত হ'য়ে পড়লো; বল্‌লে,—আমার জন্যে এখনো আপনি দাঁড়িয়ে আছেন নাকি?

রণেন বল্‌লে,—হ্যাঁ, চলুন, আপনাকে বাড়ি পর্য্যন্ত রেখে দিয়ে আসি। বাড়ি থেকে আসা-যাওয়ার একটা বন্দোবস্ত করতে পারেন না?

এক পা দু' পা করে' চলতে চলতে শান্তি বল্‌লে,—বাড়ি কোথায়, বাকি সেই হেদোর কাছে একটা প্রাইভেট হস্টলে। বন্দোবস্ত আর কী করবো? তা থাক্, কষ্ট করে' আপনাকে আর এগিয়ে দিতে হ'বে না, আমি একাই যেতে পারবো। এ-সময় আর কেউ উৎপাত করতে আসে না।

যেন রণেনই এখন উৎপাত সুরু করেছে এমনি ভাব দেখিয়ে শান্তি জোরে-জোরে পা ফেলতে লাগলো। রণেন বল্‌লে,—কিন্তু আমার বাড়ি পর্য্যন্ত তো আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি।

শান্তির পদক্ষেপগুলি আবার মন্থর হ'য়ে এলো।

এই তাদের বাড়ি—শান্তি স্পষ্ট তা চিনে রেখেছে। বাইরে থেকে দেখতে অট্টালিকাটা শান্তির অসম্ভব স্বপ্নের মুহূর্ত্তে উচ্চতম আকাঙ্ক্ষাকেও ছাড়িয়ে গেছে। হ্যাঁ, কুকুর নিয়ে রণেন সেই বাড়িতেই ঢুকলো।

বাকি পথটা কাটলো তার সেই মা'র কথা নিয়ে, মোহন আর মিণ্টুর ভবিষ্যতের কল্পনা করে', ছুটি হ'লে কার জন্যে সে কোন্ জিনিস কিনে নেবে সেই চিন্তায়!

তার পর দিন চারটের সময় ইস্কুল থেকে বেরিয়ে শান্তি দেখতে পেলো রণেন গেইটের কাছে কুকুর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শান্তি একটু হাসলো। রণেন বল্‌লে,—ক'দিন আমি আপনাকে একটু করে' দেখি—বেটাদের নাগাল পাই কি না।

কতো দূর এগিয়ে এসেই পেছন ফিরে তাকিয়ে শান্তি বল্‌লে,—আপনার ভয়ে ওরা আর ঘেঁসছে না, এবার ওদের ঘন্তরমতো ভয় ধরে' গেছে।

—নিশ্চয়। আসুক না এগিয়ে। রণেন তার বলিষ্ঠ হাতে কুকুরের চেন্‌টা টেনে ধরে' বল্‌লে,—এই আমার মুসোলিনিকে দেখছেন, একবার লেলিয়ে দিলেই কামড়ে একেবারে টুকরো টুকরো করে' ফেল্‌বে। তার পর পকেটে আমার এই হাণ্টার।

সত্যি শান্তির কেমন-যেন এখন অত্যন্ত নির্ভাবনা লাগে, দিব্যি অনায়াসে গল্প করতে-করতে দু'জনে তারা পথ চলতে থাকে। কুকুরটা থেকে সান্নিধ্যে একটু অন্তরাল এনে দিয়েছে।

শান্তি একদিন বল্‌লে,—কিন্তু আপনি চলে' গেলেই আবার হয়তো সূর্য্য-চন্দ্র দুজনে সমানে উদয় হ'বেন।

রণেন বল্‌লে,—না, না, সূর্য্যচন্দ্রবধ সমাধা না করে' আমি ছুটি নিচ্ছি না। আপনার ভাবনা নেই।

সন্ধ্যার বাড়ি থেকে বেরিয়েও শান্তি রাস্তায় রণেনকে প্রত্যাশা করে। তার পর তার বাড়ি পর্য্যন্ত এসে হঠাৎ দেহের ক্ষিপ্রতা বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি নমস্কার করে' বলে: আচ্ছা, এবার চলি। অনেক ধন্যবাদ।

ধন্যবাদটা ক্রমে-ক্রমে উঠে যায়।

চারটে বাজতে-না-বাজতেই শান্তি অস্থির হ'য়ে ওঠে, গেইট্ দিয়ে বেরিয়ে এসেই রণেনকে দেখে তার মুখমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করে' গভীর তৃপ্তির একটি ছায়া নামে। আস্তে-আস্তে রণেনের হাত থেকে কুকুরের চেনটা কখন খসে' গেছে,

শান্তির ছাতাটা সে আজকাল মাথায় ধরে। আন্তে ছাতার বাইরে চলে' গিয়েও শান্তি ব্যবধানটা প্রশস্ত করতে পারে না, আবার আস্তে কখন ভেতরে চলে' আসে।

শান্তি রণেনদের বাড়ির কাছে এসে অল্প একটু থেমে হেসে, নমস্কার করে' রোজ বিদায় নেয় না, মাঝে-মাঝে অন্তঃপুরেও ঢুকে পড়ে। আজকাল বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে তার ভাব হ'য়ে গেছে, রণেনের মা'র কাছে সে তার বাড়ির গল্প করে, তাদের আধুনিক কালের দারিদ্র্যের ইতিহাস নয়—সেই সেকেলে তার ঠাকুরদাদা কবে কোন্ ডাকাতের দল ধরে' দিয়ে সরকারের থেকে ইনাম পেয়েছিলেন তার কথা। সব চেয়ে মজা এই, বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে' রণেনের সঙ্গেই সে আলাপ করতে পারে না।

বনেদি বাড়ি—ঐশ্বর্য্যে ঘর-দোর গম্‌গম্ করছে। শান্তি যেন কেমন হাঁপিয়ে ওঠে।

না, শান্তির সময় নেই, সংসারে তার অনেক কাজ। ছোট ভাই দুটিকে মানুষ করতে হ'বে, বাবার ঋণটা শোধ না করলেই নয়—জীবনের তুচ্ছ বিলাসিতায় তার রুচি নেই। মাঝে-মাঝে বিশ্রামের জন্যে সে লুব্ধ হ'য়ে ওঠে বটে—কিন্তু এই ক্ষমাহীন যুদ্ধমত্ততায়ই তার সত্যিকারের আশ্রয়। স্বপ্নের রঙিন মুখোস খুলে ফেলে রূঢ় জাগ্রত রৌদ্রে সে অবতীর্ণ হ'লো।

সরমাকে শান্তিই যা-হোক্ চিঠি লিখলে। লিখলে, টিউশানি সে আর করতে পারবে না।

সরমা নিয়মমতো পড়ে না বলে' নয়, পথচারীদের উৎপাতের জন্যে ঐ রাস্তাই সে ছাড়তে চায়। কারণটা অবিশ্যি সরমা জানতে পারলো না। তবু কী মনে করে' ফার্ষ্ট-বুকটা কুটি-কুটি করে' ছিঁড়ে ফেলে স্বামীর কোলে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

নহ পুরাতন

শ্রীনিধিরাজ হালদার

(১)

ওহে পুরাতন নূতনের মাঝে,
খুঁজেছি তোমায় আকুল পরাণে,
কভু পাই নাই তব দরশন।

(২)

জাগ্রত স্বপনে ভেবেছি যে কত,
আঁধার নিশিতে প্রদীপ জ্বালি,—
তবে কি নহ গো তুমি পুরাতন?

(৩)

নূতনের অতি-জীর্ণ কঙ্কাল,
রাখিয়াছ শুধু করিয়া সাক্ষী,—
কত যুগ-যুগান্ত ধরিয়া।

(৪)

শরতের গোধূলি লগনে,
ঘুরিয়াছি কত দ্বার হতে দ্বারে,—
নয়ন-জলেতে পরাণ ভরিয়া।

(৫)

হেমন্ত কেটেছে, চলে গেছে শীত,
বসন্ত আজিকে অতিথি দ্বারে,
কি বলিব তাহে, ওগো পুরাতন?
তুমি সাক্ষী মোর কোরোনা আর,—
বলিতে যা চাহ বলিও তারে।

(৬)

নূতনের মাঝে তব দরশন,
কে বলিবে ওগো তুমি পুরাতন?

সংবাদ প্রভাকরে বাংলার পুরাতনী *

অধ্যাপক শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত এম-এ,

ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে ১২৭২ সালের (ইং ১৮৬৫-৬৬) "সংবাদ প্রভাকর" পত্রের এক কাটতি আছে কিন্তু উহাতে অনেক সংখ্যা নাই। বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে, "এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটের মধ্যে ৫৪নং ভবনে শ্রীরামচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।"

৩রা বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল, ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকরে বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী" উপন্যাসের এক সুদীর্ঘ সমালোচনা বাহির হয়। উক্ত প্রসঙ্গে "সংবাদ প্রভাকর" বলেন :—

"বাঙ্গালা ভাষা সম্পন্না না দরিদ্রা? এই প্রশ্নের উত্তর দান আজকাল অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কে এই কাঠিন্য উৎপাদন করিলেন? বিদেশীয়েরা না বাঙ্গালীরা? এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর তাদৃশ কঠিন নহে, বস্তুতঃ অতিশয় সহজ। বাঙ্গালীরা আপনারাই আপনাদিগের ভাষাকে অসম্পন্না দেখিতেছেন এবং আপনারাই তদ্দ্বারা কোন প্রকার অভীষ্ট লাভ করা দুরূহ ভাবিয়া কাতর হইতেছেন। কিন্তু রত্নাকর সদৃশ সংস্কৃত ভাষা যাহার জননী, তাহার প্রতি এরূপ দোষারোপ করা অসহ্য শোচনীয় সন্দেহ নাই।

• • •

অদ্য আমরা যে একখানি নূতন গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি, যাহা উপলক্ষ করিয়া এই প্রস্তাবের অবতারণায় প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে···ইহার নাম দুর্গেশনন্দিনী। এখানি ইতিহাসমূলক উপাখ্যান। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, এই পুস্তকের প্রণয়ন কর্ত্তা। গ্রন্থকারের প্রণয়োপহার স্বরূপ আমরা সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদের সহিত এই পুস্তকখানি গ্রহণ করিলাম। দুর্গেশনন্দিনীর এক এক পৃষ্ঠা করিয়া পাঠ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে আমরা ইহার আদ্যোপান্ত সমাপ্ত করিয়াছি। পাঠকালে অন্তঃকরণে কিরূপ অপরিসীম আনন্দের উদয় হইয়াছিল, পাঠকগণ স্বয়ং পাঠ করিয়া না দেখিলে সে আনন্দ অনুভব করিতে পারিবেন না।

• • •

বাঙ্গালা ভাষায় নূতন উপাখ্যান এ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই, দুর্গেশনন্দিনী-গ্রন্থকার বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যদিও স্বপ্রণীত পুস্তক মধ্যে স্থানে স্থানে ইংরাজী ভাব সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তথাপি যখন ইহা অনুবাদিত পুস্তক নহে, তখন ইহা অবশ্যই নূতন।

পাঠকগণ যেন এরূপ মনে না করেন যে, আমরা ইংরাজী উপাখ্যান সমুদয়ের সহিত দুর্গেশনন্দিনীর উৎকর্ষের তুলনা করিতেছি। ইংরাজীতে যেরূপ উত্তমং উপাখ্যান আছে, বাঙ্গালা ভাষায় সেরূপ নাই, এই নিমিত্ত আমরা এই উৎকৃষ্ট ও প্রথম বাঙ্গালা উপাখ্যানকে গৌরবস্থানীয় করিলাম। বাস্তবিক বঙ্কিম বাবু এই পুস্তকে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালার প্রথম উপাখ্যানকার (First Novelist) উপাধির অধিকারী হইয়াছেন। আমাদিগের দেশে যে সকল উপাখ্যান দৃষ্ট হয়, তৎ সমুদয়ই প্রায় অদ্ভুত ও অনৈসর্গিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। দুর্গেশনন্দিনী সর্ব্বাংশে সেই বিতৃষ্ণাকর দোষে পরিবর্জ্জিতা। বিশেষতঃ ইতিবৃত্তের সহিত ইহার সংস্রব থাকাতে আরো একটী মনোহর শোভা হইয়াছে।"

উক্ত বৎসরের ৩১শে বৈশাখের (ইং ১২ মে, ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকরে "বারুইপুর পরিদর্শন" মন্তব্যে লিখিত হয় "মেং ভিক্টর বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, বঙ্কিম বাবু দারোগাগিরি হইতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটীতে উন্নত হন নাই।" মন্তব্য কোন ডাকাইতি মোকর্দ্দমায় মিথ্যা পীড়নের

* ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে রক্ষিত ১২৭২ বঙ্গাব্দের "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকার ফাইল অবলম্বনে লিখিত। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লেখকের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য ধন্যবাদভাজন।

দারে অভিযুক্ত একজন পুলিশ কর্ম্মচারীকে বঙ্কিমচন্দ্র শাস্তি দিতে লিখিত হয়। ২৭শে ভাদ্রের (১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকরে সম্পাদকীয় স্তম্ভে পাইকহাটী পরগণার ১৪জন সারগ্রাহী যুবক ও চাঙড়িপোতা নিবাসী শ্রীযুক্ত সীতানাথ বসু বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী" পাঠে যে নিদর্শন সংবাদ প্রভাকরের নিকট প্রেরণ করেন তাহা প্রকাশিত হয়। এই অভিনন্দন পত্রে বঙ্কিমচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া লেখা হয় :—

"হে! দেশহিতৈষী মহাত্মন্। আপনি স্বদেশের একটী মহান্ উপকার সাধন করিলেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বঙ্গদেশ আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলেন। আমরা জন্মাবধি এদেশীয় মাতৃভাষাপ্রিয় পণ্ডিতগণের সুকোমল হস্ত হইতে যদিও অনুবাদলতার মধুর ফল আস্বাদন করিয়া আসিতেছি, তথাপি আপনি এক্ষণে আমাদিগকে নব-পল্লবিত অক্ষয় বৃক্ষের অমৃত ফলের রসাস্বাদন করাইলেন। দুর্গেশনন্দিনী আমাদিগকে প্রত্যেক পৃষ্ঠায় নব নব আনন্দ প্রদান করিয়াছেন। আমাদিগের স্বদেশীয় ভাষা সংস্কারকগণ যদি আপনার অনুকরণ করিতে যত্নশীল হন, বঙ্গদেশ অপরিসীম উপকার প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। আপনি যথার্থই এক্ষণে অভিনব আদর্শস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন।"

১৮ই কার্ত্তিক, ১২৭২ (২ নবেম্বর, ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকরের প্রেরিত পত্রের মধ্যে দুই জন মহিলা বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর বিশেষ প্রশংসা করিয়া পত্র লেখেন। কলিকাতা হইতে শ্রীমতী পদ্মাননী দেবী লেখেন, "আমি কোন গুরুর নিকটে শিক্ষা পাই নাই, তথাচ দুর্গেশনন্দিনী আমার উত্তম শিক্ষা পুস্তক হইয়াছে।" ভবানীপুর হইতে শ্রীমতী হরসুন্দরী দাসী লেখেন, "এমন উত্তম রচনা আমার চক্ষে আর পড়ে নাই।" বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে এইরূপ প্রশংসা লাভ বিশেষতঃ পাঠিকামণ্ডলী হইতে বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়।

৯ই বৈশাখের (ইং ২০ এপ্রিল, ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকর বলিতেছেন যে ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউস নামক ইংরাজী প্রাত্যহিক পত্র গত আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, গত ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাহার অন্যূন দুই সহস্র গ্রাহক হইয়াছে। ১৪ই বৈশাখ (২৫শে এপ্রিল, ১৮৬৫) শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত "কাকবুষণ্ডীর কাহিনী" নামক একখানি বাঙ্গালা পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে সংবাদ প্রভাকর লেখেন, "পুস্তকখানি নির্দ্দোষ না হইলেও নিতান্ত কদর্য্য হয় নাই।" গ্রন্থকার পুস্তকখানিকে "দেশের অবস্থা ও আচারব্যবহার সংক্রান্ত দৃষ্টান্ত মূলক উপন্যাস"-রূপে পরিচয় দিয়াছেন। ইহার রচনাপ্রণালী "হুতোম পাঁচার নক্সা"র ভাষার অনুকরণ।

তখনকার বাংলা সংবাদপত্রসেবীদের মধ্যে যে একতা ছিল না তাহার প্রমাণ সংবাদ প্রভাকরে পাওয়া যায়। ২৬শে বৈশাখ (৭ মে, ১৮৬৫) "চন্দ্রিকা সম্পাদকের মতিচ্ছন্ন" প্রসঙ্গে এই পত্রিকা লিখিতেছেন :

"চন্দ্রিকা সম্পাদকের ইংরাজী বর্ণপরিচয় আছে কিনা, তাহা সাধারণে জানিবার নিমিত্ত চাতকের ন্যায় ঊর্দ্ধকণ্ঠ হইয়া থাকেন নাই, তবে তিনি কি জন্য আপনার সৌজন্য ও পারদর্শিতা দেখাইতে শশকের ন্যায় স্বতঃ প্রধাবিত হন? "ইলেম বাজ" অভিধান পরিত্যাগ করিয়া কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিতে কি তাঁহার উন্নত মস্তক অবনত হয়। আমরা পুনঃ পুনঃ তাঁহার ধৃষ্টতাকে ক্ষমা করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছি, অদ্য অত্যন্ত দুঃখে তাঁহাকে সতর্ক করিতে হইল।.....এই সকল বরপুত্র বীরপুরুষগণের হস্তে পড়িয়াই বাঙ্গালা সংবাদপত্র সকল সাধারণের নিকটে এত অশ্রদ্ধাস্পদ হইতেছে।"

২২শে জ্যৈষ্ঠের (৩ জুন, ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ কলিকাতা পুলিসের প্রধান মাজিষ্ট্রেট ব্রাণ্ডন সাহেব অশ্ব হইতে পতিত হইয়া বিচারালয়ে আসিতে অশক্ত হওয়ায় অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার কার্য্য করিতেছেন এবং ব্রাণ্ডন সাহেবের নিয়োগের পূর্ব্বে সিংহ মহাশয় ঐ পদে কিছুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন। ২৪ জ্যৈষ্ঠের (৫ জুন ১৮৬৫) কাগজে শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রণীত "অযত্রথ নাটক" সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়, "অযত্রথ নাটকে বটতলার প্রসাদচিহ্ন লক্ষিত হয় না। এতৎ পাঠে নাটকের প্রকৃত মধুর রস আস্বাদন করা যায়। ফলতঃ বাঙ্গালা কাব্য, সাহিত্য ও নাটকের উন্নতিকল্পে হরিশ বাবুর বিশেষ উৎসাহ আছে। ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। অযত্রথ নাটক ঢাকার

সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত।" ২৩শে আষাঢ় (৬ জুলাই ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকর শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে অনুবাদিত ভাস্করাচার্য্যের "লীলাবতী" গণিতের সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখেন, "অনেক যুবককে এখনো খেঁউড় ও কুৎসিত নাটক প্রভৃতি লিখিয়া বটতলার শোভা সম্পাদন করিতে অধিক আগ্রহবান দেখা যায়, তাঁহারা যদি শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, বাঙ্গালা দেশ অনেক পরিমাণে কৃতার্থম্মন্য হন।" উক্ত সংখ্যায় আরো প্রকাশ—যে ব্যক্তি আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় নাটকাকারে সুরাপানের ফল বিষয়ক পুস্তক লিখিতে পারিবেন, বাবু প্যারীচরণ সরকার তাঁহাকে ৫০ টাকা পুরস্কার দিবেন। (১)

১৩ই শ্রাবণের (২৭ জুলাই ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত কোন পত্রপ্রেরকের বিবরণে জানা যায় যে শোভাবাজারস্থ রাজভবনে সম্প্রতি একটী অভিনয় সভা স্থাপিতা হইয়াছে। ৪ঠা শ্রাবণ রজনীযোগে সভার ব্যবস্থাক্রমে শ্রীযুক্ত রাজা দেবীকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত "একেই কি বলে সভ্যতা ?" প্রহসনের প্রথমবার অভিনয় প্রদর্শন করা হইয়াছিল। ২০শে শ্রাবণ (৩রা আগষ্ট ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকর "নাট্যাভিনয়" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে উক্ত অভিনয় সম্পর্কে লেখেন :

"কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রস্তাবিত প্রহসন মধ্যে যেরূপ নিপুণতা ও ব্যবহার ভাবুকতা গুণের পরিচয় দিয়াছেন, অভিনয়কর্ত্তাগণ কোন অংশেই তাঁহার হৃদগত ভাব প্রকাশ করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। যে সকল ব্যক্তির সমক্ষে অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে যদি কেহ নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের ন্যায় স্বভাবের লোক থাকেন, তাঁহারাও স্ব স্ব গোপনীয় ক্রীড়ার প্রকাশ্য অভিনয় দর্শনে লজ্জিত ও হর্ষিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমরা কায়মনবাক্যে অভিনয় কর্ত্তাগণকে ধন্যবাদ দিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। বাঙ্গালা দেশ যাঁহাদিগের প্রযত্নে পূর্ণ সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা সাধু সমাজের মহামূল্য রত্ন বলিয়া পুনঃ পুনঃ অভিহিত হইবেন, এবিষয়ে অণুমাত্র সংশয়াভাব।" (২)

[অভিনয়স্থলে বাবু দিগম্বর মিত্র, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি এক শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন]

১৮ই শ্রাবণ (১ আগষ্ট ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকর শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অনুবাদিত পুরাণ সংগ্রহের পঞ্চদশ খণ্ড প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন। উহার পরবর্ত্তী দিবস হইতে কয়েক দিন উক্ত পুরাণ সংগ্রহের প্রধান বিতরিতা শ্রীরাধানাথ বিদ্যারত্ন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপন সংবাদ প্রভাকরে বাহির হয়। ২৪ শ্রাবণ (৭ আগষ্ট ১৮৬৫) "ইণ্ডিয়ান মিরর" পত্রাবলম্বনে সংবাদ প্রভাকর লিখিতেছেন যে বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় অযোধ্যার তালুকদারগণের স্বত্ব স্থাপনার্থ ইংলণ্ড গমনের অভিলাষ করিয়াছেন। ঐ দিনই প্রকাশ যে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের কয়েকজন ব্রাহ্মের মতানুযায়ী নিয়ম প্রবর্ত্তনে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অসম্মত হওয়ায় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার নিকট নূতন সমাজ স্থাপনের উপদেশ চাহিয়াছিলেন এবং আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ লেখেন—দেশের মধ্যে যত অধিক পরিমাণে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়, ততই মঙ্গল।

৩১শে শ্রাবণ (১৪ই আগষ্ট, ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকর লিখিতেছেন, "আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক পাঠকগণকে অবগত করিতেছি যে, যিনি ১৮৬৬ অব্দের ১লা জুনের মধ্যে হিন্দুমহিলাগণের বর্ত্তমান অবস্থা উৎকৃষ্ট সাটকাকারে লিখিয়া জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় প্রেরণ করিতে পারিবেন, তিনি ২০০ টাকা পারিতোষিক পাইবেন এবং ঐ সালের ১লা ফেব্রুয়ারির মধ্যে যিনি জমিদারগণের আচার ব্যবহার ঐরূপ নাটকের প্রণালীতে লিখিতে পারিবেন, তাঁহাকে ১০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবেক। শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীযুত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র পুস্তক পরীক্ষা করিবেন।" (৩)

---

(১) ১৩ কার্ত্তিক (২৮ অক্টোবর ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকর "কলিকাতা ঘুরা নিবাসী" সভা শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন।

(২) "জেলী নিউজ" পত্রে একজন পত্রপ্রেরক প্রশ্ন করেন, "শোভাবাজারের নাট্যশালায় একেই কি বলে সভ্যতা ? অভিনয়ের দ্বারা কি ফল হইল ?"—সংবাদ প্রভাকর, ৩২শে শ্রাবণ, ১২৭২।

(৩) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৮, শ্রীযুত

৬ই আশ্বিন (২১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪) সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকীয় স্তম্ভে "খেম্‌টার নাচ, যাত্রা এবং ওস্তাদী কবি" এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিত হয়। উক্ত তিন প্রকার আমোদ প্রমোদের সমালোচনা প্রসঙ্গে সংবাদ প্রভাকর মন্তব্য প্রকাশ করেন :

"পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রিবিধ নৃত্য গীতে বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় হয়, বাঙ্গালা দেশ যদি অন্য কোন অধ্যবসায় সম্পন্ন জাতির জন্মভূমি হইত, তাহা হইলে তদ্দ্বারা এতদিনে জগদ্বিখ্যাত সঙ্গীতশাস্ত্রের উন্নতি হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই। যাহা হউক, অদ্য এ বিষয়ে আর অধিক বাক্য ব্যয় করিবার প্রয়োজন রাখে না। উপসংহার স্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, সঙ্গীতের তুল্য মনোরঞ্জন বিষয়ে বাঙ্গালীরা যতদিন নাটকাভিনয়রূপ বিশুদ্ধ প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে না পারিতেছেন, ততদিন বরং নির্দ্দোষ যাত্রা কবি প্রচলিত থাকুক, কিন্তু অদ্যন্ত খেম্‌টা নাচকে দেশত্যাগী করা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে। এই মহান্ অনিষ্টকর প্রথা এদেশের অধঃপতন সাধনের প্রধান যন্ত্র স্বরূপ।"

২৬ আশ্বিন (১১ অক্টোবর ১৮৬৪) জোড়াসাঁকোর সিংহবংশীয় বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহের পরলোকগমনে প্রভাকর শোক প্রকাশ করেন। (৪) ১০ই কার্ত্তিক (২৫ অক্টোবর ১৮৬৪) "গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক নির্ব্বাচন" প্রসঙ্গে সংবাদ প্রভাকরে লিখিত হয় :

"বাবু রাজেন্দ্রলাল একজন যোগ্য পাত্র বটেন, তথাপি তাঁহার অবলম্বিত বাঙ্গালা ভাষাটী সর্ব্বজন হৃদয়গ্রাহিণী নহে। তাহার স্থানে২ শ্রীরামপুরী বাঙ্গালার গন্ধ অনুভূত হয়। আমাদিগের মতে একমাত্র বিদ্যাসাগরই ঐ পদের অধিষ্ঠীয় অধিকারী। উপসংহার স্থলে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের অনুবাদ যথেষ্ট হইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট অনুবাদক অসম্ভব সংক্ষিপ্ত উদারতা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অনুবাদ বিভাগ যদি সংশোধিত হয়, সেই সময়ে যেন, আমাদিগের এই আক্ষেপের কারণটী অবিলুপ্ত না থাকে।" (৫)

১৭ই কার্ত্তিকের (১ নবেম্বর ১৮৬৪) সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ যে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র বাবু জ্ঞানেন্দ্র-মোহন ঠাকুর শীঘ্রই বিলাত হইতে কলিকাতা পৌঁছিবেন এবং হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী কর্ম্ম করিবেন। (৬) ১৯শে কার্ত্তিক (৩ নবেম্বর ১৮৬৪) সংবাদ প্রভাকর লিখিতেছেন :

"সোমপ্রকাশের ন্যায় ঢাকাপ্রকাশের সম্পাদকের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ঢাকাপ্রকাশ এতদিন শ্রীযুত গোবিন্দ প্রসাদ রায়ের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছিল, এক্ষণ অবধি প্রসন্নকুমার ভৌমিক কর্ত্তৃক প্রচারিত হইবে। এবং শুক্রবারের পরিবর্ত্তে রবিবার প্রকাশের নিয়ম হইয়াছে। আজিকাল সম্পাদকদিগের নাম পরিবর্ত্তন একটী অভ্যাস হইয়া উঠিল। এখন আর সাধারণকে কেহ আপনার উপর ঝোঁক রাখিতে চাহেন না। এ উপায় মন্দ নয়!"

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সংবাদ প্রভাকরের কয়েকটী মন্তব্য পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। ২৬ কার্ত্তিক (৯ই নবেম্বর ১৮৬৪) এই পত্রিকা লেখেন :

"সৌভাগ্যক্রমে বারুইপুরের এলাকাবাসিগণ শ্রীযুত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পাইয়াছেন। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষা বিষয়ে আমাদিগের যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানাস্পদ, বিচার বিষয়েও গবর্ণমেণ্টের এবং প্রজাগণের সেইরূপ প্রশংসাভাজন। ইনি চতুর্ব্বিধ কার্য্য করেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী কালেক্টর, সলীলের রেজিষ্ট্রার ও ট্যাক্সের সংগ্রহাধ্যক্ষ।..... ..... বাবু বঙ্কিমচন্দ্র অভিমানের মস্তকে পদার্পণ করিয়া যথা-যোগ্য ব্যক্তিগণের সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও শারীরিক কষ্টকে কষ্ট বোধ না করিয়া পীড়িত অবস্থাতেও বিচার-কার্য্য সম্পাদন করেন। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে বারুইপুরে

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "জোড়াসাঁকো নাট্যশালা" প্রবন্ধে "ইণ্ডিয়ান রিফরমর" বিজ্ঞাপনের সহিত "সংবাদ প্রভাকরে"র কিছু প্রভেদ আছে।

(৫) ২২শে চৈত্র (৩রা এপ্রিল ১৮৬৪) সংবাদ প্রভাকরে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্যাদির কর্ত্তৃকত্বের বিজ্ঞাপন বাহির হয়।

(৬) হিন্দু পেট্রিয়ট পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই দুই জনের নাম প্রধান অনুবাদকের পদের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

(৭) ২২ কার্ত্তিক (৬ নবেম্বর) প্রকাশ যে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

যে রাসযাত্রা হয়, তাহাতে অসম্ভব জনতার মধ্যস্থলে তিনি পদব্রজে পরিভ্রমণ করিয়া শান্তিস্থাপন ও অন্যান্য বিষয়ের তত্ত্বও করিয়াছেন। স্বকার্য্য বিষয়িনী কর্ত্তব্যতা পক্ষেও ইহাঁর নিকটে অনেক বিচারক পরাস্ত হন।..... অতএব বঙ্কিমবাবু সকল বিষয়েই প্রশংসা ও ধন্যবাদের পাত্র।"

২রা অগ্রহায়ণ (১৬ নবেম্বর ১৮৬৭) "হিন্দু নাট্যাভিনয়" প্রসঙ্গে "সংবাদ প্রভাকর" লিখিতেছেন :

"সভ্যতা মানব জীবনের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল। এক সময়ে ইহার উন্নতি ও এক সময়ে অবনতি হয়, পৃথিবীর গতিই এই। আজকাল ভারতবর্ষে শনৈঃ শনৈঃ পূর্ব্ব জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রচলিত যাত্রাগুলির প্রতি যথার্থ সঙ্গীত প্রিয় ব্যক্তিগণের নিদারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। রঙ্গভূমি করিয়া নাটকের অভিনয় করা অধিক ব্যয়সাধ্য বিবেচনায় কলিকাতার কয়েকজন শিক্ষিত যুবক সামান্যতঃ তৎ প্রণালীতে গীতাভিনয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা এদেশের পক্ষে শ্লাঘনীয় অনুষ্ঠান সন্দেহ নাই। গত জগদ্ধাত্রী পূজার সময় বহুবাজারের মৃত বাবু বিশ্বনাথ মতিলালের বাটীতে সাবিত্রী সত্যবান নাটকের গীতাভিনয় হইয়াছিল। গত মঙ্গলবার কার্ত্তিক পূজার রজনীতে উক্ত বহুবাজারের বাবু রাজেন্দ্র দত্তের বাটীতে মাইকেল মধুসূদন প্রণীত পদ্মাবতী নাটকের গীতাভিনয় হইয়াছে। যুদ্ধ যবনিকা অবলম্বন করিয়া ইহার অভিনয় হয়। নট, নটী, বিদূষক ও নায়ক নায়িকাগণ দর্শকবৃন্দের সর্ব্ববিষয়ে মনোরঞ্জন করিয়াছেন। দিন দিন ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইলে জগত্তুষ্টিকর সঙ্গীতবিদ্যার নষ্ট কোষ্ঠি উদ্ধার হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। শ্রীযুত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, বাবু হীরালাল শীল, বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক, ও মৌলবী আবদুল লতিফ প্রভৃতি বিস্তর সম্ভ্রান্ত লোক অভিনয় স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

...একটী দুঃখের বিষয় এই, গৃহমধ্যে বহু জনতা ও স্থান সঙ্কীর্ণ হওয়াতে বাটীর বহির্ভাগ হইতে অনেক ভদ্রলোককে হতাশ হইতে হইয়াছে। সচরাচর বহু সমারোহস্থলে সার্জ্জনেরা যেরূপ দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে, উপস্থিত স্থলেও তাহার অন্যথা হয় নাই। রাজেন্দ্র বাবু যদি টিকিটের নিয়ম করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় এরূপ অসুবিধা হইত না।"

৯ই অগ্রহায়ণ (২৩ নবেম্বর ১৮৬৭) সংবাদ প্রভাকর লিখিতেছেন :

"শুনা গেল, আগামী শনিবার বহুবাজারের বাবু রাজেন্দ্র দত্তের বাটীতে পুনরায় পদ্মাবতী নাটকের গীতাভিনয় হইবে। ২রা অগ্রহায়ণের প্রভাকরের ইঙ্গিত অনুসারে টিকিট করা হইতেছে। আমরা ভরসা করি, নটনটী ও নায়কনায়িকাগণ যখন যবনিকাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিবেন, তখন শ্রোতাদিগের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া একটী স্বতন্ত্র বেদীতে অবস্থিত হইবেন। তাহা হইলে দর্শকগণের দর্শন করিবার অসুবিধা থাকিবে না!"

১৩ই অগ্রহায়ণ (২৭ নবেম্বর ১৮৬৭) "পদ্মাবতী গীতাভিনয় পুনর্ব্বার" শীর্ষক প্রসঙ্গে প্রভাকরে নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল :

"অনুষ্ঠান দেখিয়া বোধ হইতেছে, এদেশের যাত্রাগুলির প্রাণবায়ুস্বরূপ কালুয়া ভূলুয়া ও ভিস্তি মেথুরাণীদিগের অন্ত লোপ হইল। আমাদিগের বহুকালের পরিচিত দূতী, কন্যাবু, বশোদা ও মালিনী গোয়ালিনীরা শীঘ্র বাঙ্গালী সমাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবেন। চিরাকাঙ্ক্ষিত নাট্যাভিনয়ের মধুর ফল আজকাল অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। যাঁহারা গীতাভিনয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রথম আরম্ভ অপেক্ষা দিন দিন অধিকতর নিপুণতার সহিত দর্শক ও শ্রোতৃবর্গের মনোহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।"

ঐ সংখ্যা সংবাদ প্রভাকরে একজন দর্শকের পত্রে প্রকাশ যে ১১ই অগ্রহায়ণ শনিবার রাত্রে শোভাবাজারের রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাদুরের বাটীতে সাবিত্রী সত্যবান নাটকের নূতন যাত্রা হইয়া গিয়াছে। ৫ই পৌষের (১৯ ডিসেম্বর ১৮৬৭) সংবাদ প্রভাকরে উল্লেখ আছে শনিবার (২রা পৌষ) তালতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামধন ঘোষের বাটীতে পদ্মাবতী নাটকের গীতাভিনয় হইয়া গিয়াছে। "শুনা গেল, অভিনেতৃগণ ইতিপূর্ব্বে দুই রাত্রি বহুবাজারের দত্তবাবুদিগের ভবনে যেরূপ

সাধারণের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন. রাধবন বাবুর বাটীতেও সেইরূপ সন্তোষকর অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন।"

২০ পৌষ (৩ জানুয়ারী, ১৮৬৬) সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ যে রেওয়ার মহারাজের কলিকাতা আগমনোপলক্ষে বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর স্বীয় ভবনে বিদ্যাসুন্দর নাটকাভিনয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ওরা ফাল্গুন মঙ্গলবার (১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৬) সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ :

"গত শনিবার রজনীযোগে পাতুরিয়া ঘাটা নিবাসী যশোধর্ম্মরাশি দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে রঙ্গনাট্যালয়ে বিদ্যাসুন্দর নাটকের অভিনয় অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম বসু দ্বারা অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে।"

১০ই ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৬) সংবাদ প্রভাকর শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত "সন্ন্যাসী" নামক রূপক কাব্যের সমালোচনা প্রকাশ করেন। ১৪ই ফাল্গুনের (২৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৬) সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ যে মিস্ ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের জীবনচরিত যাহা বিগত নবেম্বর মাসে মেজর ম্যালিসন বেথুন সভায় পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। "স্ত্রীলোকগণ কি বালকগণ এই পুস্তকখানি মনোযোগ সহ পাঠ করেন, ইহা আমাদিগের একান্ত প্রার্থনীয়।"

১৭ ফাল্গুন মঙ্গলবার (২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৬) সংবাদ প্রভাকর লিখিতেছেন :

"গত শনিবার যামিনীযোগে বিশুদ্ধস্বভাব ধনিবর শ্রীযুত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে বিদ্যাসুন্দর নাটকের অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাহা সন্দর্শনার্থ শোভাবাজারীয় রাজপরিবার, ঠাকুরবংশীয়গণ ও অন্যান্য অতি সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা গমন করাতে তাঁহার বিচিত্র হাল বহু ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, নাট্যশালা বিবিধ বর্ণের পতাকার দ্বারা খচিত ও অতি উজ্জ্বল আলোকমালায় শোভিত হইয়াছিল, নাটকের মধ্যে মধ্যে বাদ্যকরেরা সুমধুর স্বরে নানাবিধ বাদ্যোদ্যম করিয়া সভাস্থ সকলকে পুলকিত করিয়াছিলেন, বিদ্যাসুন্দর নাটকের অভিনয় যেপ্রকার প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার কিছুমাত্র অন্যথা হয় নাই, নট ও নটীগণ উপযুক্ত পরিচ্ছদে পরিবৃত হইয়া উপযুক্ত বক্তৃতা এবং গান দ্বারা সকলকে বিমোহিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে নাটকাভিনয় প্রদর্শন বিষয়ে নগরীয় ধনাঢ্য লোকদিগের যেরূপ অনুরাগ ছিল, এইক্ষণে তাহার অধিকাংশ প্রায় হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে, পাইক পাড়ার রাজভবন ও যুগল সেতুর সিংহ বাবুদিগের ভবনের নাট্য মন্দির বন্ধ হইয়া গিয়াছে, যেহেতু বহুদিবস হইল তথায় নাটকাভিনয় প্রদর্শিত হয় নাই, এইক্ষণে কেবল বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে নাট্য-ক্রীড়ার আমোদপ্রমোদ হইতেছে, বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তদনুজ বাবু সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় এই অতি কর্ত্তব্য বিষয়ে যথোচিত অনুরাগ এবং প্রযত্ন প্রকাশ করিতেছেন, আমরা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহাদিগের এই অনুরাগ কিছুকাল স্থায়িনী হইয়া বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বল করুক।" (১)

১৬ই চৈত্র (২৮ মার্চ্চ, ১৮৬৬) সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ যে গত সপ্তাহে শ্রীযুক্ত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনে গীত বাদ্যের আমোদপ্রমোদ হইয়াছিল, শোভাবাজারীয় নাট্যশালার সভ্যগণ তাহাতে নিযুক্ত হইয়া সভাস্থ মহাশয়দিগকে বিমোহিত করিয়াছিলেন। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ও লেডী বিডন ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় ও ভারতীয় ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

২৬ চৈত্র (৭ এপ্রিল, ১৮৬৬) শ্রীমতী সৌদামিনী সিংহ কর্ত্তৃক সংগৃহীত "নারী চরিত" নামক নূতন গ্রন্থের সমালোচন প্রসঙ্গে "সংবাদ প্রভাকর" লেখেন :

"এই অভিনব গ্রন্থখানি শ্রীমতী সৌদামিনী কর্ত্তৃক

---

(১) ২১শে ফাল্গুন (৩ মার্চ্চ, ১৮৬৬) সংবাদ প্রভাকর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন যে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের বিরচিত বিদ্যাসুন্দরাপেক্ষা এই বিদ্যাসুন্দর নাটকাভিনয় অনেকাংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। "বিশেষতঃ নাটকাচ্ছলে লিখিত হওয়াতে অভিনয় প্রদর্শন সময়ে ভাব রস তাৎপর্য্য ইত্যাদি প্রকাশের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই।.....এতদ্দেশীয় বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদিগের দ্বারা মূল সংস্কৃত হইতে যে নাটক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, বিদ্যাসুন্দর নাটক তাহার অনেকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট হইয়াছে।"

সংগৃহীত হইয়া সাধারণ সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। ইনি কলিকাতা ফিমেল নর্ম্মাল ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্বা ছাত্রী, এবং কোন্নগর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষাদাত্রী। ভারতবর্ষের পরম বন্ধু ও এতদ্দেশীয় সাহিত্যের উৎসাহদাতা শ্রীল শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড জেম্‌স লং সাহেব মহোদয়কে এই গ্রন্থখানি উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রণেত্রীর উদ্দেশ্য অতি উৎকৃষ্ট। তিনি বঙ্গবিদ্যার্থিনী বালিকাগণের শিক্ষোপযোগী হইবার আশয়ে ইহা ইংরাজী হইতে বঙ্গভাষায় সংগ্রহ করিয়াছেন। স্বদেশীয় সহৃদয় মহোদয়দিগের প্রসাদে সৌদামিনীর সমভিপ্রায় শীঘ্রই সুসিদ্ধ হইবেক, সন্দেহ নাই।"

এই সকল প্রসঙ্গ ব্যতীত "সংবাদ প্রভাকরে" অন্যান্য সাময়িক নানা প্রকার বিষয়ে সম্পাদকীয় মতামত প্রকাশিত হয়। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত সন্দর্ভ কয়েকটী উল্লেখযোগ্য :—

২রা বৈশাখ—সার চার্লস ট্রিবিলিয়ানকে অভিনন্দন পত্র দান।

২৫শে বৈশাখ—গোহত্যাকারীর দণ্ড হওয়া উচিত কি না?

৩০শে বৈশাখ—নূতন পুলিসের অভিলাষ।

৬ই জ্যৈষ্ঠ—হুলহোল (নৈতিক অবনতির সমালোচনা)।

৮ই জ্যৈষ্ঠ—কালীঘাট ও ইহার উন্নতি।

১২ই জ্যৈষ্ঠ—বালিকা বিক্রয় ও গবর্ণর জেনেরেল।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ—নীলপ্রধান দেশে অগ্নুৎপাত।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ—নীলপ্রধান প্রদেশের বিচার প্রণালী।

২১শে জ্যৈষ্ঠ—বিনা অত্যাচারে নীল জন্মিবে না কেন?

২৪শে জ্যৈষ্ঠ—শান্তি না সংগ্রাম? (সভাপতি লিঙ্কনের মৃত্যুর পরে)

২৬শে জ্যৈষ্ঠ - নীল পুনর্ব্বার।

ঐ লিঙ্কনের জীবনবৃত্তান্ত।

৩রা আষাঢ়—হাতুড়ে ডাক্তার।

৪ঠা আষাঢ়—নীলকর সাহেব ও ছোট আদালত।

১৪ই আষাঢ়—বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালীগণ।

২৩শে আষাঢ়—সামাজিক উন্নতি (প্রাপ্ত)।

২৪শে আষাঢ়— ঐ (,)।

২৫শে আষাঢ়—ভারতবর্ষের বিচারালয়ের দুর্ভাগ্য।

১০ই শ্রাবণ—কলিকাতার স্বাস্থ্য রক্ষা।

১৫ই শ্রাবণ—বাঙ্গালা দেশের মফস্বল।

২৬শে শ্রাবণ—সুরাপানের চরম ফল।

২রা ভাদ্র—মফস্বলের দুরবস্থা।

১৭ই ভাদ্র—কলিকাতার ধাত্রীদিগের দৌরাত্ম্য।

২৯শে ভাদ্র—কলিকাতা পুলিসের দুর্নাম।

২৮শে আশ্বিন—হিন্দুদিগের অলস প্রতিপালন।

২রা কার্ত্তিক—কয়েদী পরিচ্ছদ।

৪ঠা কার্ত্তিক—পুলিস প্রপীড়ন। (৮)

১১ই কার্ত্তিক—বাঙ্গালীরা এত অপদার্থ কেন?

১৩ই কার্ত্তিক—কলিকাতা সুরাপান নিবারণী সভা।

৩রা অগ্রহায়ণ—চা-করের দৌরাত্ম্য ও কলিকাতা পুলিস।

৯ই অগ্রহায়ণ—বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রগণ কোন কার্য্যে লাগিবেন?

১০ই অগ্রহায়ণ—কৃতবিদ্য যুবকদিগের নিদ্রা ও তাঁহাদিগের জাগ্রতাভিমান।

১১ই অগ্রহায়ণ—আমাদিগের রমণীগণকে কতদূর স্বাধীনতা দেওয়া উচিত?

২রা পৌষ—অস্মদ্দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের অবস্থা।

১৮ই মাঘ—শারীরিক দণ্ড বিধান।

২৮শে চৈত্র—চড়কপূজা ও বাণফোঁড়া ইত্যাদি।

সংবাদ প্রভাকরে সাময়িক পত্রের উল্লেখ

২৭শে বৈশাখ (৮ মে, ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকরে "সত্যান্বেষণ" পত্রের উল্লেখ আছে। ২৯শে বৈশাখ (১০ মে, ১৮৬৫) "বাঙ্গালা ভাষা ও বিজ্ঞাপনী সম্পাদক" নামে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঢাকা হইতে এই পত্রিকা বাহির হইত। ১২ই জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে, ১৮৬৫) রঙ্গপুর দিক্ প্রকাশের নাম পাওয়া যায়। ২৩ জ্যৈষ্ঠ (৪ জুন, ১৮৬৫) আমরা নিম্নলিখিত সংবাদটী দেখিতে পাই :

(৮) দারোগাদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে ইহার বহু বৎসর ১ আষাঢ় ১২৩৭ (১৪ জুন, ১৮৩০) "সমাচার চন্দ্রিকা"য় এক পত্র প্রকাশিত হয়।

"রাজনীতি সংগ্রহ। এখানি সাপ্তাহিক সমাচার পত্র। ভবানীপুর চড়কডাঙ্গা অপূর্ব্ব যন্ত্রোদয় নামক অভিনব যন্ত্র হইতে বৈশাখ মাসের প্রথম সোমবার অবধি ইহা প্রকাশিত হইতেছে। শ্রীযুত বাবু রামগোপাল বসু মল্লিক ইহার অধ্যক্ষ ও সম্পাদক। আমরা ইহার ৪র্থ, ৫ম ও সপ্তম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ১।২।৩।৬ এই ৪ খণ্ড প্রাপ্ত হই নাই। কলিকাতা নগরে রাজনীতিমূলক একখানি সংবাদ পত্রের অভাব ছিল। রাজনীতি সংগ্রহের নাম শুনিয়া ও ইহার আরম্ভ দেখিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম, এতদ্দ্বারা সেই অভাবের পরিপূরণ হইবে। কিন্তু আমাদিগের কল দৃষ্ট হইতেছে না।"

এই সাময়িক পত্রিকা দুই মাসের বেশী স্থায়ী হয় নাই। সংবাদ প্রভাকর (২৬শে শ্রাবণ, ইং ৯ আগষ্ট ১৮৬৫) পাঠে তাহা বুঝা যায়। মহারাণী স্বর্ণময়ী ইহার স্থায়িত্বের জন্য ১০০৲ টাকা সাহায্য দান করিয়াছিলেন।

১৫ই আষাঢ় (২৮ জুন ১৮৬৪) সংবাদ প্রভাকর "ধর্ম্ম প্রচারিণী" নামক মাসিক পত্রিকার প্রথমাবধি দশ সংখ্যার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন। শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু রাজেন্দ্রনাথ গুহ ইহার সম্পাদক। প্রভাকর বলেন, "এতদ্দ্বারা ধর্ম্মানুরাগী ও ধর্ম্মান্বেষী ব্যক্তিগণের সবিশেষ উপকার দর্শিতে পারিবে। মুদ্রিয়ালী ক্ষিত্র যন্ত্রে মুদ্রিত।"

২রা কার্ত্তিক (১৭ অক্টোবর ১৮৬৪) জনৈক পত্র প্রেরক সংবাদ প্রভাকর সম্পাদককে লিখিতেছেন: "মহাশয়! নয় মাস অতীত হইয়া গেল, কলিকাতা রাজধানীর পূর্ব্ব প্রান্ত ভাগে "সত্যান্বেষণ" নামে একখানি ধর্ম্ম সংক্রান্ত উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। সত্যান্বেষণ যে চক্ষে সত্য অন্বেষণ করিতেছেন, তাহা আমাদিগের যথেষ্ট বোধ হইতেছে না। চক্ষুগুলি কিছু দীর্ঘায়তন না হইলে সকল পদার্থ দর্শন করা দুরূহ। অণুবীক্ষণ লইয়া দর্শন করা নয় মাসের শিশুর পক্ষে সহজ কথা নহে। অতএব সত্যান্বেষণের জন্মদাতৃগণকে সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা কিঞ্চিৎ স্নেহবান্ হইয়া চক্ষুগুলি আর কিছু বাড়াইয়া দিন। তাঁহারা সত্যান্বেষণের শিরোনামটী কোথায় পাইয়াছেন? সেই স্থানের কারিকরেরা কি সমুদয় চক্ষুগুলি সেইরূপ উজ্জ্বল করিয়া দিতে পারেন না?

শ্রীনয়ন দুই বছরে অন্ধ।

সাং গোবর্দ্ধনপুর।"

সংবাদপত্র সম্পর্কে ২৬শে কার্ত্তিক (১০ নবেম্বর ১৮৬৫) সংবাদ প্রভাকর "ঢাকা প্রকাশ" হইতে উদ্ধৃত প্রসঙ্গে বলেন যে ১১ই কার্ত্তিকের "বিজ্ঞাপনী"তে তৎ সম্পাদক ব্রাহ্ম ধর্ম্মের স্বপক্ষে কিঞ্চিৎ লিখিলে হিন্দু ধর্ম্মরক্ষিণী সভার কোন সভ্যের নির্দ্দেশানুসারে বিজ্ঞাপনীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র রায় সম্পাদককে ভবিষ্যতে ঐরূপ লিখিতে নিষেধ করেন। স্বাধীন চিত্ত সম্পাদক তাহাতে কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন এবং পূর্ব্ববৎ স্বাধীনতা তাঁহাকে দেওয়াতে তিনি পুনর্ব্বার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

২৪ ফাল্গুন (৬ই মার্চ্চ ১৮৬৬) সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ যে "চিকিৎসক" নামে একখানি নূতন সাময়িক পত্র প্রকাশ হইয়াছে। আহিরীটোলায় চিকিৎসক সভার অধীনে আপাততঃ এই পত্রখানি সংখ্যাক্রমে প্রকাশিত হইবেক। চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয় বঙ্গভাষায় সঙ্কলন ও অনুবাদ কিম্বা রচনা ইহাতে প্রকাশিত হইবে। চিকিৎসক সভার কর্ম্মাধ্যক্ষগণ শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীঃসিকদার দাস, শ্রীক্ষেত্রগোপাল দাহা ও শ্রীঅম্বিকাচরণ রক্ষিত অনুষ্ঠান পত্রে লিখিতেছেন :—

"বঙ্গভাষায় চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকার গুরুতর অসদ্ভাব দর্শনে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া এই অসদ্ভাব সাধ্যানুসারে সংপূরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। ভরসা করি, আমাদিগের দেশের যাবতীয় চিকিৎসক সংপ্রদায় আমাদিগকে, এই মহদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার জন্য বিবিধ প্রকারে যথেষ্ট উৎসাহ ও সাহায্য দান করিবেন।"

২৮শে ফাল্গুন (১০ মার্চ্চ ১৮৬৬) সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকীয় স্তম্ভে "সর্ব্বার্থসংগ্রহ" নামক মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যার প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা বাহির হয়। সাহিত্য, বিজ্ঞান, নীতি ও শিল্পশাস্ত্রবিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধাত্মক এই মাসিকপত্রের সম্পাদকীয় উক্তিতে লিখিত হয়।

"বিলাতে লিজের আওয়ার কি কাসেলস্ ফেমেলি পেপর প্রভৃতি যে সকল পত্রিকা আছে, ইহাও প্রায় তদনুযায়ী হইবেক। ·····বাঙ্গালা ভাষায় আমাদিগের এদেশে এপ্রকার পত্র নাই, বোধ হয়, এ সংগ্রহ অনেকের মনোরঞ্জন হইতে পারে।" "সর্ব্বার্থসংগ্রহ" পত্রিকার প্রথম সংখ্যা চোরবাগান সকুল বুক প্রেসে মুদ্রিত।

৮ই বৈশাখ (১২৭২) সংবাদ প্রভাকরে বেহালা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার সাম্বৎসরিক সংবাদ পত্রিকার নবম সংখ্যার প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়।

১৫ই পৌষ (২৯ ডিসেম্বর ১৮৬৪) "মফঃসলাইট" নামে ইংরাজী পত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্যের উপর সংবাদ প্রভাকরে টিপ্পনী প্রকাশিত হয়।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

যিনি সত্যসত্যই ব্রাহ্মণ ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু 'ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত' ছিলেন না, যাঁহার উদারতা ছিল আকাশ-তুল্য, যাঁহার মহানুভবতার সীমা ছিল না, গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই শতমুখে যাঁহার গুণ-কীর্ত্তন করিতেন, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, যাঁহার সুললিত, সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও গল্পে 'ভারতবর্ষ' একদিন সুশোভিত হইয়াছিল, যাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা ও কবিত্বশক্তির তুলনা মিলিত না, অভিমানশূন্যতা যাঁহাকে সর্ব্বজন-শ্রদ্ধেয় করিয়াছিল, সেই স্বনিকল্প মহাপুরুষ মহামহোপাধ্যায় কবিসম্রাট পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের স্মৃতিতর্পণের সুযোগ পাইয়া 'ভারতবর্ষ' আজ ধন্য বোধ করিতেছে।

জন্ম

উত্তরবঙ্গে রঙ্গপুর জেলায় অতি ক্ষুদ্র পল্লী ইটাকুমারী। আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও পল্লীটি গৌরবে অতুলনীয়—অনাড়ম্বর অগাধ পাণ্ডিত্যের আধার—জ্ঞানালোচনার কেন্দ্র—বঙ্গের দ্বিতীয় নবদ্বীপ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এক সময়ে এই পল্লী বহু অধ্যাপক ও দেশ-বিদেশাগত বহু ছাত্রের অধ্যাপনা ও অধ্যয়নের কলরবে মুখরিত হইত। এই সকল অধ্যাপক-বর্গের অগ্রগণ্য পণ্ডিতকুল-চূড়ামণি রুদ্রমঙ্গল ন্যায়ালঙ্কারের নাম ও অধ্যাপনার খ্যাতি সমগ্র বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। এই গ্রামে পণ্ডিত রুদ্রমঙ্গল ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বংশে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা

শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় যাদবেশ্বরের পিতৃশিষ্যগণ শিক্ষালাভার্থ তাঁহাকে বারাণসীধামে প্রেরণ করেন। সেখানে যাদবেশ্বর ষড়দর্শনবেত্তা অধ্যাপক কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকট ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন এবং বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর নিকট বেদান্ত ও যোগদর্শন অধ্যয়ন করেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে শিরোমণি মহাশয়ের নিকট তিনি 'তর্করত্ন' উপাধি লাভ করেন। প্রাচ্য দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া কাশীর কুইন্স কলেজের প্রধান অধ্যাপক গ্রিফিথ্স্ সাহেব তাঁহাকে প্রতীচ্য দর্শনের মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য উক্ত কলেজে আহ্বান করেন। এইরূপে তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের তুলনায় সমালোচনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন।

কর্ম্মজীবনে প্রবেশ

অধ্যয়ন শেষ করিয়া যাদবেশ্বর দেশে ফিরিলেন। ফিরিয়াই রঙ্গপুরের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ পাইলেন। কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইবার পর রঙ্গপুরের জমিদাররা মিলিয়া একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় খুলেন। সেটি পরে কলেজে উন্নীত হয়।

পূর্ব্বোক্ত স্কুলের অধ্যাপনা ছাড়িয়া যাদবেশ্বর পরে ঐ কলেজের অধ্যাপক হন। কিন্তু কলেজটি বেশীদিন টিঁকে নাই। অধুনা রঙ্গপুরে যে বিখ্যাত কারমাইকেল কলেজ নামে প্রথম শ্রেণীর কলেজ রহিয়াছে, সেই কলেজের উদ্যোক্তাদিগের মধ্যে পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বরও ছিলেন, এবং তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন কলেজ-কমিটির সদস্য ছিলেন।

সাহিত্যালোচনায় বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই রঙ্গপুর জেলার খ্যাতি আছে। রঙ্গপুর কুণ্ডীর জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী ছিলেন স্বয়ং কবি এবং বিদ্যোৎসাহী জমিদার। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় "রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ" প্রকাশিত হইত। কবি কালীচন্দ্রের মৃত্যুর পর পত্রখানি হস্তান্তরিত ও ও নামান্তরিত হয়—কাকিনাধিপতি শম্ভুচন্দ্রের ব্যয়ে "রঙ্গপুর দিক্-প্রকাশ" নামে প্রকাশিত হইতে থাকে। যাদবেশ্বরের বহু প্রবন্ধে এই পত্র সুসমৃদ্ধ হইত। তদ্ব্যতীত রাজসাহীর "হিন্দু-রঞ্জিকা"তেও যাদবেশ্বর বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কাকিনারাজ শম্ভুচন্দ্র উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্যের অনুসরণ করিয়া "নবরত্ন সভা" গঠন করিয়াছিলেন। এই সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বরের ভ্রাতা পণ্ডিত ঈশ্বর বিদ্যালঙ্কার। সুপ্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার স্যার গ্রীয়ার্সন বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার Linguistic Survey of India নাম গ্রন্থের অন্তর্গত উত্তরবঙ্গের ভাষাতত্ত্ব রচনাকালে পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর সাহায্য করিয়াছিলেন।

রঙ্গপুরের প্রথম কলেজ উঠিয়া গেলে যাদবেশ্বর অনুরুদ্ধ হইয়াও আর কোথাও চাকুরী স্বীকার করেন নাই। তিনি চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক অধ্যাপনা করিতে অভিলাষী হইলেন। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের পূজনীয় পিতৃদেব কৃষ্ণধন ঘোষ (কে, ডি, ঘোষ) মহাশয় তখন রঙ্গপুরের সিবিল সার্জ্জন ছিলেন। রঙ্গপুরের সকল প্রকার জনহিতকর কর্ম্মের সহিত তাঁহার সংযোগ ছিল। তিনি শাস্ত্রানুরাগী ছিলেন। তর্করত্ন মহাশয়ের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তিনি এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলেন। রঙ্গপুর জেলায় বিদ্যোৎসাহী বদান্য জমিদার বিস্তর ছিলেন। কৃষ্ণধন ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় জমিদার ও রাজপুরুষদিগের অর্থ-সাহায্যে তর্করত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইল। যাদবেশ্বরের পাণ্ডিত্যে ও অধ্যাপনাগুণে সেই চতুষ্পাঠী আজিও চলিতেছে এবং রঙ্গপুরে শাস্ত্রালোচনার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। তর্করত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে দেশ বিদেশ হইতে বহু ছাত্র আসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। তর্করত্ন মহাশয় প্রধানতঃ কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন ও স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তদ্ব্যতীত প্রয়োজন হইলে অন্যান্য শাস্ত্রেরও অধ্যাপনা হইত। অধ্যাপক মহাশয় সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী হওয়ায় নানা শাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ হইবে বলিয়া সকল শ্রেণীর বিদ্যার্থী এই চতুষ্পাঠীতে আগমন করিতেন। পণ্ডিতরাজের মুখে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের ব্যাখ্যা ও তুলনায় সমালোচনা শুনিবার জন্য অনেক দার্শনিক পণ্ডিতও এখানে সমবেত হইতেন। দর্শনশাস্ত্রের ন্যায় জটিল বিষয়ের সরল, প্রাঞ্জল, সহজ-বোধ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করিতে পণ্ডিতরাজ অদ্বিতীয় ছিলেন। ভক্তিশাস্ত্রেও পণ্ডিতরাজের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার ভাগবত ব্যাখ্যাও অতুলনীয় ছিল। তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত স্মৃতিশাস্ত্রে বিচারের ফলে স্মার্ত্ত রঘুনাথ বিদ্যারত্ন ও মধুসূদন স্মৃতিরত্ন তর্করত্ন মহাশয়কে অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

তর্করত্ন মহাশয় সর্ব্বশাস্ত্রে সমান পারদর্শী ছিলেন বলিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে "পণ্ডিতরাজ", তাঁহার অনন্যসাধারণ কবিত্বশক্তির জন্য বারাণসী-ধামে ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে "কবিসম্রাট" এবং তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল তাঁহাকে "পণ্ডিত-কেশরী" উপাধি দান করেন। সরকার হইতে উত্তরবঙ্গে তিনিই সর্ব্বপ্রথম মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অধ্যাপকরূপে যাদবেশ্বর অনেককে উপাধি প্রদানও করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে যিনি যে উপাধি পাইয়াছিলেন, তিনিই তাহা সাদরে ও সসম্মানে ব্যবহারে করিয়াছিলেন। তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে "বিশ্ব-কোষে"র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "প্রাচ্য বিদ্যা-মহার্ণব", টাকীর রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় "শ্রীকণ্ঠ", যশোহর কলেজের অধ্যাপক ঐতিহাসিক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বিদ্যাভূষণ", রাজসাহীর ঐতিহাসিক-চার্য্য অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় "পঞ্চানন", অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "তত্ত্বসরস্বতী" শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় "বিদ্যাভূষণ" এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব কর্ণধার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "সরস্বতী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (কিন্তু স্বর্গীয় সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের "সরল বাঙ্গালা অভিধানে" দেখিতেছি, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "সরস্বতী" উপাধি "নদীয়ার পণ্ডিতগণে"র নিকট হইতে পাইয়াছিলেন।)

সংস্কৃত ও বাঙ্গলা সাহিত্য-চর্চ্চা

সংস্কৃত ভাষায় তর্করত্ন মহাশয়ের অসাধারণ অধিকার ছিল। আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী ও পণ্ডিত তারাচরণ তর্করত্ন মহাশয়ের মধ্যে সনাতন ধর্ম্মমত সম্বন্ধে যে বিচার হয়, যাদবেশ্বর তাহাতে তর্করত্ন মহাশয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন। বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিতরাজ অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী সংস্কৃত কবিতায় পণ্ডিতরাজের সহিত আলাপ ও সমস্যাপূরণ করিয়া প্রীতি লাভ করেন এবং ইঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। অনেক সংস্কৃত সাময়িক পত্রে যাদবেশ্বর বহু সংস্কৃত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি "বাণ বিজয়" নামক একখানি আখ্যান পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেকগুলি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সুভদ্রাহরণ চম্পূঃ, প্রপাতকুসুম, অশ্রুবিন্দুম্, অশ্রুবিসর্জ্জনম্, রাজ্যাভিষেক কাব্যম্, রত্নকোষকাব্যম্, অন্নপূর্ণা স্তোত্রম্, শিবস্তোত্রম্, গঙ্গাদর্শন কাব্যম্, ভারতগাথা প্রভৃতি তাঁহার সংস্কৃত কবিত্ব-শক্তির উজ্জ্বল নিদর্শন। উপাধি পরীক্ষায় তিনি দর্শন ও কাব্যের পরীক্ষক ছিলেন, এবং সংস্কৃত-বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চাতেও তিনি অবহিত ছিলেন। পূর্ব্বকালে সাধারণতঃ পণ্ডিতগণ বাঙ্গালা সাহিত্যকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চক্ষুতে নিরীক্ষণ করিতেন; বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালা সাহিত্য রচনা করা তাঁহারা পাপ বিবেচনা করিতেন। এখনও অনেকে তাহাই করিয়া থাকেন; কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্য পণ্ডিতরাজের নিকট অনাদৃত হয় নাই। "ভারতবর্ষে" তিনি বহু সুচিন্তিত, সুলিখিত, গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তর্করত্ন মহাশয়ের উদ্যোগে রঙ্গপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছিল। এই শাখা-পরিষদের তিনিই ছিলেন সভাপতি। রঙ্গপুর ত্যাগের পরও সভার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই—দূরে থাকিয়াও চিরদিন তিনি এই শাখা-সভার মঙ্গল চেষ্টা করিয়াছেন। বগুড়া নগরে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে তিনি দর্শন শাখার সভাপতি পদে বৃত হন। বাঙ্গালা বহু মাসিক, সাপ্তাহিক ও সাময়িক পত্রেও তাঁহার অনেক বাঙ্গালা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা কবিতা রচনায়ও তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ ছিল। তাহার পরিচয়স্থল তাঁহার "দ্রৌপদী" কাব্য। এতদ্ব্যতীত, বাঙ্গলা-ভাষায় রচিত তাঁহার সংশয়-নিরসন প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, অশোক উপন্যাস, একাদশী-তত্ত্ব, ত্রিসন্ধ্যা তত্ত্ব, আশা কাব্যের সমালোচনা, বঙ্কিমবাবুর মৃণালিনীর সমালোচনা, বিলাতী বিচার, 'আমি একটি অবতার' প্রভৃতি গম্ভীরও লঘু সাহিত্য, সমালোচনা, নক্‌সা বাঙ্গলা সাহিত্যকে চির অলঙ্কৃত করিয়া রাখিবে।

পোলিটিক্যাল পণ্ডিত

আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যকে ইংরেজী সাহিত্যের তর্জ্জমা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নব্য বাঙ্গলা-সাহিত্য ইংরেজী ভাবে ভরপুর। কিন্তু তর্করত্ন মহাশয়ের রচনায় বিদেশীয় ভাবের আভাষ মাত্র দৃষ্ট হয় না—উহা স্বদেশীভাবে পূর্ণ। বস্তুতঃ পণ্ডিতরাজ স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি-সম্পন্ন ছিলেন। তাহার আর একটা পরিচয়—তাঁহার রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগদান। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ আন্দোলন হইতে তিনি আপনাকে দূরে রাখিতে পারেন নাই। রঙ্গপুর জাতীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ কল্পে জেলা-সমিতির যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার সভাপতিরূপে তিনি বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই কারণে জেলার অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত তিনি Special constableএর কার্য্য করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু হাইকোর্টের নির্দ্দেশে এই আদেশ প্রত্যাহৃত হয়। ইহার প্রতিবাদস্বরূপ তর্করত্ন মহাশয়

অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পরিত্যাগ করেন। রাজদত্ত মহামহোপাধ্যায় উপাধি ত্যাগেও তিনি উদ্যোগী হইয়াছিলেন, কিন্তু বন্ধুবান্ধবগণের অনুরোধে তদনুষ্ঠানে প্রতিনিবৃত্ত হন।

যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু "ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত"-সুলভ সঙ্কীর্ণতা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। তাঁহার চিত্ত উদার ছিল। সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রবিহিত কি না এই আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইলে, এই উদারতা বলে তিনি সমগ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সমাজের মতের সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে এরূপ মত অকুণ্ঠোভয়ে প্রচার করিয়াছিলেন। বাল্য বিবাহ ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্বন্ধেও তাঁহার মতের উদারতা উল্লেখযোগ্য। অধুনা 'সমাজ-সংস্কারক' যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, ততদূর না হউক, তিনি সমাজের অনেক জটিল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতেন। রাজনীতির সহিত সংস্রবের জন্য রাজপুরুষরা তাঁহাকে 'পোলিটিক্যাল পণ্ডিত' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

সন ১৩৩১ সালের ৭ই ভাদ্র পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় লোকান্তরে প্রস্থান করেন।

তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ মহাশয় পিতৃ-পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া সাহিত্যসেবায় নিরত আছেন। *

* রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (চতুর্দ্দশ ভাগ, ২য় সংখ্যা) প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী লিখিত "পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর" অবলম্বনে।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব-জ্ঞানের ক্রমবিকাশ

ডাক্তার শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম-বি

জল

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, যতদিন জলে দেবতা-জ্ঞান জনসাধারণের অন্তরে বদ্ধমূল ছিল, ততদিন জলে মলমূত্র, নিষ্ঠীবন প্রভৃতি নিক্ষেপ অধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। রীতিমত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক জলের এই স্তব করা হইত :

ওঁ তোয় প্রাণিনাং প্রাণঃ সৃষ্টেরাদ্যঞ্চ নির্ম্মিতং।
তদ্ধেতু কারণং প্রোক্তং দ্রব্যানাং দেহিনাং তথা॥

'হে জল! তুমি প্রাণিদের প্রাণ; সৃষ্টির আদিতে তোমার সৃষ্টি। দেহী ও দ্রব্যের শুদ্ধির কারণ তুমি।'

পুরাণের মতে জল আনিয়াছিলেন ভগীরথ স্বর্গ হইতে। ব্যবহার্য্য জল বাস্তবিকই স্বর্গ হইতে আসে। বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন, সমুদ্রের প্রত্যেক বর্গ-মাইল হইতে প্রতি মিনিটে ৮৭৯০ মণ জল বাষ্পীভূত হইয়া আকাশে উঠে। আকাশ হইতে বৃষ্টি, বরফ, শিলা বা শিশিররূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। বৃষ্টির জল হইতে নদী, নির্ঝরিণী, হ্রদ, পুষ্করিণী, কূপ প্রভৃতির সৃষ্টি। আয়ুর্ব্বেদ-মতে গাঙ্গ বা নদীর জল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেখানে এবং যতদিন নদীর জল পবিত্র থাকে, তীরের নিকটস্থ নর্দ্দামা খাল প্রভৃতি হইতে প্রবাহিত ময়লার পরিমাণ নদীজলের পরিমাণের তুলনায় খুব অল্প যতদিন থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত ব্যবহারের পক্ষে নদীর জলই প্রশস্ত।

এই কারণেই বোধ হয় কলিকাতায় পাকা জল-প্রণালীর সৃষ্টি। ১৮২০ সালে চাঁদপাল ঘাটে একটী জলকল বসান হয়। সেই কলে গঙ্গার জল তুলিয়া খোলা পাকা প্রণালীতে রাখা হইত। বৎসরে আট মাস সাত ঘণ্টা করিয়া এই কল চলিত। অক্টোবর হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত নাকি ঐ জল পান স্নান রন্ধন প্রভৃতির জন্য ব্যবহৃত হইত।

বড়-লাটের প্রাসাদের সদর দরজার নিকট এক জল-প্রণালী ছিল।

ইংরাজী বিশেষজ্ঞেরা বলেন, নদীতে জল বেশি এবং ময়লা অল্প থাকিলে সে জল ব্যবহার করা যায়। মধ্য স্রোতের জল এবং গভীর জল শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা বলেন, যেখানে কলের জলের অভাব, সেখানে নদী-তীর হইতে ২০।৩০ ফুট দূরে সংগৃহীত জল ব্যবহার করা যায়। দশ মাইলের মধ্যে কোন গ্রাম যদি না থাকে, জোয়ার-ভাটার প্রভাব যদি না থাকে, এবং নর্দ্দামা প্রভৃতির ময়লা আসিয়া পড়িবার যদি কোন সম্ভাবনা না থাকে, এবং সেই স্থানে যদি নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি নঙ্গর না করে, সেইখানকার জল ব্যবহার করা যাইতে পারে; অথবা কোন সহরে গিয়া জল ফিল্টার করিয়া তদ্দ্বারা পান ও স্নানের ব্যবস্থা হইতে পারে। পলতায় যে স্থান হইতে কলিকাতার পানীয় জল সংগ্রহ করা হয়, সে স্থানের জল কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর পরীক্ষক পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, সে জলে মলের অসংখ্য জীবাণু রহিয়াছে। নিকটেই কামারহাটী প্রভৃতি কলের শ্বেতখানার ময়লা আসিয়া পড়িতেছে, প্রায় অশোধিত অবস্থায়।

দূষিত জলের জন্য কি কি রোগ হয়? প্রধানতঃ কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি পেটের অসুখ। ওলাউঠা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে 'মরিয়াও না মরে রাম' —আজ হ্রাস, কাল বৃদ্ধি। অকস্মাৎ কলেরার রব উঠিল 'চলরে, চল রে'। 'হয় ভবধাম ছেড়ে চল, আর নয় বাঁচতে চাও ত হাসপাতালে চল'। আধুনিক প্রণালীতে শতকরা ৮০ জন বেঁচে যায়। যাহা হয়, তড়িঘড়িই হয়। দু-এক সপ্তাহের মধ্যে কলেরা-ওয়ার্ড শূন্য। আবার কিছুদিন পর কলেরার সেই 'চল রে' রব। কলিকাতায় ওলাই-চণ্ডী নাকি বৎসরে দুই তিন বার নাচিয়া উঠেন। পঞ্জিকা দেখিয়াও নাকি আসেন; কখনও বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ে, কখনও মাঘ ফাগুন চৈত্রে। তাই যদি হয়, পূর্ব্ব হইতে অভ্যর্থনার আয়োজন করিলে হয় না? প্রথম আয়োজন টীকার। দ্বিতীয় আয়োজন পল্লীর মধ্যে প্রথম আগমনের বার্ত্তা ঘোষণা। তৃতীয় আয়োজন, রোগ ও প্রতিকার সম্বন্ধে পল্লীবাসীর জ্ঞানসঞ্চার। কর্পোরেশন স্বাস্থ্য-বিভাগ এবং পল্লীস্বাস্থ্যসমিতি বা ওয়ার্ড বেল্‌থ এসোসিয়েশন্ সমূহ দ্বারা এই তিন প্রকার কার্য্যই চলিতেছে। স্বাস্থ্যসমিতি রোগ ও তাহার প্রতিকার এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে ১৯১০

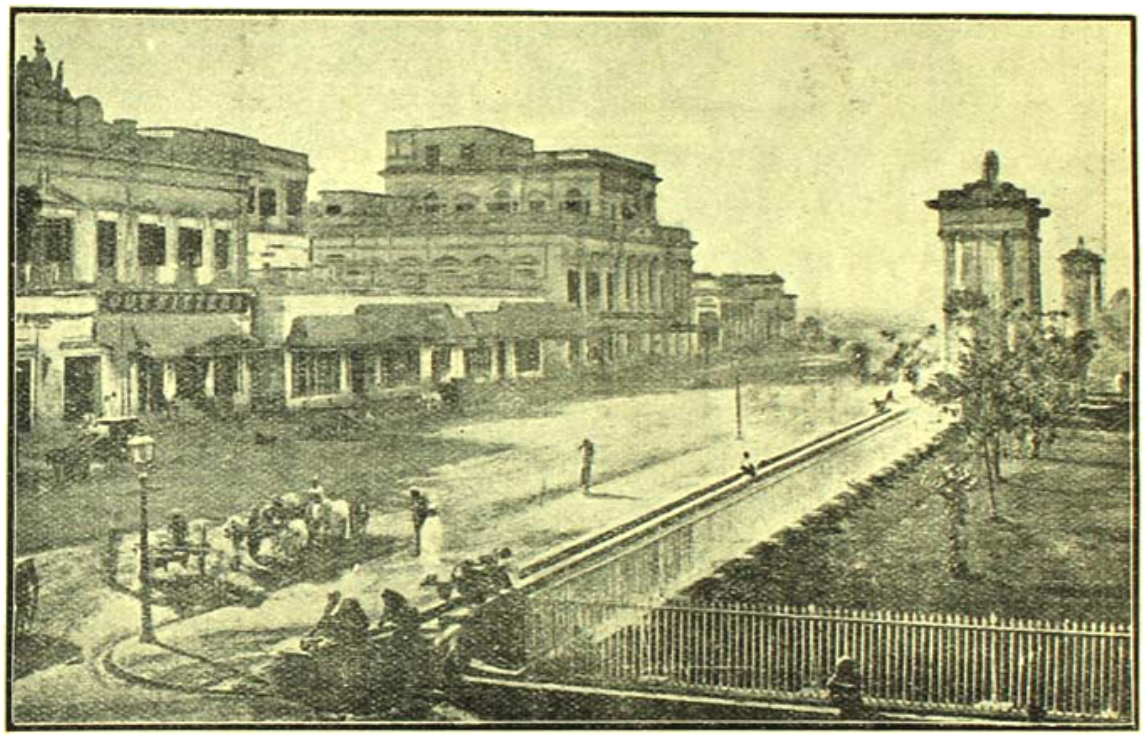

বড়-লাটের প্রাসাদ—পাকা জল-প্রণালী হইতে জল তোলা হইতেছে

ওলাউঠা রোগে অত্যধিক পরিমাণে মলমূত্র নির্গমের ফলে

সালে যে কার্য্য করিয়াছিলেন পূর্ব্ব পৃষ্ঠার ছবিতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

এই পল্লীস্বাস্থ্য-সমিতি সমূহের কর্তৃত্বাধীনে স্থানে স্থানে ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হয়, ওলাই চণ্ডীকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। ইহার আকার অতি ক্ষুদ্র, বাঁকা ডাক্তারী হুঁচের মতন। তাই কি ইহার নাম বিসূচিকা? আকার কতকটা ইংরাজী কমার মত (,), তাই ইহার নাম কমা ব্যাসিলাস্। কলেরা রোগীর মল-লিপ্ত কাপড় পুষ্করিণীতে কাচিলে ঐ বীজাণু হাজারে হাজারে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া জল দূষিত করে; ঐ জল পান করিলে কলেরা হয়। কিন্তু ঐ জল ফুটাইলে বীজাণু মরিয়া যায়। রোগীর মলে মাছি বসিয়া ঐ মাছি যে খাদ্যে বসে, সেই খাদ্য পেটে গেলেই কলেরা হয়। খাবার সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিলে মাছির ভয় থাকে না। পাইখানায়, ড্রেনে, মেজেতে ফিনাইল ছড়াইলে কলেরার বিষ নষ্ট হয় এবং মাছির উপদ্রবও কমে। তাই পল্লীস্বাস্থ্য-সমিতির বক্তাগণ বলেন কলেরাকে ভয় করিতে নাই। ভয়ে রোগ ছড়াইয়া পড়ে এবং নানাপ্রকার বিভ্রাট ঘটে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। দাদগ্রামের একটী যুবতী, তাহার স্বামী ও বিশজন আত্মীয় স্বজন সহ রথযাত্রা উপলক্ষে যখন শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত, তখন ওলাউঠার রথযাত্রে পুরীধামে ভীষণ আতঙ্ক। যুবতীর স্বামী আক্রান্ত হইয়া যখন হাসপাতালে শয্যাশায়ী এবং সহযাত্রীরা পলায়নোন্মুখ, যুবতী অনন্যোপায় হইয়া সহযাত্রীদের সঙ্গে গ্রামে ফিরিল। সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন ওলাই-চণ্ডী। তাঁহার আক্রমণ ব্যর্থ করিতে না পারিয়া ঐ সহযাত্রীদলের বারো আনা লোক কাল-কবলে পতিত হইল। অন্তঃসত্ত্বা যুবতী কিন্তু রক্ষা পাইলেন। দশ বৎসর পরে সেই গ্রামের এক অশ্বত্থবৃক্ষ-মূলে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর নিকট লোকের ভিড়। কিছুদিন পরে তিনি এক গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তারানাথের কন্যার কি বিয়ে হয়েছে?" গ্রামবাসীরা বলিল "দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি পুরীধামে ওলাউঠা রোগে দেহত্যাগ করেছেন, তাঁর মেয়ের বিবাহের উদ্যোগ কে করবে?" ঐ সন্ন্যাসীর আকারে-প্রকারে যখন বুদ্ধিমান গ্রামবাসীরা বুঝিল তিনিই তারানাথ, তাহারা স্ত্রীকে স্বামীগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। যুবতীর সন্দেহ যখন কিছুতেই ঘুচিল না, সন্ন্যাসী গ্রামবাসীর উপর কন্যার বিবাহের ভার অর্পণ করিয়া একদিন নিরুদ্দেশ হইলেন।

তাই পল্লীসমিতির প্রথম উপদেশ (১) ভয় বর্জ্জন করিয়া কলেরার বীজনাশ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয় উপদেশ (২) ওলাই-চণ্ডীর বাৎসরিক আগমন সম্ভাবনার সময় পেটের অসুখ হইবামাত্র স্বাস্থ্য-সমিতির ডাক্তার কিম্বা অন্য কোন ডাক্তারকে জানাইতে হইবে। তৃতীয় উপদেশ (৩) রোগ ওলাউঠা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলে রোগীকে স্বতন্ত্র রাখিয়া চিকিৎসা করিবার অথবা হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা উচিত। হাসপাতালে রোগী ভাল হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহার মল কলেরা বীজাণুমুক্ত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে বাড়ী ফিরিতে দেওয়া উচিত নয়। ইটালী চিত্তরঞ্জন কলেরা-ওয়ার্ডে এই ব্যবস্থা আছে।

স্বাস্থ্যসমিতির উপদেশ রোগের সূচনা মাত্র কর্পোরেশনের ও স্বাস্থ্য-সমিতির কর্ম্মচারীদের জানান আবশ্যক। স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ম্মচারীদের সংবাদ দিলে মফঃস্বলেও তাঁহারা নর্দ্দমা শৌচখানা প্রভৃতিতে ফিনাইল ঢালা এবং টীকা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। চতুর্থ উপদেশ (৪) জল ফুটাইয়া খাওয়া, এবং গঙ্গাজল কি নদীর দূষিত জল প্রভৃতি স্নান, বাসন ধোয়া প্রভৃতি কোন কাজে ব্যবহার না করা। পঞ্চম উপদেশ (৫) খালি পেটে রোগীর নিকট যাওয়া কিম্বা শুশ্রূষা করা উচিত নয়। রোগীকে দেখিয়া ভুলবশতঃ হাত ধোলাই না শোধন করিয়া সেই হাত যদি মুখে দেওয়া যায়, এবং ইতিপূর্ব্বে যদি কিছু খাওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে অম্ল পাকরসে কলেরা বীজাণু নষ্ট হয়। ষষ্ঠ উপদেশ (৬) ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবের সময় বাজারের খাদ্য বর্জ্জনীয়। (৭) প্রধানতঃ তিনটী কথা মনে রাখা আবশ্যক:—

১। আমরা ওলাউঠা পান করি।

২। আমরা ওলাউঠা আহার করি।

৩। আমরা ওলাউঠা নিশ্বাসের সঙ্গে টানি না। রোগীর ঘরের হাওয়ায় ওলাউঠা থাকে না। রোগীর কাছে গেলে রোগ তেড়ে আসে না।

ঊনবিংশ শতাব্দী নব্বইয়ের কোটায় পা দিয়ে পলায়নের চেষ্টা করিতেছিল। স্বর্গীয় আবদুল লতিফ খাঁর সাহিত্য-সমিতির সাম্বৎসরিক অধিবেশনের খুব ঘটা। টাউন-হলে

সভার অধিবেশন। আমার উপরে ভার ছিল কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বীজাণু প্রদর্শন করিবার। তখনকার বড়লাট ছিলেন বোধ হয় লর্ড ল্যান্সডাউন। কলেরার নীলদ্যুতি-সম্পন্ন বীজাণুপুঞ্জ যাই তাঁহাকে দেখাইতে গিয়াছি, অমনি তিনি দু হাত দূরে হটিয়া গেলেন। দশ হাত দূরে নয়, কারণ আমার শিং ছিল না। ইংরাজদের কলেরাকে ভয় করিবার বিশেষ কারণ আছে। তাঁহাদের কলেরা প্রায়ই সাংঘাতিক হয়। বোধ হয় ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান

কলেরার ভৈরব নাদে আতঙ্কিত হয়ে যদি কেহ বলেন ওখানে কাজ করতে যাব না, আমার শরীর অবসন্ন ও মুখ শুষ্ক হচ্ছে, শরীর ভয়ে কাঁপছে, স্বাস্থ্য-সমিতির সদস্যেরা তাঁদের সঙ্গে লইয়া কলেরা-আক্রান্ত পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিতেছেন :

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ"

"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ"

হে কর্ম্মী তরুণ! এসো আমাদের সমিতির সদস্যদের সঙ্গে এস; ক্লৈব্য ত্যাগ কর, দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর; ভয়

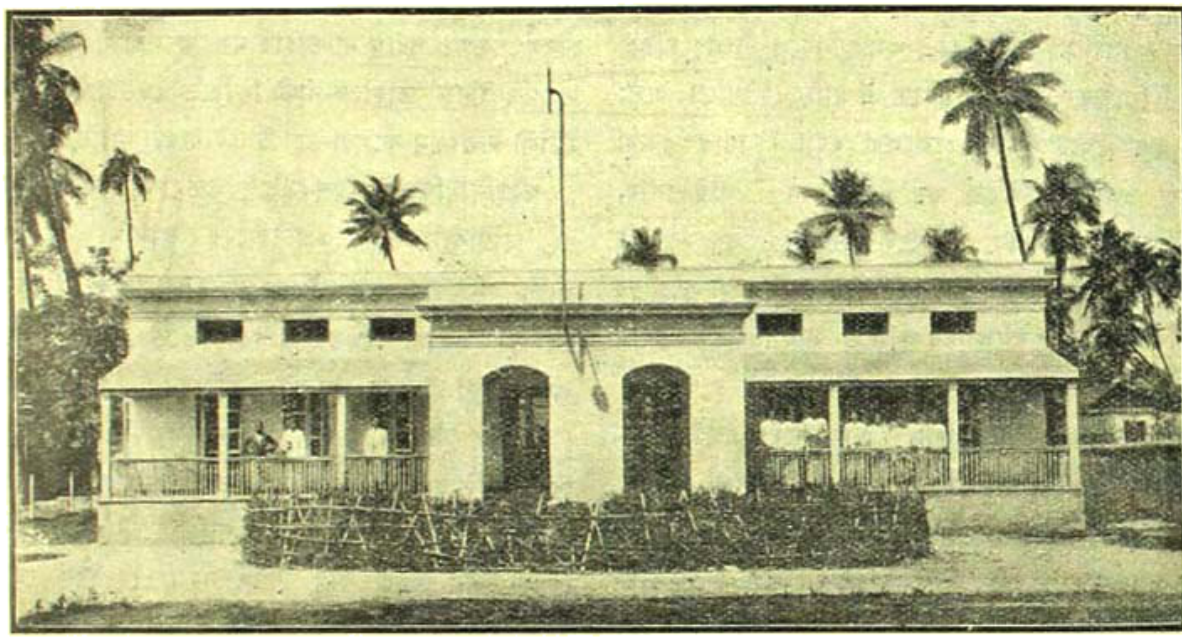

গোয়াচাঁদ রোডে কলেরা ওয়ার্ড (মক্ষিকা-প্রবেশ-নিবারক জাল-বেষ্টিত)

তদানন্তীন স্বেচ্ছাসেবিক বোর্ডের সদস্য সার হেনরী হ্যারিসন চট্টগ্রামে কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। অন্য সাহেবদের মতন তিনি কাঁচা দুধ খাইয়াছিলেন। তাহাতে কলেরার বীজাণু ছিল।

কলেরা থাকে জলে ও খাবারে; বাতাসে থাকে না। সুতরাং কলেরা-রোগীর কাছে, কি সেই বাড়ীতে যাইবামাত্র আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

"সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি
বেপথুশ্চ শরীরে মে"

পেয়ো না; অদৃশ্য শত্রু ঐ সংক্রামক জীবাণু ধ্বংস করবার অস্ত্র—বৈজ্ঞানিক গাণ্ডীব হাতে নিয়ে অগ্রসর হও। নিবার্য্য রোগ নিবারণ ক'রে দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হও। এই এক কলিকাতা সহরে বৎসর বৎসর আড়াই হাজার, সমগ্র বাংলায় ষাট হাজার লোককে বলিদান দিতে হয় ওলাই-চণ্ডীর নিকটে। কলিকাতার দশ হাজার এবং বাংলার আড়াই লক্ষ লোক অনেক সংগ্রাম করে রাক্ষসীর কবল হতে মুক্ত হয়। নির্ভীক চিত্তে এই অত্যাচার নিবারণে অগ্রসর হও।

গারোদের দেশ

শ্রীঅমলকৃষ্ণ রাহা

পাশ্চাত্য জগতের একই সহর ও জায়গাগুলির ছবি ও ভ্রমণ-কাহিনী আজকাল মাসিক-পত্রে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও দুর্গম দেশের খবর বড়-একটা বাহির হয় না। আমাদের দেশেও এরূপ অনেক জায়গা আছে, যেখানে আদিমকালের মানুষেরাই এখনও নগ্নদেহে বসবাস করে ও চলিয়া-ফিরিয়া বেড়ায়। সভ্য মানুষের মধ্যে জঙ্গল-বিভাগের কোনও কোনও কর্ম্মচারী কখনও কখনও এখানে আসিয়া থাকেন। তাঁহারাও সব গভীর বন-জঙ্গলের বেশী ভিতরে যান না। যেখানে যেখানে তাঁহাদের প্রয়োজন, সেইটুকু দেখিয়াই চলিয়া আইসেন।

আসামের গারো-পাহাড় ও তৎসংলগ্ন জঙ্গল এইরূপ একটী জায়গা। গরিলা থাকিলে ইহাকে ভারতীয় আফ্রিকা বলা অসঙ্গত হইত না। গারোরা বলে যে, তাহাদের পাহাড়ে সিংহ আছে। এ কথা কতদূর সত্য জানি না। হয় ত ছিল এক-কালে।

গারো-পাহাড় অসংখ্য পাহাড়ের শ্রেণীবদ্ধ সমষ্টি। এক ধারে ময়মনসিং, রংপুর, অন্য ধারে গোয়ালপাড়া এই বিস্তীর্ণ পাহাড়শ্রেণীকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বহুদিন আগে এই পাহাড়শ্রেণীর মালিক ছিলেন সুসং দুর্গাপুরের মহারাজা। একবার গারোরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তখন ইংরাজ-সরকার গারো হিলস্ আইন পাশ করিয়া এই পাহাড়-শ্রেণী নিজেদের অধীনে লইয়া আসেন। ইহার জন্য সুসং পরিবার ইংরাজ-রাজের নিকট টাকা পাইয়া থাকেন।

গারো-হিলস্-ট্র্যাক্ট নামে এখন ইহা একটী পলিটিকাল ডিষ্ট্রিক্ট; একজন ডেপুটী কমিশনার ইহার রক্ষক। টুরা তাঁহার হেড-কোয়ার্টার। টুরাই গারো-পাহাড়ের একমাত্র সহর। এখানে একদল ইংরাজের পল্টন থাকে। আগে আগে পল্টনের একজন উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী টুরার ডেপুটী কমিশনার হইতেন। আমি যখন টুরায় ছিলাম, তখন একজন সিভিলিয়ান ডেপুটী কমিশনার ছিলেন।

গারো-পাহাড়ে ময়মনসিং করিয়া ঘুরিয়া আসা যায়। সুসং দুর্গাপুর হইতে পাহাড়ের সীমা

সমতলভূমিতে ক্যাম্প—অদূরে পাহাড়-শ্রেণী

কাছেই। কিন্তু সহজ রাস্তা, আসাম মেলে গিয়া শান্তাহারে গাড়ী বদলী করা। পরে মিটার লাইনে উঠিয়া গোলক-গঞ্জে ধুবড়ী লাইনের জন্য গাড়ী বদল করিয়া ধুবড়ী হইতে ষ্টীমারে গোয়াল-পাড়া অথবা মানকাচরে নামিতে হয়।

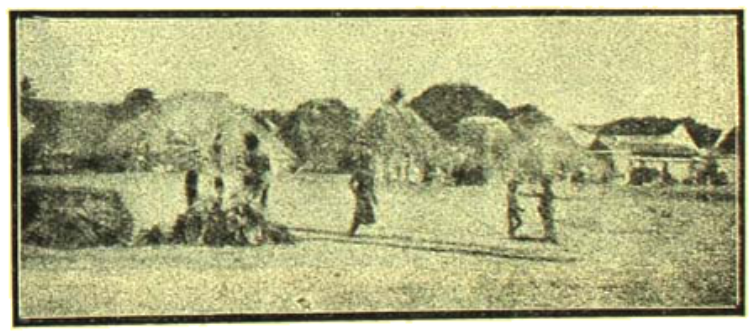

সমতল প্রদেশে একটী গ্রাম

গোয়ালপাড়া হইতে গারো-পাহাড়ের নীচে দামড়া পর্য্যন্ত মোটর সার্ভিস আছে। গ্রীষ্ম ও শীতকালে মোটর চলে। মানকাচর হইতে গরুর গাড়ীতে টুরা পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। দামড়া

হইতেও গরুর বা মহিষের গাড়ী দাদু পর্য্যন্ত চলে। তাহাও অতি কষ্টে। আমি যখন ও অঞ্চলে ছিলাম, তখন দাদুর ওপারেও যাহাতে গো যান চলে, তাহার চেষ্টা হইতেছিল। রাজনে সেই জন্য নদীর উপর একটী পোল তৈয়ারী জন্য বিভাগ হইতে হইতেছিল। তাহার পর যাইতে হইলে হাতীর

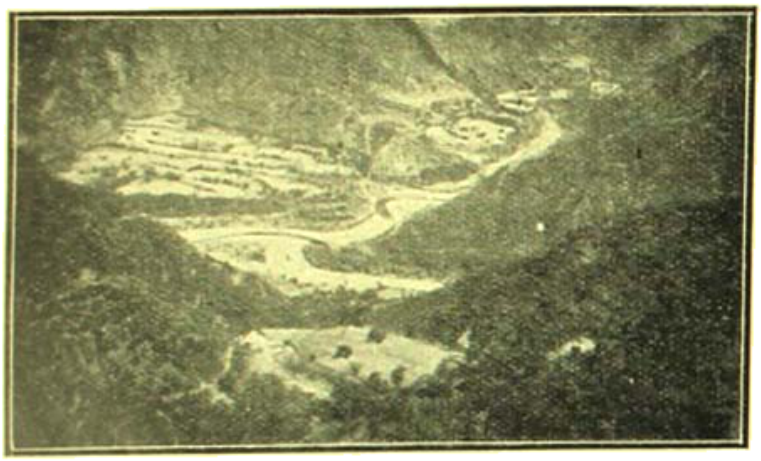

গারো পাহাড়শ্রেণী

পিঠে চাউল ও আহারাদির সব জিনিষপত্র চাপাইয়া পায়ে হাঁটা ছাড়া উপায় নাই। রাস্তা এক-রকম ভাল। সরকারী রাস্তা আছে। তবে অসংখ্য পাহাড়িয়া নদীতে পোল নাই। এই জন্য গরুর গাড়ী চলে না। তাহা ছাড়া সরকারী রাস্তা ছাড়িয়া একটু এদিক-ওদিক যাইতে হইলেই

রং রং সিজির উপর হইতে পাহাড়ের দৃশ্য

গারোদের পায়ে চলা পথ ছাড়া উপায় নাই। অনেক স্থানে তাহাও নাই।

টুরার ডেপুটী কমিশনার বাদে, সিবিল সার্জ্জন, পুলিস সাহেব ও ডিভিসনাল ফরেষ্ট-অফিসার থাকেন। আমি যখন গিয়াছিলাম, তখন একজন বাঙ্গালী শ্রীযুত যতীন্দ্র দাস ছিলেন ফরেষ্ট-অফিসার। এখানে আমেরিকান ব্যাপটিষ্ট মিসনের একটা প্রকাণ্ড আড্ডা আছে।

গারোরা এক হিসাবে স্বাধীন। তাহারা জমির কোনও ট্যাক্স দেয় না। তবে সরকার প্রত্যেক যুবা গারোর উপর একটা কর লইয়া থাকেন। শুনিয়াছিলাম যে গারো-পাহাড়ের ভিতর ইংরাজের পুলিশ পর্য্যন্ত টুরার ডেপুটী কমিশনারের হুকুম ব্যতীত যাইতে বা কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারে না। গারো-পাহাড়ের সংলগ্ন সমতল ভূমিতে জায়গায় জায়গায় থানা আছে ও পুলিসের বন্দোবস্ত আছে। পাহাড়ের মধ্যে নাই। সরকারের নিয়োজিত গারো লস্করেরা অপরাধীকে ধরিয়া আনিয়া ডেপুটী কমিশনারের নিকট হাজির করে।

গারোরা টিবেটো-বর্ম্মণ জাতি। তাহারা কাপড়ের বিশেষ ধার ধারে না। ছেলেরা একটা কৌপীন ব্যবহার করে। মেয়েরা কোমর হইতে হাঁটুর অনেক উপর পর্য্যন্ত একটা বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া রাখে। দেহের উপরিভাগে সেলাই থাকে। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের হাতেই সাধারণতঃ আমাদের দেশের রাম-দার মত লম্বা লম্বা একপ্রকার দা থাকে। ইহাই তাহাদের প্রধান অস্ত্র। অবশ্য তীর ধনুকও আছে। আজকাল দুই চারজন বন্দুকও রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে।

গারোরা চাষবাস করে না, অর্থাৎ আমাদের মত জমিতে লাঙ্গল দেয় না। যাহারা সমতল ভূমিতে থাকে, তাহারা লাঙ্গল ব্যবহার করে। পাহাড়ের উপরে যাহারা থাকে, তাহারা সাধারণতঃ ঝুম্ করে। পাহাড়ের যে জায়গায় চাষ আরম্ভ করে, প্রথমে সেখানকার বনজঙ্গল পোড়াইয়া ফেলে। তাহার পর কোদালের মত এক রকম যন্ত্র দিয়া মাটী উপর-উপর খুঁড়িয়া ফেলে। এই প্রকার আবাদ করার নাম ঝুম্। ফসল তাহারা নানাপ্রকার করে না। ধান ও তুলাই তাহাদের প্রধান ফসল। আমার মনে হয়, গারোরা স্বাধীনতাপ্রিয় ও অত্যন্ত অলস জাতি। শুনিয়াছি পুলিসে সিপাহী করিবার জন্য আসল পাহাড়ী

গারো পাওয়া যায় না। যদিও বা এক-আধজন মেলে, তাহাদের কিছু বলিবার উপায় নাই। কোন অন্যায় করিলে যদি কিছু বলা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহারা সরকারী সাজপোষাক ফেরৎ দিয়া পাহাড়ে ফিরিয়া যায়। অভাব তাহাদের অত্যন্ত কম। অল্প একটু আধসিদ্ধ ভাত ও নদীর মধ্যে ধৃত এক-প্রকার পোকার মশলা-বিহীন তরকারী হইলেই তাহাদের দিন চলিয়া যায়। কাপড়ের খরচ ত নাই-ই। কাঁচা পয়সার দরকার নাই, কারণ পাহাড়ের ভিতরে দোকান বড়-একটা নাই। কিন্তু তাহারা নেশা জিনিষটা বিলক্ষণ ভালবাসে। একটী গারোকে একটা টাকা দিয়া যত কাজ করান না যাইতে পারে, একটী রেড্ ল্যাম্প-মার্কা সিগারেট বা একটু আফিম দিয়া তাহার দশগুণ কাজ করান যাইতে পারে।

গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু ও মুরগী দেখা যায়। প্রায় অধিকাংশ গারোই মুরগী পোষে। গরু রাখা মুস্কিল। কখন যে শার্দ্দূলরাজ লইয়া যান, ঠিক নাই। এই জন্য ছাগল গরু প্রভৃতি রাখা মুস্কিল।

গারোদের লিখিবার অক্ষর নাই। সরকার তাহাদের ইংরাজী অক্ষর ধার দিয়াছেন। ব্যাপটিষ্ট মিশনের পাদ্রীরাও বোধ হয় ইহার জন্য কিছু দায়ী। আসামীদের বা খাসিয়াদের মত বাঙ্গালা অক্ষর ইহাদের মধ্যেও প্রচলিত হইলে ভাল হইত। কিন্তু করে কে? বাঙ্গালী রাজার অধীনে ত ইহারা বহুকালই ছিল।

আজকাল অনেক গারো, বিশেষ সমতল প্রদেশের গারোরা ইংরাজী লেখাপড়া শিখিতেছে। সভ্যতার আলোক পাইয়া অনেকে দেহের আবরণেরও ব্যবস্থা করিতেছে। ছেলেরা খাকী হাফ-প্যাণ্ট ও সার্ট ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মেয়েরা, যাহারা কিছু কম শিক্ষিত, তাহারা বুকের উপর হইতে হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত সাড়ী বাঁধিতেছে। যাহারা আর একটু বেশী শিক্ষা পাইয়াছে, তাহারা পুরা মেম-সাহেব। পাহাড়ের মধ্যে যে সব জায়গায় গির্জ্জা ও স্কুল আছে, সেখানে অনেক সময় বাঙ্গালী মেম সাহেবদের মাদ্রাজী ধরণের সাড়ীপরা গারো মেম সাহেব আমার সভ্যতার অভ্যস্ত চোখ দুটাকে বেশ আরাম দিয়াছিল। নগ্ন প্রকৃতির সহিত নগ্ন মানুষের চেয়ে, বিলাতী সাড়ী হইলেও আবরণে ঢেওয়া মানুষ বেশ লাগিয়াছিল। শিক্ষিত গারোরা খাসিয়াদের মতই একটু বেশী ইংরাজী-ভাবাপন্ন। নামধামও বিলাতী মেসান; বিশেষ ক্রীশ্চানদের। এরূপ অবস্থা আমাদের দেশেও যথেষ্ট দেখা যায়। মাদ্রাজের দিকে ত কথাই নাই। সুতরাং গারোদের আর দোষ কি? ইহার প্রধান কারণ গারোদের উপর ইংরাজের প্রভাব, মিশনারী সাহেব-মেমদের সহিত সব সময় ঘনিষ্ঠ মিলামিশা

ক্যাম্প হইতে একটী দৃশ্য। নীচে খাস গারোদের একটী গ্রাম

এবং বাঙ্গালী বা অন্য কোনও স্বদেশীয় শিক্ষিত জাতির সহিত দেখাশুনা না হওয়া। ধন্য এই পাশ্চাত্য জাতি, আর ধন্য তাহাদের মনের ও অর্থের উদারতা। কোথায় এই ভয়ানক পথহীন দুর্গম দেশে গিয়া যে তাহারা গির্জ্জা

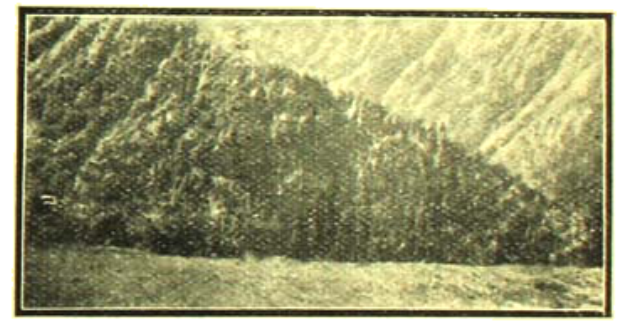

ঢেপা। গারো পাহাড় শ্রেণী। আসাম—দাদরা হইতে পাহাড়ে উঠিবার আগের দৃশ্য। সমতল প্রদেশ ও পাহাড়ের মাঝে নদী

ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ করিতে হয়।

এই সব জঙ্গলে চলা-ফেরার বিপদের কথা একটু বলি। জঙ্গলের মধ্যে, গারো পাহাড়ের ভিতরের জঙ্গলে নহে,

আমাদের সমতল ভূমির সুবিস্তীর্ণ জঙ্গলের যে সব অংশ হইতে কাঠ বাহির করা হইতেছে, সেখানে চলা-ফেরার পথ দুই রকম আছে। এক রাইড লাইন। জঙ্গলের মধ্য হইতে গরু বা মহিষের গাড়ী করিয়া কাঠ বাহিরা আনিবার জন্য যে সব একটু চওড়া রাস্তা আছে, তাহার নাম রাইড লাইন। রাস্তা সাধারণতঃ জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সমতল করা মাত্র। আর এক কুপলাইন। জঙ্গল-ব্যবসায়ীদের যাহার যেটুকু অংশ, তাহা সরু করিয়া জঙ্গল কাটিয়া একের অংশ হইতে অন্যের অংশ ভাগ করিয়া দেওয়ার জন্য যে রাস্তার মত আছে, তাহার নাম কুপ লাইন। অধিকাংশ সময়েই, অন্য চলাচলের পথ না থাকায়, এই সব কুপ লাইন ধরিয়া মানুষ চলা-ফেরা করে বলিয়াই ইহা শেষে রাস্তা হইয়া যায়। ইহা ছাড়া যে সব জঙ্গলের মধ্যে আদিম মানুষ বাস করে, সে সব জঙ্গলে তাহাদের পায়ে-

পর্ব্বতের উপরে ছোট হ্রদ। পাহাড় শ্রেণী

চলা পথও অর্থলোভী সভ্য মানুষ ব্যবহার করিয়া থাকে। অবশ্য সব নিম্নে সহজ পথ বোধ হয় দলবদ্ধ হাতীরাই বাহির করিয়া থাকে এই সব গভীর পাহাড় ও জঙ্গলে।

এই সব পথ অত্যন্ত বাঁকা-চোরা এবং এই সব অসংখ্য বাঁকের মুখে, বিশেষ যে সব জায়গায় নদী অতিক্রম করিতে হয়, কোথায় যে শার্দ্দূলরাজ বা ভল্লুক-প্রবর অথবা অন্য কোনও হিংস্র জন্তু ক্ষুধার্ত্ত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে এ কথা বলা যায় না। জঙ্গলে হাতীই মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা নির্ম্মম শত্রু। ভীমের দেহ ও শক্তি সে পাইয়াছে বলিয়াই, বোধ করি, সে দুর্ব্বল মানুষকে ধরিয়া সবল জরাসন্ধের মত মধ্য হইতে দেহটা দুইখানি করিয়া চিরিয়া মারিয়া ফেলে। একটা পা তাহার নিজের পদ দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া অন্য পা-খানা শুঁড় দিয়া ধরে; তাহার পরই জরাসন্ধ-বধ।

এই সব বড় বড় হিংস্র পশুকে দেখা যায়, কিন্তু সর্পরাজকে দেখা কঠিন; এবং সংখ্যায় তিনি এত অধিক যে বলাই বাহুল্য মাত্র। গাছের তলা দিয়া চলিয়াছেন, উপরে সর্ সর্ শব্দ। তখনি সরিতেই হইবে। কেন না মাথার উপর লাউডগা চলিয়াছে। যদিও বা লাউডগা প্রাণটা না লয়, পাতার উপর হইতে নানা আকারে ঝোঁক আসছে গায়ের উপর; কখন যে লাফাইয়া পড়ে তাহা জানা যায় না, যতক্ষণ না তাহাদের রক্ত-শোষণের জ্বালায় লাউডগার দেওয়া প্রাণটা অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। কি করিয়া কখন যে তাহারা বুটের ফিতার গর্ত্তগুলির মধ্য দিয়া অন্তরে স্থান করিয়া লইয়া আপনার কাজ করিয়া যাইতেছে, তাহা জানিবার উপায় ওই একমাত্র দংশনের জ্বালা। এরূপ নীরব কর্ম্মী দেখা যায় না।

একদিন এইরূপ সমতল জঙ্গলের এক স্থান হইতে বাইকে করিয়া ফিরিতেছিলাম। এই সব শাল জঙ্গলে অন্ধকার বড় তাড়াতাড়ি হয়। বাহির হইতে প্রায় চারটা বাজিল। সেখানে যে অধস্তন কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি রাত্রিটা সেখানে থাকিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরদিন সকালেই বেস্ ক্যাম্পে (Base Camp) বিশেষ দরকার। এই কথা বলিয়া সাইকেলে উঠিয়া পড়িলাম।

পথ মাত্র বাইশ মাইল। জঙ্গলের রাস্তা। সাইকেলের টায়ার না কাটে; অবশ্য সারাইবার যন্ত্রাদি সঙ্গে আছে। মুস্কিল সম্মুখে অন্ধকার। চাঁদ উঠিবে নিশ্চয়ই। কিন্তু রাস্তায় আলো পড়িবে কি না সন্দেহ এবং কখন যে পড়িবে তাহাও বলা যায় না। মাথার উপরে আসিলে যদি পড়ে। আলো জ্বালিবার উপায় নাই। কারণ বন্য-বরাহের আলোর প্রতি মারাত্মক বিদ্বেষ এবং তিনি সব চেয়ে সংখ্যায় অধিক।

আর মাইল খানেক যাইতে পারিলেই তারেম নদীটা পার হইতে পারি। এখানে নদীর নাম হেল্, অর্থাৎ নরক। রাস্তার নাম আছে যমদুয়ার। নদীতে নামিলেই বোধ হয় কুমীর বা আর কাহারও উদরস্থ হইতে হয়। এই জন্যই সেটা

মানুষের ভয়ের নরক। আর ওই সব রাস্তায় যাহারাই গিয়াছে, বোধ হয় যমের রাজ্যেই তাহারা পঁহুছিয়াছে।

ঘড়িতে দেখি প্রায় পাঁচটা। প্রাণের দায়ে খুব জোরেই চলিয়াছি। নদীর ওপারে মাইলখানেক অথবা আর একটু অধিক মাত্র জঙ্গল। তাহার পর জঙ্গল দুই পাশে সরিয়া গিয়া দুই বাহুর মত চলিয়াছে। মাঝখানটা উলু-ঘাসের রাজত্ব। এইরূপ প্রায় Base Camp পর্য্যন্ত। এই স্থানে ভালুকের ও হাতীর উপদ্রব খুব বেশী। অবশ্য কি করিয়া কাহাকে ঠেকান যায়, তাহা সব শিখিয়া লইয়াছি। হাতীকে বিজলী বাতি বা অন্য কোনও আলো দেখাইলেই হয়। ব্যাঘ্ররাজের চোখে চাহিয়া থাকিলেই বাধা হয়। ভালুক মহাশয় ছুটিয়া আসিয়া সাপের মত ফণা ধরেন, পিছনের পায়ে দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে নাড়ুগোপালের মত নাচিয়া নাচিয়া আইসেন আলিঙ্গন করিবার জন্য। তখন তিনি মুখখানা পাশের দিকে ফিরাইয়া থাকেন, পাছে কেহ নাকের উপর আঘাত করে। নাকটা তাহার বড় নরম জায়গা। সেই সময় নাকে একটা ঘুসি মারিলেই সে পলায় নিশ্চয়। সবই শোনা; ভয়ের আর তখন আছে কি? সুতরাং নির্ভয়ে প্রাণের দায়ে খুব জোরেই সাইকেল ছুটাইয়াছি।

নদীর খদে নামিয়া দেখি যে বাঁকের মুখে কি যেন একটা অদৃশ্য হইয়া গেল। যাহার মনের চিন্তা যখন যেরূপ থাকে, সে তখন পারিপার্শ্বিককে সেই ভাবেই দেখিতে চায়। আমার তখন মনে হইতেছিল পথে যদি একটা ভুটিয়াও পাইতাম। ভুটিয়ারা এই পথে তরী-তরকারী বিক্রয় করিবার জন্য যাতায়াত করিয়া থাকে। এই সব জঙ্গল ভুটান পাহাড়ের নীচেই। আগে ইহা ভুটানের রাজারই ছিল; পরে কোন এক যুদ্ধের সময় ইংরাজ-সরকার লইয়াছেন।

আমারও মনে হইল যে যাহা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেল, সে একজন ভুটিয়াই হইবে। বাঁকের মুখ তখনও প্রায় পাঁচশত গজ দূরে। ঢালু জমি। আরও জোরে সাইকেল চালাইলাম। বাঁকের পর রাস্তা নদীতে নামিয়া গিয়াছে, প্রায় একশত গজ। নীচেই প্রস্তর-বহুল নদী। গল্প শুনিয়াছিলাম যে, একজন ভুটিয়া একলা আসিবার সময় সহসা দেখে যে একটা হাতী শুঁড় দিয়া তাকে জড়াইতেছে। সে ভয় না পাইয়া কুকরী বাহির করিয়া কোনও মতে শুঁড়ে দাগ বসাইয়া দিলেই হাতীটা যন্ত্রণায় তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছাড়িয়া দেয়; কিন্তু আবার আক্রমণ করিতে আসে। তখন সেই ভুটিয়া ক্ষিপ্রগতিতে কুকরী দিয়া তাহার শুঁড়ে এত জোরে মারে, যে শুঁড় দুইখান হইয়া যায়। সুতরাং এই ভুটিয়া সঙ্গীকে লইয়া নদী ও জঙ্গল-রেখা পার হইতে পারিলে পুনরায় সাইকেলে নিরাপদে চড়া যাইবে।

আমি যখন সাইকেল চালাইয়া বাঁকটা পার হইয়াছি, তখন সামনে যে মন্থর গতিতে চলিতেছিল, সে সাইকেলের শব্দে ফিরিয়া দাঁড়াইল। ভুটিয়াই বটে, তবে চার পায়ে চলে। দেহে তাহার কালো কালো লম্বা লম্বা ডোরা-কাটা। বোধ হয় নদীতে জল খাইতে যাইতেছিল। সাইকেলের শব্দে ভাবিয়াছিল যে হরিণের একটা দলও জল খাইতে আসিয়াছে। আহার ও পানীয় একই সঙ্গে আজ। বেচারা বোধ হয় নিরাশ হইল; কেন না কোনও কিছু করিবার চেষ্টা না করিয়াই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমি প্রাণপণ জোরে ব্রেক কষায় উল্টাইতে উল্টাইতে পথের পাশে একটা বড় পাথরে পা লাগাইয়া কোনও মতে বাঁচিয়া গেলাম। বাঁচিবার জন্যই জগতে আসিয়াছি, বাঘের উদরে পড়িব কেন।

বিপদ যত ঘনীভূত হইয়া উঠে, আমার মনের শক্তি ও শিরা উপশিরার স্থিরতা যেন বাড়িয়া যায়। রক্তের এতটুকু চঞ্চলতা নাই। চুপ করিয়া পাথরে পা লাগাইয়া সাইকেলে বসিয়া আছি। শার্দ্দূল-রাজের ও আমার মধ্যে দূরত্ব প্রায় পনের গজ। দুই জনেই দুইজনের দিকে চাহিয়া আছি। এমনভাবে প্রায় আধঘণ্টা কাল কাটিল। মনে হইল যুগ ধরিয়া যেন বসিয়া আছি। সম্মুখে মৃত্যু। শীতকাল। আসামের শীতে গা ঘামিয়া জামা কাপড় হইতে জল ঝরিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাকে মারিবার উপায় নাই। চেষ্টা করা শুধু বৃথাই নয়, অন্যায়। আসামের ব্যাঘ্রদের মানুষের প্রতি লোলুপতার বদনাম নাই। তাহারা গরু মহিষ ধরিয়াই খায়; এবং এত শক্তি রাখে যে, বিশ পঁচিশ মন বড় বড় মহিষ মারিয়া পিঠে ফেলিয়া লইয়া যায়। সামনে রেলের উঁচু লাইন পড়িলে, তাহা অনায়াসে অক্লেশে লাফাইয়া পার হয়। ইহাকে মারিবার চেষ্টা এরূপ সামনা-সামনি হইতে করিলে, সেও আক্রমণ করিবে; এবং যদি মারিবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে সে

মানুষের মাংস ও রক্তের আস্বাদ পাইয়া নরমাংসলোভী হইয়া যাইবে।

যাহা হৌক, আর দেরী করা যায় না। হাত-পা না নাড়িয়া আঙুলের ঘায়ে সাইকেলের ঘণ্টার শব্দ করিলাম। সে একটু চমকাইয়া সামনের দিকে তিন চার পা আগাইয়া আসিল। আগে সে শুধু ঘাড় ফিরাইয়া তাকাইয়াছিল। শরীরটা রাস্তার চওড়া-চওড়ি থাকায়, অনেকটা রাস্তা বন্ধ ছিল। ভাবিলাম মরিব কি বাঁচিব আজই তাহার পরীক্ষা হইয়া যাইবে। সাইকেল ছাড়িয়া দিলাম। কতকটা চালাইবার জোরে, কতকটা ঢালু জমির টানে একেবারে গিয়া নদীর জলে পড়িলাম। জল হইতে উঠিয়া বিজলী বাতিটার কথা মনে হইল। আলো দেখিলে সে পশ্চাতে আসিলেও ফিরিয়া যাইবে, এই আশায় কোমরের সঙ্গে আটকান বাতির বোতাম টিপিলাম। বাঁচিব নিশ্চয়ই, নহিলে বাতিটা ভাঙ্গিয়া যাইত। আলো জ্বলিয়া উঠিল। কাঁধে সাইকেল লইয়া যতটা সম্ভব জোরে নদীটা পার হইলাম। পারে উঠিয়া দেখি হাত-দুটা ভয়ানক কাঁপিতেছে। সাইকেলে ভারকেন্দ্র ঠিক রাখিতে পারিতেছি না। প্রায় একশত দেড়শত গজ দৌড়িয়া নদীর পাড়ের উপর উঠিলাম। বাতিটা দিয়া যতদূর দেখিতে পাইলাম, চারপা-বিশিষ্ট দুটিয়া-প্রবর তখনও সেইখানেই দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল; আলো চোখে লাগাতে বোধ হয় সরিয়া গেল।

ভয় হইল, অন্য পথে সে না আসিয়া পড়ে। বাতি আর নিভাইলাম না। ফ্লাস্ক হইতে খানিকটা গরম কফি খাইয়া ফেলিয়া পুনরায় সাইকেলে উঠিলাম।

তাহার পর বাকী পথ যে কি ভাবে আসিয়াছি জানি না। পরদিন ঘুম ভাঙ্গিতে দেখি গায়ে খুব বেদনা। তখন সব মনে পড়িল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, রাত প্রায় নয়টায় ক্যাম্পের সামনে আসিয়া সাইকেল হইতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাই। সকলে ধরাধরি করিয়া বিছানায় শোয়ায়। গায়ের উত্তাপ তখন প্রায় ১০৪°। অনেক রাত্রে জ্ঞান হয়। তখন বাসার লোকেরা বৃদ্ধি করিয়া গরম দুধ ও ব্র্যাণ্ডি মিশাইয়া খাওয়াইয়া দেওয়ায় তখনি আবার ঘুমাইয়া পড়ি।

পরে শুনিয়াছিলাম যে, যাহাকে আমি দেখিয়া আসিয়াছি, সে ব্র্যাণ্ডরাজ নহে, রাণী। ওইখানেই বরাবর থাকে। অনেকেই দেখিয়াছে। কাহাকেও কিছু বলে না। এখন বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছে। মনে পড়িল বটে যে, তাহার শরীরটা খুব হলদে নহে বা কালো দাগগুলাও খুব কালো আর নাই। মনের ভুল কি না জানি না। আরও শুনিলাম, একবার একদল লোক নদীর ওইখানটায় রান্না করিয়া খাইয়া বিশ্রাম করিতে যাইবে দিনের বেলায়, এমন সময়ে একজন দেখে যে মহারাণী অল্প দূরে বসিয়া বসিয়া তাহাদের অনধিকার-প্রবেশ ও তাঁহার বিশ্রাম ভঙ্গজনক কার্যাকলাপ দেখিতেছেন। তখনই সকলে দৌড়।

গারো-পাহাড় ইহা অপেক্ষাও অনেক অধিক বিপদ্-জনক। তাহার উপর পাহাড়ের রাস্তা, ভয়ানক উঁচু-নীচু। তথাপিও যে খাস সহরের পাদ্রী সাহেব-মেমেরা এই সব জায়গায় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান, ইহা প্রশংসার কথা। আমাদের দেশের লোককে অধিক মাহিনা দিয়াও এ সকল স্থান পাঠান যায় না। আমার অভিজ্ঞতা বাঙ্গালী ছেলেদের সম্বন্ধে এই বিষয়ে অত্যন্ত খারাপ। কোনও কিছু জুটিতেছে না, বা কিছুতেই আপত্তি নাই, এইরূপ ছাড়া বাঙ্গালী ছেলেকে এই সব জায়গায় আনিতে পারা যায় না। অথচ যে সব সাহেব বা মেম পাদ্রী হইয়া আসিয়া এত কষ্ট স্বীকার করেন, তাঁহারা প্রায়ই ভাল পরিবারের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী। আমার মনে হয়, উপার্জ্জন করিতেই হইবে, এই যে একটা সুদৃঢ় ধারণা, তাহাই ইঁহাদের এত কষ্টসহিষ্ণু করে।

ভূমানন্দ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

ছোট্ট একটা পক্ষী, অতি বিশাল বিশ্ব ;—
ঐশ্বর্য্যের নাই অন্ত ; নিতান্তই সে নিঃস্ব !
প্রভাত হ'তে রাত্রি কেবল জীবন-চেষ্টা,
অপার ক্ষুধার কষ্ট অফুরন্ত তেষ্টা :
চতুর্দ্দিকেই বিঘ্ন, জোটা কঠিন খাদ্য,
শক্তিমানের রাজ্য, ক্ষুদ্র তাহার সাধ্য !

পাখার সোণার বর্ণ, কণ্ঠ তাহার মিষ্ট,—
তাইত সদা শঙ্কা, সর্ব্বদাই অতিষ্ঠ !
বীর্য্যবানের শক্তি, বুদ্ধিমানের ফন্দী
চাইছে লোভে নিত্য ক'রতে তারে বন্দী !
বাহুড়-পেঁচার হুন্তে তবুও আছে রক্ষে,
কেমন করে' নিস্তার মিল্‌বে নরের চক্ষে ?

চৈৎ-বোশেখের ঝঞ্ঝা, বর্ষাকালের বর্ষণ,
কাঁপ্‌ছে ভয়ে অঙ্গ, ঝাপ্‌সা চোখের দর্শন !
কুলায় ভাঙে ঝঞ্ঝে, বাচ্ছা তিনটে নষ্ট,
একটা পক্ষ ভগ্ন, শেষ পরিণাম পষ্ট ;
লুপ্ত সংজ্ঞাশক্তি, চক্ষে নাইক দৃষ্টি—
তবু জীবন চেষ্টা—হায়রে অনাসৃষ্টি !

বল্‌ব তবু ঈশ্বর, তুমি কৃপার সিন্ধু,
জল্‌তে জল্‌তে সাক্ষী দিচ্ছে সূর্য্য ইন্দু !
দীনের তুমি বন্ধু—লিখ্‌ছে শাস্ত্রগ্রন্থ,
তপস্বীদের দৃষ্টি পারনা তোমার অন্ত !
ছোট্ট একটা পক্ষী--তা'র আবার সে কষ্ট !
অনন্ত এই সৃষ্টি—কতই হবে নষ্ট ?

সুখের নামই দুঃখ—বুঝ্‌তে হবে অর্থ !
জীবনের কি মূল্য—না জান্‌লে সব ব্যর্থ ?
পক্ষী তো ছার পক্ষী—মানুষ যারা মূর্খ—
শক্তিমানের রাজ্যে আছেই তাদের দুঃখ !
কিন্তু সে সব দুঃখের গভীর ভূমানন্দ
তারাই পাচ্ছে যাচ্ছে অন্ত পথ যার বন্ধ !

কথিকা

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কবি লিখ্‌তেন ছেঁড়া মাদুরে ব'সে নল-খাগ্‌ড়ার কলম দিয়ে, মাটির দোয়াত থেকে কালি নিয়ে দেশের কোন্ প্রান্তে কোন্ অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লী-আবাসে ; কিন্তু, কবি ছিলেন ঐশ্বর্য্যের কবি—কি অন্তরে, কি বাহিরে। তাই তাঁর নল-খাগ্‌ড়ার কলমের মুখে জেগে ওঠে শৌর্য্য বীর্য্য ঐশ্বর্য্য বিভব প্রণয় গৌরব দিয়ে পূর্ণ এক জগত। তাঁর কলমের মুখে জেগে ওঠে তরুণ তরুণী, তাদের হিল্লোলিত প্রাণ, কম্পোলিত কণ্ঠস্বর, জ্যোতিঃ-পুলকিত আঁখি, হাস্য-বিকশিত আনন ;—আবার সেই তরুণ-তরুণীদের কণ্ঠে কণ্ঠে বেজে ওঠে প্রণয়-উচ্ছ্বসিত বাঁশি ফাল্গুনের সুরে সুরে, বর্ষা-বাদলের ঝর ঝর ধারায়, শরৎ-আকাশের হাসিতে হাসিতে ; —যেখানে দুঃখ নেই দৈন্য নেই, শোক নেই অশ্রু নেই, অনুতাপ নেই পরিতাপ নেই—যেখানে তরুণ বলে

চাহরে চাহ গাহরে গাহ জয়—

তরুণী বলে

দুখানি হিয়া হ'ল কি বিনিময়—

যেখানে তরুণ গান করে

আজকে মোরা রাঙার পথে

জীবন-রথে

(স্বর্ণ-রথে)

ছুটব রে ভাই দুর্নিবার—

আর তরুণী তার উত্তর দেয়

হৃদয়-নদীর তীরে তীরে

নীরে নীরে

(শীতল নীরে)

ছুটব মোরা কি দুর্ব্বার—

কবি ছিলেন ঐশ্বর্য্যের কবি—কি অন্তরে কি বাহিরে;—তাই তাঁর কলমের মুখে জেগে ওঠে রাজার ঐশ্বর্য্য, সম্রাটের দিগ্বিজয়-কাহিনী—মণি মুক্তা মকরত চুনি পান্না মোতি চতুর্দ্দিকে জ্যোতিঃ-রশ্মি বিকীরণ ক'রে সমাগত হ'য়ে ওঠে হয় হস্তী স্যন্দন চতুরঙ্গ-বাহিনীর মত্ত উল্লাসে তূরী ভেরী কাড়া-নাকাড়ার প্রমত্ত কোলাহলে দিক্-দেশ বধির হ'য়ে যায়। এমনি ছিলেন কবি, কোন্ দূর অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লী-আবাসে ছেঁড়া মাদুরে ব'সে নল-খাগ্‌ড়ার কলম দিয়ে মাটীর দোয়াত থেকে কালি নিয়ে কাব্য রচনায় ব্যাপৃত।

কিন্তু কবির খ্যাতি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়্‌ল—পল্লী থেকে জনপদে—জনপদ থেকে নগরে নগরে—অবশেষে রাজধানীতে এবং সর্ব্বশেষে রাজপ্রাসাদে সম্রাটের কাছে।

সম্রাট মন্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—"মন্ত্রী, কে এ কবি? কোথাকার এ কবি?"

মন্ত্রী উত্তর দিলেন—"মহারাজ কে এ কবি, তা আমরা কেউ জানি নে। কোন্ দূর পল্লী-প্রান্তের নির্জ্জন আবাসে ব'সে কবি তাঁর কাব্য রচনায় ব্যাপৃত।"

সম্রাট বললেন—"কিন্তু এ কবি-আত্মার সঙ্গে মিল ত দূর নির্জ্জন পল্লী-আবাসের বিজনতার রিক্ততার নয়। এ কবি জীবনের কবি, ঐশ্বর্য্যের কবি; শব্দ গন্ধ রূপ রসময়ী এই ধরণীর স্পন্দনে স্পন্দনে এর প্রাণ, ছন্দে ছন্দে এর গতি, তানে তানে এর মতি;—এই ধরণীর আশা আকাঙ্ক্ষা গৌরব-বিভব দিয়ে কবির জীবনের রস প্রবুদ্ধ।—না মন্ত্রী, এ কবির স্থান নির্জ্জন পল্লীবাসে নয়—এ কবির স্থান সম্রাটের সিংহাসনের পাশে। আমি বাহুবলেই শুধু এই পৃথিবীকে জয় করেছি, কিন্তু আসল জয় করেছে এ পৃথিবীকে এই কবি তার নিবিড় রসানুভূতি দিয়ে। আমার জয় ভুল। আমি এই পৃথিবীর অধীশ্বর মাত্র। কিন্তু এই পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যকে প্রকৃত ভোগ করে এই কবি। এই কবির জয়ই জয়। এ-জয়ের পরাজয় কারো হাতেই নেই। মন্ত্রী, এই কবিকে সসম্মানে রাজসভায় নিয়ে আসা হোক্।"

মন্ত্রী বল্‌লেন—"যে আজ্ঞে মহারাজ।"

এক বিরাট শোভাযাত্রা সজ্জিত হ'ল। হয় হস্তী স্যন্দন, লোক লস্কর, পাইক প্রতিহারী, কাড়া নাকাড়া এক সঙ্গে জেগে উঠল। তারপর সেই শোভাযাত্রা নানা বর্ণের নানা আকৃতির কেতন উড়িয়ে সেই দূর পল্লীপ্রান্তে কবির আবাস-অভিমুখে যাত্রা করল।

কবি একদিন মুখ তুলে দেখেন তাঁর কুটীর-দুয়ারে এক বিরাট শোভাযাত্রা। যার ঐশ্বর্য্যে দৃষ্টিতে চারিদিক ঝক্ ঝক্ করছে। ক্ষুদ্র পল্লীর বুকে এক বিরাট শোভাযাত্রা। যেন জীর্ণ কন্থার উপরে মণি-মুক্তা চুনি পান্নার কাজ। কবি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন!

মন্ত্রী অগ্রসর হ'য়ে তাঁর মাথা হেলিয়ে স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বললেন—"কবি, সম্রাট আপনাকে আহ্বান করেছেন।"

কবি আরও আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লেন—"সম্রাট আমাকে আহ্বান করেছেন! কেন? কি জন্য?"

মন্ত্রী বল্‌লেন—"কবি, এই নির্জ্জন পল্লী ত আপনার উপযুক্ত স্থান নয়। আপনি জীবনের কবি, ঐশ্বর্য্যের কবি,—সেই জীবন যেখানে শত ধারে সহস্র ধারে আপনাকে বিচ্ছুরিত ক'রে দিচ্ছে, সেই ঐশ্বর্য্য যেখানে সমস্ত রস সমস্ত সৌরভ সমস্ত গৌরব নিয়ে আপনাকে মূর্ত্ত ক'রে তুলেছে, সেইখানে আপনার স্থান; আপনার স্থান রাজ-সভায়—সম্রাটের সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে। আসুন, সম্রাট অপেক্ষা ক'রে আছেন।"

কবি উন্মনা হলেন। তারপর সন্দেহাকুল চিত্তে তাঁর নল-খাগ্‌ড়ার কলম ও মাটীর দোয়াতটী নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন;—যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো বল্‌লেন—"চলুন।"

মন্ত্রী ব'লে উঠ্‌লেন—"কবি আপনার ঐ লেখনী ও মস্তাধার পরিত্যাগ করুন, ও আপনার উপযুক্ত নয়। সম্রাটের প্রাসাদে সুবর্ণময় লেখনী ও সুবর্ণের মস্তাধার আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।"

কবি আরও উন্মনা হলেন। তারপর আপনার লেখনী ও মস্তাধারের দিকে শেষ একবার চেয়ে বুঝি একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে তাদের পরিত্যাগ করলেন। তারপর সেই বিরাট শোভাযাত্রার সঙ্গে রাজধানী-অভিমুখে যাত্রা করলেন।

• • • •

কবি রাজসভায় থাকেন। সম্রাট তাঁর কণ্ঠে বিজয়-মালা দুলিয়ে দেন—নাগরিকেরা তাদের অভিনন্দন জানায়—কিশোরী কুমারীরা বুঝি তাঁদের হৃদয়ের পূজা দেবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে।

কিন্তু সেই জগতের আর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, যে-জগত তাঁর চোখের সাম্‌নে তাঁর কল্প-জগতে নির্জন পল্লী-কুটীরে সত্য হ'য়ে উঠ্‌ত। বাস্তব জগতের বাস্তবতা তাঁর কল্প-জগতের কল্পনাকে দরিদ্র ক'রে তুলেছে। স্থূল জগতের ভোগ তাঁর সূক্ষ্ম জগতের ভোগানুভূতিকে ম্লান করে দিয়েছে। সুবর্ণময় লেখনী সুবর্ণের মস্তাধার যেমনকার তেমনি থাকে। তাতে কবির আঙুলের স্পর্শমাত্র পড়ে না।

সম্রাট এক-একদিন জিজ্ঞাসা করেন—"কবি, কাব্য-রচনা চল্‌ছে?"

কবি নত মস্তকে অস্ফুটস্বরে উত্তর দেন—"না মহারাজ!"

বাইরের ঐশ্বর্য্য তাকে ভিতরের ঐশ্বর্য্য থেকে বঞ্চিত করেছে। ভোগকে আর কবির কাব্যের রূপ দেবার সামর্থ্য নেই।

এমনি ক'রে দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায়, বছর গেল। সহসা একদিন কবির চোখদুটী জ্বল্ জ্বল্ ক'রে উঠ্‌ল, তার হৃদ্‌পিণ্ডটা ধক্ ধক্ ক'রে উঠ্‌ল, সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ল, শোণিত চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। কাব্যের প্রেরণা আবার তার দেহ মন প্রাণকে অধিকার করল। সুবর্ণময় লেখনী তার হাতে উঠ্‌ল—সুবর্ণ মস্তাধার থেকে কালি নিয়ে বকের পাখার মতো সুশুভ্র কাগজের উপর তার কাব্য-রচনা আবার আরম্ভ হ'ল।

কবির কাব্য-রচনা চল্‌তে লাগ্‌ল—ছত্রের পর ছত্র, কলির পর কলি, পত্রের পর পত্র—গো-মুখী থেকে উচ্ছ্বসিত ভাগীরথী-স্রোতের মতো—মাতৃস্তন থেকে উৎসৃষ্ট ক্ষীরধারার মতো—আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত অগ্ন্যুদ্গমের মতো—দুর্নিবার অনিবার্য্য, স্বতঃস্ফূর্ত।

অবশেষে রচনা শেষ হ'লে একদিন রাজসভায় এসে কবি বললেন—"মহারাজ, আমি কাব্য রচনার প্রেরণা আবার পেয়েছি—নব-কাব্য রচনা করেছি।"

সম্রাটের চোখ দুটী উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল; সোৎসাহিত কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লেন—"কবি, শোনাও শোনাও তোমার নব কাব্য, তোমার নবীন সঙ্গীত।"

মন্ত্রী পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন—তিনি বল্লেন—"মহারাজ-সম্রাটের জন্মদিন আগত। সেই জন্মোৎসবের দিন রাজসভায় সাম্রাজ্যের সমস্ত রাজন্যবর্গের সম্মুখে কবির কাব্য পাঠের উপযুক্ত সময় ও স্থান।"

সম্রাট প্রশংসমান দৃষ্টিতে কবির দিয়ে চেয়ে বললেন—"সেই ভাল কবি—সেই ভাল। সম্রাটের জন্মোৎসব ও কবির কাব্যোৎসব এক সঙ্গে মিলিত হোক্। সম্রাটের দৈর্ঘ্য বাড়ুক—কবি অমর হোক্।"

• • • •

সম্রাটের জন্মদিন। সারা সাম্রাজ্য যেন মহোৎসব। আবার তারই সেরা উৎসব রাজধানীতে। রাজপথে-পথে বিজয়-তোরণ বিজয়-স্তম্ভ—গৃহ-দ্বারে-দ্বারে কদলীবৃক্ষ, পূর্ণ-কুম্ভ, পুষ্পমালা;—নরনারী বিচিত্র বেশভূষায় ভূষিত হ'য়ে ইতঃস্ততঃ বিচরণ করছে, বালক বালিকা হাস্যে কলরবে চারিদিক মুখরিত ক'রে তুলেছে—সমস্ত মহানগরীর যেন একটা বিরাট আনন্দ-অবসর।

প্রকাণ্ড সুসজ্জিত রাজসভা। সাম্রাজ্যের সমস্ত রাজন্যবর্গ ইন্দ্রসভায় দেবতাদের তুল্য শোভা পাচ্ছে। তাঁদের পরিচ্ছদের দ্যোতিতে অলঙ্কারের দ্যুতিতে সমস্ত সভা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে; তাঁদের মাথায় মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তার মালা ঝল্‌মল্ করছে—যেন এই পৃথিবীর কোথাও দৈন্য নেই, দারিদ্র্য নেই,—একটীও দুঃখের রেখা নেই।

যখন রাজ-কুলগুরুর আশীর্ব্বচন শেষ হ'য়ে গেল, তখন সম্রাট কবির দিকে ফিরে স্মিতহাস্যে বললেন—"কবি, শোনাও এইবার তোমার কাব্য। কি রচনা করেছ এবার কবি? কোন্ ঐশ্বর্য্যের কাহিনী? কোন্ বিজয়-বার্ত্তার অভিনন্দন? কোন্ সুখস্বপ্নের কমনীয় স্পর্শ?"

সমস্ত রাজন্যবর্গ উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠ্‌ল।

কবি ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আপনার বহুমূল্য পরিচ্ছদের নীচে থেকে আপনার নব রচিত কাব্য বের করলেন। তাঁর চোখ দুটী জ্বল্ জ্বল্ করছে—শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে। কবি কাব্যপাঠ আরম্ভ করলেন। সমস্ত রাজসভা ছবির মতো অচল—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত শোনা যায় না।

কবি কাব্যপাঠ করতে লাগলেন।

কিন্তু এবার আর 'ঐশ্বর্য্যের' কাহিনী নয়,—এবারকার কাহিনী দুঃখের দৈন্যের দরিদ্রতার। শুনতে শুনতে সুখ বিস্বাদ হ'য়ে ওঠে, ভোগের জীবন দুর্বিসহ হ'য়ে ওঠে, ঐশ্বর্য্যকে আরামকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়।

এবার আর সুখের সুন্দরের কাহিনী নয়। এবারকার কাহিনী কুশ্রী কদর্য্যতার—যা মনে প্রাণে দারুণ জুগুপ্সা জাগিয়ে তোলে, যা থেকে পড়া রক্ত পুঁজের মতো, গলিত শবদেহে পচা-মাংসের মধ্যে ক্রিমিদের ভোজনোল্লাসের মতো। যা শুনে স্বতঃই মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে চায়—রক্ষা কর, রক্ষা কর কবি—জীবনের প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে তুলো না।

এবার আর ভোগ ঐশ্বর্য্য আনন্দ নয়—এবার দৈন্য দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য।

কবি প'ড়ে চল্‌লেন……

এই ঐশ্বর্য্য সম্পদ থেকে বহু বহু দূরে—সাম্রাজ্যের কোন্ এক প্রত্যন্ত প্রদেশে এক ক্ষুদ্র পল্লী। তার নদীতে জল নেই, ক্ষেতে ক্ষেতে শস্য নেই, মাঠে মাঠে তৃণ নেই, পত্রবিরল বৃক্ষরাজি যেন মানুষের কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে; তারি ফাঁকে ফাঁকে যখন তপ্ত হাওয়া নিশ্বাস ফেলে তখন যেন কোন্ প্রেত-লোক থেকে একটা চাপা হো-হো অট্টহাসিতে চারিদিক শিউরে ওঠে।

কবি পড়ে চললেন……

ঐশ্বর্য্য সম্পদ থেকে বহু বহু দূরে—এক মৃত্যুর মতো শান্ত নির্জ্জন পল্লী। এখানে মানুষ বাস করে কি না বোঝা যায় না—কোনদিন একটু আনন্দের আভাসও এর আকাশ বাতাসকে চঞ্চল ক'রে তোলে নি, একটু হাসির রেখা একটু স্নেহের ইঙ্গিত এর কোনখান থেকেই কোন দিন জন্ম নেয় নি, একটু আশা আকাঙ্ক্ষা একটুকু সুখভোগ করবার ইচ্ছা, একটু সোয়াস্তি পাবার বাসনা এর কাছে ইন্দ্রসভার অপ্সরী-পরিবেষ্টিত হ'য়ে সোমপানের তুল্য দুরাশা—ঐশ্বর্য্য সম্পদ থেকে বহু বহু দূরে সাম্রাজ্যের কোন্ প্রত্যন্ত প্রদেশে সেই ক্ষুদ্র পল্লীর বুকে।

কবি প'ড়ে চললেন……

ঐশ্বর্য্য সম্পদ থেকে বহু বহু দূরে নির্জ্জন পল্লীপ্রান্তে একখানি জীর্ণ কুটীর—বর্ষায় বৃষ্টি রোধ করে না—গ্রীষ্মে সূর্য্য রোধ করে না;—সেই কুটীরের দাওয়ায় জীর্ণ ছিন্ন মলিন ত্যানা দিয়ে তৈরি একটী ছোট্ট বিছানা—সেই বিছানা থেকে একটা চিম্‌সে দুর্গন্ধ বেরিয়ে আস্‌ছে—তারি উপরে শোয়ান' একটা শিশু—হঠাৎ দেখ্‌লে বোঝা যায় না, কিন্তু ভাল ক'রে দেখ্‌লে বোঝা যায় যে একটা মানব-শিশুই—তার সরু সরু খ্যাংরা কাঠির মতো হাত পা—ডাগর পেট—বুকের পাঁজরার হাড়গুলো স্পষ্ট ছাপায় অক্ষরে যেন আপনাদের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে;—তারি নীচে একটা ক্ষুদ্র হৃদ্‌পিণ্ড ধুক্ ধুক্ ধুক্ ধুক্ করছে—শিশুর মুখ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে—কয়েকটী মাছি তারি উপরে কখনও বসে, কখনও আবার ভন্ ভন্ ক'রে তারি আশে পাশে উড়ে বেড়ায়—অদূরে শিমুলগাছটার কঙ্কালের উপর ব'সে দুটী শকুন শকুনি…

একটী নারী, বুঝি এই শিশুটীরই মা—শতছিন্ন একখানি কাপড় পরণে—সেই ছিন্ন ফাঁক দিয়ে নারীর নগ্ন দেহ স্থানে স্থানে দেখা যাচ্ছে—কিন্তু সে নগ্নতা মনে কোন মোহ কোন লোভই জাগিয়ে তোলে না……হায় এমন নারীও সন্তানবতী হয়!

ভক্ ক'রে একটা শব্দ—শিশু বমি করেছে—নারী এসে দেখে একটা সাদা তরল পদার্থ শিশুর গণ্ড বেয়ে গ্রীবায় এসে পড়েছে—বুঝি তার আপনারই বুকের দুধ……

সম্রাট কাঁপছিলেন—সর্ব্ব শরীর তাঁর থর থর থর থর ক'রে কাঁপছিল। সহসা সিংহাসন থেকে তিনি বেগে উঠে দাঁড়ালেন—উত্তেজিত কণ্ঠে কবির কণ্ঠস্বরকে ডুবিয়ে দিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন—"থামাও, থামাও কবি, তোমার কাব্যপাঠ;—এ কি দুঃস্বপ্ন, কোথায় গেলে এ দুঃস্বপ্ন?—কোথায় গেল সেই ঐশ্বর্য্যের গান, জীবনের জয়সঙ্গীত, সৌরভ-সৌন্দর্য্যের স্পর্শ—ফুলের গন্ধ, পাখীর গান, তরুণ তরুণীর প্রণয়-লীলা—কোথায় গেল সে-সব—এ কি দুঃস্বপ্নের সৃষ্টি করেছ কবি?"

কবি তাঁর কাব্য বন্ধ করলেন;—তারপর বললেন—"মহারাজ, পল্লীর রিক্ততার মাঝে ঐশ্বর্য্য আমার কল্পনার কাছে সত্য হয়ে উঠেছিল—আর এই ঐশ্বর্য্যের বাস্তবতার মাঝে আর এক জগত আমার কল্পনার কাছে সত্য হ'য়ে উঠেছে—মহারাজ, কল্পনার ধর্ম্মই চিরকাল আপনার পার্শ্বি-পার্শ্বিককে ছাড়িয়ে যাওয়া।"

সম্রাট সিংহাসনে অসহায় ভাবে ব'সে পড়লেন। তাঁর মাথা বুকের উপরে নমিত হ'য়ে গেল—তাঁর মাথার মুকুটের মণি-মাণিক্য যেন সব নিষ্প্রভ হ'য়ে উঠেছে। রাজন্যবর্গের শির সব নত হ'য়ে গেছে।

সবার চোখের সাম্‌নে যেন ভাস্‌ছে একটী অস্থিচর্ম্মসার শিশু আর একটী ক্ষুধাজর্জ্জর নারীমূর্ত্তি।

রাজন্যবর্গের হেঁট মুণ্ড আর ওঠে না।

উৎসব যেন একটা উপহাস—পৃথিবী একটা পরিহাস।

জীবন একটা বিভীষিকা।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ এম্-এ

কুহেলিকা-মাখা শীতের তামসী নিশীথের অবসানে, বঙ্গের সাহিত্য-তপোবনে মধুমাস তা'র অফুরন্ত মাধুরীর পশরা নিয়ে দেখা দিল। বাংলার আধুনিক সাহিত্য-গগনের কোণে 'প্রত্যূষের শুকতারা' অবোধ-বন্ধুর কবি বিহারীলালের আবির্ভাবের সঙ্গে 'প্রভাত সূর্য্য' বঙ্গধর্শনের ঋষি, বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের দ্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণ-প্রতিভার সুবর্ণ-কিরণে দশদিক সমুজ্জ্বল করে' সাহিত্য-নিকেতন কল-কাকলী-মুখর করে তুল্লেন।

তারপর আর এক অপূর্ব্ব অভিনব আনন্দ-অনুষ্ঠানের উদ্বোধন। বঙ্গ-সাহিত্য-লক্ষ্মীর পূত বেদীতলে আপন-করা মনোহর ভঙ্গীতে ভারতীর আরতি-দীপ-সজ্জা-সমারোহের ভার নিয়ে অগ্রসর হলেন পুরোহিত বেশে বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ। সাথে এলেন অগণিত কুশল ব্রতী শিল্প-জনমণ্ডলী। সকলেরই হৃদয়-যন্ত্রে বিচিত্র তন্ত্রীর ঝঙ্কার। কিন্তু সে সমস্ত সুর অতিক্রম করে' বাঁশীর একটি সুমিষ্ট তান ক্ষণেকের তরে কর্ণে মধু-ধারা বর্ষণ করে' চির-নীরব হয়ে গেল। তার সে মধুর মন-মাতোয়ারা সুরে নিখিল মানব-অন্তর, অনন্ত অন্তরীক্ষ সবই মধুময় হয়ে উঠল। বংশীর মোহন স্বর-লহরীর সেই রূপ-দক্ষ যাদুকর আমাদের চির-আদরের সত্যেন্দ্রনাথ!

ভারতের একটি বৈশিষ্ট্য—এখানকার সমস্ত বড় কবিই আপনাকে দীনভাবে বিতরণ করে গেছেন বিশ্বমানবের সেবাব্রতে। কবে সেই কোন্ যুগে 'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী' উজ্জয়িনীর কবি সামান্য উড়ুপের সাহচর্য্যে তরঙ্গ-সঙ্কুল দুস্তর পারাবার পারাপার হতে চেয়েছিলেন, তারই প্রতিধ্বনি বারে বারে কত কবির মধ্যে পরিস্ফুট। সত্যেন্দ্রনাথের ধাতুতেও সে বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তাই যখন তিনি লিখ্লেন,

"প্রসন্ন মনে লও যদি সবে
সোনা হয়ে যাবে এ ক্ষুদ্র কুঁড়া,
দোষ ধর যদি রোষ কর মনে,
কুবেরেরও হয় গরব গুঁড়া।"

—তার মধ্যে অন্তরের সেই দীন ভাবটি নিহিত করে রাখলেন। এই সুরটি বাংলার কবির একান্ত নিজস্ব।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানব-মনের একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ ওতঃপ্রোতভাবে চিরন্তন বিদ্যমান্। রবীন্দ্রনাথ একখানি অপ্রকাশিত পত্রে বলেছেন, "প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গূঢ় গভীর আনন্দ পাওয়া যায়, সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা সুবৃহৎ আত্মীয়তার সায়ুজ্য অনুভব করে'। এই নিত্য সঞ্জীবিত সবুজ সরস তৃণ লতা তরু গুল্ম—এই জল-ধারা—এই বায়ু-প্রবাহ—এই সতত ছায়ালোকের আবর্ত্তন, এই ঋতুচক্র—এই অনন্ত আকাশ-পূর্ণ জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর প্রবহমান স্রোত—পৃথিবীর অনন্ত প্রাণীপর্য্যায়,—এ সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ীর রক্ত-চলাচলের যোগ রয়েছে। সমস্ত বিশ্ব-চরাচরের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো।"

তাই 'ফুলের কলমে'র কবির মুখবন্ধেই আমরা দেখতে পাই,
"জোটে যদি মোটে একটি পয়সা, খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি'
দুটী যদি জোটে তবে অর্দ্ধেকে ফুল কিনে নিও হে অনুরাগি!
বাজারে বিকায় ফল তণ্ডুল সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা,
হৃদয় প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল দুনিয়ার মাঝে সেই ত' সুধা।"
কবি ফুল ভালবাসেন। ফুলের চির-উৎসারিত ছায়া, প্রকৃতির গভীরমায়া তাঁ'কে পাগল করে তুলেছে। তাই ঝোড়ো হাওয়ার পাতার নাচনের মাঝে, শেফালি ফুলের ঝরার মত কোমল সুরে কবিতা এসে তাঁ'র প্রাণে ঝরে' পড়ে—নিস্তব্ধ দিনের ঝাউয়ের পাতায় শিশিরের ফোঁটার মত নিঃশব্দ নিষ্পন্দ চরণে।

'যাকে আমরা অজ্ঞান পূর্ব্বক জড় বলে থাকি, সেই জগতের সঙ্গে আমাদের চেতনার একটা যোগাযোগের গোপন পথ আছে।' তারি আভাস কবির প্রাণে আল্‌গোছে এসে ছুঁয়ে যায়—

"মনের যত মনের কথা সেই জেনেছে অন্তরে
কিশোর কিশলয়ের আশা তারি সে সুর মন্তরে।
শীতের গড়ে পাথর নড়ে মুহুর্মুহু হয় ঢিলা
মোচন হ'ল বন্ধী যত মুকুল কুহু মন্তরে।"

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মত সত্যেন্দ্রনাথও জীবনে আলোকের ঝর্ণাধারার সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই তিনি লিখেছিলেন,

"কুঞ্জ ভবনে লতার দুয়ারে পল্লব-দল নাচে
অযুত-গ্রন্থি তন্ত্র লতার খুলিলে পরাণ বাঁচে।
উন্মাদ ভালবাসা
ছিঁড়ে দিলে তুমি বন্ধন ওগো কেড়ে নিলে তুমি আশা।"

আবার— "তরুণ প্রাণে নূতন প্রীতি
নূতন রীতি নূতন গীতি
বিভোল ধরা আপন হারা সোনার চোখে চায় ;
বিশ্বজনে তরুণ মনে পুলক উছলায়।"

জগতের চির সুন্দর শিশু মানবকে দেখে তাই কবির প্রাণ নেচে উঠল।

"দুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দে
দুনিয়াতে আজ নূতন মানুষ দুলিয়ে নে রে দুলিয়ে নে।"

একদিন এমনিতর আষাঢ়ের প্রারম্ভে ভারতের কবি জলভারাক্রান্ত মেঘ সন্দর্শনে বিরহী যক্ষের মুখে অতুলনীয় আকুল-করা ভাষা দিয়েছিলেন, তারি ঝরঝরানি গানের মোহে সত্যেন্দ্রনাথের মনে স্বপ্ন এঁকে দিলে।

"ঝর্ঝর ঝর ঝরে বারিধারা শিথিলিত কেশ বেশ ;
গর্জ্জন-ধ্বনি সহসা উঠিল ব্যাপিয়া সর্ব্ব দেশ।
এ-পারে বহু অট্ট হাসিল ও-পারে প্রতিধ্বনি,
সংজ্ঞা হারায়ে কি যে হ'ল পরে আর কিছু নাহি জানি।"

সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা আধুনিক বিংশ শতাব্দীর বাণীর প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। তরুণ বাংলার মনের কথা, তার আশা আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ উদ্দীপনা তাঁ'র লেখায় মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। মানব-সমাজের প্রাচীন কীর্ত্তি কাহিনীতেও তিনি কম শ্রদ্ধাবান নন্। তাঁ'র 'মনি' 'তাজমহল' প্রভৃতি রচনায় সে ইঙ্গিত প্রতিভাত!

জীবন ও মৃত্যু—সংসারের দুইটী বিভিন্ন প্রকাশ। আমাদের কবি এ উভয়ই পরিপূর্ণভাবে পান করে গেছেন। তাঁর বৈষ্ণব সাহিত্যিক আদর্শ—

"চোখের বাণী মিট্‌লে পরে তখন খোঁজে মন
তাই ত প্রভু সবার আগে রূপের আকিঞ্চন।"

—ইহার পাশেই আবার মৃত্যুর বিভীষিকাময়ী তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা শুনতে পাই,

"জেনেছি মৃত্যুর স্বাদ না যেতে জীবন,
অশ্রুশূন্য হাহাকার।"

কবির অন্তর ছিল উদার, মহান্। তিনি ছিলেন সত্যের উপাসক। ক্ষুদ্র সামাজিক সঙ্কীর্ণতার আবেষ্টনে তাঁ'র হৃদয় হয়েছিল ব্যথিত, চিত্ত হয়ে উঠেছিল বিদ্রোহী। নূতনের পূজারী কবি লিখেছিলেন,

"নিতি নব নব নব উন্মেষে নবীন জীবন করুক লীলা,
রসাল মুকুলে না লাগে যেন গো অকালে মেঘের দারুণ শিলা।"

শূদ্রজাতির অপমানে তাই তাঁ'র বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল,

"শূদ্র মহান্ ওরু গরীয়ান্, শূদ্র অতুল এ তিন লোকে ;
শূদ্র রেখেছে সংসার ওগো শূদ্রে দেখো না রক্তচোখে।"

নিখিল মানবের সাহায্যে তিনি চেয়েছিলেন একটি পরিপূর্ণ বিরাট অখণ্ড জাতির সৃষ্টি করতে।

"জগৎ জুড়িয়া আছে এক জাতি সে জাতির নাম মানুষ জাতি
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত একই রবি শশী মোদের ভাতি।"

কিন্তু তাই বলে' দেশমাতৃকার ধ্যান তিনি কখনও বিস্মৃত হন নি। দেশকে উদ্দেশ করে' তাঁ'র লেখা—

"সোনার কাঠি রূপার কাঠি ছুঁইয়ে আবার দাও গো তুমি ;
গৌরবিনী মূর্ত্তি ধর, শ্যামাঙ্গিনী বঙ্গভূমি।"

তাঁর 'কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল' প্রভৃতি লেখা তো জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়ে গেছে।

সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দের বিষয়ে নূতন করে' কোন কথা আর বলব না, যেহেতু তাহা কবিতার নামান্তর মাত্র হবে ; কারণ তিনি ছিলেন ছন্দের রাজা। বাংলা ছন্দোজগতে যুগান্তরের সৃষ্টি যে তিনিই করে' গেছেন—এতো আর আজ নূতন কথা নয়। তাঁ'র 'পাল্কী চলে' 'চরকার গান' প্রভৃতি রচনা বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে চির-সমুজ্জ্বল হয়ে থেকে আমাদের 'মানসভোজের আয়োজনে' পরিতুষ্টি এনে দেবে।

হে বঙ্গসাহিত্যের বসন্তের কোকিল! তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার। তুমি ছিলে একটি বিকচোন্মুখ কমল-কলি—শুভ্র শারদ-প্রাতের অকালে-ঝরে-পড়া মমতা-মাখা একটি সুন্দর প্রসূন! ইংরাজ কবি কীট্‌স্‌এর মতই তুমি ছিলে—The inheritor of unfulfilled renown. কালের নিষ্করুণ কষাঘাতে মথিত না হ'লে কচি-কিশলয়-কোমল তোমার অন্তর-লতা কালে বিশাল বনস্পতিরূপে ফলে ফুলে কত না রস-পিপাসুর রস-সুধা পরিতৃপ্ত করতে পারত'!

আজ এই শুভ স্মৃতি-বাসরে, সেই 'ভাব-ভুবনের প্রধান' কবিকে আমাদের আমাদের অন্তরের অন্তরতম শ্রদ্ধা নিবেদন করি। *

* সাহিত্য-সেবক-সমিতির সত্যেন্দ্রনাথ স্মৃতি-বাসরে পঠিত।

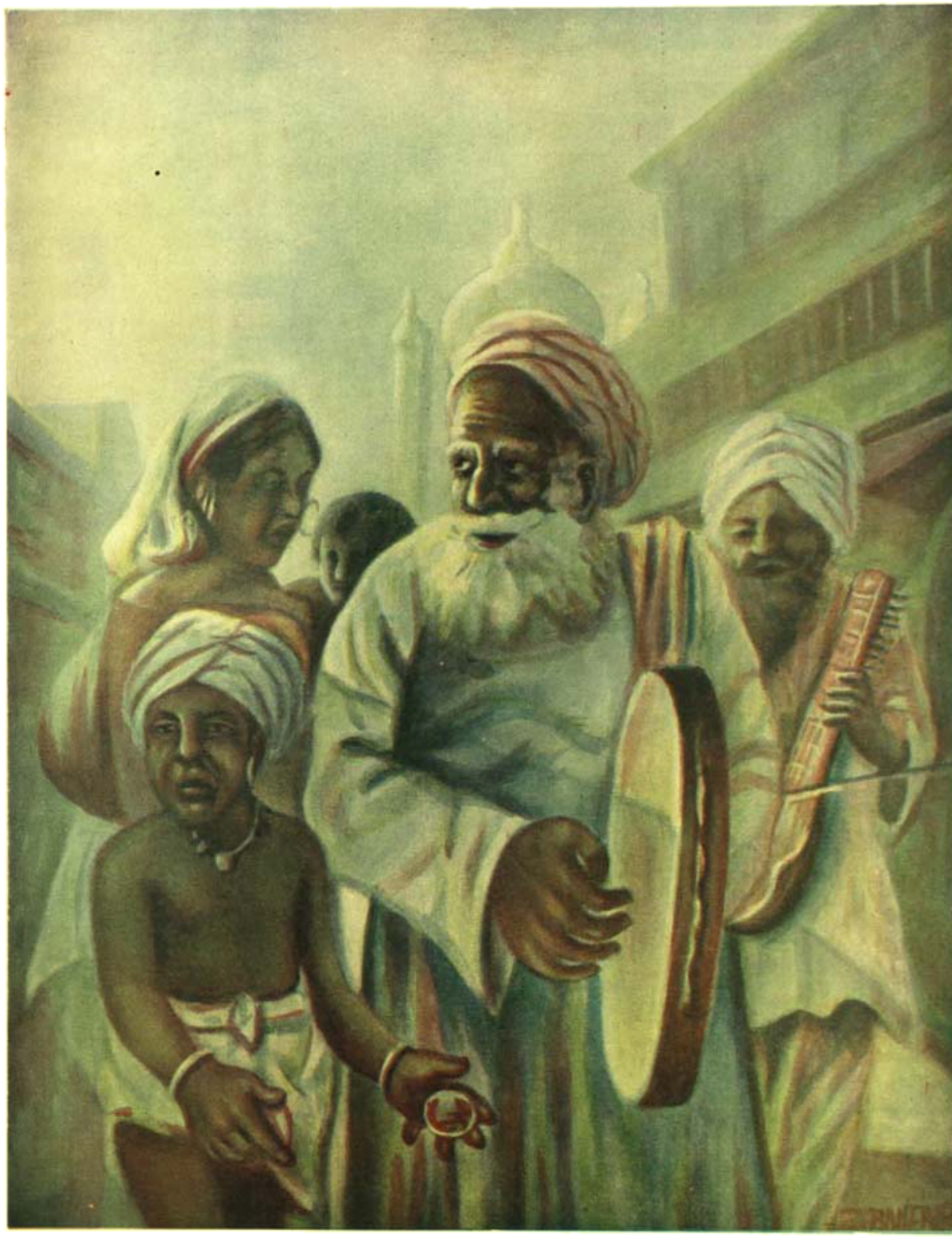

পথ ভিখারী

শিল্পী—[illegible]

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

ছায়ার মায়া

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(চলচ্চিত্রে অভিনয় প্রণালী)

পূর্ব্বেই বলেছি যে পরিচালকই হ'চ্ছেন চলচ্চিত্রের প্রধান শিল্পী—যিনি ছায়াধরবন্ধী, দৃশ্যকার, ঘাপ-দক্ষ (Light-expert) ও নট-নটীগণের সমবায়ে চিত্র-নাট্যের গল্পটিকে রূপায়িত ও প্রাণবন্ত করে তোলেন। সুপরিচালক বলে

ওয়ালেস্ বীরি (হাস্যরসের অভিনেতা)

যিনি খ্যাত হ'তে চান তাঁকে একাধারে চলচ্চিত্রাভিজ্ঞ, সাহিত্য-রসিক, সুর-সঙ্গীতজ্ঞ, আলোক-চিত্র-নিপুণ এবং শিল্প ও অভিনয় কলায় সুদক্ষ হ'তে হবে। এ ছাড়া তাঁকে আরও জানতে হবে—মনস্তত্ত্বের গুহ্য-রহস্য, মানব-চরিত্র-বৈচিত্র্য, প্রকট ও প্রচ্ছন্ন রূপের সন্ধান, চিন্তার ব্যঞ্জনা, ভাবের অভিব্যক্তি, রস-লীলা, সুতীক্ষ্ণ অন্তরালে

মারী ড্রেস্লার্ (হাস্যরসের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী)

অন্তর্দৃষ্টির আবেদন—তবেই তাঁর ছবি বিশ্বের মনোরঞ্জন করবার যোগ্য হ'তে পারবে। চলচ্চিত্রের অভিনেতারা পরিচালকেরই হাতের ক্রীড়নক মাত্র! তিনি তাদের নিয়ে

যেমনটী খেলাবেন—তারা তেমনই খেলবে, তা'ব'লে তারা 'কাণাকড়ি' হ'লে চলবে না—তাদেরও 'খেলুড়ে' হওয়া চাই।

কিন্তু রঙ্গমঞ্চের অভিজ্ঞতা নিয়ে চলচ্চিত্রে অভিনয় ক'রতে গেলে সে খেলোয়াড়ের পক্ষে বাজি মাৎ করা সম্ভব হবে না, কারণ, অনেকবার এ কথা বলেছি যে রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের সঙ্গে চিত্রাভিনয়ের নানাদিক দিয়ে অনেক রকম প্রভেদ বিদ্যমান। কাজেই, চলচ্চিত্রের অভিনেতৃগণকে ছবির উপযোগী পৃথক্ অভিনয় প্রণালী

প্রণয়ে অন্ধ (শ্রীমতী হেলেন্ টুয়েল্‌ভ্‌ট্রি ও শ্রীযুক্ত রবার্ট্ এম্‌স্)

শিখতে হবে, রঙ্গালয়ের অভিনয়-ধারাকে ধ'রে থাকলে চলবে না। রঙ্গালয়ের অবস্থান সম্পূর্ণ কৃত্রিম। সাধারণ কথা বলার যে কণ্ঠস্বর, রঙ্গমঞ্চে অভিনেতাদের তার চেয়ে অনেক বেশী জোরে চীৎকার করতে হয়, নইলে দূরস্থ দর্শকেরা শুনতে পাবে না। হাত পা একটু বেশী রকম প্রসারিত ক'রে অস্বাভাবিক জোরে ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নাড়তে হয়। ওঠা-বসা ও চলা-ফেরার একটা বিশেষ রকম নাটকীয় ভঙ্গী থাকে। অর্থাৎ নাট্যমঞ্চে সব কিছুই দেখাতে হয় সাধারণ বা স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অনেকখানি বড়ো ক'রে এবং বেশী করে। কিন্তু, চলচ্চিত্রে কিছুই বাড়িয়ে বা বেশী ক'রে করবার দরকার হয় না। স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা ব'ললেই চলে; কারণ বিবর্দ্ধক যন্ত্র (Amplifier) ও উচ্চবাক যন্ত্রের (Loud Speaker) সাহায্যে সে কণ্ঠস্বর লক্ষ দর্শকের শ্রুতিগোচর করা চলবে। কাজেই—চলচ্চিত্রের অভিনয় প্রণালী অনেকখানি সহজ ও স্বাভাবিক অভিব্যক্তিরই অনুসারি। ছায়াধর যন্ত্রের সামনে অভিনয় করবার সময়

রিচার্ড ডিক্স্ (চলচ্চিত্রের বহুগুণ সম্পন্ন অভিনেতা)

কোনো বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা ভুল। তা' ছাড়া চলচ্চিত্রাভিনয়ে অভিনেতাদের নড়াচড়া নাটকের দৃশ্য ও ঘটনানুযায়ী সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ। ছায়াধর যন্ত্রের দৃষ্টির বাইরে এতটুকু পা' বাড়াবার তাদের অধিকার নেই। হঠাৎ টপ্ ক'রে বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়ানো বা মুখ ফেরানো কিম্বা ত্বরিত অস্থির পদে ঘনঘন এধার-ওধার পদচারণা করা চলচ্চিত্রাভিনয়ে চলবে না। মুখের ভাব কেবলমাত্র অধরোষ্ঠ ও আঁখিযুগের সাহায্যে

প্রকাশ ক'রতে হবে। সমস্ত মুখ বিকৃত করা নিষেধ। অকারণ কোনো রকম অঙ্গভঙ্গী করা চলচ্চিত্রাভিনয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অনেকের ধারণা ছবিতে অভিনয় ক'রতে হ'লে বুঝি অনবরত মুখভঙ্গী ক'রতে হয়। এ ধারণা

চার্লি চ্যাপলিন (সকরুণ হাস্যরসের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা)

তাঁদের সম্পূর্ণ ভুল। বাংলা ছবিতে একাধিক অভিনেতাকে প্রায়ই এ ভুল ক'রতে দেখা যায়। ফলে তাঁদের অভিনয় হ'য়ে ওঠে যেন আনাড়ীর ভাঁড়ামী! ছবির পর্দ্দার উপর অত্যন্ত হাস্যাস্পদ এবং অশ্রদ্ধেয় হ'য়ে ওঠেন তাঁরা দর্শকের সামনে। অতি-অভিনয়ের দোষ পর্দ্দায় যেমন ক'রে চোখে পড়ে রঙ্গমঞ্চে তেমন পড়ে না, সুতরাং চপল অভিনেতাদের উচিত ছায়াধর যন্ত্রের সামনে সংযত হ'য়ে অভিনয় করা।

চিত্রাভিনয়ে কথা বলবার সময় ঠোঁট যাতে খুব বেশী না নড়ে সে দিকেও মনোযোগী হওয়া দরকার। ছবিতে যত বেশী কম কথা কওয়া হয় ততই ভালো। রঙ্গমঞ্চে যেমন—কথাই হ'লো অভিনেতার একটা প্রধান সম্পদ, ছবিতে তেমনি বেশী কথা বলাই হ'চ্ছে অভিনেতার মস্ত বড় বিপদ! বেশী ঠোঁট নাড়লেই ছবিতে মুখ বিশ্রী হ'য়ে ওঠে এবং সবাকযন্ত্রের ভিতর দিয়ে ঠিক্‌রে আসা বেশী কথা কোনো মতেই শ্রুতিমধুর হ'তে পারে না, এটা যেন প্রত্যেক চলচ্চিত্র পরিচালক ও অভিনেতা স্মরণ

রোণাল্ড্ কোলম্যান ও লিলিয়ান গিশ্
(চলচ্চিত্রের প্রসিদ্ধ নটনটী)

রাখেন। কথা কওয়া ছবিতে অল্প দু' চারটি বাছা বাছা ভালো ভালো কথা ঠিক তাল বুঝে লাগাতে পারলে সে কথা-

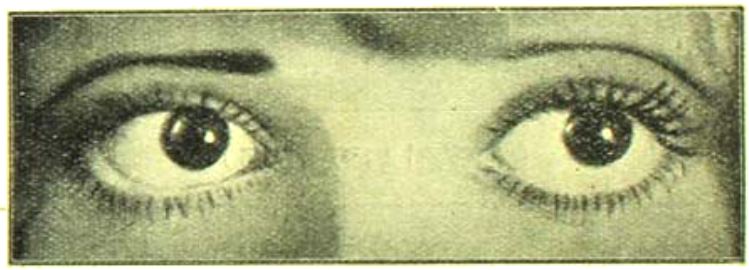

চোখের ভাষা—(ক) বিজয়িনী (ক্লারা বো)

(খ) রহস্যময়ী (গ্রেটা গার্ব্বো)

কওয়া ছবির দাম হ'য়ে ওঠে লাখটাকা! গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত গানে ও কথায় ভরা ছবির চেয়ে স্বল্প-বাক চলচ্ছবি যে অধিকতর জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে

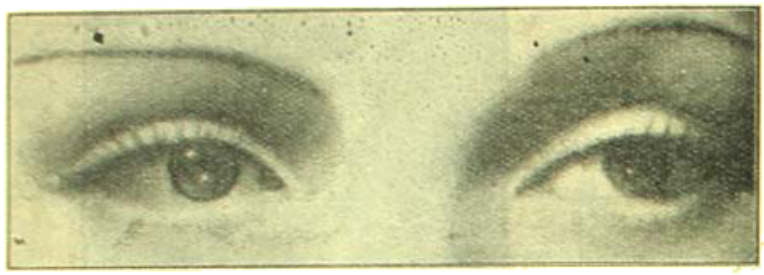

(ক) মোহিনী (মার্গারিটা ভিয়েট্রিক্স)

(খ) সুনয়নী (মেরী লয়)

(গ) চতুরা (ক্লো ব্রাণ্ডিস্)

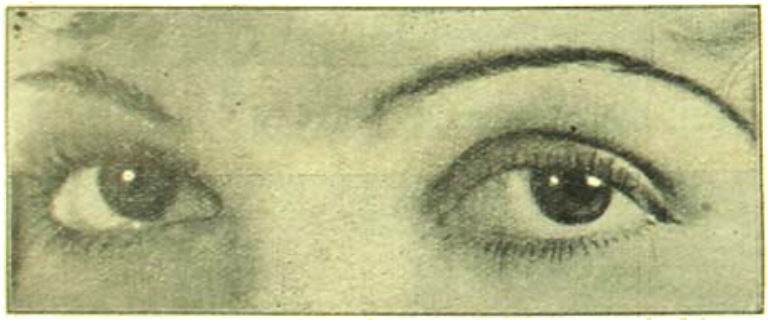

(ঘ) সুন্দরী (ক্লাডিট্ কোল্‌বার্ট)

তার পরিচয় আমরা 'মরক্কো' প্রভৃতি একাধিক ছবিতে পেয়েছি।

রঙ্গমঞ্চে যেমন অভিনেতাদের পর্দ্দায় পর্দ্দায় বক্তৃতার সুর চড়াতে হয় নামাতে হয়, চলচ্চিত্রে সে রকম ক্রমোচ্চ গ্রামে স্বর তোলা বা ফেলার প্রয়োজন নেই। ছবিতে অভিনয় করবার সময় যে কথা গুলি বলবার সেগুলি বেশ সহজ ও স্বাভাবিক কণ্ঠে, একটু বিলম্বিত ক'রে এবং প্রত্যেক কথাটির পর ঈষৎ বিরাম দিয়ে পরের কথাটি উচ্চারণ করলে সবাক্ যন্ত্রে সে কথা খুব ভালো ও স্পষ্ট ওঠে। তবে, একটা কথা এখানে বলা উচিত যে সকল অভিনেতার কণ্ঠস্বরই সবাক যন্ত্রের উপযোগী নয়। যাদের গলা শব্দ সম্প্রসারণ যন্ত্রে বিশ্রী শোনায় তাদের উচিত নয় মুখর ছবিতে অভিনয় করা।

হাত পা নাড়া সম্বন্ধেও রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ছবির পর্দ্দার অভিনয়ের ঐ একই প্রভেদ। জোরে বা বিদ্যুৎবেগে নড়া-চড়া ও হাত-পা নাড়া-চাড়া একেবারে নিষেধ! নাচের ভঙ্গীতে চলা,—কাঁধ কাঁপানো, দু'হাত অকস্মাৎ সম্পূর্ণ প্রসারিত ক'রে দেওয়া, হঠাৎ হাত তোলা বা আঙুল পাকানো—রঙ্গমঞ্চে এসব ভঙ্গী যে কোনো অভিনেতাকে দর্শকদের কাছে সুদক্ষ নট ব'লে পরিচিত ক'রে দেবে, কিন্তু ছবির পর্দ্দায় এ সব প্যাঁচ দেখাতে গেলে ঠকতে হবে। কারণ, তাঁদের এই সব সবেগ গতি ছবিতে ঠিক্ যেন ঝাঁকুনি বা খিঁচুনি হ'য়ে উঠবে।

ছবির পর্দ্দায় ভাব প্রকাশের সব চেয়ে প্রশস্ত উপায় হচ্ছে অভিনেতার দুই চোখ। বেশ ভাসা ভাসা টানা দুটি ডাগর চোখে ভাবের সাগর উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতে পারে। চিত্রাভিনেতার সব চেয়ে বড় যোগ্যতা হ'চ্ছে —তার ডাগর দুটি চোখ, যার গভীর দৃষ্টি মুখের ভাষার চেয়েও মুখর, সুছন্দ কাব্যের চেয়েও মধুর। হোলিউডের একাধিক চিত্রগড়ে ছবির জন্য অভিনেতৃ নির্ব্বাচনের সময় নট-নটীদের মুখে এমনভাবে রুমাল বেঁধে দেওয়া হয় যে কেবলমাত্র তার

চোখ দুটি দেখা যাবে। তার পর, তাকে পরীক্ষা করা হবে, সে কেবলমাত্র চোখের সাহায্যে দুঃখ, বেদনা, আনন্দ,

নটরাজন্ (শ্রীমতী রুথ চ্যাটার্টন ও শ্রীযুক্ত রালফ্ ফর্বস)

ক্রোধ, হিংসা, লোভ, ভয়, দুর্ভাবনা প্রভৃতি মনোভাব প্রকাশ ক'রতে পারে কিনা। যিনি এ পরীক্ষায় যোগ্যতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হন তাঁর ভবিষ্যৎ চিত্রজগতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

রঙ্গালয়ে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে, তাঁরা যখন ছবির পর্দ্দায় অভিনয় পদ্ধতির সঙ্গে নাট্যমঞ্চের অভিনয় প্রণালীর পার্থক্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তখন চিত্রাভিনয়েও তাঁরা যশস্বী ও জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠেন; অবশ্য যদি তাঁদের আরও কতকগুলি অতিরিক্ত গুণ থাকে। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ক'রে প্রসিদ্ধিলাভ করবার জন্য ভালো ঘোড়সওয়ার হবার প্রয়োজন নেই, মোটর চালাতে বা সাইকেল চড়তে না শিখলেও চলে; সাঁতার জানা অত্যাবশ্যক নয়, বন্দুক ছোঁড়ায় ও সব রকম খেলায় ওস্তাদ হবার প্রয়োজন হয়না, কিন্তু চলচ্চিত্রে একজন নামজাদা সু-অভিনেতা হ'তে হ'লে তাঁকে উল্লিখিত সব রকম গুণের অধিকারী হ'তে হবে। কারণ, চলচ্চিত্রের দৃশ্যপট রঙ্গমঞ্চের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। খোলা মাঠে, নদীর তীরে, বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে, পথে

মার্গারিটা ডিয়েট্রিক্ ('মোহিনী' অভিনেত্রী)

ম্যরিস্ শিভেলিয়ার (প্রসিদ্ধ ফরাসী গায়ক অভিনেতা)
রঙ্গমঞ্চ হইতে চলচ্চিত্রে উদয়

যেখানে সেখানে নাটকের নির্দ্দিষ্ট অবস্থান ও ঘটনা অনুযায়ী গল্পের নায়ক নায়িকা বা সঙ্গী ও অনুচরদের হয়ত ঘোড়ার, পিঠে উঠে ছুটতে হয়, সাইকেল চ'ড়ে ছুটতে হয়,—সাঁতার কেটে নদী পার হ'য়ে পালাতে হয়, বন্দুক বা রিভলবারও

কোঃ ব্রাণ্ডিস্ ('চতুরা' অভিনেত্রী)

ব্যবহারের দরকার হয়; কাজেই চলচ্চিত্রে সুঅভিনেতা হ'তে হ'লে এসবও জানা খুবই দরকার।

চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়া, তেতলার ছাত থেকে

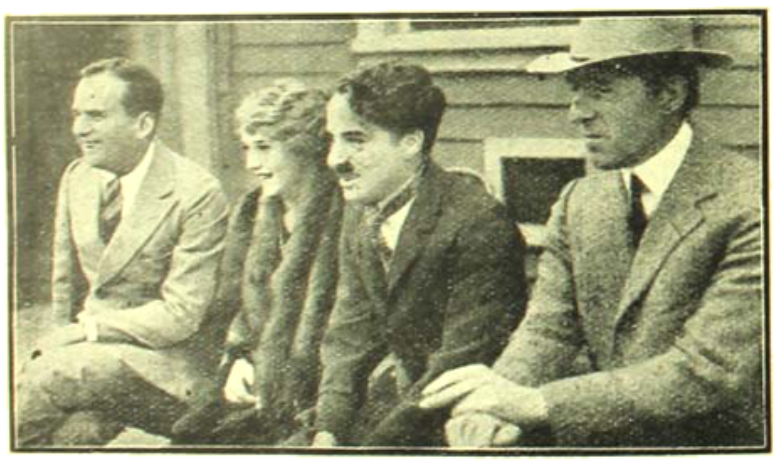

নিখিল শিল্পী সম্প্রদায় (United Artists Corporation.

ডগলাস্, মেরী, চার্লীন ও গ্রিফীথ্)

ঝাঁপ খাওয়া, জলঝড়ে সমুদ্রের মাঝখানে জাহাজডুবি হওয়া, উঁচো জাহাজ থেকে ঠিক্‌রে পড়ে যাওয়া—এসব ছবির অধিকাংশই যে 'ছায়াধর' বহুর কৌশলে ও আলোক চিত্র

শিল্পীর হাতের কারদায় সুসম্পন্ন হয় এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি, তাহ'লেও, ছবিতে নটনটীদের অনেক সময় এমন সব দৃশ্য অভিনয় ক'রতে হয় যা মোটেই নিরাপদ নয়। ঘোড়ার

জন ব্যারিমোর (অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা)

রঙ্গমঞ্চ হইতে চলচ্চিত্রে উদয়

উপর থেকে পড়ে যাওয়া—ভালো ক'রে না শিখলে অক্ষত থাকা সম্ভব নয়। নৌকোর ছই থেকে নদীর জলে ঝাঁপ খেয়ে প'ড়তে হলে সাঁতার জানা থাকা চাই। কারণ, ছায়াধর বন্ধু এখানে অভিনেতাকে খুব বেশী সাহায্য ক'রতে পারে না। চলন্ত মেল ট্রেন থেকে একজন লোক দাঁ ক'রে দরজা খুলে বা জান্‌লা গলে লাইনের ধারে লাফিয়ে পড়লো বা ট্রেনের চালের উপর উঠে পড়ে এক গাড়ী থেকে আর এক গাড়ীর মাথার টপকে চলে গেলো দেখে আমরা অবাক্ হয়ে ভাবি—লোকটা কী দুঃসাহসী! একটু প্রাণের ভয় নেই। আসলে এ ছবি যখন নেওয়া হয় তখন ট্রেন মোটেই ছোটেনা,—ধীরে ধীরে চলে! কিন্তু ছায়াধর যন্ত্রে তার—ছবিটা নেওয়া হয়—খুব তাড়াতাড়ি এবং পর্দ্দার উপর সে ছবি ফেলাও হয়—খুব তাড়াতাড়ি। কাজেই আমরা দেখি চলন্ত মেল ট্রেন একেবারে বিদ্যুৎবেগে ছুটছে—

আর তারই ভিতর থেকে একটা লোক মরিয়ার মতো জীবন তুচ্ছ ক'রে লাফিয়ে পড়লো!

ছায়াদর যন্ত্রের সামনে অভিনয় করতে নামবার আগে

ক্লডিট্ কোলবার্ট ('সুন্দরী' অভিনেত্রী)

প্রত্যেক অভিনেতার উচিত খুব ভালো ক'রে তাঁর ভূমিকার মহলা দেওয়া; যে পর্য্যন্ত না তাঁর অভিনয় নিঁখুত হয় সে

মীর্ণা লয় ('সুনয়নী' অভিনেত্রী)

পর্য্যন্ত ছায়াদর যন্ত্রের সম্মুখীন হওয়া অন্যায়, কারণ, সে সময় কোথাও সামান্য একটু ভুল করলেই সেই ত্রুটি সংশোধনের জন্য অনেকখানি মূল্যবান ছায়াবাহন বাতিল হ'য়ে যাবে এবং সেই অংশের চিত্র আবার তোলবার জন্য অতিরিক্ত খরচ ও অনেক সময় নষ্ট হবে। কোম্পানী এই ক্ষতির জন্য তাঁকে দায়ী করতে পারে। সুতরাং এ বিষয়ে প্রত্যেক ছায়াচিত্রাভিনেতার বিশেষভাবে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

সুতনু অভিনেত্রী (শ্রীমতী ডোলোরেস্ ডেলরায়ো)

কিন্তু রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার এতটা সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়না। আজ রাত্রে তাঁর অভিনয়ে কোথাও কোনো ত্রুটী হ'লে পরের রাত্রে সেটা তিনি শুধ্‌রে নিতে পারেন—সম্পূর্ণ বিনা খরচেই। তা'ছাড়া রঙ্গমঞ্চে কোনো

দৃশ্যের অভিনয়-'কাল' সম্বন্ধে তেমন কিছু বাঁধাবাঁধি কড়া নিয়ম নেই। আজ যে দৃশ্য অভিনয় করতে কুড়ি মিনিট লেগেছিল কাল সে দৃশ্য অভিনয় ক'রতে যদি আধ ঘণ্টা সময় লাগে, তাতে এমন কিছু আসে যায়না, অভিনয় ধারাও প্রতিরাত্রে বদলাতে পারে। কিন্তু চলচ্চিত্রে মহলার সময়ই প্রত্যেক দৃশ্যটির যাবতীয় কার্য্য এবং অভিনয় 'কাল'

ভিক্টর ম্যাক্‌ল্যাগ্‌লেন্ ও ডোলোরেস্ ডেলরারো
(Loves of Carmen চিত্রে)

একেবারে বড়ী ধরে নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়া থাকে, কাজেই ছায়াধর যন্ত্রের সামনে ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই অভিনয়ের যাবতীয় খুঁটিনাটি শেষ করা দরকার, নইলে পরের দৃশ্যগুলি সমস্ত বেবন্দোবস্ত হ'য়ে পড়বে।

আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে আজকাল অনেকেই চলচ্চিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জেনেই ওস্তাদ হ'য়ে উঠতে চান্। কোনো বিষয়ে সাধনা না থাকলে যে সিদ্ধিলাভ করা যায়না এ সত্য বিস্মৃত হ'য়ে তাঁরা নির্ব্বোধ ধনীর অর্থে নিজেদের খেয়াল খুশী চরিতার্থ করেন। তাঁকি দিয়ে বিনা পরিশ্রমে সবজান্তা ব'নে বাজীমাৎ ক'রতে চেষ্টা করেন। ফলে তাঁদের পরিচালনায় যে ছবি তৈরী হয় তার জীবন সপ্তাহকালের মধ্যেই নিন্দার কলঙ্ক-পঙ্কে ও ব্যর্থতার মধ্যে নিঃশেষিত হ'য়ে যায়। চলচ্চিত্রকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলবার জন্য চাই এর পরিচালকের সর্ব্বপ্রকার যোগ্যতা ও সাধনা এবং তাঁর প্রাণপাত পরিশ্রম। বহুচিন্তিত ও বহু বিনিদ্র রজনীর পরিকল্পিত নানা খুঁটি নাটির যোগাযোগে, সজ্জা ও অলঙ্কারের সুষ্ঠু সমাবেশে এবং আলোকপাত ও অভিনয় ভঙ্গীর সুনির্দ্দেশের উপরই ছবির পূর্ণ সাফল্য নির্ভর করে। প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রীর প্রধান কর্ত্তব্য হ'চ্ছে পরিচালককে এ বিষয়ে সকল দিক দিয়ে সাহায্য করবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করা।

মূক ছবির অভিনেতাদের একটি কথাও না ব'লে নিঃশব্দে মনের ভাব ব্যক্ত ক'রতে হয়—ব'লে অনেকেই ভাবেন একটু বেশী রকম মুখভঙ্গী করতে হবে নিশ্চয়, কিন্তু এরূপ মনে করা অত্যন্ত ভুল। কি মূক অভিনয়ে—কি মুখর অভিনয়ে যে কোনো ছবিতেই অতিরিক্ত মুখভঙ্গী ও অঙ্গ সঞ্চালন অভিনেতার পক্ষে ক্ষতিকর। ছবিতে বরং খুব সংযত ও ধীরভাবে অভিনয় করাই সু-অভিনেতার কর্ত্তব্য। কথা ব'লবে তাঁদের চোখ, কথা বলবে তাঁদের মুখের ভাব, তাঁদের চলা বলা ওঠা দাঁড়ানো। মনে রাখতে

হবে তাঁদের হাসি অশ্রুটি পর্য্যন্ত রাশ বাঁধা, ওজন করা! প্রত্যেক নড়া-চড়াটুকুও গণ্ডী কাটা! তাঁদের যা কিছু ভাব প্রকাশ তা শুধু আভাসে ইঙ্গিতে। ইংরাজীতে যাকে বলে Suggestive Action.

নীরব ছবিতেও নায়ক নায়িকারা মাঝে মাঝে প্রয়োজন মত কথা বলে। সে কথার শব্দ নেই বটে, কিন্তু ভাষা আছে। তা' দর্শকেরা কাণে শুনতে পায়না, কিন্তু প্রাণে যেন স্পষ্ট বুঝতে পারে। দু'খানি ঠোঁট একটু কেঁপে উঠে, অল্প নড়ে কি কথা ব'ললে তার প্রত্যেকটি হুবহু দর্শকেরা বুঝে নিতে পারে যদি সেই দৃশ্যে সেই ঘটনায় সেই অবস্থায় যে কথাটি বলা উচিত ঠিক সেই কথাটিই অভিনেতার মুখে বসিয়ে দেওয়া হয়। পরিচালকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি, রসবোধ ও অভিজ্ঞতার উপরই এই সময়োপযোগী বাক্য-নির্ব্বাচন করা নির্ভর করে। চিত্রনাট্য রচয়িতাও এ বিষয়ে খানিকটা সাহায্য ক'রতে পারেন।

চিত্র-জগতে সু-অভিনেতা হ'তে হ'লে তাঁকে অভ্যাস করতে হবে যথাসাধ্য কম কথা বলে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করা। মুখে কোনো কথা না বলেও যিনি কেবল চোখ-মুখের ভাবভঙ্গীতেই অনেক কিছু আমাদের ব'লতে ও বোঝাতে পারেন চলচ্চিত্রে তাঁর স্থান যে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই সুনির্দ্দিষ্ট সে বিষয়ে কোনো ভুল নেই। এই চোখ মুখের ভাব ভঙ্গীকে মুখের কথার চেয়েও মুখর ক'রে তুলতে হ'লে সে জন্য সযত্নে সাধনা করতে হবে। একখানি বড় আয়নার সামনে নিজের মুখে রুমাল বেঁধে কেবলমাত্র চোখ দু'টি বার করে রেখে চেষ্টা করতে হবে যাতে শুধু চোখের সাহায্যেই ভয়, সন্দেহ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা, আনন্দ, বেদনা, ক্লান্তি, উৎসাহ, উত্তেজনা, দয়া, মায়া, সহানুভূতি, সান্ত্বনা, স্নেহ, প্রেম, আশা, নিরাশা প্রভৃতি মনোভাব ব্যক্ত করা যায়। সাধনাই মানুষের চেষ্টাকে জয়যুক্ত ক'রে তোলে। ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে সাধনা ক'রতে পারলে মানুষ অনেক কিছু শক্তি ও গুণের অধিকারী হ'তে পারে যা দুর্লভ ও অনন্যসাধারণ।

চোখের গড়ন বা আকৃতি আঁখি পল্লবের অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন রকম দেখায়—এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটুকু আজ আর কারুর অবিদিত নেই। এখন, কোনো উৎসাহী তরুণ অভিনেতা যদি কিছুদিন সাধনা ও অভ্যাসের দ্বারা ইচ্ছামত এই আঁখি পল্লবের অবস্থান পরিবর্ত্তন ক'রে ফেলতে সক্ষম হ'ন, তাহ'লে যে কোনো মুহূর্ত্তে তিনি তাঁর মুখের চেহারাও বদলে ফেলতে পারবেন। একজন অভিনেতার পক্ষে—বিশেষ ক'রে চলচ্চিত্র অভিনেতার পক্ষে এটা যে একটা মস্ত গুণ এ কথা বলাই বাহুল্য; কারণ টানা চোখ, ডাগরা চোখ, ভাঁটা-চোখ, বসা চোখ, ভাসা চোখ, পারা চোখ, হরিণ চোখ, এমন কি পদ্ম আঁখি ও খঞ্জন লোচনও যদি একই মানুষ ইচ্ছা করলে তাঁর নিজেরই আঁখি পল্লবের পেশী সঙ্কুচন ও প্রসারণের দ্বারা এত বিভিন্ন রূপান্তর ঘটাতে পারেন, তাহ'লে চিত্রাভিনয়ে পরিচালকের ও অভিনেতার উভয়েরই সেটা অনেক সুবিধায় ও কাজে লাগে।

চিত্রাভিনয়ের সময় বিনা প্রয়োজনে কোনো কিছুর দিকে ঝুঁকে দেখা বা ভ্রূ কুঁচকে চাওয়া উচিত নয়। যাদের চোখ খারাপ তারাই অমনি ক'রে চেয়ে দেখে। চিত্রগৃহের তীব্র বৈদ্যুতিক আলো, বা বহির্দৃশ্যে মুকুরে প্রতিফলিত সূর্য্যালোকের দীপ্তির মধ্যে অনেকেই সহজভাবে ও পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে পারেনা! এটাতে অভ্যস্ত না-হওয়া পর্য্যন্ত কোনো অভিনেতারই উচিত নয় ছায়াধর যন্ত্রের সম্মুখীন হওয়া।

দু'জন লোকে যখন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে তখন দূর থেকে তাদের চোখ মুখের ভাব ও হাতমুখ নাড়ার প্রতি লক্ষ্য রেখে যদি বোঝবার চেষ্টা করা যায় যে তারা কি বলাবলি ক'রছে তাহ'লে ভাব প্রকাশের ভঙ্গী সহজেই আয়ত্ত হ'তে পারে। বন্ধুমহলে এটা পরীক্ষা ক'রে দেখা মন্দ নয়, কারণ, তাহ'লে বুঝতে পারা যাবে যে তাদের কথা না শুনেও তাদের বক্তব্যটা তুমি ঠিক আন্দাজ ক'রতে পেরেছো কিনা।

নিয়মিত চেষ্টা ও অভ্যাসের দ্বারা অল্পদিনের মধ্যেই কেবলমাত্র মুখের সাহায্যে ভাবের অভিব্যক্তি আয়ত্ত করা যায়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি যদি ভাবো তোমার জীবনের কোনো বিগত বেদনা বা আনন্দের স্মৃতি যা তোমার প্রাণকে গভীরভাবে নাড়া দেয়, চিত্তকে সঘনে দোলা দেয়—লক্ষ্য কোরো তোমার মুখের ভাবের কি পরিবর্ত্তন ঘটে। সে সময় কিন্তু চেষ্টা ক'রে মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করবার প্রয়াস পেয়োনা। আপনা-আপনিই মুখের যে স্বতঃ পরিবর্ত্তন ঘটবে, তারই রূপটি মনের মধ্যে

এঁকে রেখে দেবে। পরে, সেই মুখভাবটি আয়নার সামনে পুনঃপ্রকাশের চেষ্টা করবে। এ সাধনা নিতান্ত সহজসাধ্য নয়। এতে একাগ্রতা আনা দরকার, অথচ আত্মহারা বা তন্ময় হওয়া চলবেনা। নিজের দেহ মনের উপর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ নিজের হাতের মধ্যে থাকা চাই, অথচ ভাবের প্রবাহ যাতে তোমাকে অথাধে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সেদিকেও সচেতন থাকা দরকার। এমনি ক'রে নানা ভাবান্তর প্রকাশে অভ্যস্ত হ'তে হবে। শুধু তাই নয়, যে কোনোও মুখভাবকে ইচ্ছামত বহুক্ষণ ধ'রে রাখতেও শেখা চাই। কারণ চিত্রনাট্যের নির্দ্দেশ অনুযায়ী পরিচালকের ইঙ্গিতে এবং আলোক চিত্রকরের প্রয়োজনে হয়ত একাধিক দৃশ্যের সুস্পষ্ট ছবি, বা 'নিকট পটে'র জন্য কোন্ সময় হঠাৎ হুকুম হবে Hold it! বা—"অমনি থাকো!" তখন আর এতটুকু নড়চড় করা চলবেনা। মর্ম্মর মূর্ত্তির মত স্থির হ'য়ে থাকতে হবে সেই ভাবটি মুখে নিয়ে!

চলচ্চিত্রাভিনেতার পক্ষে শুধু ভাবপ্রকাশ, ভাব পরিবর্ত্তন ও ভাব ধারণে অভ্যস্ত হলেই চলবেনা, ভাবকে বা ভাব-প্রকাশকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ধীরে ধীরে গভীরতর ও নিবিড়তর ক'রে তুলতেও শেখা চাই। খুব অল্প সময়ের মধ্যে বললুম এই জন্য যে চলচ্চিত্রে সময় সম্বন্ধে সর্ব্বদা সতর্ক ও সজ্ঞান থাকা প্রত্যেক অভিনেতার প্রধান কর্ত্তব্য। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উপর একটি দৃশ্য অভিনয় হ'তে হয়ত' পনেরো মিনিট সময় লাগে কিন্তু, সেই দৃশ্যই চলচ্চিত্রে হয়ত এক মিনিটেই শেষ ক'রে নিতে হয়। কারণ, চলচ্ছবি যে চিত্রবাহনে তোলা হয় তার দৈর্ঘ্যের একটা পরিমিত সীমা আছে। মহলা দেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দৃশ্যটি অভিনয় হ'তে কতক্ষণ লাগে সেই সময়ের একটা বাঁধা ধরা তালিকা করে রেখা হয় সেটি ক' Reel (চিত্রবাহন গুটিয়ে রাখা কাঠিম) অর্থাৎ ক'হাজার ফুট ছবি হতে পারে। এক কাঠিমে প্রায় হাজার ফুট চিত্রবাহন গোটানো থাকে। এই হাজার ফুট ছবি পর্দ্দায় ফেলে দেখাতে ছুড়ি মিনিটের বেশী সময় লাগেনা। কাজেই, চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য এক মিনিট বড়জোর দেড় মিনিটের বেশী দর্শকের চোখের সামনে থাকেনা। সুতরাং একথা বোধহয় আর বুঝিয়ে বলার দরকার নেই যে চলচ্ছবির পক্ষে প্রত্যেক মিনিট কেন, প্রত্যেক সেকেণ্ড—এমন কি প্রত্যেক সেকেণ্ডের প্রত্যেক অংশটুকু পর্য্যন্ত সময় অতি মূল্যবান। কোন্ অভিনয় পর্দ্দায় কতটুকুর মধ্যে শেষ হ'য়ে যাবে এ ধারণা ও জ্ঞান যে অভিনেতার থাকে তিনি তাঁর অভিনয় নৈপুণ্য ও ভাবাভিব্যক্তি অনেকখানি তাঁর নিজের দখলের মধ্যে রাখতে পারেন।

সময়ে কুলিয়ে উঠছেনা দেখলে পরিচালক বাধ্য হ'য়ে অনেক দৃশ্যের অভিনয় সংক্ষিপ্ত ক'রে দেন, অনেক টুকিটাকি ব্যাপারও বাদ পড়ে যায়। পুনঃ পুনঃ মহলা দিয়ে যে দৃশ্য যতক্ষণ না ঠিক সময়ের মধ্যে খাপ খায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাটাকুটি ও অদলবদল চলতে থাকে, তার পর সেটা ছবিতে তোলা হয়। বাড়ীর দরজা খুলে বেরিয়ে এসে গাড়ীতে চড়া, বা গাড়ী থেকে নেমে বাড়ী ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠা এসব ব্যাপারের জন্য সময় নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবার দরকার হয়না কারুরই, কিন্তু, গ্যাড়া-তলার বস্তির একটা নিভৃত আড্ডা-ঘরে গোপনে জনকয়েক বদ্‌মায়েস্ একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র কর'ছে বা কোনো একটা পোড়ো বাগানবাড়ীর ঘরে জনকতক জালিয়াৎ লুকিয়ে বসে একজন নামজাদা বড়লোকের নামে উইল জাল করছে বা চেক জাল ক'রছে—এসব দৃশ্যের ছবি তোলবার আগে প্রত্যেক খুঁটিনাটির ভালো করে মহলা দিয়ে সময় ঠিক ক'রে নিতে হয়। কাজেই এসব স্থলে পরিচালক এবং অভিনেতা উভয় পক্ষেরই একটু মাথা খেলানো চাই; যাতে অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাপারটা শেষ হতে পারে, অথচ দৃশ্যের গুরুত্ব কিছুমাত্র না ক্ষুণ্ণ হয়।

চলচ্চিত্রে অভিনয় করবার সময় পরিচালকের বিশেষ আদেশ ব্যতীত কোনো অভিনেতারই উচিত নয় ছায়াধর যন্ত্রের দিকে সোজা চোখ ফিরিয়ে দেখা। ছায়াধর যন্ত্র যে সামনেই খাড়া করা রয়েছে এবং তারই সামনে যে সমস্ত দৃশ্য অভিনয় হচ্ছে এটা সর্ব্বদা খেয়াল থাকা চাই বটে, কিন্তু পরিচালক না বললে সরাসরি সেদিকে চেয়ে দেখা একেবারে নিষেধ!

অভিনয় ক্ষমতা হ'চ্ছে মানুষের একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত গুণ, যার নিয়ত সাধনা ও অনুশীলন তাকে ক্রমে একজন নিপুণ নট-শিল্পীতে পরিণত করে। নট-প্রবৃত্তি যার মধ্যে অন্তর্নিহিত নেই, সে শতচেষ্টা সত্ত্বেও কোনোদিনই একজন

সু-অভিনেতা ব'লে খ্যাত হ'তে পারেন না। কবি, শিল্পী নট, এরা সব 'জন্মায়'—কারখানায় 'তৈরি' হয় না। তবু, অভিনয়কলা একটা বিদ্যা এবং সেই বিদ্যা অর্জ্জন ক'রতে হ'লে এর কতকগুলি প্রাথমিক ও উচ্চপাঠ আছে যা সকলকেই ভালো ছেলের মত মনোযোগ দিয়ে পড়তে হয় ও শিখতে হয়।

যে কোনো ভূমিকা অভিনয়ের জন্ত নির্ব্বাচিত হলে অভিনেতার প্রধান কর্ত্তব্য সেই চরিত্রটি ভালো ক'রে বুঝে নিয়ে তার সঙ্গে নিজের একাত্ম হ'তে চেষ্টা করা। তাহ'লে আর প্রত্যেক খুঁটিনাটি ব্যাপারের জন্ত প্রতিবার শিক্ষকের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে হয় না। ধরুন, যদি তাঁকে পল্লীগ্রামের পাঠশালার 'গুরুমশাই' সাজতে হয়, বা মস্‌জেদের মক্তবের মৌলবী সাজতে হয়, কিম্বা তক্ত পরিবারের বৈষ্ণব 'গুরুদেব' অথবা সওদাগরী হৌসের জাঁদরেল্ বুৎসুদ্দি, বড়বাবু কি পাটের দালাল সাজতে হয় তাহ'লে এই ধরণের লোকের চরিত্র অনুধাবন ক'রে একটা স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত রূপ খাড়া ক'রে তোলাই হ'চ্ছে সু-অভিনয়ের সহজ উপায়। এমনি করেই ডাক্তার, উকীল, ব্যারিষ্টার, কবিরাজ, স্কুলমাষ্টার, চাষা, জমীদার, কেরাণী, ভিখারী, চোর, ডাকাত, খুনে, লম্পট, মাতাল, ভৃত্য, সরকার, গোমস্তা, নায়েব, দেওয়ান, মুটে, মজুর, গাড়োয়ান, দারোগা প্রভৃতি যে কোনো ভূমিকা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুধাবন করে অভিনেতা তাঁর অভিনয় চরিত্রটিকে দর্শকদের সাম্নে আসলরূপেই পরিস্ফুট ক'রে তুলতে পারেন।

মোট কথা, চলচ্চিত্রে অভিনয় হওয়া উচিত একেবারে যতদূর সম্ভব স্বতঃস্ফূর্ত্ত, সাবলীল ও সকল দিক দিয়ে সুসম্পূর্ণ সহজ ও স্বাভাবিক। কোথাও এতটুকু কৃত্রিমতা বা চেষ্টা ক'রে কিছু কারদা দেখাবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হ'লে পর্দ্দার উপর সে অভিনয় দর্শকদের বিরক্তি ও অশ্রদ্ধাই অর্জ্জন ক'রবে। কারণ, যা অপ্রাকৃত ও অস্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে তার কোনো সহজ যোগ থাকে না, কাজেই সে অভিনয় হ'য়ে ওঠে প্রাণহীন ও অনুপভোগ্য!

আর একটা কথা মনে রাখা দরকার—চিত্রজগৎ হ'চ্ছে সৌন্দর্য্যের রাজ্য। এখানে কোনো কিছু অসুন্দর বা অশোভন হ'লে চলবে না। ঘরে ঢোকা, ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া, গাড়ীতে ওঠা, গাড়ী থেকে নামা,—চিঠি লেখা, বইপড়া, ওঠা, বসা, দাঁড়ানো, চলা, হাত-পা নাড়া, এ সবের মধ্যেই একটা বেশ কমনীয় শ্রী যাতে বজায় রাখতে পারা যায় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা চাই। চলচ্চিত্রে অভিনয় করা রঙ্গমঞ্চের চেয়ে কঠিন বলেছি—আরও এই জন্ত যে, রঙ্গমঞ্চে একখানি নাটক দীর্ঘকাল ধরে মহলা দেওয়া হয় এবং একই রাত্রে সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত বেশ ধারাবাহিক অভিনয় হয়, কাজেই চরিত্রের ক্রম-পরিণতি ও ভাব বিকাশের দিক দিয়ে প্রস্তুত হবার জন্ত অভিনেতা যথেষ্ট সময় ও সুবিধা পায়, কিন্তু, চলচ্চিত্রে চিত্রনাট্যের সমাপ্ত দৃশ্যগুলি একদিনে তোলা হয় না, এবং গল্পের ধারা অনুসারেও তোলা হয় না। ভিন্ন ভিন্ন দিনে এবং ছবির সময় ও অন্তরের ধারা অনুসারে তোলা হয়, মহলা দেবার সময়ও বেশী পাওয়া যায় না, কাজেই, একই দিনে, একই সময়ে অভিনেতাকে হয়ত এক দৃশ্যে সম্পদের প্রাচুর্য্যে ভাসমান একজন স্ফূর্ত্তিবাজ ও পরক্ষণেই হয় ত' অভাব ও দৈন্যের পীড়নে কাতর ও আর্ত্তের চরিত্র অভিনয় ক'রতে হয়। কাজেই, প্রস্তুত হবার সময় ও সুযোগ চিত্রাভিনয়ে খুব অল্প মেলে। সুতরাং প্রত্যেক অভিনেতার উচিত চলচ্চিত্রে অভিনয় করবার পূর্ব্বে চরিত্রটি উত্তমরূপে আয়ত্ত ক'রে রাখা।

সাময়িকী

বঙ্গীয় ব্যায়াম শালা—

বাঙ্গলার শিক্ষা মন্ত্রী মাননীয় মিঃ কে, নাজিমুদ্দীন বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ এইচ, ই, ষ্টেপলটনের সহযোগে গত ১৯এ জুলাই, ১৯৩২, মঙ্গলবার, বালীগঞ্জে দি বেঙ্গল সেণ্টার অব ফিজিক্যাল ট্রেনিং (the Bengal centre of Physical Training) বা বঙ্গীয় ব্যায়ামশালার উদ্বোধন করিয়াছেন। কলিকাতার অনেক খ্যাতনামা পদস্থ ব্যক্তি এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। সরকারের ফিজিক্যাল ডাইরেক্টর মিঃ বুকাননের তত্ত্বাবধানে ব্যায়ামশালার কার্য্য পরিচালিত হইবে—এখানে স্কুল কলেজের জন্য ব্যায়াম-শিক্ষক তৈয়ার হইবে।

—

ব্যবস্থাটি সময়োচিত ও সমীচীন হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করিয়াছেন, ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদিগকে অন্যান্য বিষয়ের সহিত ব্যায়ামেরও পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে; তবে তাহারা কলেজে পড়িবার অধিকার পাইবে। ইহাও অতি উত্তম ব্যবস্থা এবং আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই ব্যবস্থার সমর্থন করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে বাঙ্গলার প্রত্যেক উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার; এবং সে জন্য প্রত্যেক স্কুলে অন্ততঃ একজন করিয়া ব্যায়াম-শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে। কোন স্কুলে ছাত্র-সংখ্যা অধিক হইলে একাধিক ব্যায়াম শিক্ষকের প্রয়োজনও হইতে পারে। অতএব সরকার এই ব্যায়ামশালা স্থাপন করিয়া উত্তম কার্য্যই করিয়াছেন। সরকারী ব্যায়ামশালায় কি ভাবে ব্যায়াম শিক্ষক তৈয়ার করা হইবে তাহার এখনও কোন আভাষ পাই নাই। ব্যায়াম শিক্ষকের কেবল ব্যায়াম কৌশল জানিলেই যথেষ্ট হইবে না—শারীর সংস্থান, শারীর তত্ত্ব এবং প্রাথমিক চিকিৎসা (first aid) সম্বন্ধেও তাঁহাদের মোটামুটি জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ব্যায়াম শিক্ষকগণকে যে এই সকল বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহাও আমরা স্বচ্ছন্দে অনুমান করিতে পারি।

—

উদ্বোধন সভায় বক্তৃতা উপলক্ষে মিঃ ষ্টেপলটন বাঙ্গলার খেলা ধূলা—ফুটবল, হকি, এথলেটিক স্পোর্টস প্রভৃতির প্রবর্ত্তনের প্রাথমিক ইতিহাসের অভাব দেখিয়া দুঃখ ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়ই বটে, কেন না, এই ইতিহাস একটা মস্ত বড় ইতিহাস এবং তাহা লিখিয়া রাখিবার যোগ্যও বটে। কিন্তু লিখিবে কে? লিখিবার যোগ্যতা যাহাদের আছে তাহারা 'সুবোধ বালক' (good boy), কেবল পড়াশুনা লইয়া থাকে—খেলা ধূলায় তাহাদের উৎসাহ, তথা অভিজ্ঞতার অভাব। আর যাহারা ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি খেলা-ধূলায় ওস্তাদ, তাহারা তেমন 'লিখিয়ে' নহে। যা'ও বা দু'চার জন শিক্ষিত ছেলে লেখাপড়া ও খেলা-ধূলায় সমান ওস্তাদ, তাহাদিগকে উৎসাহ দিবার কেহ নাই—এ সম্বন্ধে 'লোক-মত'ও এখনও যথাযথ ভাবে গঠিত হইয়া উঠে নাই।

—

বস্তুতঃ, নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া বাঙ্গলার ছেলেরা কেবল নিজেদের চেষ্টায় খেলাধূলায় লায়েক হইয়া উঠিতেছে। বাড়ীতে বাপ-দাদা ও অন্যান্য অভিভাবক, স্কুল-কলেজে শিক্ষক ও অধ্যাপক শ্রেণীর লোকদের নিকট হইতে তাহারা এতটুকু উৎসাহ ত পায়ই না, বরং যথেষ্ট বাধা পাইয়া থাকে। তাহারা, পুষ্টিকর, বলকর খাদ্য ত দূরের কথা, সাধারণ ডাল ভাত পেট ভরিয়া দুই বেলা সকলে হয় ত খাইতে পায় না। দিনান্তে এক ফোঁটা দুধ শতকরা নিরানব্বই জনের কপালে জুটে না—শতকরা একজনও খাইতে পায় কি না তাহাতেও সন্দেহ আছে। তাহাদের খেলিবার মাঠ নাই। এই এত বড় কলিকাতা সহরে, দশ-বারো লক্ষ লোকের বাস; তাহাদের লক্ষ লক্ষ ছেলেপুলে; কিন্তু তাহাদের ফুটবল, হকি খেলিবার মাঠ কই? সহরের পত্তন হইয়া অবধি কেবল

বাড়ী তৈয়ার হইতেছে—কেবল বাড়ী—বাড়ী—আর বাড়ী—ইটের 'পরে ইট মাঝে মানুষ কীট"—ফাঁকা জায়গা একটুও থাকিতেছে না। "প্রাসাদ নগরীর" (City of Palaces) নামের মর্য্যাদা রক্ষার্থ এত বাড়ী তৈয়ার হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে যে, ইহাতে যে নগরের স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে সেদিকে কি সহরবাসী, কি কর্পোরেশন কাহারও দৃষ্টি নাই—সে বিষয়ে জ্ঞানই নাই। এই ভাবে চলিতে চলিতে অবস্থা এমন সঙ্গীন হইয়া উঠিল যে, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট গড়িয়া বাড়ী ভাঙ্গিবার ব্যবস্থা করিতে হইল।

—

কিন্তু ছেলেদের উৎসাহ অদম্য। কিছুতেই তাহারা দমে না। যেখানেই একফোঁটা খোলা জায়গা পায়, সেই খানেই একটা করিয়া ফুটবল ক্লাব গড়িয়া জল-খাবারের পয়সা জমাইয়া চাঁদা করিয়া ফুটবল কিনিয়া খেলা করে। সে রকম জায়গা না পাইলে লোকের বাড়ীর উঠানে, কিম্বা গলি রাস্তায় তাহারা ফুটবল খেলে। মিঃ ষ্টেপলটন যদি এই সময় একদিন বৈকালে বেড়াইতে বেড়াইতে উত্তরাঞ্চলে আসেন তাহা হইলে দেখিবেন, প্রায় প্রত্যেক গলি রাস্তার ছোট, মাঝারি, বড় ছেলেরা মিলিয়া ফুটবল খেলা করিতেছে। গাড়ী-ঘোড়া, মোটর, বাস কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই, একটুও ভয়ডর নাই—তাহারা উন্মত্ত হইয়া ফুটবল খেলিতেছে—ফুটবল তাহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। বাঙ্গলার এই সব শিশু, বালক, কিশোর, যুবক—ইহারা খেলিবার জায়গা পায় না বলিয়া রাস্তায় খেলা করে। আজকাল মোটর, বাসের যুগ—দুর্ঘটনা ঘটিতে কতক্ষণ? ছেলেদের অপরাধ কি? কেন তাহারা খেলিবার জায়গা পাইবে না? যদি তাহারা রীতিমত ফুটবল, হকি খেলিবার গ্রাউণ্ড বা ফীল্ড পাইত, তাহা হইলে তাহারা কি না করিতে পারিত? কলিকাতা কর্পোরেশন মেছুয়াবাজারে কলাবীথি বুলাইয়া মার্কাস স্কোয়ার করিয়া দিয়াছেন, সেজন্য তাঁহারা ছেলেদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। কিন্তু সেখানে কয়টি ক্লাব খেলিতে পায়? খেলিবার জন্য শ্রীযুত পার্ক করিয়া দিলেন, তাহাও আবার কাড়িয়া লইয়া মেয়েদের দিলেন। লেডিজ পার্ক করা কিছু অন্যায় হয় নাই, আরও কতকগুলা ঐ রকম পার্ক মেয়েদের জন্য দরকার। কিন্তু ছেলেদের যে আরও বেশী দরকার—তাহার কি? ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট সহর ভাঙ্গিয়া গড়িতেছেন, দু একটা পার্কও করিয়া দিতেছেন—ভাল কথা। ঐ সঙ্গে ছেলেদের খেলিবার মাঠও যে দরকার। আমরা ট্রাষ্টকে এবং কর্পোরেশনকে অনুরোধ করি, তাঁহারা ছেলেদের ফুটবল খেলিবার জন্য কয়েকটা মাঠ করিয়া দিন।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—

বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের শুভ দিন কি সত্য সত্যই আসিল? দিকে দিকে নানা লক্ষণ দেখিয়া তাহাই ত অনুমান হইতেছে। বাঙ্গলা ভাষা আজ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন হইতে চলিয়াছে। বন্দোবস্ত প্রায় সবই ঠিক—কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের এবং সরকারের অনুমোদনের মাত্র অপেক্ষা। আর এক দিকে আরও একটা শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ভাষার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন; এবং রবীন্দ্রনাথও এই পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। লেকচারের বিষয় নির্ব্বাচন ও সংখ্যা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন। বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে যে কোন বিষয়ে যে কয়টী ইচ্ছা বক্তৃতা রবীন্দ্রনাথ দিতে পারিবেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স এবং বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করিলে বলিতে হয় এই পদ গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ অসমসাহসিকতার পরিচয় দিলেন। বাঙ্গলা ভাষা বাঙ্গলা সাহিত্য ও বাঙ্গলার দেশমাতৃকার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম অনুরাগের ফলেই এই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইল। এই পদের বাৎসরিক পারিশ্রমিক পাঁচ হাজার টাকা নির্দ্দিষ্ট হইল। রামতনু লাহিড়ী ফেলোসিপের আয় বৎসরে দশহাজার টাকা। বর্ত্তমান ব্যবস্থা-অনুসারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া অবশিষ্ট পাঁচ হাজার টাকায় আর একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইবে। এক দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যাপারে বাঙ্গলা ভাষার প্রবর্ত্তন, অপর দিকে বিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগে বাঙ্গলার অধ্যাপকের পদে রবীন্দ্রনাথের নিয়োগ বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে যে নিতান্তই শুভ সংযোগ তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

পতিতা-সমস্যা—

কলিকাতা ও অন্যান্য সহরে পতিতা-সমস্যা একটা গুরুতর সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধির প্রতিকারের জন্য বহু দিন হইতে নানারূপ চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু সমস্যাটি এতই জটিল এবং সমগ্র সমাজ-গঠন-পদ্ধতির সহিত এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত যে ইহার মীমাংসা করা বড় সহজ নহে। পতিতা-সমস্যার সমাধানকল্পে বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভায় Bengal Suppression of Immoral Traffic Bill নামে একটি আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত হইয়াছে। গত ২৩এ জুলাই, ১৯২২, শুক্রবার ওয়াই, এম, সি, এ'র চৌরঙ্গী শাখায় ক্যালকাটা ভিজিল্যান্স এসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির পদ হইতে কলিকাতার লর্ড বিশপ মহোদয় জনসাধারণকে, বিশেষতঃ বাঙ্গলার নারীসমাজকে, এই পাণ্ডুলিপির সমর্থন করিতে অনুরোধ করিয়া একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। তা ছাড়া, এই বিলের সমর্থন কল্পে অন্যান্য স্থানেও সভা-সমিতির অধিবেশন হইতেছে। এরূপ একটি সমাজ-হিতসাধনোদ্দেশ্যে রচিত বিলের সমর্থন করা যে সকলেরই উচিত, তাহাতে মতদ্বৈধ ঘটিতে পারে না। তবে বিষয়টি এমন জটিল যে, আইনের ফলাফল না দেখিলে, উহার দ্বারা সামাজিক ব্যাধির যথার্থ প্রতিকার হইবে কি না বলা যায় না। বারনারী-সমস্যা সম্বন্ধে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী একটি ঘটনার কথা আমরা, যতদূর স্মরণ হয়, উল্লেখ করিতেছি। তাহা হইতে, বিষয়টির জটিলতা পাঠকবর্গের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। সেই সময় বরাবর ভূপালের তদানীন্তন বেগমসাহেবা একবার আদেশ দিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে বারনারী থাকিতে পারিবে না। বারনারীদের মধ্যে যাহারা বিবাহ করিয়া দাম্পত্য জীবন যাপন করিবে, কেবল তাহাদেরই তাঁহার রাজ্যে স্থান হইবে। অবশিষ্ট সকলকে তাঁহার রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা হইবে। যেদিন এই হুকুম জারি করা হইল, সেইদিন রাত্রেই সাত শত বারনারীর বিবাহ হইয়া গেল—পরদিন হইতে তাহারা প্রকাশ্যতঃ দাম্পত্য জীবন যাপন করিয়া ভূপাল রাজ্যে বাস করিতে লাগিল। অবশিষ্ট বারনারীরা অবশ্য বেগম সাহেবার আদেশ অনুযায়ী রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইল। কয়েক দিনের মধ্যেই কিন্তু দেখা গেল, ঐ সাতশত বারনারী, দাম্পত্য জীবনের আবরণে—প্রকাশ্যভাবে নয়, গোপনে—আগেকার মতই বারনারী বৃত্তি চালাইতেছে। এইরূপে কার্য্যতঃ বেগম সাহেবার মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। সম্প্রতি বোম্বাই সহরে আইন প্রণয়ন করিয়া তত্রত্য পতিতালয়গুলি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফল যে খুব ভাল হইয়াছে তাহা মনে হয় না। কয়েক দিন পূর্ব্বে অমৃত বাজার পত্রিকায় দেখিতেছিলাম যে, বোম্বাইবাসীরা অভিযোগ করিতেছেন—বোম্বায়ের পতিতালয়গুলি তুলিয়া দেওয়াতে বারনারীরা সহরের বহুতর স্থানে গিয়া বাস করিতেছে—যাহা কয়েকটিমাত্র স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল, সেই ব্যাধি সমগ্র সহরে এমনভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, কে পতিতা, কে পবিত্রা তাহা বাছিয়া লওয়া দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতাতেও যাহাতে এইরূপ অবস্থা না ঘটে, আইনটি এমনভাবে রচিত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেও, কার্য্যক্ষেত্রে উহা প্রয়োগ করিয়া ফলাফল না দেখিলে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা যায় না।

রবীন্দ্র-জয়ন্তীর ভোজ—

বিগত বড়দিনের সময় যখন মহাসমারোহে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হয়, তখন দেশের অনেক প্রতিষ্ঠানই বিশ্ব-কবিকে অভিনন্দিত করেন, কেবল কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ই সে সুযোগ লাভ করিতে পারেন নাই। বিশ্ব বিদ্যালয় সেই সময়ই আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হইয়া পড়ায় তখন তাঁহাকে অভিনন্দিত করা সম্ভবপর হয় নাই। এতদিন পরে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ করিলেন। বিগত ২১শে শ্রাবণ তাঁহারা কলিকাতা সিনেট গৃহে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। ২০শে তারিখে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কয়েকজন সদস্য বোলপুরে গমন করেন এবং সেইদিনই মাননীয় গজনবী সাহেবের সরকারী সেলুন যোগে কবিকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। হাবড়া ষ্টেশনে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সদস্যগণ কবিকে সাদর অভ্যর্থনা করেন এবং পরদিন যথাসময়ে সিনেট ভবনে লইয়া আসেন এবং সিনেটের সোপানে ভাইস চ্যান্সেলর ও অন্যান্য সদস্যগণ কবিকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া সভাগৃহে লইয়া যান এবং সেখানে তাঁহাকে মাল্যভূষিত করিয়া

যথারীতি অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন ; কবিবরও এই অভিনন্দনের উত্তর প্রদান করেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই অনুষ্ঠান সর্ব্বাংশে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল।

কলিকাতা বন্দরের আমদানী রপ্তানী—

গত জুন মাসে কলিকাতা বন্দরে আমদানীর পরিমাণ মে মাসের তুলনায় আরও হ্রাস পাইয়াছে। মে মাসে ২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল, জুন মাসে হইয়াছে ২ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকার। গত বৎসর জুন মাসে আমদানীর পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা।

রপ্তানীর পরিমাণও মে মাসে ৩ কোটি ৩২ লক্ষ টাকার স্থলে জুন মাসে ৩ কোটি ৩ লক্ষ টাকা হইয়াছে। গত বৎসর জুন মাসে রপ্তানী হইয়াছিল ৩ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার।

এ বৎসর জুন মাসে কোন্ জিনিষ কত লক্ষ টাকার আমদানী হইয়াছে এবং গত বৎসরের জুন মাসের তুলনায় কত লক্ষ টাকা হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

জিনিষ	লক্ষ টাকা	হ্রাস-বৃদ্ধি
কার্পাস দ্রব্য	৫২	বৃঃ ৬
কলকব্জা	৩৬	„ ৪
তৈল ও খনিজ	১১	হ্রাঃ ১৩
লৌহ ও ইস্পাত	১৭	„ ১
অন্যান্য ধাতু	১০	বৃঃ ১
খাতব জিনিষ	১০	„ ১
চিনি	৯	হ্রাঃ ৪
মদ্য	৪	„ ১
তামাক	১	„ ৪

কাপড়ের আমদানী ১ কোটি ৯০ লক্ষ বর্গগজ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২ কোটি ৩০ লক্ষ বর্গগজে এবং মূল্য হিসাবে ৩৫ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৭ লক্ষ টাকায় উঠিয়াছে।

চিনির আমদানী ১২ হাজার টন হইতে ৮ হাজার টনে, মূল্য হিসাবে ১২ লক্ষ টাকা হইতে ৮ লক্ষ টাকায় নামিয়াছে।

আমেরিকা হইতে কেরোসিনের আমদানী খুব কমিয়া গিয়াছে।

সিগারেটের আমদানীও খুব বেশী পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

রপ্তানী

১৯৩২ সালের জুন মাসে কোন্ জিনিষ কত লক্ষ টাকার রপ্তানী হইয়াছে এবং ১৯৩১ সালের জুন মাসের তুলনায় কত লক্ষ টাকা হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

পাটের জিনিষ	১৫৭	হ্রাস	৫
কাঁচা পাট	৩৩	„	১৩
চা	৩১	„	১০
খাদ্য শস্য	১৪	„	১
চর্ম্ম	১১	„	১২
লাক্ষা	৮	„	৩
লৌহ	৫	„	৩
ম্যাঙ্গানিজ	৩	„	২

রপ্তানির দিকে সমস্ত জিনিষেরই পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে।

স্বর্ণ-রপ্তানী—

গত ২৩শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ভারতবর্ষ হইতে ৯৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২৩শে জুলাই পর্য্যন্ত ১৭ কোটি ১১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার রপ্তানী হইয়াছে। মার্চ্চ মাসে ৬ কোটী ৮৯ লক্ষ ৩৯ হাজার, এপ্রিল মাসে ৪ কোটী ২৩ লক্ষ ৭৮ হাজার, মে মাসে ৩ কোটী ৩০ লক্ষ ৪২ হাজার এবং ১৯৩১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৩২ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত মোট ৬০ কোটী ৭৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছে। ১৯২১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৩২ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত স্বর্ণের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ মোট ৫৭ কোটী ৯৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা বেশী হইয়াছে।

গ্রন্থ-প্রাপ্তি স্বীকার

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার প্রণীত 'জমিদারী দর্পণ ও সার্ভে সেটেলমেণ্ট বিধি'। প্রত্যেক কোর্ট অব ওয়ার্ডসের জ্ঞাতব্য ম্যানেজার। প্রকাশক কমলা বুক ডিপো, লিমিটেড ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৸০।

দৌলতপুর হিন্দু একাডেমির বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধারমণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ ও ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত "চন্দ্রশেখর তত্ত্ব"—অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখরের" আলোচনা। সোল এজেন্টস কমলা বুক ডিপো, লিমিটেড। ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ।৶০।

শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণের অপরাজিতা ব্রহ্মবিদ্যা, অথবা আত্মদর্শন বা সত্যলাভ। ঈশোপনিষৎ। স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক শ্রীকুসুমরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। উপনিষৎ রহস্য কার্য্যালয়, শ্রীগুরু মন্দির—কোঁড়ার বাগান, হাওড়া। মূল্য ১।০।

শ্রীযুক্ত আশীষ গুপ্ত প্রণীত গল্পের বই "ইহাই নিয়ম"। সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯ রবানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত অজিতকুমার সেন এম-এ প্রণীত কবিতার বই 'সুর-মুরো'। প্রকাশক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বাগচি, ইলাবাস, হিন্দুস্থান পার্ক, বালীগঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

"দিদির বর" উপন্যাস; শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মণ্ডল প্রণীত। সিটি লাইব্রেরী, ৩৩, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও ২৩, বাঙ্গলা বাজার ঢাকা। মূল্য একটাকা।

ভক্তপ্রবর মহাকবি সুরদাস—জীবনী ও কাব্যালোচনা; শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল, ভাষাতত্ত্বরত্ন, এম-এ লিখিত, কলিকাতা ইউনিভার্সিটী প্রেস। মূল্য দেওয়া নাই।

উপনিষদ রহস্য বা গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা—শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীকুসুমরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়—শ্রীগুরু মন্দির, কোঁড়ার বাগান, হাওড়া। মূল্য ৸০।

ইতালিতে বারমাসক—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত, সিটি লাইব্রেরী, ৩৩ কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷০।

কালিদাস—স্ত্রী-ভূমিকা বর্জ্জিত বালকদিগের আবৃত্তি ও পাঠের উপযোগী ক্ষুদ্র নাটক; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম-এ প্রণীত। গুরুদাস পাবলিসিং হাউস, ৫১ অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

রায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন বাহাদুর প্রণীত উপন্যাস "উষা"—১৲

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "মায়াযন্ত্র"—১৷০

শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী প্রণীত "স্মৃতিকাব্য"—৸০

শ্রীযুক্ত প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "সেজবৌর ডায়েরী"—১৷০

শ্রীযুক্ত অনিল রায় প্রণীত "মায়াবাঈ"—।৶০

শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "কালো মাণ্ড"—৸০

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "দুঃখের দেওয়ালী"—১৷০

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "প্রথম প্রেম"—২৲

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দত্ত প্রণীত "নীলমণির লীলা" প্রহসন—।০

রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথমোহন দাস বাহাদুর প্রণীত "সমবায় সোপান"—।০

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "সৌরী"—১৷০

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার প্রণীত "জমিদারী দর্পণ"—৩৷০

শ্রীযুক্ত রাধারমণ চক্রবর্ত্তী এম-এ ও শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত "চন্দ্রশেখর তত্ত্ব"—।৶০

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' আগামী ২৫শে ভাদ্র এবং কার্ত্তিক সংখ্যা ১০ই আশ্বিন প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপন-দাতৃগণ আশ্বিন কার্ত্তিক দুই মাসের বিজ্ঞাপন এক সঙ্গে ছাপিতে দিবার ব্যবস্থা করিয়া বাধিত করিবেন।

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons.
201, Cornwallis Street, Calcutta.

Printer—NARENDRA NATH KUNAR.
The Bharatvarsha Printing Works.
203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.